৪র্থ খণ্ড, [illegible]ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ, ১২৮২।

ও

প্রতিবিম্ব।

(মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।)

কলিকাতা।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিংলাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮২

মূল্য।৴০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

১। বিবিধ কারণ বশত জ্ঞানাঙ্কুর এত দিন বন্ধ ছিল, এক্ষণে উহার কার্য্যভার হস্তান্তরিত হইল। আর ইহার প্রচার বিষয়ে গ্রাহকগণ সন্দেহ করিবেন না। ইহার সমুদায় বন্দোবস্ত নূতন হইল। যদিও ইহার অন্যান্য বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তিত হইল, তথাপি ইহার নিয়মগুলি পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল, আমরা তাহার কোন পরিবর্ত্ত করিলাম না।

২। জ্ঞানাঙ্কুরের সহিত প্রতিবিম্ব মিলিত হইল। কোন বঙ্গীয় মাসিক পত্র সম্বন্ধে প্রতিবিম্বে যে কথঞ্চিৎ বিদ্বেষ ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর তাহার লেশমাত্রও থাকিবে না।

৩। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য বিষয়ে নিম্নলিখিত নিয়মই অবধারিত রহিল ;—

বার্ষিক অগ্রিম	৩৲
ষাণ্মাষিক ,, ...	১৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	।৵০

এতদ্ব্যতীত মফঃসলে গ্রাহকদিগের বার্ষিক ।৵০ ছয় আনা করিয়া ডাক মাশুল লাগিবে।

৪। যাঁহারা জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য স্বরূপে ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন ; এবং প্রত্যেক টাকাতে ৴০ এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইতে হইবে, কেননা বিক্রয় করণ কালে আমাদিগকে টাকাতে ৴০ আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

৫। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের কার্য্য সম্বন্ধে পত্র এবং সমালোচনের জন্য গ্রন্থাদি আমরা গ্রহণ করিব। রচনা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমাদের ঠিকানায় "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব সম্পাদক" শিরোনাম দিয়া লিখিতে হইবে।

৬। ব্যারিং ও ইন্সফিসেণ্ট পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট
ক্যানিং লাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব কার্য্যাধ্যক্ষ।

[মাসিক পত্র ও সমালোচন]

৪র্থ খণ্ড] অগ্রহায়ণ ১২৮২ [১ম সংখ্যা

অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায়।

দর্শনেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণ অন্ধ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্ধত্ব কি মর্ম্মান্তক, ক্লেশের আকর! কি দুরপনেয় যন্ত্রণার নিদান! অন্ধগণ জগতের সমুদায়ই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন বলিয়া অনুভব করে। সহস্র রশ্মির প্রতপ্ত কাঞ্চন-ময়-সূত্র-সন্নিভ কিরণজাল, হিমাংশুর নয়ন রঞ্জন কমনীয় মূর্ত্তি, নৈশ গগন বিকাশিত মুক্তাবৎ তারকা প্রভৃতি দর্শন লোভনীয় পদার্থ সমূহ অন্ধগণ সমীপে তমসাবগুণ্ঠিত রূপে প্রতীত হয়। বসুধা যেন তামসময়ী হইয়া তাহাদিগের নিকট বিচরণ করিতে থাকে। চক্ষুহীনদিগকে সর্ব্বদাই পর প্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হয়। অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যই অপরের সাহায্য সাপেক্ষ, অন্যথা তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়া থাকে।

অন্ধদিগের সহানুভূতি নিতান্ত হীন ভাবাপন্ন। স্বয়ং দর্শন না করিলে অপরের শারীরিক চেষ্টাগত ভাব কখনই সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। দুঃসহ যন্ত্রণা প্রকাশক বিকার, অথবা অনুপম আনন্দজনক দৃষ্টি উভয়ই প্রায়, আকৃতিগত ভাব দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত উভয়বিধ জ্ঞানই দর্শন সাপেক্ষ। কিন্তু অন্ধগণ এতদ্বিষয়ে একান্ত বঞ্চিত। সুতরাং তাহাদিগের সহানুভূতি যে হীনতর

হইবে, সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। জন্মান্ধগণ এই সহানুভূতির অভাব নিবন্ধন ঈশ্বরের সত্ত্বাতেও অবিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে। সুবিখ্যাতনামা সর আঁইজাক নিউটনের সমকালে সাণ্ডার্শন নামক এক জন প্রসিদ্ধ জন্মান্ধ বিজ্ঞানবেত্তা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিও সহজজ্ঞানে ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তিম সময়ে এক জন ধর্ম্মোপদেষ্টা ঐশ্বরিক ভাব মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাওয়াতে আসন্ন-মৃত্যু সাণ্ডার্শন বলিয়াছিলেন ;—

"হায়! আমি সমস্ত জীবন কেবল অন্ধকার মধ্যেই অতিবাহিত করিলাম। প্রকৃতির কৌশল আমাকে আকাশ-কুসুম সদৃশ ফল প্রদান করিল। আপনি যে সমস্ত ঐশ্বরিক তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা কেবল আপনি ও আপনার সদৃশ ব্যক্তিগণই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।"

বিজ্ঞানবেত্তার এই নাস্তিকতা বিজৃম্ভিত বাক্য শ্রবণ করিয়া উল্লিখিত ধর্ম্মোপদেষ্টা তৎসমকালীন নিউটন প্রভৃতির ধর্ম্মভাব ব্যক্ত করিলে সাণ্ডার্শন উত্তর করিয়াছিলেন ; — 'নিউটন প্রকৃতির বিচিত্র কৌশলময় কার্য্য সন্দর্শন করিয়া ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা প্রবল নহে। যাহা হউক, এক্ষণে নিউটন বিশ্বাস্য 'পরমেশ্বর' পদটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইল।' পরিশেষে এই বিজ্ঞানবেত্তা 'হে নিউটনের ঈশ্বর! অন্তিম সময়ে আমাকে তোমার করুণার আস্পদ কর' বলিয়া পরলোকগত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, জন্মান্ধগণ এক প্রকার নাস্তিকের ন্যায় কালাতিপাত করে। কেবল ইহাই তাহাদিগের শোচনীয় দশার পরিণাম নহে, দর্শন শক্তির অভাব নিবন্ধন অসহনীয় যন্ত্রনা পীড়িত হইয়া ইহারা সর্ব্বদা করুণ রসপূর্ণ বিলাপ দ্বারা জনগণের হৃদয় ব্যথিত করিয়া থাকে। কবিকেশরী মিল্‌টন স্বপ্রণীত 'স্বর্গভ্রষ্ট' নামক লোকবিশ্রুত মহাকাব্যে স্বীয় দুঃসহ অন্ধত্ব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ;—

'বৎসরের সহিত ঋতু সকল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রকৃতি প্রতি ঋতুতে নব নব ভূষায় ভূষিত হইয়া জনগণের নিকট উপস্থিত হইতেছে ; কিন্তু হায়! আমার নিকট কিছুই পরিবর্ত্তিত হইতছে না। সুকোমল-অরুণরাগ-বিভাসিত প্রাভাতিক লক্ষ্মী, দিবস-পরিণাম-সম্ভূত নয়নরঞ্জন সায়ন্তন শ্রী, নব পল্লব বল্লরীরাজি সুশোভিত বাসন্ত দৃশ্য, গ্রীষ্ম সম্ভূত সুরম্য পুষ্পশ্রেণী এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিলাসিত মানববদন প্রভৃতি সকলই সমভাবে রহি-

য়াছে—সকলই অন্ধতমসাবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া উপদেশ লাভ কিম্বা প্রকৃতির কার্য্য পরম্পরা সন্দর্শন করিয়া বহুদর্শিতা উপার্জ্জন করিবার সাধ্য নাই। আমি কেবল অন্ধকার মধ্যেই অবস্থান করিতেছি। চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্য সমূহ আমাকে নিরন্তর আকাশ কুসুম সদৃশ ফল প্রদান করিতেছে।"

ফলতঃ অন্ধগণ বহুবিধ কষ্ট ও অশান্তি অনুভব করিয়া থাকে। স্বাধীন ভাবে জীবিকা সংস্থাপন করা এই দুর্ভাগ্যদিগের নিতান্ত ক্লেশসাধ্য বলিয়া আশু অনুমিত হয়। কিন্তু স্থিরচিত্তে উপায়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ইহা তাদৃশ কষ্টকর বলিয়া প্রতীত হইবে না।

অন্ধত্ব যেমন কতিপয় ক্লেশ সমষ্টির নিদান, সেইরূপ কয়েকটী সদ্গুণ সমষ্টিরও আকর। অন্ধত্বাবস্থায় স্মৃতিশক্তির তীব্রতা সাধিত হয়—মনোযোগের আধিক্য হয় এবং কল্পনা ও চিন্তা শক্তির সবিশেষ উৎকর্ষ হইয়া থাকে। বাহ্য জগৎ তাহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না বলিয়া অন্তঃকরণের বিশিষ্ট স্থিরতা সাধিত হয়। মালব্রাঞ্চ নামা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রগাঢ়রূপে মনঃসংযোগ করিবার সময়ে সূর্য্যালোক প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত গৃহের গবাক্ষ সমূহ রুদ্ধ করিতেন, এতন্নিবন্ধন অবস্থান গৃহ অন্ধকারময় হইয়া তাঁহার চিন্তাশক্তির বিশিষ্ট অনুকূলতা সাধন করিত। অপিচ অন্ধদিগের দৃষ্টি শক্তি না থাকাতে কোন লিখিত বিষয় স্বয়ং পাঠ করিয়া মর্ম্মাবগত হইবার উপায় থাকে না সুতরাং তাঁহারা অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ সহকারে অপরের পাঠ শ্রবণ করে, এবং পাঠ সমাপ্ত হইলেও শ্রুত বিষয়গুলি মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া স্মৃতি পথবর্ত্তী করিতে সবিশেষ প্রয়াসবান্ হয়। এইরূপে স্মৃতি, মনোযোগ ও চিন্তা তিনটীই সমভাবে চালিত হওয়াতে সকল গুলিই সতেজ হইয়া উঠে। প্রথিত আছে ডিমক্রিতিস্ নামক এক জন বিজ্ঞানবেত্তা এই সমস্ত গুণ পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়াছিলেন। চিন্তা শক্তির প্রগাঢ়তা নিবন্ধন অন্ধদিগের কবিত্ব ও গণিতশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়া থাকে। ইংলণ্ডের কবিকুল চূড়ামণি মিল্টন অন্ধত্বাবস্থায় 'স্বর্গভ্রষ্ট' নামক অত্যুৎকৃষ্ট ভুবন-মোহন কাব্য প্রণয়ন করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ণিত আছে গ্রীশ্ দেশীয় মহাকবি হোমর অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনিও বীররসাত্মক 'ইলিয়াদ' কাব্য প্রণয়ন করিয়া জগৎ বিশ্রুত হইয়াছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানবেত্তা সাণ্ড-

র্শনের বিষয় এক বার লিখিত হইয়াছে; তিনি যে কেবল দৃষ্টিশক্তি বিহীন ছিলেন এরূপ নহে, তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় মাত্রও ছিল না। কিন্তু পরিশেষে এই অন্ধ মহানুভব স্বাবলম্বন বলে বিজ্ঞান ও গণিত বিদ্যায় তৎসমকালে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অধিক কি, এই মহাত্মাই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদ্‌বিখ্যাত সর্ আইজক্ নিউটনের আসন পরিগ্রহ করিয়া অন্তেবাসীবর্গকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন সাণ্ডার্শনকে জীবিকা নির্ব্বাহ বিষয়ে কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। ইনি অধ্যাপনা কার্য্যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পোষ্যবর্গের পর্য্যন্ত ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আমেরিকা বাসী বিখ্যাত গ্রন্থকার প্রেস্‌কটের নাম অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন; বাগ্‌দেবীর এই স্নেহাস্পদ পুত্রও সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া একরূপ অন্ধত্বাবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সময়ে এই মহামনস্বী এক চক্ষুহীন হয়েন, পরিশেষে ঘটনা বশতঃ অন্য চক্ষুটীরও দুইবার দর্শন শক্তি বিলুপ্ত হয়। প্রেস্‌কট এইরূপ বিপন্ন অবস্থাতেও কতিপয় ইতিবৃত্ত মূলক প্রস্তাব রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রশস্তমনা ব্যক্তি অন্ধনিবাস বিষয়ে একটী মনোহর প্রস্তাব লিখিয়া অন্ধত্বকে বধিরতা অপেক্ষা সৌভাগ্য সমন্বিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইউলর অন্ধ ছিলেন; কিন্তু তিনি বিখ্যাত গণিত ও বিজ্ঞানবেত্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

অন্ধদিগের যেমন মনঃসংযম প্রভৃতি গুণের উৎকর্ষ হয়, সেইরূপ স্পর্শজ্ঞানেরও অসাধারণ তীব্রতা সাধিত হইয়া থাকে। অনেকানেক অন্ধ কেবল হস্ত পরামর্শ দ্বারা পদার্থ সমূহের বর্ণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। কেবল ইহাই নয়, অনেক অন্ধমনুষ্য প্রকৃত চক্ষুষ্মানের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এরূপও অবগত হওয়া গিয়াছে যে তাহারা ঘোর অমারজনীতে পথ প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া পথিকদিগকে গন্তব্য স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদ ম্যাক্‌ডফ্ অন্ধ ছিলেন। তিনি এইরূপ পথ প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া পথিকদিগকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু ইনি স্থপতি বিদ্যাতেও জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

দর্শনবেত্তা আবরক্রম্বি স্বপ্রণীত দর্শন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন,—একটী ইন্দ্রিয় শক্তি হীনভাবাপন্ন হইলে

অপর শক্তিগুলি সহজেই সতেজ ও স্বকর্ম্মপ্রবল হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন অন্ধদিগের অন্যান্য জ্ঞানশক্তিগুলি যে অপেক্ষাকৃত প্রবল ও তেজস্কর হইবে, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অন্ধদিগের ইন্দ্রিয় বিশেষের শক্তির বিষয় শ্রবণ করিলে অবাক্ ও হত-বুদ্ধি হইতে হয়। সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-বেত্তা অন্ধ ডাক্তার ময়সি কোন বন্ধুর পরিহিত পরিচ্ছদের বর্ণ কেবল আঘ্রাণ শক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। উত্তর আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী ইউনাইটেডষ্টেটস্ বাসী অধ্যাপক আপ্‌হাম উল্লেখ করিয়াছেন, হার্টফোর্ডস্থ অন্ধ-নিবাস-বাসিনী একটী বালিকা কেবল হস্তপরামর্শ দ্বারা রজকীর বস্ত্রের বস্তা হইতে নিজের বস্ত্রগুলি চিনিয়া লইত। ডাক্তার রাস্ বর্ণন করিয়াছেন, ফিলাডেলফিয়া নগরের দুইটী অন্ধ ভ্রাতা পথ চলিবার সময় অগ্রপথবর্ত্তী কোন প্রোতশঙ্কু ইত্যাদি থাকিলে তাহা জানিতে পারিয়া দণ্ডায়মান হইত। এই ভ্রাতৃদ্বয় অপূর্ব্ব সংস্কার বলে মস্তকোপরি উড্ডীয়মান ক্রীড়া কপোতের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইত। সুবিখ্যাত বিজ্ঞান ও গণিত-বেত্তা আণ্ডার্সন অসাধারণ স্পর্শশক্তি-বলে পুরাতন এবং অনুকৃত নূতন পদক সমূহ বিভেদ করিয়া দিতে পারিতেন। এই ধীশক্তিসম্পন্ন অন্ধ মহানুভব যখন উদ্যানে বসিয়া জ্যোতিষ বিদ্যার আলোচনা করিতেন, তখন আকাশ-মার্গ পরিচালিত মেঘখণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিতেন।

কেবল পাশ্চাত্য দেশের মুখাপেক্ষা না করিলেও আমাদিগের দেশ হইতে অন্ধদিগের ঈদৃশ অসাধারণ শক্তি বিশেষের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী পরম ভাগবত সুরদাস অন্ধ ছিলেন। তিনিও এই অন্ধত্বাবস্থায় দশ সহস্র পদাবলি রচনা করিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের মধ্যেও ঈদৃশ ব্যক্তি অবিরল নহেন। নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আনুলিয়া নিবাসী দীননাথ নামক জনৈক ব্যক্তি চারিমাস বয়ঃক্রম কালে হাম-রোগে অন্ধ হয়েন। পঠদ্দশায় ইনি ১২৭২ কি ৭৩ সালে কাশী গমন করেন। কাশীতে অবস্থান কালে সর্ব্বদা গুরু সন্নিধানে বসিয়া থাকাতে ৬ খানি উপনিষদ্ অন্বয় ও ব্যাখ্যা সহিত মুখস্থ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর কবিত্ব ও সঙ্গীতেও বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে। স্বয়ং নানাবিষয়ে গীত রচনা করিয়া তানলয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে গান করিতে পারেন। আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এইস্থলে দীননাথ বিরচিত একটী গানের প্রথম কলিটী

উদ্ধৃত করিয়াদিলাম ;——

'আমি এসেছি যারো আশে,
যাব কোথা তার উদ্দেশে।
নিজ স্নেহগুণে বন্ধি জীবগণে
কে পালে যতনে, আছে জগত
মোহিত, কার, প্রেমাভাবে।'

সম্বাদ পত্রপাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে নদীয়া জেলার অন্য একটী অন্ধ অধ্যাপক অসাধারন মেধা ও মনঃ সংযম বলে সংস্কৃতে পারদর্শিতা লাভ পূর্ব্বক স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া অন্তেবাসীবর্গকে নিয়মিতরূপে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

উল্লিখিত উাদহরণ পরম্পরা দ্বারা অন্ধদিগের ক্ষমতা অনেকাংশে উপলব্ধ হইবে, এবং তাহারা মনোযোগ করিলেই যে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী সংস্থান করিতে পারে, তাহাও অনুমিত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে যে কতিপয় মহামনস্বীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ ব্যক্তি হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা বহুকাল সাক্ষেপ। বিশেষতঃ অন্ধগণ দেশকালানুসারে কেবল মসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এরূপ আশা করাও নিতান্ত অসাময়িক ও অসঙ্গত। অতএব অন্ধদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত কতিপয় উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

১ম। অন্ধনিবাস স্থাপন।

২য়। উক্ত নিবাসে অন্ধদিগের শিক্ষানুকূল নিয়ম সংস্থাপন ও তাহাদিগকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান।

৩য়। নিবাসবাসী অন্ধদিগের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিয়া তদুৎপন্ন অর্থদ্বারা নিবাস রক্ষার মূলধন বৃদ্ধি করণ।

৪র্থ। শিক্ষার পরিচয় গ্রহণ ও পুরস্কার স্বরূপ উপযুক্ত অন্ধদিগের সংসার প্রবেশোপযোগী উপায় সংস্থাপন।

৫ম। সুশিক্ষিত অন্ধদিগের স্বাধীনভাবে জীবিকা রক্ষার নিমিত্ত নিবাস শিক্ষিত বিষয়ানুসারে যথারীতি ব্যবসায় অবলম্বন। অন্ধনিবাস স্থাপন ও তথায় যথারীতি শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের সহিত অন্ধদিগের জীবন যাত্রার সংস্থান অনুলিপ্ত আছে। অতএব আদৌ অন্ধনিবাসের বিষয় বিবৃত করিয়া পশ্চাৎ অন্ধদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

১ম। অন্ধনিবাস স্থাপন।

জীবিকা সংস্থানানুরূপ শিক্ষা লাভ করা নিজায়াত্ব নহে। এতদ্বিষয়ে অপরের হস্তাবলম্বন গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা স্বশক্তি সমুত্থিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও কোন না কোন বিষয়ে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অতএব যখন চক্ষু-

স্থানগণও অপরের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন যে অন্ধগণ কেবল নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া তদধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে, তাহা নিতান্ত অসম্ভাবিত। অন্ধদিগের স্বাধীন ভাবে জীবিকা সংস্থান হিতৈষিগণের অভীষ্ট হইলে শিক্ষনীয় অবস্থা হইতেই তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যানুসারে কাজ করিতে হইলে স্থানবিশেষে এক একটী অন্ধনিবাস স্থাপন করা একান্ত বিধেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এই অন্ধনিবাস যথা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্ধদিগের অবস্থান ও আহারাদি বিষয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ এক একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। এই অধ্যক্ষ যথানিয়মে সমুদয় অন্ধের অবস্থান প্রভৃতির সুবিধা করিয়া দিবেন। ফলত অন্ধদিগের অবস্থানাদি সম্বন্ধে যাহ কিছু আবশ্যক, তৎসমুদুয়ের সম্পাদন বিষয়েই ইহাঁকে দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

সমুদয় জাতির অন্ধদিগকে এক আশ্রমে স্থান দিলে জাতি অনুসারে তাহাদিগের অবস্থান ও খাদ্য প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত নিবাসে অন্ধগ্রহণ করিবার সময়েও যথাবিহিত নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়। সংক্রোমক রোগাক্রান্ত দিগকে নিবাসে স্থান দেওয়া উচিত নহে। যে জাতীয় অন্ধ আশ্রম বাস প্রার্থী হইবে তাহাকে সেই জাতির আবাস গৃহে স্থান দিয়া তত্ত্বাবধারণ করা কর্ত্তব্য।

অন্ধনিবাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তদরক্ষণোপযোগী একটী মূলধন স্থাপন করা বিধেয়। উক্ত মূলধন সঞ্চিত মুদ্রাদ্বারাই নিবাসের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। মূল-ধন-রক্ষার ভার নিবাস সম্পর্কীয় কতিপয় হিতৈষী ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত। উক্ত মহোদয়গণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিবাস রক্ষণোপযোগী মূলধন বৃদ্ধিকরণ ও তদুৎপন্ন অর্থদ্বারা নিবাসের আবশ্যক ব্যয় সম্পাদন স্বকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিবেন।

এডেনবরা ও পারীনগরীতে এক একটী অন্ধনিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে; এই দৃষ্টান্তানুসারে আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরেও আর একটী অন্ধনিবাস সংস্থাপিত হয়। শেষোক্ত নিবাসটি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মানবকুল হিতৈষী জন ফিসার কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া সমূহ সুফল প্রসব করিতেছে। অতএব অস্মদ্দেশেও এইরূপ এক একটী অন্ধনিবাস সংস্থাপিত হইলে বহুল উপকার সাধিত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বিধেয় নহে। স্বদেশ হিতৈষিগণের স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া

সমাহিত সাধনে অগ্রসর হওয়া উচিত। দেশহিতকর কার্য্যে লঘুহস্ততা ও অগ্রসরতা প্রদর্শন না করিয়া মুখে কেবল বাগ্‌জাল বিস্তার করা নিরবচ্ছিন্ন ধৃষ্টতা ও প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন মাত্র।

২য়। উক্ত অন্ধনিবাসে অন্ধদিগের শিক্ষানুকূল নিয়ম সংস্থাপন ও তাঁহাদিগকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান।

অন্ধনিবাস স্থাপন ও নিবাসবাসী অন্ধদিগের অবস্থানের সুবিধা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে। যাহাতে অন্ধদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিমুক্ত হইতে পারে তদুপযোগী উপায় বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। অন্ধদিগকে অবস্থা সঙ্গত ব্যবসায়ানুকূল শিক্ষা প্রদান করিয়া সংসারোপযোগী করাই তথাবিধ উন্নতির প্রশস্ততম উপায়। বিশেষতঃ অন্ধদিগকে যথা নিয়মে শিক্ষা দিয়া সংসারোপযোগী করিয়া দেওয়াই অন্ধনিবাস স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব সর্ব্বদা অবহিত চিত্ত হইয়া তাহাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি অন্ধ নিবাসে শিক্ষা দিলে অপেক্ষাকৃত সুখলব্ধ হইতে পারে।

সঙ্গীত বিদ্যা। সূচিকার্য্য। রজ্জু ও দ্রব্যাধার (চাঙ্গাড়ি ইত্যাদি) প্রভৃতির নির্ম্মাণ, লিখন ও পঠন।

উল্লিখিত বিষয় গুলির শিক্ষা দানার্থ সময় বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। বিভিন্ন বিষয়ের কতিপয় শিক্ষক যথা সময়ে অন্ধদিগকে নির্দ্দিষ্ট বিষয় গুলি শিক্ষা দিবেন। এইরূপ শিক্ষা দিতে কতিপয় শিক্ষানুকূল নিয়ম সংস্থাপনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে। প্রস্তাবিত বিষয়ে নিম্ন লিখিত কতিপয় নিয়মই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়।

নিবাস সন্নিধানে কি নিবাস মধ্যে একটী সুপ্রশস্ত গৃহে অন্ধ শিক্ষালয় স্থাপন করা উচিত। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন ১০ টা হইতে পরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত অন্ধদিগকে যথানিয়মে পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

তাহাদিগকে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন বিশ্রাম দিয়া চিত্তবিনোদনার্থ অবকাশ কাল নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতে দেওয়া উচিত। সঙ্গীতানুশীলন, সকলে পৃথক্ পৃথক্ সমবেত হইয়া বিশুদ্ধ উপন্যাস কি অন্যবিধ কোন ইতিহাসশ্রবণ এবং অন্ধোপযোগী পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ মুদ্রিত পুস্তক অধ্যয়নই এই চিত্তবিনোদনের প্রশস্ত উপায়। শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পাদনার্থ অবস্থানুরূপ ব্যায়ামাদি করিতে দেওয়াও অপরামর্শ সিদ্ধ নহে। শিক্ষনীয় বিষয়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিয়া তদনুসারে যথা সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের

শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্ধদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব প্রদর্শিত বিষয় গুলির যে কোন বিষয় শিক্ষা করিতে অভিলাষ করে, তাহাকে তত্তৎ বিষয়ের শিক্ষাধীন করা কর্ত্তব্য। অথবা যে ব্যক্তি যে বিষয় গুলিতে স্বল্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষিত হইতে পারে, তাহাকে সেই বিষয় শিক্ষা দেওয়াই প্রশস্ত। অপেক্ষাকৃত উন্নত ক্ষমতাশালী অন্ধদিগকে একবারে ৩। ৪ টী বিষয়ের শিক্ষাধীন করাও অবিবেচনা সিদ্ধ নহে।

অন্ধ নিবাসে শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে পঠোপযোগী পুস্তক সমূহ অন্ধদিগের অবস্থা সঙ্গত করিয়া মুদ্রিত করা আবশ্যক। এতদ্বিষয়ে সবিশেষ কৌশল প্রদর্শনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে। কাষ্ঠফলকে অক্ষর সমূহ খুদিয়া অন্ধদিগকে বর্ণপরিচয় শিক্ষা করান যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদিগের অধ্যয়নানুকূল পুস্তক সমূহ মুদ্রিত না করিলে বর্ণ শিক্ষা নিতান্ত বিফল হইয়া উঠিবে। ঈদৃশ পুস্তক মুদ্রিত করিতে অনুকৃতি দর্শনাপেক্ষা কল্পনা ও চিন্তাশক্তি সন্ধুক্ষণের সমধিক প্রয়োজন। নিম্ন লিখিত ত্রিবিধ প্রণালী অনুসারে অন্ধদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক সমূহের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে।

১। বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত লিখন প্রণালী (Stinography) অনুসারে কোন মুদ্রাপদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন।

এই প্রণালী বিশেষ আশ্রয় করিয়া অন্ধদিগেরপাঠোপযোগী পুস্তক সমূহ মুদ্রিত করিতে হইলে বিশিষ্ট কৌশল ও কল্পনা শক্তি পরিচালনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে। অতএব যথোচিত উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ করিয়া এক একটী পদ প্রকাশক এক একটী অক্ষর প্রস্তুত করা আবশ্যক। অক্ষর গুলি এরূপ কৌশল সহকারে নির্ম্মাণ করা উচিত যে, কাগজের এক পৃষ্ঠায় দৃঢ়তর বল প্রয়োগ করিয়া মুদ্রা করিলে অপর পৃষ্ঠা স্ফুটিত অক্ষর গুলি বিপর্য্যস্ত না হইয়া স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন হয়। এইরূপ সুকৌশল নির্ম্মিত অক্ষর সমূহ বিনা কালীতে মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠায় এরূপ শক্তি প্রয়োগ করিয়া মুদ্রিত করা আবশ্যক যে, অপর পৃষ্ঠায় সেই অক্ষর সমূহ বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া হস্ত পরামর্শ বোধ্য হইতে পারে। দেশ কাল ও পাত্রানুসারে এই প্রণালীটীই অন্ধদিগের বিশিষ্ট অবস্থানুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এরূপ করিলে অন্ধদিগের সর্ব্বদা আকার ইকার বিন্দু বিসর্গ প্রভৃতির অন্বেষণ জনিত কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। তাহারা কেবল হস্ত-পরামর্শ দ্বারা প্রয়োজনীয় পুস্তকা

সমূহের মর্ম্ম অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় মানসিক প্রীতি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

২। প্রথম প্রণালী প্রদর্শিত মুদ্রাপদ্ধতি অনুসারে প্রচলিত অক্ষর সমূহ মুদ্রিত করা।

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে প্রচলিত বড় বড় অক্ষর সমূহ মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলেও কাজ চলিতে পারে। অন্ধগণ এ গুলিও পূর্ব্বের ন্যায় হস্ত পরামর্শ দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারিবে।

৩। মোটাকাগজের এক পৃষ্ঠায় বিলক্ষণ গাঢ়মসী দ্বারা বড় বড় অক্ষর সমূহের মুদ্রা।

এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা মুদ্রামসী এরূপ গাঢ় করিতে হইবে যে, মুদ্রিত অক্ষর গুলি স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কথঞ্চিত উন্নত হইয়া হস্ত পরামর্শানুকূল হইতে পারে। এই প্রণালী দ্বারাও অন্ধদিগের অনল্প উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। প্রস্তাবের প্রারম্ভে অন্ধগণের স্পর্শ শক্তির উৎকর্ষের বিষয় যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তদ্দারাই ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইবে।

ইউরোপের অন্ধনিবাসে উল্লিখিত উপায়ত্রয়ের অন্যতম পদ্ধতি দ্বারা চরণ,ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া অন্ধদিগের বিশিষ্ট উপকার সাধন করিতেছে। শেষোক্ত প্রণালী-দ্বয় অনুসারে মুদ্রিত পুস্তকগুলি খণ্ডশঃ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা পুস্তকের পত্র সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িবে। ইউরোপের কোন অন্ধনিবাসে বাইবলের একটী অধ্যায় উক্ত নিয়মানুসারে মুদ্রিত হইয়া তিন খণ্ডে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মুদ্রিত পুস্তক সমূহ আশানুরূপ ফল সাধন করিতে পারিবে না, এরূপ ভ্রান্তি বিলসিত মতস্থাপন করা নিতান্ত অযৌক্তিক। অন্ধদিগের স্পর্শজ্ঞানের প্রখরতা যাঁহারা ধারণা করিতে না পারেন, তাঁহারাই এইরূপ প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার প্রেস্‌কট লিখিয়াছেন,— আমার একজন পরিচিত অন্ধ সঙ্গীত শাস্ত্রের স্বরলিপির কোন্ স্থানে অধিক কালী এবং কোন্ স্থানে অল্প কালী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা কেবল হস্ত পরামর্শ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিতেন। ঈদৃশ প্রখর স্পর্শজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে হস্ত পরামর্শ বলে পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রণালী সঙ্গতমুদ্রিত পুস্তক সমূহ অধ্যয়ন করিতে পারিবে না, এরূপ মত প্রকাশ করা যে কতদূর সাধু যুক্তির অনুমোদিত তাহা সহৃদয় পাঠক বর্গই অনুভব করিবেন।

সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হস্ত পরামর্শ বলে শিক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু গণিত শিক্ষা তথাবিধ অনায়াস-সাধ্য নহে। ইহা শিক্ষা করিতে হইলে অন্ধদিগকে মানসিক শক্তির বিশিষ্ট পরিচালনা করিতে হইবে। আদৌ অন্ধনিবাসে লিখন কার্য্য শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। কাগজে পিন দ্বারা বর্ণ সমূহের অঙ্কন প্রণালী শিখাইলেই অন্ধদিগের লেখার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে। ইহাতে কেবল অন্ধগণ নহে, চক্ষুষ্মানগণও লেখাগুলি বুঝিতে পারিবেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সুবিখ্যাত নামা প্রেস্কটের পরিচিতা একটী অন্ধমহিলা বিশিষ্ট সত্বরতা সহকারে পিন দ্বারা কাগজ স্ফুটিত করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। অপর অন্ধগণ উক্ত কাগজে হস্ত পরামর্শ করিয়া লিখিত বিষয় অনায়াসে বুঝিত। চক্ষুষ্মানগণও আলোর নিকট উহা ধরিয়া লেখাগুলি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেন। যাহাহউক এইরূপ উপায় দ্বারা লিখন প্রণালী অভ্যস্ত হইলে গণিত শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হইয়া উঠিবে।

সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতে অন্ধদিগকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। সঙ্গীত শাস্ত্রের স্বরলিপি সমূহ পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য।

সীবন কার্য্য এবং নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ শিক্ষা দিবার সময় অন্ধগণের সমক্ষে তত্তৎ বিষয়ের এক একটী আদর্শ উপস্থাপিত করা কর্ত্তব্য। অন্ধগণ স্পর্শ দ্বারা তাহার স্বরূপ অবগত হইলে বাচনিক উপদেশ প্রভৃতি দ্বারা কার্য্য প্রণালী শিক্ষা দেওয়া উচিত।

অনেকে মনে করিতে পারেন, অন্ধদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা বিড়ম্বনা মাত্র। এতদ্দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফললাভের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের এই মত নিতান্ত ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত। অন্ধদিগের গুণের বিষয় পূর্ব্বে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তদ্দ্বারাই অন্ধশিক্ষালয় স্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইবে। অন্ধদিগের বিবিধ গুণসম্ভাবনিবন্ধন দেশ হিতৈষী হাউই সাহেব ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পারী নগরীতে একটী অবৈতনিক অন্ধশিক্ষালয় স্থাপন করেন। এই শিক্ষালয়টী প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লব পর্য্যন্ত তাদৃশ সুফল প্রসব করে নাই। কিন্তু পরিশেষে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ডাক্তর গালিলির অধীন হইয়া আশানুরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে। পারী নগরীর দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড, স্কট্‌লাণ্ড, আষ্ট্রিয়া, রুষিয়া ও সুইট্‌জর্লাণ্ড প্রভৃতি দেশ সমূহের প্রধান প্রধান নগরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই-সমুদয় অন্ধনিবাসের শিক্ষা যে ব্যর্থীভূত হইতেছে, এরূপ নহে। প্রত্যুত উহা

অন্ধদিগের সঙ্গলই সাধন করিতেছে। অতএব অন্ধশিক্ষার দ্বারা তাদৃশ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই, এরূপ বাক্য বিন্যাস করা নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন মাত্র।

৩য়। নিবাস বাসী অন্ধদিগের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য সমুহ বিক্রয় করিয়া তদুৎপন্ন অর্থদ্বারা নিবাস রক্ষার মূল-ধন বৃদ্ধি করণ।

অন্ধনিবাস অন্ধদিগের স্বাধীন-ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের নিঃশ্রেণী স্বরূপ। ইহার আশ্রয় গ্রাহী না হইলে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া জীবিকা সংস্থাপন করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ দেশ কাল ও পাত্রানু-সারে অন্ধ নিবাস দ্বারা অন্ধদিগের যে কতদূর উপকার সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সাধুশীল পিতা যেমন স্বীয় সন্তান দিগকে যথা রীতি শিক্ষা দিয়া সংসারোপযোগী করিতে সচেষ্ট থাকেন, অন্ধনিবাসও অন্ধদিগকে তাদৃশ অবস্থান্বিত করিতে সবিশেষ প্রয়াসবান্ হইয়া থাকে। ঈদৃশ অন্ধজন হিতকর নিবাসের মূল-ভিত্তি দৃঢ়ীভূত করা সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর। নিবাস রক্ষণোপযোগী মূলধন সঞ্চয় করাই এই ভিত্তি দৃঢ়ী করণের প্রসস্ত উপায়। এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে মূল ধন সঞ্চয়ের প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলে অনেকে এইপ্রস্তাবটী দ্বিরুক্তি দোষ দুষ্ট মনে করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা অবহিত চিত্তে তৃতীয় উপায়টীর মর্ম্মগ্রাহী হইলেই আরোপিত দোষ নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ করিবেন, সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়োপায় প্রদর্শিত শিল্পশিক্ষা-প্রণালী অন্ধনিবাসে যথারীতি প্রবর্ত্তিত হইলে সময়ে সময়ে অন্ধগণকর্ত্তৃক বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। এই সমুদয় দ্রব্য সঞ্চিত করিয়া রাখিলে তাদৃশ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। অন্ধদিগের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য সমূহ প্রদর্শনের জন্য সঞ্চয় করা উচিত; অনেকে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু এবম্বিধ প্রদর্শ-নের সহিত কোন ফল সংযোগ নাই। এই শিল্পজাত দ্রব্য সমূহ একটী প্রদর্শন জন্য গৃহে সুসজ্জিত করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে একবারে প্রদ-র্শন ও অর্থলাভ দুইই হইতে পারে। এই বিক্রয় লব্ধ অর্থ নিবাস রক্ষার মূল ধনের সহিত যোগ করাই সাধুযুক্তির অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়। এতদ্দ্বারা যে মূলধন বৃদ্ধিবিষয়ে কিছু উপকার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সং-শয় নাই। অন্ধনিবাস অন্ধদিগের অদ্বিতীয় অবলম্বন স্বরূপ অতএব তাহা-দিগের পরিশ্রমজাত যৎকিঞ্চিৎ বিষয় ইহার উপকারার্থ ব্যয়িত হওয়া অপ-

রামর্শ সিদ্ধ নহে। কেহ কেহ অন্ধদিগের শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা তাহাদিগের জীবিকা রক্ষণোপযোগী সংস্থান করিবার উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু ইহা শিক্ষণীয় অবস্থাপন্ন অন্ধদিগের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়না। কিরূপে আশানুরূপ সুশিক্ষিত অন্ধদিগের জীবিকা সংস্থানের সূত্রপাত হইবে, তদ্বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে আমরা এই স্থলে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলাম। পরবর্ত্তী উপায়ে ইহা যথারীতি বিবৃত হইতেছে।

৪র্থ। শিক্ষার পরিচয় গ্রহণ ও পুরস্কার স্বরূপ আশানুরূপ সুশিক্ষিত অন্ধদিগের জন্য সংসার প্রবেশোপযোগী সংস্থানকরণ।

যিনি যে বিষয় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন না কেন, এক এক সময়ে তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলে যথেষ্ট ফল লব্ধ হয়। অপরীক্ষিত শিক্ষা জীবিকা সংস্থান বিষয়ে তাদৃশ ফলোপধায়িনী নহে। অতএব অন্ধশিক্ষালয়ে পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা অতীব আবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। আদৌ অন্ধগণ যে বিষয় শিক্ষাকরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই বিষয়ে আশানুরূপ সুশিক্ষিত ও জীবিকা নির্ব্বাহ ক্ষম হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিলেই যথেষ্ট হইবে। যাহারা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে পুরস্কার স্বরূপ সংসারোপযোগী সংস্থান করিয়া দেওয়া উচিত

সংসারে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়া কিছু অবলম্বন না পাইলে দিশাহারা হইতে হয়; বিশেষতঃ অন্ধগণ তদ্বিধ সময়ে সাহায্য না পাইলে কিরূপ দুর্দ্দশান্বিত হইবে, তাহা সহৃদয়গণ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। হয় ত অবশ্যম্ভাবী দুর্দ্দশাই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পথের ভিখারী করিয়া তুলিবে। স্বশক্তি সমুত্থিত হওয়া বহুকাল সাপেক্ষ। বিশেষতঃ অন্ধদিগের মধ্যে তথাবিধ উন্নতি প্রায়ই দুর্লভ। অতএব অন্ধনিবাসের অধ্যক্ষগণের যাহাদিগকে সুশিক্ষিত বিষয়ানুসারে আশানুরূপ জীবিকার উপায় করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ধগণ ঐ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরিশেষে স্বীয় ক্ষমতানুসারে সমুত্থিত হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে ঈদৃশ কোন নির্দ্দিষ্ট উপায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারেনা। ইহার নির্দ্দেশ ভার অন্ধনিবাসের কর্ত্তৃপক্ষগণের উপরেই সমর্পিত হইতেছে। তাঁহারই বিবেচনামত শিক্ষিত বিষয়ানুসারে অন্ধদিগের জন্য কোন রূপ সংস্থান করিয়া দিবেন। সহায়-শূন্য ও দরিদ্র-ভাবাপন্ন অন্ধদিগের নিমিত্তই যে এই উপায়টী অবলম্বিত হইবে

তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় অবস্থিত, তাহাদিগকে উক্তরূপ সংস্থান না করিয়া দিলেও চলিতে পারে।

৫ম। সুশিক্ষিত অন্ধদিগের নিবাস-শিক্ষিত বিষয়ানুসারে যথারীতি ব্যবসায় অবলম্বন।

এই পঞ্চম ও শেষ উপায়টী প্রকৃষ্ট-পদ্ধতি ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইলে, অন্ধদিগকে আর উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হয় না। অন্ধগণ শিক্ষালয়ে যে বিষয়ে সুশিক্ষিত হইবে, সংস্থানানুরূপ সেই বিষয় অবলম্বন করিয়াই আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতে পারে। অন্ধগণ যদি অন্ধনিবাসে শিক্ষিত হইয়া ব্যবসায় বিশেষের পরিচালনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা পরমুখাপেক্ষা না করিয়া আপনাদিগের পোষ্যবর্গের পর্য্যন্ত ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

অনেকে বলিয়া থাকেন, গ্রীষ্মকালে 'পাখাটানা' অন্ধদিগের জীবনোপায়ের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। একবার সম্বাদ পত্র বিশেষেও ইহার আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু 'পাখাটানা' কার্য্য ইতর শ্রেণীর অন্ধদিগের করণীয়। ভদ্র শ্রেণীর অন্ধগণ এরূপ কার্য্যে কখনও নিয়োজিত হইতে সম্মত হইবেন না। বিশেষতঃ সকল সময়ে পাখাটানার আবশ্যকতা উপস্থিত হয় না, কেবল গ্রীষ্মকালেই ইহার প্রয়োজন পড়ে। এরূপ ক্ষণস্থায়ী কার্য্যের জন্য উর্দ্ধনেত্র না হইয়া পূর্ব্ব প্রদর্শিত উপায়ানুসারে অন্ধদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করাই সৎপরামর্শ সিদ্ধ। তবে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, ইতরশ্রেণীর অন্ধগণ এই কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে।

আমরা প্রস্তাবের পল্লবিত দোষ পরিহারার্থ এই স্থলেই লেখনীর ব্যায়াম ক্রিয়ায় বিরত হইতে বাধ্য হইলাম। উপসংহার সময়ে আমরা দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে একটী অন্ধনিবাস স্থাপন করিতে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি। অন্ধদিগের ন্যায় তপস্বিগণের নিমিত্ত এক একটী আশ্রম থাকা নিতান্ত উচিত। রাজপুত্রের শুভাগমন স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত অনেকেই অনেক সৎকার্য্যের অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যদি কোন মহাত্মা এই উদ্দেশে একটী অন্ধনিবাস স্থাপন পূর্ব্বক আমাদিগের প্রদর্শিত উপায়গুলি কার্য্যে পরিণত করেন, তাহা হইলে তিনি দেশের একটী প্রধান অভাব মোচন করিয়া অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রলাপ।

(১)

গিরির উরসে নবীন নির্ঝর,
ছুটে ছুটে অই হ'তেছে সারা।
তলে তলে তলে নেচে নেচে চলে,
পাগল তটিনী পাগল পারা।

(২)

হৃদি প্রাণ খুলে ফুলে ফুলে ফুলে,
মলয় কত কি করিছে গান।
হেতা হোতা ছুটি ফুল-বাস লুটি,
হেসে হেসে হেসে আকুল প্রাণ।

(৩)

কামিনী পাপড়ি ছিড়ি ছিড়ি ছিড়ি,
উড়িয়ে উড়িয়ে ছিড়িয়ে ফেলে।
চুপি চুপি গিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়ে,
জাগায়ে তুলিছে তটিনী জলে।

(৪)

ফিরে ফিরে ফিরে ধীরে ধীরে ধীরে,
হরষে মাতিয়া, খুলিয়া বুক।
নলিনীর কোলে পড়ে ঢোলে ঢোলে,
নলিনী সলিলে লুকায় মুখ।

(৫)

হাসিয়া হাসিয়া কুসুমে আসিয়া,
ঠেলিয়া উড়ায় মধুপ দলে।
গুণ গুণ গুণ রাগিয়া আগুন,
অভিশাপ দিয়া কত কি বলে।

(৬)

তপন কিরণ—সোনার ছটায়,
লুটায় খেলায় নদীর কোলে।
ভাসি, ভাসি, ভাসি স্বর্ণ ফুল রাশি
হাসি, হাসি হাসি সলিলে দোলে।

(৭)

প্রজাপতি গুলি পাখা দুটী তুলি
উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায় দলে।
প্রসারিয়া ডানা করিতেছে মানা।
কিরণে পশিতে কুসুম দলে।

(৮)

মাতিয়াছে গানে সুললিত তানে
পাপিয়া ছড়ায় সুধার ধার।
দিকে দিকে ছুটে বন জাগি উঠে
কোকিল উতর দিতেছে তার।

(৯)

তুই কেলো বালা! বন করি আলা,
পাপিয়ার সাথে মিশায়ে তান!
হৃদয়ে হৃদয়ে লহরী তুলিয়া;
অমৃত ললিত করিস্ গান!

(১০)

স্বর্গ ছায় গানে বিমানে বিমানে
ছুটিয়া বেড়ায় মধুর তান।
মধুর নিশায় ছাইয়া পরাণ,
হৃদয় ছাপিয়া উঠেছে গান।

(১১)

নীরব প্রকৃতি নীরব ধরা।
নীরবে তটিনী বহিয়া যায়।
তরুণী ছড়ায় অমৃত ধারা,
ভূধর, কানন, জগত ছায়।

(১২)

মাতাল করিয়া হৃদয় প্রাণ,
মাতাল করিয়া পাতাল ধরা।
হৃদয়ের তল অমৃতে ডুবায়ে,
ছড়ায় তরুণী অমৃত ধারা।

(১৩)

কেলো তুই বালা ! বন করি আলা,
ঘুমাইছে বীনা কোলের পরে।
জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া স্বরগীয় মায়া,
ঢল ঢল ঢলি প্রমোদ ভরে।

(১৪)

বিভোর নয়নে বিভোর পরাণে—
চারি দিক্ পানে চাহিস্ হেসে !
হাসি উঠে দিক্ ! ডাকি উঠে পিক !
নদী ঢলে পড়ে পুলিন দেশে !!

(১৫)

চারি দিক্ চেয়ে কেলো তুই মেয়ে,
হাসি রাশি রাশি ছড়িয়ে দিস্ ?
আঁধার ছুটিয়া জোছানা ফুটিয়া
কিরণে উজলি উঠিছে দিশ্ !

(১৬)

কমলে কমলে এ ফুলে ও ফুলে,
ছুঠিয়া খেঁলিয়া বেড়াস্ বালা !
ছুটে ছুটে ছুটে খেলায় যেমন
মেঘে মেঘে মেঘে দমিনী মালা।

(১৭)

নয়নে করুণা অধরে হাসি,
উছলি উছলি পড়িছে ছাপি।
মাথায় গলায় কুসুম রাশি
বাম করতলে কপোল ছাপি।

(১৮)

এত কাল তোরে দেখিনু সেবিনু—
হৃদয়-আসনে দেবতা বলি।
নয়নে, নয়নে, পরাণে পরাণে,
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিনু তুলি।

(১৯)

তবুও তবুও পূরিল না আশ,
তবুও হৃদয় র'হেছে খালি।
তোরে প্রাণ মণ করিয়া অর্পণ
ভিখারি হইয়া যাইব চলি !

(২০)

আয় কল্পনা মিলিয়া দুজনা,
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।
সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।

(২১)

দেখিব ঊষার পূরব গগনে,
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।
তুষার-দর্পণে দেখিছে আনন
সাঁজের লোহিত জলদ-ঘটা॥

(২২)

কনক-সোপানে উঠিছে তপন
ধীরে ধীরে ধীরে উদয়াচলে।
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সোনার বরণ,
তুষারে শিশিরে নদীর জলে।

(২৩)

শিলার আসনে দেখিব বসিয়ে,
প্রদোষে যখন দেবের বালা
পাহাড়ে লুকায়ে সোনার গোলা
আঁখি মেলি মেলি করিবে খেলা।

(২৪)

ঝর ঝর ঝর নদী যায় চলে,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
চপল নির্ঝর ঠেলিয়া পাথর
ছুটিয়া—নাচিয়া—বহিয়া যায়।

(২৫)

বসিব দুজনে—গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয় ব্যথা;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগত শুনিবে সে সব কথা।

(২৬)

যেথায় যাইবি তুই কলপনা,
আমিও সেথায় যাইব চলি।
শ্মশানে, শ্মশানে—মরু বালুকায়,
মরীচিকা যথা বেড়ায় ছলি।

(২৭)

আয় কলপনা আয়লো দুজনা,
আকাশে আকাশে বেড়াই ছুটি।
বাতাসে,বাতাসে, আকাশে,আকাশে
নবীন সুনীল নীরদে উঠি।

(২৮)

বাজাইব বীণা আকাশ ভরিয়া,
প্রমোদের গান হরষে গাহি,
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
অবাক্ জগত রহিবে চাহি!

(২৯)

জলধর রাশি উঠিবে কাঁপিয়া,
নব নীলিমায় আকাশ ছেয়ে।
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
দেবতারা সব রহিবে চেয়ে।

(৩০)

সুর সুরধুনী আলোক ম[illegible],
উজলি কণক বালুকা রাশি।
আলোকে আলোকে লহরী তুলিয়া,
বহিয়া বহিয়া যাইছে হাসি।

(৩১)

প্রদোষ তারায় বসিয়া বসিয়া,
দেখিব তাহার লহরী লীলা।
সোণার বালুকা করি রাশ রাশ,
সুর বলিকারা করিবে খেলা।

(৩২)

আকাশ হইতে দেখিব পৃথিবী,
অসীম গগনে কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

(৩৩)

কোথায় ভূধর কোথায় শিখর
অসীম সাগর কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু,
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

(৩৪)

আয় কলপনা আয়লো দুজনা,
এক সাথে সাথে বেড়াব মাতি।
পৃথিবী ফিরিয়া জগত ফিরিয়া,
হরষে পুলকে দিবস রাতি।

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র * ।

(শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রণীত)

মনুষ্য যখন যে কোন কার্য্য করে, তাহাতে তাহার অবশ্যই কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। নিতান্ত উন্মাদকেও বিনা উদ্দেশ্যে কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। অ কার্য্যের উদ্দেশ্য কি, ইহা জানিতে পারিলেই কর্ত্তার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যে উদ্দেশ্য যত মহান্ এবং সাধনোপযোগী, তাহাতে ততই জ্ঞানের চিহ্ন প্রকাশ পায়। কাহারও উদ্দেশ্য ক্ষণস্থায়ী, বিষয়ভোগ মাত্রেই পর্য্যাপ্ত; কাহারও চেষ্টা তদপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী, বিষয়লাভের প্রতি উন্মুখ; এবং কাহারও লক্ষ্য, অনন্ত কালের উপজীবিকার প্রতি স্থিররূপে নিবিষ্ট থাকে। প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, এবং দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর লোক যে জ্ঞানের উন্নতসোপানে অধিরূঢ় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই নিয়মানুসারে যে কেবল ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের তারতম্য নিরূপিত হয় এমন নহে, জাতি বিশেষেরও সভ্যতার তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। অতীব অসভ্য জাতি, ক্ষুৎপিপাসাদি শান্তি করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত থাকে। অসভ্য জাতি, ক্রমে যত উন্নতি লাভ করে. ততই দীর্ঘকাল স্থায়ী ভোজ্য এবং ভোগ্য সামগ্রী সংগ্রহে যত্নবান্ হয়; এবং যখন তাহাতে সুন্দররূপে কৃতকার্য্য হয়, তখন তাহারা সভ্যপদবীতে আরোহণ করে। তখন কিসে যাবজ্জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবে, ইহারই প্রতি লোকের দৃষ্টি হয়। কিন্তু সভ্যজাতির মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল ক্ষণিক বিষয়ভোগ, ঐহিকসুখ স্বচ্ছন্দতা, ইহার কিছুতেই তৃপ্ত না হইয়া, নিত্য কালের উপযোগী যে পারমার্থিক বিষয়, তাহারই উপার্জ্জনে প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশ সভ্যতা বিষয়ে কোন দেশ অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তৎকালে আমাদের দেশের, কি রাজ্যশাসন, কি কৃষিবাণিজ্য, কি বিদ্যাশিক্ষা, সকলই অতি সুচারুরূপে প্রণালী-বদ্ধ হইয়াছিল; তখন পরি-

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ পূর্ব্বে প্রতিবিম্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর ইহা যথাক্রমে জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত হইবে। যে সকল পাঠক পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের জন্য পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশটুকু প্রতিবিম্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

চ্ছদ এবং বাসস্থান বিষয়েও কাহাকে অভাব অনুভব করিতে হইত না। এ অবস্থায় মনুষ্য যে ভোগৈশ্বর্য্য-পরায়ণতা হইতে আর এক সোপান উচ্চে উঠিবার চেষ্টা করিবে, ইহা বিচিত্র নহে, বরং মধ্যে মধ্যে দেশ-বিশেষে, কাল-বিশেষে ও পাত্র-বিশেষে ইহার যে অন্যথা দেখা যায়, তাহাই বিচিত্র। মনুষ্যের অধিকার যেরূপ উচ্চ, তাহার কর্ম্মক্ষেত্রও সেইরূপ প্রশস্ত। যখন ইহ-জীবনের উপকরণ সামগ্রী সকল অধিকারায়ত্ত হইল, তখন যদি মনুষ্য অনন্ত জীবনের উপজীবিকার প্রতি যত্ন নিয়োগ না করিবে, তবে আর করিবে কি? যদি অদ্যকার অন্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে, তবে কল্যকার অন্ন সংগ্রহ না করিয়া মনুষ্য আর করিবে কি? যখন আপনার এবং আত্মীয় স্বজনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার কোন অভাব রহিল না, তখন দেশের সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপলক্ষে কার্য্য না করিয়া মনুষ্য আর করিবে কি? যখন দৈহিক ও মানসিক অভাব সকলের যথেষ্ট প্রতীকার করা হইল, তখন আধ্যাত্মিক অভাব সকলের মোচন না করিয়া মনুষ্য আর করিবে কি? অতএব নিম্ন সোপান হইতে উচ্চ সোপানে আরোহণ না করিয়া মনুষ্য কোন প্রকারেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। স্বার্থের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা যখন হস্তায়ত্ত হইয়াছে, তখন পরমার্থের উদ্দেশে কার্য্য না করিয়া মনুষ্য কোন রূপেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

ক্লেশ-নিবৃত্তির ইচ্ছা, জীবমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যান্য জীবের সহিত মনুষ্যের প্রভেদ এই যে, মনুষ্যের জ্ঞানের উন্নতি অনুসারে উক্ত ইচ্ছার ক্ষেত্র ক্রমশই প্রসারিত হয়। অসভ্য মনুষ্য, উপস্থিত ক্ষণিক ক্লেশ নিবৃত্ত হইলেই নিশ্চিন্ত হয়; সভ্যব্যক্তি আপনার বা আত্মীয় স্বজনের ঐহিক ক্লেশ নিবৃত্তি হইলেই নিশ্চিন্ত হয়; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি, কি ঐহিক, কি পারত্রিক, কি স্বকীয়, কি পরকীয়, কি শারীরিক, কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার ক্লেশের সম্পূর্ণ নিবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। শেষোক্তরূপ উচ্চ লক্ষ্য হইতেই সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শন প্রসূত হইয়াছে। পাতঞ্জল এবং সাংখ্য উভয় দর্শনই ক্লেশের আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক নিবৃত্তিকে মুক্তির লক্ষণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ক্ষণিক সুখ এবং দুঃখ উভয়ই পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে ক্লেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাতঞ্জলের দ্বিতীয় পাদের পঞ্চদশ সূত্র এই যে,—

"পরিমাণ-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈগুণ-বৃত্তিবিরোধাচ্চ, দুঃখময় সর্ব্বং বিবেকিনঃ।"

ইহার অর্থ এই যে, পরিণাম দুঃখ, তাপ-দুঃখ, সংস্কার দুঃখ, এবং গুণবৃত্তি-বিরোধজনিত দুঃখ; এ সমস্তই বিবেকীর নিকট দুঃখ বলিয়া গণ্য হয়। ঐ সূত্রের বৃত্তিতে উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে:—বিষয় যত ভোগ করা যায়, ততই একদিকে যেমন ভোগ-লিপ্সা প্রবল হয়, অন্য দিকে সেই রূপ ভোগ্য বিষয়ের অপ্রতুল হইতে থাকে; এইরূপ অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি এবং অন্যান্য প্রকার দুঃখের মূল হওয়া প্রযুক্ত সুখ যে, দুঃখরূপে পরিণত হয়, ইহাকেই পরিণাম-দুঃখ কহা যায়। তাপ দুঃখ কি? না, সুখ-সাধক বস্তু সকলের চারিদিকে যে সমস্ত শত্রুবর্গ, তাহাদিগের প্রতি দ্বেষ নিয়ত প্রবহমাণ হওয়াতে সুখভোগের সময়েও দুঃখ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে—ইহাকে তাপ-দুঃখ কহে। সংস্কার-দুঃখ কি? না, অভিমত বা অনভিমত বিষয়ের সন্নিধান বশতঃ সুখবোধ বা দুঃখ-বোধ উৎপন্ন হইয়া মনোমধ্যে তদনুরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দেয়, আবার সেই সংস্কার বশতঃ সুখ দুঃখ উৎপন্ন হইতে থাকে, এই রূপ সংস্কার চক্রে চক্রিত হওনের যে দুঃখ, তাহাকেই সংস্কার-দুঃখ কহে। গুণবৃত্তি-বিরোধ-জনিত দুঃখ কি? না, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের পরস্পর প্রতি-দ্বন্দিতা বশতঃ যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাই গুণবৃত্তি-বিরোধ-জনিত দুঃখ। অতএব বিবেকী ব্যক্তি যখন ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ইচ্ছা করিতেছেন, তখন সুখভোগেও কথিত চারি প্রকার দুঃখের বীজ বর্ত্তমান থাকাতে, ভোগ্য বিষয় মাত্রেই তাহার নিকট দুঃখরূপে প্রতিভাত হয়। এস্থলে আরও লিখিত হইয়াছে যে,—

"অত্যন্তাভিজাতো যোগী দুঃখলেশেনাপ্যুদ্বিজতে।"

অত্যন্ত পরিশুদ্ধ যে যোগী, তিনি, দুঃখের সংস্পর্শেই ব্যথা পান।

"যথা অক্ষিপাত্রং ঊর্ণাতন্তু স্পর্শমাত্রেণ মহতীং পীড়াম্ অনুভবতি, নেতরাঙ্গম্, তথা বিবেকী স্বল্প দুঃখানুষঙ্গেনাপি বিরজ্যতে"

যেমন চক্ষুর অভ্যন্তর প্রদেশ, ঊর্ণাতন্তুর স্পর্শমাত্রেও মহৎ পীড়া অনুভব করে, অন্য অঙ্গ সেরূপ করে না, সেইরূপ বিবেকী ব্যক্তি, অল্প দুঃখের সংস্রব মাত্রেই বিরক্ত হন। আরও উক্ত হইয়াছে যে,

"পরিজ্ঞাত ক্লেশাদি বিবেকস্য সর্ব্বমেব ভোগসাধনং সবিষান্নবৎ দুঃখমেব"

অর্থাৎ বিবেকী ব্যক্তির সম্বন্ধে সমস্ত ভোগ সাধন, বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই-রূপ আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ চরম পুরুষার্থ লাভের উদ্দে-

শেই পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্ররূপ সেতু বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

পাতঞ্জলের সূত্রকার, যোগের এই রূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"।

যোগ কি? না চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ। কেহ বিতর্ক করিতে পারেন—

"নমু বৃত্তি বিষয়ক বোধস্বরূপ এব পুরুষঃ"।

মনোবৃত্তিকে বিষয়রূপে অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান স্থিতি করে, তাহাই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা।

"কাষ্ঠাগ্নিবৎ ইতি সাংখ্য যোগয়োঃ সিদ্ধান্তঃ"।

সাংখ্য এবং পাতঞ্জল উভয়েরই সিদ্ধান্ত এইযে, যেমন কাষ্ঠকে অবলম্বন করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই চেতন পদার্থ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।

"বৃত্তি বিলয়ে পুরুষোঽপি নশ্যেৎ কাষ্ঠাপায়ে অগ্নিবৎ"।

কাষ্ঠবিনষ্ট হইলে যেমন অগ্নিও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মনোবৃত্তি লয় প্রাপ্ত হইলে চেতন পদার্থও তাহার সঙ্গে লোপ পাইতে পারে।

"ততশ্চ যোগকালেংকঃ পুরুষার্থঃ"

তবে যোগে আর পুরুষার্থ কি? এই আশঙ্কা বিমোচনার্থে পাতঞ্জলের তৃতীয় সূত্রে স্থাপিত হইয়াছে, যথা;—

"তদা দ্রষ্টুঃ—স্বরূপে অবস্থানম্"।

যোগ কালে আত্মা আপন স্বরূপে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ মনোবৃত্তি লয় পাইলেও আত্মা বিলুপ্ত হন না; পরন্তু আত্মা নিরবলম্বভাবে আপন স্বরূপে অবস্থিতি করেন। যোগেরসময় ভিন্ন অন্য সময়ে আত্মা কিরূপ হন?

"বৃত্তিসারূপ্য মিতরত্র"

অন্য সময়ে আত্মা মনোবৃত্তির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হন। সে কিরূপ?

"চিত্তে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়াকারেণ পরিণতে সতি, পুরুষস্তদাকার ইব পরিভাব্যতে"।

অর্থাৎ যখন বুদ্ধিবৃত্তি ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া বিষয়-বিশেষে অবতীর্ণ হইয়া, তদীয় আকারে পরিণত হয়, অর্থাৎ জল যেমন ঘটে নিপতিত হইয়া ঘটাকারে পরিণত হয়, বুদ্ধিবৃত্তি যখন সেইরূপ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন আত্মাও তদনুরূপ আকার বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"যথা জল-তরঙ্গেষু চলৎসু চন্দ্র নক্ষত্রশ্চভবতি তদ্বদ্, ইতি।"

যেমন চঞ্চল জলতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত হওয়া প্রযুক্ত চন্দ্র চঞ্চল না হইয়াও চঞ্চল রূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ যোগের সময় ভিন্ন, অন্য সময়ে বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষণে ক্ষণে নানা বিষয়ে নানা আকারে পরিণত হওয়াতে আত্মাও সেই সেই আকার বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হন।

চিত্ত-বৃত্তি সকলকে, মনোবৃত্তি সক-

লকে বা বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে কিরূপে নিরোধ করা যাইতে পারে ? না

"অভ্যাস বৈরগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দুয়ের দ্বারা মনোবৃত্তি সকলের নিরোধ হইতে পারে। অভ্যাস কি ?

"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ"

আত্মস্থ হইবার জন্য যে যত্ন তাহাকেই অভ্যাস কহে। যথা ;—

"তস্যাঞ্চ যত্ন উৎসাহঃ পুনঃ পুনঃ তথাত্বেন চেতসি বিনিবেশনং অভ্যাস ইত্যুচ্যতে"।

সেই আত্মনিষ্ঠাতে যে যত্ন কিংবা উৎসাহ, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আত্মার স্বরূপে চিত্তের যে অভিনিবেশ, তাহাকেই অভ্যাস কহে। বৈরাগ্য কাহাকে বলে ? না ;—

"দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।"

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়বিধ বিষয়েতেই যাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, তাঁহার বশীকরণ ভাব।

"মমৈতে বশা নাহ মেতেষাং বশ ইতি যোঽয়ং বিমর্শঃ"।

বিষয় সকল আমার বশ, আমি ইহাদের বশ নহি," এই যে একটী মনের ভাব ইহাকেই বৈরাগ্য কহে। বৈরাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর।

"তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণং"

বিষয়-বিতৃষ্ণা মূলক বৈরাগ্য অপেক্ষা গুণ-বিতৃষ্ণা মূলক বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠতর। এস্থলে গুণ শব্দের অর্থের প্রতি বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক, কেননা গুণ শব্দের অর্থ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম না হইলে সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া কোন প্রকারেই সাধ্য হইতে পারে না। অতএব সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনে গুণ শব্দ যে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা নিতান্ত আবশ্যক। যাহা কালেতে পরিবর্ত্তিত না হইয়া সর্ব্বকালে এক এবং অভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, তাহাই বস্তু বলিয়া উক্ত হয়, যাহা কালের বশবর্ত্তী হইয়া, 'হইতেছে যাইতেছে রূপে' প্রকাশ পায়, তাহাই গুণ বলিয়া উক্ত হয়। প্রকৃতি কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তাহা গুণ-সর্ব্বস্ব রূপে সাংখ্য এবং পাতঞ্জলে স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিষয় সকল বর্ত্তমান কালে প্রকাশ পায়, ভূতকালে অবসান হয় এবং বাধা অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতে প্রকাশ পাইবার জন্য বিচেষ্টিত হয়। এইরূপ আত্মা ভিন্ন, আর তাবৎ বস্তুই কালে প্রকাশ পায়, কালে বিচেষ্টিত হয় এবং কালে বিলীন হয় বলিয়া সাংখ্য এবং পাতঞ্জলে আত্মা ভিন্ন আর সমস্ত বস্তুই গুণাত্মক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কথিত বস্তু সকল বর্ত্তমান কালে প্রকাশ পায়; উহা-

দের এই যে প্রকাশাত্মক গুণ, ইহাকেই সত্ত্ব গুণ কহে। উহারা ভবিষ্যতের জন্য বিচেষ্টিত হয়; উহাদের এই যে চেষ্টাত্মক গুণ, ইহাকেই রজোগুণ কহে। এবং উহারা অতীত কালে লয় প্রাপ্ত হয়; উহাদের এই যে বিলয়াত্মক গুণ, তাহাকেই তমোগুণ কহে। আত্মা ভিন্ন আর তাবৎ বিষয়ের মূলেই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণ বর্ত্তমান; বিষয়-বিশেষে সত্ত্বগুণের বা রজোগুণের বা তমোগুণের প্রাধান্য হইতে পারে, কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, বিষয়-বিশেষে উল্লিখিত গুণ-ত্রয়ের কোন একটি গুণ মূলেই নাই। আলোকে যদিও প্রকাশ গুণেরই প্রাধান্য দেখা যায়, কিন্তু সেই প্রকাশ-গুণের সঙ্গে চেষ্টা-গুণ এবং বিলয়-গুণ উভয়ই অনুস্যূত রহিয়াছে। আলোকরশ্মির প্রত্যেক তরঙ্গই বিচেষ্টিত হইতেছে, প্রকাশ পাইতেছে এবং বিলীন হইতেছে। এবং তমোগুণ-প্রধান পাষাণের মধ্যেও আকর্ষণ ক্রিয়া রূপ চেষ্টা গুণ, এবং স্পষ্টতাং বিদ্যমান রহিয়াছে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে প্রকৃতি কিসের জন্য নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, বিচেষ্টিত হইতেছে এবং বিলীন হইতেছে?

সাংখ্য এবং পাতঞ্জল বলেন যে, প্রকৃতি নিজের জন্য কোন কার্য্য করে না, প্রকৃতি কেবল পরের জন্যই কার্য্য করে; আত্মার ভোগ-সাধন এবং মুক্তি-সাধনের জন্যই প্রকৃতি নিরন্তর ব্যস্ত রহিয়াছে। প্রকৃতি, সত্ত্বগুণের আবির্ভাব দ্বারা আত্মার সুখ সাধন করে, রজোগুণের আবির্ভাব দ্বারা আত্মার দুঃখ সাধন করে, এবং তমোগুণের আবির্ভাব দ্বারা আত্মাকে মোহাচ্ছন্ন করে। প্রকাশ-গুণ সুখ-ভোগ্য এবং সুখ প্রকাশকে অপেক্ষা করে। চেষ্টা-গুণ দুঃখ জনক, এবং দুঃখ-নিবারণ, চেষ্টাকে অপেক্ষা করে। তমোগুণ মোহজনক, এবং মোহ অপ্রকাশ এবং নিশ্চেষ্ট ভাবকে অপেক্ষা করে। এই রূপ দেখা যাইতেছে সুখের সহিত সত্ত্বগুণের, দুঃখের সহিত রজোগুনের এবং মোহের সহিত তমোগুণের অকাট্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব কেবল শাস্ত্রোক্ত বচন বলিয়া নহে, পরন্তু কঠোর যুক্তির সিদ্ধান্ত বলিয়া আমাদিগকে মানিতে হইতেছে যে, প্রকৃতি সত্ত্বগুণের আবির্ভাব দ্বারা আত্মার সুখ সাধন করে, রজোগুণের আবির্ভাব দ্বারা আত্মার দুঃখ সাধন করে এবং তমোগুণের আবির্ভাব দ্বারা আত্মাকে মোহাচ্ছন্ন করে। আমাদের উপর প্রকৃতি এইরূপ কার্য্য করে বলিয়া আমরা প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার

করিতে বাধ্য হই। সুখ দুঃখ প্রভৃতির উদ্ভাবকত্ব গুণ দ্বারা প্রকৃতির অস্তিত্ব যেমন সহজে সপ্রমাণ হয় যুক্তি দ্বারা তেমন হয় না। যুক্তি দ্বারা অগ্নির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায়, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে দুঃখ বা সুখ উৎপন্ন হইলে সেই সুখ দুঃখের কারণ স্বরূপ অগ্নির অস্তিত্বের প্রতি কোন রূপেই উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, সুখ দুঃখ এবং মোহ রূপ গুণত্রয়ের আবির্ভাবই প্রকৃতির অস্তিত্বের সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ।

ক্রমশঃ।

অমৃতাঙ্কুর।

উপন্যাস।

(শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কোন ফরাসী গ্রন্থকর্ত্তার রচিত উপন্যাসে উল্লেখ আছে, যে একটী ভূত সেই উপন্যাসের নায়ককে কোন নগরের গৃহ সকলের ছাদ উঠাইয়া তাহার নিম্নে কে কি করিতেছে, তাহা দেখাইয়াছিল। ত্রিংশৎ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বিশেষ রজনীতে ঐ প্রকার কোন দৈত্য যদি পাঠককে কলিকাতাস্থ কোন বিশেষ গৃহের ছাদ উঠাইয়া দেখাইত, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, সেই ছাদের নিম্নে এক পরম সুন্দর যুবক ও পরমাসুন্দরী যুবতী বিষণ্ণ বদনে পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যেন কোন একটী ঘোরতর বিপদ ঘটিয়াছে। যুবকের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর, যুবতীর বয়স ষোড়শ বৎসর হইবে। যুবক একজন ধনাঢ্য বক্তির সন্তান ছিলেন। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তির যুবক পুত্রদিগের মুখশ্রীতে, বিদেশীয় বলবান জাতীয় লোকের দৃষ্টিতে অনেক পরিমাণে স্ত্রীজনোচিত সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়, সে প্রকার সৌন্দর্য্য ঐ যুবকের ছিল না। পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যই তাঁহার মুখে দেদীপ্যমান ছিল। উল্লিখিত অধিকাংশ যুবকের দেহ যেমন নবনীত-পুত্তলিকার ন্যায় কোমল, তিনি সেরূপ কোমল ছিলেন না, তিনি দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ ছিলেন।

ব্যায়ামপরতাই সেই দৃঢ়কায়তার কারণ। যুবকের নাম নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার যেমন নাম তাঁহাকে সেইরূপ দেখাইত। তাঁহাকে

দেখিলে যথার্থই রাজার ছেলের ন্যায় বোধ হইত; তাঁহার ললাট উচ্চ ও বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত ছিল। সংস্কৃত কবিরা স্ত্রী কিম্বা পুরুষের মুখ, চন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন কিন্তু নরেন্দ্রের মুখমণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের গুণ বিমিশ্রিত ছিল। তাহা যেমন তেজস্বী তেমনি মধুর ও প্রীতিকর।

যুবতীটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ও কৃশাঙ্গী; কিন্তু পদ্মের কোমলতা ও লাবণ্য দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মাখা ছিল। তাঁহার মুখশ্রী নিরূপম ছিল; যদি তাহার কোন উপমা থাকে তবে উড়িষ্যার প্রাচীন দেবমন্দিরের প্রাচীরের উপরে খোদিত কোন রমণী-মুখের সহিত থাকিতে পারে*। উপন্যাস লেখকেরা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বর্ণনা কালে তাহাদিগের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এপ্রকার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া কি সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা যাইতে পারে? সৌন্দর্য্য সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুগঠনের ফল। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না।

উল্লিখিত গৃহে নিস্তব্ধতা বিরাজমান। যুবতীটি প্রথমে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। তিনি বলিলেন;—

"কল্যই কি নিশ্চয় যাইবে?"

যুবক উত্তর করিলেন,—

"নিশ্চয়ই যাইব। আমার পিত্রালয়ে থাকা সুকঠিন হইয়াছে। আমার পিতা আমাকে বড় পীড়ন করিতেছেন। সে পীড়ন আর আমি সহ্য করিতে পারি না। ছোট মা যাহা তাঁহাকে বলেন, তিনি তাহাই শুনেন। তোমার পিতা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাঁহার নিজ পুত্র অপেক্ষাও তিনি আমাকে স্নেহ করেন। তিনি এই খানেই থাকিতে বলেন। কিন্তু আমি কিপ্রকারে থাকিতে পারি। সে কি পুরুষোচিত কার্য্য হয়? লোকেই বা কি বলিবে?"

রাত্রি অবসান হইল। ঊষার সময়ে নরেন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে জাগাইলেন, এবং বিদায় প্রার্থনা করিলেন। পরস্পর প্রকৃত প্রণয়-সূত্রে বদ্ধ দম্পতীর সম্বন্ধে "বিদায়" শব্দ কি ভয়ানক! এই শব্দে পরস্পরের মন নিপীড়িত হইয়া কি যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা কি বর্ণনা করা যাইতে পারে? কোন কোন পুরুষ এই সময়ে ঈষদ্ধাস্যের ভান করেন, কিন্তু এসময়ে তাঁহার অন্তর কি করে তাহা অন্তরই জানে। নরেন্দ্রের ঈষদ্ধাস্যও করিবার কোন কারণ ছিল

* শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের দ্বারা ইংরেজীতে প্রণীত উৎকলের পুরাতত্ত্ব বিবরণ পুস্তকের শেষের চিত্রগুলি দেখ।

না। তাঁহার মন এই সময়ে যন্ত্রণার পেষণী যন্ত্র দ্বারা ভয়ানকরূপে পেষিত হইতেছিল। কেনই বা ঈশ্বর প্রণয়ের সৃষ্টি করিলেন? কেনই বা বিদায়ের কারণ সৃষ্টি করিলেন? তাঁহার অভিপ্রায় কে বুঝিবে? যুবকযুবতীর হৃদয় এমনি উদ্বেল হইয়া উঠিল যে, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে আর চাহিতে অক্ষম হইলেন। নরেন্দ্র আপনাকে বল পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করিলেন।

নরেন্দ্রের পিতা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশে বৃদ্ধ লোকে একটি অল্প বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করে, তাহা হইতে অতি অমঙ্গল জনক ফলই ফলিয়া থাকে। তাহা অসম বয়স নিবন্ধন দম্পতীর পরস্পর অপ্রণয়, পরিবার মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ও স্ত্রীলোকের পাপাচরণের প্রতি কারণ হয়। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও আমাদিগের দেশের কোন কোন বৃদ্ধ লোক পুনরায় কেন বিবাহ করেন বলা যায় না। আমার একটি বন্ধু বলেন যে, এই সকল ব্যক্তি স্ত্রী-পদার্থ যত ভাল বাসেন, স্ত্রীকে তত ভাল বাসেন না। স্ত্রী-পদার্থ অন্তর্হিত হইলেই তাহার অভাব তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, আর একটি স্ত্রী-পদার্থ দ্বারা সে অভাব যে পর্য্যন্ত না পূরণ করিতে পারেন, সুস্থির হয়েন না। যিনি তাঁহার স্ত্রীকে যথার্থ ভাল বাসেন, পরলোকগত হইলে তিনি তাঁহাকে কখনই ভুলিতে পারেন না। এক জন ইংরাজী কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

> "Earthly love, when bless'd by heaven,
> Ends not with earthly life;"

"ঈশ্বরের মনোনীত পবিত্রপ্রণয়,
বিগত হ'লেও প্রাণ বিগত না হয়।"

ক্রমশঃ

পৌরাণিক ভূবৃত্তান্ত।

(শ্রীযুক্ত কালীবর বেদ ন্তবাগীশ সঙ্কলিত।)

বর্ত্তমান পৃথিবী মধুকৈটভের মেদ দ্বারা সঞ্জাত হওয়ায় ইহার নাম মেদিনী হইয়াছে। এ কথার প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝি না। বুঝিলেও ব্যক্ত করিতে সাহস হয় না। আবার ব্যক্ত না করিয়াও স্থির থাকা যায় না। যাহা হউক পূর্ব্বাচার্য্যেরা মেদিনী নামের ল অন্বেষণ যে রূপ করিয়াছেন, আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব, তাহার সদসদ্ভাব পাঠকগণের উপর নির্ভর করুক।

উৎপলিনী প্রভৃতি প্রাচীন কোষকারেরা বলেন, "মেদজন্যত্ব-শক্তি লইয়াই পৃথিবীর নাম মেদিনী।" এ

কথা কতদূর সঙ্গত ও কি অভিপ্রায়-যুক্ত তাহা ঠিক্ বলা যায় না। আবার নিতান্ত অসত্য জ্ঞান করাও যায় না। যে হেতু ভূত-পঞ্চকের মধ্যে পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন ভূতেরই কঠিন স্পর্শ নাই, স্থৌল্যও নাই। যাবৎ স্থূলতার প্রতি, যাবৎ কঠিন স্পর্শের প্রতি, এক মাত্র পৃথিবীই পুষ্কল কারণ। অতএব স্থূল ও কঠিন স্পর্শ বর্ত্তমান পৃথিবীর কারণ ও এতত্তুল্য পদার্থ হওয়াই সঙ্গত।

এখন বিবেচনা করুন, বৈদিক আচার্য্যেরা বলিলেন, "জল হইতে পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে।" আর, পৌরাণিক পণ্ডিতেরা বলিলেন, "জল হইতে পৃথিবী একথা সত্য, কিন্তু তাহা মধুকৈটভের শরীর পতন হওয়ার পরে।" এই দুই বাক্যের অন্যতর বাক্যকে যদি আমরা মিথ্যা জ্ঞান না করি, তাহা হইলে, কি রূপ ব্যাখ্যা করিলে সামঞ্জস্য হইতে পারে ইহা বিবেচনা করা যাউক।

মীমাংসকাচার্য্য গাগাভট্ট এক সময় বলিয়াছিলেন "পরোক্ষ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ,—আর অব্যক্তধ্বনির অর্থ কল্পনা—(ঢেঁকীর কচকচি প্রভৃতি) উভয়ই তুল্য। যখন যাহা ভাবা যায় তখন তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়।" গাগাভট্টের এই কথা শিরোধার্য্য করিয়া আমরা উক্ত উভয় মতের সামঞ্জস্য কল্পনা করিলাম।

"উক্ত পৌরাণিক গল্পটীর আভ্যন্তরীণ অভিপ্রায় এ রূপ হইলে হানি কি? নির্ম্মল জল, তেজঃ ও বায়ুর সংসর্গে কদাচিৎ বিকৃত হইলেও হইতে পারে—স্থূল হইলেও হইতে পারে—কিন্তু তাদৃশ প্রকারের স্থূল জল কদাচ পদার্থান্তর হইতে পারে না,—যেমন করকা। জল, বিকৃত হইয়া স্থূল ও কঠিন স্পর্শ করকার উৎপাদন করিলেও তাহা জল হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। এই রূপ মৌলিক জল সকল তেজঃ ও কঠিনস্পর্শ হইয়াছে কল্পনা করা যায়, তথাপি তাহার পদার্থান্তরতা ঘটে না; মনে হয় সেই জলই আছে। অতএব, সেই অনন্ত মৌলিক জল-রাশির পরিণামে পৃথিবী নামক পদার্থান্তরের উৎপত্তি হওয়া চাই—পদার্থান্তর-রূপে উৎপন্ন না হইলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, চিরস্থায়ী না হইলেও ব্যবহারের উপযোগী হয় না। যদিও আণবিক মাধ্যাকর্ষণ বলে বা ঈশ্বরেচ্ছা বশতঃ বিকৃত পরমাণু সকল চির-সংহত হইতে পারে, তথাপি তাহাতে সহকারী নিমিত্তের সংযোগ কল্পনা করিবার দোষ কি?—মনে কর উষ্ণতার অপগম হইলে শার্করিক অণু সকলের স্বভাবতঃ সংহত হইবার শক্তি থাকিলেও যেমন মৎস্যণ্ডি (মিছরি) প্রভৃতি উৎপাদনের নিমিত্ত তাহাতে সহকারি-নিমিত্ত-রূপ বীজ প্রক্ষেপ করার আবশ্যক দৃষ্ট হয়,

সেই রূপ, মধুকৈটভের মাংস-রাশিই এই বর্ত্তমানাকার পৃথিবী উৎপন্ন হইবার বীজ এরূপ হইলে হানি কি?—ফলতঃ, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইবার প্রণালী যাহা আর্য্য-জাতির বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রায় এই গতিকের; যথা,

"তদ্যদপাংশর আসীত্তৎ সমহন্যত সা পৃথিব্যভবৎ"—সেই অপরিসীম জল রাশি তেজ ও বায়ু দ্বারা পরিপক্ক হইলে তাহা শর অর্থাৎ সারবৎ পদার্থে পরিণত হইল। পরে সেই শর সকল সংহত (জমাট) হইল। তাহাই এই পৃথিবী।

পৃথিবীর আকার ও সংস্থান প্রভৃতি কি রূপ? এই প্রশ্নে অনেক আর্য্য, এক বাক্যে এই উত্তর করেন "পৃথিবী গোল, সর্ব্বদা শূন্যোপরি সংস্থিত, তাহার সমন্তাৎ জল,—ইত্যাদি।" এই সকল উত্তর উপনিষদ্, স্মৃতি, কোন কোন পুরাণ, রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্র, ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, প্রভৃতি জ্যোতিঃ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র থাকিতেও পারে। যথা,

"ব্রহ্মাণ্ডবিষয়েহ্মেয ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি। বিভ্রাণঃ পরমাংশক্তি মাধারাখ্যং মহেশিতুঃ।"

ব্রহ্মাণ্ডবিষয়ের মধ্যে এই ভূগোল (গোলাকার পৃথ্বী) মহেশ্বরের উৎকৃষ্ট শক্তিতে আকাশে নিহিত আছে।

"বিশ্বাধারোহি বায়ু স্তদুপরি কমঠ স্তত্র শেষ স্ততোভূঃ।" (চিরন্তনী গাথা) বায়ু সমুদ্রই বিশ্বের আধার।

"গোলং শ্রোতুং যদি তব মতিঃ"

(সিদ্ধান্ত শিরোমণি)

এই গোল অর্থাৎ ভুগোলের বিষয় শুনিতে যদি ইচ্ছা হয়, তবে ভাস্কর যাহা বলেন, তাহাই শুন।

"অপএব সসর্জাদৌ—"

(মনুঃ)

প্রভু পরমাত্মা প্রথমতঃ অনন্ত শূন্যোপরি জলের সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে তাহাতে অন্যান্যপদার্থের বীজ আহিত করিলেন। অতএব সজল পৃথিবীর আধার আকাশ।

বৃহদারণ্যকে দেখা যায়, গার্গী যাজ্ঞবল্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান পদার্থ-সঙ্কুল বিশ্ব, কিসের উপর আছে?" যাজ্ঞবল্ক উত্তর করিলেন "আকাশ ইতি—" সমস্ত বিশ্বের আধার আকাশ।

এই রূপ, পৃথিবী যে গোল ও শূন্যে নিহিত, একথা সকল আর্য্যেরা বলেন। তবে কি না সেই গোলত্বের স্বরূপ ও শূন্যোপরি নিহিত থাকার বীজ সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে।* কিন্তু

* গোলত্ব পক্ষে মতভেদ এই রূপ—কেহ বলেন, "পৃথিবী পদ্মপত্রের ন্যায়

"তিন কোণা পৃথিবী" এই প্রবাদ যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা বুঝা যায় না। "পৃথিবী ত্রিকোণ" এ কথা আর্য্যদিগের কোন মান্য গ্রন্থে লিখিত দেখা যায় না। বোধ হয়, 'তাবন্ত্রিকোণা—" এই আধুনিক শ্লিষ্ট আদি-রস-ঘটিত কবিতাটি ও তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ত্রিকোণ-যন্ত্রে আধার-শক্তি পূজা ঐ প্রবাদ জন্মাইবার মূল।

শূন্যোপরি যদি পৃথিবীর স্থিতি নির্ণয় হইল, তবে পুরাণে বর্ণিত আছে যে, "পৃথিবী কমঠ পৃষ্ঠে, শেষ-সর্পের বা বাসুকির মস্তকোপরি নিহিত আছে। এ বর্ণনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ভিন্ন হইলেও হইতে পারে; অর্থাৎ ঐ রূপ বর্ণনা কেবল রূপক বা উৎপ্রেক্ষা পুষ্টির নিমিত্তই বলিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে কমঠ ও বাসুকি প্রভৃতি এক একটি পার্থিব স্তরের নাম।

(ক্রমশঃ)

গোল।" কেহ বলেন 'কদম্ব ফুলের ন্যায় গোল।" কেহ বলেন "পৃথিবী নাভ্যাকৃতি।" কেহ বলেন "একটী অণ্ডকে সম ভাগে ছেদ করিলে তাহার গোলত্ব যেরূপ থাকে, পৃথিবীর গোলত্ব সেই রূপ" ইত্যাদি।

শূন্যে থাকার পক্ষেও এই রূপ। কেহ বলেন, "পৃথিবী আপন শক্তিতে আছে।" কেহ বলেন 'ঈশ্বরের মহিমায়" কেহ বলেন 'পৃথিবী আধারাখ্য ঐশী-শক্তি অবলম্বন করিয়া স্থিত আছেন, কিন্তু তিনি আপন অভিমুখে সমপাতবর্ত্তী পদার্থান্তর সকল নিরন্তর আকর্ষণ করিয়াছেন" ইত্যাদি।

ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত।*

ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ দেশ। তদন্তর্গত প্রদেশ সংখ্যা অনেক। ঐ প্রদেশ সমূহ বিবিধ কারণে ইতিহাস প্রথিত। কোন প্রদেশ শৌর্য্যে, কোন প্রদেশ সৌন্দর্য্যে, কোন স্থান স্বভাব শোভায়, কোন স্থান বা সৌজন্যে জগৎ মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। স্বর্ণ প্রসবিনী, রত্নাদরা ভারত ভূমি একটি সংক্ষিপ্ত জগৎ। ইহাতে যাহা চাও তাহাই পাইবে। ধন রত্ন বল, বিদ্যা বল, সভ্যতা বল, গুণ বল, বীরত্ব বল, যাহা কিছু অনুসন্ধান কর—ভারতের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা কর সকলই দেখিতে পাইবে। ভারতের প্রতি প্রকৃতি দেবীর এবম্বিধ কৃপাই

* অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ, মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ রাজা ক্ষিতীশের পুত্র ভট্ট নারায়ণের বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপনাবধি বর্ত্তমান ক্ষিতীশচন্দ্রেরসময় পর্য্যন্ত এই রাজবংশের ইতিহাস এবং নবদ্বীপ প্রদেশের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থা। শ্রীকার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। সংবৎ ১৯৩২। মূল্য ১৷৹ এক টাকা আট আনা।

ইহার সমস্ত দুরদৃষ্টের মূল। ইহার সৌভাগ্য নিচয়ই ইহার অসৌভাগ্যের কারণ। ইহার উন্নতিই ইহার অবনতির নিদান। ইতিহাস পাঠক, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিকট এ কথায় নূতনত্ব নাই।

ভারত ভূমির বিপুলাবয়ব পরিবৃত করিয়া নানাবিধ কারণে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রদেশ সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে; কিন্তু, বীরত্বে না হউক, সাহসে না হউক,—সৌজন্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, সরলতা ও নিরীহতায় বোধ করি বঙ্গদেশাপেক্ষায় অন্য কোন প্রদেশই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না; অন্ততঃ অদ্যাপি পারে নাই ইহাই আমাদের বিশ্বাস। অবাদে লর্ড মেকলের ন্যায় উষ্ণশোণিত বঙ্গবিদ্বেষী লেখক লিখিতে পারেন,—

"What the horns are to the buffalo, what the paw is to the tiger, what the sting is to the bee, what beauty, according to old Greek song, is to woman, deceit is to the Bengalee. Large promises, smooth excuses, elaborate tissues of circumstantial falsehood, chicanery, perjury, forgery, are the weapons, offensive and defensive, of the people of the Lower Ganges."

বলুন তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই, গা পচিয়া যাইবে না। যে সরল হৃদয় দুই দিন বঙ্গীয় সমাজে মিশিয়াছেন, যিনি দুই দণ্ড বঙ্গীয় ভদ্র ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছেন, যিনি অসহায় প্রতিবেশীর পীড়ার সময়, অপরের সহানুভূতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এক জনের বিপদে অপর বাঙ্গালীর সমদুঃখিতা যিনি একবার দেখিয়াছেন, আর যিনি বঙ্গান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অতুলনীয়া বঙ্গ সিমন্তিনীগণের রীতি নীতি পরিদর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন বাঙ্গালীর কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি। বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া হেষ্টিংসের দোষ স্খালন মানসে লর্ড মেকলে যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে চাহি না। যে সকল শ্বেতকান্তি দোকানদার মহোদয়রা আপনাদিগকে রাজ জাতি মনে করিয়া নিরপরাধী বাঙ্গালীকে পদে পদে ঘৃণা ও অপমানিত করিতেছে, সেই জাতীয় কাহার নিকট হইতে সহানুভূতির আশা করা নিরতিশয় দুরাশা। হেয়ার ও বেথুনের ন্যায় ইংরাজ পাই তাহা হইলে শুনাই বাঙ্গালি ভাল কি মন্দ। যাহা হউক যিনি যাহাই বলুন—আমরা বলিব, আবশ্যক হয় প্রমাণ দিব, বাঙ্গালী অতি বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, নিরীহ ও অকপটী। জগতের কতই বিপর্য্যয় হইতেছে, রাজনীতির কতই অন্যথা হইতেছে, প্রকৃতির কতই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালী সেই বিনয়ী, সেই ভদ্র, সেই শিষ্ট। বাঙ্গালী

যখন নামাবলী গায়ে, গঙ্গামৃত্তিকা লেপিত দেহ কুশাসনাসীন হইয়া জপ রত থাকিত তখনও বাঙ্গালী যে ভদ্র, আর এখনও বাঙ্গালী, চুরট মুখে, কোট গায়ে, চেয়ার সমাসীন হইয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছে তথাপি সেই ভদ্র। ভদ্রতা যদি দোষ হয় বাঙ্গালী জাতি ভদ্রতা দোষে দোষী। বাঙ্গালীর ভদ্রতাই বাঙ্গালীর গৌরব। তাহারা আর কিসের গর্ব্ব করিবে? এই ভদ্রতা হেতু ভারতে বাঙ্গালী প্রধান। এই জন্যই বাঙ্গালী ভারতের মুখপাত। যত দিন ভারত থাকিবে ততদিন বঙ্গভূমির এ গৌরব লুপ্ত হইবে না। ততদিন বঙ্গের ভদ্রতা কেহই ভুলিবে না।

বঙ্গের যে কিছু উন্নতি, বিদ্যা সম্বন্ধে যে কিছু গৌরব, তাহা বিগত বঙ্গীয় রাজধানী নবদ্বীপ হইতে সমুদ্ভূত। এক শত কয়েক বর্ষ মাত্র কলিকাতা বঙ্গের প্রধান স্থান হইয়াছে। সভ্যতা, বিদ্যা, রীতি, সমাজ শাসন সকলই এখন কলিকাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, যখন দোদুল্য টানা পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে চেয়ারে বসিয়া, শ্বেতাবয়ব অধ্যাপকগণ শ্মশ্রু কণ্ডূয়ন করিতে করিতে উপদেশ দিতেন না, যখন আশ্চর্য্য হর্ম্ম্য সমস্ত বিদ্যামন্দির রূপে নির্ম্মিত হইয়া নগরের শ্রীসম্পাদন করে নাই, যখন ফাউলরের লজিক প্রাচীন ন্যায় শাস্ত্রের ও এবরক্রম্বির ফিলজফি দর্শন শাস্ত্রের স্থানাধিকার করে নাই, তখন নবদ্বীপ বঙ্গদেশের ভূষণ ছিল। হবিষ্যাসী, ধর্ম্মরত, একাহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তখন অকাতরে অসংখ্য ছাত্রের অধ্যাপনা করাইতেন; কেবল অধ্যাপনা নয়— স্বয়ং ভিক্ষা করিয়াও তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেন!!! জগতে এরূপ ব্যাপার আর দেখা যায় না। সেই নবদ্বীপ প্রদেশই বঙ্গ রাজ্যের প্রধান স্থান, বঙ্গের উন্নতি সূত্র সেই নবদ্বীপ প্রদেশের সহিত দৃঢ় সম্বদ্ধ। তথাকার রাজবংশই বঙ্গের উন্নতির মূল, নবদ্বীপের জ্ঞান চর্চ্চার প্রধান সহায়, দেশীয় সমাজের মস্তক, গুণের পক্ষপাতী ও পুরস্কারক ছিলেন। বঙ্গদেশে শিল্প ও সাহিত্য সংসারে যদি বিন্দু মাত্র স্থান অধিকারে সমর্থ হয়, সেই রাজ বংশের অকৃত্রিম চেষ্টাই তাহার কারণ।

নবদ্বীপের ও তত্রত্য রাজন্যবর্গের বিবরণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সকল বঙ্গবাসীরই তাহা সম্যক প্রকারে বিদিত থাকা আবশ্যক। "ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত" সেই আবশ্যক পূরণ করিবে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকের

চন্দ্র রায়, বঙ্গবাসী গণের বিশেষ উপকার সাধিত করিলেন, তিনি দেশের বিশেষ অভাব মোচন করিলেন। সুতরাং তাঁহাকে আমরা অকপট হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করি।

"ক্ষিতীশবংশাবলি চরিত" ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে। ইহার কলেবর ২৩৪ পৃষ্ঠা। এই ২৩৪ পৃষ্ঠা অতি আবশ্যকীয় কথায় পরিপূর্ণ। নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ, ও তৎপ্রদেশের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থা বিবরিত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। আমরা সন্তোষ সহকারে ব্যক্ত করিতেছি, গ্রন্থকার তাহাতে সম্যক কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ গ্রন্থ খানি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। সংস্কৃত ভাষায় "ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতম্" নামে এক গ্রন্থ আছে। 'এই গ্রন্থ প্রুসিয়া রাজ্যের বরলিন্ রাজধানীর রাজ পুস্তকাগারে ছিল। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ডবলিউ পর্শ (w. Pertsh) নামক জনৈক জর্ম্মাণ জাতীয় পণ্ডিত ইহা ইঙ্গরেজী অনুবাদের সহিত মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ঐ পুস্তক ইদানীং ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রধান নগরে এবং কলিকাতার কোন সাধারণ পুস্তকালয়েও বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থে রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আহূত ভট্টনারায়ণের বঙ্গদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন হইতে মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিবরিত আছে।' ঐ সংস্কৃত গ্রন্থ সমালোচ্য গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন সন্দেহ নাই। কিন্তু তদ্ব্যতীত এ গ্রন্থে বিস্তর মূল্যবান্ নূতন কথা স্থান পাইয়াছে। সেই সকলের নিমিত্তই এ গ্রন্থ বিশেষ আদরযোগ্য। বিবিধ ইংরাজি গ্রন্থ, সাময়িক রিপোর্ট, রাজকীয় বিধি, রাজ সংসারস্থ প্রাচীন কাগজ, ফরমান্ প্রভৃতি হইতে নিরতিশয় গবেষণা দ্বারা তৎসমস্ত নিরাকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার পুরুষানুক্রমে নবদ্বীপ রাজ সংসারের উচ্চ পদ সমূহে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং অন্যের অগোচর বিস্তর ব্যাপার তাঁহার জানিবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব কার্ত্তিক বাবু এ গ্রন্থ প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়া ভালই করিয়াছেন।

"ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত" পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে ১ম ৮ অধ্যায় বিস্তর অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পরিপূর্ণ। বিশেষ ৪র্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় বড়ই মনোরম। আমরা ইহার স্থান বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গদেশের কিঞ্চিৎ প্রাচীন বিবরণ পাঠকগণকে দেখাইব ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুরের দেহের ক্ষীণতা বিধায় সে ইচ্ছা সফল করিতে পারিলাম না বলিয়া বিশেষ দুঃখিত রহিলাম।

মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের সময় সংস্কৃত স্মৃতি, ন্যায় ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হয়। যে সমস্ত সুধীবর্গের নাম চিরকাল বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলির ভুষণ স্বরূপ থাকিবে, তাঁহারা স্বর্গীয় মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের সময় প্রাচুর্ভূত হন। গ্রন্থকার সেই মহাত্মাগণের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। একটু চেষ্টা করিয়া বঙ্গীয়বিদ্বৎকুলতিলকগণের যথা-সম্ভব সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিলে ভাল হইত। কার্ত্তিক বাবু এ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া ভাল করেন নাই। ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও জগ-ন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় পণ্ডিতগণের জীবনী কথনই অসার ও নীরস নহে। সে জন্য পরিশ্রম করিলে গ্রন্থকারের শ্রম অনাবশ্যক কার্য্যে নষ্ট হইত বলি-য়া আমরা বিবেচনা করি না। বঙ্গীয় কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় রাজার এক জন সভাসদ ছিলেন। কবিরঞ্জন রাম প্রসাদসেনের অসামান্য কবিতা কলাপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যত্নেই বি-ভাসিত হয়। বিখ্যাত মুক্তারাম মুখো-পাধ্যায়, গোপাল ভাঁড় এবং হাস্যা-র্ণব এই তিন হাস্য রস পণ্ডিত ব্যক্তি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের ন্যায় প্রসিদ্ধ রসি-কের আর একটুকু অধিক বিবরণ দেও-য়া উচিত ছিল।

রাজা গিরীশ চন্দ্রের সময় কৃষ্ণ কান্ত ভাদুড়ি নামক এক অসামান্য ক্ষমতা সম্পন্ন কবি রাজ সভা অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন, রাজা ইহাঁকে "রসসা-গর" উপাধি প্রদান করেন। কেহ কোন ভাবের এক বা আধ চরণ অথবা একচরণের কিয়দংশ বলিলে, তিনি ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে, উপর্য্যুপরি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে তাহা অনা-য়াসে পূরণ করিতেন। রসসাগর অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, জ্ঞানাঙ্কুরের ক্ষুদ্র কলেবরে তাঁহার পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য। আমরা ভবিষ্যতে এজন্য স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখি-য়া পাঠকগণকে উপহার দিব।

আমাদের দেশীয় জনগণ সভ্যতা ও উন্নতি লইয়া যতই কেন ব্যস্ত হউন না, তাঁহারা যতই কেন বিজাতীয় অনুকরণ দ্বারা আপনাদিগকে সভ্যতার আব-রণে আবরিত করিতে চেষ্টা করুন না, ভারতবাসী যতই কেন শিল্প, সাহিত্য ও ইংরাজি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হই-য়াছি বলিয়া গর্ব্ব করুন না; আমরা বলিতে পারি ভারতের প্রকৃত, ও সার উন্নতির এখনও বিস্তর বিলম্ব আছে। কোন উন্নত জাতির মধ্যে এই রসসাগরের ন্যায় অসামান্য মনুষ্যের আবির্ভাব হইলে তাঁহার নাম যাহাতে অনন্ত কালের সহিত স্থায়ী হয় তজ্জন্য যথাসম্ভব আয়োজন হইত, বালক

বৃদ্ধ বনিতা তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার কল্যাণ কামনা করিত, তাঁহার রচিত পদাবলী সকলের তুণ্ডাগ্রে বিরাজ করিত। দুর্ভাগ্য বঙ্গরাজ্যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁহার নামও জানেন না। এই জন্য বলি এদেশের প্রকৃত উন্নতির এখনও অনেক বিলম্ব।

এই রাজবংশীয়েরা তাবতেই বিদ্বান্ ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে সংস্কৃত চর্চার যে কতই উন্নতি হয়, দেশের রীতি নীতির যে কতই সুব্যবস্থা সাধিত হয়, অপরিমিত উৎসাহ দানে যে কতই নূতন মহাত্মা ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকসিত হইয়া দেশের ও ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করে তাহার ইয়ত্তা নাই। সংগীতশাস্ত্রে ইহাঁদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ইহাঁদের দ্বারা সংগীতশাস্ত্র অনেক পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মহারাজ গিরীশচন্দ্র ও তৎপুত্র শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সময়ে সংগীতের বিশেষ উন্নতি হয়।

আমরা "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত" সমালোচনায় অনেক স্থান ব্যয় করিলাম। কিন্তু এ পুস্তক মধ্যে যে সকল বিবরণ আছে, তাহা পাঠকগণের গোচর করা হইল না। বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব। সুতরাং আমরা আর দুই একটী মাত্র কথা বলিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব।

গ্রন্থের ভাষাটী প্রাঞ্জল, এবং বিশুদ্ধ। স্থানবিশিষে এক এক প্রসঙ্গের মধ্যস্থলে গ্রন্থকার স্বতন্ত্র প্রসঙ্গের সমাবেশ করিয়াছেন এবং বহুক্ষণ পরে আবার পূর্ব্বকথার আবির্ভাব করিয়াছেন। এরূপ উদাসীন ভাবে ভিন্ন কথা সন্নিবেশ করা সম্পূর্ণ রীতি বিরুদ্ধ ও পাঠকের অসন্তোষ জনক। এবম্বিধ সামান্য সামান্য দোষ গ্রন্থে বিরল নহে। গ্রন্থকারের মত সকলও সকল সময়ে সমীচীন বোধ হয় না। তিনি অধিকাংশ,— অধিকাংশ কেন, সমস্ত রাজগণকে নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কদাচ এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারি না, আমরা কখনই সকলকে তাদৃশ সম্মান দানে প্রস্তুত নহি। মনুষ্য দোষ ও ভ্রমে পরিপূর্ণ। যদি শুনি অমুক মনুষ্যের জীবনমধ্যে কখন কোন দোষ বা ভ্রম লক্ষিত হয় নাই তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা সে ব্যক্তিকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিব না। নদীয়ারাজেরা মনুষ্য বলিয়া আমাদের জ্ঞান আছে, সুতরাং তাঁহাদের দোষ আছে, ভ্রান্তি আছে। ইতিহাস লেখকের লেখনীমুখে তৎসমস্ত অব্যক্ত থাকা কখনই বিহিত নহে। ইতিহাস লেখকের পক্ষে এটী মহৎ দোষ, যাহা

হউক এরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তকের দোষানুসন্ধান করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উক্তবিধ দোষ সমস্ত স্বত্ত্বেও ইহা যে একখানি বঙ্গভাষায় আদর যোগ্য পুস্তক হইয়াছে তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। এতদ্রূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক সংকলন জন্য কার্ত্তিকেয় বাবু অবশ্যই কৃতজ্ঞতা ভাজন ইহা বলা বাহুল্য।

বন ফুল।

কাব্য।

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ।"

১ম সর্গ।

চাইনা জ্ঞেয়ান, চাইনা জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতাম বনের কোলে!

"দীপ নির্ব্বাণ"

নিশার আঁধার রাশি করিয়া নিরাস
রজত সুষমাময়, প্রদীপ্ত তুষার চয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য শিখর মালা বিশাল মহান্;
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান!
শিরোপরি চন্দ্র সূর্য্য,পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন;
তুষারে আবরি শির, ছেলে খেলা পৃথিবীর
ভ্রুক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন
কত নদী কত নদ,কত নির্ঝরিণী হ্রদ
পদতলে পড়ি তার করে আস্ফালন!
মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে, দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে
অবাক্ হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন!

চৌদিকে পৃথিবী ধরা নিদ্রায় মগন,
তীব্র শীত সমীরণে, দুলায়ে পাদপগণে
বহিছে নির্ঝর-বারি করিয়া চুম্বন,
হিমাদ্রি শিখর শৈল করি আবরিত
গভীর জলদরাশি, তুষার বিভায় নাশি
স্থির ভাবে হেথা সেথা রয়েছে নিদ্রিত।
পর্ব্বতের পদতলে, ধীরে ধীরে নদী চলে
উপল রাশির বাধা করি অপগত,
নদীর তরঙ্গ কুল, সিক্ত করি বৃক্ষ মূল
নাচিছে পাষাণ-তট করিয়া প্রহত!
চারি দিকে কতশত, কল কলে অবিরত
পড়ে উপত্যকা মাঝে নির্ঝরের ধারা।
আজি নিশীথিনী কাঁদে, আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা।

কম্পনে! কুটীর কার তটিনীর তীরে
তরুপত্র ছায়ে ছায়ে, পাদপের গায়ে গায়ে
ডুবায়ে চরণ-দেশ স্রোতস্বিনী নীরে?
চৌদিকে মানব-বাস নাহিক কোথায়
নাহি জন কোলাহল, গভীর বিজন-স্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!
কুসুম-ভূষিত-বেশে, কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকা-মালা প্রসারিয়া কর,
কুসুমস্তবক রাশি, দুয়ার উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীর ভিতর!

কুটীরের একপাশে, শাখা দীপ* ধূমশ্বাসে
স্তিমিত আলোক শিখা করিছে বিস্তার।
অস্পষ্ট আলোক তায় আঁধার মিশিয়া
যায়
ম্লান ভাব ধরিয়াছে গৃহ-ঘর দ্বার!
গম্ভীরনীরব ঘর, শিহরে যে কলেবর!
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে রয়—,
বিষাদের অন্ধকারে, গভীর শোকের
ভারে॰
গভীর নীরব গৃহ অন্ধকার ময়!
কেওগো নবীনা বালা, উজলি পরণ-শালা
বসিয়া মলিন ভাবে তৃণের আসনে?
কোলে তার সঁপি শির, কে শুয়ে
হইয়া স্থির,
থেক্যে থেক্যে দীর্ঘশ্বাস টানিয়া সঘনে,
সুদীর্ঘ ধবল কেশ, ব্যাপিয়া কপোল দেশ
শ্বেতশ্মশ্রু ঢাকিয়াছে বক্ষের বসন,
অবশ জ্ঞেয়ান হারা, স্তিমিত লোচনতারা
পলক নাহিক পড়ে নিস্পন্দ নয়ন!
বালিকা মলিন মুখে, বিশীর্ণা বিষাদ দুখে
শোকে, ভয়ে অবশ সে সুকোমল হিয়া
আনত করিয়া শির, বালিকা হইয়া স্থির
পিতার বদন পানে রয়েছে চাহিয়া;
এলোথোলো বেশবাস, এলোথেলো
কেশ পাশ
অবিচল আঁখি পার্শ্ব করেছে আবৃত!
নয়ন পলক স্থির, হৃদয় পরাণ ধীর
শিরায় শিরায় রহে স্তবধ শোণিত
হৃদয়ে নাহিক জ্ঞান, পরাণে নাহিক প্রাণ

চিন্তার নাহিক রেখা হৃদয়ের পটে!
নয়নে কিছুনা দেখে, শ্রবণে স্বর না ঠেকে
শোকের উচ্ছ্বাস নাহি লাগে চিত্ততটে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি, সুধীরে নয়ন মেলি
ক্রমে ক্রমে পিতা তাঁর পাইলেন জ্ঞান,
সহসা সভয় প্রাণে, দেখি চারিদিক পানে
আবার ফেলিল শ্বাস ব্যাকুল পরাণ
কি যেন হারায়ে গেছে কি যেন আছেনা
আছে
শোকে ভয়ে ধীরে ধীরে মুদিল নয়ন
সভয়ে অস্ফুট স্বরে সরিল বচন
"কোথা মা কমলা মোর কোথা মা
জননী?"
চমকি উঠিল যেন নীরব রজনী!
চমকি উঠিল যেন নীরব অবনী!
উর্ম্মিহীন নদী যথা ঘুমায় নীরবে
সহসা করণ ক্ষেপে সহসা উঠেরে কেঁপে
সহসা জাগিয়া উঠে চল উর্ম্মি সবে!
কমলার চিত্তবাপী সহসা উঠিল কাঁপি
পরাণে পরাণ এলো হৃদয়ে হৃদয়!
স্তবধ শোণিত রাশি, আস্ফালিল হৃদে
আসি
আবার হইল চিন্তা হৃদয়ে উদয়!
শোকের আঘাত লাগি, পরাণ উঠিল
জাগি
আবার সকল কথা হইল স্মরণ!
বিষাদে ব্যাকুল হৃদে নয়ন যুগল মুদে
আছেন জনক তাঁর, হেরিল নয়ন;
স্থির নয়নের পাতে পড়িল পলক
শুনিল কাতর স্বরে ডাকিছে জনক
"কোথা মা কমলা মোর কোথা মা
জননী!"
বিষাদে ষোড়শী বালা চমকি অমনি

* হিমালয়ে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার শাখা অগ্নিসংযুক্ত হইলে দীপের ন্যায় জ্বলে. তৎকার লোকেরা উহা প্রদীপের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে।

(নেত্রে অশ্রুধারাঝরে) কহিল কাতর স্বরে,
পিতার নয়ন পরে রাখিয়া নয়ন!
"কেন পিতা! কেন পিতা! এই যে
রয়েছি হেতা"
বিষাদে নাহিক আর সরিল বচন!
বিষাদে মেলিয়া আঁখি, বালার বদনে
রাখি
এক দৃষ্টে স্থির নেত্রে রহিল চাহিয়া!
নেত্রপ্রান্তে দর দরে, শোক অশ্রুবারি
ঝরে
বিষাদে সন্তাপে শোকে আলোড়িত
হিয়া!
গভীর নিশ্বাসক্ষেপে হৃদয় উঠিছে কেঁপে
ফাটিয়া বা যায় যেন শোণিত-আধার!
ওষ্ঠ প্রান্ত থর থরে কাঁপিছে বিষাদ ভরে
নয়ন পলক পত্র কাঁপে বার বার
শোকের স্নেহের অশ্রু করিয়া মোচন
কমলার পানে চাহি কহিল তখন।
"আজি রজনীতে মাগো! পৃথিবীর কাছে
বিদায় মাগিতে হবে, এই শেষ দেখা ভবে
জানিনা তোমার শেষে অদৃষ্টে কি আছে;
পৃথিবীর ভালবাসা পৃথিবীর সুখ আশা
পৃথিবীর স্নেহপ্রেম ভক্তি সমুদায়
দিনকর, নিশাকর, গ্রহতারা চরাচর
সকলের কাছে আজি লইব বিদায়;
গিরিরাজহিমালয়, ধবল তুষারচয়
অয়িগো কাঞ্চন শৃঙ্গ মেঘ আবরণ!
অয়ি নির্ঝরিণী মালা, স্রোতস্বিনী শৈল-
বালা
অয়ি উপত্যকে! অয়ি হিম শৈল বন!
আজি তোমাদের কাছে মমুর্ষু বিদায় যাচে,
আজি তোমাদের কাছে অন্তিম বিদায়।
কুটীর পরণ শালা, সহিয়া বিষাদ জ্বালা
আশ্রয় লইয়াছিনু যাহার ছায়ায়
স্তিমিতদীপেরপ্রায়, এতদিন যেথা হায়
অন্তিম জীবন রশ্মি করেছি ক্ষেপণ;
আজিকে তোমার কাছে মুমুর্ষু বিদায় যাচে
তোমারি কোলের পরে সঁপিব জীবন!
নেত্রেঅশ্রুবারিঝরে নহেতোমাদের তরে
তোমাদের তরে চিত্ত ফেলিছেনা শ্বাস,
আজি জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিবত
বাতাসে মিশাবে আজি অন্তিমনিশ্বাস!
কাঁদিনা তাহার তরে হৃদয় শোকের ভরে
হতেছেনা উৎপীড়িত তাহারো কারণ
অহাহা! দুখিনীবালা সহিবে বিষাদ জ্বাল
আজিকার নিশিভোর হইবে যখন?
কালিপ্রাতে একাকিনী, অসহায়া,
অনাথিনী,
সংসার সমুদ্র মাঝে ঝাঁপ দিতে হবে!
সংসারযাতনাজ্বালা কিছুনা জানিস্ বালা
আজিও!—আজিও তুই চিনিস্ বিভবে
ভাবিতে হৃদয় জ্বলে, মানুষ কারে যে বলে,
জানিস্‌নে কারে বলে মানুষের মন।
কারদ্বারে কালপ্রাতে, দাঁড়াইবি শূন্যহাতে
কালিকে কাহার দ্বারে করিবি রোদন!
অভাগা পিতার তোর—জীবনের
নিশা ভোর
বিষাদ নিশার শেষে উঠিবেক রবি
আজ রাত্রি ভোর হ'লে—কারে আর
পিতা বলে
ডাকিবি, কাহার কোলে হাসিবি,
খেলিবি?
জীবধাত্রী বসুন্ধরে!—তোমার কোলের
পরে
অনাথা বালিকা মোর করিনু অর্পণ!
দিনকর! নিশাকর! আহা, এবালার পর

তোমাদের স্নেহদৃষ্টি করিও বর্ষণ!
শুন সব দিক্‌বালা! বালিকা না পায় জ্বালা
তোমরা জননীস্নেহে করিও পালন!
শৈলবালা! বিশ্বমাতা! জগতের স্রষ্টা পাতা!
শত শত নেত্রবারি সঁপি পদতলে
বালিকা অনাথা বোলো, স্থান দিও তব কোলে
আবৃত করিও এরে স্নেহের আঁচলে!
মুছ মাগো অশ্রুজল! আর কি কহিব বল!
অভাগা পিতারে ভোল জন্মের মতন!
আটকি আসিছে স্বর!—অবসন্ন কলেবর
ক্রমশঃ মুদিয়া মাগো! আসিছে নয়ন!
মুষ্টিবদ্ধ করতল,—শোনিত হইছে জল,
শরীর হইয়া আসে শীতল পাষাণ
এই—এই শেষবার—কুটীরের চারিধার
দেখে লই! দেখে লই মেলিয়া নয়ান!
শেষবার নেত্রভোরে—এই দেখে লই তোরে
চিরকাল তরে আঁখি হইবে মুদ্রিত!
সুখে থেকো চিরকাল!—সুখে থেকো চিরকাল।
শান্তির কোলেতেবালা থাকিও নিদ্রিত!
স্তবধ হৃদয়োচ্ছ্বাস! স্তবধ হইল শ্বাস!
স্তবধ লোচন তারা! স্তবধ শরীর!
বিষম শোকের জ্বালা—মূর্চ্ছিয়া পড়িল বালা
কোলেষ্ব উপরে আছে জনকের শির!
গাইল নির্ঝর বারি বিষাদের গান
শাখার প্রদীপ ধীরে হইল নির্ব্বাণ!

ললিত-সৌদামিনী

স্বর্ণলতা উপন্যাস লেখকপ্রণীত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ষোড়শী কুলীনকুমারী সৌদামিনী এক দিবস অপরাহ্নে বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। প্রফুল্ল শতদল সদৃশ মুখখানি প্রতিভাশূন্য দেখাইতেছে—চক্ষুর পক্ষ্মাগ্রভাগে গুটী দুই অশ্রুবিন্দু মুক্তাফলের ন্যায় ঝুলিতেছে—নিবিড় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তলজাল নিতম্ব ঝাঁপিয়া পড়িয়া মেঘমালার ন্যায় শোভা সম্পাদন করিতেছে—তপ্তকাঞ্চন নিভ উজ্জ্বল গৌরকান্তি বিদ্যুৎপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। সৌদামিনী অবনতমস্তকে রোদন করিতেছেন। এমন সময় অনতিদূরস্থ পদধ্বনি সৌদামিনীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সৌদামিনী চমকিয়া কক্ষদ্বারাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন তাঁহার মাতা সাবিত্রী সুন্দরী আসিতেছেন। সৌদামিনী ত্রস্ত হইয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং একটী সুচিকা গ্রহণ করিয়া শেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী গৃহে প্রবেশ করিয়া

চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক সৌদামিনীর নিকট গিয়া বসিলেন। সৌদামিনী মুখ তুলিয়া দেখিলেন না। শেলাই করিতেই লাগিলেন—যেন তিনি এতক্ষণ অনবরতই সূচীকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সুদাম! চুপ করে বসে আছিস্ কেন?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া একটু হাসিলেন, ভাবিলেন একটু হাসিলে সাবিত্রী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু ইঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সাবিত্রী তাঁহার মুখে স্পষ্ট বিষণ্ণতার চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সাদরে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন "আজ তোর কি হয়েছে? অমন কচ্ছিস্ কেন?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া পুনরায় হাসিতে গেলেন। কিন্তু আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইলেন না। হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষু দিয়া দুটি ধারা বহিল। রৌদ্রবৃষ্টি এক কালে হইল। ভাবুক যদি দেখিত, তাহার ভাবসিন্ধু উছলিয়া উঠিত।

সাবিত্রী সৌদামিনীর চিবুকে নিজ হস্ত সংলগ্ন করিয়া কহিলেন "ভেবে কি করবে বাছা, অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কি কেউ খণ্ডাতে পারে?"

মাতার সকরুণ কথা শুনিয়া সৌদামিনী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল বেগে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন!

সৌদামিনী কুলীনকন্যা। জন্মাবধিই মাতামহালয়ে বাস। তাঁহার পিতার ৪টি বিবাহ। তন্মধ্যে এক স্ত্রীর গর্ব্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যার জন্ম হইয়াছিল। অপর তিনটীর দুই টীর সন্তানাদি হয় নাই। সৌদামিনী তাঁহার মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতার নাম বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বামনদাস, যে স্ত্রীটির গর্ভে একটী পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাকে লইয়াই ঘর সংসার করিতেন। অপর তিনটির তত্ত্ব তল্লাস লইতেন না। ক্রমে সৌদামিনী বিবাহযোগ্যা হইলে তাঁহার মাতুল বামনদাসের নিকট পাত্রানুসন্ধান করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। বামনদাস সে পত্রে মনোযোগ করিলেন না। ভাবিলেন সৌদামিনীকে সৎপাত্রে সমর্পণ করা তাঁহার মাতুলের অবশ্য কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ সৌদামিনীর মাতুল পত্র লিখিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনিও নিজে পাত্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলেন বামনদাসের স্বঘরের পাত্র পাইলেন না।

এমন সময় এক দিবস সাবিত্রী হঠাৎ একটী বালককে দেখিতে পাইলেন। বালকটীর বয়স আনুমানিক দ্বাবিংশতি বৎসর, নাম ললিতমোহন।

সৌদামিনীর মাতুলের বাটীর নিকট এক বাটীতে ললিতের ভগিনীপতি দুশ্চিকিৎস্য চক্ষুরোগাক্রান্ত হইয়া কালেজের ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করিবার মানসে আসিয়া বাসা করিয়াছিলেন। ললিত হিন্দুকালেজে পড়িতেন এবং সর্ব্বদাই আসিয়া ভগ্নী ও ভগ্নিপতিকে দেখিয়া যাইতেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকেই জামাতা করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন।

সাবিত্রী ললিতের কথা নিজ ভ্রাতার নিকট বলিলেন। তাঁহার ভ্রাতার নাম দিগম্বর। দিগম্বর অনন্তর ললিতের কুলশীলের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। পরিচয়ে জানিতে পারিলেন ললিত বংশজ। দিগম্বরের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। পাত্রটী দেখিতে শুনিতে ও বিদ্যা বুদ্ধি সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু বংশজকে কি প্রকারে নৈকোষ্য কুলীনের কন্যা দান করেন?

সাবিত্রী ললিতকে প্রথমতঃ যে প্রকারে দেখেন,সৌদামিনীও সেইরূপে এক দিবস ললিতকে দেখিতে পাইলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাটীর জানালায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ললিত তাঁহার ভগ্নিপতিকে দেখিতে আইলেন, ললিতকে দেখিবামাত্রেই সৌদামিনীর মন প্রাণ ললিতের প্রতি আকৃষ্ট হইল। প্রণয় চিরকালই এরূপে আরম্ভ হয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া,—স্বভাব বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া কাহার কোন্ কালে প্রণয় হইয়া থাকে? বারুদ অগ্নিস্পর্শ মাত্রেই যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, কাষ্ঠাদির ন্যায় রহিয়া রহিয়া জ্বলে না, সেই রূপ প্রণয় দর্শন মাত্রেই হয়, অল্পে অল্পে কখনও প্রণয়ের উৎপত্তি হয় না।

রোগী বিশ্রাম লাভার্থে যতই শয্যায় এপাশ ও পাশ ফিরিতে থাকে ততই তাহার নিদ্রা দূর হয়, সেইরূপ যে ভাল বাসিয়াছে সে যতই নিজ মনের ভাব গোপন করিতে চায় ততই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই সাবিত্রী সৌদামিনীর মনের ভাব অবগত হইতে পারিলেন। কিন্তু ললিত বংশজকুলোদ্ভব, সৌদামিনীর সহিত তাঁহার পরিণয় অসম্ভব, জানিতে পারিয়া সাবিত্রী নিজ তনয়াকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া ললিতের চিন্তা দূর করিতে কহিলেন। সৌদামিনীকে আর জানালায় বসিতে দেন না। তাহাকে নিষ্কর্ম্মা দেখিলে অমনি কোন না কোন কার্য্যে নিয়োজিত করেন। কিন্তু প্লাবনের জল কার সাধ্য হঠাৎ সুখায়, সৌদামিনী একাকিনী হইলেই বসিয়া বসিয়া অনবরত ললিতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, এবং কেহ কোথায় না থাকিলে অমনি গিয়া জানালায় বসিতেন।

ললিতের ভগিনীপতিকে এক্ষণে ললিত প্রত্যহই দেখিতে আইসেন। পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে; কিন্তু ললিতের আসার ক্ষান্ত না হইয়া বৃদ্ধি হইতেছে। এক দিবস ললিত ভগিনীপতিকে দেখিয়া পুনরায় নিজ বাসে গমন করিয়াছেন। যতক্ষণ ললিত ছিলেন সৌদামিনী তাঁহাকে অনিমিষ লোচনে নিরীক্ষণ করিলেন। ললিত চলিয়া গেলে ঘরের মেঝের উপর বসিয়া ললিতের চিন্তা করিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইতেছিল। এইরূপ সময়ে সাবিত্রী অনেকক্ষণ তনয়াকে না দেখিতে পাইয়া যে ঘরে সৌদামিনী বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভোক্ত সান্ত্বনা বাক্য গুলি তনয়াকে প্রয়োগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিষ একবার মস্তিষ্কে উঠিলে আর তাহার চিকিৎসা করা বৃথা। তখন সে অসাধ্য হইয়া পড়ে। সৌদামিনীকে উপদেশ বাক্য, এক্ষণে সেই অসাধ্য রোগে ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় হইয়াছিল। সৌদামিনী মাতার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন ও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েন কিন্তু সকলি বৃথা হইয়া পড়ে। তাঁহার মন আর আত্মবশে নাই। বহতা নদীকে পথান্তর খনন করিয়া অনায়াসে সেই নূতন পথে লইয়া যাওয়া যায়; কিন্তু তাহার প্রবাহ কেহ একেবারে বন্ধ করিতে পারে না। সৌদামিনীকে বোধ হয় পাত্রান্তরে বিমুগ্ধমনা করা যাইতে পারিত কিন্তু তাঁহার মাতা সে চেষ্টা করেন নাই। তিনি একেবারে তাঁহাকে চিন্তা শূন্য করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। প্রবাহকে একেবারে শুষ্ক করিবেন মানস করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে নিস্ফল প্রয়াস হইবেন তাহার আর বিচিত্র কি?

সাবিত্রী যখন দেখিলেন যে তাঁহার সমুদায় যত্ন বিফল হইল, তখন তিনি তদীয় ভ্রাতাকে পুনরায় ললিতের কথা কহিলেন। ললিত সর্ব্বাংশে সুপাত্র; কিন্তু তাঁহার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিলে বামনদাসের কুল থাকিবে না। তাহাতে সাবিত্রীর কি ক্ষতি? সাবিত্রীর পুত্র সন্তান নাই যে তাহার কুল নষ্ট হইবে। সপত্নিপুত্রের কুল থাকিলেও সাবিত্রীর কোন লাভ নাই, গেলেও কোন দুঃখ নাই।

দিগম্বর শুনিয়া ভগিনীকে বিস্তর বুঝাইলেন। কহিলেন "কুলীনের কুল নষ্ট করা মহাপাপ, তাহাতে বহুবাসু

হওয়াও উচিত নয়।” সাবিত্রী উত্তর করিলেন “তোমরা যদি সত্বর সৌদামিনীর বিবাহ না দাও, তবে আমি ললিতের সহিত তাহার বিবাহ দিব। আমি কাহারো কথা শুনিব না।”

দিগম্বর উত্তর করিলেন “দিদি! আর দশ দিন কাল বিলম্ব কর। যদি এত দিন গিয়াছে তবে আর দশ দিনে কি হবে? আমি একখানা পত্র লিখি, দেখি কি জবাব পাই।”

সাবিত্রী কহিলেন “তবে পত্র লেখ। কিন্তু আমি এগার দিনের দিন বিবাহ দেব তার আর ভুল নাই। আমি আর কাহাকে জানাবও না, দিন ক্ষণও দেখিব না।”

দিগম্বর উত্তর করিলেন “আচ্ছা, দশ দিনই যাউক তার পর তোমার যা খুসি তাই করো। আমি আজিই পত্র লিখিব। দশ দিনের মধ্যে অবশ্যই পত্রের উত্তর পাইব।”

ললিতকে দেখিয়া সৌদামিনীর যেরূপ মন হইয়াছিল, সৌদামিনী দর্শনেও ললিতের সেইরূপ হইয়াছিল। দুই এক দিবস ভাবিলেন সৌদামিনী লালসা আমার পক্ষে বামনের প্রাংশুলভ্য ফল লালসার ন্যায়। কিন্তু যখন সাবিত্রী নিজেই সেই কথার উত্থাপন করিলেন, তখন আর ললিতের পক্ষে সে আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হইল না। যে আগুণ ললিত ইচ্ছা পূর্ব্বক অনায়াসেই নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেন, সাবিত্রী বায়ু স্বরূপ হইয়া সেই অগ্নিকে দিন দিন প্রবল করিয়া তুলিলেন। ললিত পূর্ব্বে পূর্ব্বে দুই তিন দিনে একবার আসিতেন, কিন্তু এক্ষণে প্রত্যহই আসিতে আরম্ভ করিলেন। ললিতের ভগ্নী নিষেধ করিবেন ভাবিলেন, কিন্তু লজ্জায় ভ্রাতার নিকট ও বিষয়ে কথা কহিতে পারিলেন না। ললিতের ভগিনীপতি সমস্ত দিবস একাকী থাকিতেন। চক্ষু রোগ নিবন্ধন পড়া শুনা করিয়া কালক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকটে কেহ বসিয়া কথোপকথন করিলে তিনি যার পর নাই শান্তি প্রাপ্ত হন। সুতরাং তিনি, যাহাতে ললিত পূর্ব্বাপেক্ষাও ঘন ঘন আইসে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সঙ্ক্ষেপত ললিতকে কেহ কোন উপদেশ দিল না, কেহ তাঁহাকে স্বরূপ দেখিতে সাহায্য করিল না। ললিতের পড়া শুনা বন্ধ হইয়া গেল। বাসায় থাকিলে কতক্ষণে ভগ্নিপতিকে দেখিতে আসিবেন ভাবেন। ভগ্নিপতিকে দেখিতে আসিলে আবার পুনরায় বাসায় প্রত্যাগমন করিতে হইবেক এই ভাবনায় সন্তাপিত হন। সাবিত্রী ক্রমাগত ললিতের উৎসাহই বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছেন, এক দিনের জন্যও এমন কথা বলেন নাই যে, বিবাহ

না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সৌদামিনীকে কখনং উৎসাহের কথা কহেন নাই। তাহাকে অনবরতই এ বিবাহ যে সম্ভবপর নহে তাহাই বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন।

সকলে এই ভাবে অবস্থিত আছেন এমত সময়ে দিগম্বর নিজ ভগিনীপতিকে পত্র লিখিলেন। দশ দিবসের মধ্যেই পত্রের উত্তর আইল। বামনদাস সানুনয়ে অন্তত আর এক মাস অপেক্ষা করিতে লিখিয়াছেন। বলিয়াছেন এক মাসের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া একেবারে কলিকাতায় পৌছিয়া শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। দিগম্বর ভগিনীকে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইয়া সেইরূপ অনুরোধ করিলেন। তখন সাবিত্রী মহা গোলযোগে পড়িলেন। ললিতকে বলিয়া রাখিয়াছেন দশ দিবসের পরেই বিবাহ দিবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন রূপেই পত্রের জবাব আসিবে না। কিন্তু ভাবিয়া আর কি করিবেন? লজ্জাবনত মুখী হইয়া ললিতের ভগিনীকে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইয়া কহিলেন "ললিতকে বলো কর্ম্মের সুবিধা হইবেক না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ললিত প্রত্যহ যে সময় ভগিনীপতিকে দেখিতে আসিতেন, অদ্য সে সময় অতিক্রম করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় ভগিনীপতির বাসায় সমাগত হইলেন। সৌদামিনীর পিতার নিকট পত্র অদ্য দশ দিবস গিয়াছে। অদ্য উত্তর না আসিলে সৌদামিনী তাঁহার হইবেন। ললিত এই ভাবিয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া আসিলেন, যে ভগিনীপতির বাটীতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিবেন কিম্বা তাহার পরেও দুই চারি দণ্ড অপেক্ষা করিয়া যাইবেন। একেবারে দশম দিবসের শেষ খবর লইয়া যাইবেন। ললিত রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া কম্পিত হৃদয়ে তদীয় ভগিনীপতির দ্বারে আঘাত করিলেন। ললিতের ভগিনী গিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। ললিতের ভগিনীর মুখ অদ্য কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ। কিন্তু ললিতের হৃদয় সৌদামিনীময়। তাহাতে তৎকালে অন্য কাহারো স্থান হওয়া অসম্ভব। ললিতের চক্ষে তাঁহার ভগিনীর মুখে কোন বৈলক্ষণ্য বোধ হইল না। অন্যান্য দিবসের ন্যায় ললিত গিয়া তদীয় ভগিনীপতির নিকট উপবেশন করিলেন। অন্যান্য দিবস হয় সাবিত্রী নতুবা তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন না কোন লোক তাঁহার আগমন প্রতী-

ক্ষা করিয়া থাকিত। তিনি আসিলেই তাহাদিগের মুখে দিবসের খবর পাইতেন, কিন্তু অদ্য কেহই তাঁহার নিকট আসিয়া সম্বাদ জানাইল না। ললিত অত্যন্ত চঞ্চল-চিত্ত হইলেন। তাঁহার ভগিনীপতি কথা কহেন কিন্তু তাহা ললিতের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয় না। হয় তো ললিতের ভগিনীপতি এক কথা কহিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন—ললিত কিছুই জানিতেছেন না; অথবা উত্তর দিতেছেন কিন্তু "হাঁ" স্থানে "না" বা "না" স্থানে "হাঁ" বলিতেছেন। ললিতের ভগিনীপতি ললিতের চিত্ত-চাঞ্চল্য অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলেন, তিনি তাহার কারণ সম্যক অবগত ছিলেন। কিন্তু কি প্রকারে তিনি ললিতকে কুসম্বাদ দিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; এবং যে বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল তাহা ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ললিতও চুপ করিয়া থাকিলেন। সন্ধ্যা হইল, প্রদীপ জ্বালা হইল, যে ঘরে ললিত ও তদীয় ভগিনীপতি বসিয়া ছিলেন সেই ঘরে দাসী প্রদীপ দিয়া গেল। হঠাৎ আলোক অবলোকন করিয়া ললিত ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আর কি উপলক্ষে বসিয়া থাকিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ভগিনীপতিকে কহিলেন "তবে আজ আমি যাই।"

ললিতের ভগিনীপতি উত্তর করিলেন "হাঁ আর আজ থাকিয়া কি করিবে।"

ললিত এই কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন ললিতের ভগ্নিপতির যেন হঠাৎ মনে হইল, ললিতকে কোন কথা কহিতে হইবেক; এজন্য তিনি ললিতকে কহিলেন "ভাল কথা, ললিত তোমার একটা সম্বাদ আছে শুনে যাও।"

ভগিনীপতির কথা শুনিয়া ললিতের হৃৎপিণ্ড এরূপ জোরে বক্ষঃস্থলে প্রতিঘাত হইতে লাগিল যে ললিতের বোধ হইল তাঁহার ভগিনীপতি সে আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ললিত যেখানে দাড়াইয়াছিলেন সেই খানেই বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন "কি সম্বাদ?"

ললিতের ভগ্নিপতি কহিলেন "সৌদামিনীর সহিত তোমার যে বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল তাহার প্রতিবন্ধক পড়িয়াছে। সে বিবাহ হইবেক না।"

ললিত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন "কে কহিল?"

ললিতের ভগ্নিপতি উত্তর করিলেন "সৌদামিনীর মাতা দাসী দ্বারায় সম্বাদ পাঠাইয়াছেন। দাসী কহিয়া গেল "মা লজ্জায় নিজে আসিতে

পারিলেন না ; আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন।”

ললিত ক্ষণ-কাল মৌনভাবে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন “কোথায় বিবাহ হবে ?”

ললিতের ভগ্নিপতি উত্তর করিলেন “দাসী কহিল সৌদামিনীর পিতা উপযুক্ত পাত্র লইয়া সত্বর কলিকাতায় পৌঁছিয়া নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন। তিনি ত্বরায় পৌঁছিবেন।”

ললিতের আর উঠিয়া যাইবার শক্তি রহিল না, কিন্তু তথাপি কহিলেন, “তা আমি জানি। আমি কখন প্রত্যাসা করি নাই যে আমার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইবেক। কুলীনের কন্যা আমাকে দিবে কেন ? তবে তাঁরাও বলিতেন, আমিও সায় দিতাম।”

ললিতের ভগ্নিপতি ললিতের কথায় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ললিতও কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া তথা হইতে উঠিয়া নিজবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রি ললিত কি রূপে অতিবাহিত করিলেন সহজেই অনুভূত হইতে পারে। পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া ললিত পড়া শুনায় মনো নিবেশ করিবেন স্থির করিলেন। পুস্তকাদি খুলিয়া দেখিলেন সমুদায় আবার প্রথম পত্র হইতে আরম্ভ করিতে হইবেক। এদিকে গণনা করিয়া দেখিলেন পরীক্ষার আর অধিক দেরি নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া স্থির করিলেন এ বৎসর পরীক্ষা দিবেন না। তবে কলিকাতায় থাকিবারই বা আবশ্যকতা কি ? এইরূপ চিন্তা করিয়া ললিত সেই দিবসই পুস্তকাদি লইয়া বাটী গমন করিলেন। ট্রেন যখন চলিতে আরম্ভ হইল তখন ললিত কত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন তাহা বলা দুঃসাধ্য। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত কলিকাতা অদৃশ্য না হইল তত ক্ষণ পশ্চাৎ ভাগ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা অদৃশ্য হইল। ললিত নিজ বস্ত্রে মুখাবরণ পূর্ব্বক অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয় বৃক্ষ ভগ্ন হইলে আশ্রিত লতার যে রূপ দুরবস্থা হয়, ললিত বিরিহে সৌদামিনীর চিত্ত সেইরূপ হইল। ললিতের সহিত তিনি কখন কথা কন নাই, একত্র উঠা বসা করেন নাই, তথাপি ললিত চলিয়া গেলে তাঁহার হৃদয়শূন্য, গৃহশূন্য, সমুদায় সংসার শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সাবিত্রী এক দিনের জন্যও সৌদামিনীকে ললিতের সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া

উৎসাহ দেন নাই, কিন্তু তথাচ সৌদামিনীর চিত্তে এক প্রকার বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার ললিতের সহিত পরিণয় হইবেক। এক্ষণে সেই বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। সৌদামিনী নিজ মনের ভাব গোপন করিবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু কোন রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে স্থানে বসিলে ললিতকে দেখিতে পাইতেন সেই স্থানে সর্ব্বদা থাকিতে ভাল বাসিতেন কিন্তু এক্ষণে ভ্রমেও আর সে গৃহে গমন করেন না। সৌদামিনীর মুখের হাসি যেন কোথায় গেল, ভাবিয়া ভাবিয়া বর্ণ মলিন ও শরীর শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার পিতা লিখিয়াছিলেন এক মাসের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সমভিব্যাহারে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। সে এক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। পাত্র সমভিব্যাহারে আসা দূরে থাকুক তিনি একখানি পত্রও লিখিলেন না। সাবিত্রীও যার পর নাই চিন্তিতা হইলেন। তনয়ার সুখে তাঁহার সুখ, তনয়ার দুঃখে দুঃখ; ভাবনায় সেই তনয়াকে কৃশাঙ্গী দেখিয়া সাবিত্রী সাতিশয় ভাবনা-যুক্ত হইলেন। ললিতকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন সে জন্য এক্ষণে হৃদয় আত্মগ্লানিতে সন্তাপিত হইতে লাগিল। কতবার ললিতকে পত্র লিখিতে উদ্যত হইলেন, কতবার আবার নিরস্ত হইলেন। কি লজ্জায়, যাহাকে একবার বিদায় দিয়াছেন তাহাকে পুনরায় আহ্বান করিবেন? এই রূপে যখন তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন আর সাবিত্রী থাকিতে পারিলেন না। ললিতকে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন যে এবার আর বিবাহ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার আগমন মাত্র প্রতীক্ষা। সৌদামিনীর পিতা যদি রতিপতির ন্যায় রূপবান, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান্, কুল কুলীনের অগ্রগণ্য পাত্রও লইয়া আইসেন তথাপি সাবিত্রী সৌদামিনীকে ললিতের করে সমর্পণ করিবেন।

সাবিত্রী এই ভাবিয়া ললিতকে এরূপ পত্র লিখিলেন যে যদি তাঁহার সৌদামিনীকে সুখী করিতে না পারি তবে তাঁহার জীবনে ফল কি? কৌলিন্যের অনুরোধে তিনি নিজ স্বামী বর্ত্তমানেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তাঁহার তনয়াকে কখনই যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিবেন না এই রূপ কৃতসংকল্প হইয়া তিনি সৌদামিনীকে কহিলেন "বাছা আর কেঁদ না, এই ললিতকে পত্র লিখিলাম। ললিত আসিলেই তোমার বিবাহ দিব। আর কাহারো অনুরোধ শুনিব না।

যে দিবস প্রাতঃকালে সাবিত্রী ললি-

তকে উল্লিখিতরূপ পত্র লিখিলেন, সেই দিবস সায়ংকালে বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হৃষ্টচিত্তে পাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া দিগম্বরের বাটীতে উপনীত হইলেন। পাত্রটীর নাম রামকানাই চট্টোপাধ্যায়। রামকানাই কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, কৃশ। বয়ঃক্রম আনুমানিক চত্বারিংশৎ বৎসর, মস্তকের কেশ দুটী একটী পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং সম্মুখের দুইটী দন্ত পড়িয়া গিয়াছে। এই পাত্র। ইহাই অনুসন্ধান করিতে বামনদাসের তিন মাস অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি দিগম্বরের দ্বিতীয় পত্র পাইবামাত্রেই বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। নানা স্থান অনুসন্ধান করিলেন, কোনখানেই সুপাত্র, অর্থাৎ তাঁহার সমান ঘরের পাত্র পাইলেন না। পরিশেষে রামকানাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিবাহ করা রামকানাইয়ের ব্যবসায়। তিনি ইতিপূর্ব্বে এগারটী কুলীন কামিনীর আইবড় নাম ঘুচাইয়াছেন। সৌদামিনীকে উদ্ধার করিতে পারিলে দ্বাদশটী হয়। বামনদাস রামকানাইকে পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অন্যান্য কথোপকথনের পর সৌদামিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। রামকানাই কহিলেন উপযুক্ত পণ পাইলে বিবাহ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, তবে এক কথা এই তিনি স্ত্রীর ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে যদি বামনদাস সম্মত হন তবে দিন স্থির করিয়া বলিয়া গেলেই রামকানাই নির্দ্ধারিত দিবসে কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইবেন।

বামনদাস ভাবি জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "বাপু তুমি চিরজীবী হও, তোমার ন্যায় সুবুদ্ধি লোক আজ্ কাল্ মেলা ভার। তুমি যথার্থই কুলীনের মর্য্যাদা বুঝো, তুমিই যথার্থ কুলীন। তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে আমি তৎ সমুদায়ে সম্মত আছি। কন্যার ভরণপোষণের ভার তোমার লইতে হইবেক না। আমি তাহা ইষ্টম্বরে লিখিয়া দিতে পারি। সে জন্মাবধি মাতামহালয়ে আছে, বিবাহের পরেও সেইখানে থাকিবেক। এখন পণের কথাটা সাব্যস্ত হইলেই হয়।"

রামকানাই উত্তর করিলেন "পণের কথা পাত্রীর বয়সের উপর নির্ভর করে। কন্যা যতই বয়স্থা হইবেক পণ ততই বেশী লাগিবেক। এ কথা আপনি না জানেন তাহা ত নহে? আপনিও ত কুলীন?

বামনদাস কহিলেন "যাহা বলিলে, সত্য। কিন্তু আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে পণের কথাটা ব'লো, আমার কন্যার বয়সও অধিক নহে।

যদি বড় বেশী হয় তবে চৌদ্দ বৎসর।

রামকানাই একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন "বৎসর পিছু দুটাকা দিবেন, আপনার নিকট আর অধিক প্রার্থনা করিব না।"

বামনদাস বিস্তর বলিয়া কহিয়া ১৫ টাকায় রাজি করিয়া রামকানাইকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছেন। সমস্ত পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছেন শশুর বাটী গেলে তাঁহার আদরের সীমা থাকিবেক না, কিন্তু সে আশা যে কতদূর ফলবতী হইল তাহা পরে জানা যাইবেক।

ক্রমশঃ।

৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা   পৌষ, ১২৮২।

জ্ঞানাঙ্কুর

ও

প্রতিবিম্ব।

(মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।)

বিষয়   পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিংলাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নুতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮২

মূল্য।৶০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

১। বিবিধ কারণ বশত জ্ঞানাঙ্কুর এত দিন বন্ধ ছিল, এক্ষণে উহার কার্য্যভার হস্তান্তরিত হইল। আর ইহার প্রচার বিষয়ে গ্রাহকগণ সন্দেহ করিবেন না। ইহার সমুদায় বন্দোবস্ত নূতন হইল। যদিও ইহার অন্যান্য বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তিত হইল, তথাপি ইহার নিয়মগুলি পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল, আমরা তাহার কোন পরিবর্ত্ত করিলাম না।

২। জ্ঞানাঙ্কুরের সহিত প্রতিবিম্ব মিলিত হইল। কোন বঙ্গীয় মাসিক পত্র সম্বন্ধে প্রতিবিম্বে যে কথঞ্চিৎ বিদ্বেষ ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর তাহার লেশমাত্রও থাকিবে না।

৩। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য বিষয়ে নিম্নলিখিত নিয়মই অবধারিত রহিল ;—

বার্ষিক অগ্রিম	৩৲
ষাণ্মাষিক ,, ...	১৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	।৵০

এতদ্ব্যতীত মফঃসলে গ্রাহকদিগের বার্ষিক ।৵০ ছয় আনা করিয়া ডাক মাশুল লাগিবে।

৪। যাঁহারা জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য স্বরূপে ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা কেবল অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন ; এবং প্রত্যেক টাকাতে /০ এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইবেন, কেননা বিক্রয় করণ কালে আমাদিগকে টাকাতে /০ আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

৫। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের কার্য্য সম্বন্ধে পত্র এবং সমালোচনের জন্য গ্রন্থাদি আমরা গ্রহণ করিব। রচনা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমাদের ঠিকানায় "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব সম্পাদক" শিরোনামা দিয়া লিখিতে হইবে।

৬। ব্যারিং ও ইন্সফিসেন্ট পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী } শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব কার্য্যাধ্যক্ষ।

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাংখ্য এবং পাতঞ্জলের মতে কার্য্য এবং কারণ বস্তুতঃ অভিন্ন, কার্য্য এবং কারণের মধ্যে কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, কারণে যে সকল গুণ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন থাকে, কার্য্যে সেই গুলি ব্যক্তভাবে পরিণত হয়। এই প্রকার যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া উভয়েই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কার্য্যের পরিণামে যখন সুখ দুঃখ এবং মোহ এই তিন প্রকার গুণ দৃষ্ট হইতেছে, তখন কারণেতেও উক্ত তিন প্রকার গুণ বর্ত্তমান থাকিবেই থাকিবে। কেননা, কারণেতে যাহা অব্যক্ত ভাবে স্থিতি করে, কার্য্যেতে তাহাই কেবল ব্যক্ত ভাবে পরিণত হয়। পুনশ্চ কার্য্যমাত্রতেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কার্য্য সুখ-প্রধান ও প্রকাশগুণ-প্রধান; কোন কার্য্য, দুঃখ-প্রধান ও চেষ্টা-প্রধান এবং কোন কার্য্য, মোহ-প্রধান ও জড়তা-প্রধান। এই রূপ কার্য্য-বিশেষে গুণ-বিশেষের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কার্য্য-বিশেষে সুখ দুঃখ এবং মোহ তিনই সমান পরিমাণে বলবৎ থাকিতে পারে না। যেমন কোন সামগ্রীতে মিষ্টত্ব এবং কটুত্ব উভয়ই সমান মাত্রায় বলবৎ থাকিতে পারে না,—সেই রূপ। কিন্তু, কি সত্ত্ব-প্রধান কার্য্য, কি রজঃ-প্রধান কার্য্য, কি তমঃ-প্রধান কার্য্য, সকলই যখন প্রকৃতি রূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন প্রকৃতিতে সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণই অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান আছে, ইহা উল্লিখিত ঐ মত মানিতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, প্রকৃতিতে গুণ সকলের অব্যক্ত-ভাব কি রূপে সমর্থিত হয়? তবে তাহার উত্তর এই যে, সুখ দুঃখ এবং মোহ এই তিনটি গুণ পরস্পরের বিরোধী; যথা সুখ, দুঃখ এবং মোহ এ দুয়ের বিরোধী; দুঃখ, সুখ এবং মোহ এ দুয়ের বিরোধী; মোহ, দুঃখ এবং সুখ এ দুয়ের বিরোধী। এইরূপ যখন তিনটি পরস্পর বিরোধী গুণ প্রকৃতিতে একত্রে বিদ্যমান, তখন সেখানে প্রত্যেক গুণ, অপর দুই গুণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া কোন গুণই যে ব্যক্ত হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রকার বিবেচনা অনুসারে সাংখ্য এবং পাতঞ্জলে উক্ত হইয়াছে যে, সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; প্রকৃতির

আর এক নাম অব্যক্ত। প্রকৃতি নিজেই কেবল কথিত গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, কিন্তু প্রকৃতি হইতে যখন কার্য্য উৎপন্ন হয়,তখন উক্ত গুণত্রয়ের বৈষম্য ব্যতিরেকে তাহা হইতে পারে না। অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন'গুণের একটির না একটির বিশেষ প্রাদুর্ভাব না হইলে প্রকৃতি হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রকৃতি নিজে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বটে; কিন্তু প্রকৃতি হইতে যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা, হয় সত্ত্ব-প্রধান, নয় রজঃ-প্রধান, নয় তমঃ-প্রধান, অথবা সত্ত্বরজঃ-প্রধান বা রজস্তমঃ-প্রধান কিংবা-সত্ত্ব তমঃ-প্রধান। প্রকৃতি পুরুষেরই অর্থ সাধনের জন্য,—এক কথায়—পুরুষার্থ সাধনের জন্য, কার্য্য প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিজের স্বার্থের জন্য নহে। প্রকৃতি প্রথমে পুরুষের ভোগ সাধন করে, পশ্চাৎ তাহার মোক্ষ সাধন করে। পুরুষের ভোগের জন্যই প্রকৃতি যথাক্রমে কার্য্য সকল উৎপন্ন করে, এবং পুরুষের মুক্তির জন্যই যথাক্রমে কার্য্য সকলকে কারণ-পরম্পরায় বিলীন করিয়া গুণত্রয়কে সাম্যাবস্থায় পরিণত করে। পুরুষের ভোগসাধন উদ্দেশে প্রকৃতি প্রথমে সত্ত্বগুণ-প্রধান বুদ্ধি উৎপাদন করে, বুদ্ধি হইতে রজোগুণ-প্রধান অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে তমোগুণ-প্রধান পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। পঞ্চ-তন্মাত্র এবং পঞ্চভূত এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, পঞ্চভূতের যেমন বিশেষ বিশেষ শব্দগুণ, বিশেষ বিশেষ স্পর্শ গুণ, বিশেষ বিশেষ রূপ, বিশেষ বিশেষ রসগুণ ও বিশেষ বিশেষ গন্ধগুণ দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চ-তন্মাত্রের সেরূপ বিশেষ বিশেষ শব্দাদি গুণ নাই, কেবল সামান্য শব্দাদিগুণ দ্বারা উহারা পরস্পর হইতে বিবিক্ত হইতে পারে। যথা, শব্দ-তন্মাত্রের গুণ কেবল শব্দ মাত্র—কর্কশ বা মধুর বা গভীর বা উচ্চ এরূপ কোন বিশেষ শব্দ নহে, সামান্যতঃ শব্দমাত্র গুণ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়-ঘটিত যে পদার্থ সূচিত হয়, তাহাই শব্দ-তন্মাত্র বলিয়া উক্ত হয়। স্পর্শ-তন্মাত্র প্রভৃতি অন্যান্য তন্মাত্রও ঐ রূপ সামান্য অথচ অন্যান্য সাধারণ এক একটী গুণ দ্বারা সূচিত হয়। সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া তমঃপ্রধান পঞ্চভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতির যে উত্তরোত্তর স্থূল পরিণাম, যাহার উদ্দেশ্য কেবল পুরুষের ভোগ-সাধন, তাহাকে অনুলোম পরিণাম কহে। পুরুষের ভোগসাধন যখন ক্রমে ক্রমে সমাপ্ত হইতে থাকে, তখন প্রকৃতি উল্লিখিত প্রকার অনুলোম-পরিণামের অবিকল

বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করত, তমঃ-প্রধান কার্য্যকে রজঃ-প্রধান কার্য্যে, রজঃ-প্রধান কার্য্যকে সত্ব-প্রধান কার্য্যে বিলীন করিয়া পরিশেষে সাম্যাবস্থা লাভ করে। প্রকৃতির শেষোক্ত রূপ পরিণামকে, অর্থাৎ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উত্তরোত্তর বিলীন হওয়াকে প্রতি-লোম-পরিণাম কহা যায়। সাংখ্য এবং পাতঞ্জল পঁচিশটি তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, যথা, পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, অন্তঃকরণ সমেত একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চভূত। এই পঁচিশটি তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলিয়া সংক্ষেপে উক্ত হইয়া থাকে।

গুণ-বিষয়ের ব্যাখ্যা পরিসমাপ্ত হইল। প্রকৃত প্রস্তাব বহু দূরে পড়াতে পাছে শৃঙ্খলার হানি হয় এজন্য যোগ বিষয়ে যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা একবার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিয়া অবশিষ্ট বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যোগ কি? চিত্ত বৃত্তি বা মনোবৃত্তি বা বুদ্ধি-বৃত্তি সকলের নিরোধ পূর্ব্বক চেতন স্বরূপ আত্মাতে অবস্থিতি করা। কি উপায়ে উক্ত কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে? অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দুই অবলম্বন করিলে যোগে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। অভ্যাস কি? আত্মস্থ হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করা। বৈরাগ্য কি? বিষয়েতে বি-তৃষ্ণা জন্মিলে বিষয়ের উপর যে এক প্রভুত্ব অনুভূত হয়, তাহাই বৈরাগ্য শব্দে উক্ত হয়। বিষয়-বিতৃষ্ণা-মূলক বৈরাগ্য অপেক্ষা গুণ বিতৃষ্ণা-মূলক বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠতর। গুণ বিষয়ক বৈরাগ্য কেন যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, এবং তিন গুণের বৈষম্য হইতেই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সত্ব রজঃ ও তমো গুণই মূল, বিষয় সকল তাহার শাখা প্রশাখা মাত্র। সুতরাং বিষয়-বৈরাগ্য শাখা সম্বন্ধীয়, ও গুণ বৈরাগ্য, মূল সম্বন্ধীয়। এই প্রযুক্ত বিষয়-বিতৃষ্ণা-মূলক বৈরাগ্য অপেক্ষা গুণ-বিতৃষ্ণা-মূলক বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গুণ-বৈরাগ্যে যাঁহারা পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা সুখ দুঃখ মোহের অধিকারায়ত্ত হন না, সুতরাং অনায়াসে চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক যোগে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এই রূপ অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়োন্মুখ বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরোধ-পূর্ব্বক আত্মাতে স্থিতি করাকেই যোগ কহে। এইরূপ করিতে পারিলে আত্মার স্বাধীন ভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয়। আত্মাই স্ব পদের বাচ্য, বিষয় পর-শব্দের বাচ্য; সুতরাং আত্মার স্বাধীনতা, এবং বিষয়ের অধীনতাই পরাধীনতা।

প্রবৃত্তির অধীনতা, যাহাকে স্বেচ্ছাচারিতা কহে, তাহা স্বাধীনতা নহে; কেননা বিষয় হইতেই প্রবৃত্তির উদ্ভব এবং বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই প্রবৃত্তি জীবন ধারণ করে, অতএব প্রবৃত্তির অধীনতা ও বিষয়ের অধীনতা একই; উভয়ই পরাধীনতা। সুতরাং প্রবৃত্তি নিরোধ ভিন্ন,—যোগ ভিন্ন,—স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই।

পাতঞ্জল যোগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা, সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্জীব সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, যোগের সোপান স্বরূপ, অসংপ্রজ্ঞাত-সমাধি, যোগের চরম পর্য্যাপ্তি স্বরূপ। চিত্তবৃত্তি সকল নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকিলে তাহাদিগকে আয়ত্ত করা অসাধ্য হইয়া উঠে, এ জন্য তাহাদিগকে নিরোধ করিবার অগ্রে, কোন একটা বিষয়ে আবদ্ধ করা আবশ্যক। কেননা চিত্ত-বৃত্তির যখন একটি মাত্র অবলম্বন ভিন্ন আর দ্বিতীয় অবলম্বন না থাকে, তখন সেই অবলম্বনটি পরিত্যক্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া যায়। এই রূপ একটি কোন বিষয়েতে বুদ্ধি-বৃত্তিকে পর্য্যবসিত করাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির লক্ষণ কি? "সম্যক সংশয় বিপর্য্যয় রহিতত্বেন, প্রজ্ঞায়তে প্রকর্ষেণ জ্ঞায়তে, তাবদস্য স্বরূপ যেন, স সম্প্রজ্ঞাত সমাধিঃ ভাবনাবিশেষঃ।" যদ্বারা ভাব্য বিষয়ের স্বরূপ, সংশয় রহিত রূপে এবং প্রকৃষ্টরূপে জানা যায়, এমন যে ভাবনা-বিশেষ, তাহাকেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কহে। ভাবনা কাহাকে বলে? "ভাব্যস্য বিষয়ান্তর পরিহারেণ চেতসি পুনঃ পুন বিনিবেশনং" অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষয় পরিহার পূর্ব্বক কেবল ভাব্য বিষয়কে পুনঃ পুনঃ চিত্তে বিনিবেশন করাকেই ভাবনা কহে। ভাব্য বিষয় কি কি? পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এবং ঈশ্বর। সমাধি চারি প্রকার, কি কি? সবিতর্ক-নির্ব্বিতর্ক, সবিচার-নিবিচার, সানন্দ এবং সাস্মিত। সবিতর্ক এবং নির্ব্বিতর্ক সমাধি, স্থূল-ভূত-বিষয়ক; সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাধি সূক্ষ্ম-ভূত-বিষয়ক অর্থাৎ তন্মাত্র এবং অন্তঃকরণ বিষয়ক; সানন্দ সমাধি অন্তঃকরণের সত্ব গুণ-বিষয়ক; এবং সাস্মিত সমাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ-বিষয়ক। সবিতর্ক সমাধি কি? স্থূলভূত এবং বহিরিন্দ্রিয়গণকে বিষয়রূপে গ্রহণ করত "ইহা এই শব্দে উক্ত হয়" এবং "ইহার অর্থ এই" এই রূপ শব্দ প্রভেদ পূর্ব্বক যখন ভাবনা চলিতে থাকে, তখন তাহাকেই সবিতর্ক সমাধি কহে। কিন্তু যখন শব্দার্থের কোন উল্লেখ না করিয়া উক্ত স্থূলভূত এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে

কে কাহার অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে, ও কে কাহার পরে উৎপন্ন হইয়াছে, এই অনুসন্ধান পূর্ব্বক ভাবনা চলিতে থাকে, তখন তাহাকে নির্ব্বিতর্ক সমাধি কহে। সবিচার সমাধি কি রূপ? তন্মাত্র এবং অন্তঃকরণ বিষয়ে যখন দেশ কাল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভাবনা চলিতে থাকে, তখন তাহাকে সবিচার সমাধি কহে এবং যখন দেশ কাল ধর্ম্ম নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে উক্ত তন্মাত্র এবং অন্তঃকরণকে বস্তু রূপে ভাবনা করা যায়, তখন তাহাকে নির্ব্বিচার সমাধি কহে। যখন অন্তঃকরণ-স্থিত অত্যল্প রজস্তমোবিশিষ্ট সত্ত্বগুণ ভাবনা করা যায়, তখন সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ আনন্দের স্ফূর্ত্তি হয়, এই রূপ সমাধিকে সানন্দ সমাধি কহে। যাঁহারা এই পর্য্যন্ত সমাধি করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, বুদ্ধিরও উচ্চতর প্রদেশে প্রকৃতি এবং পুরুষ রূপ যে দুইটি তত্ত্ব আছে, তাহা যাঁহারা দেখিতে না পান তাঁহারা দেহাভিমানশূন্য হন, এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের ফল লাভ হয়, ইহার অধিক নহে। এ জন্য তাঁহারা বিদেহ শব্দে উক্ত হন। পরে যখন রজস্তমোবিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র অবলম্বন করিয়া ভাবনা চলিতে থাকে, তখন জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সত্ত্বমাত্রের স্ফূর্ত্তি হয়, এইরূপ সমাধিকে সাস্মিত সমাধি কহে। যাঁহারা শেষোক্ত প্রকার সমাধি সাধন করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন, আত্মার প্রতি যাঁহারা দৃষ্টি না করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ করিয়া উক্ত হইয়াছে যে, "তেষাং পরতত্ত্বাদর্শনাৎ যোগাভাসোঽয়ং" আত্মার অদর্শন হেতু বিদেহ এবং প্রকৃতিলীন ব্যক্তির যে যোগ, তাহা যোগ নহে, তাহা যোগাভাস, অর্থাৎ তাহা সম্যকরূপে যোগ নহে তাহা যোগের আভাস মাত্র। অন্তঃকরণসত্ত্বে সমাধি করিয়া, সাধক, দেহাভিমান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে সমাধি করিয়া সাধক, প্রকৃতির সহিত যোগযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতেও সাধকের সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ হয় না। আত্মাতে সমাধি করিতে পারিলেই সাধক প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এইরূপ প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করাই সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জলের মতে পুরুষের চরম পুরুষার্থ।

ক্রমশঃ

ললিত-সৌদামিনী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ললিতের ভগিনীর নাম গিরিবালা। তাঁহার ভগিনীপতির নাম কেশবচন্দ্র। কেশবের চক্ষে ছানি পড়িয়াছিল; সেই ছানি কাটাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ছানি কাটিবার উপযুক্ত না হওয়ায় তাঁহাকে অনেক দিবস কলিকাতায় থাকিতে হইল। পরে ছানি কাটিবার যোগ্য হইলে ডাক্তার সাহেব এক চক্ষের ছানি কাটিয়া দিলেন। কহিলেন একটা আরোগ্য হইলে অন্যটা কাটিবেন। ললিত যখন বাটী যান তখন একটী চক্ষু বিলক্ষণ আরোগ্য হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব তথাপি পড়া শুনা বা যে কোন কার্য্যে অধিকক্ষণ চক্ষুর স্থির-দৃষ্টি প্রয়োজন হয় তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ললিত কলিকাতায় থাকিতে তিনি প্রত্যহই কেশবকে দেখিতে আসিতেন এবং প্রায় সমস্ত দিবস তাঁহার নিকট থাকিয়া কথোপকথন বা তাস ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু ললিত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলে কেশবের পক্ষে একাকী থাকা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী পাক শাক ও অন্যান্য গৃহ কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। কেশবের নিকট বসিয়া কথোপকথন করেন এরূপ অবকাশ পাইতেন না। ললিতের গমনের পর প্রথমদিবস কেশব কোন রূপে কাটাইয়া দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস আর নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারিলেন না। একখানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিয়াছিলেন দুই এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ পুস্তক খানি এতই ভাল লাগিয়াছিল যে তাহা শেষ না করিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে ৮টা ৯টার সময় আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর রাত্রি ১০ টার সময় শেষ হইল। গিরিবালা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র তাঁহার কথা শুনিলেন না; কহিলেন "কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না তবে কেন না পড়িব? আর কত কালই বা চক্ষু থাকিতে অন্ধের ন্যায় বসিয়া থাকিব?" সংক্ষেপতঃ কেশব স্ত্রীর নিষেধ শুনিলেন না। পুস্তক খানি এক দিবসেই শেষ করিলেন।

পুস্তক সমাপ্ত করিয়া কেশব হৃষ্টচিত্তে শয়ন করিলেন। কোনই অসুখ নাই। কিন্তু শেষ রাত্রে চক্ষের বেদনায় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। জাগিয়া দেখিলেন আর চক্ষু মেলিতে পারেন না। কোন রূপে সে রাত্রি অতিবাহিত

করিলেন। পর দিবস পুনরায় ডাক্তারকে চক্ষু দেখাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া কহিলেন "চক্ষুটী আর পূর্ব্ববৎ হইবেক না। কিন্তু অপর চক্ষুটী অস্ত্র করিলে আরোগ্য হইতে পারে।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া কেশব রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিবালাও তদ্দর্শনে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর ডাক্তার সাহেব দুই চারিটী সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কেশব রোদন করিতে করিতে বলিলেন "এত দিনের পর অন্ধ হইলাম। আর কিছুই দেখিতে পাইব না। কেনই বা তোমার কথা অবহেলা করিলাম?"

গিরিবালা গাঢ়স্বরে উত্তর করিলেন "সে কথা ভাবিয়া রোদন করিলে আর কি হইবে? অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ঘটিয়াছে।"

কেশব উত্তর করিলেন "না গিরিবালা। তোমার কথা না শুনিয়া আমি যখন যে কার্য্য করিয়াছি তাহাতেই কোন না কোন অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তুমি মিথ্যা অদৃষ্টকে দোষিতেছ। এ আমার নিজের দোষ।"

গিরিবালা কেশবের শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অঞ্চল দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছিয়া দিয়া কহিলেন "অদৃষ্টে লেখা আছে বলেই তুমি আমার কথা শুনো নাই। অদৃষ্টের লিপি কি কাহারো বারণে বন্ধ হয়?"

গিরিবালার কথা শুনিয়া কেশব ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন "গিরিবালা আমি আর কিছুই দেখিতে পাইব না।"

গিরিবালা রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "যদি এক জনের চোক আর একজনকে দেওয়া যাইত তাহা হইলে মাথার উপর ঈশ্বরই জানেন আমার চোক এখনিই তোমাকে দিতাম। কিন্তু তা যেখানে হবার যো নাই সেখানে যাতে একজনের চোক দুজনের হয় তাই করিব। তুমি যেমন আমারে সব বিষয় বুঝাইয়া দাও আমি তেমনি তোমাকে যা যখন দেখিতে পাই বলিয়া দিব।"

কেশব কহিলেন "আমার আর এক ভয় হচ্ছে, গিরিবালা, আমি অন্ধ হইলাম, তুমি আর এখন আমাকে ভাল বাসবে না। কানা বোলে ঘৃণা করিবে।"

গিরিবালা দুই হস্তে কেশবের পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন "এমন কথা মুখেও এনো না। পূর্ব্বে আমি কখন কখন রাগ করিতাম, কখন কখন অভিমান করিতাম কিন্তু এখন আর আমার তাহা কখনই ইচ্ছা হইবে না। আমি দেবতার স্থানে এই ভিক্ষা চাই যেন জন্ম জন্ম তোমার মতন স্বামী পাই।"

কেশব কহিলেন " সে তুমি ভাল বাসিয়া যা বল। আমার মনের কথা এই, গিরিবালা যে তোমার ন্যায় পত্নী বুঝি আর পৃথিবীতে নাই। "

গিরিবালা আর কথা কহিতে পারিলেন না। স্বামীর নিকট বসিয়া উচ্ছাসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বামনদাস কর্ত্তৃক আনীত পাত্র দর্শন করিয়া সাবিত্রী যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন বামন দাস ললিতের মতন আর একটী পাত্র আনিবেন। রামকানাইয়ের ন্যায় পাত্র আসিবে তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। ললিতের সহিত দেখা হইবার অগ্রে যদি সাবিত্রী রামকানাইকে দেখিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাহার প্রতি এত গাঢ় ঘৃণা জন্মিত না। ঘরে বয়স্থা কন্যা, পাত্রও বৃদ্ধ নহে ; তাহাদিগের বিবাহ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু একবার ললিতকে দেখিয়া রামকানাইয়ের ন্যায় পাত্রে কন্যা সমর্পণ করা সাবিত্রীর নিকট কন্যা জলে নিক্ষেপ করার ন্যায় বোধ হইল। ভাল পাইবার সম্ভব থাকিলে মন্দ কে চায়? সাবিত্রী একমাত্র কন্যাকে কেন রামকানাইয়ের করে সমর্পণ করিবেন ?

বামন দাস স্বভাবতঃ যে রামকানাইকে কন্যা দান করিতে উৎসুক হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু রামকানাই এতাবৎ টাকার জন্যই বিবাহে সম্মত ছিলেন। তিনি কন্যাকে দেখেন নাই। কন্যা সুরূপা তাহা অনুসন্ধান করিবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। টাকা মেকি না হইলেই হইল। টাকার জন্যই তাঁহার বিবাহ, কন্যার জন্য নহে। কিন্তু কলিতাতায় আসিয়া সৌদামিনীকে দর্শন করিয়া রাম কানাইয়ের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল ; তাঁহার আর অর্থ স্পৃহা রহিল না। তখন যদি সৌদামিনী লাভার্থ তাঁহার কিঞ্চিৎ ব্যয় হয় তাহাও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু বিবাহের ভয়ানক প্রতিবন্ধক সমুত্থিত হইল। সাবিত্রী কহিলেন তিনি ওরূপ পাত্রে সৌদামিনীকে দান করিতে দিবেন না। বামন দাস বুঝাইলেন, তোষামোদ করিলেন, রাগ করিলেন, সাবিত্রী তাঁহার কথায় কর্ণ-পাতও করিলেন না।

ভাব ভঙ্গি দেখিয়া রামকানাই বামনদাসকে কহিলেন, " মহাশয়! মনের কথা ভেঙ্গে বলাই ভাল ; আমি বাড়ী হইতে সকলকে বিবাহ করিব বলিয়া আসিয়াছি। এমন স্থলে বিবাহ না করিয়া ফিরিয়া গেলে লোকে ঠাট্টা করিবে। বিশেষ, মুখে যা বলি কিন্তু আমার সংসারে স্ত্রীলোক নাই,

বিবাহ করা আমার আবশ্যক হইতেছে, এমন অবস্থায় আমি পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম তাহার অতিরিক্ত আরও স্বীকার করিতেছি যে, বিবাহ হইলে আমি কন্যা নিজ বাটী লইয়া যাইব।” রামকানাই ভাবিলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহার কন্যা লইয়া ঘর করিবার কথা ছিল না। এক্ষণে তাহা স্বীকার করিলেন সুতরাং সাবিত্রীর আর অধিক আপত্তি থাকিবেক না ও বামনদাসও বিবাহ পক্ষে অধিকতর প্রয়াস পাইবেন।

বামনদাস কহিলেন, “যদি তোমাকে কন্যা দেয় তবে তো বাটী নিয়ে যাবে! যে গতিক দেখিতেছি তাহাতে অপ্রতিভ হইয়া যাইতে হইবে সেই সম্ভবই অধিক।”

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া রামকানাই পুনরায় কহিলেন, “আমার সংসারে একটী স্ত্রীলোক নহিলে চলে না। কি করি যদি পনের টাকা হইতে কিছু বাদ দিলে সম্মত হন আমার তাহাও কর্ত্তব্য।” রামকানাই যেরূপ টাকার মর্ম্ম বুঝিতেন অমন অতি অল্প লোকেই বুঝে। টাকা তাঁহার শরীরের শোণিত সদৃশ; সুতরাং কম টাকা লইলে যে সাবিত্রী তাঁহাকে কন্যা দান করিতে পারেন এরূপ ভাবনা তাঁহার পক্ষে বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে।

বামনদাস স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, রামকানাই কি জন্য কম টাকা লইয়াও বিবাহ করিতে সম্মত। সুতরাং তিনি রামকানাইকে যে নিরাশ হইয়া যাইতে হইবেক ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, “ইহারা বড় মানুষ; ৫।৭ টাকার প্রলোভনে ইহারা যে ভুলিবে তাহা বোধ হয় না।” বামনদাসের মনোগত ইচ্ছা যে বিনা পণে রামকানাই সম্মত হইলেই ভাল হয়। বস্তুত তাহাই ঘটিল। আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রামকানাই কহিলেন, “আমার নিতান্ত প্রয়োজন, বিশেষ বিবাহ করিতে আসিয়াছি, না করিয়া গমন করিলে লোকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে, অতএব আমি বিনা পণেই এ কর্ম্ম করিতে সম্মত আছি।”

বামনদাসের ইচ্ছানুরূপ কথা হইল। ভাবিলেন সাবিত্রীর যদি পায় ধরিতে হয়, তিনি তাহাও ধরিবেন। যদি বিবাহের জন্য অনাহারে ধন্না দিতে হয়, তাহাও দিবেন। তিনি দেখিলেন এরূপ সুবিধা আর হইবে না। এমন ঘর, এত কম ব্যয়ে আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার কুলও এ কর্ম্ম না হইলে আর টিকিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় সাবিত্রীকে বুঝাইবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

সাবিত্রী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন— রামকানাইয়ের সহিত সৌদামিনীর

বিবাহ দিবেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা কেহ কখন ভঙ্গ করাইতে পারে নাই। বামনদাসও পারিলেন না। বামনদাস বুঝাইলেন, রামকানাইয়ের সহিত বিবাহ দিলে টাকা লাগিবে না, কুলবজায় থাকিবে, পাত্র নিতান্ত মন্দ নহে। সাবিত্রী সক্রোধে উত্তর করিলেন "১৫টাকা, ভারি টাকা, ভারি সাশ্রয় দেখাইতেছ, ও টাকা আমিই তোমাকে দিচ্ছি, তুমি এখন যেখানে ছিলে সেই খানে যাও।"

বামনদাস কাতরস্বরে কহিলেন, "টাকা যেন দিলে, কুলবজায়ের কি করলে ?"

সাবিত্রী পূর্ব্ববৎ সরোষে কহিলেন, "আমার কুলের দরকার কি ? কুল না থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল। বাবা কুলক্রিয়া করিয়াছিলেন বলে আমার যাবজ্জীবনটা দুঃখে গেল। আবার আমি কুলক্রিয়া করে সুদামকে চিরকালের জন্যে দুঃখভাগী করে যাব, তাহা আমি পারিব না।"

বামনদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ হলো ? তোমার কিসের অভাব ?"

সাবিত্রীর আর বরদস্ত হইল না। তিনি উচ্চৈস্বরে কহিলেন, "কিসের দুঃখ ? কিসের অভাব ? অভাব আর দুঃখ এই যে তুমি মর না।" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

বামনদাস তাঁহার অঞ্চলাকর্ষণ করিয়া কহিলেন "আর একটা কথা শুনে যাও।"

সাবিত্রী উত্তর করিলেন, "যে শুন্তে চায় তাকে গিয়ে বল।" এই বলিয়া বলপূর্ব্বক নিজের অঞ্চল মুক্ত করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বামনদাসের আর একটী মাত্র উপায় রহিল—অনাহারে ধন্না দেওয়া। এক্ষণে সেই উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া বহির্ব্বাটী আগমন করিলেন। পাঠকবর্গকে বলা বাহুল্য বামনদাস অধুনাতন ইংরাজি-পরিমার্জ্জিত যুবক নহেন। স্ত্রীকে প্রহার করা অবিধেয়, তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। তাঁহার এই দুঃখ হইতে লাগিল যে সাবিত্রী তাঁহার আলয়ে নহে। মনে মনে বলিলেন, "আমার বাটীতে থাকিলে বেতের আগে সোজা করিতাম।" কিন্তু এ স্থানে আর তাহা ভাবিয়া কি করিবেন। মৌনভাবে আসিয়া রামকানাইয়ের নিকট উপবেশন করিলেন।

রামকানাই তাঁহাকে বিরসবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি

খবর ?” তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন যে একেবারে পণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া কার্য্য ভাল হয় নাই, হয় ত কিঞ্চিৎ কম গ্রহণ করিবেন বলিলেই হইতে পারিত। হায় ! ঘরে লক্ষ্মী আসিতেছিল, তিনি নিজেই তাহাকে বন্ধ করিলেন। কিন্তু বামনদাসকে বিরস বদন দেখিয়া চিন্তাদগ্ধচিত্ত অপেক্ষাকৃত শীতল হইল। ভাবিলেন যদি বিনাপণেও কর্ম্ম করিতে স্বীকার না হইয়া থাকে তবে আর তিনি পণগ্রহণ করিবেন না বলায় ক্ষতি হয় নাই।

বামনদাস রামকানাইয়ের কথায় উত্তর না করিয়া যেখানে বসিয়াছিলেন সেই খানে শুইয়া পড়িলেন। রামকানাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি খবর ?”

বামনদাস কাতরস্বরে কহিলেন, “আর কি খবর ? কোন মতেই স্বীকার করে না। তার প্রতিজ্ঞা সে আমার কুল নষ্ট করিবে। আমারত প্রতিজ্ঞা যে যতক্ষণ সে আমার কথায় স্বীকার না হয় ততক্ষণ আমি অনাহারে এইখানে পড়িয়া থাকিব।”

রামকানাই কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আমাকেও কি অনাহারে থাকতে হবে ?”

বামনদাস কহিলেন “না, তুমি কেন থাকবে ?”

অনন্তর স্নানের সময় দিগম্বর বামনদাসকে স্নান করিতে কহিলেন। বামনদাস উত্তর করিলেন, “আমি নাবও না, খাবও না। আমি এইখানে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।” দিগম্বর নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিলেন, বামনদাস কিছুতেই স্নান করিলেন না। তখন নিজ ভগিনীর নিকট গিয়া কহিলেন, “দিদি, যাতে ব্রাহ্মণের কুল বজায় থাকে তার চেষ্টা কর।” সাবিত্রী সরোষে কহিলেন, “কুল গেল তো বয়ে গেল, আমি প্রাণ থাকতে অমন বরে কন্যা দিতে পারব না।”

দিগম্বর নিরুপায় হইয়া কহিলেন, আচ্ছা তাই হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার মতের অন্যথা করবো না। তুমি এখন একবার বল যে রামকানাইকে কন্যা দেবে, তা হলে আমি বাঁচি, আর আমার দ্বারে ব্রহ্মহত্যা হয় না।”

সাবিত্রী কহিলেন “আমি যা বলবো তা করবে ?”

দিগম্বর উত্তর করিলেন “করিব।”

সাবিত্রী। “তবে যা বল্লে স্নান আহার করেন, তাই গিয়ে বল।”

সাবিত্রী কি সংকল্প করিয়া দিগম্বরকে প্রতিশ্রুত করাইলেন তাহা পরে প্রকাশ হইবে। আপাততঃ বামনদাস আশ্বস্ত হইয়া স্নানাহার করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের অদৃষ্টের কথা মনুষ্য দূরে থাকুক, দেবতারাও বলিতে পারেন না। ললিতের ভগিনী ও ভগিনীপতি এতকাল সদ্ভাবে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে কেশবের চক্ষু গিয়াছে, গিরিবালার উচিত পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অধিক যত্ন করা কিন্তু কি আশ্চর্য্য এত কালের পর তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভব হইল। বিবাদ আবার একটী দাসীর কথায়। দাসীটী বাল্যকালাবধি কেশবের বাটীতে আছে। কলিকাতায় আসিবার সময় কেশব সেই দাসীটী লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই দাসীটীর দ্বারাই সংসারের কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু কেশবের চক্ষু যাওয়া অবধি একটী চাকরের প্রয়োজন হইল। সর্ব্বদা তাঁহাকে ডাক্তার খানায় যাইতে হয় কিন্তু এক্ষণে চক্ষু না থাকায় নিজে গিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া যাইতে পারেন না। ললিতও কলিকাতায় নাই যে তাঁহার দ্বারা এক্ষণে কোন সাহায্য হইবে। দাসীটী পল্লীগ্রামের সুতরাং সে সহরের ভাব ভঙ্গী কিছুই জানে না। এ সমস্ত কারণে একটী চাকর রাখা হইল, কিন্তু দাসী চাকরে এরূপ বিবাদ আরম্ভ হইল যে দাসীটী বহুকালের হইলেও গিরিবালা তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

দাসী কাঁদিতে২ কেশবের নিকট গমন করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিল কিন্তু যখন দেখিল যে কেশবও তাহাকে রাখিতে সম্মত নহেন তখন বলিয়া গেল, "এতকাল আমি ছিলাম কোন কথাটী জন্মায় নি, এখন সকের চাকর আসিয়াছে আর আমায় দরকার নাই। আমি যদি আপনার মতন কানা হতে পাত্তেম, তবে আমি থাকলে কোন আপত্তি থাকতো না।" কেশব দাসীর কথা শুনিয়া দূর২ করিয়া তাহাকে তথা হইতে তৎক্ষণাৎ যাইতে আদেশ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে কেশবের রাগের সমতা হইলে কেশব ভাবিতে লাগিলেন, এত কালের পর দাসী আজ হঠাৎ এরূপ কথা বলিয়া গেল কেন? সে যদি কানা হইত তাহা হইলে তাহার থাকার কোন আপত্তি জন্মিত না। ইহার অর্থ আর কি হইতে পারে? কি ভয়ানক কথা কহিল? হায়, কেন তাহার নিকট সবিশেষ না শুনিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম? সন্দেহ একবার উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় ভিন্ন কমে না। তুচ্ছ কথা, যাহাতে পূর্ব্বে কর্ণপাতও করিতেন না, এক্ষণে সে গুলি গুরুতর বলি-

য়া জ্ঞান হইতে লাগিল। চাকরকে তামাক দিতে কহিলে যদি একটু দেরি হয় তাঁহার অমনি মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইরূপে দিন কতক কাটিয়া গেল। কেশব কাহাকে কিছু স্পষ্ট করিয়া বলেন না। কিন্তু গিরিবালাও চাকরের প্রতি কথা, প্রতি পদধ্বনি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন ও তদ্বিষয়ে তর্ক করেন। কেশব কখন কখন বোধ করেন যে সে সব কিছুই নহে, দাসীর রাগ প্রকাশ মাত্র; আবার সময়ে সময়ে যেন সমুদায় স্পষ্ট দেখিতে পান। কেশবের মন এই ভাবে আছে এমন সময় এক দিবস বর্হিদ্বারে শব্দ হইল। চাকর ইহার পূর্ব্বে বাজারে গিয়াছে সুতরাং গিরিবালা গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। একটী যুবা পুরুষ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া একটু হাসিল। গিরিবালাও তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন। পরক্ষণেই যুবক গিরিবালাকে দরজার আড়ালে ডাকিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি কহিল। অনন্তর গিরিবালা নিঃশব্দে দরজা পুনরায় বন্ধ করিয়া, যুবকটীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ লইয়া, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা স্বাভাবিক পদধ্বনি করিয়া যাইতে লাগিলেন। যুবক নিঃশব্দে গমন করিল। উভয়ে অন্তঃপুরে যাইতেছেন এমন সময় কেশব গিরিবালাকে ডাকিলেন। গিরিবালা নিকটে গেলে কেশব জিজ্ঞাসিলেন "কে দুয়ারে না ডাকিতেছিল?" গিরিবালা অম্লানবদনে, উত্তর করিলেন "কেহ না।" কেশব জিজ্ঞাসিলেন, "ফিস্ ফিস্ করে কার সঙ্গে কথা কহিতেছিলে?" গিরিবালা কহিলেন, "কৈ? কার সঙ্গে কথা কহিলাম?" কেশব দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। গিরিবালা কেশবের মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া একটু মুচ্‌কে হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

গিরিবালা! এই কি তোমার উচিত হইল? যে স্বামীকে তুমি দেবতাতুল্য জ্ঞান করিতে আজ তাঁহার চক্ষু গিয়াছে বলিয়া তাহাকে এত হেয়জ্ঞান করিলে?

গিরিবালা স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আগন্তুক যুবকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। সে গৃহ হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিবার সময় যুবকের চর্ম্ম পাদুকা চৌকাটে লাগিয়া শব্দ হইল। সেই শব্দ কেশবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কেশবের মনে হইল যেন তাঁহার হৃদয় পাদুকা দ্বারা আহত হইল। তিনি আবার গিরিবালাকে ডাকিয়া কিসের শব্দ হইল জিজ্ঞাসিলেন। গিরিবালা উত্তর করিলেন, "কৈ শব্দ হলো?"

কেশব আবার মৌনাবলম্বন করিয়া বসিলেন, গিরিবালা যুবকের নিকট গমন করিলেন এবং তাহার সহিত নানাবিধ গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন।

কেশব ভাবিলেন চাকর প্রকাশ্যরূপে বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল; আবার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিবে।

গিরিবালা যুবককে লইয়া অনেকক্ষণ পরে পুনরায় বাহিরে আসিলেন। যুবককে কহিলেন, "এই বেলা যাও। নৈলে প্রকাশ হয়ে পড়বে।" এই বলিয়া যুবককে লইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্বারদেশে গমন করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু পুনরায় দ্বাররুদ্ধ করিবার সময় শব্দ হইল। কেশব জিজ্ঞাসিলেন, "কে ও?" গিরিবালা দেখিলেন আর গোপন করা যাইবে না, এজন্য কহিলেন, "চাকর ফিরিয়া আসিল কি না দেখিতে গিয়াছিলাম।" এই কথা বলিতে না বলিতে পুনরায় দ্বারদেশে শব্দ হইল। গিরিবালা গিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। এবার চাকর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া কথা কহিতে কহিতে আসিল। কেশব মনে করিলেন, "এই প্রকাশ্য প্রবেশ করিল।"

ক্রমশঃ

সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে? অবয়বের গঠন কিরূপ হইলে তাহাকে সুন্দর বলিতে পারা যায় তাহার কিছু নির্দ্ধারিত নিয়ম আছে কি? অয়ি সুন্দরি! তুমি যে সম্মুখে দর্পণ রক্ষা করত, স্বীয় জলদ পটল বিনিন্দিত চিকুরদাম বেণী আকারে নিবদ্ধ করিতেছ ও স্বীয় সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব সন্দর্শনে তোমার অধরোষ্ঠ যে ঈষৎ হাস্য প্রসব করিতেছে—তুমিই কি যথার্থ সুন্দরী? হে বরাননে! তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠের মনোহারিত্ব দর্পণপটে দেখিতে দেখিতে মনে মনে সৌন্দর্য্য গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইতেছ, তুমিই কি যথার্থ সুন্দরী? হে নবীনা! চঞ্চলচিত্ত নায়ক "বিদ্যুদ্দাম" নিঃসারিণী নেত্রযুগলের অপাঙ্গদৃষ্টিতে মৃতপ্রায় হইতেছে বলিয়া কি তুমি ভাবিতেছ যে, জগতে তুমি অদ্বিতীয়া সুন্দরী? অয়ি লাবণ্য ময়ি! বিচেতন ও সংজ্ঞাশূন্য ভাবে প্রেমিক যুবক তোমার বদনের পরম রমনীয় সৌন্দর্য্য এক মনে নিরীক্ষণ করিতেছে বলিয়া কি তুমি ভাবিতেছ যে, জগতে তোমার ন্যায় সুন্দরী আর

নাই? আর দুর্গেশনন্দিনীর বিমলে! শৈলেশ্বর মন্দিরে যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে বলিয়া স্বীয় বরবপুঃ অমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করিলে, কিন্তু কেন তুমি দর্পণে স্বীয় রূপের ছায়া দেখিয়া অধরপ্রান্তে ঈষৎ গর্ব্বের হাসি ভাসাইয়া দিলে? ভাবিলে কি জগতে তোমার ন্যায় রূপসী আর নাই? সুন্দরীগণ যদি তোমরা এরূপ বিশ্বাস মনে স্থান দিয়া থাক, তবে তাহা ত্যাগ কর, তোমাদের ভ্রান্তি হইয়াছে। তাই বলিয়া আমি তোমাদের সৌন্দর্য্যের অপ্রশংসা বা তোমাদিগকে কুৎসিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি না। আমারদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রবিধ।

সৌন্দর্য্য লইয়া জগতে কতই প্রলয় ব্যাপার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সৌন্দর্য্যের মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া দেবদ্বেষী অসুরগণ অমৃতলাভে বঞ্চিত হইল। এই সৌন্দর্য্য হেতু সুন্দ উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয় অকালে জীবলীলা শেষ করিল। এই সৌন্দর্য্যই রোমরাজ্যের পতনের এক মাত্র কারণ। ইহাই ক্লিওপেট্রার নাম অনন্তকাল স্থায়ী করিবার হেতু। এই সৌন্দর্য্যই জাহাঙ্গীরের জীবনের অনপনেয় কলঙ্কের নিদান। ইহাই নুরজাহানের নাম ইতিহাস গ্রথিত করিবার মূল। এই সৌন্দর্য্যই কাব্য নাটকাদির জীবন। সেক্ষপীয়র ও কালিদাস প্রভৃতি কবি-কুল-সবিতাগণের অমৃতময় নাটক সকলের মূলে সৌন্দর্য্যই কারণস্বরূপ নিহিত। এই সৌন্দর্য্য হইতে বঙ্কিম চন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" ও "বিষবৃক্ষের' উৎপত্তি। ফলতঃ জনসমাজের অর্দ্ধাধিক আমোদ সৌন্দর্য্য দ্বারা পরিচালিত। অধিকাংশ কার্য্যেরই মূলে সৌন্দর্য্য সংস্থিত।

সৌন্দর্য্যের ন্যায় সর্ব্বজন বিদিত, সর্ব্বদা দৃষ্ট, নিরন্তর নির্ব্বাচিত বিষয় আর কিছুই নাই। তথাপি এ সৌন্দর্য্য যে কি তাহা বলিয়া উঠা ভার। কাহাকে সৌন্দর্য্য বলে তাহা নির্ব্বাচন করা অসাধ্য। ঐ রমণীর লোচনের তারাদ্বয় নিবিড় কৃষ্ণ, অতএব উনি সুন্দরী, বাঁড়ুয্যেদের বড় বয়ের নাকটী যেন বাটালী কাটা সুতরাং তিনি সুন্দরী, ও পাড়ার হালদারদের মেজ মেয়ের রঙ্‌টী যেন কাঁচা হলুদ বা দুধে আল্‌তা অতএব তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রতি সন্দেহ করা অবিধি। ইত্যাদি প্রকার সৌন্দর্য্যের বিচার ও তাহার বাদানুবাদ সততই জন সমাজে শ্রবণ করা যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রঙ্, নাক, চোক্ প্রভৃতি লইয়া কি সৌন্দর্য্য হয়? নাক,চোক,মুখ ভাল হইলেই কি তাহার সৌন্দর্য্যের প্রতি আর সন্দেহ করিবার উপায় নাই? ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে দেহগত বা বস্তুগত কতক

গুলি দ্রব্যের কোন কোন অংশ বিশেষ এরূপ সুন্দর রূপে বিন্যস্ত থাকে যে তাহা দর্শন মাত্র দর্শকের একটী অভূতপূর্ব্ব, অপরিজ্ঞাত পূর্ব্ব, আনন্দের উদয় হয়; তাঁহার হৃদয় তন্ত্রী যেন স্বেচ্ছায় স্বয়ং বাজিয়া উঠে; তিনি যেন সুখী হন। সেই মনোহর, অপূর্ব্ব বিন্যাসই সাধারণতঃ সৌন্দর্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অনেক বিখ্যাত দার্শনিক এ সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক করিয়াছেন। অঙ্গ সমুদায়ের সুচারু বিন্যাসের সমষ্টি যে সৌন্দর্য্য এ বিষয়ে তাঁহাদের সকলের ঐকমত্য নাই। সে যাহাই হউক সৌন্দর্য্যের প্রধান ও বিশেষ কারণ যে স্বতন্ত্র এ বিষয়ে অধিকাংশেরই মতের একতা দৃষ্ট হয়। সেই কারণটী নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। বিন্যাস বিষয় সর্ব্বথা প্রশংসনীয় হইলেও তদভাবে যে সকলই তুচ্ছ, ও অতি সামান্য রূপে প্রতীত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

যে যাহাকে ভাল বাসে তাহার দেহে সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমষ্টি ও তাহার অন্তরে সমস্ত গুণের ভাণ্ডার দেখিতে পায়। ইহা নূতন কথা নহে। মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় এই ঐশী আকর্ষণটী মানব সমাজের মূল বন্ধন। প্রণয়ের চক্ষে দোষ বিচার নাই ইহা সাধারণ কথা। এই জন্যই গ্রীশীয়েরা আপনাদের প্রণয়-দেবতা কিউপিদকে অন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা সকলেই স্ব স্ব পত্নীর সৌন্দর্য্য ক্লিওপেট্রা ও মেহেরউন্নিসা অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি এই প্রণয়ই তাহার মূল কারণ। এই জন্যই যুবক বা বৃদ্ধ স্ত্রীর অপ্রশংসা শুনিলে মুখ ভার করেন; এই জন্যই নবীনা স্বীয় পিতৃ সমবয়স্ক স্বামীকেও সাধ করিয়া সিমলার কালাপেড়ে ধুতি পরাইয়া সুখী হন। তোমাকে আমি অযথা ভাল বাসি বলিয়া তোমার দেহে অযথা রূপের, অন্তরে অযথা গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই সত্য কিন্তু জগৎ তো আমার চক্ষে দেখে না। জগতের চক্ষে এই অযথা সৌন্দর্য্যের অবশ্যই অন্য রূপ বিচার হইবে। সুতরাং আমি তোমাকে পরম সুন্দর বলিলেও অন্যে হয়ত তাহার বিপরীত বলিবে। তোমাকে আমি ভাল বাসি বলিয়াই তোমার শরীরে আমি এত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, কিন্তু তোমাকে আমি যত ভাল বাসি এত আর জগতে কেহই বাসে না এই জন্যই হে নবীনা রূপসীগণ ও নবীন ভাবুক কুল তোমরা আপনরূপে আপনিই মোহিত হও। কিন্তু জানিও জগৎ হয়ত তোমাকে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাদৃশ প্রশংসা দিতে প্রস্তুত নহে। তোমাকে আমি ভাল বাস বলিয়া তোমার দেহের সৌন্দর্য্য দর্শন করি, অন্যে

তাদৃশ ভাল বাসে না বলিয়া তাদৃশ সৌন্দর্য্যের সত্তা অনুভব করে না। এই জন্যই জগন্মধ্যে সৌন্দর্য্যের রুচি সম্বন্ধে ভয়ানক অনৈক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। "দেশভেদে, জাতি-ভেদে, মনুষ্য ভেদে, সৌন্দর্য্যের রুচি ভিন্নবিধ। জগতস্থ বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতি সমূহে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য প্রচলিত। কোন জাতি হয় ত তুষার ধবলাঙ্গী, তাম্রকেশী, বিড়া-লাক্ষীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। কোন জাতি হয়ত ক্ষুদ্র পদ-শালিনী, নখর-কুলিশ-প্রহারিণী, সর্ষপ-সম-লোচনী যোষার গৌরব করেন। অপর কোন জাতি হয়ত কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূল চর্ম্মা, স্থূলা-ধর সম্পন্না অঙ্গনার লাবণ্য অর্চ্চনা করেন। কোন জাতি বা স্বর্ণবর্ণা, স্থির-নয়না, কৃষ্ণকেশী রমণীর রূপে মুগ্ধ হন। কোন জাতি বা চঞ্চললো-চনা, দ্রুত-সজোর-পদ-বিক্ষেপিনী, শুক-পক্ষী তুল্য নাসা ধারিণী কামিনীর দেহে সমধিক সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। ফলতঃ এ বিষয়ে কুত্রাপি একতা দৃষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জগৎ দারুণ বৈষম্য পূর্ণ।*" নিম্ন লিখিত বাক্যেও অবিকল এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। Where one sees beauty another perceives none, nay, recognises, it may be, hedious deformity. A Chinese lover would see no attractions in a belle of London, or Paris; and a Bond Street exquisite would discover nothing but deformity in the Venus of the Hotentots." *

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই আশ্চর্য্য বৈষম্যের হেতু নিরাকরণার্থ চেষ্টা পাইয়াছেন। বিবিধ পণ্ডিত এ সম্বন্ধে বিবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি আন্তরিক আকর্ষণ, চাই তাহাকে প্রণয় বল, বা যা ইচ্ছা হয় বল, ইহার একমাত্র কারণ। আমরা আপনাকে অত্যন্ত ভাল বাসি, এ সত্যে দ্বিমত নাই। এই জন্যই আমরা আপনার রূপ ভাল, কথা ভাল, বিদ্যা ভাল, চলা ভাল, বসা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি। আপনাকে ছাড়িয়া দিলে যে ব্যক্তি আমাদের অবিচলিত প্রেমের আস্পদ, আন্তরিক আকর্ষণের মূল, যথার্থ প্রীতির নিকেতন, তাহারই প্রেমময় মূর্ত্তি মনে পড়ে। তাহাকে নিখুঁত, তাহার সকল কাজ অনির্ব্বচনীয় সুন্দর বলিয়া বিবেচনা হয়। তাহাকে ত্যাগ করিয়া বিবেচনা করিলে স্বদেশ, স্বজাতি, প্রভৃতি আমাদের লক্ষ্য স্থল হয়। যে কারণে লাপলাণ্ডবাসী

* মৃণ্ময়ী। ২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।

*Elements of mental and moral science by George. Payne. L.L. D.

অনবরত রাত্রির ঘোর তমসে আবৃত থাকিয়া এবং অনবরত দিবাকরের খরতর উত্তাপ ভোগ করিয়া, অসহ্য শীতে ও সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত হইয়াও স্বদেশের গুণ, শোভা, সৌন্দর্য্য ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না; যে কারণে আফরিকাবাসী দুরন্ত অগ্নিবৎ শোণিত বিশোষক উত্তাপে সমস্ত দিন বরাহ ও বন্য পশু বধ করত আম মাংসে উদরপুর্ণ করিয়া, কথঞ্চিৎ রূপে কাল যাপন করিয়াও কোন ক্রমে ভ্রমেও স্বদেশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে, সেই কারণ আর সৌন্দর্য্য বোধ-বিধায়ক কারণ প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন। উভয়ই একরূপ মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত। এক মাত্র চিত্তের আকর্ষণই এই বিসম্বাদী ঘটনানিচয়ের অকাট্য কারণ। এই চিত্তের আকর্ষণ বা চিত্তোচ্ছ্বাস (emotion of the mind) কেবল মাত্র যে প্রণয় জন্য উদ্ভূত হয় তাহা নহে। লালসা, বিকার প্রভৃতি কতক গুলি মনোবৃত্তি এবম্বিধ সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের বিশিষ্ট কারণ। কিন্তু ঐ সকল মনোবৃত্তি চিত্তের আকর্ষণ বা উচ্ছ্বাস,(emotion) বা প্রণয়ের প্রশাখামাত্র; অতএব বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র আমাদের চিত্তই পরকায় মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করায়। মূর্ত্তিতে, ছবিতে, প্রণয়াস্পদের বদনে, কিছুতেই সৌন্দর্য্য নাই। সৌন্দর্য্য অপরের মনে। ডাক্তর ব্রাউন (Dr. Brown) এই মতের পক্ষপাতী। তিনি এই কথা বলিয়া পরে অনেক কুটিল তর্কের আবির্ভাব করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের সে সকল দার্শনিক তর্করাশিতে প্রবেশ করিবার অবশ্যকতা নাই। লার্ড জেফ্রি (Lord Jeffrey) এতদপেক্ষা বিশদরূপে সে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। লোক প্রথিত কুৎসিতা কুব্জাকে কৃষ্ণ যে সুন্দরী রূপে পরিণত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে। যেরূপে বা যে কারণেই হউক, কুব্জার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তের আকর্ষণ জন্মিয়াছিল।

তুমি লুৎফউন্নিসা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বুঝিয়াছ কি সৌন্দর্য্য কিছুই নহে, কেবল দর্শকের মনের উচ্ছ্বাস মাত্র! ঐ উচ্ছ্বাস বা আকর্ষণ ছিন্ন হইলে বিদ্যাধরীর রূপও তুচ্ছ হইয়া পড়ে। একথা যদি কোন রমণী বুঝিয়া থাকে তবে লুৎফউন্নিসা তুমি এক দিন তাহা বুঝিয়াছিলে সন্দেহ নাই। জামাইবারিকের কামিনী, তুমি সৌন্দর্য্য গর্ব্বে স্ফীতা হইয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু দুই দিন পরে বুঝিবে, যে তোমার ও সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। তুমি সুন্দরী হইলেও তোমার স্বামীর চক্ষে তুমি অতি অপদার্থ। কারণ তোমাতে তাঁহার চিত্ত নাই। যাহাতে

তাঁহার চিত্ত অধিকার করিতে পার তাহার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই তোমার রূপ বাড়িবে। অতএব তুমি বৃন্দাবন গিয়া স্বামীর চরণ ধরিয়া সাধনা কর।

হে কুটিল-কটাক্ষ-বর্ষিণী কামিনী-গণ! হে মুকুর হস্ত সুন্দরি! হে সৌন্দর্য্য গর্ব্ব গর্ব্বিতা রমণীগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও। তোমাদের রূপের বড়াই ত্যাগ কর। তোমাদের শরীরে এক বিন্দুও রূপ নাই। আমি তোমাদের তাই বলিয়া নিন্দনীয়া বা কুৎসিতা বলিতেছি না। হইতে পারে—তোমার লোচন-যুগল পটল চেরা, বা ইন্দীবর তুল্য বা পদ্মপলাশ-বৎ; তোমার নাসিকা তিলফুল অপেক্ষাও উত্তম; তোমার পীন পয়োধর দাড়িম্ব অপেক্ষাও আশ্চর্য্য; তোমার বাহুদ্বয় মৃণাল অপেক্ষাও সুকুমার; তোমার অঙ্গুলি নিচয় চম্পক কুসুম সদৃশ; তোমার উরু-যুগল রামরম্ভা অপেক্ষাও ভয়ানক; তোমার বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার ন্যায়। সংক্ষেপতঃ তোমার শরীর মহান্ অশ্বত্থ গাছ হইতে অতি ক্ষুদ্র ঘাস পর্য্যন্ত যাবতীয় বন জঙ্গলের আদর্শস্থল ইহা আমি স্বীকার করিলাম। বিনা ওজরে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, তোমার দেহস্থিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিন্যাস অতি মনোরম, কিন্তু মন না থাকিলে তুমি কোন্ কাজের? তোমার ও রূপ রাশি অতি ছার, নাক ফুঁড়িয়া তাহাতে দেড় মন নথ ঝুলাও, কান ফুঁড়িয়া তাহাতে রাজ্য সমেত বোঝা দোলাও, দুঃখ রাখ কেন, সোনার পাথর গলায় বাঁধিয়া বাসনা স্রোতে সাঁতার খেল, দিনে দুপুরে পুরুষ মহাজনদের মন চুরি করিয়া স্বয়ংই তার সাজা স্বরূপ অগ্রে পায়ে রূপার বেড়ী দিয়া আদরের কয়েদী হইয়া বসিয়া থাক, আর যা খুসী হয় তা কর, কিন্তু এ নিশ্চয় জানিও যে তাতে রূপ বাড়িবে না বরং কমিবে। তোমরা বাহির সাজাইতে চেষ্টা করিও না তাহাতে কেবল হিতে বিপরীত ঘটিবে। দরিদ্র শিশু তোমাদের এবেশ দেখিতে পাইলে, কোন নূতন জীব দেখিলাম ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিবে, আর জগদ্বিখ্যাত ভীরু বাঙ্গালী পুরুষ তোমাদের এই রণরঙ্গিণী বেশ দেখিয়া বিশেষ সুধু মুখ নাড়া নয়, উপরন্তু নথ নাড়ার ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিবে। তাই বলি তোমরা বাহির সাজাইতে চেষ্টা করিও না। নাক ফোঁড়া ফুঁড়িতে আর কাজ নাই, যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়, অন্তর সজ্জীভূত হয়, তাহার উপায় বিধান কর—তোমার রূপ রাশির কখন ধ্বংস হইবে না, তোমার পার্থিব কায় স্বর্গীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে, প্রেমিকের চক্ষে তোমার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় বলিয়া বোধ হইবে। প্রেমিকের মনের গুণে তোমার রূপ।

অতএব গুণের প্রলোভনে প্রেমিকের চিত্তকে ভুলাইয়া রাখ, তাহা হইলে তোমার রূপ বাড়িবে। হে নবীনা বাঙ্গলিনি! তুমি আর কষ্ট করিয়া স্বীয় সুকোমল গণ্ডস্থলে পাউডার মাখাইও না, আর সোপ দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দেহ কাতর করিও না, তাহাতে তোমার রূপ বাড়িবে না, রূপ বাড়েও না কমেও না। যে তোমাকে সুরূপা বলিয়া জানে সেই প্রেমিকের চিত্ত যাহাতে তোমার ব্যবহারে, তোমার গুণে আনন্দিত থাকে তাহারই চেষ্টা কর— তোমার রূপরাশি কখন ভাঙ্গিবে না। হে মানিনি! তুমি মান্ করিয়া নায়ককে পায়ে ধরাইয়া সাধাইতেছ, সাধাও—কিন্তু কেন তুমি, তাহাকে প্রকারান্তরে জানাইতেছ যে ভুবনে আর তোমার ন্যায় সুন্দরী নাই? যদি তুমি তাহাই বিবেচনা করিয়া থাক তাহা হইলে তোমার নিতান্ত ভ্রম হইয়াছে। এখনও সে বিশ্বাস ত্যাগ কর।

কেরাণী মেমোরিয়েল।

যমপুরী কেহ কখন দেখেন নাই, বিবিধ কল্পনা বলে অনেকেই অনেক প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রবন্ধে কল্পনা স্বতন্ত্র পথে চলিয়াছে, সেজন্য লেখক দোষী নহেন। যমপুরী যে নিতান্ত অল্পায়তন নহে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অতি বৃহৎ না হইলে মৃত সংখ্যার স্থান হয় কৈ? মারীভয় আছে, সর্পভয় আছে, জলমগ্ন আছে, আত্মহত্যা আছে, কাৎলা ফেলা প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার আছে; সকলেরই উদ্দেশ্য যমপুরী গমন। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, বিদ্বান্ মূর্খ, দাতা কৃপণ, সাহসী ভীরু, ধার্ম্মিক পাপী, আর কত বলিব, জীবমাত্রেরই গন্তব্য স্থান যমপুরী। সকলের আত্মাই তথায় বিচরণ করিতেছে, কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে, ধর্ম্মের পুরস্কার ও পাপের তিরস্কার হইতেছে। সদ্‌বিচারের চূড়ান্ত স্থান, পক্ষপাতের লেশ মাত্র নাই।

বৃহৎ আয়তন যমপুরী নানা খণ্ডে বিভক্ত; এক এক খণ্ডে এক এক শ্রেণী আত্মার বাস। পৃথিবীতে জীবনোপায় সংস্থানের জন্য যাঁহারা এক এক শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা যমালয়ে এক এক খণ্ডে নিবাস স্থান প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক খণ্ডে কর্ম্মফলোপযোগী স্বর্গ নরক সদৃশ সুখ ও দুঃখ স্থান আছে। কোন খণ্ডে বিচারকদিগের আত্মা বিচরণ করিতেছেন, তন্মধ্যে সদ্বিচারক-

বর্গের আত্মা সুখসেব্য পদার্থ সমূহে পরিবৃত হইয়া পরম সুখে সময়াতিপাত করিতেছেন, আর উৎকোচগ্রাহী পক্ষপাতী বিচারকের আত্মা যমদূতের কঠোর যন্ত্রণাদায়ক মুদ্গারাঘাতে ছট্ফট্ করিতেছে। সকল খণ্ডের গতিই এই প্রকার। প্রতি খণ্ডের দ্বারদেশে তত্তৎ খণ্ডের নাম লিখিত আছে। তন্মধ্যে এক খণ্ডের নাম "কেরাণী বারিক।" বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই খণ্ডের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ। এই স্থানে বঙ্গীয় মৃত কেরাণীবর্গের আত্মার বাস।

যমরাজ প্রতি দিন মর্ণিং ওয়াক করিয়া থাকেন। এক দিন শমন প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে বারান্দায় বসিয়া চা খাইতেছেন ও দৈনিক সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন। যমের সংবাদপত্র পাঠ শুনিয়া সকলেই হাঁসিবেন,--হাঁসুন, কিন্তু বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, যমপুরীতে সংবাদপত্র থাকা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পার্থিব সৌকর্য্য সাধনোপযোগী দ্রব্য সমূহের উৎকৃষ্ট আদর্শ যে শমনপুরীতে থাকিবে তাহার সন্দেহ কি? যখন ভোগবিলাসিতার সমস্ত বস্তুই তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে, তখন যে স্বর্গীয় সমাচারপত্র থাকিবে না, একথা যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি যমপুরীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যমরাজ চা খাইতে খাইতে এক এক বার চাম্‌চে রাখিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন। এত মনোযোগের সহিত শমনদেব কি সংবাদ পাঠ করিতেছিলেন? বিবিধ সংবাদ স্তম্ভে দেখিলেন;—

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, যমপুরীর কেরাণীবারিকের আত্মাগণ বঙ্গীয় দুর্ভাগ্য কেরাণীবর্গের শোচনীয় অবস্থা নিরাকরণের জন্য বিধাতার নিকট আবেদন করিবেন; ফল কি হয় তাহা আমরা পরে জানাইব।"

যমরাজ এই সংবাদ পাঠ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, ক্ষণেক চিন্তার পর আপনা আপনি কহিলেন;—কৈ, আমি তো ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি নাই। আবেদন অবশ্যই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইয়া যাইবে। "আড়দালী"—বলিয়া ডাকিবা মাত্র এক জন তক্‌মাধারী আড়দালী "হুজুর" বলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। যমরাজ কহিলেন "সেকেটর সাহেব কো ছেলাম দেও।" ভৃত্য "যো হুকুম" বলিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণবিলম্বে সেক্রেটরী চিত্রগুপ্ত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিধাতার নিকট প্রদত্ত হইবার জন্য কেরাণীবারিক হইতে কোন আবেদন এখানে উপস্থিত হইয়াছে কি না?" চিত্রগুপ্ত

কহিলেন "পলিটিকেল আপিস হইতে সংবাদ পাইয়াছি শীঘ্রই কেরাণী-বারিকের সুচরিত আত্মাবর্গ হুজুরে হাজির হইয়া আবেদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবে।"

পর দিন মধ্যাহ্ন সময়ে যখন শমনদেব বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিবিধ বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন, এমন সময়ে কেরাণীবর্গের আত্মারা এক আবেদন হস্তে ধর্ম্মরাজ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করপুটে ও বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিল যে "আমরা লোকপিতামহ প্রজাপতি সমীপে এক আবেদন করিতেছি, আপনি ইহাতে অনুমোদন করিলে আমরা চরিতার্থ হই।" ধর্ম্মরাজ ইঙ্গিত করিবামাত্র আবেদন প্রদত্ত হইল, পার্শ্বস্থ কর্ম্মচারী উহা পাঠ করিলেন। আবেদন খানি এই ;—

"মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীলশ্রীযুক্ত লোকপিতামহ বিধিবিধায়ক বিধাতৃ মহাশয় প্রবল প্রতাপেষু।

বঙ্গীয় মৃতকেরাণীবর্গের আত্মাগণের সবিনয়নিবেদন।

যেহেতু অপ্রকাশ নাই যে বঙ্গীয় কেরাণীবর্গের তুল্য হতভাগ্য জীব সংসারে আর নাই। তাহারা যে পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিল, তাহা স্থির করা যায় না। আমরা যে সময়ে কেরাণী ছিলাম, তখন উহাতে কিয়ৎ পরিমাণে সুখ ছিল, কিন্তু এখন ঐ বৃত্তি নিতান্ত শ্ববৃত্তির ন্যায় নিকৃষ্ট হইয়াছে। কোন কালেই কেরাণীবর্গের অর্থের অনাটন ঘুচে না। এখন তো অনেক কেরাণীতে অনেক মোটা মোটা বেতন পাইয়া থাকেন, তথাপি কাহারও কিছু সঞ্চয় হয় না। তাঁহাদের ডাইনে আনতে বাঁয় কুলায় না। কেরাণীগণ কি উপায় করিলে এই শাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, তাহা জ্ঞাত হইলে, যদি কোনরূপে আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি তাহার চেষ্টায় নিযুক্ত হই। আপনি বিধাতা, আপনার করতলেই সকলের অদৃষ্ট লিপি। আপনি ভিন্ন কে ইহার উপায় বিধান করিবে। আমরা ভরসা করি যে আমাদের এই আবেদনে আপনার করুণাকটাক্ষপাত হয় ইতি।

স্বাক্ষর——"

ধর্ম্মরাজ আবেদন পত্রের মর্ম্মাবগত হইলেন, দেখিলেন, ইহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই। বিষয়ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এক শ্রেণীস্থ লোকের অদৃষ্টলিপির সমালোচন হইবে। তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। বিদ্যুল্লতা নাম্নী স্বর্গবিদ্যাধরী সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেল, এবং চক্ষুর নিমেষে প্রত্যুত্তর আনিয়া দিল। ধর্ম্মরাজ উত্তর লিপি পাঠ ক-

রিয়া আবেদনকারীগণকে শুনাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই ;—"বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অতএব অমুক তারিখে ফুলবেঞ্চ সমীপে আবেদনকারীগণ উপস্থিত হইলে যথাযোগ্য বিচার করা যাইবেক।" আবেদনকারীগণ সহর্ষে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল, মনে মনে ভাবিল আমরা সুবিচার পাইব। এই বার অবশ্যই মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

নিয়মিত দিবসে সুরলোকে ফুল-বেঞ্চের বৈঠক। ধুমের সীমা নাই। বিচারাসনে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বসিয়াছেন। ব্যক্তি গণনায় তিন জন মাত্র কিন্তু মস্তক গণনায় দশ জন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাদেবের পাঁচ, ব্রহ্মার চারি, আর বিষ্ণুর এক, একুনে দশটী মস্তক, সুতরাং মস্তক গণনায় দশ জন বলিতে পারা যায়। ফলে ফুল বেঞ্চের নিয়মানুসারে তিন হইলেও ফুলবেঞ্চ, দশ হইলেও ফুল-বেঞ্চ। বিচার দেখিবার জন্য অনেক দেব দেবর্ষির সমাগম হইয়াছে। শুভ্র শ্মশ্রুরাজি বিরাজিত লর্ড বিশপ বৃহস্পতি মহাশয় এক দিকে বসিয়া আ-ছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এডবোকেট জেনেরল দক্ষ প্রজাপতি একান্তে বসিয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেল নারদের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। আবেদনকারীবর্গের ভাগ্যে কতিপয় নূতন পাস হওয়া ব্যারিষ্টার আছেন। উকীল মোক্তার ও দর্শকগণে ঘর রৈ রৈ করিতেছে। আবেদনকারীগণ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। আড়দালীরা "চুপ চুপ আস্তে" বলিয়া আপনারাই গোল বৃদ্ধি করিতেছে। আবেদন খানি পঠিত হইল। আবেদনকারীগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য এক জন ব্যারিষ্টার উঠিয়া সৎযুক্তি দ্বারা আবেদনের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। ক্ষিপ্রহস্ত গণদেব সম্মুখে উপবেশন পুরস্বর সাঙ্কেতিক বর্ণে রিপোর্ট লিখিতেছেন। এ স্থলে পাঠকবর্গের সুবিদিতার্থে নিম্নে বক্তৃতা ও বিচারের প্রতিলিপি প্রকাশ করা যাইতেছে।

আবেদকারীগণের ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা।

"অদ্য এই বিচার মন্দিরের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! অদ্য সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী ত্রিমূর্ত্তি বিচা-রাসনে উপবিষ্ট। এই ধর্ম্মাধিকরণে মীমাংসার জন্য অদ্য যে বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত গুরুতর। বিষয়টী গুরুতর বলিয়াই ধর্ম্মরাজ শমনদেব বিদ্যুল্লতার দ্বারা লোকপিতামহ সমীপে সংবাদ প্রেরণ করেন; এবং এ স্থলে এ কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয় যে বিষয়টী গুরুতর বলিয়াই সদ্বিচারক বিধি বিধা-

য়ক বিধাতা মহাশয় এই ফুল বেঞ্চের,—এই অনরেবল ফুল বেঞ্চের আয়োজন করিয়াছেন। এক্ষণে এই গুরুতর বিষয়ে আমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে, প্রকাশ করিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

বঙ্গীয় কেরাণীগণের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কোন্ সহৃদয়ের হৃদয় না কাঁদিয়া উঠে! পৃথিবীতে যদি কোন অবসর শূন্য দুর্ভাগ্য জীব থাকে তবে সে বঙ্গীয় কেরাণী। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অর্থোপার্জ্জন করিয়াও যাহার অন্নকষ্ট দূর হয় না,—সন্তানগুলিকে মানুষ করিবার জন্য যাহার বিব্রত হইয়া বেড়াইতে হয়,—পরিবারের মোটা ভাত, মোটা কাপড় জুটিয়া উঠা যাহার পক্ষে ভার হয়,—ঔষধ, পথ্য ও ডাক্তারের দর্শনী অভাবে যাহার পরিবারবর্গের রোগোপশম হয় না,—প্রতিবেশিনীর ন্যায় বস্ত্রালঙ্কার হইল না বলিয়া যাহার রমণী শত শত ধিক্কার দিতে থাকে,—এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে কে আছে? বঙ্গীয় কেরাণী। যদি একাধারে এই সকল ঘটনা পরম্পরার সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে বঙ্গীয় কেরাণী বর্গের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই ইচ্ছা ফলবতী হইবে। বঙ্গীয় কেরাণীই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাহারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন মহাপাপের প্রতিফল ভোগ করিতেছে তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। ইহা যে ঘোরতর মহাপাপের প্রতিফল তাহাতে আর সন্দেহ কি? হা বঙ্গীয় কেরাণি! তুমি যে কি পাপে বঙ্গে আসিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ তাহা বলিতে পারি না। দয়াদাক্ষিণ্য পূর্ণ উপস্থিত অমর বৃন্দের দীর্ঘনিশ্বাস, উন্নত লোচনা ও নিস্তব্ধতা নিবন্ধন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বঙ্গীয় কেরাণীগণ যথার্থই দুর্ভাগা বটে। ইহাদের দুর্ভাগ্যের কথা কি বলিব? পূর্ব্বে লোকে পাঁচ টাকা বেতন পাইয়াও বিবিধ সুখে কালযাপন করিয়াছেন, কিন্তু এখন মোটা মোটা বেতনের কেরাণীগণ উদরান্নের জ্বালায় অস্থির। ইহাদের আহারের অবকাশ নাই, নিদ্রার অবকাশ নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়াই স্নানের উদ্যোগ—ক্রমে স্নান, আহারের কথা কি—নাকে মুখে প্রদান মাত্র। পান প্রত্যহ ঘটে কি না সন্দেহ, অমনি আপিস অঞ্চলে দৌড়। আপিসে গমন করিয়া নানাবিধ ফরমাইস সরবরাহ করিতে হয়। তাহার উপর আবার গমেজ, পিক্রুস, প্রভৃতি বাজেওয়ালার পদাঘাত, ব্লাডিনিগর প্রভৃতি সুধাময় সম্বোধন সহ্য করিতে হয়। রাত্রে বাটী আসিবার সময় মুলতবি কাজের প্যাকেট বগলে করিয়া আনিতে হয়। সমস্ত রাত্রি জাগিয়াও কাজের শেষ হয় না। এমন দুর্ভাগ্য জীব বোধ হয় নরলোকে আর

গোচর হয় না। অদ্য সেই দুর্ভাগ্য জীবের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই মহামান্য ফুল বেঞ্চ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। ভরসা আছে কখনই অবিচার হইবে না। যদি এমন বিচারকদিগের নিকট সদ্বিচার পাইবার আশা না থাকে, তবে আর কোথায় যাইব? এক্ষণে তাহাদের জন্য কিছু উপায় বিধান করা অতি কর্ত্তব্য। যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে তাহা জানিতে পারিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। এক্ষণে মহামান্য বিচারপতিগণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলে কৃতার্থ হই।"

তৎপরে ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেল বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

"আমার সুযোগ্য বন্ধু বিশেষ দক্ষতা সহকারে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। বঙ্গীয় কেরাণীবর্গের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয়, তদ্বিষয়ে বোধ হয় উপস্থিত অমরবৃন্দের মধ্যে কাহারো কোন সন্দেহ নাই। আমিও সে কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করি। কিন্তু পাছে আমার সুযোগ্য বিজ্ঞবর বন্ধুর বাক্‌পটুতায় মুগ্ধ হইয়া মহামান্য বিচারপতিগণ ভ্রমে পতিত হন, এই জন্যই আমি দুই একটী কথা বলিতে উঠিলাম। কেরাণীগণের অবস্থা শোচনীয় হওয়া নিতান্ত অন্যায় নহে। যখন তাহারা বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা এই প্রতিজ্ঞা করে যেন কেরাণিগিরি করিয়াই উদর পোষণ করিতে হইবে। এই জন্যই বাঙ্গালী জাতি কেরাণী প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আপনারাই আপনাদের উন্নতি পথে কণ্টক হইয়াছে। ইহাই কি তাহারা বিদ্যাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছে! সুশিক্ষিত হইয়া যদি আপনার অবস্থা উন্নতির জন্য চেষ্টা না হইল, তবে বিদ্যাশিক্ষার ফল কি? শিক্ষিত হইয়া দেশের উন্নতিকল্পে অনেক প্রকার চেষ্টা হইতে পারে। যাহাদের সে চেষ্টার প্রতি কিছু মাত্র মনোযোগ নাই, তাহাদের পক্ষে স্ববৃত্তিই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। ভারতবর্ষে সুবর্ণবর্ষে। সেই সুবর্ণ লোভেই বিদেশীয় জাতির আবির্ভাব। তাহাতেই ভারতের সর্ব্বনাশ। বিদেশীয় জাতির আবির্ভাবেই সকল সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যের উপস্বত্বে অন্য জাতি ভাগ্যবান হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা উদরান্নের জন্য লালায়িত! ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গীয়েরা সমধিক নিশ্চেষ্ট। তাঁহাদের উদ্যমশূন্যতা দেখিলে কে বলিবে যে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে? ইহারা যে একটী জাতি মধ্যে পরিগণিত হয়, ইহাই বঙ্গীয়দিগের পক্ষে যথেষ্ট।

ভারতবর্ষ স্বভাবসিদ্ধ যে সকল রত্নের ভাণ্ডার, যতদিন বঙ্গীয়েরা সেই

সকল রত্ন আহরণে যত্ন না করিবে,—যত দিন তাহারা অভিমান-শূন্য হইয়া হল চালন, যন্ত্র চালন প্রভৃতি উন্নতি-কর কার্য্যে ব্যাপৃত না হইবে,—যতদিন তাহারা চাকরী করিবার জন্যই বিদ্যা-শিক্ষা এরূপ মনে না করিবে; ততদিন তাহাদের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। ততদিন বাঙ্গালী কেরাণি-প্রধান জাতিই থাকিবে। ইহাদের পূর্ব্বজন্মে কোন পাপ ছিল কি না, এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই, তবে কেরাণী-গিরি আরম্ভ করা অবধি যে দিন দিন তাহাদের পাপবৃদ্ধি হইতেছে তাহার কোন সংশয় নাই। সে পাপে নর-লোকের আশু কোন ক্ষতি প্রতীয়মান হইতেছে না বটে, কিন্তু সুরলোকের যে বিষম ক্ষতি হইতেছে ইহা সকলেই স্বী-কার করিবেন। কেরাণীবর্গ এত মসিব্যয়ী যে, আমাদের রাইট অনরেবল বৈকুণ্ঠ নাথ বিষ্ণুদেব ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছেন। নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্য দেবই তাহার প্রমাণ। বিষ্ণু এই পাণ্ডু রোগের ভয়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ক্ষিরোদ বাসেই কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ইহাতে কেরাণীবর্গের মহাপাপ সঞ্চার হইতেছে। অতিরিক্ত কাগজ ব্যয় জন্য মহামান্য মহাদেবের গাত্রে আর চিক্কনতা নাই। তাহাই ঢাকিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা গাত্রে ভস্মলেপন করিয়া শ্মশানে বাস করেন। শিবের ঈদৃশ অবস্থা সংঘটন জন্য কেরাণীগণের আরও পাপ সঞ্চারিত হইতেছে। আর কেরাণীগণের জন্য লোক পিতা-মহ ব্রহ্মার যে কত দূর ক্লেশ হইয়াছে, তাহা আমি এক মুখে বলিয়া উঠিতে পারি না। তাহাদের জন্য ব্রহ্মা চলৎ শক্তি হীন হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেরাণারা ব্রহ্মার বাহনের ক্রমাগত পক্ষচ্ছেদ করিয়া তাহাদি-গকে এককালে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছে। ইহা কি সাধারণ পাপ সঞ্চারের বিষয়! এই সকল পাপেই তাহারা এত কষ্ট ভোগ করিতেছে। যত দিন তাহারা স্বাধীন বৃত্তি অব-লম্বন করিতে না পারিবে, তত দিনে তাহাদের এসকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। এই সকল কারণেই আমি আবেদন অগ্রাহ্য করিতে কহিতেছি। মহামান্য বিচারপতিগণ আমার প্রদ-র্শিত কারণ কলাপ উত্তমরূপে বিবে-চনা করিয়া দেখিলে কখনই আবেদ-নের অনুকূল আদেশ প্রদান করিবেন না। অনেকে কহিবেন, এখন অধি-কাংশ কেরাণী লৌহ লেখনী ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু সে লেখনী অপরজাতি দ্বারা প্রস্তুত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহারা সকল বিষয়ে স্বাধীন ভাব ধারণ করিতে না শিখিলে কখনই উন্নতি হইবে না। এক্ষণে মহামান্য বিচারপতিগণ সমগ্র অবস্থা

বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন।”

বক্তৃতা শেষ হইল, বিচার পতিগণ টিফিন করিতে কক্ষান্তরে গমন করিলেন। সকলেই সমুৎসুকে তাঁহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পনেরো মিনিট বিশ্রামের পর বিচারপতিগণ আসিয়া বিচারাসনে বসিয়া নিম্নমত আদেশ প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন ;—

“আবেদনের বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর বলিয়াইআমরা সকলেথাকিয়া ইহার বিচার করিলাম। কার্য্যকারণ ভাবের সামঞ্জস্য দর্শনে আমাদের এমন প্রতীতি হইতেছে যে এখনও কেরাণীদিগের উন্নতির সময় হয় নাই। জাতীয় গৌরব রক্ষায় তাহাদের যত্ন নাই, যে পরিমাণে সেই যত্ন হইবে, সেই পরিমাণেতাহাদের উন্নতি হইবে। এই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত। আর যখন দেখা যাইতেছে যে তাহাদের দ্বারা সুরলোকের কিছু কিছু ক্ষতি হইতেছে, তখন আমরা এই আদেশ করিতেছি যে তাহারা অভিমান শূন্য হয়ে বিবিধ উপায় দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে তাহাদের উদরান্নের জ্বালা যাইবে না। অতএব আবেদন অগ্রাহ্য করা গেল।”

বিষ্ণু কহিলেন —“আই কন্‌কর্‌।”

শিব কহিলেন —“ডিটো।”

যবনিকা পতন।

আর্য্যজাতির ভূ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

“কমঠ ও বাসুকী প্রভৃতি এক একটী পার্থিব স্তরের নাম,—একথা যাহার মুখ হইতে নির্গত হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অনেকেই হাসিবেন। হাসুন, আমরা মনোভাব চাপিয়া রাখিতে পারিব না।

আদি স্তরের নাম কূর্ম্ম বা কমঠ, দ্বিতীয় স্তরের নাম বাসুকী বা শেষ সর্প। পুরাণোক্ত কচ্ছপ ও সর্পফণাকে যে আমরা বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কল্পান্তসৃষ্টির আধার অর্থাৎ স্তর বিশেষের সহিত সমন্বয় করিতেছি, তাহার কারণ কেবল কৈমুতিক ন্যায়। যে পুরাণ, বেদ ও স্মৃতির কনিষ্ঠ,তিনি যে জ্যেষ্ঠের “আকাশ ইতি হোবাচ” এ কথা জানিতেন না, এমত বোধ হয় না। বিশেষতঃ যে দেশের লোকেরা “ভোজন কৌতর বাচা নিত্যং, হরিনামাংসক ভাজাসত্যং, ভাতে ব্যঞ্জন নানাকেশে, শেষে দুগ্ধোদধি সন্দেশে,” এবংবিধ শ্লিষ্ট শ্লোক রচনা করে, সে দেশের

ঋষিরা যে ও রূপ উৎপ্রেক্ষা বা রূপক বর্ণন করিবেন আশ্চর্য্য কি ?—উৎপ্রেক্ষা বা রূপক বর্ণনায় রুচি হওয়া বা তাদৃশ বর্ণনায় শ্রোতৃবর্গের মনোমগ্ন হওয়া, এ সকল ভারতবর্ষের জল বায়ুর মহিমা। ভারতের প্রকৃতি যে সমধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি ও রূপ বর্ণন-রুচি অদ্যাপি ভূরি পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

অথবা পুরাণের ও রূপ অংশ সকল মিথ্যা। একথায় আপততঃ অনেকের অসন্তোষ জন্মিতে পারে, কিন্তু উহা আমাদের উদ্ভাবিত কথা নহে। পুরাণ-লেখক ব্যাস দেব স্বয়ং বলিয়াছেন "পুরাণের উপকথাংশ অনেক মিথ্যা।" যথা—

"কথা ইমাস্তে কথিতামহীয়সাং
হিতায় লোকেষু যশঃপরেযুষাং।
বিজ্ঞান বৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভোঃ
বচোবিভূতির্ণব পারমার্থ্যম্।"

(ভাগবত ১১ স্কন্দ)

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন, "মহারাজ! আমি তোমার নিকট পরলোকগত যে সকল মহদ্ব্যক্তির কথা প্রসঙ্গে যে নানা বিচিত্র কথা বলিলাম, তাহা কেবল জ্ঞান ও বৈরাগ্য উৎপাদন নিমিত্তই বলিলাম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির উপদেশ অংশ ব্যতীত অন্য বিস্তৃতাংশ যে সমস্তই সত্য তাহা মনে করিবেন না।"

যদ্যপি ভাগবতের কথায় তাদৃশ শ্রদ্ধা না হয়, তবে মহর্ষি জৈমিনির কথায় মনোযোগ কর। জৈমিনি বেদবাক্য সকলের যথাশ্রুত অর্থজাতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ কালে বলিয়াছেন "বিরোধে গুণবাদং স্যাৎ।" (মীমাংসা সূত্র) প্রত্যক্ষ বা যুক্তিবিরুদ্ধ বেদাংশ গুলি গুণবাদ অর্থাৎ উপদিষ্ট বিষয়ের প্রশংসা বা নিন্দাবচন মাত্র।

মীমাংসকাচার্য্য ভট্ট কুমারিল স্বামীও বলিয়াছেন,

"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদেব ধারিতে।
ভূতার্থবাদ স্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধামতঃ।"

শাস্ত্রীয় বাক্য সকল দুই শ্রেণীভুক্ত। বিধি ও অর্থবাদ। উপদেশাত্মকবাক্যের নাম বিধি; আর, বিধির প্রশংসা বা নিষেধের নিন্দা প্রতিপাদক অংশের নাম অর্থবাদ। এই অর্থবাদ আবার ত্রিবিধ। গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। প্রত্যক্ষ বা যুক্তিবিরুদ্ধ হইলে তাহা গুণবাদ অর্থাৎ তদ্দ্বারা কেবল বিহিত বিষয়ের প্রশংসা করা হয় এই মাত্র বুঝিতে হইবে। প্রমাণান্তরে অবধারিত বিষয় ঘটিত হইলে তাহা অনুবাদ। যাহার অবধারক প্রমাণ উপস্থিত নাই, অথচ প্রত্যক্ষ বা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে, তাহা ভূতার্থবাদ নামে প্রসিদ্ধ। এই ভূতার্থবাদ নির্ম্মিত আখ্যায়িকা বস্তু নির্ণয়ই সত্য, তদ্ভিন্ন অসত্য। অতএব ঋষিরা যখন প্রমাণ

বিরুদ্ধ শাস্ত্রাংশকে অলীক জ্ঞান করিতে অনুমতি দিতেছেন, তখন আমরা তাহা কি অস্বীকার করিব ? ফল এতাবতা বলার অভিপ্রায় যে কূর্ম্ম ও শেষ সর্প রচনায় পূর্ব্ব কথিত গূঢ়াভিসন্ধি নিহিত থাকিলেও থাকিতে পারে।

অধুনাকালের ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, "পৃথিবীর অন্তরালে উপর্য্যুপরি ক্রমশঃ স্তর চতুষ্টয় সংস্থাপিত আছে। প্রথম স্তর অঙ্গার ময়, দ্বিতীয় চূর্ণ বীজময়, তৃতীয় বালুকাময়, চতুর্থ মৃত্তিকাময়।" প্রদর্শিত বাসুকী কূর্ম্ম ঘটিত অস্মদীয় কল্পনা যদি পুরাতন আর্য্যদিগের মর্ম্ম গামী হইয়া থাকে, তবে, তম্মতে তিনটি মাত্র স্তর হইতেছে। যদি "প্রথমে আধার শক্তি, তৎপরে কূর্ম্ম, তৎপরে শেষ নাগ" এই বাক্যস্থ আধার শক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া স্তর সংখ্যা নির্ণয় করা যায় তাহা হইলে আর্য্যদিগের মতেও পৃথিবী চতুঃ-স্তর বিশিষ্টা হয়। ফল, আর্য্যজাতির লোপাবশিষ্ট গ্রন্থ অদ্যাপি যে কিছু বর্ত্তমান আছে, তত্তাবতের মধ্যে ইহার কোন বিশেষ নির্ণয় দেখিতে পাওয়া যায় না। ফল, পৃথিবী যে বহুবিধ স্তর দ্বারা পরিবেষ্টিতা, তাহার আভাস পাওয়া যায়। "যদপাংশর আসীৎ স সমহন্যত।" (আরণ্যক) যাহা জল সমূহের শর তাহাই সংহত অর্থাৎ জমাট হইয়া পৃথিবী হয়। এতাবতা যতবার জল প্লাবন ঘটিয়াছে ততবারই সেই সকল জলের শর (মথিত সার) সংহত হইয়াছে বলা হইল; সুতরাং ততগুলি স্তরও বলা হইল। স্তর সত্ত্বার বিষয় এতদপেক্ষা স্পষ্ট প্রমাণ আগম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যথা —

"ম্লেচ্ছকন্দো যথা ত্বগ্‌ভির্বহুভিঃ পরিবারিতঃ
স্বোদ্ভূতৈ র্বহুভির্দেবী স্তরৈরেষা ব্যবস্থিতা।"

(ব্রহ্ম যামল)

ম্লেচ্ছ কন্দ (পলাণ্ডু বা লশুন) যেমন অনেক গুলি ত্বক্ দ্বারা ক্রমশঃ পরিবেষ্টিত, সেইরূপ, এই পৃথিবী দেবীও স্বীয় অবয়বীভূত বহুবিধ স্তর দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

বিদেশীয় পণ্ডিতেরা যাহা স্তরোৎপত্তির কারণ স্থির করেন, সে কারণ আর্য্যশাস্ত্রেও লক্ষিত হয়। অর্থাৎ, "পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার পূর্ব্বে, পূর্ব্বকালে বহুবার জল প্লাবন ও পুনঃ পুনঃ অগ্নি সঞ্চার হওয়াতে পৃথিবীর গাত্রের উপরিভাগ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়া স্তর সকল উৎপন্ন হইয়াছে।" আর্য্যেরাও এই বর্ণন করিয়াছেন। উহা প্রলয় বা কল্পান্ত নামে প্রসিদ্ধ। যথা,—

"শতবর্ষান্যনাবৃষ্টি র্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি।
তৎকালোপচিতাষ্ণাকো লোকান্ ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি।

পাতালতল মারভ্য সঙ্কর্ষণ মুখানলঃ।
দহন্নূর্দ্ধশিখো বিশ্বং বর্দ্ধতে বায়ুনেরিতঃ।
সম্বর্ত্তকো মেঘগণো বর্ষতিস্ম শতং সমাঃ।
ধারাভি র্হস্তিহস্তাভি লীয়তে সলিলে বিরাট্।”

(ইত্যাদি ভাগবতে দেখ)

অর্থ এই যে, প্রলয়ের প্রারম্ভে পৃথিবীতে প্রথমতঃ শত বৎসরব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইবে। অনন্তর আদিত্য অতি উষ্ণ কিরণ বিস্তার করত লোকত্রয় সন্তপ্ত করিবেন। তৎপরে পৃথিবীর অধস্তল হইতে সঙ্কর্ষণের (প্রলয় কারী ঈশ্বর) মুখানল সমুত্থিত বায়ু দ্বারা সর্ব্বত্র প্রসৃত স্বীয় শিখাছায়া সমুদায় পৃথিবী দগ্ধ করিবে। পরিশেষে প্রলয় কারক মেঘ জলে সমুদ্রিত হইয়া করিকরাকার জল ধারা বর্ষণ করত এই ব্রহ্মাণ্ডকে জল মগ্ন করিবে। এইরূপ প্রলয় অনেকবার হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। (কোন মতে বর্ণিত আছে যে সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া পৃথিবীকে জলমগ্ন করে।)

মহাভারতের বনপর্ব্বে অপর এক প্রলয় বর্ণন আছে, তাহাও প্রায় এই রূপ।

ইয়ুরোপীয় ভূতত্ত্ববেত্তারা আরও এক কথা বলেন। “উক্ত চতুর্ব্বিধ স্তর ভিন্ন অগ্নি দগ্ধ প্রস্তর খণ্ডও অভ্যন্তরে অনেক আছে। তৎসমূহকে আগ্নেয় প্রস্তর বলিয়া থাকেন।” ফলতঃ ইহাও আর্য্যশাস্ত্রের বহির্ভূত নির্ণয় নহে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিবিধ ধাতু থাকার কথা পৃথুরাজার পৃথিবীদোহন প্রস্তাবে আছে। উষ্মতা দ্বারা ভূমির অভ্যন্তরস্থিত মৃত্তিকা বিকৃতা হইয়া বিবিধ ধাতুর আকার প্রাপ্ত হয়; ইহা দার্শনিকদিগের মধ্যে বিজ্ঞাত আছে। আগম শাস্ত্রে এই বিষয়টি বিশেষ রূপে ব্যক্ত আছে। যথা ;—

“ভূমেরন্তর্গতে দেবি! তেজোঽম্বুশ্বসনৈঃ।
বিকুর্ব্বদ্ভিঃ প্রজায়ন্তে বহুবো ধাতবঃ শিরেঃ॥
তৈরেব চাল্যতে ভূমিরূর্দ্ধমুৎক্ষিপ্যতে ক্বচিৎ।
উৎপদ্যন্তে মহাসারা ভূধরাঃ কাপি সুব্রতে!”

(ব্রহ্মযামল।)

অর্থাৎ হে দেবি! অন্তর্গত পার্থিব তেজঃ জল ও বায়ু, ইহারা মৃত্তিকাকে বিকৃত করিয়া বিবিধ ধাতু উৎপন্ন করে। তদ্দারাই পৃথিবী কখন পরিচালিতা, কখন বা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্তা হন এবং কোন স্থান হইতে মহাসার পর্ব্বত সকল উৎপাদন করেন।

আর্য্যজাতির এই আগম বার্ত্তা দ্বারা ভূকম্পের পুষ্কল কারণও সুব্যক্ত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত যে কিছু বলা হইল, তদ্দারা পৃথিবীর উপাদান, সংস্থান, প্রকৃতি, শক্তি ও তদন্তর্গত পরিচয় প্রকাশ হইল। এক্ষণে তদীয় আকার প্রকার, পরিমাণ ও জল স্থল বিভাগের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

ক্রমশঃ।

মাধবমালতী।

(উদাসিনী গীতিকাব্য লেখক প্রণীত)

প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দে ইলাইসা ও আবিলার্ড ফ্রান্স দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতিশয় প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে, ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ও বক্তৃতা বিষয়ে আবিলার্ড সে সময়ের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইলাইসাও ধনে, মানে, রূপে ও গুণে তাদৃশ অদ্বিতীয়া ছিলেন। তিনি পিতৃহীনা হইলেও তাঁহার পিতৃব্যের বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিলেন। নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া কেবল বিজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকাতে ইলাইসার পিতৃব্য আবিলার্ডের হস্তে সেই শিক্ষা ভার অর্পন করিলেন এবং আবিলার্ডও সাদরে সে ভার গ্রহণ করিলেন। তখন ইলাইসা সবে মাত্র যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতেছেন এবং আবিলার্ড যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন। উভয়ের মনেই ক্রমে ক্রমে প্রণয় সঞ্চার হইল, উভয়েই শেষে উন্মত্ত প্রায় হইয়া পড়িলেন। দেশময় কলঙ্ক প্রচার হইল। ইলাইসার পিতৃব্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অনন্যোপায় হইয়া উভয়কে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবিলার্ড একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত ছিলেন; এই পৌরহিত্যে উচ্চ পদবীপ্রাপ্ত হইবার পক্ষে বিবাহ একটী দারুণ প্রতিবন্ধক; সুতরাং আবিলার্ড বিবাহ বিষয়ে সম্মত হইলেও ইলাইসা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন "আমা হইতে আবিলার্ডের কোন রূপ মন্দ হইতে পারিবে না"। পরিশেষে ইলাইসার পিতৃব্য তাঁহাকে একটী কুমারিকাশ্রমে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেখানে আমরণ কুমারিকাব্রত ও ধর্ম্ম চিন্তায় তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হইবে। কিছুকাল পরে সে আশ্রম হইতে আবিলার্ড নির্ম্মিত প্যারাক্লিট নামক আশ্রমে তাঁহাকে থাকিতে হইল, এই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এদিকে আবিলার্ডের প্রতি ইলাইসার পিতৃব্য দারুণ অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে একটী অঙ্গহীন করিয়া দিলেন। আবিলার্ডও মনের কষ্টে একটী ধর্ম্মাশ্রমে আসিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাগিলেন। এখান হইতে তাঁহার এক বন্ধুকে আপন অবস্থা বর্ণন করিয়া তিনি একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্র ইলাইসার হস্তে পতিত হওয়াতে তাঁহার সমস্ত পুর্ব্বানুরাগ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সেই পত্রের উত্তর স্বরূপ তিনি আবিলার্ডকে কতকগুলি

পত্র লেখেন তাহা হইতে সারাংশ সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডীয় কবি পোপ একটী কবিতা রচনা করেন। সেই পত্রখানিতে ধর্ম্মভাব ও প্রেম ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতি উত্তম রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাই অবলম্বন এবং ইংরাজী নামের পরিবর্ত্তে মাধব মালতী নামে সমাবেশ করিয়া এই কবিতা লিখিত হইল।

এই যে গম্ভীর ঘোর নিভৃত বসতি—
যেখানে স্বর্গীয় চিন্তা সদা মূর্ত্তিমতি—
দুখের ভাবনা-রাজ্য বিস্তার যেখানে—
কেন আজ হেন ভাব কুমারীর মনে ?
কেন আজ অতিক্রমি এ নির্জ্জন স্থল—
সংসারের পানে চিত্ত ধাইছে কেবল ?
নির্ব্বাণ আছিল হৃদে দুরন্ত অনল,
কেনইবা আজ তাহা হইল প্রোজ্বল ?
এখনো এখনো যেরে ভাল বাসি তারে,
পেয়েছি নাথের লেখা এতদিন পরে,
ত্যেজেছি ত্যেজেছি বটে সংসার আশ্রম,
তবুও নাথের নাম করিব চুম্বন,
অয়ি দয়িতের নাম ! অমৃত ভবন—
(যে নাম অভাগী চিত্ত-বিকার-কারণ)
রহ রহ অপ্রকাশ চির দিন তরে,
আর যেন ও নাম না বদনে নিস্বরে !
হৃদয় ! লুকায়ে তাহা রাখো হৃদি মাঝে,
নাথের প্রতিমা যথা বিভুসহ রাজে !
লেখনি ! লিখনা তুমি বল্লভের নাম,
অন্তরে অঙ্কিত তাহা আছে অবিশ্রাম !
বরঞ্চ তোমরা, ওহে নেত্র অশ্রুজল !
ধুয়ে ফেল সেই নাম-নিবাও অনল !
বৃথা এ বাসনা হায় ! লেখনী আমার
হৃদয়ের আজ্ঞামতে লিখিছে আবার—
অয়ি নিরদয় উচ্চ প্রাচীর নিকর !
পশেনা সূর্য্যের রশ্মি যাহার ভিতর,
স্বেচ্ছাবশে কুমারীরা আসি যেই স্থল
অনুতাপ অশ্রুবারি ফ্যালে অবিরল,
অয়ি সুবন্ধুর খর্ব্ব পর্ব্বত নিচয়
দেব পূজা করে যথা ঋষি সমুদায়,
অয়ি কুঞ্জবন কুল, কন্দর সকল,
ভীষণ কণ্টকাবৃত সদা যেই স্থল—
হে মঠ মন্দির বৃন্দ ! ঈশ্বর পূজায়—
যেখানে কুমারীকুল যামিনী কাটায়,
অয়ি দেব ঋষি কুল ! দয়ার্দ্র হৃদয়—
যাঁদের প্রতিমা হ'তে অশ্রু যেন বয়,
যদিও বসতি মম তোমাদের সাথে,
ওই মত স্থির ভাবে আছি মৌন ব্রতে,
যদিও উদাস চিত্তে থাকি সর্ব্বক্ষণ,
তবুও পাষাণময় হয় নাই মন !
কেদিবে সমস্ত হৃদি ঈশ্বরের লাগি,
স্বভাবে করেছে নাথে অর্দ্ধাংশের ভাগী !
বৃথা দেব আরাধনা, বৃথা উপবাস,
কিছুতেই প্রেমসাধ হলোনা বিনাশ !
কেনইবা হবে তাহা ? —চির দিন তরে—
এত যে কেঁদেছি, তাকি বৃথা হতে পারে ?
ভয়ে ভয়ে তব লিপি করি উদ্ঘাটন,
তব নামে সব দুঃখ হইল স্মরণ,
আহা, মাধবের নাম-অমৃত আগার—
অথচ এ অভাগীর দুঃখের ভাণ্ডার—
এখনো ও নামে হয় আলোড়িত মন,
এখনো ও নামে করি অশ্রু বিসর্জ্জন,
আবার আমার নাম পত্রের মাঝারে
যখনি নেহারি, ভয়ে হৃদয় সিহরে,
না জানি কি অমঙ্গল আছে তার পর,
এই ভয়ে হৃদি মম কাঁপে থর থর !

প্রতি ছত্রে নেত্র ধারা অনর্গল বয়,
দুঃখের সাগর মাঝে সব দুঃখ ময়,
কভু জ্ব'লে ওঠে হৃদে প্রণয় অনল,
আকুলিত ক'রে তোলে হৃদয় চঞ্চল,
কভু বা বিঘোর এই অন্ধকার পুরে
যৌবনে জীয়ন্তে ম'রে থাকি হতাদরে !
কঠোর ধর্ম্মের ব্রতে পড়িয়ে এবার
প্রেম-সাধ,যশ-সাধ ঘুচিল আমার !
হোক হোক যা হবার অদৃষ্টের ঘোরে,
তুমি কিন্তু সব খুলে লিখো নাথ মোরে,
তোমার অশ্রুর সনে অশ্রু বিসর্জ্জিব,
তোমার দুঃখের শ্বাসে শ্বাস মিশাইব,
শক্রতে, অদৃষ্টে নারে করিতে তা লয়—
তা চেয়ে মাধব কিরে হইবে নির্দ্দয় ?
এক মাত্র অশ্রুজল আছয়ে সম্বল,
তোমারি কারণে তাহা ফেলিব কেবল,
এখন এ নেত্রদ্বয় কি আর করিবে,
পড়িবে পত্রিকা আর অশ্রু বিসর্জ্জিবে।
দাও নাথ দাও তবে তব দুঃখ ভার,
তা বই সান্ত্বনা মম কিছু নাই আর,
কেনইবা ও দুঃখের অংশ মাত্র লব ?—
দেও হে সমস্ত দুঃখ অনাসে তা বব।
দুর্ভাগার দুঃখ দূর করণ আশায়,
প্রথমে লেখার সৃষ্টি হইল ধরায়,
নির্বাসিত প্রণয়ীর একই সম্বল,
রুদ্ধ রমণীর সুখ লেখাতে কেবল,
অনুরাগ ভরে করে হৃদয় প্রকাশ,
চাতুরী ছলের তাহে থাকে না আভাস,
কুমারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রকাশে অনাসে
থাকে না ভয়ের লেশ, লাজ নাহি বাসে
হৃদে হৃদে প্রেমালাপে করায় স্থাপন,
দেশ দেশান্তরে করে বাসনা বহন।
তুমিত জানহে নাথ, প্রথমে কেমনে—
বন্ধুতার বশে প্রেম উপজিল মনে
দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইত তোমায়,
ঈশ্বরের প্রতিরূপ প্রকাশ ধরায়,
বিকচ নলিন-নিভ নয়নে তোমার
চপলা খেলিছে জ্ঞান হইত আমার !
দেখিতাম তব শোভা নিষ্কলঙ্ক মনে,
প্রণয়ের লেশ মাত্র জানিনা স্বপনে,
অমরো সংগীত তব শুনিত শ্রবণে,
সুমধুর শাস্ত্র ব্যাখ্যা ক্ষরিত রসনে,
ও মুখে শুনিলে ব্যাখ্যা যায় কি বিফলে,
বিশ্বাস সহজে যেন হৃদয়ে উথলে—
উপদেশে উপজিল এই জ্ঞান পরে,
প্রণয়ে পাপের গন্ধ কভুনা সঞ্চরে !—
অমনি ইন্দ্রিয় পথে আসিলাম ফিরে,
কল্পনার কত সুখ থাকে যেন ঘিরে,
কখন দেবতা হ'তে চাহিনে তাহায়
মানুষ ভাবেতে আমি বরিয়াছি যায় !
ঋষিদের স্বর্গ সুখ তাও তুচ্ছ করি,
চাহিনে ত্রিদিব ধাম তোমারে পাশরি !

ক্রমশঃ

ভূতত্ত্বরহস্য।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

আমরা জগতে যে কিছু প্রত্যক্ষ করি, তাহা কিছুই সমস্থায়ী নয়। সকলই পরিবর্ত্তনশীল। প্রতি দিনে, প্রতি মুহূর্ত্তে দ্রব্য সমস্ত পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করিতেছে। অদ্য যাহা পরম সুন্দর, কল্য হয়ত তাহা অত্যন্ত বিরাগ জনক। এবম্বিধ পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা পৃথিবীর ধর্ম্ম। হয়ত একদিনের পরিবর্ত্তন সমস্ত আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু ১ মাসের, ১ বৎসরের বা ৫ বৎসরের পরিবর্ত্তন আমাদের অগোচর না থাকিতে পারে। আমাদের অধিষ্ঠান-ভূতা বসুমতী কত কাল সৃষ্ট হইয়াছে তাহার স্থিরতা কি? পুরুষপুরুষানুক্রমে আমরা এই পৃথিবীতে বাস করিতেছি, পৃথিবীর সাধারণ সামগ্রী সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া সম্ভোগ করিতেছি, ইহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শস্য সমুৎপাদনের যত্ন করিতেছি, খনন করিয়া জলাশয় করিতেছি, আর কত কি করিতেছি, তাহা কি লিখিয়া শেষ করা যায়। কেবল অদ্য নয়, অবধি মনুষ্য পৃথিবীর উপর ঘোরতর দৌরাত্ম্য করিয়া আসিতেছে। মনুষ্য মরিতেছে,—নুতন নুতন মনুষ্য তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে; পৃথি- বক্ষের উপর রাজ্য সমস্ত ধ্বংস হইতেছে; রাষ্ট্র বিপ্লবে স্বর্গপুরী শ্মসানবৎ হইতেছে; রোগে, শোকে, দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে;—কিন্তু এ পৃথিবীর কি কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না? ইহা কি চিরদিন সমভাবে রহিয়াছে? বিজ্ঞান বলে ভূতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিত বলিতেছেন, — না, পৃথিবী-শরীরে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বের বসুমতী ও আজিকার বসুমতী অনেক বিভিন্ন হইয়াছে। সে বৈষম্য পৃথিবীর প্রকৃতি ও উপাদান গত নহে। যে যে উপাদান সম্মিলনে পৃথিবীর জন্ম, তাহারা তাহাই আছে, তাহার অন্যথা হয় নাই, হইবে কি না সন্দেহ। যে উত্তাল ঊর্ম্মিমালা-সঙ্কুল জলরাশি অদ্য পৃথিবীর উপকূল সমস্ত বিধৌত করিতেছে, পূর্ব্বেও তাহারা তাহাই করিত; যে প্রচণ্ড বাত্যা অদ্য প্রকাণ্ড মহীরুহ সমূলে উন্মূলিত করিতেছে, পূর্ব্বে তাহা তাহাই করিত। তৎসম্বন্ধে কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই; সে সকল চিরন্তন ধর্ম্ম অবিকৃত আছে। অদ্য যে স্থান জন কোলাহল ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন, পূর্ব্বে হয়ত সে স্থানে ঘনারণ্য ছিল; অদ্য যে স্থান ভয়ানক অরণ্য সমাচ্ছন্ন, পূর্ব্বে হয়ত তথায় ঘোর সিন্ধু বিরাজ করিত; অদ্য যে স্থানে গভীর সিন্ধু

বারি কল্লোল করিতেছে, পূর্ব্বে হয়ত সে স্থানে অভ্রভেদী গিরিরাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৃথিবীর যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা ঐরূপ। পৃথিবীর উক্তবিধ পরিবর্ত্তন জন্য তদুপরিস্থ বৃক্ষ,লতা, জীব, জন্তু প্রভৃতিও যথেষ্ঠ পরিবর্ত্তন প্ররিগ্রহ করিয়াছে। অদ্য যে মনুষ্য স্বর্গের বিদ্যুৎ ধরিয়া স্বীয় দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে, যে মনুষ্য অধুনা পার্থিব পদার্থের উপাদান-ভূত ভূত সমস্তকে ভৃত্যরূপে যথেচ্ছা কার্য্যে বিনিযুক্ত করিতেছে; যে মনুষ্য অধুনা স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতাবলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীব সমস্তকেও স্বকীয় আয়ত্বাধীনে আনিতেছে; যে মনুষ্য অসামান্য বুদ্ধিবলে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের উপর অবিসম্বাদী প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে; যে মনুষ্য বুদ্ধিবলে পৃথ্বিতলে নন্দন কাননের কল্পিত সুখ সমস্ত সম্ভোগ করিতেছে—বলিতে বিস্ময় জন্মে—পূর্ব্বে পৃথ্বিরাজ্যে সেই অসীম ক্ষমতাশালী মনুষ্য জাতির অস্তিত্ব ছিল না। পূর্ব্বে পৃথিবীতে মনুষ্য ছিল না। সেই নক্ষত্র পুঞ্জ সম্বেষ্টিত শশধর পূর্ব্বেও সুস্নিগ্ধ কর বর্ষণ করিয়া জাগতিক জীবগণের সন্তোষ বিধান করিত; সেই দিবাকর খরতর কিরণে পৃথিবী দগ্ধ করিত; সেই জলধরগণ অযাচিত হইয়াও বারিবর্ষণ করিয়া জগতের শীতলতা সম্পাদন করিত; সেই সৌদামিনী মেঘমধ্য হইতে দেখা দিয়া মেঘান্তরালে লুকাইত; সেই সুস্নিগ্ধ মলয়মারুত জীব দেহে বায়ু ব্যজন করিত; কিন্তু তখন মানুষ ছিল না। মানুষ ছিল না, হইয়াছে, এখন আছে, আবার যাইবে কি না কে জানে? এখন এমন অনেক জীব পৃথ্বিরাজ্য বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের স্বত্বা পুর্ব্বে ছিল না। এমন অনেক জীব পৃথিবীতে পূর্ব্বে বাস করিত যাহাদের অস্তিত্ব ও স্বতা এক্ষণে কল্পনা বা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অকাট্য যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই বিশ্বাস করিবে যে, সে সমস্ত উন্মাদ বিজৃম্ভিত প্রলাপ বা কবি কল্পনা বিরচিত আকাশ কুসুমবৎ অলীক নহে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবী যে কঠিনাবরণে আবৃত্ত প্রস্তর তাহার মূল। সেই মূল প্রস্তরের উপর স্তরে বহুবিধ প্রস্তর কাল ক্রমে সংস্থাপিত হইয়াছে। তদুপরি অঙ্গার, কর্দ্দম ও ভিন্নবিধ প্রস্তরাদি অবশেষে তৃণ শস্য সম্ভবোপযোগী মৃত্তিকাবরণ আবরিত হইয়া পৃথিবী এই রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ আবরণ স্তর সমস্ত বিজ্ঞান প্রিয় ভূতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু জনগণের পরিদর্শনার্থ, ভুমণ্ডলে বৃক্ষ,লতা, জীব

জন্তু প্রভৃতির উৎপত্তি, স্থিতি, ও বিনাশ বিষয়ক প্রমাণ সমূহ বহন করিতেছে।

এই সকল স্তরমধ্যে, বিবিধ সময়াগত পৃথিবীস্থ উদ্ভিদ ও প্রাণী সমস্তের দেহাবশেষ অবিকৃত ভাবে পরিরক্ষিত রহিয়াছে। আনস্টেড্ স্বপ্রণীত ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "প্রাণী ও উদ্ভিদ সমস্তের অবশেষ যে কত প্রকার ও তাহার সংখ্যা যে কত তাহা নির্ণয় করা দুর্ঘট। কখন বা কঠিন প্রস্তর-স্তরের মধ্যে অতি কোমল, অতি রমণীয় কোন জীব দেহ অবিকৃত ভাবে রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কখন বা কোন জীবের দন্ত অস্থি প্রভৃতি অবিকল স্বাভাবিক ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবের চর্ম্ম, চক্ষু এমন কি ভ্রমণ কালে কর্দ্দমোপরি তাহার যে পদ চিহ্ন নিপতিত হইয়াছে, এবং তাহার পাকস্থলীস্থ খাদ্য যেরূপ ভাবে জীর্ণ হইতেছে, ও তাহার অসার অংশ যে রূপে উদরের অন্যত্র রহিয়াছে, তৎসমস্ত অবিকল দেখিতে পওয়া যায়; বোধ হয় যেন কয়েক হোরা পূর্ব্বে মৃত্যু তাহার জীবনের বিনাশ সাধন করিয়াছে। মৎস্য দেহের এমন অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার একখানি অস্থি, একটী কাঁটাও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই; আবার সেই স্তরে সেই জাতীয় জীবের কেবল মাত্র বহিঃকঙ্কাল ও অসংলগ্ন অস্থি দৃষ্টিগোচর হয়। পতঙ্গ,—এমন কি তাহার পক্ষস্থিত ক্ষুদ্র শিরা সকল প্রস্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শম্বূকাদির আকৃতি ও বর্ণ পর্য্যন্ত অবিকল পরিরক্ষিত রহিয়াছে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ভ্রান্তিমূলক কুসংস্কার আছে যে, জগতের সকলই মনুষ্যের সন্তোষসাধনার্থ জাত, সেই মনুষ্য যখন জন্ম পরিগ্রহ করে নাই তখনও পৃথিবীস্থ জীববৃন্দ নয়ন-মন-রঞ্জন বর্ণে পরিশোভিত ছিল।" স্তর মধ্যস্থ এবম্বিধ দেহাবশেষ সকল ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত সমূহের অকাট্য যুক্তি।

অতি প্রাচীন কালে, যখন আবরণ প্রস্তরের প্রথম দশা, তখন পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ ছিল না। প্রথম স্তর মধ্যে কোন জীব দেহাবশেষ বা উদ্ভিদ অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রথমে পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্ট হয় নাই। এই বিশাল মহান্ মেদিনী তৎকালে প্রাণী শূন্য ছিল! ভৌতিক যাবতীয় কার্য্য তখনও অব্যাঘাতে চলিত। এখনও পৃথিবীর যে সকল স্বাভাবিক শক্তি আছে তখনও তাহাই ছিল, কিন্তু তখন পৃথিবীতে জীব ও উদ্ভিদ ছিল না। তখনকার দুর্ব্বিসহ আতপ তাপে ক্লান্ত

হইবার পথিক ছিল না, প্রশান্ত ভাবে বৃক্ষ শাখা সমাসীন হইয়া কূজন করিবার পক্ষী ছিল না, নিদারুণ শীত ভীত হইয়া আশ্রয় মধ্যস্থ থাকিবার জীব ছিল না, এক জীবের ভয়ে অপর জীবের ব্যাকুলতার কোন কারণই ছিল না; সংসার শান্ত ও শূন্য ছিল। তখন ঊষার সমাগমে কেহই আহ্লাদিত হইয়া উঠিত না, দিনমণির অস্তগমন কালে পশ্চিমাকাশের মনোহর ভাব দেখিয়া কেহই মোহিত হইত না, সন্ধ্যা সমাগমে রজনীর ঘোর তমসাবরব স্মরণ করিয়া কেহই ভয় বিকলিত হইত না। দারুণ শিলাবৃষ্টিতেও কেহ কাতর হইত না। গগনমণ্ডলে ইরম্মদ সন্দর্শনেও কাহার হৃদয় ভয় চকিত হইত না, অশনি সম্পাতেও কেহ ব্যাকুল হইত না; পৃথিবীর সেই এক দিন গিয়াছে! সে সময়ের অবস্থা ভাবিয়া উঠা যায় না, মনে স্থান দেওয়া যায় না, কবির কল্পনা তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করে। জীব ছিল না, সুতরাং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য, লোভ-কাম-ক্রোধ প্রভৃতি জীবগণকে উত্ত্যক্ত করিবার কারণ ছিল না। হায় সেই এক দিন! ভাবিলে হৃদয় অস্থির হয়। সেই জীব শূন্য, সেই বৃক্ষ লতাদি পরিশূন্য, সাগর বারি পরিবেষ্টিত, প্রস্তর কঙ্কর পরিপূর্ণ, শ্মশান ভূমিবৎ মেদিনী মধ্যে এক জন, কেবল এক জন মাত্র মনুষ্য যদি আবির্ভূত হইত, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের অবস্থা কি হইত, পাঠক তাহা ভাবিয়া দেখ। দুর্ব্বিপাক বশতঃ জুয়ান ফরনানডেজ দ্বীপে রবিন্সন ক্রুশোর অবস্থান স্মরণ করিয়া ও তাঁহার ক্লেশের কথা শুনিয়া মন দারুণ উদাস হইয়া উঠে। তথাপি তথায় মনুষ্য ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি ছিল। এই পূর্ব্বকালের পৃথিবী রূপ ফারনানডেজে যদি সহসা এক জন রবিন্সনের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে তাহার অবস্থা কি ভয়ানক হইত!

আমরা প্রসঙ্গতঃ মূল প্রস্তাব হইতে অধিক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা বিধেয়। প্রথমে ভূমণ্ডলে জীবনিবাশ ছিল না। ক্রমে ক্রমে, যুগ যুগান্তর পরে, একে একে, পৃথিবী এই অসংখ্যবিধ জীবের অধিষ্ঠান-ভূতা হইয়াছে। একই দিনে পৃথিবীতে কিছুই হয় নাই। সকলেই কালক্রমে জন্মিয়াছে। অসম্ভব বিষয় দূরে থাকুক সম্ভব বিষয়ই কই এক দিনে হয়? এই মনোহর, নয়ন রঞ্জন, হর্ম্ম্যমালা সুশোভিত, উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দ পূর্ণ মহান্ পুরী কি এক দিনে গঠিত হইয়াছে? এই যে সামাজিক নিয়ম সমস্ত আমাদিগকে দাসবৎ করিয়া রাখিয়াছে

তাহারই উদ্ভব কি এক দিনে সংঘটিত হইয়াছে? এই যে অসংখ্য বিধ ধর্ম্ম প্রণালী অসংখ্য হৃদয় অধিকার করিয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাদিগের সৃষ্টি কি এক দিনে ঘটিয়াছে? এই যে ভূমণ্ডলে কোন কোন মনুষ্য জাতি উন্নতির উচ্চতম আসনে সমাসীন হইয়াছে তাহাই কি এক দিনে ঘটিয়াছে? না, এ সকল কিছুই এক দিনে ঘটে নাই, কিছুই এক দিনে ঘটিতে পারে না। তদ্রূপ পৃথিবীর যে কিছু নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা কখনই এক দিনে হয় নাই; যে কিছু বিলয়—ধ্বংস হইতেছে তাহাও এক দিনে হইতেছে না। পৃথিবীর এই যে বহুবিধ বৃক্ষ লতাদি, বহুবিধ জীব জন্তু,—তাহাদের জন্মও এক দিনে হয় নাই, ধ্বংসও এই দিনে হইবে না। ক্রমে ক্রমে জন্মিয়াছে, ক্রমে ক্রমে লয় পাইবে, জগতের এই নিয়ম।

ক্রমশঃ।

বিমলা।

উপন্যাস।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অবন্তীপুর গণ্ডগ্রামের দক্ষিণ সীমায় একটী সুপরিষ্কৃত সামান্য ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে একটী পরমাসুন্দরী ষোড়শী যুবতী বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছেন। তাঁহার অনিন্দ্য বদনে চিন্তার চিহ্ন প্রকাশিত, বিশাল লোচন-যুগল অশ্রুবারি পরিপ্লুত। ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি অসম্বদ্ধ—উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অংশে নিপতিত—গুচ্ছ-দ্বয় দ্বারা পরিণত বক্ষস্থল সমাবৃত। যুবতীর পরিধান একখানি অতি নির্ম্মল শ্বেত সাটী। তাঁহার হস্তে দুই গাছি স্বর্ণবলয়, কণ্ঠে সৌবর্ণ কণ্ঠী, কর্ণে হিরণ্ময় দুল বিলম্বিত। দেহে অন্য আভরণ নাই। যুবতীর বর্ণ ঊষার সৌর-কররাশির ন্যায়। বঙ্গাঙ্গনার দেহে তাদৃশ বর্ণ সম্ভবে না। যিহুদির বর্ণের সহিত তদীয় বিমল বর্ণের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নবীনার নেত্রদ্বয় বিশাল, আয়ত ও মনোহর। তাহা সলজ্জ মধুরভাবে পরিপূরিত। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বথা কমনীয়। অপূর্ব্ব যৌবনশ্রী তাঁহার বরবপুর সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত। সমস্ত অঙ্গই যথোপযুক্ত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত।

নবীনা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, তাহা অতি সামান্য, কিন্তু অতি পরিষ্কার। একখানি পরিষ্কার

শয্যাচ্ছাদিত খট্টায় যুবতী উপবিষ্টা, তাঁহার সম্মুখে লেখ্য সামগ্রী সমন্বিত একটী বাক্স। খট্টার সন্নিকটে একটী সুন্দর সিন্দুক। তদুপরি কতকগুলি বাঙ্গলা পুস্তকাদি,—ভিতরে কি আছে তাহা জানি না। সম্ভবতঃ তাহাতে নবীনার বস্ত্রাদি পরিরক্ষিত আছে।

নবীনার পত্র লিখন পরিসমাপ্ত হইল, তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র পরিমার্জ্জিত করিয়া লিপি মণ্ডিত করিলেন। ক্ষণেক চিন্তার পর তাহা পুনরুক্ত করিয়া পাঠ করিলেন। পরিশেষে একখানি আবরণে শিরোনাম লিখিলেন। লিখিলেন,— "শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমীপেষু—" লিপি সমাধা করিয়া তাহা বাক্সের উপর রক্ষা করিলেন।

পত্রিকা সমাপন করিয়া যুবতী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এই সময় তাঁহার পশ্চাদ্দিকস্থ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া একটী সুন্দর যুবক প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবক নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে খট্টা সন্নিধানে আগমন করিলেন। নবীনার চিত্ত তৎকালে বিষয়ান্তরে বিশেষ বিনিবিষ্ট সুতরাং তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। আগন্তুকের মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত, গম্ভীর, সতেজ ও রমণীয়। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল ও গৌর। নেত্রদ্বয় বুদ্ধির ও ঐশী প্রতিভার জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে; মস্তকের কেশ অব্যবস্থিত ভাবে নিপতিত। তাহা বিশৃঙ্খল, তৎপক্ষে যুবকের বিশেষ মনোযোগ আছে বলিয়া বোধ হয় না। দেহ উচ্চ ও পরিণত। অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈহিক শক্তির পরিচায়ক, তাঁহার বদনের ভাব তেজ ও নির্ভীকতা প্রকাশক। তাঁহার পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও আড়ম্বর পরিশূন্য।

যুবক আসিলেন, যুবতী তাহা জানিতে পারিলেন না। হয়ত জানিতে না পারাই যুবকের উদ্দেশ্য। কারণ তাঁহার গতি অতি ধীর ও মন্থর। আগন্তুক খট্টা সন্নিহিত হইয়া নবীনার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। নবীনার অবেনী সম্বদ্ধ কেশরাশি, তাঁহার কমনীয় কান্তি আচ্ছাদিত করিয়া অতি মনোহর ও স্বাভাবিক ভাবে নিপতিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে চিকুরদামের বিরল বিনিবেশ বশতঃ যুবতীর অতি মনোহর উত্তপ্ত বর্ণের আভা বিভাসিত হইতেছে। যেন নীল নভস্থলে তারাগণ সহ শশধর শোভা পাইতেছে, বা নীলাম্বুনিধি হৃদয়ে আলোকালয় (লাইটহাউস) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে অথবা নীল জলে অমল কমল ভাসিতেছে। যুবক সেই মনোহর শোভা অতৃপ্ত নয়নে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার চক্ষু নবীনার সম্মুখস্থ লিপির প্রতি পরিচালিত হইল। তিনি তাহার

শিরোনাম পাঠ করিলেন। তাঁহার বদনে ঈষদ্ধাস্যের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। পরক্ষণেই সে ভাব দূর হইল। যুবক অতি কোমল ও সস্নেহ স্বরে ডাকিলেন,—

"বিমলে—"

বিমলার চমক ভাঙ্গিল। তিনি ব্যস্তে ললাট নিপতিত কেশ স্তবক অপসারিত করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। সম্মুখস্থ যুবকের দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। তিনি ব্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করিলেন। লজ্জায় তাঁহার বদন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। লোচন যুগল মনোহর আবেশময় ভাব ধারণ করিল। অধর প্রান্তে ঈষৎ সলজ্জ হাসি দেখা দিল। কি মনোহর! কি নয়নরঞ্জন! যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, —

"বিমলে! এখানে একাটী বসিয়া কি ভাবিতেছিলে?"

পত্রের কথা বিমলার মনে পড়িল। তিনি পত্রখানি অপসারিত করিবার চেষ্টায় তাহা গ্রহণ করিলেন। যুবক জিজ্ঞাসিলেন,—

"ও কাহার পত্র বিমলা?"

বিমলা ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"ও কিছু নয়, তুমি বস।"

যুবক কহিলেন, —

"বিমলে! আজি তোমার এরূপ ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? তোমার সেই অপূর্ব্ব সরলতা, সেই মধুরভাব, আমার আগমনে সেই প্রফুল্লতা, আজি সে সমস্তের অন্যথা দেখিতেছি কেন? বিমল! আমি কি তোমার হৃদয় হইতে ক্রমশঃ অন্তরিত হইতেছি?" বিমলার বদনে সমধিক বিষাদ চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তিনি স্তব্ধপ্রায় হইয়া বলিলেন, —"না—না—অনেক ক্ষণ লেখা পড়ায় ব্যস্ত থাকায় কি জানি কি হইয়াছে।"

যুবক উপবেশন করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—

"বিমল! ও কাহার পত্র বলিলে না? না বলিলে; আমি বলিতে পারি।"

বিমলা একটু মধুর হাসি সহকারে বলিলেন,—

"বল দেখি কাহার পত্র?"

যুবক হাসিয়া বলিলেন, —

"যাহার পত্র সে চাহিতেছে, দেও"

যুবতী লজ্জা সহকারে পত্রী গোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুবক হাসিয়া কহিলেন,

"কেন গোপন করিতেছ? ও আমার পত্র আমি উহা দেখিব।"

যুবতীর মুখ শুকাইয়া গেল। কহিলেন,—

"কি দেখিবে, উহাতে কিছুই নাই।"

যোগেশ কহিলেন,

থাকুক বা না থাকুক,

আমার পত্র আমি দেখিব, ইহাতে তোমার আপত্তি কি ? '

বিমলা বলিলেন।

' তোমারই পত্র বটে। কিন্তু আর তোমাকে পত্র দিবার প্রয়োজন নাই।'

যোগেশ হাসিয়া বলিলেন,—

'কিন্তু পত্র যদি না দেও তবে উহার মধ্যে যাহা লিখিয়া তাহার মর্ম্ম আমাকে বল।'

বিমলা ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; বুঝিলেন একান্তে বসিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা বা যাহার উদ্দেশে তাহা লিখিত হইয়াছে. তাহাকেই তাহা পাঠ করিতে দেওয়া উভয়ই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার অন্তরে যেন কত যাতনা উপস্থিত হইতে লাগিল। কেন এরূপ হইল, কে জানে।

তিনি যেন হৃদয়স্থিত অনিবার্য্য মনঃক্ষোভ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া কহিলেন,

পত্রে যাহা আছে তাহার তোমার জানিয়া কাজ নাই।'

'যোগেশ বুঝিতে পারিলেন বিমলা বাক্য সমাপনের পর একটী অনতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যোগেশ দেখিলেন বিমলার মুখের ভাব অন্য রূপ। লজ্জার সহিত তাঁহার বদনে দারুণ বিষাদের চিহ্ন মিশ্রিত হইয়াছে। প্রণয়ীর হৃদয়ে এ ভার আঘাত করিল। যোগেশ বলিলেন,—

"বিমলে ! পত্রের কথায় যদি তোমার হৃদয়ে কোন রূপ ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকি, তবে ক্রুটী স্বীকার করিতেছি। যাহাতে তোমার অন্তরে কষ্ট জন্মে এরূপ কার্য্য সম্পাদন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। স্থির বিশ্বাস আছে এ জীবনে কখন সেরূপ মতি হইবে না। যদি পত্র দেখাইতে কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আর কখন এ মুখ হইতে, ও কথার উত্থাপনও শুনিতে পাইবে না। জিজ্ঞাসা করি—কোন আপত্তি আছে কি ?"

বিমলা নির্ব্বিঘ্ন ভাবে কহিলেন;—

" অতি সামান্য কথায় তুমি দুঃখিত হইও না। পত্র তোমার উদ্দেশেই লিখিত—তা তুমি দেখিবে—তা- -"

বিমলা আর বলিলেন না। যোগেশ বুঝিলেন স্ত্রী স্বভাব সুলভ, বিশেষ বিমলার ন্যায় রমণী চরিত্রগত, লজ্জা ভিন্ন অন্য আপত্তি কিছুই নাই। বিমলা তাঁহাকেই পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে তাহা দেখাইতে বা, তাঁহার নিকট তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অস্বীকার কেন, যোগেশ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল লজ্জাই কি ইহার কারণ? না, আর কিছু আছে। বিমলা তাঁহাকে কি লিখিয়াছেন? ভাবি-

লীন— লিপি মধ্যে হয়ত অশুভ সংবাদ আছে ; হয়ত সেই সংবাদ আমার বহু যত্ন পালিত আশা লতার মূলে কুঠারাঘাত করিবে, হয়ত সেই সংবাদ আমার সম্মুখে ভবিষ্যতের অন্ধকারময় অসুখ পূর্ণ দ্বার উদ্ঘাটিত করিবে। হয়ত সেই সংবাদ আমার সুখ-চন্দ্রিমা বিরাজিত হৃদয়-গগনে ঘোর অমানিশা উপস্থিত করিবে। এ সন্দেহ তাঁহাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। শুভ সংবাদ অপেক্ষা মনুষ্য নিয়ত অশুভ সংবাদ সম্বন্ধে অধিক চিন্তা করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জননী শয়নে, স্বপনে ভাবিয়া থাকেন, হয়ত তাঁহার প্রবাসগত প্রিয় পুত্র পীড়ায় কাতর হইয়াছে, তথায় এমন আত্মীয় কেহ নাই যে, তাহার ব্যাধি বিকলিত চিত্তের সান্ত্বনা করে বা ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা যথোপযুক্ত সুশ্রূষা করে। এবম্বিধ প্রিয়জন জন্য দুশ্চিন্তার সমধিক উদাহরণ ও প্রয়োগ স্থল প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ তাহা মনুষ্য হৃদয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। এই চিরন্তন ধর্ম্মই সন্দেহের মূল। ইহাই নায়ক নায়িকার হৃদয় নিকেতনে বিদ্বেষ বিষ সঞ্চারণের কারণ। এই মনোবৃত্তির শাখা প্রশাখা হইতে জগতে কত সময় কত লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। এই মন্দ সন্দেহই সেক্সপীরের "ওথেলো" নাটকের জীবন। তাঁহার অন্যান্য অধিকাংশ নাটকেও ইহার ছায়া আছে। এই মনোবৃত্তি রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্যের পদে পদে প্রকাশিত, অনেক সংস্কৃত কাব্য নাটকও ইহার সংশ্রব শূন্য নহে। বঙ্গীয় বিস্তর কাব্যে ইহার আভাস আছে।

যোগেশ আবার ভাবিতে লাগিলেন, হয়ত লিপি মধ্যে আমার ঈপ্সিত সংবাদ আছে। আশা, সংসার-সাগর স্থিত, বিপদ বাত্যা বিঘূর্ণিত তরণীর সুদৃঢ় কর্ণধার। আশার ছলনায় কে না ভুলে ? যে না ভুলে, জানিও তাহার হৃদয় প্রবাহে জোয়ার ভাটা নাই। তাহার হৃদয় গগনে অমানিশার অন্ধকার ভিন্ন পৌর্ণমাসীর শুক্ল স্নিগ্ধ আলোক কখন প্রকাশ পায় না। দারুণ যন্ত্রণা ও ক্লেশ রাশি পরিপ্লুত সংসার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যে একবারও আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যতের নিমিত্ত অননুভূতপূর্ব্ব সুখ সমস্ত কল্পনা করে নাই, নিশ্চয়ই সে সংসারের কিছুই জানে না। সে সংসারের কোন সুখই সম্ভোগ করে নাই। যোগেশ আশার ছলনায় ভুলিলেন। ভাবিলেন পত্রে বুঝি সুসংবাদ আছে। ব্যস্তে বলিলেন,—

"বিমল ! তবে পত্র দেও, কি লিখিয়াছ দেখি। যদি না দেও, তবে উহাতে কি লিখিত আছে বল।"

বিমলা সঙ্কুচিত হইলেন। পত্র দেওয়া দুরূহ, বলা আরও কঠিন। সুতরাং. কিঙ্কর্ত্তব্য বিমূঢ়ার ন্যায় অবনত মস্তকে পত্রিকা হস্তে বসিয়া রহিলেন। যোগেশ বলিলেন ;—

"যদি না বলিলে, তবে পত্র দেও।" অনন্যোপায় হইয়া বিমলা অগত্যা যোগেশকে পত্র দিলেন। কহিলেন ;—

"আমি তোমার কথা শুনিলাম, তুমি আমার কথা শুনিবে না ?" যোগেশ কহিলেন ;—

"তুমি যাহা বলিবে তাহা যদি অসাধ্য হয় তথাপি শুনিব। বিমলা ঈষৎ বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন,

"তুমি পত্র এখনই এখানে বসিয়া পড়িও না, সময়ান্তে উহা পাঠ করিও। তাহা হইলে আমি সুখী হইব।"

যোগেশ পত্র উন্মোচন করিতেছিলেন, তাহা না করিয়া হাসিয়া কহিলেন,

"এই কথা, বেশ, বাটী গিয়া পত্র পড়িব। এখন পড়িব না।—বিমল! তোমার এই বালিকা ভাবের কথা গুলি কি মনোহর !"

বিমলা মস্তক বিনত করিলেন। যোগেশ আবার কহিলেন,

"বিমল! পত্রের মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব আমি বাটী চলিলাম।

বিমলা হাসিয়া কহিলেন ;

"আমাকে বালিকা বলিতেছিলে!" যোগেশ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,

"সংসারে সকলেই বালক বালিকা, আমি যাই।"

বিমলা বলিলেন,—

"ব্যস্ত হইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। পত্র দেখিয়া তাহা উপেক্ষা করিও না। তাহাতে—"

আর বলিলেন না। যোগেশ গম্ভীর ভাবে হাস্য করিয়া তাহার উত্তর সমাধা করিলেন। বিমলার সুন্দর বদনশ্রী পুনরায় দর্শন করিয়া যোগেশ প্রস্থান করিলেন। যোগেশ দৃষ্টি সীমা অতিক্রম করিলে বিমলা নয়নাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন,—

"হৃদয় দগ্ধ হও।"

২ য় পরিচ্ছেদ।

যোগেশ ব্যস্ততা সহকারে বাটী আসিলেন। বিমলার আলয় হইতে তাঁহার নিবাস দূর নহে। সন্ধ্যা সমুপস্থিত। যোগেশের তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয় জগতে যে ঘোরতর সন্ধ্যা সমাগত তিনি তদ্দর্শনে ব্যস্ত। হৃদয়ে সন্ধ্যা—কারণ তথায় তখন আলোক অন্ধকার দুই মিশিতেছে। আলোক— বিমলার পত্রী মধ্য হইতে সুসংবাদের আশা; অন্ধকার—বিমলার পত্র মধ্য

হইতে ক্ষোভজনক সংবাদের ভয়। যোগেশের হৃদয়াকাশে সন্ধ্যা। বাহ্যিক প্রকৃতির সন্ধ্যা তাঁহার চখে লাগিল না। বাটী আসিয়া যোগেশ ব্যস্ততা সহকারে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় আলোক নাই। প্রকোষ্ঠ অন্ধকার, যোগেশ তাহা ভাবিলেন না। ত্বরায় বিমলার পত্র উন্মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত বিকম্পিত হইতে লাগিল। বক্ষ বেপন সম্বর্দ্ধিত হইল। চিত্তের অবস্থা কি হইল তাহা বর্ণনা করা সহজ নয়। পত্রিকা উন্মুক্ত হইল। যোগেশ তাহা পড়িতে বসিলেন। কিন্তু অন্ধকার হেতু এক বর্ণও পড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। উঠিয়া ভৃত্যকে আলোক দিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য আলোক আনিলে যোগেশ পত্রিকা পাঠে নিযুক্ত হইলেন। পড়িলেন,—

"যোগেশ, তোমাকে কি লিখিব? যাহা লিখিব ভাবিতেছি তাহা লিখিতে পারিতেছি না। লিখিতে পারিতেছি না, কিন্তু হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রাখিলে তো চলিবে না। আজ এক সপ্তাহ ভাবিয়া আমি মনকে দৃঢ় করিয়াছি। আজ আমি মনের কথা জনাইব।

যোগেশ! এজীবনে আমি তোমার হইতে পারি না, তুমিও আমার হইতে পার না। এ প্রফুল্ল কুসুমদ্বয় একত্রে শোভা পায়, ইহা জগদীশ্বরের অভিপ্রায় নয়। সে সুখ, সে সন্তোষ, সে শোভার জন্য আমরা সৃষ্ট হই নাই। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না। পাপ সমাজ তাহার কারণ। অদ্য যদি তোমার সহিত আমার বিবাহ হয়, কল্য তোমার জাতি যাইবে। তোমার সহিত কেহ আহার ব্যবহার করিবে না, হয়ত অনেকে কথাই কহিবে না, তুমি সমাজ মধ্যে চিরকাল ঘৃণিত হইয়া থাকিবে। তাহাও হউক, তাহাও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ বিবাহের পরিণামে আর এক মহদনিষ্ট ঘটিবে। তোমাদের বংশ পরম্পরা চিরদিন এই অবিবেচনার ফলভোগ করিবে। আমি এসকল কথা ভাবিয়া দেখিয়াছি। স্থির বুঝিয়াছি তোমার সহিত আমার পরিণয় অশুভের নিদান হইয়া উঠিবে। আমার অপেক্ষা ভবিষ্যতে তোমারই যন্ত্রণা অধিক হইবে। তবে কেন যোগেশ? তবে বিবাহে কাজ নাই। তুমি মনকে দৃঢ় কর।

আমি জানি তুমি আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ কর। তুমি আমাকে যার পর নাই ভাল বাস। যদি আমি তাহা না জানিতাম তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু যোগেশ ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমার হৃদয়, আমার আত্মা, তোমার অমানুষী স্নেহ, অসীম

প্রীতি, অপার উদারতার সমান প্রতিদান করে না এমন নয়। তুমি কি তাহা জ্ঞান না যোগেশ? এ হৃদয় যুগলে এ সকল কি নূতন ভাব? বিস্মৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া যতদূর সম্ভব ভূত ঘটনা সাগরে প্রবেশ করিতেছি, দেখিতেছি। সেই তুমি সেই আমি হায় কেন ইহার বিপর্য্যয় ঘটে নাই? এ হৃদয়ের যদি কিছু স্পৃহনীয় পদার্থ থাকে তাহা তুমি, যদি কিছু আনন্দের নিলয় থাকে তাহা তোমার বদন, যদি কিছু সুখ থাকে তাহা তোমার মধুমাখা কথা। যোগেশ! তুমি দেবতা দুর্ল্লভ সামগ্রী। তুমি দেবতা দুর্ল্লভ সমগ্রী বলিয়াই আমার আজি এত কষ্ট। আমি অদ্য তোমাকে যে সংবাদ দিতেছি, আমার বেশ বিশ্বাস আছে, তাহা তোমার প্রীতিপ্রদ হইবে না, তাহাতে তুমি অনুমোদন করিবে না, এবং তাহা তোমার মর্ম্মে আঘাত করিবে। কিন্তু তোমার প্রতি অচলা স্নেহ, তোমার মঙ্গলে অন্তরের একান্ত অনুরাগ, তোমার সুখে আমার সুখ প্রভৃতি স্বর্গীয় সমন্ধ সমস্ত আজি আমাকে এক বাক্য হইয়া এই পরামর্শে মতি জন্মাইয়া দিতেছে। তুমি মনকে দৃঢ় কর। আমি মনকে দৃঢ় করিয়াছি, পাষাণে হৃদয়কে গঠিত করিয়াছি। আমি পাষাণী।

মনকে দৃঢ় কর বলিতেছি। কিন্তু মনকে দৃঢ় করা বড় কঠিন। আমার অনুরোধে যোগেশ—তুমি কি না করিয়াছ? আমার জন্য তুমি কি কষ্টই না পাইয়াছ। আমার অনুরোধে তুমি এ কষ্টও স্বীকার কর। তুমি কত দিন আমাকে বলিয়াছ যে, আমি যাহাতে সুখী হই তাহা যদি নিতান্ত ক্লেশসাধ্য হয় তথাপি তুমি তৎসম্পাদনে পরমানন্দিত হও। আমি জানি তাহা তোমার মুখের কথা নহে। তোমার অন্তরের সেই ভাব। তুমি আমার পরামর্শে কর্ণপাত করিলে,যথার্থ বলিতেছি, আমি সুখী হইব। যোগেশ আমার এই কথাটী শুনিয়া আমাকে সুখী কর।

যোগেশ! তোমাকে আবার বলি, এপাপ পৃথিবী আমাদের পবিত্র প্রণেয়র স্থান নহে। তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, যে এ জীবনের পর, এক রাজ্য আছে, তথায় দলাদলি নাই, সমাজশাসন নাই, কপটতা নাই, পাপ নাই। তথায় কেবল পুণ্য সাধুতা ও পবিত্রতা বিরাজ করে। সে কি আনন্দের স্থান যোগেশ? সে স্থানে কি এখন যাওয়া যায় না? তুমি বলিয়াছিলে সকলকেই সে স্থানে যাইতে হইবে—আর আসিতে হইবে না। কি সুন্দর স্থান। সেই স্থানে আমরা মিলিব! তথায় আমাদের বিবাহ হইবে। এ সংসারে আমাদের

বাসনা সফল হইবে না। এ সংসার কাননে আমরা প্রজাপতি যুগল হইয়া পড়িতে পাইব না, এখানে আমরা কপোত কপোতিনী হইয়া থাকিতে পাইব না। এ মধুমক্ষিকাদ্বয় মিলিয়া এখানে স্বতন্ত্র মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে পাইবে না। এ শুক শারীর কথা এ জগৎ শুনিবে না। এ বৃথা আশা ত্যাগ কর যোগেশ। এ জগতে আমাদের সম্মিলন বিধাতার ইচ্ছা নয়

তুমি আমার জন্য ভাবিও না, তুমি সুখী হইলেই আমার পরম সুখ। তুমি আমার অনুরোধ শুন, চিত্ত সুস্থির কর। তাহা হইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। আমার জন্য তুমি এক বিন্দুও উদ্বিগ্ন হইও না। আমি জানি এ জগতে আমাদের সম্মিলন না হইলে তোমার অনেক মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গল অপেক্ষা আমার আর কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? তোমার মঙ্গল, তোমার কল্যাণ, তোমার হিত, এ জগতে আমার প্রধান চেষ্টা। সেই জন্য অদ্য আমি হৃদয়কে লৌহবৎ কঠিন করিয়া, পাষাণবৎ দুর্ভেদ্য করিয়া, বজ্রাধিক ভয়ঙ্কর করিয়া এই কঠোর পরামর্শ লিপিবদ্ধ করিতেছি। যাহা লিখিতেছি জানিও তাহা আমার অন্তরের কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্তোষ সহকারে এই মত স্থির করিয়াছি অতএব তুমি আমার জন্য ভাবিও না।

আমার জন্য তুমি কোন রূপে অসুখী হইও না। আমি বেশ থাকিব, মনকে প্রবোধ দিব এ জগত আমাদের স্থান নয়। তাই ভাবিয়া আমি স্বচ্ছন্দে থাকিব। কিন্তু তুমি, তুমি যদি অসুখী হও, তুমি যদি দুঃখিত ও ব্যথিত হও তাহা হইলে আর আমার সুখ কোথায়? তাহা হইলে আমার অসুখের সীমা থাকিবে না। তোমার চরণে আমার সানুনয় অনুরোধ তুমি কদাচ চিত্তকে অস্থির হইতে দিও না। যোগেশ! তোমার জনক আছেন, জননী আছেন, ভ্রাতা ও ভগ্নী আছে, তুমি অতগুলি লোকের লক্ষ্যস্থল—অতগুলি লোকের আনন্দ ধাম। তোমার চিত্ত প্রশান্ত না থাকিলে, কেবল তুমি আমি নই, সকলেই কষ্ট পাইবে। যোগেশ তুমি চিত্তকে স্থির করিও।

আর এক কথা যোগেশ! আর একটী কথা বলিয়া আমার এই কঠোর শোকাবহ লিপির শেষ করিব। তোমার একটী বিবাহ করিতে হইবে। একটী সুশীলা সুন্দরী বালিকাকে তোমার পত্নী রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন তুমি তাহা করিবে না? এককারণে দুই জনের যাতনার আবশ্যক কি? যোগেশ! তুমি বিবাহ করিও। সেই রমণী তোমাকে ভাল বাসিবে। তোমাকে স্নেহ করিবে। আমি, যখন দেখিব তুমি একটী সুন্দরী সুশীলা রমণীকে পত্নী

রূপে গ্রহণ করিয়াছ, আর যখন দেখিব সেই রমণী তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছে, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। কালক্রমে যোগেশ! তোমার প্রফুল্ল কুসুমবৎ আনন্দময় সন্তান হইবে। তাহারা হাসিতে হাসিতে নাচিয়া বেড়াইবে। আমি তাহাদের ক্রোড়ে লইব, অন্তরের সহিত ভাল বাসিব, মাতৃবাৎসল্যে লালন পালন করিব। যোগেশ! তুমি তাহাদের বলিয়া দিও তাহারা যেন আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকে। যোগেশ! এ সকল আনন্দে তুমি বঞ্চিত হইও না। তুমি বিবাহ করিও, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

ভাবিও না যোগেশ যে আমার হৃদয় তোমার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে। না তাহা নয়। এ হৃদয়ে যাহা আছে তাহার কথা কি বলিব? তাহা আমি জগতকে দেখাইতে চাহি না। লোককে শুনাইতে চাহি না। সে অন্তরের ভাব আমি অন্তরে বহন করিয়া সুখী হইব। যিনি জানিবার তিনি তাহা জানেন। যোগেশ তুমি কি তাহা জান না?

এ জীবনে তোমার সহিত আমার সদা সর্ব্বদা দেখা হইবে। দেখা হওয়াই প্রার্থণীয়। দেখা হইবে কিন্তু পূর্ব্বের ভাব আর কিছু মনে না থাকে, এসকল কথা স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হউক। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছিল, তাহা যেন তোমার আমার আর মনে না থাকে। কিন্তু যোগেশ! এ অতুলনীয় প্রণয়, অসীম স্নেহ, অবিচ্ছেদ্য ঐক্য ইহা কি ভাসিয়া যাইবে? না তাহা অসম্ভব; জীবন যাইবে তথাপি এ স্বর্গীয় প্রবৃত্তি সমস্ত লোপ পাইবে না। ঈশ্বর করুণ যেন তাহা চিরদিন সমান থাকে। তোমার সহিত আমার সতত সাক্ষাৎ হইবে যোগেশ। কিন্তু তুমি আমাকে স্নেহময়ী ভগ্নী বলিয়া ভাবিও। আমিও তোমাকে ভ্রাতা বলিয়া ভাবিব। তাহাতেই আমার আনন্দ হইবে। তাহাতেই আমি সুখী থাকিব। এ কথা যোগেশ কখন ভুলিও না।

এ জগতে তুমি ভিন্ন আর কেহ আমার পূর্ণ হৃদয়ের, পূর্ণ প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং জানিও যোগেশ তোমার আদরের, তোমার স্নেহের বিমলা তোমা ভিন্ন আর কাহারও নহে, আর কাহারও হইবে না। সংসার আমাদের বিরোধী হউক, সমাজ আমাদের পবিত্র আশালতাকে বিদলিত করুক, এ পাপ পৃথিবী আমাদের স্বর্গীয় সুখের যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতা করুক,— আমাদের অন্তরের ভাব কেহ মুছিয়া দিতে পারিবে না। তাহার ধ্বংস হইবে না। এখন না হউক যে কোন কালে তাহা জয় লাভ

করিবে। সেই হৃদয়ের অতি পবিত্র ভাব সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া আর তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, তোমার মধুমাখা কথা সকল স্মরণ করিয়া আমি পরম সুখে জীবন কাটাইব। এ জীবনে তাহাই আমার সুখ।

আর কিছু লিখিব না। লেখা তো সুখের নয়। তবে লিখিয়া আর ফল কি? আমি হৃদয়কে আশ্বস্ত করিয়াছি। তুমিও তাহাই কর।

তোমারই

বিমলা।"

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইল। সংজ্ঞা শূন্যের ন্যায় পত্র হস্তে যোগেশ সেই স্থলেই বসিয়া রহিলেন।

পুস্তক প্রেরকদিগের প্রতি।

জ্ঞানাঙ্কুরে সমালোচনার্থ, 'কমল কলিকা,' 'শক্রসিংহ,' ভারত বিজয়,' 'চিত্ত বিনোদিনী,' 'ভারতের সুখ শশী যবন কবলে' প্রভৃতি অনেক গুলি পুস্তক আসিয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ সম্প্রতি সমালোচন প্রকাশিত হইল না। অতএব গ্রন্থকারগণ মার্জ্জনা করিবেন।

৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। মাঘ, ১২৮২।

ও

প্রতিবিম্ব।

(মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।)

বিষয় পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিংলাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮২

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

১। বিবিধ কারণ বশত জ্ঞানাঙ্কুর এত দিন বন্ধ ছিল, এক্ষণে উহার কার্য্যভার হস্তান্তরিত হইল। আর ইহার প্রচার বিষয়ে গ্রাহকগণ সন্দেহ করিবেন না। ইহার সমুদায় বন্দোবস্ত নূতন হইল। যদিও ইহার অন্যান্য বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তিত হইল, তথাপি ইহার নিয়মগুলি পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল, আমরা তাহার কোন পরিবর্ত্ত করিলাম না।

২। জ্ঞানাঙ্কুরের সহিত প্রতিবিম্ব মিলিত হইল। কোন বঙ্গীয় মাসিক পত্র সম্বন্ধে প্রতিবিম্বে যে কথঞ্চিৎ বিদ্বেষ ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর তাহার লেশমাত্রও থাকিবে না।

৩। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য বিষয়ে নিম্নলিখিত নিয়মই অবধারিত রহিল ;—

বার্ষিক অগ্রিম	৩৲
ষাণ্মাষিক ,, ...	১৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	।৵০

এতদ্ব্যতীত মফঃসলে গ্রাহকদিগের বার্ষিক ।৵০ ছয় আনা করিয়া ডাক মাশুল লাগিবে।

৪। যাঁহারা জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য স্বরূপে ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা কেবল অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন ; এবং প্রত্যেক টাকাতে /০ এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইবেন, কেননা বিক্রয় করণ কালে আমাদিগকে টাকাতে /০ আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

৫। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের কার্য্য সম্বন্ধে পত্র এবং সমালোচনের জন্য গ্রন্থাদি আমরা গ্রহণ করিব। রচনা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমাদের ঠিকানায় "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব সম্পাদক" শিরোনামা দিয়া লিখিতে হইবে।

৬ব্যারিং ও ইন্সফিসেন্ট পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী } শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব কার্য্যাধ্যক্ষ।

ললিত-সৌদামিনী।

নবম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য অস্তমিত হইল। পৃথিবী গাঢ়তিমিরাবৃত হইল। তদপেক্ষা গাঢ়তর তিমির কেশবের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল। পৃথিবীর সহিত মানব হৃদয়ের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একতা আছে। অরুণোদয়ে কেবল পৃথিবী হাসেন এরূপ নহে। জীবলোক সমুদায় সূর্য্যালোকে প্রফুল্ল হয়। হাজার ভাবনা চিন্তা থাকিলেও রজনী অপেক্ষা দিবাভাগে মন নিরুদ্বেগ থাকে। যামিনী নিজে মলিন, সুতরাং সকলকেই মলিন করিতে পারিলেই যেন ভাল থাকে।

রজনী আগমনে কেশবের হৃদয় যার পর নাই সন্তাপিত হইতে লাগিল। গিরিবালা রন্ধনাদি করিয়া কেশবকে আহার করিতে ডাকিলেন। কেশব ক্ষুধা নাই বলিয়া আহার করিলেন না। অন্যান্য সকলে আহারাদি করিল। চাকর গিয়া নিজস্থানে শয়ন করিল। গিরিবালা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গায়ে তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন। কেশব মনে করিলেন গিরিবালা তাঁহাকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এজন্য তিনি কহিলেন "আজ আর বাতাস করিতে হইবে না। আমার জ্বরভাব হইয়াছে। গা শীতং করিতেছে। তুমি শোও।"

গিরিবালা স্বামীর কপাল স্পর্শ করিলেন। হাত কেশবের কপালে জলন্তুবৎ বোধ হইল। অনন্তর গিরিবালা শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

কেশব ক্ষণকাল শয়ন করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। এরূপ স্ত্রীর সহিত কিরূপে সহবাস করিবেন? গিরিবালাকে তিনি বিষধর সর্প জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া প্রকাশে বলিতে লাগিলেন "গিরিবালা! এই কি তোমার উচিত? তুমি এমন হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি এক্ষণে অন্ধ হইয়াছি, কোথায় তুমি আমাকে অধিকতর যত্ন করিবে তাহা না করিয়া তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?" এত দূর বলিয়া আর কেশব ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহার উচ্ছ্বাসে গিরিবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু তিনি তাহার কোন চিহ্ন না দেখাইয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। কেশব কহিতে লাগিলেন "গিরিবালা ক্ষমা কর, তোমার বৃথা দোষ দিয়াছি। এদোষ তোমার নহে, এ আমার অদৃষ্টলিপি। তুমিতো আমাকে সে দিবস পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলে, আমি তোমার কথা না শুনিয়া পড়িলাম। পড়িয়া চক্ষুরত্ন হারাইলাম। আমার অদৃষ্ট যদি ভাল হইত তাহা হইলে চিরকাল তোমার কথা শুনিয়া আসিয়া সে দিবস

তোমার পরামর্শের বিপরীত আচরণ করিতাম না। আমার অদৃষ্ট ভাল হ-ইলে তুমিই বা কেন আমাকে ত্যাগ করিবে? কিন্তু গিরিবালা যদি তোমার চক্ষু এরূপ হইত তাহা হইলে আমি কখন তোমাকে অনাদর করিতাম না। কখন তোমাকে ত্যাগ করিয়া অপর কাহাকে বিবাহ করিতাম না। গিরি-বালা তোমার চক্ষু আছে বটে কিন্তু তুমি আমার অন্তঃকরণ দেখিতে পাই-তেছ না। আমি যে তোমাকে কত ভাল বাসি, তোমা বিনে যে আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না তাহা তুমি টের পাই-তেছ না। তুমি বলিবে 'কানার ভাল বাসায় আমার কাজ কি?' সত্য; কিন্তু গিরিবালা তোমার অন্তঃকরণ যে মৃণাল অপেক্ষাও কোমল তাহা তো আমি জানি। আমার ভালবাসার জন্য না হউক আমার অন্তঃকরণের কষ্ট একবার দেখিতে পাইলে তুমি আমাকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারিতে না। নিতান্ত পর হইলেও তুমি তাহার কষ্ট সহ্য করিতে পার না। আমার কষ্ট যে তোমার বরদস্ত হইত তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। গিরিবালা এখনও ফের। তুমি যাহা করিয়াছ তা করিয়াছ, আর আমাকে ত্যাগ করিও না। সহস্র দোষে দোষী হইলেও গি-রিবালা তুমি আমারি। একবার তুমি আমাকে এইরূপ আদর করিয়া আমাকে 'আমারি' বলিয়া ডাক। তাহা হই-লে আমার সকল দুঃখ দুর হইবে।"

এতদুর প্রকাশে বলিয়া কেশব চুপ করিলেন। গিরিবালার চক্ষে বারি বহিতে লাগিল। কিন্তু তিনি প্রকাশ করিয়া কিছুই বলিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

সৌদামিনীর বিবাহের দিনস্থির হই-য়াছে। বামনদাস আনন্দ সলিলে ভাসিতেছেন। রামকানাই দুঃখার্ণবে হাবুডুবু খাইতেছেন। বামনদাসের উ-পর তাঁহার যার পর নাই রাগ হই-য়াছে। মনে মনে ভাবিতেছেন "বা-মনদাসকে সেই ধন্না দিতে হইল, তবে কিঞ্চিৎ আগে দিলেই হইত, তাহা হইলে আর আমার ক্ষতি হইত না।"

দিগম্বর সমস্ত দিবস বিবাহের উদ্যো-গে ব্যস্ত আছেন; ভগিনীপতির সহিত বসিয়া গল্প করিবার অবকাশ নাই। ক্রমে সমস্ত উদ্যোগ হইল; কল্য রাত্রে বিবাহ। রামকানাইয়ের পূর্ব্ব রাত্রি নিদ্রা হইল না। সৌদামিনী লাভ হ-ইবে ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছু পণ পাইবেন না ভাবিয়া আবার যার পর নাই দুঃখিত হইতে লাগিলেন। বামনদাসের উপরেই তাঁহার রাগ,— তিনি কেন কিঞ্চিৎ অগ্রে ধন্না দিলেন না, এই তাঁহার দোষ।

বিবাহের দিন রামকানাই ও বামনদাস উভয়েই উপবাস করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দু একটী করিয়া আসিতে লাগিল। বিবাহের লগ্ন অনেক রাত্রে; সুতরাং সকলে বৈটক খানায় বসিয়া গল্প ও বরকে লইয়া নানাবিধ হাস্য কৌতুক করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে রামকানাই কহিলেন, "দিগম্বর বাবু কোথায়?" বামনদাস কহিলেন, "কেন?" রামকানাই উত্তর করিলেন "তাঁহার সহিত আমার কোন বিশেব প্রয়োজন আছে, একবার ডেকে পাঠান।"

দিগম্বর বাটীর মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন, আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। রামকানাই বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আমি ডাকৃছি, তাতে দেরি!"

নিকটে এক জন বসিয়া ছিল, সে রামকানাইয়ের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "দিগম্বর বাবু শীঘ্র আসুন, শিশুপ্যাল রাগ কর্ছেন।"

রামকানাই রাগতস্বরে কহিলেন "আপনি কি বল্যেন?"

সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "কিছু না।"

রামকানাই রাগত হইয়া কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দিগম্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকানাই তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "এমন স্থানে আমি বিবাহ করিতে চাই না। দুদণ্ড আমাকে সুস্থির থাকিতে দেয় না!"

দিগম্বর কহিলেন, "তোমরা সকলে চুপ কর।" পরে রামকানাইকে কহিলেন, "মহাশয়! বিবাহের রাত্রে এমন করে থাকে; আপনি ও সব কথায় কান দেন কেন?"

রামকানাই কহিলেন, "আর এক কথা আছে, আমি ২০ টাকা পণ না পাইলে বিবাহ করিব না।"

দিগম্বর কহিলেন "সে কি মহাশয়? আপনি তো আগে এমন কথা বলেন নাই।"

রাম। "কখন বলি নাই? আমাকে কে জিজ্ঞাসা করিল?"

ইতি পূর্ব্বে বামনদাসের সহিত রামকানাইয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছে, যদি রামকানাই বিবাহের সময়ে কোন ছলে কিছু লইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

দিগম্বর কহিলেন, "বামনদাস বাবু বলেছেন আপনি পণ লইবেন না। কেমন বামনদাস বাবু, আপনি এ কথা বলেন নাই?"

বামনদাস নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হাঁ—না। তাই বটে—তাওতো নয়। কুলীনের ছেলে বিবাহের সময় কিছু পেয়ে থাকে।"

দিগম্বর কহিলেন, "এ আপনার বড় অন্যায়।"

বামনদাস কহিলেন, "যাক্ যাক্ সে সব কথা এখন যাক্—পরে হবে। এখন তুমি এঁর কুটুম্ব হলে, দশ পাঁচ টাকা চাইলে কি তুমি দেবে না?"

দিগম্বর কহিলেন "সে স্বতন্ত্র কথা। রামকানাইকে যদি মেয়েই দি, তবে কি আর দু চার টাকা চাইলে পাবেন না?"

দিগম্বরের কথার ভাবে বোধ হইল যে এখনও কন্যাদান পক্ষেই বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তখন বামনদাস ও রামকানাই কহিলেন, "সে কেমন কথা?"

দিগম্বর কহিলেন "২০ টাকা না পেলে তো উনি আর বিবাহ কর্‌বেন না, তাই বল্‌ছিলাম।"

দিগম্বরের কথা শুনিয়া রামকানাইয়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলেন টাকা চাহিয়া ভাল কর্ম্ম করি নাই।

এমন সময় বাটীর অভ্যন্তরে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি হইল। বামনদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "লগ্নের সময় হলো না কি?"

স্বরভঙ্গির সহিত দিগম্বর উত্তর করিলেন "হাঁ বিবাহ হইল।"

বামনদাস ও রামকানাই উভয়েই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তার মানে কি?"

দিগম্বর কহিলেন "তার মানে আবার কি? বিবাহ হইল, এ কথার আবার কি অর্থ হইয়া থাকে!" এই বলিয়া সভাস্থ সকলকে বলিলেন "আপনারা গাত্রোত্থান করুন, আহারের উদ্যোগ হইয়াছে।"

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রতিবেশবাসী, তাঁহারা সকলেই এ ব্যাপার পূর্ব্বাবধি অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা কেহ এ কথায় চমৎকৃত হইলেন না। প্রত্যেকেই উঠিয়া যাইবার সময়ে রামকানাইয়ের কান মলিয়া দিয়া যাইতে লাগিলেন। রামকানাই উচ্চৈঃস্বরে "দোহাই মেজেষ্টর সাহেবের, দোহাই কোম্পানী সাহেবের" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

বামনদাস কহিলেন "রামকানাই একটু স্থির হও, ব্যাপারটা কি শুনি

বামনদাস যতই এইরূপ বলিতে লাগিলেন, ততই রামকানাই "দোহাই মেজেষ্টর সাহেবের, দোহাই জজ সাহেবের, আমার জাত মার্‌লে, আমার কান্ ছিড়্‌লে" বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দিগম্বর বামনদাসের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "ব্যাপারটা শুন্তে চাও কি দেখ্‌তে চাও?"

বামনদাস কহিলেন "শুন্তেও চাই, দেখ্‌তেও চাই।"

"তবে আমার সঙ্গে এসো" এই বলিয়া দিগম্বর বামনদাসকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে গেলেন। সেই সঙ্গে রামকানাইও গমন করিলেন। যে স্থানে

বর কন্যা ছিল, দিগম্বর বামনদাসকে তথায় লইয়া গিয়া বরকে কহিলেন, "ললিত, ইনি তোমার শ্বশুর, এঁকে প্রণাম কর।"

ললিত প্রণাম করিলেন। বামনদাস সরোষে কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ আর কি করিব, শীঘ্রই উচ্ছিন্ন যাও, এই আমার প্রার্থনা।"

রামকানাই উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরুক।"

দিগম্বর তাঁহাদিগের মুখে এতাদৃশ কথা শুনিয়া রাগত স্বরে কহিলেন, "বেরো তোরা আমার বাড়ী থেকে। যত বড় মুখ তত বড় কথা। আজি আনন্দের দিনে অমঙ্গলের কথা?" এই বলিয়া বামন দাসের বুকে হাত দিয়া ধাক্কা মারিলেন। বামনদাস সমস্ত দিবস অনাহারে; ধাক্কা সাম্‌লাইতে না পারিয়া রামকানাইয়ের গায়ের উপর পড়িলেন। রানকানাই অমনি মাটীর উপর পড়িয়া গেলেন। বামনদাস তাহার উপর পড়িলেন। পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমাকে মেরে ফেল্লে, কে কোথায় আছ ঠ্যাকাও।" রামকানাই কহিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিলে। আমার টাকা কড়ি সব নিলে। কে কোথায় আছ রক্ষা কর দোহাই মেজেষ্টর সাহেবের, দোহাই কোম্পানী সাহেবের।"

এই চীৎকার শুনিয়া যে যেখানে ছিল, সকলেই সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। বামনদাস কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তোমরা সব দেখ আমার হাত ভেঙ্গে গিয়াছে। আমি এখনই থানায় যাব।"

রামকানাই কহিলেন "তোমরা সব দেখ, আমার নগদ দুশ টাকা ছিল, আর পাঁচ থান মোহর ছিল, সব লুটে নিল। আমি এর জন্য লাট সাহেবের কাছে যেতে হয় তাও যাব।"

দিগম্বর কহিলেন, "যা তোরা কোথায় যাবি যা। এখানে গোলমাল কর্‌লে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।" এই বলিয়া উভয়ের হাত ধরিয়া বাটীর বাহিরে লইয়া চলিলেন। পশ্চাৎ হইতে অমনি দুই চারি জন রামকানাইয়ের কাপড় ধরিয়া কহিল "কোথায় যান মহাশয়! গ্রামভাটী ও বারোয়ারী দিয়ে যান, নইলে যেতে দেব না।" উপস্থিত সকলে তদ্দর্শনে হাসিতে লাগিল। রামকানাই ও বামনদাস চীৎকার করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। দিগম্বর বিরক্ত হইয়া একজন পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া দিলেন। পাহারাওয়ালা উভয়কে তথা হইতে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সৌদামিনীর বিবাহে গিরিবালার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বিবাহ সমাধা হইবামাত্র তিনি নিজ বাটীতে আগমন

পূর্ব্বক কেশবের নিকট গমন করিলেন। কেশব নিজের শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। গিরিবালা কহিলেন, "তোমাকে যদি একটী সুসমাচার দিতে পারি, তবে আমাকে কি দাও?"

কেশব কহিলেন "কেও গিরিবালা! কি সুসমাচার?"

গিরিবালা "কহিলেন, আগে আমাকে কি দেবে বল?"

"এ অন্ধের আর অদেয় কি আছে?"

"আমি তা শুন্তে চাইনে। তুমি একটু হাঁস্‌বে কি না? আর আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা কর্‌বে কি না?"

কেশব গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "অন্ধের রাগে তোমার কি হবে?"

"তবে তুমি কিছু দেবে না,—আমি অমনিই বলি। সৌদামিনীর সহিত ললিতের বিবাহ হইয়াছে।"

"সে কি? রাম কানাইয়ের কি হলো?"

"তার শিশুপালের বিবাহ হয়েছে।"

কেশব চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "বিষয়টা কি ভেঙ্গেই বল না।"

গিরিবালা কহিলেন, "রামকানাইকে দেখে অবধি সুদামের মা প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন, তার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেবেন না। তাই শুনে বামনদাস আর নায়ও না, খায়ও না, বল্‌লে অনাহারে প্রাণত্যাগ কর্‌বে। সৌদামিনীর মা কি করেন? তাঁহাকে বল্লেন রামকানাইকে কন্যা দিবেন। এদিকে গোপনে ললিতকে এখানে আস্‌তে পত্র লিখ্‌লেন। ললিত পত্র পেয়ে এল, এসে আমাকে মাথার দিব্য দিয়ে বারণ কর্‌ল্লে, যেন তুমি এ কথা শুন্তে না পাও। আমি কত বলিলাম, তোমাকে বলায় কোন ক্ষতি নাই, তবু সে শুন্‌লো না। এমনি দুই এক দিন আস্‌তে দাসী তাকে দেখ্‌তে পেলে, কিন্তু সন্ধ্যার পর বলে চিন্তে পার্‌লে না। সে মনে কর্‌লে চাকরই বুঝি গোপনে বাহির হয়ে যাচ্যে। এই মনে করে তার মনে সন্দেহ হলো। আমাকে মন্দ কথা বল্যে। সেই জন্য তাকে বিদায় করে দিলাম। যাবার সময় বুঝি তোমাকে কিছু বলে গিয়া থাক্‌বে, তাই তোমার মনে সন্দেহ হয়েছে। সে দিন রাত্রে তোমার কথা শুনে আমি জান্‌তে পারিলাম। আমি তখনই তোমাকে সব কথা কহিতাম, কিন্তু ললিত দিব্য দিয়াছিল বলিয়াই বলি নাই। আমি কি তোমাকে ত্যাগ কর্‌তে পারি? তোমার মতন——"

কেশব এত দূর শুনিয়া গিরিবালার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আর কাজ নাই, আমি সব বুঝেছি। গিরিবালা আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর।"

গিরিবালা কহিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিব? তুমি আমাকে এই ক্ষমা কর যে ললিতের কথা শুনে আমি এত দিন তোমার নিকট এ বিষয় গো-

পন করে রেখেছি। আমার বড় কঠিন প্রাণ যে তোমার এই কয়েক দিনকার কষ্ট দেখেও আমি গুপ্ত কথা প্রকাশ করি নাই। তোমার স্ত্রী হওয়া দূরে থাকুক, আমি তোমার দাসী হওয়ারও যোগ্য নই।”

পূর্ব্ববৎ গিরিবালার হস্তাকর্ষণ করিয়া কেশব কহিলেন, “ তোমার দোষ কি? তোমাকে দিব্য দিয়া বলিয়াছিল, তাই তুমি এ কথা বল নাই। দোষ দুজনেরই। আমি যে দাসীর কথা শুনে তোমাকে কলঙ্কিনী মনে করেছি, এই আমার ঘোরতর অপরাধ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।” এই বলিয়া কেশব কাঁদিতে লাগিলেন। গিরিবালাও তদ্দর্শনে কাঁদিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

রসসাগর।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

এতদ্দেশে কোন কালেই জীবন চরিত লেখার পদ্ধতি ছিল না, সেই জন্যই আমরা ভূতপূর্ব্ব মহোদয়বর্গের জীবনী সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ হইয়া রহিয়াছি। অধিক পূর্ব্বের কথা দূরে থাকুক শতবৎসরের মধ্যবর্ত্তী ঘটনাবলীও ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ৪০।৫০ বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধেও নানাবিধ মত ভেদ হইয়া থাকে। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বিদ্যায় এবং কবিত্বে ভারতবর্ষ কোন দেশ অপেক্ষাই ন্যূন ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত বিষয় সমুহের মধ্য হইতে যদি কেহ কখন অলীক ঘটনা পরম্পরার দুরীকরণে সমর্থ হন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন, ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিরোভূষণ ছিল। আমাদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত নানাবিধ অলীক আড়ম্বরেই পরিপূর্ণ; তম্মধ্য হইতে সারভাগ সঙ্কলন করা অতীব দুঃসাধ্য, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল বিষয় কালের কুটিল ক্রোড়ে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ সমাহার করা বিদ্যোৎসাহী স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমরা অদ্য যে ব্যক্তির পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি, তিনি অধিক দিনের প্রাচীন লোক নহেন, তথাপি তাঁহার পরিচয় সংগ্রহ করা যার পর নাই কঠিন হইয়া রহিয়াছে। জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী বাগোয়ানের সন্নিহিত বাড়ে বাঁকা গ্রামে বাঙ্গালা ১১৯৮ সালে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী জন্ম পরিগ্রহ করেন।

ইহাঁর বাল্যকাল কি রূপে অতিবাহিত হয়, তাহা আমরা বিবিধ অনুসন্ধানেও জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তখন পল্লী-গ্রামে বিদ্যাশিক্ষার সম্যক সদুপায় ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত বাল্যকালে সংস্কৃত, পারসী, উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহার পিতা নিতান্ত দীন হীন ছিলেন না, সন্তানের সুশিক্ষার জন্য তাঁহার যত্নের ক্রুটী হয় নাই। ভাদুড়ি মহাশয় কৃষ্ণনগরে দার পরিগ্রহ করেন, এবং সেই সূত্রেই তাঁহার উক্ত রাজধানীতে বাস। তাঁহার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট ভাগ কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই স্থলেই তাঁহার কবিত্ব বিকসিত কুসুমের ন্যায় সকলের মনোহরণ করিয়া ছিল।

কৃষ্ণনগরের রাজসংসার বিদ্যোৎসাহিতার জন্য চিরদিন প্রসিদ্ধ। মহারাজ গিরীশ চন্দ্র রায় অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ির কবিত্বের পরিচয় পাইয়া আপন সভাসদ পদে নিযুক্ত করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার কবিত্বরসের আস্বাদনে পরম পুলকিত হইয়া তাঁহাকে 'রসসাগর' উপাধি প্রদান করিলেন। তিনি এই রাজদত্ত উপাধি দ্বারা কৃষ্ণনগর অঞ্চলে এতদূর প্রসিদ্ধ হন, যে তাঁহার প্রকৃত নাম অনেকেই অবগত ছিলেন না। রসসাগরই তাঁহার প্রকৃত নামের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে এই উপাধির যথার্থ উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

আমরা 'করিচরিত' গ্রন্থের উপক্রমণিকায় রসসাগরের প্রথম পরিচয় দেই, কিন্তু তাহা এত সংক্ষিপ্ত যে তৎপাঠে পাঠকের তৃপ্তিসাধন হয় না। তৎপরে এডুকেশন গেজেটে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয়, তাহাতে আমরা সমধিক পরিচয় পাই নাই। শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায় বাঙ্গালা ১২৭৮ সালে "৺কবি রসসাগরের জীবন চরিত এবং তাঁহার কতকগুলি উপস্থিত পাদপূরণ" ইত্যভিধেয় এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে ৯৬টী পাদপূরণ আছে, কিন্তু জীবনী সম্বন্ধে অধিক কথা নাই। সংগ্রহকার সে বিষয়ে সম্যক দোষী নহেন, তদপেক্ষা অধিক সংগৃহীত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" গ্রন্থে রসসাগরের বিবরণ যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতেও নূতন কথা নাই। গ্রন্থকার কৃষ্ণনগর রাজসংসারে অনেক দিন কর্ম্ম করিতেছেন, এবং রসসাগরের জীবিত কালে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তথাপি তিনি যখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তখন অন্যের পক্ষে ইহা নিতান্ত দুঃসাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্রুত রচনা বিষয়ে রসসাগরের অতি

আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেহ কোন ভাবের এক বা অর্দ্ধচরণ অথবা চরণের কিয়দংশ বলিলে তিনি ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া উপর্য্যুপরি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে তাহার পাদপূরণ করিতেন। তাঁহার আর এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে তিনি প্রশ্নকর্ত্তার মনোগত ভাব প্রায়ই অনুভব করিতে পারিতেন। একদা তিনি রাজ সভায় চারি চরণে এক সমস্যা পূরণ করিলেন, রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চারি টাকা পুরস্কার দিলেন। রসসাগর চরণে চরণে টাকা দেখিয়া কহিলেন, "মহারাজ! যদি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করেন তবে অন্যভাবে ছয় চরণে এই সমস্যা পূরণ করি।" এই বলিয়া ছয় চরণে পাদ পূরণ করিয়া ছয় টাকা পুরস্কার পাইলেন। পুনরায় আট চরণে ঐ সমস্যা পূরণ করিয়া আট টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি এই প্রকারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অনায়াসে পাদ পূরণ করিতে পারিতেন, তাহাতে কিছু মাত্র কবিত্বের ব্যত্যয় হইত না।

ইনি যে সকল সমস্যা পূরণ করিতেন, তাহাতে দ্রুত রচনা নিবন্ধন ছন্দের দোষ দৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু কবিত্বের দোষ দৃষ্ট হইত না। অবকাশ কালে যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহা সর্ব্বাংশে অতি সুন্দর হইত। যাহা হউক তিনি এই দ্রুত রচনার জন্যই সমধিক বিখ্যাত। ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রশ্ন করিবামাত্র মুখে মুখে তাহা পূরণ করা সাধারণ ক্ষমতার বিষয় নহে। তিনি ইংলণ্ড নিবাসী সুবিখ্যাত উপস্থিত বক্তা থিয়োডর হুক অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিলেন না, তবে তাঁহার দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার নাম, ধাম ও বংশাবলী এবং তাঁহার সুবিস্তীর্ণ জীবনবৃত্ত গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়া সর্ব্বসাধারণ সমীপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। ঈদৃশ অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব দেশের অহঙ্কার স্বরূপ সন্দেহ নাই। তিনি এমন সুরসিক ছিলেন এবং সর্ব্বদা এমন রসভাব সমন্বিত মিষ্ট কথা কহিতেন, যে তাঁহার নিত্য সহচর বন্ধুবর্গ সর্ব্বদা আনন্দে ভাসমান থাকিতেন। অতি দুঃখের সময়েও তাঁহার কথায় হাস্য সম্বরণ হইত না।

রসসাগরের এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান ছিল। পুত্র অকালে বিগত জীবিত হয়। শান্তিপুরে তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা দুহিতার বিবাহ দেন। সুরধুনী তীর সন্নিধান নিবন্ধন রসসাগর জীবনের শেষ কাল জামাতৃগৃহেই অতিবাহিত করেন। এই স্থানেই ১২-৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমরা এস্থলে রসসাগরের রসিকতার কতিপয় উদাহরণ প্রদান করিতেছি।

একদা তিনি মহাবিষুব সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস রাজ সংসারের কর্ম্মাধ্যক্ষ রামমোহন মজুন্দারের নিকট কিঞ্চিৎ বেতন চাহিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় পরদিন কলসী উৎসর্গের নিতান্ত ব্যাঘাত দেখিয়া যার পর নাই বিষণ্নবদনে যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবরাজ জিজ্ঞাসিলেন "আজ নুতন কি?" রসসাগর উত্তর করিলেন "শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, কোন পিতৃক্রিয়া পণ্ড হইলে অরণ্যে রোদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, একারণ আমি কিয়ৎক্ষণ মজুন্দারের নিকট রোদন করিয়া আইলাম।"

একদা কোন ভূম্যধিকারীর বাটীতে কোন কর্ম্মোপলক্ষে রাজসভাস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হন। কর্ম্মকর্ত্তা যেখানে বসিয়া বিদায় দক্ষিণা প্রদান করিতেছিলেন, সে গৃহের দ্বারটী কিছু ক্ষুদ্র। রসসাগর গৃহ প্রবেশ করিতে মস্তকে দ্বার ঠেকিল। সভাস্থ সকলে হাঁসিয়া কহিলেন, "আহা, বড় লাগিয়াছে," রসসাগর কহিলেন "কি করি, ছোট দুয়ারে তো কখনো আসা অভ্যাস নাই!" এই উত্তরে সকলেই অপ্রতিভ হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

কোন সময়ে এক বৈদ্যজাতীয় ভূম্যধিকারীর ভবনে কলিকাতা নিবাসী প্রসিদ্ধ পাঁচালী গায়ক লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস গমন করেন। তিনি অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন। সেই সময়ে ভূম্যধিকারী রসসাগরকেও নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। এই উভয় সুপ্রসিদ্ধ সুরসিকের পরস্পর বচন বৈদগ্ধী শ্রবণের জন্য তথায় অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হয়। এই গ্রামের বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় গলদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিত, এজন্য তথাকার ব্রাহ্মণ বৈদ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যাইত না। নবদ্বীপাধিপতির অধিকার মধ্যে এ প্রথা ছিল না। রসসাগর আপন উপবীতে এক কড়া কড়ি বাঁধিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর করিলেন যে "এ বামুনে পৈতে।" এই কথা শ্রবণ মাত্র ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বৈদ্যেরা অতিশয় লজ্জিত হইলেন। রসসাগর অত্যন্ত কুৎসিত ছিলেন, লক্ষ্মীকান্তের একটী চক্ষু ছিল না। রসসাগর সভাস্থ হইলে লক্ষ্মীকান্ত "আসুন আট পুণে ঠাকুর" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। রসসাগর তৎক্ষণাৎ "থাক্‌রে বেটা চারি পুণে" বলিয়া ঐ শিষ্টাচারের প্রতিশোধ দিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এই উভয় বাক্যের ভাবার্থ জ্ঞাত হইবার জন্য ব্যগ্র

হইলে রসসাগর কহিলেন " বিশ্বাস মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন।" লক্ষ্মীকান্ত কহিলেন " এ ঠাকুরটীর আটপুণের অর্থাৎ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের মত আকার কি না আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।" রসসাগর প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "হুঁা আমি আট পুণে বটে, কারণ আমার দুই চোক, কিন্তু এ বেটার চারি পোণে এক চোক।" ইহা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন।

এক দিন সন্ধ্যাকালে এক সম্প্রদায় রাঢ় অঞ্চলীয় কালীয় দমন যাত্রা কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রসসাগর ও তাঁহার কতিপয় সমবয়স্ক আত্মীয় আনন্দময়ী দর্শনে গমন করিয়া যাত্রা সম্প্রদায়ের সন্ধান পাইলেন, এবং সেই রাত্রে পাড়ার মধ্যে তাহাদের গানের বায়না করিলেন। যাত্রা আরম্ভ হইল, এমন সময়ে যে ব্যক্তি যশোদা সাজে তাহার পীড়া হইল, সকলের অনুরোধে রসসাগর যশোদা সাজিলেন। ব্রজ গোপীগণ যশোদার নিকট কহিল, " মা যশোদা কৃষ্ণ আমাদের ননী চুরি করে খেয়েছেন," যশোদা কৃষ্ণকে কহিলেন, " বাপু চুরি করা মহা পাপ, এমন কর্ম্ম আর কখনো কর না।" দ্বিতীয়বার ব্রজগোপীগণ ঐরূপ অভিযোগ করিল। যশোদা পুনরায় কৃষ্ণকে কহিলেন, "কৃষ্ণ! কাজ বড় অন্যায় হচ্ছে, আমি একবার বারণ করেছি, তথাপি তোমার চৈতন্য হলো না? পুনরায় এমন কাজ হলে তোমাকে বিলক্ষণ দণ্ড দিব।" ব্রজগোপীগণ তৃতীয়বার আসিয়া অভিযোগ করিল, " মা, কৃষ্ণের জ্বালায় আর আমাদের এখানে বাস করা হয় না। এবার ছিকে ছিঁড়ে ভাণ্ড ভেঙ্গে ননী চুরি করে খেয়েছে।" এই কথা বলিবামাত্র যশোদা রূপী রসসাগর ক্রোধে অন্ধ হইয়া বাম হস্তে কৃষ্ণের চূড়া ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে এক খানি জুতা লইয়া প্রহার করিতে ২ কহিতে লাগিলেন, " বেটাকে দুই দুই বার বারণ করেছি, তথাপি চুরি! আজ ননী চুরি, কাল খীর চুরি, পরশু ঘটী চুরি, এই রকম করে আমাকে কাঁদাবে মনে করেছ?" প্রহারের জ্বালায় অস্থির হইয়া কৃষ্ণ চীৎকার করিতে লাগিলেন, যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল, শ্রোতৃবর্গ হাঁসিয়া মজলিশ ফাটাইয়া দিলেন।

একদা রাণাঘাটে পালচৌধুরী বাবুদের বাটীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে। রসসাগর প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক শুনিতে আসিয়াছেন, কিন্তু এত লোক সমারোহ হইয়াছে যে, তাঁহারা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। কিরূপে প্রবেশ করা যায় ভাবিতেছেন, এমন সময় বাসুদেব সাজিয়া প্রবেশ করিতেছে। রসসাগর তাহাকে সজোরে ধরিলেন, মুনিগোঁসাই

বাসুদেব বলিয়া যতই চীৎকার করে, বাসুদেব ততই চীৎকার করিয়া উত্তর দেয় যে "আমার নড়িবার যো নাই, আমাকে এক বামুনে ধরেছে।" বাবুরা চমৎকৃত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন যে রসসাগর বাসুদেবকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রসসাগর কহিলেন, "এরূপ না করিলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই কৈ?" তাঁহারা তখন আগ্রহাতিশয় সহকারে রসসাগর ও তৎসঙ্গীদিগকে বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া উত্তম স্থানে বসাইয়া দিলেন। এরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে গৃহ প্রবেশ দুঃসাধ্য হইত।

রসসাগরের এরূপ কার্য্য অনেক আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার অবতারণা করিলাম না। এক্ষণে তাঁহার কতিপয় সমস্যা পূরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

একদা রাজা গিরিশচন্দ্র অন্তঃপুরে রাণীর সহিত কি কলহ করিয়া রাণীকে বিবিধ অপ্রিয় বচন কহেন, তাহাতে রাণী কহেন "তুমি স্বামী, ভগবান্ তোমাকে বল্‌তে দিয়াছেন, বল বল বল।" রাজা ক্রোধভরে বাহিরে আসিতেছেন, সম্মুখে রসসাগরকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—"বল বল বল।" রসসাগর পূরণ করিলেন;—

দম্পতি-কলহে স্বামী হয়ে ক্রোধ মন।
কহেন প্রেয়সী প্রতি অপ্রিয় বচন॥
পতি বাক্যে সতী-চক্ষে জল ছল ছল।
বলিতে দিয়াছে বিধি বল বল বল॥

পাঠকবর্গ দেখুন, রসসাগর কতদূর ক্ষমতাপন্ন দ্রুত কবি ছিলেন"। প্রশ্নকারীর অবস্থা দর্শনে মনের ভাব অনুভব করিতে পারিতেন। একদা রাজা প্রশ্ন করিলেন, "পায়, পায়, পায় না" রসসাগর তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন;—

চিনিতে নারিনু আমি, আইল জগৎ স্বামী,
মাগিল ত্রিপদ ভুমি, আর কিছু চায় না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে দেখি সর্ব্বনাশ
স্বর্গ মর্ত্য দিয়ে আশ, পরিতোষ হয় না॥
দিয়া সকল সম্পদ, বাঁকি আছে এক পদ,
এ দেখি ঘোর বিপদ, ঋণ শোধ যায় না।
কি আর জিজ্ঞাস প্রিয়ে, বৃন্দাবলী দেখ গিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তৎপরে জিজ্ঞাসিলেন "পায় পায় পায়।" রসসাগর পূরণ করিলেন;

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী, বলিরাজ শুন বলি
আসিয়াছে বনমালী, ছলিতে তোমায়।
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে, বলি জয় জয়॥
এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ করিলে চক্রী,
এ দেহ করিয়া বিক্রী, ধরহে মাথায়।
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্ম্মের ফের,
মিলাইবে বামনের, পায় পায় পায়॥

অনেকে কহেন উপরি উক্ত কবিতাদ্বয় রসসাগরের নহে, উহা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচিত, কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি, যে রসসাগরই উক্ত কবিতাদ্বয়ের প্রণে-

তা। একদা মহারাজ প্রশ্ন করিলেন "টুক্ টুক্ টুক্।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

দেবাসুরে যুদ্ধ যবে কৈলা ভগবতী।
পদভরে টলমল রসাতল ক্ষিতি॥
অধৈর্য্য দেখিয়া হর, পেতে দিলেন বুক।
হর হৃদে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্॥

মহারাজ রসসাগরের ক্ষমতা বুঝিবার জন্য কহিলেন, "মনের মত হইল না।" রসসাগর আবার পূরণ করিলেন ;—

কৈলাশেতে বাস সদা স্থির ভগবতী।
পৃথিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি॥
যুদ্ধ কালে সুর অরি পেতে দিল বুক্।
অসুরের কাঁধে পদ টুক্ টুক্ টুক্।

রাজা তথাপি কহিলেন "মনমত হয় নাই।" রসসাগর পুনরায় পূরণ করিলেন ;—

বৈষ্ণব হইয়া যেবা মজে কৃষ্ণপদে।
রাধাকৃষ্ণ বিনা তার অন্য নাই হৃদে॥
নয়ন মুদিয়া দেখে সকলি কৌতুক।
হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্।

তথাপি রাজা সন্তুষ্ট হইলেন না, রসসাগর পুনরায় পূরণ করিলেন ;—

পথমধ্যে দাঁড়াইয়ে পরমা সুন্দরী।
ভুবন মোহন রূপ যেন বিদ্যাধরী॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ শশী জিনি মুক।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা টুক্ টুক্ টুক্॥

রাজা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরস্কার প্রদান করিলেন। এরূপ ক্ষমতা সংসারে অতি বিরল। একদা প্রশ্ন হইল "রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।" প্রশ্ন শুনিয়া সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইল, সকলেই ভাবিতে লাগিল, হয়তো রসসাগর এবার ঠকিলেন। রসসাগর তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন ;—

লক্ষ্মীনারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে।
তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে॥
তৃণ কাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল।
রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল॥

এখানে লক্ষ্মী শব্দে তণ্ডুল ও নারায়ণ শব্দে জল বুঝায়। অন্নপাকের সময়ে যত জ্বাল পাইতে থাকে, জল ততই তণ্ডুলের মধ্যে প্রবেশ করে। দ্রুত রচনায় এতদূর পর্য্যন্ত ভাব টানিয়া আনা সাধারণ ক্ষমতার বিষয় নহে। একবার প্রশ্ন হইল "কাট পাথরে বিশেষ কি ?" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

তোমার চাল না চুলো, ঢেঁকী না কুলো
পরের বাড়ী হবিষ্যি।
আমার নাই লক্ষ্মী, দীন দুঃখী,
কতকগুলি কুপুষ্যি॥
যখন ঠেকবে পা, ঘুচবে লা,
লা হয়ে যাবে মনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাট পাথরে বিশেষ কি ?

বিশ্বামিত্র মুনি রাম লক্ষ্মণ সহ মিথিলা গমন কালে মধ্যে এক নদীতে পার হইবার প্রয়োজন হওয়ায়, মাঝী

তাঁহাদের পার করিতে কোনমতে স্বীকৃত হয় না; তাহার কারণ এই যে মাঝী পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, রামচন্দ্রের পদস্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হইয়াছে। সে কহিল পাছে নৌকাও মানুষ হয় এই ভয়ে সে পার করিতে সাহসী নয়। মাঝী এই ভাবে অপভাষায় বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া উপরি উক্ত শ্লোক কহে। একদা প্রশ্ন হইল "বড় দুঃখে সুখ।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে
চকা কয় চকী প্রিয়ে এবড় কৌতুক।
বিধি হতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ॥

একদা রসসাগর কতিপয় বন্ধু সমেত শান্তিপুরের ঘাটে স্নান করিতেছেন, এমন সময় ডাকওয়ালা আসিয়া ঘাটে নৌকা নাই দেখিয়া মুকুন্দ নামক ঘাটমাঝীকে "মুকুন্দ, মুকুন্দ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। এমন সময় একজন কহিলেন "রসসাগর! মুকুন্দ মুরারে।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

পাপের পুলিন্দা বতে ভগ্ন হলো পা রে।
নিয়মিত ঘন্টা মধ্যে যেতে হবে পারে॥
নায়েতে নাহিক মাঝী ডাক রসনারে।
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে॥

পাঠক মহাশয় দেখিবেন, উপরি উক্ত কবিতায় দুই ভাব লক্ষিত হইবে। একদা প্রশ্ন হইল, "বদর বদর।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

প্রকোষ্ঠ ভাঙ্গিলে হয় সকলি সদর।
টাকা কড়ি না থাকিলে না থাকে কদর
শাল রুমাল ঘুচে গেলে চাদরে আদর।
পাথারে পড়িলে তরি বদর বদর॥

রামগোবিন্দ নামক একজন শান্তিপুর নিবাসী গোস্বামী ভট্টাচার্য্য একদিন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রসসাগরের সহিত সাক্ষাতের পর "লাগে তীর না লাগে তুক্কা" এই প্রশ্ন করিলেন। তাহাতে রসসাগর গোস্বামী মহাশরকে লক্ষ্য করিয়া নিম্ন লিখিত উত্তর করিলেন ;—

গোঁসাই গোবিন্দ প্রেমের ভুক্কা।
গ্রন্থপাঠ গাঁজা হুঁক্কা॥
ধরেন কান লাগান ফুক্কা।
লাগে তীর না লাগে তুক্কা॥

একবার প্রশ্ন হইল "সেই তো বটে এই।" রসসাগর উত্তর করিলেন ;—

তরি বৈ আমার হরি আর কিছুই নেই।
চরণ দুখানি আন আপনি ধুয়ে দেই॥
নাবিক স্বজাতি পদ পরশিলে যেই।
ভবনদীর কাণ্ডারী সেই তো বটে এই॥

ক্রমশঃ।

সঙ্গীত-শাস্ত্রানুযায়ী নৃত্য ও অভিনয়।

(শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।)

নৃত্য মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং কি আদিম কালে, কি আধুনিক সুসভ্য কালে সকল সময়েই ইহা প্রচলিত। আদিমকালে অসভ্য নৃত্য এক্ষণে সভ্য কালে নানা রূপান্তর সহকারে, সভ্য সমাজের অভিনয় প্রথার একটী প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই নৃত্য চিরকাল হইতেই প্রচলিত। সকল প্রকার ধর্ম্ম গ্রন্থেই নৃত্যের উল্লেখ আছে। স্বয়ং মহাদেব নৃত্য করিতেন, স্বর্গে গন্ধর্ব্ব-কন্যাগণ নৃত্য করিয়া দেবতাগণের মনোহরণ করিতেন। মহর্ষি ভরত নাট্য শাস্ত্র প্রণেতা, তিনিই স্বর্গে অপ্সরাগণকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। দেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিলে মহাপুণ্য সঞ্চার হয়। চৈতন্যদেব বৈষ্ণববৃন্দকে হরিনামোচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে বিশেষ উপদেশ দিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন কালে গ্রীকগণ উৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গান করিতে করিতে গ্রাম্য দেবতার মন্দির প্রদক্ষিণ করিত। য়ীহুদিগণের মধ্যে নৃত্য অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। ইস্ত্রেলগণ শুষ্ক বালুকা ভূমির ন্যায় লোহিত সাগর পার হইলে, মোসেস এবং মিরাএম আনন্দ ধ্বনি সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন। ডেবিডও নৃত্য করিতেন। গ্রীকগণের নৃত্যে অভিনয় প্রথার অন্তর্ভূত। তাঁহাদিগের ইউমিনিডেশের অর্থাৎ ভয়ানক রসের নৃত্য দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইত। গ্রীক শিল্পবিদ্যা বিশারদগণের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিতে নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়াছে। হোমর, অরিস্তুতল, পিণ্ডার সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে নৃত্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অরিস্তুতল নৃত্যের বিবিধ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া " পোইটীকুশ " গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়াছেন। স্পার্টানগণ যুদ্ধ কালে নৃত্য করিবার জন্য পঞ্চমবর্ষ হইতে নৃত্য শিক্ষা করিত এবং তাহারা এজন্য উত্তম পারদর্শী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিত হইত। তাহাদিগের যুদ্ধের এই নৃত্যের নাম " পাইরিক " নৃত্য। প্রাচীনকাল হইতেই প্রকাশ্য স্থলে নৃত্য ব্যবসায়ী নটগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইত। সম্ভ্রান্ত রোমকগণ ধর্ম্ম কার্য্য ভিন্ন আমোদের জন্য নৃত্য করিতেন না। আমোদের নিমিত্ত নৃত্য ব্যবসায়ীগণ দ্বারা সম্পাদিত হইত। মিশরদেশে নর্ত্তকীগণের নাম আলমী। তাহারা উত্তম উত্তম কবিতা গান করিতে করিতে নৃত্য করে, ইহার সহিত হিন্দুস্থানী নাচের সাদৃশ্য আছে।

ইউরোপীয়গণের মধ্যে " বলে"

সম্ভ্রান্তবর্গ হইতে সাধারণ লোক সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। কোন কামিনী বা পুরুষ যিনি "বলে" নাচিতে না পারেন, তিনি অকর্ম্মণ্য,—সভ্য সমাজে ভুক্ত হইবার যোগ্য নহেন। এই "বলের" ও নৃত্য বিবিধ প্রকার যথা—পোল্‌কা, কোয়াড্রিল, কনট্রি-ড্যানশ্‌, ইত্যাদি; ইহা ভিন্ন অভিনয় কার্য্যে অনেকপ্রকার নৃত্য আছে—যথা—ব্যালেট, প্যাণ্টোমাইম প্রভৃতি। আমরা এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশের প্রস্তাবানুসারে বিদেশীয় কোন নৃত্যের উল্লেখ না করিয়া সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী প্রাচীন ও মধ্যকালের আর্য্য জাতির নৃত্যের বিবরণ লিপি বদ্ধ করিতেছি।

আমাদিগের পুরাণ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে নৃত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

"নৃত্যেনালমরূপেনসিদ্ধির্নাট্যস্য রূপতঃ।
চার্ব্বাধিষ্ঠান বন্নৃত্যং নৃত্য মন্যদ্বিড়ম্বনা।"

এই শ্লোক দ্বারা রূপহীন নট বা নটীর নৃত্যকে নিন্দা করিতেছেন।

বরাহ পুরাণে—"নৃত্যমানস্য ফলং যচ্চ বসুন্ধরে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শোকর মাহাত্ম্যে নর্ত্তকের গতি কথিত হইয়াছে।

অগ্নি পুরাণে—"দৃষ্ট্বাসম্পূজিতং দেবং নৃত্য মানোঽনুমোদয়েৎ"। অর্থাৎ দেবতার পূজা দেখিয়া যথাশাস্ত্র নৃত্য দ্বারা হর্ষ বিস্তার করিবেক।

পুনশ্চ বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে "যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা"—"নৃত্যং দত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ম্"—"স্বয়ং নৃত্যেন সম্পূজ্য তস্যৈবানুচরোভবেৎ।" "নৃত্যতাং স্ত্রীপতেরগ্রে তালিকা বার্দনৈভূশম্"। "যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করে"—"দেব দেবীর পূজায় নৃত্য করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়"—"স্বয়ং নৃত্য দ্বারা দেবের পূজা করিলে, সেই দেবের পরলোকে অনুচর হয়।"

রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নৃত্যের বিশেষ বিস্তার আছে। মহাভারত বিরাট পর্ব্বে লিখিত আছে অর্জ্জুন উত্তম নর্ত্তক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি বিরাটের অন্তঃপুরে কামিনীগণকে নৃত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্মৃতিতে নটের অথবা নটীর অন্ন অগ্রাহ্য বলিয়া ব্যবস্থা লিখিয়াছেন যথা—"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।"

(যম সংহিতা।)

অর্থাৎ রজক, চর্ম্মকার, নট ইত্যাদি ৭ প্রকার জাতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ইহাদের অন্ন ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এইরূপ মনুসংহিতা প্রভৃতি সর্ব্ব সংহিতাতে নট জাতির এবং নাট্যোপজীবীর উল্লেখ আছে, সুতরাং নৃত্য চর্চ্চা এদেশের অতি পুরাতন।

তাল, মান, রস আশ্রয় করিয়া

সবিলাস অঙ্গ বিক্ষেপের নাম নৃত্য যথা—

"দেবকন্যা প্রতীতো যস্তালমান রসাশ্রয়ঃ। সবিলাসোঽঙ্গ বিক্ষেপো নৃত্য মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।"

(সঙ্গীত দামোদর।)

নৃত্য দুই জাতীয়—তাণ্ডব ও লাস্য। পুং নৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রী নৃত্যকে লাস্য কহে যথা—

"স্ত্রী নৃত্যং লাস্যমাখ্যাতং পুং নৃত্যং তাণ্ডবং স্মৃতং।"

(সঙ্গীত নারায়ণ)

তাণ্ডব নৃত্যের বিধি তাণ্ডি নামক মুনি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ভরত মল্লিক অমর কোষের টীকায় বিস্তার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন। তাণ্ডব ও লাস্য এই দ্বিবিধ নৃত্যই দুই প্রকার। দুই প্রকার তাণ্ডবের প্রথম পেবলী আর দ্বিতীয় বহুরূপ, যথা— [মুচ্যতে।

তাণ্ডবঞ্চ তথা লাস্যং দ্বিবিধং নৃত্য পেবলি বহুরূপঞ্চ তাণ্ডবং দ্বিবিধং মতম্।

(সঙ্গীত দামোদর)

অভিনয় শূন্য অঙ্গ বিক্ষেপ মাত্রকে পেবলী, আর ছেদ, ভেদ, প্রভৃতি বহুবিধ অভিনয় সহকারে যে অঙ্গ বিক্ষেপ তাহাকে বহুরূপ বলে।

লাস্য নৃত্যও দুই প্রকার। একের নাম ছুরিত অপরের নাম যৌবত। ভাব রসাদি ব্যঞ্জক অভিনয় সহকারে নায়ক নায়িকা উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন চুম্বনাদি পূর্ব্বক যে নৃত্য তাহাকে ছুরিত বলে, আর কেবল নর্ত্তকী স্বয়ং যে লীলা সহকারে নৃত্য করে তাহাকে যৌবত কহে যথা— [মুচ্যতে।

ছুরিতং যৌবতঞ্চেতি লাস্যং দ্বিবিধ যত্রাভিনয়ভাবৈর্ভাব রসৈ রাশ্লেষ চুম্বনৈঃ, নায়িকা নায়কৌ রঙ্গে নৃত্যতে শ্চ্ছুরিতংহিতং। মধুরং বদ্ধ লীলাভির্নটীভির্যত্র দৃশ্যতে—বশীকরণ বিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতম্ (সঙ্গীত দামোদর)

যত প্রকার বিশেষ ২ নৃত্য আছে তত্তাবতের সাধারণ নাম নর্ত্তন। ফল, চিত্ত-রঞ্জক অঙ্গ-বিক্ষেপের নামই নর্ত্তন। যথা নর্ত্তক নির্ণয়ে—"অঙ্গ বিক্ষেপ বৈশিষ্টং জন চিত্তানুরঞ্জনম্। নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা।"

ইহার অর্থ সহজ। সাধারণ নর্ত্তনের ত্রিবিধ জাতি আছে।—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। যথা—

—"নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ত্রিবিধং তৎ [illegible]র্ত্তিতম্"।

নাট্য—"নাটকাদি কথা দেশ বৃত্তি ভাব রসাশ্রয়ং চতুর্দ্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ।"

নাটকাদি অর্থাৎ দৃশ্য কাব্য ও তদ্গত কথা, দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রস চারি প্রকার অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে নাট্য বলা যায়।

নৃত্য—"অপুস্ত সর্ব্বাভিনয় সম্প-

ন্নং ভাব ভূষিতং। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরং নৃত্যং সর্ব্ব লোক মনোহরম্।"

কোন আখ্যায়িকা পুস্তকের অনু-গত নহে, নেপথ্য বিধানের অধীন নহে অথচ রস ভাবাদির দ্বারা বিভূষিত ও তত্তৎ রসভাবাদি অভিনয় দ্বারা প্রদ-র্শিত হইলে তাহাকে নৃত্য বলা যায়। ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলে সকল লোকে-রই মনোহারী হয়। এই নৃত্যের লক্ষণ হিন্দুস্থানের তয়ফা ওয়ালিদের মধ্যে অনেকাংশে দৃষ্ট হয়।

নৃত্ত—"হস্ত পদাদি বিক্ষেপৈশ্চমৎ-
কারাঙ্গশোভিতং।
ত্যক্ত্বাভিনয়মানন্দকরং নৃত্তং জন
প্রিয়ং।"

অভিনয় বর্জ্জিত চমৎকার জনক অঙ্গ বিক্ষেপ বিশেষের নাম নৃত্ত। এই নৃত্তের ৩ প্রকার ভেদ আছে, যথা—"নৃত্তে ভেদ ত্রয়ং চাস্তি বিষমং বিকটং লঘু।"

বিষম—"শস্ত্র সঙ্কট রজ্জ্বাদি ভ্রমণং
বিষমং হি তৎ।"

অস্ত্র সঙ্কটের মধ্যে এবং রজ্জুতে পরিভ্রমণ ইত্যাদি প্রকারের নাম বিষম নৃত্ত। এই নৃত্য মাদ্রাজী বাজীকরদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

বিকট—"বিরূপতোঽঙ্গ বেশাদি
ব্যাপারং বিকটং মতম্।"

বৈরূপ্যজনক বেশ ভূষাদি ব্যাপা-রকে বিকট নৃত্ত বলে।

লঘু—"উপেতং করণৈরল্পৈ-
রুৎপ্লুতাদ্যৈর্লঘু স্মৃতং।"

অল্প উপকরণ অবলম্বন করিয়া উৎ-প্লুতাদি গতি বিশেষের নাম লঘু নৃত্ত। এই নৃত্ত রাসধারীদিগের মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।

অভিনয়।

'অভি' এই উপসর্গ পূর্ব্বক 'নিঞ্' ধাতু হইতে অভিনয় শব্দ উৎপন্ন হই-য়াছে। অভির অর্থ সাংমুখ্য, নিঞ্ ধাতুর অর্থ পাওয়ান; এতাবতা তদুভয়ের যোগে এইরূপ অর্থ পাওয়া গেল যে প্রয়োগ সকল যে প্রক্রিয়া দ্বারা সা-ক্ষাৎকারের ন্যায় দর্শকের সম্মুখে উপ-স্থিত হয়, সেই প্রক্রিয়া বিশেষের নাম অভিনয়। যথা—

"অভি পূর্ব্বস্তু নিঞ্ ধাতুরাভি-
মুখ্যার্থ নির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভি-
নয়ঃ স্মৃতঃ।"

অভিনয় ৪ প্রকার।

"চতুর্দ্ধাভিনয়ঃ সঃ স্যাৎ বাচি-
কাহার্য্য সাত্ত্বিকাঃ।
আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ
শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"

বাচিক, আহার্য্য, সাত্ত্বিক ও আ-

ঙ্গিক এই চারি প্রকার অভিনয়। তন্মধ্যে বাচিক অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ ও কঠিন।

"অঙ্গ নেপথ্য সত্বানি বাগর্থং ব্যক্তয়ন্তিহি।
তস্মাদ্বাচঃ পরং নাস্তি বাক্‌হি সর্ব্বস্য কারণম্।"

যেহেতু অঙ্গ, নেপথ্য ও নেপথ্য সত্ব অর্থাৎ প্রাণী, সকলকেই সর্ব্বপ্রকার অর্থ বাক্য দ্বারা প্রকট করিতে হয়, এহেতু বাচিক অভিনয় শ্রেষ্ঠ।

বাচিক—"গদ্য পদ্যাদি ভাষা প্রাকৃত সংস্কৃতৈঃ।
সার্থকৈ রচিতো বান্যা বাচিকঃ সোভিধায়তে।"

গদ্য পদ্য বা তদুভয় লক্ষণ বিবর্জ্জিত অর্থাৎ খণ্ড বাক্য, উহা প্রাকৃতই হউক, আর সংস্কৃতই বা তদুভয়ের সংযোগ করিয়াই হউক, অর্থানুরূপ রচনা করিয়া প্রয়োগ উপস্থিত করিলে তাহা বাচিক অভিনয়। ইহা অস্মদ্দেশের কথকদিগের প্রধান অবলম্বন।

আহার্য্য—"আহার্য্যাভিনয়ো নাম জ্ঞেয়ো নেপথ্য যো বিধিঃ।"

নেপথ্য বিধানে সাধ্য (অর্থাৎ সাজ্ গোজ্) অভিনয়ের আহার্য্যাভিনয়।

নেপথ্য বিধি ৪ প্রকার। পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গ রচনা। যথা—"চতুর্ব্বিধস্ত নেপথ্যং পুস্তোলঙ্কারক স্তথা। সংজীব শ্চাঙ্গরচনাচ—"

পুস্ত নেপথ্য আবার ৩ প্রকার। সন্ধিমা, ভাজিমা, ও চেষ্টিমা। বস্ত্র বা চর্ম্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্ম্মাণ করা যায় তাহার নাম সন্ধিমা। সেই দৃশ্য যদি চন্দ্র ঘটিত হয় তবে তাহা ভাজিমা। যে দৃশ্য চেষ্টমান থাকে তাহা চেষ্টিমা।

পুস্ত—"শৈল যান বিমানানি চর্ম্ম বর্ম্মায়ুধ ধ্বজাঃ।
যানি ক্রিয়ন্তে তান্যের সপুস্ত ইতি সঙ্গিতঃ।"

পর্ব্বত, যান, বিমান (ব্যোমচারিযান) চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা প্রভৃতিকে পুস্ত জাতীয় বলা যায়।

অলঙ্কার—"অলঙ্কারশ্চ বিজ্ঞেয়ো মাল্যাভরণ বাসসাং।
নানাবিধ সমাযোগো যথাঙ্গেষু বিনির্ম্মিতঃ।"

মাল্য, আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথা যোগ্য তত্তদঙ্গের নিমিত্ত যে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার নাম অলঙ্কার নেপথ্য।

সংজীব—যঃ প্রাণিনাং প্রবেশাস্তু সসংজীব ইতি স্মৃতঃ।"

নেপথ্য হইতে যে প্রাণি-প্রবেশ হয় তাহার নাম সংজীব।

অঙ্গ রচনা—"তৈরঙ্গরচনা কার্য্যা নানা বেশ প্রধাতঃ।"

পূর্ব্বোক্ত মাল্যাভরণাদিও শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য ভাবে যে বিন্যাস করা যায় তাহার নাম অঙ্গরচনা।

রক্ত, পীত, শ্বেত ও নীল এই ৪

বর্ণই প্রধান। এতৎ সংযোগে অন্যান্য বিবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইবেক। যথা শ্বেত ও নীল যোগ করিলে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। সংযোগেতে বর্ণের ভাগ বিশেষ বিশেষ রূপে লিখিত আছে। তাহার আর প্রকট করিলাম না।

সুখ দুঃখাদি জনিত অন্তঃ কার্য্যকে সত্ব বলে (মনের বিবিধ বিকার) তৎ প্রযুক্ত ভাবের নাম সাত্বিকভাব। সেই সাত্বিক ভাব ৮ প্রকার,ইহা বাহ্য শরীরের ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। 'স্তম্ভ','স্বেদ','রোমাঞ্চ', 'স্বরভেদ', 'বেপথু', 'বিবর্ণতা', 'অশ্রুপ্রলয়', যথা— "সুখদুঃখ কৃতো ভাবো মনসঃ মীরিতং। তৎ প্রযুক্তশ্চ ভাবশ্চ সাত্বিকঃ সোপি চাষ্টধা। স্তম্ভঃ স্বেদশ্চ রোমাঞ্চ স্বরভেদোহম বেপথুঃ। বৈবর্ন্ন মশ্রুপ্রলয়ঃ-"

(নর্ত্তন নির্ণয়)

রঙ্গ প্রবেশের অনন্তর যে নৃত্ত তাহা ২ প্রকার আছে। একের নাম বন্ধ নৃত্ত, অন্যের নাম অবন্ধ। বন্ধ নৃত্যে গতি নিয়ম এবং চারী প্রভৃতি বিবিধক্রিয়ার নিয়ম থাকে, অবন্ধ নৃত্যে তাহা থাকে না।

নৃত্যের মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, অনেক জ্ঞাতব্যও আছে। মস্তক, চক্ষু, ভ্রূ, মুখ, বাহু, হস্তক, চালক, তলাহস্ত, হস্তপ্রচার, করকর্ম্ম, ক্ষেত্র, কটি, অঙ্ঘ্রি, স্থানক, চারী, করণ, রেচক, ইত্যাদি শারীরিক অনেক বিধ ব্যাপার আছে। নৃত্যশালা ও নটের লক্ষণ, রেখালক্ষণ, এবং নৃত্যাঙ্গ ও তাহার সৌষ্ঠব এবং চিত্রক, লাসক, মুদ্রা, প্রমাণ, সভা, সভাধর্ম্ম, সভাসন্নিবেশ, বৃন্দলক্ষণ, বংশীর প্রকার, ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য আছে। পণ্ডিত বিট্ঠল এই সকল ব্যাপার বিস্তার পূর্ব্বক নর্ত্তন নির্ণয়ের চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছেন। ৪র্থ প্রকার লয় উত্তরার্দ্ধের প্রতিজ্ঞা শ্লোক এই—

"অথাত্রাস্মিন্ শিরোক্ষিভ্রূ মুখরাগাশ্চ বাহবঃ। হস্তকা হস্তকরসা চালা হস্ত প্রচারকাঃ। করকর্ম্মাণি ক্ষেত্রাণি কট্যঙ্ঘ্রি স্থানকানিচ। চার্ব্বশ্চ ভূগতা ব্যোমগতাঃ করণ রেচকাঃ লক্ষণং নৃত্যশালায়া নটস্য চ সুলক্ষণং। রেখায়া লক্ষণং পশ্চাৎ লাস্যাঙ্গা নিচ সৌষ্ঠবং। চিত্রকং লাসকং মুদ্রা প্রমাণঞ্চ সভাসদঃ। সভাপতিঃ সভায়াশ্চ নিবেশো বৃন্দ লক্ষণং। বংশস্য লক্ষণং তত্র পশ্চাদ্রঙ্গ প্রবেশনং। বিবিধং নর্ত্তনং চাস্মিন প্রমহে লক্ষণং ক্রমাৎ।"

পণ্ডিত বিট্ঠল এই গুলিকে অতি বিশদরূপে বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অভিনয় সম্পর্কীয় যে কিছু তত্তাবৎ অতীব উত্তমরূপে বলিয়াছেন।

শিরঃ—"একোন বিংশধাভচ্চ"

শিরঃ সম্বন্ধে ১৯ প্রকার ক্রম আছে "সমং যুতং বিধূতঞ্চ" ইত্যাদি ক্রমে তত্তাবতের নাম লক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

দৃষ্টিঃ—"অদোষং ভাবসংব্যক্ত লোকানং দৃষ্টিরুচ্যতে।" দোষ রহিত রসভাবাদির ব্যঞ্জক অবলোকনের নাম দৃষ্টি। এই দৃষ্টি ৩ প্রকার। রস দৃষ্টি, স্থায়ি দৃষ্টি, সঞ্চারী দৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন ব্যভিচারা দৃষ্টিও আছে। নর্ত্তক বা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে এই দৃষ্টি বিজ্ঞান যেমন কঠিন, তেমন কঠিন আর কিছুই না। শৃঙ্গার, বীর, করুণা, প্রভৃতি দশপ্রকার রস ভাব এই দৃষ্টি দ্বারা মুর্ত্তিমান করিতে হইবে।

যেরূপে বা উপায়ে তাহা হয় তাহারও উপদেশ আছে। সে সকল ব্যক্ত করিতে গেলে বড় বাহুল্য হইয়া যায়। ফল রস দৃষ্টি ৮ প্রকার। স্থায়িভাব প্রকাশক দৃষ্টি ৮, ব্যভিচারা দৃষ্টি ২০ একুনে ৩৬ প্রকার দৃষ্টি আছে।

"দৃষ্টি চারানুগামিন্য স্তারা কর্ম্ম পুটাদয়ঃ" ইত্যাদি, তদ্ভিন্ন তারা কর্ম্ম অর্থাৎ চক্ষের মণি বিকার সাধক ব্যাপারও আছে।

ভ্রূঃ—৭ প্রকার ভ্রূ ভেদ আছে। সহজা, উৎক্ষিপ্তা, কুঞ্চিতা, রেচিতা, পতিতা, চতুরা, ভ্রূকুটী এই ৭।

"সহজা রেচিতোৎক্ষিপ্তা কুঞ্চিতা
পতিতা তথা।
চতুরা ভ্রূকুটী চেতি সদ্ভিসা সপ্ত
ধোদিতাঃ॥"

"সহজাতু স্বভাবস্থা" ইত্যাদিক্রমে ঐ সকলের লক্ষণও উক্ত হইয়াছে।

মুখরাগঃ—"যে নাভি ব্যজ্যতে চিত্তবৃত্তির্দ্বারৈ রসাম্বিতা। রসাভিব্যক্তি হেতুত্বন্মুখরাগঃ স উচ্যতে॥"

অন্তরস্থ রস (ভাব) যদ্দ্বারা (মুখে) প্রকাশ পায়, তাদৃশ মুখবর্ণকে মুখ রাগ বলে। উহা ৪ প্রকার।

বাহুঃ—বাহু অর্থাৎ বাহুর গতি ১৬ প্রকার। ঊর্দ্ধ্ব, অধোমুখ, তির্য্যক্, অপবিদ্দ, প্রসারিত, আচিন্ত, মণ্ডল গতি, স্বস্তিক, চিন্থিতা, আবেষ্ঠিত, পৃষ্ঠানুগ, আবিদ্ধ, কুঞ্চিত, সরল, নম্র, আন্দোলিত, উৎসারিত যথা—

"ঊর্দ্ধ্বশ্চাধোমুখস্তির্য্যাপবিদ্ধঃ
প্রসারিতঃ।
অচিন্ত্যো মণ্ডলগতিঃ স্বস্তিকো
বেষ্টিতা বপি॥
পৃষ্ঠানুগস্তথাবিদ্ধঃ কুঞ্চিতঃ সরল
স্তথা।
নম্র আন্দোলিতঃ পশ্চাদুৎসারিত ইতি ক্রমাৎ॥"

ইহাদের লক্ষণ ও সাধন প্রকারও বর্ণিত আছে।

হস্তক—"নর্ত্তনে রক্তিজন কোঽব্যক্তবানর্থ বোধকঃ।
পাদেতরাঙ্গুলিন্যাস বিশেষো
হস্তক স্মৃতঃ॥"

নৃত্য কালে আনুরক্তি জনক, অব্যঙ্গ অথচ অর্থপ্রকাশক যে হস্তাঙ্গুলির বিন্যাস বা বিক্ষেপ বিশেষ তাহার নাম হস্তক। উহা ৩ প্রকার। সংযুত, অসংযুত ও নৃত্য হস্ত। ইহাদের লক্ষণ ও সাধন উক্ত হইয়াছে। পরন্তু কথিত সংযুত হস্তের আবার ৩৮ প্রকার ভেদ আছে। অসংযুত ও নৃত্যহস্তেরও ৩২ প্রকার ভেদ ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম আছে যথা—

"পতাকো হংসপক্ষশ্চ গোমুখশ্চতুর স্তথা।
নিকুঞ্চকঃ সর্পশিরাঃ পঞ্চাস্য শ্চর্দ্ধ চন্দ্রকঃ॥
চতুর্ম্মুখ স্ত্রি দ্বিমুখৌ সুচ্যাস্য স্তাম্র চূড়কাঃ।
সন্দেশ হংস চক্রাখ্যোতৃতঃ স্যাদ্রতা গৃধ্রকঃ॥
খণ্ডাস্যো মৃগশীর্ষশ্চ মুকুলঃ পদ্ম কোশকঃ।
কুর্ম্ম নামাভিধো হস্ত অল পল্লব পল্লবাঃ॥
অল পদ্মাতি ঘোরাল শুকাস্যো- লতাভিধাঃ।

ইত্যাদি—

পতাক, হংস পক্ষ, গোমুখ, চতুর, নিকুঞ্চক, সর্পশিরা, পঞ্চাস্য বা সিংহাস্য, অর্দ্ধ চন্দ্রক, চতুর্ম্মুখ, দ্বিমুখ, সুচ্যাস্য, তাম্রচূড় ইত্যাদি—

চালকাঃ—বংশী বা অন্যবিধ লয় যন্ত্রের অনুগত করিয়া হস্ত বিরেচনের নাম চালক।

তলহস্ত বা হস্ত প্রচার—পার্শ্ব, তির্য্যক্, সম্মুখ প্রভৃতি স্থান বিশেষে যে হস্তান্দোলন তাহার নাম তল হস্ত।

কর কর্ম্ম—"উৎকর্ষণং বিকর্ষঞ্চ তথা চাকর্ষণং পুনঃ।
পরিগ্রহো নিগ্রহশ্চ ত্বাহ্বানং রোধনং তথা।
সংশ্লেষশ্চ বিয়োগশ্চ রক্ষণং মোক্ষণং তথা।
বিক্ষেপে ধুননঞ্চৈব বিসর্জ্জস্ত- র্জ্জনস্তথা।
ছেদনং ভেদনঞ্চৈব স্ফোটনং মোটনং তথা।
তাড়নঞ্চেতি হস্তানাং স্ফুটং কর্ম্মাণি বিংশতিঃ।"

উৎকর্ষণ, (ঊর্দ্ধে) বিকর্ষণ, (দূরে) আকর্ষণ, (সম্মুখে) পরিগ্রহ, নিগ্রহ, আহ্বান, রোধন, (অবরোধ করার মতন) সংশ্লেষ, বিশ্লেষ, (ছড়াইয়া দেওয়া) রক্ষণ, মোক্ষণ, (ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি) বিক্ষেপ, ধুনন, (কম্পন) চির্জ্জন, তর্জ্জন, ছেদন, ভেদন, স্ফোটন, (ফুটান) মোটন (মটকান) তাড়ন এই সকল হস্ত কর্ম্ম নামে কথিত হয়।

হস্ত ক্ষেত্রং—"পার্শ্বদ্বন্দং পুরস্তাচ্চ পশ্চাদূর্দ্ধমধঃ শিরাঃ।
ললাট কর্ণ স্কন্ধোরো নাভয়ঃ কটি শীর্ষকে।

ঊরুদ্বয়ঞ্চ হস্তানাং ক্ষেত্রানীতি
ত্রয়োদশঃ।"

পার্শ্বদ্বয়, সম্মুখ, পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধ, অধ, মস্তক, ললাট, কর্ণ, স্কন্ধ, নাভি, কটি, শীর্ষ, ঊরুদ্বয়,—এই ত্রয়োদশ হস্ত-ক্ষেত্র অর্থাৎ হস্ত বিন্যাসের প্রধান স্থান।

কটিঃ—নির্দ্দোষ নৃত্য যোগ্যা কৃশা দেহ মধ্যে কটি ৬ প্রকার। যথা—

"সমাচ্ছিন্না নিবৃত্তাচ রেচিতা
কম্পিতা তথা।
উদ্বাহিতোত সা প্রোক্তা ষড়্-
বিধা চাথ লক্ষণম্।"

সমাচ্ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, কম্পিতা, উদ্বাহিতা। ইহাদের লক্ষণ ও সাধন প্রকারও নির্দ্দিষ্ট আছে।

চরণ—নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ ১৩ প্রকার যথা—

"সমোঽঞ্চিতঃ কুঞ্চিতশ্চ সূচ্য-
গ্রস্থল সঞ্চরঃ।
উদ্ঘাটিতো ঘট্টিতশ্চ ঘা উ-
ত্তোৎ সেধকস্ততঃ।
বার্টিতো মর্দ্দিত শ্চাথ পার্ষ্ণি-
গ শ্চাত্রগস্তথা।
পার্শ্বাশ্চেতি পাদঃস্যাৎ ত্রয়ো-
দশ বিধ স্ততঃ।"

সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্যগ্র, তলসঞ্চর, উদ্ঘট্টিত, ঘট্টিত, ঘট্টিত উৎসেধক, বার্ট্টিত, (ক্রোটিত), মর্দ্দিত, পার্ষ্ণিগ, অগ্রগ, পার্শ্বগ।

স্থানক—"সন্নিবেশ বিশেষোঽঙ্গে স্থানং—"

আনুরক্তি জনক অঙ্গে অঙ্গ সন্নিবেশ বিশেষের নাম স্থানক। ইহা অসংখ্য প্রকার। তন্মধ্য হইতে নর্ত্তন নির্ণয়কার ২৭টীর লক্ষণ ও সাধন প্রকার বলিয়াছেন ঐ ২৭টীর নাম এই—

—সমপাদ, পার্ষ্ণি বিদ্ধ, স্বস্তিক, সংহত, উৎকট, অর্দ্ধচন্দ্র, যান (বা বর্দ্ধমান,) নন্দ্যাবর্ত্ত, মণ্ডল, চতুরস্র, বৈশাখ, আবহিন্নক, পৃষ্ঠোত্থান, তলোত্থান, অশ্বক্রান্ত, একপাদিক, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, আলাঢ়, প্রত্যালাঢ়, খণ্ডসূচি, সমসূচি, বিষম সূচি, কুর্ম্মাসন, নাগবন্ধ, গারুড়, বৃষভাসন।

চারী—ইহার সাধারণ লক্ষণ এই যে পাদ, জঙ্ঘা, বক্ষ ও কটি এই স্থানকে আয়ত্ত করা। উহা আয়ত্ত হইলে তদ্দ্বারা চরণ করার নামও চারী। সঞ্চারণ বিশেষে উহার কোন অংশের নাম চারীকরণ, কোন অংশের নাম ব্যায়াম, এই ব্যায়াম পরস্পর ঘটিত অংশ বিশেষের নাম খণ্ড। খণ্ড সমূহের নাম মণ্ডল। ফল "চারীভিঃ প্রস্তুতং নৃত্যং চারীভি শ্চেষ্টিতং তথা। চারীভিঃ শাস্ত্র মোক্ষশ্চ চার্য্য যুদ্ধেষু কীর্ত্তিতাঃ।" চারী (সঞ্চারণ বিশেষ) দ্বারা নৃত্য প্রস্তুত হইয়াছে। চারী দ্বারা চেষ্টা সকল সম্পন্ন হইতেছে, চারী দ্বারা শস্ত্রক্ষেপ সাধিত হয় এবং চারী যুদ্ধেরও এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

চারী প্রথমত দ্বিবিধ। "ভৌমী চাকাশিকা চেতি দ্বিধা চারী প্রকীর্ত্তিতা।" ভৌমী অর্থাৎ পৃথিবী সম্বন্ধীয়া, আকাশিকা অর্থাৎ আকাশ অম্বন্ধীয়া। আকাশচারী ও ভৌমীচারী এই উভয় বিধ চারীর আশয় ৮২ প্রকার ভেদ আছে। তত্তাবতের নাম, লক্ষণ ও সাধন প্রকার নর্ত্তক নির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে। নামগুলি এই—

সম পাদা, স্থিতা বর্ত্তা, শকটাস্যা, বিচ্যবা, অর্ধ্যাঙ্গিকা, আ গতি, এলকা, ক্রীড়িতা, সমসয়িত, মত্তল্লী, মতল্লী, উৎস্যান্দিতা, উড্ডিত্য, স্যন্দিতা, বদ্ধা, জনিতা, উন্মুখী, রথচক্রা, পরাবৃত্ত, নূপুর পাদিকা (বিদ্ধিকা), তির্য্যত্তমুখা, মরালা, করি হস্তা, কুলীরীকা, বিশ্লিষ্টা, কাতরা, পার্ষ্ণি রেচিতা, ঊরু তাড়িতা, ঊরু বেণী, তলোদ্বৃত্তা, হরিণ ত্রাসিকা, অর্দ্ধ মণ্ডলিকা, তির্য্যক্কুকুঞ্চিতা, মদালসা, সঞ্চারিতা, উৎকুঞ্চিতা, স্তম্ভ ক্রীড়নিকা, লঙ্ঘিত জঙ্ঘা, স্ফুরিতা, আকুঞ্চিতা, সঙ্ঘটিতা, খুন্না, স্বস্তিকা, তলদর্শিনী, পুরাত্যুর্দ্ধ পুরাটী, সারিকা, স্ফুরিকা, নিকুট্টকালতা, আক্ষেপা, অর্দ্ধস্খলিতিকা, সমস্খলিতিকা, সৌখ্যা (এইগুলি ভৌমীচারীর জাতি) অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, মৃগপ্লুতা, ঊর্দ্ধ জানু রঞ্জিতা, সূচির্ব্বাদা, নূপুর পাদা, দোল পাদা, দণ্ডঘাদো, বিদ্যুদ্ভ্রান্তা, ভ্রমরী, ভুজঙ্গ ত্রাসিতা, ক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদ্বৃত্তিকা, আতপ্তা, পুরক্ষেপা, বিক্ষেপা, অপক্ষেপা, ডমরা, জঙ্ঘালম্বনিকা, অঙ্ঘ্রিতাড়িতা, লপ্তিকা, জঙ্ঘাবর্ত্তা, আবেষ্ঠনা, উদ্বেষ্ঠনা, উৎক্ষেপা, পৃষ্টোৎক্ষেপা, সূচিবিদ্ধা, প্রবৃত্তকা উন্মোলা, এই ৩১ আকাশ চারী জাতি।

করণ—"হস্ত পাদ সমযোগঃ করণং নর্ত্তনস্যচ।"

নৃত্যকালে যে হস্তে হস্তে পদে পদে বা হস্ত পদে সংযোগ করে তাহার নাম করণ। এই করণ অনন্ত প্রকার হইতে পারে, তন্মধ্যে কতকগুলির নিয়ম নর্ত্তক নির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে।

লীন, সমনখ, ছিন্ন, গঙ্গার তরল, বৈশাখ, রেচিত, পশ্চাজানিত, পুষ্পপুট, পার্শ্ব, জানু, ঊর্দ্ধজানু, দণ্ডপক্ষ, তলবিলাসিত, বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, চন্দ্রাবর্ত্তক, গুম্ভিত, ললাট তিলক, নাম লতা, বৃশ্চিক, (১৬) এই ষোলটীর লক্ষণাদি বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

রেচক—রেচক ৪ প্রকার "পাদয়োঃ করয়ো কট্যাঃ গ্রীবায়াশ্চ ভবন্তি তে।" পাদ রেচক, হস্ত রেচক, কটি রেচক, গ্রীবা রেচক। ইহাদের লক্ষণাদি তাবৎ উক্ত হইয়াছে।

অতঃপর প্রতিজ্ঞাত নৃত্যবস্তুর মধ্যে নৃত্যশালা, নটের লক্ষণ, রেখা লক্ষণ, লাস্যাঙ্গ, সৌষ্ঠব, চিত্র কর্ম্ম, মুদ্রা, লাসক, প্রমাণ, সভ্য, সভাপতি, সভাসন্নিবেশ, বৃন্দলক্ষণ, বংশলক্ষণ, রঙ্গ

প্রবেশ,—এই গুলিকে পরিত্যাগ করা গেল, কারণ এসকলের উপযোগ নাই।

উক্ত পদার্থের আবাপ, উদ্বাপ, সংযোগ, বিয়োগ বশতঃ বহুবিধ নৃত্য জন্মিতে পারে এবং জন্মিয়াও থাকে। নৃত্য আর কিছুই নয়, কথিত নিয়ম আয়ত্ত করিয়া, তাল লয় সংযোগ করিলে উহাই নৃত্য নাম ধারণ করে। যদ্যপি স্বতন্ত্র নৃত্যের বিষয় বলিবার আবশ্যক নাই, তথাপি ২।১টী স্বতন্ত্র লিখিলাম।

নৃত্য দ্বিবিধ বন্ধ নৃত্য ও অনিবন্ধ নৃত্য।

"কার্য্যং তত্রদ্বিধা নৃত্যং বন্ধকং চানিবন্ধকম্।
গত্যাদি নিয়মৈর্যুক্তং বন্ধকং নৃত্য অনিবন্ধত্ব নিয়মাৎ—" মুচ্যতে॥

গত্যাদি নিয়মের অধীন যে নৃত্য তাহার নাম বন্ধ নৃত্য আর অনিয়মে অর্থাৎ কেবল তাল লয় সংযুক্ত নৃত্যের নাম অনিবন্ধ নৃত্য।

নৃত্যের নাম—কমল বর্ত্তনিকা নৃত্য, মকর বর্ত্তনিকা মায়ুরি নৃত্য, ভানবী নৃত্য, মৈনী নৃত্য, মৃগী নৃত্য, হংসী নৃত্য, কুক্কুটী নৃত্য, রঞ্জনী নৃত্য, গজগামিনী নৃত্য, মুখচালী নৃত্য, নেরি নৃত্য, করণ নেরি নৃত্য, মিত্র নৃত্য, চিত্র নৃত্য, নেত্র নৃত্য, অদৃষ্টোল্ল নৃত্য, কুবাড় নৃত্য, চক্রবন্ধ নৃত্য, নাগবন্ধ নৃত্য, বৃত্তলতিকা নৃত্য, সালুক নৃত্য, মুর্ম্ম নৃত্য, রূপক নৃত্য, উপরূপ নৃত্য, রবি চক্র নৃত্য, পদ্ম বন্ধ নৃত্য ইত্যাদি বহু শ্রেণীর নৃত্য আছে।

নেরা জাতীয় শুদ্ধনেরী নৃত্য——

চতুরস্রে স্থিতির্যত্র রাস তালশ্চিরো লয়ঃ।
রথ চক্রোকপাটেন পরেন চ যথোচিতম্।
গতিঃ পতাক হস্তশ্চ প্রত্যাশং তল সঞ্চরঃ।
বীবিবৎ গতি সঞ্চারঃ ক্রমাৎ সব্যাপ সব্যয়োঃ।
রেখা সৌষ্ঠব সম্পন্ন সশুদো নেরী রুচ্যতে।
উপায়ষ্টপি সর্ব্বেষু বিনা দৃষ্টক পৃষ্টকম্।
বাহ্য ভ্রমরিকাং বন্ধা মুক্তিঃস্যা চ্চতুরস্রকে।"

পূর্ব্বোক্ত চতুরস্রে স্থিতি করতঃ রাস নামক তালে ও বিলম্বিত লয়ের অনুগত হইয়া নেরী নৃত্য আরম্ভ করিবেক। তৎপরে রথ চক্র পাট (পূর্ব্বে উক্ত আছে) তৎপরে যথা যোগ্য গতি অবলম্বন করিবেক। প্রতিদিকে পতাক হস্ত হইয়া তল সকল অবলম্বন করিবেক। বাম ও দক্ষিণ ভাগে নীকি রন্ধাগতি প্রকাশ করিবেক। ইহাতে রেখা ও সৌষ্ঠব সংযোগ করিবেক। তৎপরে দৃষ্ট পৃষ্ট ব্যতীত অন্য যে কোন চারী অবলম্বন করিয়া বাহ্য ভ্রমরিকা বন্ধন পূর্ব্বক চতুরস্রে মুক্তি অর্থাৎ নৃত্য সমাপ্তি করিবেক।

চক্রবন্ধ নৃত্য—

" কাংশ্চিত্তানানুপক্রম্য প্রয়োগে বহুল দ্রুতান্।
সঙ্কীর্ণানেক গতিভি প্রবৃত্তং সুমনোহরম্।
কুবাড়াখ্যঞ্চ তদ্গোয়ং তালরূপ বিচক্ষণৈঃ।
হস্ত বাহ্বঙ্ঘ্রিভিঃ সব্যৈ বাম পদ্বাহু হস্তকৈঃ।
ষড়ভিরঙ্গৈশ্চতুর্ভি বা তালৈস্তত্তাস্মিতাঙ্গকৈঃ।
সমান মাত্র লাস্তেশ্চ দ্রুত লঘ্বাদিদৌ যদি।
পূর্ব্ব পূর্ব্বং পরিত্যজ্য ত্বগ্রিমাগ্রিম মাশ্রিতৈঃ।
এতদোবান্য তালেন নৃত্যং কুর্ব্যান্নটাগ্রনীঃ।
চক্রবন্ধং তদাখ্যাতং নৃত্য বিদ্যা বিশরদৈঃ। "

যে কোন তালে আরম্ভ—আরম্ভের পর দ্রুত তালই অধিক—সঙ্কীর্ণ এবং অনেক বিধ গতি দ্বারা প্রবর্ত্ত করা—কুবাড় নামক গীত জাতির গীত সংযুক্ত করা—এবং ঐ জাতীয় তাল যোজনা করা—হস্ত, বাহু, বাম পাদ, প্রভৃতি ৬ অঙ্গ অথবা ৪ অঙ্গ তৎপরিমিত তাল দ্বারা মিলিত করিয়া—ল অন্ত তাল যদি সমান মাত্রায় গ্রহীত হয়, আর দ্রুত এবং লঘু দ-দ্বয় যদি তাহাতে থাকে তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাত্রার পরিত্যাগ করা ক্রমে অগ্রিমে আরোহণ করা—এতদ্ভিন্ন অন্য কোন তালে এ নৃত্য করিবেনা—এইরূপ নৃত্য চক্রবন্ধ নামে খ্যাত। ইত্যাদি।

সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী নৃত্যের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল, এক্ষণে এতদ্দেশে সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী কোন প্রকার নৃত্য প্রচলিত নাই, যে সকল নৃত্য প্রচলিত আছে তাহা সমস্তই আধুনিক।

অরণ্যের বিহঙ্গিনী।

(১)

ওইত পশ্চিমে ভানু ঢুলিয়া পড়িল,
অন্ধকার ক্রমে ক্রমে ছাইল আকাশ,
দলে দলে বিহঙ্গম কুলায় ফিরিল,
কুমুদ ফুটিল, ধীরে বহিল বাতাস;
নলিনীর মত কিন্তু অভাগীর ঘন,
রজনীর আগমনে মুদিল নয়ন!

(২)

প্রতি দিন উঠি উষা হাসিলে গগনে,
অশ্রু ধারা চিহ্ন মুছি কপোল হইতে,
আঁকি সযতনে পুনঃ হৃদয়-দর্পণে
তোমার মুরতি, দগ্ধ পরাণে তুষিতে;
কিন্তু যবে নিশা আসি পরশে ধরণী,
সে সুখের ছায়াবাজি ভাঙ্গে রে তখনি!

(৩)

ভাঙ্গুক, ভাঙ্গিবে যদি, নাহি ক্ষতি তায়,
সংসার আবর্ত্ত মাঝে সকল (ই) চঞ্চল;
কিন্তু কেন তার সঙ্গে শত খণ্ড, হায়,
হয় না দাসীর এই হৃদয় বিকল ?
কেন আশা প্রতি দিন অভাগীরে লয়ে
খেলে রে নিষ্ঠুর খেলা পরাণে বধিয়ে ?

(৪)

কেন আশা কাণে কাণে কহে অনিবার,
'পাইবে, সুন্দরি, তুমি পাইবে ত্বরায়
হৃদয়ের ধন সেই পতিকে তোমার ;
কেন দেহ কর ক্ষীণ অসার চিন্তায়'
কেন আশা এ কুহকে ভুলায় আমায় ?
আশা দিয়ে কেন পুনঃ হতাশে ডুবায় ?

(৫)

দিন যায় নিশা আসে, নিশা যায়
দিন আসে,
কখন আশার হাসি, কখন বিষাদ ;
কখন তোমারে হেরি হৃদয় আকাশে,
কখন সংশয়ে ডুবি গণি পরমাদ ;
মাসেতে ডুবিল দিন, বৎসরেতে মাস,
হায়, তবু না পূরিল হৃদয়ের আশ !

(৬)

না-জানি কি মায়া জালে ঘেরেছে আমায়
যেখানে যখন যাই, যা করি দর্শন,
তোমার মুরতি চক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়,
সে রূপ-সাগরে ডোবে সন্তাপিত মন ;
প্রত্যেক পদার্থ যেন স্মৃতির মায়ায়
সহস্র বিগত কথা হৃদয়ে জাগায় !

(৭)

যত বাড়ে বেলা তত বাড়ে চিন্তানল,
শত শত শিখা উঠে হৃদয় ভেদিয়া ;
শরীরের গ্রন্থি যত হইয়া দুর্ব্বল,
ধীরে ধীরে ধরাতলে পড়ে এলাইয়া ;
বাহিরে প্রখর রবি, অনল অন্তরে,
দুখিনীরে, হায়, যেন উন্মাদিনী করে।

(৮)

তৃষাতুরা কুরঙ্গিনী চঞ্চল নয়নে
দূর জল ভ্রম যথা করি নিরীক্ষণ,
আমিও গবাক্ষ দিয়া এক প্রাণ মনে
তোমার প্রতীক্ষা, হায়, করি প্রতিক্ষণ ;
একটি দুইটী করি যায় লোক যত,
আশার কনক লতা নতশির তত !

(৯)

এত আদরের, নাথ, এ তব লতিকা,
(শত প্রেম রজ্জু দিয়ে বেঁধে ছিলে যারে)
অহিতে পারিবে কিসে এ ঘোর ঝটিকা,
যদি তুমি এ সময়ে নাহি ধর তারে ?
রসাল আশ্রয় চ্যুত হয় হে যখন
স্বর্ণলতা প্রাণ, মরি, হারায় তখন !

(১০)

দরিদ্রের কন্যা আমি, জনম দুঃখিনী
জান তা ত প্রাণনাথ ! এ সংসারে আর
নাহি কেহ মোর সম, হায়, অভাগিনী,
জনক জননী কেহ নাহিক আমার !
করিলে বিবাহ তুমি এই অভাগীরে,—
কি সুখে সে দিন তুমি ভাসালে দাসীরে !

(১১)

একটী কুসুম বৃক্ষ ছিল ঘোর বনে
নির্জ্জনে ফুটিত পুষ্প কেহ না দেখিত ;
তাহারে রোপিলে তুমি আপন উদ্যানে
(বলেছিলে) রূপে নাকি হইয়া মোহিত ;
কত বারি আলবালে করিলে সেচন,
অরণ্য কুসুমে দিলে নবীন জীবন !

(১২)

তোমার যতনে বৃক্ষ বাড়িয়　　ল,

তুমি তার সুখ দাতা, চিনিল তোমায় ;
তুষিতে তোমারে নব পল্লব ধরিল,
হাসিত, বসিত যবে তোমার ছায়ায় ;
তুমি তারে যেই মত করিলে যতন,
জ্ঞান হীন যদিও সে, করিত তেমন !

(১৩)

হায় নাথ ! সেই তব যতনের ধন
তোমার (ই) কারণে আজি শুকাইয়া যায় ;
তুমিই যাহারে দিলে দ্বিতীয় জীবন,
তুমিই হইবে তার বধের উপায় ?
তোমার কারণে যদি এ তরুটী মরে,
ঘোষিবে কলঙ্ক তব দেশ দেশান্তরে !

(১৪)

শৈশব জীবন স্থির স্বপ্নের সলিলে
যখন প্রথমে মন মোহিত করিয়া,
তোমার বদন ইন্দু যতনে আঁকিলে,
নয়ন চকোরে মোর চঞ্চল করিয়া—
সেই শুভ দিন স্মরি, নয়ন ধারায়,
কহ নাথ, কেন আজি বক্ষ ভেসে যায় !

(১৫)

কহিব তোমারে আজি সে সুখ স্বপন,
সেই প্রথম প্রণয় ; কহিব কেমনে
প্রথমে হৃদয়ে বীজ করিনু বপন—
দেখা দিল নবাঙ্কুর নবীন জীবনে—
কেমনে বাড়িল বৃক্ষ—বিস্তারিল শাখা—
কেমনে ফলিল ফল সুধামৃত মাখা।

(১৬)

এক দিন একাকিনী বিজন কাননে
(দ্বাদশ বৎসর (ও) নহে বয়স তখন)
গিয়াছিনু ভূপতিত পত্র আহরণে,
যাহাতে দুঃখিনী নিত্য করিত রন্ধন ;
নানা কষ্টে পিতা মাতা কিছু পূর্ব্বে তার
ত্যজিলা মানব দেহ, সুখের আগার।

(১৭)

তখন (ও) পশ্চিম দিক্ লোহিত বরণ ;
তখন (ও) সে অন্ধকারে থাকিয়া থাকিয়া
একটী দুইটী করি সোণার কিরণ
নাচিতে দুলিতে ছিল নয়ন রঞ্জিয়া,
তখন (ও) আনন্দ মনে বিহঙ্গম দল,
বাছিয়া খাইতেছিল ভূপতিত ফল।

(১৮)

দেখিয়াছ, প্রাণনাথ, শরদের শশী,
নিরমল নভস্থল, উষার বদন,
স্বচ্ছ দরপণ নব বিমল সরসী,
দেখিয়াছ এরা সবে সরল কেমন—
সেই রূপ সে সময়ে দাসীর হৃদয়,
জানিতনা কুটিলতা চিন্তার বিষয়।

(১৯)

ধীরে ধীরে নত শিরে ধরিলাম গান,
'আয় রে পিঞ্জরে, পাখি, আয় এক বার,
নিকুঞ্জ বিহারী বলে যাবেনা রে মান—
এখানেও মিষ্ট ফল পাইবি আহার ;'
এত করে সাধিলাম তবু না শুনিলি,
বিহঙ্গ হইয়া মোরে অবজ্ঞা করিলি !

(২০)

বনে বনে প্রতিধ্বনি হইল তখনি,—
'আয় রে পিঞ্জরে, পাখি, আয় একবার ;'
আপনার গানে, হায় হাসিনু আপনি,
উথলিল অন্তরেতে সুখ পারাবার ;
কিবা সে গীতের অর্থ বুঝি নাই মনে,
তথাপি লজ্জায় রাগ পড়িল বদনে।

(২১)

সহসা হৃদয় মন চমকি উঠিল,
শুনিলাম মানুষের চরণের ধ্বনি ;
'কে তুমি' তাহার সঙ্গে শ্রবণে ধ্বনিল
মধুর সংগীত সম এই সুধা বাণী ;

হেরিনু তোমার মুখ ফিরায়ে বদন,
সেই দিন হৃদে বীজ করিনু বপন।

(২২)

তথাপি ভয়েতে মন লাগিল কাঁপিতে,
তোমার প্রশ্নের নাহি দিলাম উত্তর;
ফেলিয়া পত্রের ডালি পবন গতিতে
উর্দ্ধশ্বাসে গৃহ দিকে ধাইনু সত্বর;
দুরু দুরু করি হিয়া কাঁপিতে লাগিল,
অনর্গল স্বেদ জল শরীরে বহিল।

(২৩)

তখন বালিকা দাসী না জানিত, হায়,
প্রেম সিন্ধু কত বড়, দেখিতে কেমন,
কেমন তরঙ্গ তাহে খেলিয়া বেড়ায়,
কোথায় রয়েছে গিরি সলিলে মগন;
পড়িলে তরণী সেই সাগরের জলে,
কেমনে লভিবে কূল দলি উর্ম্মি দলে।

(২৪)

আইলাম গৃহে ফিরে সচঞ্চল মনে,
ভাবিলাম সব কথা আপন অন্তরে;
শুইলাম ধীরে ধীরে মুদিয়া নয়নে,
কিন্তু নিদ্রা নাহি এল তুষিতে দাসীরে;
নাহি বুঝিলাম এই অসুখ কারণ,
ভাবিলাম, ভয়ে বুঝি হয়েছে এমন।

(২৫)

প্রভাত হইল নিশা, উদিল তপন;
বাড়িতে লাগিল বেলা, লাগিল বাড়িতে
বীজ মধ্যে নবাঙ্কুর, গোপনে যেমন
বাড়ে শিশু জননীর জঠর সহিতে,
সেই ঘর, সেই দ্বার, সেই সমুদায়,
তথাপি অশান্ত কেন হইল হৃদয়?

(২৬)

আইল আবার সেই সুখের গোধূলি,
যখন প্রথমে তুমি সরল অন্তরে
আঁকিলে আপন মূর্ত্তি আপনারে ভুলি
ডুবিল অধিনী তব প্রণয় সাগরে;
বালিকার স্থির তর জীবন সরসে
উঠিল তরঙ্গমালা প্রেমের পরশে।

(২৭)

আবার বসিনু গিয়া অতি ধীরে ধীরে
সেই বনে, সেই ভাবে ধরিনু আবার
সেই গীত—কিন্তু ভাসি নয়নের নীরে,
নাহি জানি কেন হলো এ ভাব আমার।
গাইলাম হাসিলাম তেমনি করিয়া,
তথাপি হতাশ হায় এলাম ফিরিয়া।

(২৮)

নাহি জানিলাম, হায়, অন্তরে গোপনে
নবাঙ্কুর হতে ক্রমে তরু দেখা দিল,
বাড়িল সে বৃক্ষ অশ্রু বারি বরিষণে,
সহস্র প্রশাখা শাখা হৃদয় ছাইল;
নাহি জানিলাম হায় পড়েছে পিঞ্জরে
অরণ্যের বিহঙ্গিনী জনমের তরে।

(২৯)

হায় সখে! কত কব সে সব বিষয়!
সন্ধ্যা হলে উপাধানে লুকায়ে বদন
জুড়াতে অন্তর জ্বালা তুষিতে হৃদয়,
কত নিশা করি ভোর করেছি রোদন
ভাবিয়াছি প্রণয় কি ইহাকেই বলে?
ইহার (ই) মাহাত্ম্য এত মানব মণ্ডলে

(৩০)

ভাবিয়াছি কত দিন, অবোধের মত
কেন আমি সেই দিন এলাম চলিয়া
কেন নিজ আশা লতা করিলাম হত
আপনার হস্তে হায়, লজ্জার লাগিয়া;
কেন না প্রশ্নের তাঁর প্রত্যুত্তর ছলে,
হৃদয়ের ভাব তাঁরে বলিলাম খুলে?

(৩১)

কি হইল শেষে নাথ, জান তা আপনি

বিধির বিধানে বৃক্ষ ধরিল মুকুল ;
হইল এ অভাগিনী তোমার রমণী,
সুস্থির হইল এই হৃদয় বিকল ;
অকূল সমুদ্রে তরী বহুদিন পরে
উতরিল তীরে, মন্দ পবনের ভরে !

(৩২)

হায় নাথ ! অভাগিনী জন্মিল এ ভবে
কেবল দিবস নিশা করিতে রোদন।
পূর্ণিমার মহোৎসব কয় দিন রবে !
কয় দিন অনুকূল বহিবে পবন !
নিরদয় বিধি বাদ আবার সাধিল,
বিষম বিচ্ছেদ বাণ হৃদয়ে বিঁধিল।

(৩৩)

এই ত আইল নিশা আবার ধরায়,
অন্ধকারে বসুন্ধরা নীরবে ডুবিল,
শত শত তারা আসি আকাশের গায়
হীরার ঝালর সম ঝুলিতে লাগিল ;
গৃহস্থের গৃহ ক্রমে হইল আঁধার,
নিবিল আশার দীপ হৃদয়ে আমার।

(৩৪)

নিবিল আশার দীপ, আবার তথনি
নিরাশার হুতাশন উঠিল জ্বলিয়া,
দাবানল মাঝে যথা আকুল হরিণী,
তেমতি হইল দাসী ভাবিয়া ভাবিয়া ;
ঘুমাইল জগতের জীব জন্তু যত,
কেবল এ অভাগিনী রহিল জাগ্রত।

(৩৫)

কেন তুমি কহিলে না প্রথমে আমায় ?—
প্রেমের সাগরে আছে বিচ্ছেদ তুফান,
কুসুমের মধ্যে কীট লুক্কায়িত, হায়,
কলঙ্কিত চন্দ্রমার সুন্দর বয়ান ;
আমি জানিতাম হবে তোমার আমার
এক মন, এক প্রাণ, একত্রে বিহার।

(৩৬)

অরণ্যের বিহঙ্গিনী পুরিয়া পিঞ্জরে,
কোথা গেলে প্রাণ নাথ ! দেখনা আসিয়া
মন দুখে তব পাখী পিঞ্জর ভিতরে
কাঁদিছে-দিবস নিশা নীরবে বসিয়া।
কে দিবে তাহারে আর আহার এখন,
কে আর তাহারে এবে করিবে যতন ?

(৩৭)

যে অবধি তুমি, হায়, ত্যজিয়া তাহারে
গেলে চলি দূর দেশে অর্থের কারণ,
সে অবধি ক্ষুন্নমনে বসি কারাগারে
নীরবে সে অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন !
নাহি হাসে, নাহি গায় না করে আহার,
আর সে পূর্ব্বের ভাব নাহিক তাহার !

(৩৮)

কি আর কহিবে দাসী, এস প্রাণেশ্বর,
এসো ফিরি গৃহে তুমি বিদেশ হইতে ;
ভিক্ষা করি সুখে দোঁহে খাব নিরন্তর,
তথাপি বিচ্ছেদ বাণ পারিনা সহিতে ;
একত্রে দুজনা রব একই জীবন,
এক আশা, এক চিন্তা একই মনন।

শ্রীদীঃ—

বিমলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেন বিমলার সহিত যোগেশের বিবাহ হইতে পারে না? কেন বিমলা অদ্য চির-সেবিত-প্রণয়-পাদপের বিরোধে খড়্গ ধারণে উদ্যত? এ প্রণয়ী যুগল কে? ইহাঁদের প্রণয় মধ্যে কি রহস্য আছে? এ সকল কথা এই স্থলেই পাঠকগণকে বিদিত করা বিধেয়। উপস্থিত দুই পরিচ্ছেদ তাহাতেই পর্য্যবসিত হইবে।

বিমলার পিতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় নিরতিশয় নিঃস্ব ছিলেন। অবন্তীপুর থাকিয়া জীবিকাপাত করা অসম্ভব হওয়ায় তিনি সম্পত্তির অনুসন্ধানে কলিকাতায় আইসেন, তখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র। পিতা স্থবির ও অক্ষম, মাতাও বৃদ্ধা। তাঁহাদের ক্লেশ নিবারণার্থ বালক রামকুমার নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া কলিকাতা আসিলেন। পিতার যতদিন সাধ্য ছিল স্বয়ং পুত্রকে যথাসাধ্য লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। রামকুমার পিতার নিকট ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়াছিলেন, ইংরাজি শিক্ষা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কাজ কর্ম্ম হইবে ভাবিয়া রামকুমার কলিকাতা আসিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ কাজ কর্ম্ম দূরে থাকুক কলিকাতায় উদরান্নের সংস্থান হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে রামকুমার এক জন ভদ্র মুৎসুদ্দির সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার অধীনে মাসিক ৮৲ আট টাকা বেতনে এক সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। রামকুমার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বালক ছিলেন। অতি সহজেই প্রভুর সন্তোষজনক কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রভুও বড় ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। নিঃসহায়, ব্রাহ্মণ-সন্তান রামকুমারের উপর দয়া করিয়াই তিনি তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে যখন রামকুমার যথোচিত নিপুণতা সহকারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রামকুমারের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ক্রমে রামকুমারের বেতন ২০৲ কুড়ি টাকা হইল। এক দিন তাঁহার প্রভু বলিলেন,—"ইংরাজি না জানিলে আর উন্নতি হইবে না; অতএব রামকুমার তুমি ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ কর।" রামকুমার প্রভুর উপদেশ বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিলেন।

রামকুমারের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার বৎসরেক পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। নিরতিশয় কাতর হইয়া রামকুমার বাটী গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া আসিলেন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে তিনি কিছু ঋণী হইয়া পড়িলেন।

পর বৎসর রামকুমারের মাতৃদেবী গঙ্গালাভ করিলেন। যথাবিহিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাঁহাকে আরও ঋণগ্রস্ত হইতে হয় এজন্য তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ভুয়োভুয়ঃ ব্যয় বাহুল্য করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ফলতঃ পুনরায় কর্জ্জ করাও অসম্ভব। পূর্ব্ববারেই রামকুমার প্রভুর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন,—পুনরায় তাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা অসম্ভব। রামকুমার প্রভুর নির্দ্দেশ বশবর্ত্তী হইয়া সংক্ষেপে মাতৃ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। তথাপি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ঋণ-জালে বদ্ধ হইতে হইল।

রামকুমার কলিকাতায় আসিলেন। সংসারে তাঁহার আর কেহ থাকিল না। পিতৃ মাতৃহীন রামকুমার পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, পুনরায় এক মাত্র আশ্রয়স্থল, দয়াবান্ প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া প্রভু তাঁহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইলেন। ক্রমে রামকুমার পূর্ব্ববৎ যত্ন সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল। ইংরাজিতেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময় তাঁহার প্রতিপালক চেষ্টাশীল হইয়া একটী সৎপাত্রী অনুসন্ধান করত রামকুমারের বিবাহ দেওয়াইলেন। বিবাহ কলিকাতা হইতে নির্ব্বাহিত হইল। তখন রামকুমারের বয়স দ্বাবিংশ বর্ষ। তাঁহার পত্নী দ্বাদশ বর্ষীয়া। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন।

প্রভুর যত্নে রামকুমার বিলক্ষণ উন্নতিশীল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আয়ও সম্বর্দ্ধিত হইল। যথাকালে রামকুমার প্রভুকে বলিলেন,'কন্যার অন্নপ্রাশন নিজ নিবাসে না দিলে ভাল দেখাইবে না, লোকেও বড় নিন্দা করিবে।' তাঁহার প্রভু প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রামকুমার যথা সাধ্য সমৃদ্ধি সহকারে অবন্তীপুরে আসিয়া কন্যার অন্নপ্রাশন ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। কন্যার নাম হইল—বিমলা।

বিবিধ কারণে রামকুমার অতঃপর স্ত্রী, কন্যাকে কলিকাতার বাসায় না রাখিয়া অবন্তীপুরে রাখা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। তাঁহার প্রভুও এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। অবন্তীপুরে রামকুমারের এক সহৃদয় অকপট মিত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য। সেই মিত্রের নাম গঙ্গাগোবিন্দ। গঙ্গাগোবিন্দ নিঃস্ব ছিলেন না। পল্লিগ্রামে দোলদুর্গোৎসব করিয়া চলে তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল। তিনি স্বয়ং নিঃসন্তান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের অপত্যগণই তাঁহার সর্ব্বস্ব। গঙ্গাগোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে এক জন পাঠকের নিকট পরিচিত। তিনি যোগেশ। যোগেশ জ্যেষ্ঠ পুত্র। যোগে-

শের অপর এক সহোদরার সহিত উপস্থিত আখ্যায়িকার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাঁহার নাম সরমা। ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রতি গঙ্গাগোবিন্দের যেরূপ অটল মমতা, নিজ সন্তানের প্রতি তদধিক হওয়া সম্ভাবিত নহে। পরিবার মধ্যে গঙ্গাগোবিন্দের আধিপত্য অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহারা দুই সহোদর,—জ্যেষ্ঠ অবর্ত্তমানে কনিষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দের স্কন্ধেই সাংসারিক সমস্ত ভার সমর্পিত হইয়াছিল। গঙ্গাগোবিন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক যোগেশকে রামনগরে রাখাইয়া ইংরাজি শিক্ষা দেন। অধিক দুর দেশে গিয়া, বা অসৎ সংসর্গে মিশিয়া,বা অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া,যোগেশ অর্থোপার্জ্জন করিবে এ আশায় তিনি তাঁহাকে ইংরাজি শিক্ষিত করেন নাই।

গঙ্গাগোবিন্দ, রামকুমারের স্ত্রী, কন্যাকে যথোচিত যত্ন ও তত্ত্বাবধান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। যখন রামকুমারের পরিবার যোগেশের খুল্লতাতের যত্নাধীনে পরিরক্ষিত হইল, যোগেশ তখন নিতান্ত বালক। গঙ্গাগোবিন্দ যথা সম্ভব যত্নে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যোগেশও সতত রামকুমারের বাটীতে যাতায়াত করিতেন; প্রায়ই তথায় আহার ও শয়ন করিয়া থাকিতেন। রামকুমারের স্ত্রী যোগেশকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। যোগেশের বাল্যাবস্থার কথা বড় মিষ্ট ছিল। যে শুনিত সে মুগ্ধ হইত। বিমলা তখন এক বছরের। যোগেশ, বিমলা কাঁদিলে তাহাকে সান্ত্বনা করিতেন। যাহাতে বিমলা সর্ব্বদা হাসে তাহার চেষ্টা করিতেন। বিমলাকে বড় ভাল বাসিতেন।

বৎসরত্রয় পরে ইংরাজি অধ্যয়নার্থ যোগেশকে রামনগরে প্রেরণ করা হইল। যোগেশের সোদরা সরমা সতত যোগেশের ন্যায় রামকুমারের বাটীতে যাইতেন। যোগেশ অপেক্ষা তাঁহার বয়স দুই বৎসর কম। এইরূপে উভয় পরিবার অভেদাত্মা হইয়া গেল। এরূপ ঘটিলে যথা সম্ভব আত্মীয়তা জন্মিবে তাহার সন্দেহ কি ?

কলিকাতা হইতে অবন্তীপুর যাইবার সহজ উপায় ছিল না। যাতায়াতে বিলম্ব ঘটিত। এজন্য রামকুমার সতত বাটী আসিতে পারিতেন না। সময় ও সুবিধা হইলেই আসিতেন। মাসে এক বার আগমন ঘটিয়া উঠিত। তিনি আসিয়া পরিবারের যেরূপ যত্ন দেখিতেন, তাহাতে বুঝিতেন যে তত যত্ন করিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। ফলতঃ পরিবারকে এরূপ পৃথক রাখিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ক্রমে বিমলার বয়স নয় বৎসর হইল। তাঁহার রূপরাশি অতুলনীয় হইয়া উঠিল। স্বভাব যৎপরোনাস্তি মনো-

রম হইতে লাগিল। গুণের সীমা রহিল না। রূপে গুণে বালিকা বিমলা সকলের লোচনানন্দদায়িনী ও সন্তোষবিধায়িনী হইয়া উঠিলেন। পরিচিতের মধ্যে তাঁহাকে ভাল বাসিত না এরূপ লোক ছিল না। যে একবার তাঁহাকে দেখিত সে আবার বার বার তাঁহাকে দেখিতে চাহিত। যে একবার তাঁহার কথা শুনিত সে পুনরায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্র থাকিত। বিমলা নারীজাতির ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

যোগেশ সদা সর্ব্বদা বাটী আসিতেন। বাটী আসিয়া যে কয় দিন থাকিতেন তাহার অর্দ্ধাধিক কাল বিমলাদের বাটীতেই অতিবাহিত হইত। বিমলার মাতা লেখা পড়া জানিতেন। তিনি কন্যাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

যোগেশ বাটী আসিয়া বিমলার লেখা পড়া পরীক্ষা করিতেন, মাতার যাহা সন্দেহ থাকিত তাহার নিরাকরণ করিতেন, নূতন পাঠ দিতেন এবং নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতেন। ফলতঃ এই রূপে যোগেশ ও বিমলার হৃদয় মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিল। সুরবদ্ধ মিলিত বাদ্যযন্ত্র সমুহের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ের বিশেষ একতা জন্মিল। উভয়ের হৃদয় এক কেন্দ্রাভিমুখে পরিধাবিত হইতে লাগিল। এক উদ্যানের সমভাবাপন্ন যুগল কুসুমের ন্যায় উভয়ে বিশ্বোদ্যান বিশোভিত করিতে লাগিলেন। বিমলা বালিকা—বয়স নয় বৎসর। যোগেশ বালক—বয়স. ষোড়শ বর্ষ। কি আশ্চর্য্য নৈসর্গিক নিয়ম! প্রণয় কাহাকে বলে তাহা জানা নাই, ভালবাসা কিসে প্রকাশ হয় তাহা বোধ নাই, যৌবনের লীলা কি তাহার জ্ঞান নাই, কোন কার্য্যেই পার্থিব কৃত্রিমতা বা বিকার বিমিশ্রিত নাই, তথাপি স্বভাব তাঁহাদের হৃদয়-নিকেতনে পরম পবিত্র মমতা, স্নেহ, প্রীতি পরিস্থাপিত করিল। তৎপ্রভাবে উভয়ের উভয়কে দর্শনে আনন্দ—অদর্শনে বিষাদ। ইহাই পবিত্র প্রকৃত প্রণয়ের কারণ, এই স্বভাবিক বৃত্তি-প্রসূত, মোহাদি পরিশূন্য প্রণয় চিরস্থায়ী, অপার্থিব সম্পত্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অবন্তীপুরের জমিদার বরদাকান্ত রায় সমাজ ও দলপতি। জমিদারি মধ্যে তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও অবিসম্বাদিত প্রভুত্ব। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামে এক উচ্চ শ্রেণীর জীব তাঁহার শ্যালক। এই ব্যক্তি জাতি বিষয়ে ও কুল সম্বন্ধে যাহাই হউক, অন্যান্য বিষয়ে একটী মহারত্ন। আকৃতি চমৎকার, যেন আল্‌কাতরা মাখান রলা কাষ্ঠ বিশেষ। চক্ষু কোটর গত। পাঠশালায় যান নাই সুতরাং উদরে বর্ণমালার প্রথম অক্ষরও প্রবেশ ক-

রে নাই। বয়স অনূ্যন ত্রিংশ বর্ষ। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর অন্যান্য অবয়ব অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও কেবল উদর সমস্ত অভাব সংকুলান করিয়াও পরিমাণ হইতে অধিক হইত। তিনি গুলি খাইতেন। যখন গুলির নল মুখে দিয়া রামকৃষ্ণ আড্ডায় বসিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের পন্থা অন্বেষণ করিতেন, তখন পিপায় চোঙ্গ লাগাইয়া কে যেন আল্কাতরা ঢালিতেছে বোধ হইত। রামকৃষ্ণ কথা গুলি পরিষ্কার বলিতে পারিতেন না, কিছু বাধিত। গজদন্ত প্রভৃতি নানারকমের চারি পাটী দাঁত আকর্ণ বিস্তৃত ছিল। তাহাদের ঢাকিয়া রাখা তাঁহার সাধ্যাতীত। সততই রামকৃষ্ণের হাস্যমুখ। হরিদ্রাবর্ণের ছাতা পড়া দাঁত বাহির হইয়াই থাকিত। রামকৃষ্ণ ধনবানের শ্যালক, সুতরাং তিনি বড় লোক। অবশ্য।

দেবী-সম-রূপ-গুণ সম্পন্না বিমলার সহিত এই ব্যক্তির বিবাহ দিবার নিমিত্ত জমিদার বরদাকান্ত রায় রামকুমারের নিকট প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য রামকুমার তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও কুপিত হইলেন।

এই সময়ে, বিমলার সহিত যোগেশের বিবাহ হইলে বড় সুখের বিষয় হয় ভাবিয়া, উভয় পক্ষেই তাহা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এ যুগলকে দেখিয়া কে তাহা মনে না ভাবিয়া থাকিতে পারে? নির্ম্মল নির্ঝরবৎ যে দুই জীবন স্রোত বিশ্ব গিরি নিঃসৃত হইয়া সমভাবে নাচিতে নাচিতে, খেলিতে খেলিতে অনন্ত সমুদ্রবৎ অনন্ত কালাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; যে দুই সুকুমার প্রসূন সমভাবে ফুটিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে; যে দুই বালক বালিকার একের আনন্দ, উৎসাহ, আহ্লাদ, উন্নতি, হাস্য, রোদন প্রভৃতি অপরের সহিত সংবদ্ধ; তাঁহাদের পরস্পরের চিরন্তন সম্মিলন কাহার স্পৃহনীয় নয়! উভয় পক্ষ হইতেই এই দুইয়ের বিবাহ কামনা করিতে লাগিলেন। কোন পক্ষই, পাছে অমত হয় ভয়ে, মনের কথা অপর পক্ষকে জানাইতে সাহস করিলেন না। কিন্তু এরূপ কথা চাপিয়া রাখা সুকঠিন। কথা চাপা থাকিল না। রামকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ উভয়ে উভয়ের মনোগত জানিলেন। আনন্দের সীমা রহিল না। বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গেল। অদ্য হইতে রামকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ উভয়ে উভয়কে বৈবাহিক সম্বোধনে সম্ভাষিত করিতে লাগিলেন। আত্মীয়তা আরও দৃঢ় হইল।

বিমলা বালিকা। বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ অল্প বয়স্কা বালিকাদের সংস্কার অতি অপূর্ব্ব। কতকগুলি লোকজন সমবেত হইয়া গোলমাল করিয়া গ্রাম তোলপাড় করিবে, নানাবিধ বাজনা বাদ্য বাদিত হইয়া লোক জনকে অস্থির

করিয়া তুলিবে, ভোজ, ফলারে বিস্তর লোক আসিয়া উদর পূরিয়া আহার করিবে, অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া পুরোহিতের নিদেশ মত বাক্য উচ্চারণ করিবে, বিবিধ বস্ত্র ও সুরঞ্জিত অলঙ্কারে শরীর সমাচ্ছন্ন হইবে—তাহার নাম বিবাহ। বিমলার বিবাহ বিষয়ে জ্ঞান প্রায় এইরূপ। এ রূপ জ্ঞানহীনা বালিকাকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করা বিধেয় কি না, তাহার উত্তর সামাজিক নিয়ম নিয়ন্তাগণ বলিতে পারেন। বিমলা জানিতেন, বিবাহ আর যাহা কেন হউক না, তাহা কলহ নয়। যোগেশের সহিত কলহ মনান্তর ব্যতীত যাহা হউক না কেন তাহাই আনন্দ। সুতরাং যোগেশের সহিত বিবাহ হইবে ভাবিয়া বিমলার আনন্দ। যোগেশের আনন্দ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ়, অপেক্ষাকৃত সারবান্। বিবাহ স্থির হইয়া গেল, সকলে পরমানন্দিত।

বরদাকান্ত বিরক্ত হইয়া এত দিন চুপ করিয়া ছিলেন। ভাবিয়াছিলেন তাঁহার বিরক্তিতে ভীত হইয়া রামকুমার বিবাহে অতঃপর অমত করিবেন না। তাহা হইল না দেখিয়া পুনরায় সকোপে আজ্ঞা করিলেন,—'অনতিবিলম্বে রামকৃষ্ণের সহিত বিমলার বিবাহ দিতে হইবে। তাহার অন্যথা হইলে আমি যথাসাধ্য দণ্ড দিব।' রামকুমার গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতি সকলের সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলে একবাক্যে ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রামকুমার বরদাকান্তের প্রস্তাব এককালে উপেক্ষা করিলেন। বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'আমার কথা শুনিলে না, দেখিব কোন্ ব্যাটা তোমার কন্যাকে বিবাহ করে।' বরদাকান্তের আদেশক্রমে গ্রামে রামকুমার অচলিত, এক ঘরে ও সমাজচ্যুত হইলেন। তাঁহার অপরাধ? নৃশংসের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া অপত্যস্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া কন্যাকে সমুদ্র গর্ব্ভে নিক্ষেপ করিলেন না, এই তাঁহার অপরাধ! একি সহজ পাপ? ইহারই নাম বঙ্গীয় সমাজ শাসন! তুমি বঙ্গীয় সংবাদ পত্র সম্পাদক! একতা, ভ্রাতৃভাব, উন্নতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও স্বাধীনতার ধুয়া ধরিয়া চীৎকারে মেদিনী অস্থির করিতেছ, আপনার কণ্ঠও বিদীর্ণ করিতেছ, ফল কি হইতেছে? অরণ্যে রোদন। কেবল কলিকাতা বা তদ্বৎ স্থানে স্বকীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিও না। পল্লিগ্রামে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, তার পর একতা ও স্বাধীনতার ধুয়া তুলিও।

রামকুমারের কন্যার বিবাহ হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। গঙ্গাগোবিন্দ গ্রাম মধ্যে অসম্ভ্রান্ত বা সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহারও প্রভুত্ব ছিল, তাঁহারও ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সে প্রভুত্ব ও সে ক্ষমতা বরদাকান্ত অপেক্ষা

অনেক কম। লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। বরদা কান্তকে,লোকে ভয় করিত, তাঁহার বিপদে লোকে অনিচ্ছায় দুঃখ প্রকাশ করিত। ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে সম্মান করিতে হইত, যে না করিত তাহার নিকট হইতে জোর করিয়া মান আদায় করা হইত। ভয়ে নিজ বিপদ উপেক্ষা করিয়াও বরদার মন যোগাইতে হইত। গঙ্গাগোবিন্দের প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আন্তরিক, তাঁহার বিপদে লোকে আন্তরিক ক্ষুণ্ণ হইত, সম্পদে আন্তরিক আনন্দিত হইত। কিন্তু অসাধু, ক্ষমতাশালী, অদূরদর্শী জমিদারের বিরাগ শঙ্কায় প্রজাগণ সতত মনের কথা গোপন করিয়া রাখিত। সেই জন্যই বরদাকান্তের অপেক্ষা গঙ্গাগোবিন্দের ক্ষমতা অনেক কম। রামকুমার সমাজচ্যুত হইলেন। গঙ্গাগোবিন্দ তৎপ্রতিবিধানার্থ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। জমিদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কাহারও সাহস হইল না। রামকুমার সমাজচ্যুত হইলেন।

যোগেশের সহিত বিমলার বিবাহের আর উচ্চবাচ্য হইল না। মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও গঙ্গাগোবিন্দ নানারূপ অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া অগত্যা বাসনা প্রকাশ করিলেন না। রামকুমারও সাহস করিয়া সে কথার আর উল্লেখ করিতে পারিলেন না। কন্যার অন্যত্র বিবাহ দেওয়াও রামকুমারের পক্ষে অসম্ভব হইল। যে বিবাহ করিবে, গ্রামস্থ জনগণের নিকট হইতে পাত্রীর কুল, বংশাদি বিষয়ক বিশেষ সন্ধান না লইয়া কখনই বিবাহ করিবে না। কুল, বংশাদি নিখুঁত হইলেও রামকুমার সমাজচ্যুত, তাঁহার কন্যা কে বিবাহ করিবে? বিমলার এত সৌন্দর্য্য, এমন বিদ্যা, এমন শান্তভাব, এত উদারতা, এত প্রসাদ, তাহার পরিণাম কি এই হইল? উপয়াভাবে এইরূপেই দিন কাটিতে লাগিল।

"বিপদ কখন একাকী আইসে না।" এ সত্য যিনি প্রথম ব্যক্ত করিয়াছিলেন তিনি মানব-জীবন-ক্ষেত্র-সম্ভূত ঘটনা কলাপের প্রকৃতি সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কলিকাতায় রামকুমারের প্রভু জ্বর বিকার রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রামকুমার পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রভুর নিকট আরও কিছু টাকা জমাইয়াছিলেন। অন্তিম কালে প্রভু তৎসমস্ত রামকুমারকে দিলেন। বিদেশে টাকা কড়ি লইয়া বিব্রত হইতে হইবে ভাবিয়া রামকুমার সঞ্চিত অর্থ সমস্ত গঙ্গাগোবিন্দের নিকট রাখিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—'ভ্রাতঃ! আমার নিকট যে

টাকা রাখিলে, তুমি খরচ না পাঠাইলেও তাহার আয়ে তোমার সংসার সুচারুরূপে চলিতে পারিবে। রামকুমার সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন।

কাল কাহার বাধ্য নহে। সংসারে আমাদের যত গর্ব্ব, যত অহঙ্কার, যত আশা, যত লোভ, সমস্তই আকাশ কুসুমবৎ অলীক; মানব সংসার-সমুদ্র-বক্ষে জল বুদ্বুদ্। এই ভাসিতেছে, এই নচিতেছে—এই নাই। রামকুমারের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। প্রভুর মৃত্যুর সপ্তাহদ্বয় পরে রামকুমার ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইলেন। তিনি অনেকের প্রিয় ছিলেন। অনেকে ব্যথিত হইয়া তাঁহার রোগোপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুই হইল না। তিন দিন পরে রামকুমার স্ত্রী, কন্যা, অর্থলিপ্সা, অর্জ্জনস্পৃহা প্রভৃতি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। আসন্নকালে স্ত্রী কন্যার সহিত রামকুমারের শেষ সাক্ষাৎ হইল না। কয়েক দিন মধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। সকলে নিরতিশয় শোকাকুলিত হইলেন তাহার সন্দেহ কি? গঙ্গাগোবিন্দ, যোগেশ ও সরমা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ এই বিপদের সময় বিবিধ প্রকারে বিমলা ও তাঁহার জননীর চিত্ত শান্ত ও প্রবোধ বিধান করিতে লাগিলেন। তখন বিমলার বয়স ১২ বৎসর। যোগেশের বয়স অষ্টাদশ বর্ষ।

কালে সকলই মন্দীভূত হয়। স্বামী পুত্র বিহীনা অনাথাও কালে হাসে, আশা ভঙ্গ জনিত ঘোর মনঃক্লেশ সম্বরণ করিয়া কালে নবীনা প্রেমোন্মত্তা কামিনী পুনরায় আমোদে যোগ দেয়। কালে বিমলা ও তাঁহার জননীর শোক কমিয়া আসিতে লাগিল। রামকুমারের উপার্জ্জিত অর্থের আয়ে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের ভাবনা ছিল না। গঙ্গাগোবিন্দের যত্নেরও ত্রুটী ছিল না। বিমলা ও তাঁহার গর্ব্ভধারিণীর সন্তোষ সাধনই যোগেশের ব্রতস্বরূপ ছিল।

ক্রমে বিমলা যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যোগেশ রামনগরের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাটী আসিলেন। বাটী আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় বিমলাদের আবাসে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। চির সঞ্চিত প্রণয় দৃঢ় হইতে লাগিল। যৌবনাগমে তাহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করিল। যুবক যুবতী বিবাহের কথা একদিনও ভুলেন নাই। বিবাহ কি তাহা তাঁহারা এক্ষণে সম্যকপ্রকারে বুঝিয়াছেন। কেন বিবাহ হইতে পারে না, তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। ইংরাজি শিক্ষিত ও উন্নতিশীল হওয়ায় যোগেশের চক্ষে বিবাহ বিষয়ে কোনই প্রতিবন্ধক লক্ষিত হইল না। তিনি কৌশলে, খুল্লতা-

তের অভিপ্রায় জানিলেন। জানিলেন সমাজের ভয় ব্যতীত তাঁহার অন্য বিশেষ আপত্তি নাই। যোগেশ তাদৃশ সমাজ ভীত নহেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে যোগেশ বিমলার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। বুঝিলেন,—বিমলার কোনই অমত নাই,এবং তাহাই হৃদয়ের একান্ত বাসনা, কেবল তজ্জন্য পরিণামে যোগেশ কষ্ট পাইবেন এই আপত্তি। যোগেশ তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইলেন। বিমলা নীরবে সমস্ত শুনিলেন। যোগেশ ভাবিলেন, বিমলা সমস্ত বুঝিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মহানন্দে ভাসমান হইয়া যোগেশ সময় পাত করিতে লাগিলেন। সপ্তাহদ্বয় পরে বিমলা তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। সে পত্র পাঠক মহাশয় পাঠ করিয়াছেন। ক্রমশঃ

বনফুল।

দ্বিতীয় সর্গ।

যেওনা! যেওনা!

দুয়ারে আঘাত করে কেও পান্থবর?
'কেওগো কুটীর বাসি! দ্বার খুলে দাও আসি'
তবুও কেনরে কেউ দেয়না উত্তর?
আবার পথিকবর আঘাতিল ধীরে!
"বিপন্ন পথিক আমি, কে আছ কুঠীরে?"
তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই—
তটিনী বহিয়া যায় আপনার মনে!
পাদপ আপন মনে, প্রভাতের সমীরণে
দুলিছে, গাইছে গান সর সর স্বনে!
সমীরে কুটীর শিরে, লতা দুলে ধীরে ধীরে
বিতরিয়া চারিদিকে পুষ্প পরিমল!
আবার পথিক বর, আঘাতে দুয়ার পর—
ধীরে ধীরে খুলে গেল শিথিল অর্গল।
বিস্ফারিয়া নেত্রদ্বয়, পথিক অবাক রয়
বিস্ময়ে দাঁড়ায়ে আছে ছবির মতন।
কেন পান্থ, কেন পান্থ, মৃগ যেন দিকভ্রান্ত
অথবা দরিদ্র যেন হেরিয়া রতন!
কেনগো কাহার পানে,দেখিছ বিস্মিত প্রাণে
অতিশয় ধীরে ধীরে পড়িছে নিশ্বাস?
দারুণ শীতের কালে, ঘর্ম্ম বিন্দু ঝরে ভালে
তুষারে করিয়া দৃঢ় বহিছে বাতাস!
ক্রমে ক্রমে হয়ে শান্ত, সুধীরে এগোয় পান্থ
থর থর করি কাঁপে যুগল চরণ—
ধীরে ধীরে তার পরে, সভয়ে সঙ্কোচ ভরে
পথিক অনুচ্চ স্বরে করে সম্বোধন।
"সুন্দরি!-সুন্দরি!" হায়! উত্তর নাহিক পায়
আবার ডাকিল ধীরে "সুন্দরি! সুন্দরি"
শব্দ চারিদিকে ছুটে, প্রতিধ্বনি জাগি উঠে,
কুটীর গম্ভীরে কহে "সুন্দরি! সুন্দরি!"
তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই
এখনো পৃথিবী ধরা নীরবে ঘুমায়!
নীরব পরণ শালা, নীরব ষোড়শীবালা
নীরবে সুধীর বায়ু লতারে দুলায়!

পথিক চমকি প্রাণে, দেখিল চৌদিক পানে
কুটীরে ডাকিছে কেও "কমলা ! কমলা
অবাক হইয়া রহে, অস্ফুটে কেওগো কহে?
সুমধুর স্বরে যেন বালকের গলা !
পথিক পাইয়া ভয়, চমকি দাঁড়ায়ে রয়
কুটীরের চারি ভাগে নাই কোন জন !
এখনো অস্ফুটস্বরে,'কমলা'কমলা ! ক'রে
কুটীর আপনি যেন করে সম্ভাষণ !
কেজানে কাহাকে ডকে,কেজানেকেনবা ডাকে
কেমনে বলিব কেবা ডাকিছে কোথায় ?
সহসা পথিকবর, দেখে দণ্ডে করি ভর
'কমলা, ! কমলা' বলি শুক গান গায় !
আবার পথিকবর, হন ধীরে অগ্রেসর
সুন্দরি ! সুন্দরি বলি ডাকিয়া আবার !
আবার পথিক হায় ! উত্তর নাহিক পায়,
বসিল ঊরুর পরে সঁপি দেহ ভার !
সঙ্কোচ করিয়া কিছু-পান্থবর আগুপিছু
একটু একটু ক'রে হন্ অগ্রেসর !
আনমিত করি শিরে, পথিকটি ধীরে ধীরে
বালার নাসার কাছে সঁপিলেন কর !
হস্ত কাঁপে থর থরে, বুক্ ধুক্ ধুক্ করে
পড়িল অবশ বাহু কপোলের পর ;
লোমাঞ্চিত কলেবরে, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মঝরে
কে জানে পথিক কেন টানি লয় কর !
আবার কেন কি জানি, বালিকার হস্তখানি
লইলেন আপনার করতল পরি—
তবুও বালিকা হায় ! চেতনা নাহিক পায়—
অচেতনে শোক জ্বালা রয়েছে পাশরি !
রুক্ষ রুক্ষ কেশ রাশি, বুকের উপরে আসি
থেকে থেকে কাঁপি উঠে নিশ্বাসের ভরে
বাঁহাত আচল পরে, অবশ রয়েছে পড়ে
এলো কেশ রাশি মাঝে সঁপি ডান করে
ছাড়ি বালিকার কর, ত্রস্ত উঠে পান্থবর
দ্রুত গতি চলিলেন তটিনীর ধারে,
নদীর শীতলনীরে, ভিজায়ে বসন ধীরে,
ফিরি আইলেন পুনঃ কুটীরের দ্বারে।
বালিকার মুখে চোকে, শীতল সলিল সেকে
সুধীরে বালিকা পুনঃ মেলিল নয়ন।
মুদিতা নলিনী কলি, মরম হুতাশে জ্বলি
মুরছি সলিল কোলে পড়িলে যেমন—
সদয়া নিশীর মন, হিম সেঁচি সারাক্ষণ
প্রভাতে ফিরায়ে তারে দেয়গো চেতন।
মেলিয়া নয়ন পুটে, বলিকা চমকি উঠে
একদৃষ্টে পথিকেরে করে নিরীক্ষণ
পিতা মাতা ছাড়া কারে,মানুষে দেখেনি হারে
বিস্ময়ে পথিকে তাই করিছে লোকন !
আঁচল গিয়াছে খসে, অবাক্ রয়েছে ব'সে
বিস্ফারি পথিক পানে যুগল নয়ন !
দেখেছে কভু কেহ কি, এহেন মধুর আঁখি ?
স্বর্গের কোমল জ্যোতি খেলিছে নয়নে
মধুর স্বপনে মাখা, সারল্য প্রতিমা আঁকা
কে তুমি গো?' জিজ্ঞাসিছে যেন প্রতিক্ষণে
পৃথিবী ছাড়া এ আঁখি,স্বর্গের আড়ালে থাকি
পৃথ্বীরে জিজ্ঞাসে 'কে তুমি ? কে তুমি'
মধুর মোহের ভুল, এ মুখের নাই তুল
স্বর্গের বাতাস বহে এ মুখটি চুমি !
পথিকের হৃদে আসি, নাচিছে শোণিত রাশি
অবাক্ হইয়া বসি রয়েছে সেথায় !
চমকি ক্ষণেক পরে, কহিল সুধীর স্বরে,
বিমোহিত পান্থবর কমলা-বালায় !
"সুন্দরী,আমিগো পান্থ, দিকভ্রান্ত,পথশ্রান্ত
উপস্থিত হইয়াছি বিজন কাননে !
কাল হ'তে ঘুরি ঘুরি, শেষে এ কুটীর পুরী
আজিকার নিশি শেষে পড়িল নয়নে !
বালিকা ! কি কব আর, আশ্রয় তোমার দ্বার
পান্থ পথ হারা আমি করিগো প্রার্থনা

জিজ্ঞাসা করিগো শেষে,মৃতেলয়ে ক্রোড়দেশে
কে তুমি কুটীর মাঝে বসি সুধাননা ?”
পাগলিনী প্রায় বালা, হৃদয়ে পাইয়া জ্বালা
চমকিয়া বসে যেন জাগিয়া স্বপনে ;
পিতার বদন পরে, নয়ন নিবিষ্ট ক'রে
স্থির হ'য়ে বসি রয় ব্যাকুলিত মনে।
নয়নে সলিল ঝরে, বালিকা সমুচ্চ স্বরে
বিষাদে ব্যাকুল হৃদে কহে“পিতা—পিতা”।
কে দিবে উত্তর তোর, প্রতিধ্বনি শোকেভোর
রোদন করিছে সেও বিষাদে তাপিতা।
ধরিয়া পিতার গলে, আবার বালিকা বলে
উচ্চৈঃস্বরে “পিতা-পিতা” উত্তর নাপায় !
তরুণী পিতার বুকে, বাহুতে ঢাকিয়া মুখে
অবিরল নেত্র জলে বক্ষ ভাসি যায়।
শোকানলে জল ঢালা,সাঙ্গ হ'লে উঠে বালা
শূন্য মনে উঠি বসে আঁখি অশ্রুময় !
বসিয়া বালিকা পরে, নিরখি পথিকবরে
সজল নয়ন মুছি ধীরে ধীরে কয়,—
'কে তুমি জিজ্ঞাসা করি,কুটীরে এলে কি করি
আমি যে পিতারে ছাড়া জানিনা কাহারে !
পিতার পৃথিবী এই, কোন দিন কাহাকেই
দেখিনি ত এখানে এ কুটীরের দ্বারে !
কোথা হ'তে তুমি আজ, আইলে পৃথিবীমাঝ ?
কি ব'লে তোমারে আমি করি সম্বোধন ?
তুমি কি তাহাই হবে, পিতা যাহাদের সবে,
মানুষ বলিয়া আহা করিত রোদন ?
কিম্বা জাগি প্রাতঃকালে, যাদের দেবতা বলে
নমস্কার করিতেন জনক আমার ?
বলিতেন যার দেশে, মরণ হইলে শেষে
যেতে হয়, সেথাই কি নিবাস তোমার ?
নাম তার স্বর্গভূমি, আমারে সেথায় তুমি
ল'য়ে চল দেখি গিয়া পিতায় মাতায় !
ল'য়ে চল দেব তুমি আমারে সেথায় ?

যাইব মায়ের কোলে, জননীরে মাতা ব'লে
আবার সেখানে গিয়া ডাকিব তাঁহারে !
দাঁড়ায়ে পিতার কাছে, জলদিব গাছে গাছে
সঁপিব তাঁহার হাতে গাঁথি ফুলহারে !
হাতে লয়ে শুকপাখী, বাবা মোর নাম ডাকি
'কমলা' বলিতে আহা শিখাবেন তারে !
লয়ে চল দেব, তুমি সেথায় আমারে !
জননীর মৃত্যু হ'লে,ওই হোথা গাছতলে
রাখিয়াছিলেন তাঁরে জনক তখন !
ধবল তুষার ভার, ঢাকিয়াছে দেহ তাঁর
স্বরগের কুটীরেতে আছেন এখন !
আমিও তাঁহার কাছে করিব গমন ! ”
বালিকা থামিল সিক্ত হয়ে আঁখিজলে
পথিকেরো আঁখিদ্বয়, হ'ল আহা অশ্রুময়
মুছিয়া পথিক তবে ধীরে ধীরে বলে !
আইস আমার সাথে,স্বর্গরাজ্য পাবে হাতে
দেখিতে পাইবে তথা পিতায় মাতায়।
নিশা হ'ল অবসান, পাখীরা করিছে গান
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাতের বায় !
আঁধার ঘোমটা তুলি, প্রকৃতি নয়ন খুলি
চারিদিক ধীরে যেন করিছে বীক্ষণ—
আলোকে মিশিল তারা, শিশিরের মুক্তাধারা
গাছ পালা পুষ্প লতা করিছে বর্ষণ !
হোথা বরফের রাশি,মৃত দেহ রেখে আসি
হিমানি ক্ষেত্রের মাঝে করায়ে শয়ান,
এই লয়ে যাই চ'লে,মুছে ফেল অশ্রুজলে
অশ্রুবারি ধারে আহা পূরেছে নয়ান !”
পথিক এতেক কয়ে, মৃত দেহ তুলে লয়ে
হিমানি ক্ষেত্রের মাঝে করিল প্রোথিত।
কুটীরেতে ধীরি ধীরি, আবার আইল ফিরি
কত ভাবে পথিকের চিত্ত আলোড়িত।
ভবিষ্যত কলপনে, কভু কি আপন মনে
দেখিছে, হৃদয় পটে আঁকিতেছে কত—

দেখে পূর্ণচন্দ্র হাসে, নিশিরে রজতবাসে
ঢাকিয়া, হৃদয় প্রাণ করি অবারিত—
জাহ্নবী বহিছে ধীরে, বিমল শীতল নীরে
মাখিয়া রজত রশ্মি গাহি কলকলে—
হরষে কম্পিত কায়, মলয় বহিয়া যায়
কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে কুসুমের দলে—
ঘাসের শয্যার পরে, ঈষৎ হেলিয়া পড়ে
শীতল করিছে প্রাণ শীত সমীরণ—
কবরীতে পুষ্পভার, কেও বাম পাশে তার
বিধাতা এমন দিন হবে কি কখন ?
অদৃষ্টে কিআছে আহা! বিধাতাই জানে তাহা
যুবক আবার ধীরে কহিল বালায়,—
"কিসের বিলম্ব আর ? ত্যজিয়া কুটীর দ্বার
আইস আমার সাথে কাল বহে যায় !"
তুলিয়া নয়ন দ্বয়, বালিকা সুধীরে কয়,
বিষাদে ব্যাকুল আহা কোমল হৃদয়—
"কুটীর ! তোদের সবে, ছাড়িয়া যাইতে হবে
পিতার মাতার কোলে লইব আশ্রয়।
হরিণ ! সকালে উঠি, কাছেতে আসিত ছুটি
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায় ;
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি, মুখেতে দিতাম তুলি
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায় !
তাদের করিয়া ত্যাগ যাইব কোথায় ?
যাইব স্বরগ ভূমে, আহা হা ! ত্যজিয়া ঘুমে
এতক্ষণে উঠেছেন জননী আমার—
এতক্ষণে ফুল তুলি, গাঁথিছেন মালাগুলি
শিশিরে ভিজিয়া গেছে আঁচল তাঁহার—
সেথাও হরিণ আছে, ফুল ফুটে গাছে গাছে
সেখানেও শুক পাখী ডাকে ধীরে ধীরে !
সেথাও কুটীর আছে, নদী বহে কাছে কাছে
পূর্ণ হয় সরোবর নির্ঝরের নীরে।
আইস ! আইস দেব ! যাই ধীরে ধীরে !
আয় পাখী ! আয় আয় ! কার তরে রবি হায়
উড়ে যা উড়ে যা পাখি ! তরুর শাখায় !
প্রভাতে কাহারে পাখি ! জাগাবিরে ডাকি২
"কমলা !" "কমলা !" বলি মধুর ভাষায় ?
ভুলেযা কমলানামে,চলে যা সুখের ধামে
'কমলা !' 'কমলা !' ব'লে ডাকিস্‌নে আর
চলিনু তোদের ছেড়ে, যা শুক শাখায় উড়ে—
চলিনু ছাড়িয়া এই কুটীরের দ্বার।
তবু উড়ে যাবি নেরে, বসিবি হাতের পরে
আয় তবে, আয় পাখি, সাথে সাথে আয়,
পিতার হাতের পরে আমার নামটি ধ'রে—
আবার,—আবার তুই ডাকিস্‌ সেথায়।
আইস পথিক তবে কাল ব'হে যায়।"
সমীরণ ধীরে ধীরে, চুম্বিয়া তটিনী নীরে—
দুলাইতে ছিল আহা, লতায় পাতায়—
সহসা থামিল কেন প্রভাতের বায় ?
সহসারে জলধর, নব অরুণের কর
কেনরে ঢাকিল শৈল অন্ধকার ক'রে ?
পাপীয়া শাখার পরে, ললিত সুধীর স্বরে
তেমনি করনা গান, থামিলি কেনরে ?
ভুলিয়া শোকের জ্বালা, ওইরে চলিছে বালা
কুটীর ডাকিছে যেন 'যেওনা—যেওনা !—
তটিনী তরঙ্গ কুল, ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন 'যেওনা ! যেওনা'—
বনদেবী নেত্র খুলি—পাতার আঙ্গুল তুলি
যেন বলিছেন আহা—'যেওনা!—যেওনা!—
নেত্র তুলি স্বর্গ পানে, দেখে পিতা মেঘ যানে
হাত নাড়ি বলিছেন 'যেওনা!—যেওনা!—
বালিকা পাইয়া ভয়—মুদিল নয়ন দ্বয়
এক পা এগোতে আর হয়না বাসনা—
আবার আবার শুন !—কানের কাছেতে পুনঃ
কে কহে অস্ফুট স্বরে 'যেওনা!—যেওনা!—

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ভারত বিজয়। দৃশ্যকাব্য। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। Published by R. N. Chakravarti, 34 Meerjaffer's Lane :—Calcutta, 1875. মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

ইন্দ্রপ্রস্থাধিপ পৃথ্বিরাজ ও কান্যকুব্জেশ্বর জয়চন্দ্র এই হিন্দু রাজদ্বয়ের গৃহবিচ্ছেদ জনিত সমুচিত সুযোগে, গজনীরাজ সাহাবউদ্দীন কাগার ক্ষেত্রে, হিন্দু স্বাধীনতার মূলে যে বিষম কুঠারাঘাত করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই দৃশ্য কাব্য খানি বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার ঘটনাটীর শেষ পর্য্যন্ত গমন করেন নাই। মধ্যস্থলে নায়ক নায়িকার সম্মিলন সাধিত করিয়া দৃশ্যকাব্য খানিকে শুভান্ত করিয়া শেষ করিয়াছেন। ইহা প্রথমাংশ, অপরাংশে বোধ হয় ঘটনার সমাপ্তি হইবে। প্রমথ নামক একজন বীর যুবা পৃথ্বিরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনিই গ্রন্থের নায়ক। জয়চন্দ্রের কন্যা ইন্দুমালা নায়িকা। এতদ্ভিন্ন মূল ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত আরও বিস্তর কবিজনোচিত কল্পনা বিমিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তৎসমস্তে সমধিক নুতনত্ব নাই। বিষধর, বিজয়, ইন্দুমালা ও জয়চন্দ্রের চরিত্র সুচিত্রিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবুর স্ত্রী চরিত্র অপেক্ষা পুরুষ চরিত্র চিত্রিত করিবার ক্ষমতা অধিক। গ্রন্থের ভাষা ও ভাব অশ্লীলতা বর্জ্জিত ও অতি সুন্দর। রাজেন্দ্র বাবু "শকুন্তলা" ও "রোমিও জুলিয়েট্" প্রভৃতি হইতে অনেক ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন স্থানে তাহা স্বীকার করেন নাই। যাহাই হউক উপস্থিত গ্রন্থ খানি সুপাঠ্য হইয়াছে, ভরসা করি দ্বিতীয়াংশ আরও উত্তম হইবে।

ভারতের সুখশশী যবন কবলে নাটক শ্রীনবীন চন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সন ১২৮২। মূল্য এক টাকা মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত দৃশ্যকাব্য খানি যে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত, এ নাটক খানিও সেই ঘটনামূলক। ঐ ঘটনাটী ভারত ইতিহাসের অতি উজ্জ্বল সম্পত্তি। ভারতবাসীগণের হৃদয়ে তাহা সতত জাগরূক থাকা উচিত। যে যে ব্যক্তি উক্ত ঘটনাটী চিরস্মরণীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। বাবু রাজেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী বিষয়টীর শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করেন নাই,— বিদ্যারত্ন মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত সুচিত্রিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লেখনী

প্রসূত নাটক ইদানীন্তন কালের পাঠক সমূহের সবিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে না বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, কিন্তু পাঠান্তে বুঝিলাম, বিদ্যারত্ন মহাশয় যে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা আধুনিক অনেক নাটক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হস্তিনার রাজা পৃথুরাজ বা পৃথ্বীরাজ এ গ্রন্থের নায়ক এবং জয়চন্দ্রের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরী নায়িকা। অবন্তীরাজ কুমার পুষ্পকেতু গ্রন্থের একজন প্রধান পাত্র। বিদ্যারত্ন মহাশয় এই ব্যক্তিকেই যাবতীয় অশুভ, অনিষ্ট ও কলহের নিদান রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এই ব্যক্তির চরিত্র চিত্রিত করিতে গ্রন্থকার অতিশয় নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রতি কথায় ও প্রতি কার্য্যে বিদ্বেষ ও নষ্ট বুদ্ধি বিভাসিত হইতেছে। অনঙ্গমঞ্জরীর চরিত্রও সুচিত্রিত হইয়াছে। উৎসাহে, আনন্দে, নিরাশায়, ভগ্নোৎসাহে, বিগ্রহে, সকল স্থানেই অনঙ্গমঞ্জরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং সকল স্থানেই তাঁহাকে সজীব ও মূর্ত্তিমতী বলিয়া বোধ হয়। নাটক খানির মধ্যে যে সমস্ত দৃশ্য সমাবিষ্ট তাহাও অতি মনোহর। বিশেষতঃ উপসংহার কালে পৃথুরাজ ও সোমরাজের বীরত্ব সূচক বাক্যাবলী, অন্যায় সমরে তাঁহাদের পতন, এবং বীরনারী অনঙ্গমঞ্জরীর আত্মহত্যা বিবরণ অতীব হৃদয়গ্রাহী। পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে সংগীত ও কবিতা বিন্যস্ত আছে, সে গুলি পরম মনোহর।

গ্রন্থে কয়েকটী বিশেষ দোষ লক্ষিত হইল। বিদ্যারত্ন মহাশয় একটু মনোযোগী হইলেই তাহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা দুইটী দোষ আমাদের বিশেষ বিরক্তিজনক হইয়াছে। ১ম— অনেক স্থলেই ঐতিহাসিক কথার অন্যথা করা হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বজন বিদিত ঘটনার অপহ্নব করা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। ২য়—বঙ্গদেশ প্রচলিত আধুনিক গ্রাম্য শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার। মহম্মদ ঘোরির সময়ে, দিল্লী নগরে নসিরদ্দি টীকেওয়ালা, ফতে উল্লা দরজি, হেমাত চাচা ও গুলজার মামুর আবির্ভাব নিতান্ত অসঙ্গত। বোধ হয়, বিদ্যারত্ন মহাশয় গল্প সুমিষ্ট করিতে ও পাঠকের হৃদয়ে আমোদ উৎপাদন করিতে সমধিক চেষ্টাশীল ছিলেন, এ সকল দিকে লক্ষ্য করিতে অবকাশ পান নাই।

হোমিওপেথিক সচিত্র পুস্তকাবলী। ১ম ও ২য় সংখ্যা। শ্রীবসন্ত কুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ।৶০ ছয় আনা। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে শ্রীহেম চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

এক শতাব্দী অদ্যাপি উত্তীর্ণ হয় নাই, প্রাতঃ স্মরণীয় মহাত্মা হানিমান, হোমিওপেথিক চিকিৎসার মূল তত্ত্ব

ব্যক্ত করেন। ভূমণ্ডলে যখন যে কোন পণ্ডিত যে কোন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তখনই তিনি জন সমাজে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়াছেন। হানিমানও চিকিৎসা সম্বন্ধে নূতন মত প্রকাশ করিয়া অশেষ বিধ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। সত্যের প্রকৃত তথ্য হৃদয় কাননে নিবিষ্ট হইলে কাহার সাধ্য তাহা উৎপাটিত করে? কষ্টে বা যাতনায় হৃদয়ের প্রকৃত ভাবের কখন অন্যথা হয় না। কিছুতেই ডাক্তর হানিমানের মতের অন্যথা হইল না। বরং নিরন্তর গবেষণা হেতু তৎসম্বন্ধে আরও নূতন যুক্তি ও প্রমাণ সংগৃহীত হইতে লাগিল। "কণ্ট্রারিয়া কণ্টোরাইস্ কিউর‍্যাণ্টর," অর্থাৎ "বিপরীতে বিপরীত উপশমিত হয়," এই চির প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে হানিমান বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া "সিমিলিয়া সিমিলিবস্ কিউর‍্যাণ্টর,"—অর্থাৎ "সমানে সমান উপশমিত হয়," এই নূতন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এ মতে চিকিৎসা প্রচলিত ছিল না বটে কিন্তু ভূতলে বহুকাল পূর্ব্বেও এরূপ মত ছিল। অতি প্রাচীন হিপক্রিটীসের গ্রন্থে এবম্বিধ মত ব্যক্ত আছে, এবং

"শ্রূয়তে হি পুরালোকে
বিষস্য বিষমৌষধম্।"

এ কথা যে দেশে প্রচলিত, সে দেশের অধিবাসীবর্গ কোন না কোন কালে হোমিওপেথি জানিতেন সন্দেহ নাই। মহাত্মা সামুয়েল্ হানিমান ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত চিকিৎসা প্রণালী বিজ্ঞানজ্ঞগণের হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিতবৎ জাজ্বল্য রহিয়াছে। অল্প সময়ে ও ঘোর প্রতিদ্বন্দিতা ভেদ করিয়া হোমিওপেথিক যেরূপ উন্নতি ও প্রাধান্য লাভ করিতেছে, তাহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে যে, ভবিষ্যতে হোমিওপেথিক পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র চিকিৎসা হইয়া উঠিবে।

সর্ব্বাপেক্ষা আমেরিকা খণ্ডেই হোমিওপেথির প্রতি জনসাধারণের সমধিক আস্থা পরিদৃষ্টহয়। বিজ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অতি হীনাবস্থা। কিন্তু অন্যান্য বিষয়াপেক্ষা হোমিওপেথির প্রতি ভারত বাসীগণের অধিক যত্ন দেখা যাইতেছে। বঙ্গীয় চিকিৎসক প্রধান ডাক্তর শ্রীমহেন্দ্র লাল সরকার মহোদয় "বিপুল বিভব-প্রদ এলোপেথি" চিকিৎসায় সুশিক্ষিত হইয়াও "সত্যের অনুরোধে" তাহা ত্যাগ করিয়া হোমিওপেথির আশ্রয় গ্রহণ করত "মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা" প্রদর্শন করিয়াছেন। মেডিকেল কালেজের আরও অনেক সুশিক্ষিত ছাত্র এলোপেথি ত্যাগ করিয়া হোমিওপেথি অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু বসন্ত কুমার দত্ত ম-

হাশয় এই শ্রেণীর একজন সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। এই চিকিৎসা প্রণালীতে তিনি সবিশেষ অনুরক্ত ও যাহাতে দেশে ইহা সম্যক্ প্রচলিত হয়, তৎপক্ষে তিনি সবিশেষ যত্নশীল। ইতিপূর্ব্বে বসন্ত বাবু স্ত্রীলোক ও গৃহস্থ দিগের ব্যবহারার্থ "গৃহ চিকিৎসা" নামধেয় অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক শ্রেণী স্বদেশ বাসীবর্গকে প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি হোমিওপেথি শাস্ত্র সুচারু ও সবিশেষরূপে প্রচারিত করিবার মানসে, "হোমিওপেথিক, সচিত্র পুস্তকাবলী" সংখ্যাক্রমে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ উদ্যম অতি প্রশংসনীয়, অতি উচ্চ ও অতি কল্যাণকর। প্রকাশিত সংখ্যাদয়ের প্রথমে ভৈষজ্য তত্ত্ব, ও অপরে চিকিৎসা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ভৈষজ্য তত্ত্ব, ও চিকিৎসা বিবরণ প্রকাশিত হইবে। প্রথমে 'আর্নিকা,' 'ইপিকাক্' প্রভৃতি—কয়েকটী দ্রব্যের ধর্ম্ম, দ্বিতীয়ে রক্ত সঞ্চলন ও জ্বরের বিবরণ মাত্র লিখিত হইয়াছে। যেরূপ সুবিস্তৃত রূপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয় সকল বিবৃত হইতেছে, তাহাতে এতৎপাঠে সকলেই সমূহ উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন ও দেশের যথেষ্ট হিত সাধিত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমরা কায়মনোবাক্যে বসন্ত বাবুর দীর্ঘ জীবন ও মঙ্গল কামনা করি এবং প্রার্থনা করি, তিনি যেন সুস্থ শরীরে থাকিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন।

শক্র সিংহ নাটক। শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ১৪ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীমথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮২ সাল। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই,উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পাইতে পার লুকান রতন।"

কবির এই উপদেশানুসারে আমরা "লুকান রতন" প্রাপ্তির আশায় গ্রন্থ খানি আলোড়ন করিলাম। অদৃষ্ট মন্দ—রত্ন পাইলাম না। না পাই—তাহাতে দুঃখ নাই। কুঞ্জ বিহারী বাবু নবীন লেখক। আমরা তাঁহাকে ব্যথিত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার গ্রন্থে দোষ গুণ দুইই আছে। গুণেও নূতনত্ব নাই; দোষেও নূতনত্ব নাই। তবে যেরূপ প্রণালীতে গল্প সজ্জিত হইয়াছে, যেরূপ ভাষায় গ্রন্থ খানি লিখিত হইয়াছে, এবং নায়ক নায়কা প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত পাত্র গণের চরিত্র চিত্রিত করিতে গ্রন্থকার যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে তাঁহার লেখনী অপেক্ষাকৃত সুফল প্রসব করিবে।

কমল কলিকা কাব্য। শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। ১৮৭৫। মূল্য।/০ পাঁচ আনা।—

এখানি ক্ষুদ্র পদ্যময় গ্রন্থ। ক্ষুদ্র হউক ইহাতে বিস্তর সদ্ভাব পূর্ণ কবিতা আছে। লেখকের একটু কবিত্ব আছে, একটু চিন্তাশক্তিও আছে। তিনি সাহিত্য সংসারে আর একবার "বিবিধ দর্শন" নামে আর একখানি সুন্দর কাব্য হস্তে দেখা দিয়াছিলেন। দীন নাথ বাবুর কবিতা সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও তাহা সুপাঠ্য ও সুললিত তাহার সন্দেহ নাই।

ভারতে সুখ। (রাজ্ঞি পুত্রের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে।) শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮২ সাল। মূল্য ৶০ আনা ও ডাকমাশুল /০ আনা।—

রাজ্ঞি পুত্রের অনুগ্রহে দুর্ভাগ্য ভারত বাসী অনেক দেখিল। ভারত স্বপ্নেও যাহা আশা করে নাই তাহা ঘটিল। দীনহীনা ভারতের বহুরত্ন পরিপূর্ণ ভাণ্ডার অধুনা নিঃশেষ হইয়াছে। সেই শূন্য ভাণ্ডারে যাহা কিছু ছিল, ভারত রাজ্ঞি পুত্রের সন্তোষ সাধনার্থ তাহাও ব্যয় করিল। ভারতের নিরুপম শোভা হইল। নির্ব্বোধ ভারতসুতবৃন্দ অতৃপ্ত নয়নে সেই শোভা সন্দর্শন করিল। যুবরাজ সম্প্রতি আমাদের এই দেব দুর্ল্লভ শোভা সমস্ত দেখাইলেন। তাঁহার জয় হউক—তিনি সুখে থাকুন।

যুবরাজ আমাদের আর এক মহদুপকার করিয়াছেন। তাঁহার আগমনে বঙ্গীয় সাহিত্যের শরীর অপেক্ষাকৃত পুষ্ট হইয়াছে। নিরীহ, দরিদ্র বঙ্গসন্তানের কাগজ, কলম ভিন্ন আর কি আছে? লেখনী মুখে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিয়া তাহারা রাজকীয় করুণা লাভের চেষ্টা করিল। দেশময় রাজোপহারের ছড়াছড়ি হইল।

ভক্তি মনুষ্য হৃদয়ের অতি পবিত্র ধর্ম্ম, অতি অকপট ভাব ও মহার্হ ধন। কল্পনায় তাহার আবির্ভাব হয় না, বর্ণনায় তাহা বুঝান যায় না, কবিশক্তি সকল সময় তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। হৃদয়ের অকপট ভাব সময় পাইলে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, আধার হইতে উচ্ছলিত হইয়া পড়ে, আপনার অসামান্য গুণে জগৎ মোহিত করে, হাসায়, কাঁদায় এবং স্বয়ং মোহিত হয় হাসে ও কাঁদে। বঙ্গীয় হৃদয় কমনীয় গুণ সমস্তে পরিপূর্ণ। ভক্তি ও প্রীতি তাহাদের ইষ্ট মন্ত্র। শত বর্ষ মধ্যে যাহা ঘটে নাই, আর শত বর্ষেও যাহা ঘটিবার আশা ছিল না এরূপ অগোচর পূর্ব্ব, পরম মঙ্গলময় রাজ্ঞিপুত্রের দর্শন লাভে ভারতবাসী, বিশেষতঃ

বঙ্গবাসী, মহানন্দে স্ব স্ব হৃদয় কবাট খুলিয়া দিল। ভক্তিময় হৃদয় নাচিয়া উঠিল। আনন্দে মন মোহিত হইল। ব্যবহার শাস্ত্রের কূট তর্কে কাতর মস্তক কবির হৃদয়, অবরোধ নিবদ্ধা বঙ্গ সিমন্তিনীর অস্ফুট অন্তঃকরণ, বিচারাসন সমাসীন ভাবুকের মন, সকলই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হৃদয় নিঃসৃত স্রোত রাশি হৃদয়ের অতি গূঢ়তম প্রদেশের, অতি গূঢ়তম ভাব পুঞ্জ বহন করিয়া বঙ্গবাসী সমক্ষে উপস্থিত করিল। বঙ্গবাসী তাহাতে মোহিত হইল, হাসিল, কাঁদিল; তথাপি নিস্তব্ধভাবে সেই কথা শুনিল। পাগল হইল তবু শুনিল।

সমালোচ্য "ভারতে সুখ" পুস্তিকা সেই ভক্তি প্রণোদিত হৃজ্জাত বহুবিধ প্রস্রবণের একতম। ইহার অবয়ব তাদৃশ বৃহৎ নহে। কিন্তু এই ক্ষুদ্রাবয়ব মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা অতি সুন্দর, অতি মনোহর ও অতি পবিত্র। যাহা কিছু আছে—তাহার সহিত হৃদয় আছে, সরলতা আছে ও অনুরাগ আছে।—তাহা মুগ্ধকরী, সন্তোষ সাধিনী ও তৃপ্তি বিধায়িনী।

"অয়ি অনাথিনি, মলিন বসনা,
পাষাণে আবৃত তোমার কপাল,
এজনমে আর কখন যাবে না
সেই শৈল খণ্ড রবে চিরকাল।"

কবি ভারতকে সম্বোধন করিয়া এই যে হৃদয় ঘাতী কথা বলিয়াছেন তাহা আমরা কখন ভুলিতে পারিব না। ইহার অস্থি মজ্জায় কবির সহৃদয়তা ও স্বদেশানুরাগ আছে।

৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা ফাল্গুন, ১২৮২।

ও

প্রতিবিম্ব।

(মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।)

বিষয় পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিংলাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮২

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

১। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য বিষয়ক নিয়ম ;—

বার্ষিক অগ্রিম	……	……	……	……	৩৲
ষাণ্মাষিক ,,	……	……	……	……	১৸৵
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	……	……	……	……	।৵৹

এতদ্ব্যতীত মফঃসলে গ্রাহকদিগের বার্ষিক ।৵৹ ছয় আনা করিয়া ডাক মাশুল লাগিবে।

২। যাঁহারা জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য স্বরূপে ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা কেবল অৰ্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন ; এবং প্রত্যেক টাকাতে /৹ এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইবেন, কেননা বিক্রয় করণ কালে আমাদিগকে টাকাতে /৹ আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

৩। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের কার্য্য সম্বন্ধে পত্র এবং সমালোচনের জন্য গ্রন্থাদি আমরা গ্রহণ করিব। রচনা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমাদের ঠিকানায় "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব সম্পাদক" শিরোনামা দিয়া লিখিতে হইবে।

৪। ব্যারিং ও ইন্সফিসেণ্ট পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট
ক্যানিং লাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব কার্য্যাধ্যক্ষ।

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শেষোক্তরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাধি আয়ত্ত করিতে হইলে, তজ্জন্য ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটি উপকরণের আবশ্যক যথা;—'শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা পূর্ব্বক ইতরেষাম্।' 'ইতরেষাং' অর্থাৎ 'বিদেহ-প্রকৃতি-লয়-ব্যতিরিক্তানাং যোগিনাং।' বিদেহ এবং প্রকৃতি-লয়-ব্যতিরিক্ত যোগিদিগের; অর্থাৎ পরম কারণ যে প্রকৃতি, তাহারও উপরের তত্ত্ব যে জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা, তাহাতে কৃতসমাধি যোগিদিগের, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা এই পাঁচটি উপকরণ ক্রমান্বয়ে আবশ্যক। 'তত্র শ্রদ্ধা যোগবিষয়ে চেতসঃ প্রসাদঃ।' শ্রদ্ধা কি?—না, যোগ বিষয়ে চিত্তের প্রসন্নতা। 'শ্রদ্ধাবতো বীর্য্যং জায়তে'—শ্রদ্ধা হইলেই বীর্য্য, কিনা উৎসাহ জন্মায়। 'সোৎসাহস্যচ পাশ্চাত্যাসু ভূমিষু স্মৃতিরুপজায়তে।'—উৎসাহ হইলেই পূর্ব্বাভ্যস্ত সমাধির ভাব্য-বিষয় সকল স্মরণ-গোচর হয়। 'তৎস্মরণাৎ চেতঃ সমাধীয়তে।" সে সকলের স্মরণ মাত্রে চিত্ত সমাহিত হয়।—'সমাহিতচিত্তশ্চ ভাব্যং সম্যক্ বিজানাতি'।—এবং চিত্ত সমাহিত হইলেই ভাব্যবিষয় সম্যক্‌রূপে জ্ঞান-গোচর হইয়া থাকে। এইরূপ প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে উৎসাহ, পরে স্মৃতি, পরে সমাধি, অবশেষে প্রজ্ঞা অর্থাৎ সংশয় রহিত প্রকৃষ্ট জ্ঞান; এই কয়টি পর পর উদিত হইয়া সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির চরম সাফল্য সম্পাদন করে।

"ইদানীং এতদুপায়বিলক্ষণং সুগমমুপায়ান্তরমাহ"।—এক্ষণে উল্লিখিত শ্রদ্ধাদি উপায় সকল হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র আর একটি উপায় কহা যাইতেছে,— "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।" সে উপায় কি?—না, ঈশ্বরপ্রণিধান। "ঈশ্বরপ্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষঃ, বিশিষ্টমুপাসনং, সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং।' ঈশ্বর-প্রণিধান কি? না, ঈশ্বরেতে ভক্তিবিশেষ, বিশিষ্টরূপে ঈশ্বরের উপাসনা এবং সমস্ত ক্রিয়া ঈশ্বরকে সমর্পণ করা। "বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া স্তস্মিন্ পরমগুরৌ অর্পয়তীতি।" ঈশ্বরেতে সমস্ত ক্রিয়া সমর্পণ,—এ কথার অর্থ এই যে সাধক, বিষয়-সুখাদি ফল ইচ্ছা না করিয়া সকল কর্ম্ম সেই পরম গুরু ঈশ্বরেতে সমর্পণ করেন। "তৎ প্রণিধানং।" এইরূপ আচরণকেই প্রণিধান কহে। "সমাধেস্তৎফললাভস্যচ প্রকৃষ্ট উপায়ঃ।' এই রূপ ঈশ্বর প্রণিধান সমাধির এবং তাহার ফল-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ

বীজং।" ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞবীজ নিরতিশয়। 'তস্মিন্ ভবতি সর্ব্বজ্ঞস্য যদ্বীজং তত্র নিরতিশয়ং কাষ্ঠাপ্রাপ্তং।' সর্ব্বজ্ঞের যে বীজ, তাহা ঈশ্বরেতে নিরতিশয়, অর্থাৎ কাষ্ঠাপ্রাপ্ত—অর্থাৎ সকলেতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সর্ব্বজ্ঞতা-বীজ নিহিত আছে, কিন্তু ঈশ্বরেতে সেই সর্ব্বজ্ঞতা-বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। বীজ কেন বলা হইল?—না, "অতীতানাগতাদি গ্রহণ স্যাল্পত্বে মহত্ত্বেচ মূলত্বাৎ বীজমিব বীজং।" ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞানের ন্যূনাধিক পরিমাণ থাকাতে তাহার মূলে যে জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে তাহা বীজের সহিত উপমেয় বলিয়া তাহাকে বীজ বলা হইল।

'দৃষ্টাহ্যল্পত্ব মহত্ত্বাদীনাং সাতিশয়ানাং কাষ্ঠা প্রাপ্তিঃ।' অল্পত্ব এবং বৃহত্ত্ব মাত্রেরই কাষ্ঠা প্রাপ্তি দেখা গিয়া থাকে। যথা;—'পরমাণৌ অল্পত্বস্য, আকাশেচ পরম মহত্ত্বস্য।' যেমন পরমাণুতে অল্পত্ব এবং আকাশে বৃহত্ত্ব কাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'এবং জ্ঞানাদয়োঽপি চিত্তধর্ম্মা স্তারতম্যেন পরিদৃশ্যমানা ক্বচিৎ নিরতিশয় মাসাদয়ন্তি।' এই রূপ জ্ঞানাদি চিত্তধর্ম্ম সকলও, যাহারা তারতম্যবিশিষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারাও, অবশ্য কোন না কোন স্থানে নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; যেখানে জ্ঞানাদি নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর। 'তস্য স্বপ্রয়োজনাভাবে কথং প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সংযোগ-বিয়োগান্ আপাদয়তীতি নাশঙ্কনীয়ং।' তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই, তবে কেন তিনি আত্মা এবং জড়ের সংযোগ বিয়োগ সম্পাদন করেন? এরূপ আশঙ্কা অযুক্ত। 'তস্য কারুণিকত্বাৎ ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনং।' তিনি করুণাময়, এ জন্য জীবগণের প্রতি অনুগ্রহই তাঁহার প্রয়োজন। 'স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।' সকলের আদি পুরুষদিগেরও তিনি গুরু, যে হেতু তিনি কাল কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন নহেন, অর্থাৎ তিনি অনাদি।

'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।' প্রণব অর্থাৎ ওঁকার তাঁহার বাচক। 'তজ্জপস্তস্যার্থ ভাবনং।' তাঁহার জপ কি? না, ওঁকারের অর্থ-ভাবনা। 'ভাবনং পুনঃ পুনশ্চেতসি বিনিবেশনং।' ভাবনা কি? না, পুনঃ পুনঃ চিত্তেতে বিনিবেশন অর্থাৎ ওঁকারের অর্থ পুনঃ পুনঃ চিত্তে সন্নিবেশন করাই তাঁহার জপ। 'একাগ্রতায়া উপায়ঃ।' ঐরূপ ওঁকারের জপ একাগ্রতার উপায়। "অতঃ সমাধি সিদ্ধয়ে যোগিনা প্রণবো জপ্যঃ।" অতএব সমাধি সিদ্ধির জন্য পুনঃ পুনঃ ওঁকারের অর্থ-ভাবনা যোগীদিগের কর্ত্তব্য। ওঁকার জপের ফল কি?—

না, ' ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়া ভাবশ্চ।' তদ্দ্বারা প্রত্যক্-চেতন-স্বরূপের উপলব্ধি হয় এবং যোগের যে সকল বাধা আছে, সে সকলের অভাব হয়। প্রত্যক্-চেতন কাহাকে বলে ? না, " প্রতীপং বিপরীতং অঞ্চতিবিজানাতীতি প্রত্যক্ (বহির্ব্বস্তু সকলের বিপরীতে যিনি জানেন) সচাসৌ চেতশ্চেতি।" এমন যে চেতন পুরুষ তাঁহাকেই প্রত্যক্-চেতন কহা যায়। ওঁকার জপ দ্বারা এই প্রত্যক্-চেতন পুরুষের, অর্থাৎ বিষয়াতীত চেতন পুরুষের, স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং চিত্ত বিক্ষেপ রূপ বাধা সকলের বিনাশ হয়। চিত্ত-বিক্ষেপ সকল নিবারণ করিবার জন্য উল্লিখিত উপায়ের আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপায়ও কল্পিত হইয়াছে যথা;—'তৎপ্রতিষেধার্থং এক তত্ত্বাভ্যাসঃ।' কোন একটি তত্ত্বের পুনঃপুনঃ চিন্তা দ্বারা বিক্ষেপ নিবারিত হইতে পারে। বিক্ষেপ নিবারণের আর এক উপায় বলিতেছেন;—'মৈত্রীকরুণা মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনং।" সুখী ব্যক্তির সহিত মৈত্র অর্থাৎ সৌহার্দ্দ্য, দুঃখী ব্যক্তির প্রতি করুণা, পুণ্যবান্-দিগের পুণ্য কর্ম্মে মুদিতা অর্থাৎ অনুমোদন, ও পাপীদিগের প্রতি উপেক্ষা এই চারি বিষয়ের অভ্যাস দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হয়, সুতরাং বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয়।

"প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" প্রাণবায়ুর রেচন এবং ধারণ দ্বারাও বিক্ষেপ নিবারিত হইতে পারে। এই রূপ করাকে প্রাণায়াম কহে। নাসিকা দ্বারা নিয়মিত পরিমাণে বায়ু রহিত করাকে রেচক কহে, নাসিকার দ্বারা নিয়মিত পরিমাণে বায়ু আকর্ষণ করত শরীরাভ্যন্তর প্রদেশকে পূরণ করাকে পূরক কহে এবং উক্ত রূপে পূরিত বায়ুকে শরীরের অভ্যন্তরে নিরোধ করাকে কুম্ভক কহে। এইরূপ প্রাণায়াম দ্বারা সাধকের মনঃস্থির হয়। "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী"—'প্রবৃত্তি রুৎপন্না চিত্তস্য স্থিতি নিবন্ধিনীতিবাক্য শেষঃ।' আরও শোক নাশিনী জ্যোতিষ্মতি প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে বিক্ষেপ নিক্ষেপ নিবারিত হয়। "জ্যোতিঃ শব্দেন সাত্ত্বিক প্রকাশ উচ্যতে।" জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ সত্ত্ব-গুণ-মূলক প্রকাশ। 'স প্রশস্ত ভূয়ান্ অতিশয়বানশ্চ দৃশ্যতে যস্যাং সা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিঃ' সেই সাত্ত্বিক জ্যোতিঃ যেখানে মহা প্রশস্ত এবং সাতিশয় রূপে বিদ্যমান তাহাকেই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি কহা যায়। ইহার অর্থ এই যে, 'হৃৎপদ্ম সম্পুট মধ্যে প্রশান্ত-কল্লোল-ক্ষীরোদধিপ্রখ্যং চিত্তস্য সত্ত্বং ভাবয়তঃপ্রজ্ঞালোকাৎ সর্ব্ববৃত্তিক্ষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যং

উৎপদ্যতে।' হৃৎপদ্মের কোষ মধ্যে কল্লোল-শূন্য ক্ষীর সমুদ্রের ন্যায় যে চিত্তনিহিত সত্ত্বগুণ তাহাতে যিনি মনঃ সমাধান করেন তাঁহার প্রজ্ঞার স্ফূর্ত্তি বশতঃ সমস্ত চিত্তবৃত্তি লয় প্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য উৎপন্ন হয়। আর এক উপায় এই যে, 'বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তং।' কোন বীত-রাগ ব্যক্তির অর্থাৎ বিষয়াভিলাষশূন্য, নিস্পৃহ ব্যক্তির চিত্তভাবনা করিলে বিক্ষেপ নিবৃত্তি হইতে পারে। আর এক উপায় এই যে, 'যথাভিমত ধ্যানাদ্বা।' কোন মনোনীত বিষয়ের ধ্যান দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ নিবৃত্তি হইতে পারে। বিক্ষেপ নিবৃত্তি হইলে কি রূপ ফল লাভ হয়? না, 'পরমাণু পরম মহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ।' চিত্ত যাঁহার বিক্ষেপ শূন্য হইয়াছে, তিনি পরমাণু অবধি পরম মহত্ত্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারেন। 'ক্বচিৎ পরমাণু পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে অস্য মনো ন প্রতিহন্যতে।' পরমাণু পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়েতেও বিক্ষেপ শূন্য ব্যক্তির মন প্রতিহত হয় না। 'এবং স্থূল মাকাশাদি পরম মহত্ত্ব পর্য্যন্তং ভাবয়তো ন ক্বচিৎ চেতঃ প্রতিঘাত উৎপদ্যতে।' এই রূপ আবার আকাশাদি বৃহৎ বিষয় সকলের ভাবনাতে প্রবৃত্ত হইলেও উল্লিখিত ব্যক্তির মন কোথাও প্রতিহত হয় না। 'কিন্তু সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্যং ভবতীত্যর্থঃ।' কিন্তু কি মহাকাশ, কি ক্ষুদ্র পরমাণু সর্ব্বত্রই চিত্তের স্বাতন্ত্র্য হয়। 'এবং এভি রুপায়ৈঃ সংস্কৃতস্য চেতসঃ কীদৃক্‌]. রূপন্তবতীত্যাহ।' এই রূপ উপায় সকল দ্বারা সংস্কৃত হইলে চিত্ত কিরূপ হয়? না, 'ক্ষীণ-বৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেগৃহিতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যেষু তৎস্থ তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ।' উল্লিখিত উপায় সকল দ্বারা যাঁহার চিত্তবৃত্তি সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার চিত্ত বিষয়-ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ীতে যথাক্রমে তন্নিষ্ঠ এবং তন্ময় রূপে পরিণত হয়। যেমন নির্ম্মল মণি যে বস্তুকে আশ্রয় করে, সেই বস্তুরই রূপ-ময় হইয়া পরিণত হয়, সেই রূপ বিক্ষেপ-শূন্য নির্ম্মল চিত্ত যে বস্তুতে সমর্পিত হয়, সেই বস্তুরই আকারে পরিণত হয়। ভাব্য বিষয়েতে মনের তন্নিষ্ঠ এবং তন্ময় রূপে পরিণামের বিষয় যাহা কথিত হইল, তাহাকে সমাপত্তি কহা যায়। ভাব্য বিষয়েতে চিত্তের তন্নিষ্ঠতা এবং তন্ময়তা-রূপ পরিণাম, যাহাকে সমাপত্তি কহা যায়, তাহা চারি প্রকার; যথা; সবিতর্ক সমাপত্তি, নির্ব্বিতর্ক-সমাপত্তি, সবিচার-সমাপত্তি এবং নির্বিচার-সমাপত্তি। সবিতর্ক-সমাপত্তি কি? না, "শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা।" শব্দ অর্থ এবং জ্ঞান এই তিনের বিকল্প, যাহাতে বর্ত্তমান, তাহাকে সবিতর্ক-সমাপত্তি কহে। "গো"

বলিবামাত্র, "গো" এই শব্দ, "গো" এই জাতি, "গো" এই জ্ঞান, এই তিনের মধ্যে যখন চিত্ত ইতস্ততঃ হয়, তখন চিত্তের যে "গো" বিষয়ক পরিণাম, তাহা সবিতর্ক-সমাপত্তি বলিয়া উক্ত হয়। নির্বিতর্ক-সমাপত্তি কি ?—না, "স্মৃতি পরিশুদ্ধৌ স্বরূপ-শূন্যেব অর্থ মাত্র নির্ভাসা নির্বিতর্কা।" যখন শব্দ কি অর্থ কিছুরই স্মরণ নাই, যখন আপনি কিছু নই, ভাব্য বিষয়টিই সর্ব্বস্ব—এই রূপ কেবল বিষয়-মাত্রটিই প্রকাশ পাইতেছে, তখন চিত্তের সেই যে, পরিণাম, তাহাকে নির্বিতর্ক-সমাপত্তি কহে। যদি তন্মাত্র-বিশেষ বা অন্তঃকরণ ইত্যাদিরূপ কোন একটি সূক্ষ্ম বিষয়ে, চিত্ত তন্নিষ্ঠ এবং তন্ময়-ভাবে সমর্পিত হইয়া শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান এই তিনের মধ্যে বিকল্পিত হয়, অথবা দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, তবে তখন চিত্তের যেরূপ পরিণাম হয়, তাহাকে সবিচার-সমাপত্তি কহে। এবং যখন উক্তরূপ সূক্ষ্ম বিষয় শব্দার্থ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত রূপে ও দেশ কাল অবস্থায় অনবচ্ছিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ বস্তু-মাত্র-রূপে প্রকাশ পায়, তখন তদ্বিষয়ক যে চিত্তের পরিণাম, তাহাকে নির্বিচার-সমাপত্তি কহে। "সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানং।" সূক্ষ্ম বিষয়ত্ব প্রকৃতি পর্য্যন্তে পরিসমাপ্ত। অর্থাৎ পঞ্চ স্থূল-ভূত এবং বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষা পঞ্চ তন্মাত্র এবং অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম-তন্মাত্র এবং অন্তকরণ হইতে অহঙ্কার সূক্ষ্ম, অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম, বুদ্ধি হইতে প্রকৃতি সূক্ষ্ম, প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম বিষয় আর নাই। আত্মা যেহেতু বিষয়ী শব্দের বাচ্য, বিষয় শব্দের বাচ্য নহে, এই হেতু আত্মা সূক্ষ্ম বিষয় সকলের শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইতে পারে না।

"তা এব সবীজঃ সমাধিঃ"। সবিতর্ক-সমাপত্তি, নির্বিতক-সমাপত্তি, সবিচার-সমাপত্তি এবং নির্বিচার-সমাপত্তি এই চারি প্রকার সমাপত্তিই সবীজ সমাধি বলিয়া উক্ত হয়। অর্থাৎ কি স্থূল বিষয়, কি সূক্ষ্ম বিষয়, কি বিকল্পিত বিষয়, কি অবিকল্পিত বিষয়, যে কোন প্রকার বিষয় হউক, তাহাতে চিত্ত তন্ময় এবং তন্নিষ্ঠ ভাবে পরিণত হইলেই তাহাকে সবীজ সমাধি কহে। কিন্তু তাহার মধ্যে নির্বিচার সমাপত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, সবিকল্প-সমাপত্তির লক্ষিত বিষয় স্থূল এবং বিকল্পিত; নির্বিকল্প সমাপত্তির লক্ষিত বিষয়, স্থূল এবং অবিকল্পিত; সবিচার সমাপত্তির লক্ষিত বিষয়, সূক্ষ্ম এবং বিকল্পিত; এবং নির্বিচার সমাপত্তির, লক্ষিত বিষয় সূক্ষ্ম এবং অবিকল্পিত। এই রূপে দেখা যাইতেছে যে, নির্বিচার সমাপত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "সহ

বীজেন আলম্বনেন বর্ত্ততে ইতি সবীজঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধি রুচ্যতে।" বীজের সহিত, কি না বিষয় বিশেষের অবলম্বনের সহিত, বর্ত্তমান বলিয়া উক্ত সমাপত্তি চতুষ্টয় সবীজ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া উক্ত হয়।

"নির্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্ম প্রসাদঃ।" নির্ব্বিচার সমাপত্তিতে পারদর্শিতা জন্মিলে আধ্যাত্মিক প্রসন্নতা হয়। আধ্যাত্মিক প্রসন্নতা হইলে তাহার ফল কি হয়? না, "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা" তখন প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা হয় কি না সত্যগর্ব্ভা হয়। "ঋতং সত্যং বিভর্ত্তি, কদাচিদপিন বিপর্যয়েণ আচ্ছাদ্যতে সা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা।" ঋতকে কি না সতকে, যে স্বীয় অভ্যন্তরে ধারণ করে, সতকে যে কোন কালেই সংসার দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে দেয় না,তাহাকেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা কহে। "তজ্জ সংস্কারোঽন্য সংস্কার প্রতিবন্ধী"। প্রজ্ঞাজনিত যে সংস্কার তাহা অন্য সকল সংস্কারের প্রতিবন্ধক। বহিরুদ্যম জনিত, কি না, বিষয় ব্যাপার-জনিত সংস্কারই হউক, আর পূর্ব্বকৃত সমাধি-জনিত সংস্কারই হউক, প্রজ্ঞা জনিত সংস্কার, তাহাদিগেরসকলকেই দূর করিয়া দিয়া স্বয়ং একাধিপত্য করে। যখন শেষোক্ত রূপ সবীজ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেও নিরোধ করা হয়, তখন সমুদায় বৃত্তির নিরোধ হওয়াতে নির্বীজ সমাধি উদ্ভূত হয়। "সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনা স্বকারণে প্রবিলয়াৎ যা যা সংস্কার মাত্রাবৃত্তি রুদেতি তস্যাং নেতি নেতি কেবলং পর্য্যুদাসনাৎ নির্বীজ সমাধি রাবির্ভবতি।" সমস্ত চিত্তবৃত্তি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া কারণে বিলীন হওয়াতে, সংস্কার-মাত্র রূপ যে যে বৃত্তি উদিত হয় সেই সেই বৃত্তি "ইহা নহে, ইহা নহে" বলিয়া পরিত্যক্ত হইলে নির্বীজ সমাধি আবির্ভূত হয়। "যস্মিন্ সতি পুরুষঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ শুদ্ধঃ কেবলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে।" নির্বীজ সমাধি আবির্ভূত হইলে আত্মা স্বরূপস্থ, শুদ্ধ, কেবলমুক্ত, এই রূপ শব্দ সকলের বাচ্য হন।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাতে সামান্যতঃ যোগ-বিষয়ের পরিচয় লাভ হইতে পারে। এক্ষণে পূর্ব্বাপর সেই সমুদায়ের স্থূল মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে যথা;—প্রথমতঃ, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ পূর্ব্বক আত্মাতে স্থির করাকেই যোগ কহে। দ্বিতীয়তঃ, চিত্তবৃত্তি সকলকে একেবারেই নিরোধ করা সুকঠিন বলিয়া, প্রথমে চিত্ত বৃত্তিকে একটা কোন বিষয়ে স্থির রাখিতে অভ্যাস করা আবশ্যক। এই রূপ একটা বিষয়ে চিত্তকে তন্নিষ্ঠ এবং তন্ময়-ভাবে পরিণত করাকেই

সমাধি কহে। সমাধির ভূমি কি কি ? অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয়ে সমাধি করিবে?—না, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এবং ঈশ্বর। আত্মা-রূপ চরম ভূমিতে সমাধি করিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান। কোন প্রকার চিত্ত-বিক্ষেপ থাকিতে সমাধি আয়ত্ত হইতে পারে না, এ জন্য চিত্ত বিক্ষেপ নিবারণার্থে উপায় করা অতীব কর্ত্তব্য। চিত্ত যখন বিক্ষেপ শূন্য হয়, তখন কি স্থূল বিষয়, কি সূক্ষ্ম বিষয়, যাহাতে যখন মনঃ-সমাধান করা যায়, তাহাতেই মন নিমগ্ন হইয়া তন্নিষ্ঠ ও তন্ময় ভাবে পরিণত হয়। যে সমাধিতে ভাব্যবিষয়ের অবলম্বন আবশ্যক হয়, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি কহে। স্থূল ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া মূল প্রকৃতি পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বে উত্তরোত্তর ক্রমে মনঃ-সমাধান করত সেই সেই তত্ত্বে মনকে তন্নিষ্ঠ এবং তন্ময় ভাবে পরিণত করাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উদ্দেশ্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরম ভূমিতে সত্যগর্ব্বা প্রজ্ঞার স্ফূর্ত্তি হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা সবীজ সমাধি যোগের সোপান মাত্র, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং নির্বীজ সমাধিই প্রকৃত যোগ। যখন সমস্ত ভাব্য বিষয়ের অবলম্বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়াতীত পুরুষে গিয়া সমাধি পর্য্যবসিত হয়, তখন মনোবৃত্তি সকলের নিরোধ হইয়া যায়, চেতন স্বরূপ আত্মা তখনই আপনাতে স্বাধীনভাবে স্থিতি করেন। ইহাই যোগ।

(ক্রমশঃ।)

পরিধেয় বস্ত্র।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত, এম্ এ প্রণীত।

বস্ত্র পরিধান করিবার প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং সুসভ্য জাতিমাত্রেই এই প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদিও বস্ত্র অধুনা সভ্যতার এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তথাপি সুপ্রসিদ্ধ কবি মিল্‌টনের মতানুসারে উহা আমাদের প্রকৃত গৌরবের বিষয় নহে, বরং আমাদের লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে। তিনি বলেন, আমাদের বস্ত্র পরিধান করাতে যে সম্মান হয় তাহা যথার্থই অপমান; কারণ উহা নিয়তই আমাদের আদি-পুরুষ গণের দোষের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। সম্পূর্ণ নির্দোষ থাকিতে পারিলে, তাঁহারা কখনই লজ্জিত হইয়া পরস্পর হইতে শরীরের অংশবিশেষকে আচ্ছাদন করিতে বাধ্য হইতেন না।

এরূপ যুক্তি মিল্‌টনের ন্যায় কবির মুখেই শোভা পাইয়া থাকে। এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে কেহ এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে তাহা সাধারণের নিকট কিরূপে পরিগৃহীত হইবেপাঠকবর্গ ইহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। সাধুবাদের কথা দূরে থাকুক, তিনি যে সকলের নিকট উপহাসাস্পদ হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ উপরোক্ত মতটি যে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ একটু অনুশীলন করিয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কেবল লজ্জা নিবারণের জন্য হইলে কখন বস্ত্রের সৃষ্টি হইতে কি না নিতান্ত সন্দেহ স্থল। এবং শুদ্ধ লজ্জার ভয়ে যে ইংরেজেরা সদা সর্ব্বদা প্রায় এক মণ ভার বহন করিবেন, এরূপ কখনই সম্ভব বোধ হয় না। লজ্জা নিবারিত না হইলে কষ্ট বোধ হয় বটে, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি না হইলে যেরূপ কষ্ট হয় ইহা সেরূপ কষ্ট নহে। এই কষ্ট একমাত্র কৃত্রিম আচার ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে; ইহা কিছু স্বাভাবিক কিংবা সাধারণ নহে। এক জাতি যাহাতে লজ্জা বোধ করেন অন্য জাতি তাহাতে কোন সংকোচমনে করেন না। উলঙ্গ থাকা সুসভ্যজাতির পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় কিন্তু কুকী প্রভৃতি অসভ্যজাতির মধ্যে উহা তদ্রূপ নহে। সুতরাং লজ্জা কখনই স্বাভাবিক হইতে পারে না। স্বাভাবিক হইলে ইহা সকল জাতির পক্ষেই সমান হইত। আবার, আমরা এক অবস্থায় থাকিলে যাহাকে লজ্জা বোধ করি অন্য অবস্থায় থাকিলে তাহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ মনে করি। বড় হইলে কেহই উলঙ্গ থাকিতে পারেন না, কিন্তু ছোট কালে কেহ তাহাতে কোন লজ্জা অনুভব করেন না। অতএব লজ্জা কৃত্রিম ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা স্বাভাবিক তাহা সকল সময়েই সমান থাকে। ছোট কালেও যেরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে, বড় হইলেও তাহাই থাকে। এক্ষণে একটি কৃত্রিম বিষয় উদ্ভাবন করিয়া মনুষ্য যে তাহার নিমিত্ত এত কষ্ট সহ্য করিবে ইহা কখনই সম্ভব বোধ হয় না। কাপড় নিতান্ত লঘু নহে এবং উহাকে বহুল পরিমাণে বহন করাও নিতান্ত সহজ নহে। ফলতঃ, যেরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে বস্ত্র পরিধান করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কেবল মাত্র লজ্জাই যে তাহার কারণ, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

আমাদের মতে লজ্জা নিবারণ ব্যতীত বস্ত্র পরিধানের আরও গুরুতর বিজ্ঞান সম্মত কারণ আছে; এবং তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সেই কারণ এই—যথা; শরীরকে উষ্ণ

সহজে শীতল হইতে পারে না। আমাদের শরীর হইতে নিয়তই তেজ বিকীর্ণ হইয়া উহা শীতল হইতে থাকে। কিন্তু বস্ত্র পরিধান করিলে তাহা হইতে পারে না। জীব শরীরের তাপ সাধারণতঃ বহিস্থ বায়ু অপেক্ষা অনেক অধিক। এমন কি গ্রীষ্মকালে যখন বায়ু, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে, তখনও জীব শরীরের তাপ তদপেক্ষা অধিক থাকে। এই তাপ বহুল পরিমাণে বিনির্গত হইলে শীঘ্রই শরীরের হানি হয়। দারুণ শৈত্যনিবন্ধন শরীরের যে কিরূপ হীনাবস্থা হয় ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। বস্ত্র পরিধান করিলে শরীর হইতে অধিক তেজ বিকীর্ণ হইতে পারে না। কারণ বস্ত্র অত্যন্ত অপরিচালক এবং তাহাতে ভিতরের তেজ বাহিরে যাইতে পারে না এবং বাহিরের তাপও ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। বস্ত্রের দ্বারা এরূপে শরীর শৈত্য হইতে সংরক্ষিত হয়, এবং শৈত্যনিবন্ধন শরীরের যে হীনাবস্থা হয়, বস্ত্র ব্যবহার করিলে তাহা আর হইতে পারে না।

শৈত্যনিবন্ধন শরীরের হীনাবস্থা উপস্থিত হয়, বোধ হয়, ইহা প্রথমে অনেকেই অস্বীকার করিবেন। শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারিলে শরীর বলবান ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়; তবে শীতাতপ সহ্য করিলে শরীরের হীনাবস্থা হয়, ইহা কিরূপে হইতে পারে? তাঁহারা অবশ্যই এরূপ বলিতে পারেন বটে; কিন্তু যাঁহারা একথা বলেন তাঁহারা যেন এটি স্মরণ রাখিয়া বলেন যে, বর্দ্ধিষ্ণুতার বিনিময়ে সহিষ্ণুতা ক্রয় করা যাইতে পারে। সহিষ্ণু হও তবে বর্দ্ধিষ্ণু হইবে না, আর বর্দ্ধিষ্ণু হও সহিষ্ণু হইবে না, ইহাই প্রকৃতির আজ্ঞা এবং এই আজ্ঞার কখন ব্যতিক্রম ঘটে না। বর্দ্ধিষ্ণুতার বিনিময়ে যে সহিষ্ণুতা ক্রয় করিতে হয় ইহা কেবল অলীক প্রসঙ্গ নহে, কিন্তু ইহা বাস্তবিক যুক্তিসিদ্ধ ও বিজ্ঞান সম্মত কথা। নিম্নে তাহা প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

দ্রব্যমাত্রই উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয় এবং শীতল হইলে সংকুচিত হয়, ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের এক প্রবল সত্য। রাত্রি যেরূপ সর্ব্বদাই দিবার অনুগমন করে এবং তাহার কোন ব্যত্যয় ঘটেনা, এ সত্যও সেইরূপ, তাহারও কোন বিপর্য্যয় ঘটেনা। ফলতঃ প্রকৃত ঘটনা যে এইরূপ ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য আমাদের দূরে গমন করিতে হইবে না। একবার দুগ্ধকটাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে। যখন দুগ্ধকে জ্বাল দেওয়া যায় এবং যখন উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়

তখন উহার আয়তনের যে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। উহার আয়তন এরূপ বিবৃদ্ধ হয় যে উহা উচ্ছলিত হইয়া চতুষ্পার্শ্ব দিয়া পড়িয়া যাইতে থাকে। কিন্তু আবার যেই উহাকে বাতাসের দ্বারা শীতল করা হয়, বা দুগ্ধকটাহকে নামাইয়া রাখা যায় কিংবা তাহাতে যে কোন শীতল পল্লব ফেলিয়া দেওয়া যায়, দুগ্ধ অমনি উহার পূর্ব্ব আয়তন প্রাপ্ত হয় ; এবং যে উহা ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে, উহার আয়তনেরও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইতে থাকে। দুগ্ধ যেরূপ উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয় এবং শীতল হইলে সংকুচিত হয়, জীবশরীরেও তাহাই হইয়া থাকে। শীতকালে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইলে হস্তপদাদি প্রসারণ করা যে তাদৃশ কষ্টকর হয় এই সংকোচই তাহার কারণ। যিনি শীতকালে হস্তকে উষ্ণ না রাখিয়া কখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে গমন করিয়াছেন,তিনি অবশ্যই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। শীতের দ্বারা মাংসপেশী সমূহ এরূপ সংকুচিত হয় যে সহজে হস্ত চালনা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। প্রতিমুহূর্ত্তেই হস্ত স্থগিত হইয়া যায় এবং বহুকষ্টে হস্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া উত্তর লিখিতে হয়। এক্ষণে অল্প শীতে যদি এরূপ সংকোচ হয়, সর্ব্বদা শীতল রাখিলে যে শরীর সংকুচিত হইয়া খর্ব্বাকৃতি হইবে ইহাতে, বিচিত্র কি! বস্তুতঃ এইরূপই ঘটিয়া থাকে এবং এই নিমিত্তই শীত প্রধান দেশের লোকেরা প্রায়ই খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে। লাপলাণ্ড ও এসকুইমোর অধিবাসীরা একারণেই তাদৃশ খর্ব্ব, টেরাডেলফিউগোর অধিবাসিরা দারুণ শীতের সময়ও প্রায় উলঙ্গ থাকে বলিয়া এরূপ খর্ব্ব হইয়াছে যে, তাহাদিগকে দেখিলে সহজে মনুষ্যজাতি বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদিগকে দেখিলে আমাদের লিলিপতীয়ানদিগকে মনে পড়িয়া থাকে।

জীবশরীর এক প্রকাণ্ড কারখানা স্বরূপ। ইহাতে যে কত রাসায়নিক সংযোগ ও বিয়োগ হইতেছে, তাহা স্থির করিয়া কেহ বলিতে পারেন না। আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি, তাহাও এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অধীন হয়। উহার কিয়দংশ পাকস্থলীতে অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হয় এবং আর কিয়দংশ উহার উপাদান পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া শরীরের ভিন্ন ২ অংশের পুষ্টিসাধন করে। পাকস্থলীতে আহৃত সামগ্রীর ও অম্লজানের সংযোগ হয়। পূর্ব্বে জীব শরীরের যে ভাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই সংযোগের উপরই নির্ভর করে। জীব

শরীর হইতে সর্ব্বদাই তাপ বিকীর্ণ, এবং চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু শীতল হইলে উহা আরও অধিক পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু জীব শরীরের তাপ নিত্য পদার্থ, কোন বিশেষ কারণ ভিন্ন ইহার কখন ন্যূনাধিক্য ঘটে না। আমাদের শরীর হইতে যে পরিমাণে তাপ বাহির হইয়া যায় আবার সেই পরিমাণে তাপ জনিত হইয়া থাকে। অধিক তাপ বাহির হইয়া গেলে অভ্যন্তরেও অধিক জনিত হয়। কিন্তু তজ্জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়। অধিক তাপ বাহির হইয়া গেলে ভুক্ত সামগ্রীরও অধিক ভাগ অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাপ জন্মায় ও অল্পভাগ মাত্র শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং তন্নিমিত্ত শরীর খর্ব্ব হইতে থাকে। যে পরিমাণে তাপের হ্রাস হয়, সে পরিমাণে আহারের মাত্রা বাড়াইতে পারিলে ক্রুটি নিবারিত হইতে পারে কিন্তু তাহা করা অসম্ভব। আমাদের পাকযন্ত্রের শক্তি অতিশয় পরিমিত এবং উহা কোন প্রকারেই অধিক তাপ জন্মাইতে পারে না। সুতরাং অধিক তেজ বিকীর্ণ হইলে শরীর কখনই পুষ্ট থাকিতে পারে না।

কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, বস্ত্র পরিধান করিলে শরীরের তাপ ক্ষয় হইতে পারে না, সুতরাং অধিক খাদ্যদ্রব্যেরও প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই লাইবিগ সাহেব বস্ত্রকে এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখ, অশ্বপ্রভৃতিকে অত্যন্ত শীতল স্থানে রাখিলে শীঘ্রই উহাদের তেজ নষ্ট হইয়া যায়, এবং যদি তাহাদিগকে তেজস্বী রাখিতে হয়, তাহা হইলে অনেক অধিক খাদ্যদ্রব্যের ব্যয় বহন করিতে হয়। অতএব বস্ত্রও যে এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য ইহার কোন সন্দেহ নাই।

দারুণ শৈত্যপ্রভাবে শরীরের যে কিরূপ হীনাবস্থা হয় ইহা আমাদের আদি পুরুষেরাও জানিতে পারিয়াছিলেন। শরীর অনাচ্ছাদিত থাকিলে যে অত্যন্ত শীতল হয় এবং সর্ব্বদা শীতল থাকিলে যে শরীরের হ্রাস হয়, ইহা তাঁহারা জানিতে পারিয়া প্রথম হইতেই শরীরকে আচ্ছাদিত রাখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। যখন বস্ত্রবয়নের কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, তখনও তাঁহারা পশুচর্ম্ম দ্বারা শরীরকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের আদি পুরুষেরা জ্ঞানোন্নতির প্রথম অবস্থায় যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের জ্ঞানী সন্তানেরা তাহাও বুঝিতে পারেন না। এদেশে বস্ত্রের বিষয়ে,বিশেষতঃ শিশুদিগের পরিধান বিষয়ে,যেরূপ অমনোযোগ এরূপ আর

কোথাও দেখা যায় না। দুই এক ফুল-বাবু, যাঁহারা এবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দেন, তাঁহারাও বস্ত্রের ঔৎকর্ষের বিষয় চিন্তাকরিয়া দেখেন না; সৌন্দর্য্য ও বাহ্যাকৃতি দ্বারাই মোহিত হইয়া যান। এদেশে দারুণ শীতের সময়ও শিশুদিগকে যে প্রকার সূক্ষ্ম, জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেয়, তাহা দর্শন করিলে কাহার হৃদয় দ্রব হয় না? বস্ত্রের বিষয়ে এরূপ শিথিলানুরাগ হওয়াতে এদেশের যে কত হানি হইতেছে তাহা বলা যায় না। শীত-প্রভাবে ইন্দ্রিয়সমূহ স্তম্ভিত হওয়াতে কত শত সন্তান যেশৈশবাবস্থায় কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে তাহার সংখ্যা কে নিরূপণ করিবে? মৃত ব্যক্তিগণের তালিকা দর্শন করিলে শিশুদের সংখ্যাই অধিক দৃষ্ট হয়। আজকাল অনেককেই ব্যায়াম শিক্ষার সুবিধা সম্পাদনার্থ ব্যগ্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধিকাংশ সন্তানই যদি উপযোগী পরিধেয় অভাবে শৈশবাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয়, অথবা নিতান্ত রুগ্ন ও খর্ব্ব হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যায়ামে কি করিবে? অতএব আমাদের সর্ব্বাগ্রে সন্তানগণের পোষাকের প্রতি মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। যতদিন আমরা আমাদের সন্তানগণকে উত্তম পরিধান দ্বারা শীতাতপ হইতে রক্ষা করিতে না পারি, তত দিন আমাদের কোন প্রকার উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, আমাদের দেশে পরিমিতাচারিতা দ্বারা যত অনিষ্ট হইতেছে, অন্য কোন মতের দ্বারাই ওরূপ অনিষ্ট হইতেছে না। পরিমিতাচারী হওয়া মন্দ আমরা একথা বলিতেছি না, কিন্তু পরিমিতাচারের সীমা নিরূপণ করা অতিশয় সুকঠিন। পরিমিতাচারের নামে অনেককেই সংযতেন্দ্রিয় হইতে দেখা যায়। পরিমিত আহার করিবেন এই সংকল্প করিয়া অনেককেই প্রয়োজনাপেক্ষাও অল্প আহার করিতে দেখা যায়। পরিমিতাচারী হওয়া যেরূপ প্রশংসনীয়, সংযতেন্দ্রিয় হওয়া সেরূপ দোষনীয়। এই পরিমিতাচারের নামে আহারের ন্যায় অনেককেই প্রয়োজনাপেক্ষা অল্প বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা যায়। অধিক শৈত্যানুভব হইলেও কেহ তাহার প্রতি মনোযোগ করেন না, এবং অধিকাংশকেই এরূপে তাঁহাদের অনুভব শক্তিকে অবিশ্বাস করিতে দেখা-যায়। তাঁহারা বলেন উহা আমাদিগকে সত্য পথে লইয়া না গিয়া কুপথে লইয়া যায়; উহাকে বিশ্বাস করিলে আমাদিগকে অনর্থক অতিরিক্ত কাপড়ের ভার বহন করিতে হয়। কিন্তু এই সংস্কার যে কতদূর ভ্রান্তিমূলক তাহা বলা যায় না।

আমাদের অনুভব শক্তি দ্বারা আমরা কখন বিপথে নীত হই না। আমরা উহার উত্তেজনাকে অবজ্ঞা করিলেই বিপথে নীত হইয়া থাকি। ক্ষুধার সময় আহার করিলে, কিংবা তৃষ্ণার সময় পান করিলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু ক্ষুধা কিংবা তৃষ্ণার অসদ্ভাবে, আহার কিংবা পান করিলেই অনেক প্রকার কষ্ট পাইতে হয়। অতএব আমাদের সকলেরই অনুভব শক্তির উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য এবং শৈত্যানুভব হইলেই বস্ত্র পরিধান করা ও গ্রীষ্মানুভব হইলেই বস্ত্রপরিত্যাগ করা উচিত। যে প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিলে শৈত্যানুভব হয় না, গ্রীষ্মানুভব হয় না, আমাদের এইরূপ বস্ত্রই পরিধান করা কর্ত্তব্য।

আবার অনেকে সহিষ্ণুতার দোহাই দিয়া সন্তানদিগকে অত্যন্ত অল্প বস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া থাকেন। শীতাতপ সহ্য করাইয়া সহিষ্ণু করা কি পর্য্যন্ত অনিষ্টকর ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কৃষকের সন্তানেরা অর্দ্ধেক উলঙ্গ থাকিয়াও যে বলবান হয়, তাহার কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহারা নিয়তই মাঠে বিচরণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে; তাহাদের সমস্ত জীবন ক্রীড়ায় যাপিত হয়; এবং তাহাদের মস্তিষ্ক কোন মানসিক শ্রমের দ্বারা আলোড়িত হয় না। কৃষকের সন্তানেরা উলঙ্গ থাকিয়াও বলবান হয় বলিয়া ভদ্রলোকের সন্তানেরাও তাহাই হইবে, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত।

আমাদের দেশে বৃদ্ধেরা যে পরিমাণ বস্ত্রব্যবহার করেন, সন্তানগণকে তাহার চতুর্থাংশও ব্যবহার করিতে দেন না। কিন্তু বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে সন্তানগণেরই অধিক উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে খাদ্য দ্রব্যের ও অম্লজানের যে সংযোগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে সেই সংযোগ হইতে অঙ্গার্য্যাম্ল নামক এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু উদ্ভূত হইয়া থাকে, এবং এই বায়ু আমাদের শরীর হইতে নিশ্বাসের দ্বারা বাহির হইয়া যায়। এই অঙ্গার্য্যাম্ল প্রস্তুত হইবার সময় তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেই তাপের উপর জীব শরীরের তাপ নির্ভর করে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, নিশ্বাসের দ্বারা যৌবনাবস্থায় যে পরিমাণে অঙ্গার্য্যাম্ল বিনির্গত হয়, শৈশবাবস্থায় তাহার দ্বিগুণ বহির্গত হইয়া থাকে। অতএব যৌবনাবস্থা অপেক্ষা শৈশবাবস্থায় দ্বিগুণ তাপ জনিত হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এরূপে জনিত তাপ শরীরেই থাকা উচিত। উহা বিকীর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে। সুতরাং বৃদ্ধের অপেক্ষা শিশুর যে

দ্বিগুণ উষ্ণ বস্ত্রের প্রয়োজন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু শৈশবাবস্থায় যদিও অধিক উষ্ণ বস্ত্রের প্রয়োজন, আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশীয় লোকেরা সন্তানগণকে ছিট কাপড় ভিন্ন প্রায়ই আর কিছু ব্যবহার করিতে দেন না। ছিট কাপড় অতিশয় সুন্দর ও মনোহর এবং অল্প ব্যয়েও হইয়া থাকে। আবার কেহ যদি কখন সন্তানগণকে কোন উত্তম পোষাক প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহাও মলিন হইবার আশঙ্কায় ব্যবহার করিতে দেন না। আপনারা উত্তম উত্তম পশমী বস্ত্র ব্যবহার করেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু সন্তানদিগকে তাহা দেওয়া হইবে না। অনেকে বলেন সন্তানগণকে ভাল কাপড় দিলে কি হইবে? তাহা ময়লা করিয়া ও ছিঁড়িয়া ফেলিবে বইত নয়। হায়! এরূপ সংস্কার আর কতকাল এ দেশে থাকিবে? আর কতকাল এ সংস্কার হতভাগ্য ভারত সন্ততিদিগকে উৎপীড়িত করিবে? হায় আমাদের কি দুর্ভাগ্যের বিষয়! এতদ্দেশীয় মহাত্মারা ইহা দেখিয়া শুনিয়াও তাহার প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপ করেন না!

যাহাতে শীত নিবারণ হয় সন্তানগণকে এরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু শীত নিবারণ করা যেরূপ উচিত, শীত নিবারণ করিতে গিয়া যাহাতে কোন গ্রীষ্মাধিক্য বোধ না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও সেইরূপ কর্ত্তব্য। শরীর শীতল থাকিলে যেরূপ তেজের হানি হয়, সর্ব্বদা উষ্ণ থাকিলেও সেরূপ দুর্ব্বল হয়। এই জন্যই চিকিৎসকেরা উষ্ণ জল ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। যাহাতে শীতও অনুভব হয় না, গ্রীষ্মও অনুভব হয় না, এরূপ বস্ত্রই পরিধান করা আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, বস্ত্র অপরিচালক পদার্থ হইতে নির্ম্মিত হওয়া উচিত, কিন্তু ছিট প্রভৃতি যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহা অপরিচালক নহে। সুতরাং তাহা ব্যবহার করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। পশম প্রভৃতি পদার্থ অত্যন্ত অপরিচালক। এই সকল অপরিচালক পদার্থ হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

প্রলাপ-সাগর।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

আভিধানিক তরঙ্গ।

এখন গ্রন্থ লেখা লোকের একটী বাতিক হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের দ্বারা দেশের বা শিক্ষার্থিগণের কিছু উপকার হউক না হউক, গ্রন্থকার নামে সাধারণে পরিচিত হওয়া সেই সকল লেখকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। আজি কালি অনেক অভিধান বাহির হইতেছে, কিন্তু সে গুলি বাস্তবিক কোন কার্য্যকর হইতেছে কি না, কেহই তাহার বিচার করেন না। আমার বিবেচনায় এক খানি অভিধানও প্রয়োজনোপযোগী হয় নাই। অনেকে আমার কথায় উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকার মাত্রেরই অদৃষ্ট সমান এ কথা বলিতে পারিব না। প্রথমে উপহাসস্পদ হইলেও পরিণামে আমি যে এক জন প্রশংসাভাজন হইয়া পড়িব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি এককালে অনেক গুলি গ্রন্থ প্রচারে কৃতসংকল্প হইয়াছি, কিন্তু প্রথমে এক কালে বহু অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অপেক্ষা সকল বিষয়ের একটু একটু আদর্শ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম; পাঠকবর্গ তাহাতেই আমার ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। আমার এই অভিধানে বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় বিধ শব্দেরই ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাইবে। শব্দের অর্থ সংঘটনের কারণ পরম্পরা অবগত হইলে তাহা যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। আমি এক্ষণে ইহা অকারাদি বর্ণক্রমে প্রকাশ করিলাম না, আদর্শ স্বরূপে কয়েকটী শব্দ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ অবহিত হইয়া পাঠ করিলে সমুদায় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অসুর; — প্রচলিত অর্থ দৈত্য, দানব ইত্যাদি। আমার সঙ্কলিত অর্থ 'যাহার সুর বোধ নাই'। যে ব্যক্তির সুর বোধ নাই, তাহাকে সকলে অন্-সুরো বা বে-সুরো বলিয়া থাকে। বাস্তবিক যাহার সুর বোধ নাই সে ব্যক্তি অসার। সঙ্গীতেই সুরবোধের প্রয়োজন অন্য কিছুতে সে প্রয়োজন নাই, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত। সকল বিষয়েই সুরবোধ থাকা অতি আবশ্যক। সুরবোধ এই শব্দ দ্বয় সকল বিষয়েই খাটিতে পারে। অমুক ব্যক্তি ভারি তালকানা, একথা বলিলে যে, সে ব্যক্তির সঙ্গীত বিষয়ে

ভাল বোধ নাই ইহাই বুঝাইবে, এমন নহে। তালকানা বলিলে কিছুতেই তাহার ভাল বিষয় বুদ্ধি নাই, ইহাই বুঝিতে হয়। কোন ব্যক্তির গল্প শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ পুলকিত হইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ কেহ অন্য একটী কথা কহিয়া আমোদ ভঙ্গ করিলে, লোকে তাহাকে অন্-সুরো বা বে-সুরো বলিয়া থাকে। একথা কেন বলে? তাহার কি সঙ্গীতে সুর-বোধ নাই, এই জন্য তাহাকে এই কথা বলা হইল! তাহা নহে। যাহার দ্বারা কোন বিষয়ের সৌন্দর্য্য ভঙ্গ হয়, তাহাকেই লোকে বে-সুরো বা তাল-কানা কহিয়া থাকে যে ব্যক্তির এ-রূপ নিকৃষ্ট রুচি, যাহার দ্বারা সৌন্দর্য্যের হানি হইয়া থাকে, সে যে মনুষ্য মধ্যে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। সেই জন্যই এরূপ লোককে সাধারণে দৈত্য, দানব বলিয়া সম্বোধন করে। এই কারণেই অসুর শব্দে দৈত্য, দানব ইত্যাদি বুঝায়। দৈত্য বলিলেই যে অসার অপদার্থ এক নিকৃষ্ট ও ভয়ানক জীব বুঝায়, সুর-না থাকাই তাহার প্রধান কারণ।

নারদ,—প্রচলিত অর্থ "ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি বিশেষ।" আমার সংকলিত অর্থ "যাহার রদ অর্থাৎ দন্ত নাই।" বৃদ্ধ হইলেই দাঁত পড়িয়া যায়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। জরাগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বয়স থাকিতে কি কাহারো দাঁত পড়ে না? পড়ে বটে, কিন্তু সে কোন্ উৎকট পীড়া জন্য। বৃদ্ধ হইলে সকল ইন্দ্রিয়ই দুর্ব্বল হয়, চলৎশক্তির হ্রাস হয়, কোন স্থানে যাইতে হইলে বাহনের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, আর লোক জন উপস্থিত হইলে বকামীর স্রোত বহিতে থাকে। বৃদ্ধ হইলেই বাচাল ও বহুভাষী হয়; বহুভাষীর সকল কথাই যে সত্য হয়, তাহা নহে; যে বক্তি অনেক কথা কহে, তাহার কথার মধ্যে দুই একটী মিথ্যা কথা থাকেই থাকে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। নারদ মুণি চিরকালই বৃদ্ধ, চিরকালই তাঁহার নাম শুনিতেছি। সত্য যুগেও নারদের নাম শুনিয়াছি, ত্রেতাযুগেও তাঁর অনেক সংবাদ পাইয়াছি, দ্বাপরেও তিনি অনেক বার দেখা দিয়াছেন। তিনি জন্মাবধিই বৃদ্ধ। একথা অনেকেই অসম্ভব মনে করিতে পারেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র—ষষ্ঠি পূজা ও অন্ন প্রাসনাদির সুখসম্ভোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, ইহা বিলক্ষণ বোধগম্য হইতেছে। তবে এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, নারদ শব্দে যদি রদ বিহীন, বৃদ্ধ, বাচাল ও বহুভাষী হইল, তবে আর ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষিকে বুঝায় কেন? পঙ্কজ শব্দে, যে পঙ্কে জন্মে, এই মাত্র হইলে শুদ্ধ

পদ্মকে বুঝায় কেন ? সেই জন্যই নারদ বলিলে সেই দেবর্ষিকেই বুঝায়, অন্য কাহাকে বুঝাইবে না।

ইন্দ্রজাল ;—ভোজ বাজী। আমার কৃত ব্যাখ্যা এই ;—ইন্দ্র দেবরাজ, আর জাল শব্দে মৎস্যাদি ধরিবার চির প্রসিদ্ধ সূত্র যন্ত্র বিশেষ। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, যে, বারোইয়ারি পূজা, অথবা রাস যাত্রা ও রথ যাত্রার মহোৎসব সময়ে পথমধ্যস্থলে এক খানি জাল টাঙ্গানো হইয়া থাকে। তাহাতে সোলার মাছ, কচ্ছপ, কুম্ভীর, পদ্ম ফুল, প্রভৃতি বিবিধ খেলনা ঝুলিতে থাকে। সেই জালের নাম ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজাল শব্দের অর্থ যে ভোজ বিদ্যা, ইহাই তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভোজ বিদ্যার প্রভাব ভিন্ন, মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর এত অল্প আয়তন স্থানের মধ্যে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। দেবতার জাল বলিয়া দৈবশক্তি প্রভাবে এই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে। জাল শব্দে মৎস্যাদি ধরিবার জাল অর্থ না করিয়া যদি কপটতা ও জুয়াচুরি করা যায় তাহা হইলে ইন্দ্র জাল শব্দে ভোজবাজী প্রতিপন্ন হইতে পারে। জাল নোট, জাল-দলিল ইত্যাদি সকলেই শুনিয়াছেন। জাল ধরা বড় কঠিন। এত রাজ শাসন, এমন দণ্ডবিধির আইন, তথাপি সর্ব্বদা জাল হইতেছে। সকল জালকারীই কি ধরা পড়িতেছে ; কখনই না। সূক্ষ্ম বুদ্ধি বিচারকের চক্ষে ধূলি দিয়া কত জাল কারী পরিত্রাণ পাইতেছে। ভোজ বাজী মিথ্যা বলিয়া জানিয়াও ধরা কঠিন। নোট ও দলিল মিথ্যা জানিয়াও ধরা কঠিন। মানুষের কৃত জাল যখন মানুষে ধরিতে অশক্ত, তখন ইন্দ্রের জাল ধরে সাধ্য কার !

ভূগোল বিদ্যা ;—প্রচলিত অর্থ, "যে বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর আকৃতি, ধর্ম্ম, বিভাগ, গতি প্রভৃতি জ্ঞাত হওয়া যায়।" আমি বলি "যে বিদ্যা শিখিতে হইলে দেশের ভূয়ো গোল উপস্থিত হয়, তাহাকেই ভূগোল বিদ্যা কহে।" ভূগোল তত্ত্ব বিষয়ক যাবতীয় বিষয়ই কি নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে? ভূগোল তত্ত্ব বিষয়ে অদ্যাপি নানা মুনির নানা মত রহিয়াছে। পৃথিবী গোল কি ডিম্বাকৃতি কি চক্রাকার, অদ্যাপি কেহ তাহা স্থির করিতে পারেন না। এখন এ সম্বন্ধে যত দূর পর্য্যন্ত স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, অনেক ভূয়োগোলই তাহার কারণ। যাহা চক্ষের অগোচর ও অনুমান সাপেক্ষ, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে অনেক ভূয়ো গোল হইয়া থাকে। অনেক ভূয়োগোলের পর এই পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে কোন নূতন কথা উপস্থিত

হইলে অনেক ভূয়োগোল উপস্থিত হয় এই জন্যই ইহার নাম ভূগোল বিদ্যা হইয়াছে।

কোকিল ;— প্রচলিত অর্থ "স্ব-নাম প্রসিদ্ধ পক্ষী।" আমার সঙ্কলিত অর্থ "কন্দর্পের উকিল।" ক বর্ণে নানা অর্থ অভিধানে শুনি—যথা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কন্দর্প, অগ্নি, বায়ু, ইত্যাদি। বসন্ত সমাগমে কন্দর্পের হইয়া দুটী কথা কয়, এমন যারা আছে, তন্মধ্যে কোকিল সর্ব্ব প্রধান। কন্দর্পের পক্ষ সমর্থনার্থে সে এত চীৎকার করে যে বসন্তের অন্তর্ধানে প্রায়ই তাহার গলা ভাঙ্গিয়া যায়। এই জন্যই বলি, "ক—উকিল, কোকিল।"

মদ,—প্রচলিত অর্থ সুরা। আমার সঙ্কলিত অর্থ বিষদাতা। ম বর্ণের অর্থ অনেক, তন্মধ্যে বিষ একটী। আর দ বর্ণে যে দান করে তাহাকে বুঝায়, যেমন ধনদ, বারিদ, ইত্যাদি। বিষ-দাতাকে আমরা যে প্রকার ভয় করি, মদকেও তেমনি ভয় করা উচিত। বিষে প্রাণনাশ হয়, মদেও প্রাণনাশ হয় সুতরাং বিষদ শব্দে যে মদ বুঝাইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

বিপদ,—প্রচলিত অর্থ বিপত্তি, দুর্ভাগ্য, বিনাশ। আমি বলি বি শব্দের অর্থ অভাব, গতি, বৈপরিত্য, অসহন ইত্যাদি এবং পদ শব্দে পা ও চাকরী। পায়ের বা চাকরীর অভাব সুতরাং বিপদ; চাকরীর গতি বা গমন সুতরাং বিপদ; পায়ের বা চাকরীর বৈপরিত্য সুতরাং বিপদ; পায়ের অসহন সুতরাং বিপদ।

মুখবন্ধ; প্রচলিত অর্থ "কোন গ্রন্থ বা গল্প রচনার প্রারম্ভে প্রকৃত বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে নানা কথা প্রসঙ্গ।" আমার সঙ্কলিত অর্থ "মুখ আট্‌কানো।" "এ গ্রন্থ খানি লেখার উদ্দেশ্য কি ?" গ্রন্থ পাঠ সময়ে পাঠকের মনে প্রায়ই এরূপ প্রশ্ন উদয় হয়। বিজ্ঞাপন পাঠে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাতেই পাঠকের মুখ বন্ধ হয়। এই কারণেই বিজ্ঞাপনের নাম মুখবন্ধ হইয়াছে।

লেজী, lazy ;—অলস ; আমার মতে "লেজ আছে যার, সেই লেজী।" জগদীশ্বর পশুগণের শারীরিক শোভা সংবর্দ্ধনের জন্য লাঙ্গূল দেন নাই। লাঙ্গূল দ্বারা তাহাদিগের অনেক অসুবিধা বিদূরিত হইয়া থাকে। গায় মশা মাছি বসিলে লেজ দিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। যাহারা মশা মাছি তাড়াইতেও অক্ষম তাহারা অবশ্যই অলস পদ বাচ্য তাহার আর সন্দেহ কি ! এস্থলে আর এক কথা বলিবার আছে। লাঙ্গূল বিশিষ্ট জীব মাত্রেই অনায়াস লব্ধ আহারে পরিতৃপ্ত থাকে, সুখ সৌকর্য্যার্থে

তাহাদিগের কোন চেষ্টাই নাই। এরূপ জীবকে অলস না বলিয়া আর কাহাকে বলিব? এই জন্যই লেজো শব্দের অর্থ অলস হইয়াছে।

একশেষ, excess;—একশেষ। এ শব্দটী ইংরেজেরা কোথায় পাইলেন। একটী স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া তবে ত সকল কথাকেই ইংরাজী করা যাইতে পারে। এমন কথা চুরি কত ধরা যাইতে পারে তাহার শেষ করা যায় না। বাক্চৌর্য্যের দণ্ড নাই, তাই রক্ষা, নচেৎ এ জন্য সর্ব্বনাশ হইতে পারিত। এ স্থলে স্বরপরিবর্ত্তনের একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একটী বালক রথ দেখিতে গিয়াছে, তাহাকে আর কতকগুলি বালকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি লেখা পড়া করে থাক?" সে ইংরাজী না জানিয়াও কহিল "আমি ইংরাজী পড়ি।" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "বল দেখি, পাররার ইংরাজী কি?" বালক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কোন উপায় না পাইয়া ইংরাজী স্বরে কহিল "পায়রা দি কপিটুর।" বালকেরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভাবিল, "হবেই বা।" তাহারা অপ্রতিভ হইল। বালক হাঁসিতে হাঁসিতে চলিয়া গেল।

সারদা,—দুর্গা, আমি বলি "হাড়দহ।" সারদা শব্দের অপভ্রংশে হাড়দহ হইয়াছে ইহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট বোধ হইবে। 'স' স্থানে 'হ' অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা;—সপ্তসিন্ধু—হপ্ত হিন্দু; সপ্তা—হপ্তা; সপ্তম—হপ্তম। অদ্যাপি বঙ্গদেশে স স্থানে হ ব্যবহার করে। শিব—হিব তাহার প্রমাণ 'র' স্থানে 'ড়' সংস্কৃতে ব্যবহার আছে, 'ডরলয়োঃ' তাহার প্রমাণ। অতএব সার শব্দে হাড় পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। দা শব্দে দহ, ইহা বুঝাইতে কোন কষ্ট নাই। চাক্দহ—চাক্দা; খড়্দহ—খড়দা ইত্যাদি। এই জন্য বলি সারদা শব্দে হাড়দহ বুঝায়। দুর্গা যখন যার গৃহে আসেন, হাড় না জ্বালাইয়া যান না। দুর্গোৎসবের ব্যাপার যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। সুতরাং ইহার আর বাহুল্য করিলাম না। সারদা শব্দে সরস্বতী বুঝায়। সার দেন যিনি, তিনি সরস্বতী ভিন্ন আর কি হইতে পারেন! বিদ্যা ভিন্ন মনুষ্যের সারবত্তা জন্মায় না, সুতরাং বিদ্যাই সার পদার্থ। সরস্বতীর অনুগ্রহ ভিন্ন বিদ্যা লাভ হয় না, এই জন্যই সারদা শব্দে সরস্বতী বুঝায়।

ভবভূতি (১)।

ভারতবর্ষীয় কবিগণের ইতিবৃত্ত নিরবচ্ছিন্ন কিম্বদন্তী সমূহে পরিপূর্ণ। এই কিম্বদন্তী গুলি আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইতিহাস স্থানীয় যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, বিশিষ্ট অনুসন্ধায়িতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎসমুদায় হইতে সার সংগ্রহ না করিলে ভারতবর্ষীয় কবিগণের বিবরণ জানিবার উপায় নাই। আমাদিগের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যাঁহাদিগের কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-সুখ অনুভব করিয়া থাকি, প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে তাঁহাদিগের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারিনা। এ বিষয়ে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইলেই নিরাশার হিল্লোল-পরম্পরা আমাদিগকে নিরন্তর আহত করিতে থাকে। আমরা অনায়াসে ভিন্ন দেশীয় মিল্টন, বায়রণ প্রভৃতি কবিগণের জীবনী অক্ষরে অক্ষরে গলাধঃকরণ করিতে পারি, কিন্তু স্বদেশীয় কবিদিগের বিষয় একবারে কিছুই অবগত হইতে পারি না। প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-বলে এক্ষণে এই সংশয়-কণ্টকিত পথ অনেকাংশে সুগম হইয়া উঠিয়াছে। ইদানীন্তন অনেক মহাত্মা প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধানের প্রতি সবিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। রুচির ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ভারতীয় মহিমা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা যাহাদিগকে অকিঞ্চিৎকর গল্প ও উপন্যাসপ্রিয় বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিতাম, এক্ষণে তাহাদিগের অনেককে কষ্টসাধ্য প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধানে সমুৎসুক দেখিয়া আমরা যুগপৎ আহ্লাদিত ও আশ্বস্ত হইতেছি। এই আহ্লাদ ও আশ্বাসই অদ্য আমাদিগকে কবিশ্রেষ্ট ভবভূতি বিষয়ক প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। আমরা চরিতাখ্যায়ক শিরোরত্ন বস্‌ওয়েলের গৌরব স্পর্দ্ধী হইয়া ভবভূতি-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। মানব চরিত অপরের হৃদয়ে যথাযথ প্রতিফলিত করিতে বসওয়েল অসাধারণ ক্ষমতা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর জনৈক সুপ্রসিদ্ধ লেখক বলিয়া গিয়াছেন, "হোমর অবিসম্বাদিত রূপে বীররসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি নহেন, সেক্ষপিয়রও অবিসম্বাদিত রূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক

(১) উত্তর চরিতম্। মহাকবি ভবভূতি প্রণীতম্। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেণ সংস্কৃতম্। অভিনবং সংস্করণম্। কলিকাতা রাজধান্যাম্ সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিতম্।

প্রণেতা নহেন, দিমস্থিনিস্ ও অবিসম্বাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী নহেন; কিন্তু বসওয়েল চরিতাখ্যায়কদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তিনি তাঁহার প্রতিযোগিদিগকে এত দূরবর্ত্তী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহাদিগকে তৎসমক্ষে উপস্থাপিত করা ঔচিত্যের একান্ত বিরোধী।" পরমুখপ্রেক্ষী ভারতবর্ষে এরূপ একটী বস্ওয়েল জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে কোন জন্সনের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত করেন নাই। ভারতীয় গৌরবের নিদানভূত মনস্বিগণ কল্পনার গর্ভে প্রসূত হইয়াছেন, কল্পনার ক্রোড়ে লালিত হইয়াছেন, এবং পরিশেষে কল্পনাতেই বিলীন হইয়া গিয়াছেন। যে মানবীলীলা আদ্যোপান্ত এইরূপ কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ সহৃদয়গণের হৃদয়ঙ্গম হওয়া একান্ত অসম্ভাবিত। এতন্নিবন্ধন বস্ওয়েল যেমন স্বীয় অনুপম গ্রন্থে অক্ষরে অক্ষরে সজীব জন্সনের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ভারতীয় ব্যক্তির হস্তে ভারতীয় ব্যক্তির চরিত্র সেরূপ অঙ্কিত হওয়া সম্ভবে না। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ চিত্র তুলিকাবিন্যাসদোষে প্রায়ই অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়া উঠে। আমরা সজীব ভবভূতির চরিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য লেখনী ধারণ করি নাই। স্বপ্রণীত কতিপয় পুস্তক ব্যতীত যাঁহার অন্য কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই, তাঁহার বিষয় জীবন-চরিতের সম্মানিত পদের প্রতিপাদ্য করা নিরবচ্ছিন্ন অহম্মুখতার পরিচায়ক। আমরা যাহা বলিব, তাহা ভবভূতির জীবিতকাল-নির্ণয় প্রসঙ্গের একদেশ মাত্র। আমরা এই উদ্দেশ্যসূত্রে পরিচালিত হইয়াই বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভবভূতি কোন্ সময়ে, কোন্ দেশ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার নিরূপণ করা সহজ সাধ্য নহে। মহিমবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় স্বমুদ্রিত উত্তরচরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই তিন নাটক (বীরচরিত, উত্তর-চরিত ও মালতীমাধব) ভিন্ন ভবভূতি আর কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি কোন্ সময়ের লোক তাহারও নিরূপণ করা সহজ নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি সহস্র বৎসরের কিছু পূর্ব্বে ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনাতে সূত্রধার মুখে তিনি আপনার যে পরি-

চয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে তদতিরিক্ত আর কিছু জানিবার উপায় নাই। সে পরিচয় এই— বিদর্ভ দেশের অন্তঃপাতী পদ্মপুর নগর তাঁহার জন্মভূমি, পিতার নাম নীলকণ্ঠ, পিতামহের নাম গোপাল, মাতার নাম জাতুকর্ণী; তিনি কাশ্যপ গোত্রে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা বেদ বিদ্যা, ও বেদোদিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা বিলক্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।"

আমরা কবির কেবল এই পরিচয়েই পরিতৃপ্ত নহি। সহৃদয় সম্প্রদায়ও এই পরিচয়ে আশানুরূপ সন্তুষ্ট হইবেন না। কবি নিজমুখে যে পরিচয় দিয়াছেন, তদতিরিক্ত বিষয় জানিতে হইলে ইতিবৃত্তের বিষয়ীভূত বিবরণাদির অনুসন্ধান আবশ্যক। এই বিবরণ যদিও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে জানিবার উপায় নাই, তথাপি আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা সহৃদয় পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের পদ্মপুর নগরে নীল কণ্ঠের ঔরসে ও জাতুকর্ণীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার উপাধি শ্রীকণ্ঠ। এতন্নিবন্ধন তিনি ভট্ট ভবভূতি নামে কথিত হইয়া থাকেন (১)। পদ্মনগর দাক্ষিণাত্য বিলসিত বিদর্ভদেশের অন্তঃপাতী। সচরাচর বিদরের সহিত এই বিদর্ভের অভিন্নতা কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা বর্ত্তমান হাইদরাবাদের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত (২)। উত্তর চরিতের স্থানে স্থানে গোন্দয়ানা প্রদেশশোভিনী পর্ব্বতমালার যেরূপ চিত্ত

---

(১) "সূত্র। অস্তি দক্ষিণাপথেষু পদ্মনগরং নাম নগরং তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়েণঃ কাশ্যপশ্চরণগুরবঃ পংক্তি পাবণাঃ পঞ্চাগ্নেয়ো ধৃতবতাঃ সোমপীথিনোডম্বর নামনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃপ্রতিবসন্তিস্ম।

*   *   *   *

তদামুষ্যায়ণস্য তত্র ভবতঃ সুগৃহীত নাম্নো ভট্ট গোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্র কীর্ত্তের্নীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবো ভট্ট শ্রীকণ্ঠ পদলাঞ্ছনো ভবভূতি নাম জাতুকর্ণীপুত্র কবির্নিসর্গ সৌহৃদেন ভবতেষু বর্ত্তমানঃ স্বকৃতিমেবং প্রায় গুণ ভূয়সী মস্মাকমর্পিতবান্।" মালতী মাধব।

মহাবীর চরিত ও উত্তর চরিতেও এইরূপ লিখিত আছে। পরন্তু মহাবীর চরিতে ভবভূতির জন্ম স্থান পদ্মনগরের স্থলে পদ্মপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

(২) অনেকে বিদর্ভকে বর্ত্তমান বেরার বলিয়া অনুমান করেন। স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারে অদ্যাপি ইহার প্রধান নগর বিদর নামে কথিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মানচিত্র সমূহে পদ্মনগরের অবস্থান সন্নিবেশের কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। এই পদ্মনগর পদ্মাবতী অথবা পদ্মপুর নামেও কথিত হইয়া থাকে। See H. H. Wilson's 'Theatre of the Hindus' vol. ii. p. 11, note.

চমৎকারিণী ও হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা আছে, তাহাতে স্বচক্ষে এই নিসর্গ-পট দর্শন না করিলে লেখনী-মুখ হইতে তাদৃশ স্বভাবোক্তি-সমলঙ্কৃত রচনা বিনির্গত হয় না। ইহাতে অনুমান হয়, ভবভূতি বর্ত্তমান বিদরেরই স্থান বিশেষে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মালতীমাধবের স্থল বিশেষে শ্রীপর্ব্বতের উল্লেখ আছে (১)। এই শ্রীপর্ব্বতের অন্যতর নাম শ্রীশৈল। পুরাবিদ্‌দিগের মতে এই পর্ব্বত বর্ত্তমান কৃষ্ণা নদীর নিকটে অবস্থিত (২)। মালতী মাধবের নবম অঙ্কের প্রথমাংশের লিখন ভঙ্গীতে বোধ হয়, শ্রীপর্ব্বত ভবভূতির জন্মস্থান পদ্মাবতীর (পদ্মনগরের) নিকটবর্ত্তী। ভবভূতি প্রথমে পদ্মাবতীর উপান্ত-বাহিনী সিন্ধু ও পারা নামক নদীদ্বয়ের বর্ণনা করিয়া পরে গোদাবরীপ্রান্তবর্ত্তিনী দক্ষিণারণ্য ভূধর মালার চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন (৩) শ্রীযুক্ত হোরেস্ হিমেন উইলসনের মতে ভবভূতি-বর্ণিত সিন্ধু দুই ভাগে বিভক্ত। বৃহৎসিন্ধু চম্বল ও ক্ষুদ্রসিন্ধু উজ্জয়িনীর প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ দিকবর্ত্তী শিপ্রা নদীতে পতিত হইয়াছে (৪)। পারা একটী ক্ষুদ্র নদী। ইহা সচরাচর পার্ব্বতী নামে উক্ত হয়। প্রাচীন ভূগোলের মতে এই নদী বিজয় নগরের নিকট সিন্ধু নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এ দিকে ভারতমানচিত্রানুসারে কৃষ্ণা তটবর্ত্তী শ্রীশৈল শিপ্রা ও চম্বলের বহু দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং পদ্মাবতী অথবা পদ্মনগর চম্বল নদের দক্ষিণ দিকবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহাতে অনুমান হয় ভবভূতির জন্মভূমি বর্ত্তমান আরঙ্গাবাদ অথবা বেরারের নিকটে কোনও স্থলে অবস্থিত ছিল (৫)। ক্রমশঃ।

(১)। অব। ভঅবদি সা সোদামিনী অগুণা সমাসাদিত্য অচ্চরীঅ মন্ত সিদ্ধিপহাবা সিরিঅপ্‌পব্বদেকাবানিঅ বদৎ ধাবেদি। * * * ইত্যাদি
মালতী মাধব। প্রথমাঙ্ক।

(২) Wilson's "Theatre of theHindus" vol. ii. p. 18 note.

(৩) "পদ্মাবতী বিমল বারি বিশাল সিন্ধু
পারা সরিৎপরিকর চ্ছলতো বিভর্ত্তি।
উত্তুঙ্গ সৌধ সুর মন্দির গোপুরাট্ট
সংঘট্ট পাটিত বিমুক্তমিবান্তরীক্ষং॥
* * *

এতাশ্চন্দনাশ্বকর্ণ সরল পাটল প্রায় তরুগহনাঃ পরিণত মাতৃর সুরভয়োহরণ্য গিরি ভূময়ঃ স্মারয়ন্তি খলু তরুণ কদম্বজম্বুবনাবনদ্ধান্ধকার গুরু নিকুঞ্জ গভীর গহ্বরোদ্‌গার গোদাবরীরব মুখরিতবিশাল মেখলা ভুবো দক্ষিণারণ্য ভূধরান্।" মালতী মাধব। ৯ম অঙ্ক।

(৪) "Theatre of the Hindus" vol. ii. p. 96, note.

(৫) Colonel Wilford's 'Ancient Geography of India' in Asiatic Researches vol. xiv. p. 408.

মানবতত্ত্ব।

উপক্রমণিকা।

মানব বলিলে আমরা দুই হস্ত দুইপদবিশিষ্ট জীবমাত্রকেই বুঝি; সুতরাং বৃহৎ অট্টালিকাবাসী উজ্জ্বল হীরকমণ্ডিত বেশধারী মহাপরাক্রান্ত সম্রাটও মানব, জীর্ণকুটীরবাসী শত গ্রন্থীযুক্ত বসনধারী, আহারাদি অভাবে শীর্ণকায় দরিদ্রও মানব; প্রখর-বুদ্ধিসম্পন্ন চানক্য, রিসিলু প্রভৃতিও মানব, গণ্ডমূর্খ গদাধর চন্দ্র, বিদ্যা-দিগগজ প্রভৃতিও মানব; মহাবীর ভীষ্ম, অর্জ্জুন, সেকন্দর, বোনাপার্টী প্রভৃতিও মানব এবং দাসত্ব ব্যবসায়ী মসিজীবী আধুনিক বঙ্গবাসীরাও মানব; কালিদাস, ভারবি, আর্য্য-ভট্ট, সেক্ষপিয়র, নিউটন প্রভৃতি মনীযাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও মানব এবং অনক্ষর ও কুসংস্কারসম্পন্ন ভুলু, কালুও মানব; সুসভ্য বুদ্ধিমান্ সুরূপ আর্য্য, ফরাসী, ইংলণ্ডীয়গণও মানব এবং নিতান্ত অসভ্য কদাকার কাফ্রি, নাগা, ভীল প্রভৃতিও মানব। এই প্রকারে দেখা যায় যে, মানব নাম-ধারী জীবের মধ্যে পরস্পরের এত প্রভেদ যে, একের সম্বন্ধে অপরকে মানব বলিয়াই বোধ হয় না। প্রথ-মোক্তকে মানব বলিলে শেষোক্তকে পশু এবং শেষোক্তকে মানব বলিলে প্রথমোক্তকে দেবতা বলিতে হয়। অতএব আমরা কাহাকে মানব বলিব? মানবের লক্ষণ কি এবং উদ্দেশ্যই বা কি? যদি দুই হস্ত দুইপদবিশিষ্ট গতি শক্তিসম্পন্ন পদার্থমাত্রই মানব পদবাচ্য, তবে তাহার মধ্যে এত প্র-ভেদ কেন? সুবর্ণ পিত্তলে প্রভেদ কেন? নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানবের সহিত পশুর এবং উচ্চশ্রেণী মানবের সহিত দেবতার সাদৃশ্য উপলব্ধি হয় কেন? যদি মানব মাত্রই এক পদার্থ এবং তাহাদের একই উদ্দেশ্য ও পরিণাম হয় তবে এত প্রভেদ কেন? যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্যের উদ্দেশ্য ও পরিণাম ভিন্ন হয়, তবে তাহা-দিগকে কি প্রকারে এক পদার্থ বলা যায় এবং তাহাদের অধিকারী বা কি প্রকারে এইরূপ হইতে পারে? সুরম্য হর্ম্ম্যনিবাসী রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত জীর্ণ কুটীর বাসীর, অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ দূরদর্শী পণ্ডিতের সহিত অনক্ষর ও নিতান্ত মূর্খের এবং সভ্যতা চাক্‌চিক্যশালী সুন্দর মান-বের সহিত নিতান্ত কদাকার অসভ্যের যদি একই উদ্দেশ্য ও পরিণাম হয়, তবে তাহাদের এত প্রভেদ কেন এবং সেই প্রভেদ জনিত মানাপমা-

নেরই বা বিচার কেন? উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের পরিণাম ও উদ্দেশ্য যদি একই হয়, তবে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের প্রভেদ কি থাকিল? যদি ভিন্ন হয়, তবে মানব মাত্রেই এক পদার্থ কিরূপে বলা যায়? যদি মানব মাত্রেরই উদ্দেশ্য ও পরিণাম এক হয়, তবে তাহাদিগের অধিকারও সমান হইবে, কিন্তু কিজন্য তাহা হয় না? এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব সকলেরই জানিতে ইচ্ছা হয়। এ পর্য্যন্ত এই সকল সম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু তাহার ফল সর্ব্ববাদী সম্মত কিছুই স্থির হয় নাই, কখন যে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। তবে অনেকে এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, মানব ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত সৃষ্ট বস্তু; ঈশ্বর-সেবাই মানবের কার্য্য; স্বর্গ, ঈশ্বর-সাযুজ্য-সারূপ্য বা মোক্ষ-লাভই মানবের উদ্দেশ্য; ইহ কাল মানবের কার্য্যকাল এবং পরকালের সুখ দুঃখই তাহাদের লক্ষ্য। মানব মাত্রেই ইহাতে সমাধিকারী। তবে যে অবস্থার এরূপ প্রভেদ হয়, কেবল পূর্ব্ব বা ইহ জন্মের কার্য্য ফলে। সুতরাং মানব সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে অগ্রে ঈশ্বর, সৃষ্টি, পরকাল ও পূর্ব্বজন্মের বিষয় জানা আবশ্যক। ক্রমে সে সকল বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তৎ পূর্ব্বে আমাদের আর একটী বিষয় দেখা আবশ্যক। বিশ্ব কেবল মনুষ্য লইয়া নহে। মানব ভিন্ন এই বিশ্বে এত পদার্থ আছে যে, মানব না থাকিলেও বিশ্বের কিঞ্চিন্মাত্র পরিমাণের ন্যূনতা হইত না। অতএব সে সকল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা আবশ্যক।

যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়, আমরা তাহারই সত্তা অনুভব করি। তাহার কতকগুলিকে পদার্থ ও কতকগুলিকে পদার্থের শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করি। আমরা বলিয়া থাকি, যাহার সত্তা আছে, তাহা কোন না কোন প্রয়োজনোদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে। বিনা প্রয়োজনে কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। এজন্য যাহার প্রয়োজন আমাদের বুদ্ধিতে অনুভূত হয়না, তাহারও প্রয়োজন কল্পনা করিয়া লই, এই জন্য ব্যাঘ্র, সর্প, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি যে সকল হইতে স্পষ্ট অপকার দেখা যাইতেছে, তাহা হইতেও কোন না কোন উপকার কল্পনা করিয়া থাকি, কিন্তু কেন এরূপ কল্পনা করি, তাহা বলিতে পারিনা। বোধহয় যে দ্রব্যে কোন প্রয়োজন নাই, তাহার কোন মূল্য নাই এবং ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যে মূল্যহীন পদার্থ এরূপ সম্ভাবনা

করা আমাদিগের নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই এই-রূপ বলিয়া থাকি। ঈশ্বর কৃত পদার্থ যে বিনা উদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদিগের বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কাহার প্রয়োজন সাধনের জন্য সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে? এখানে মানব বক্তা, সুতরাং মানব বলিবেন যে, মানবের উপকারের জন্যই সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, জল, বায়ু, সর্প, ব্যাঘ্র, রোগ, মৃত্যু সমুদায়ই মানবের উপকারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। যদি বানরের হস্তে কলম থাকিত, তাহা হইলে বোধহয় তাহারাও বলিত যে, মানবের সহিত সমুদায় বিশ্ব বানরের কল্যাণের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। আচ্ছা মানব! তোমারই কথায় স্বীকার করা গেল যে, তোমারই জন্য সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে বল দেখি তুমি কাহার উপকারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছ? যখন তুমি বলিতেছ, বিনা প্রয়োজনে কিছুই সৃষ্ট হয় নাই, তখন তোমারও সৃষ্টি বিনা প্রয়োজনে হয় নাই বলিতে হইবে। অপরাপর পদার্থ তোমারই প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে বলিতেছ, কিন্তু তোমার সৃষ্টির প্রয়োজন কি? যদি বল, মানবগণ স্বজাতীয় পরস্পরের উপকারের জন্য প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তর হইল না। মানবজাতি দ্বারা বিশ্বের বা অপর কাহারও কি প্রয়োজন সাধিত হয়, তাহা তুমি বলিলে না। তুমিই কি এই বিশ্বের সর্ব্বস্ব? তুমি কি স্বয়ম্ভূ? তুমি কি স্বাধীন? যখন তোমার জন্ম মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন নহে, অপরাপর পদার্থের ন্যায় তোমার যখন জন্ম ও মৃত্যু আছে, তখন তুমি কি বলিয়া বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে ভিন্ন সত্ত্ব আকাঙ্ক্ষা কর। যদি অপরাপর পদার্থের সৃষ্টি প্রয়োজন জন্য হইয়া থাকে, তবে তোমারও সৃষ্টি প্রয়োজন জন্য হইয়াছে বলিতে হইবে। যদি তুমি অকারণ সম্ভূত হও, তবে অন্য পদার্থ সকলকেও অকারণ সম্ভূত বলিতে হইবেক। যদি বল ঈশ্বরের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে মানবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের আবার প্রয়োজন কি? যদি থাকে, তবে অপর পদার্থ সকলও তাঁহার প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবেক। কেননা তোমার ন্যায় তৎসমুদয়ও তাঁহার সৃষ্ট। তুমি কেবল এইমাত্র বলিতে পার যে, তোমার শক্তি পৃথিবীস্থ অপরাপর পদার্থ হইতে অধিক; তোমার বুদ্ধি এই আধিক্যের প্রধান হেতু। সেই বুদ্ধি বলে তোমরা পৃথিবীর সকল পদার্থের

উপর রাজত্ব করিতেছে কিন্তু তাহা বলিয়া তোমরা যে বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তাহা বলা যায় না। বিশ্ব সম্বন্ধে সমগ্র মানব জাতি একটী বালুকা কণার সমানও হইতে পারে না। যাহা হউক, মানব কি, তাহার কার্য্য কি, উদ্দেশ্য কি ও পরিণাম কি তাহা জানিতে হইলে মানবের আদি দেখা আবশ্যক। সুতরাং বিশ্বেরও আদি দেখা আবশ্যক হইতেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিশ্ব।

বিশ্বের আদি দেখিব, কিন্তু আমাদের তাহা দেখিবার ক্ষমতা আছে কি না? আমরা কখনও কি কোন পদার্থের আদি দেখিয়াছি? যদি না দেখিয়া থাকি, তবে বিশ্বের আদি দেখিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় কেন? মানব মাত্রেরই স্বভাব এই যে, পদার্থ মাত্রেরই আদি অর্থাৎ উৎপত্তি ও কারণ অন্বেষণ করে। ইহার কারণ কি? আদি কাহাকে বলে? প্রথম অবস্থাকে কি আদি বলেনা? সুতরাং যাহার পূর্ব্বে কিছুই ছিলনা, তাহাকেই আদি বলিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক আমরা কোন পদার্থের আদি দেখিয়াছি কি না। তোমার ভুমিষ্ঠ হওন কালীন অবস্থাকে কি তোমার আদি বলিবে? তাহা কখনই বলিতে পারনা। কেননা তৎপূর্ব্বে তুমি মাতৃগর্ব্ভে ছিলে, তাহার পূর্ব্বে তোমার পিতা মাতার শোণিতে ছিলে, তাহার পূর্ব্বে গবাদি জীবদেহে ও ধান্যাদিতে বর্ত্তমান ছিলে এবং তাহারও পূর্ব্বে মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতিতে অধিষ্ঠিত ছিলে। এইরূপ যত অন্বেষণ করিবে, ততই তোমার অগ্রিম অবস্থা অসংখ্য হইয়া পড়িবে কোনমতে তোমার আদি অনুসন্ধান পাইবেনা। অতএব যাহাকে তোমার উৎপত্তি বলিলে, তাহা তোমার উৎপত্তি নহে, অবস্থান্তর মাত্র। পূর্ব্বে তোমার নরদেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল পদার্থ হইতে তোমার দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই বর্ত্তমান ছিল। তুমি মেঘকে বৃষ্টির কারণ বল, কিন্তু মেঘ বাস্প হইতে জন্মে। বাস্প আবার জল হইতে উৎপন্ন হয়। যে জল ছিল, তাহাই রহিল। যে সকল পদার্থ লইয়া তোমার দেহ গঠিত, তোমার মৃত্যু হইলে আবার তাহাই হইবে। শাস্ত্রকারেরা ইহাকেই "পঞ্চে পঞ্চ মিশান কহেন।" এই প্রকারে দেখিতে পাইবে যে, কোন পদার্থেরই আদি পাওয়া যায় না। যাহাদের উৎপত্তি ও নাশ তোমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে, সে অবস্থান্তর মাত্র। যেমন মৃত্তিকা ঘট হইতেছে, স্বর্ণ অলঙ্কার হইতেছে, তুলা বসন হইতেছে, সেইরূপ ভৌতিক

পদার্থ মানব হইতেছে, বাস্প বৃষ্টি হইতেছে। যাহা কিছু দেখিতে পাও তৎসমুদায়ই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। যখন কোম পদার্থ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা তাহার উৎপত্তি বলিয়া থাকি। সে পদার্থের সেই অবস্থার সেই আদি বটে, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত আদি বলা যায় না। যখন কিছুই ছিলনা, তখন যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাকেই আদিম অবস্থা বলা যায়। কিন্তু কিছুই ছিলনা অথচ কিছু হইয়াছে এরূপ আমরা কখন দেখি নাই। এরূপ কল্পনা করাও আমাদিগের অসাধ্য। মনুষ্য যাহা কখন দেখে নাই, তাহার কল্পনা করিতেও অক্ষম। দেখিয়া শুনিয়াই মানবের জ্ঞান। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, কোটী শূন্য একত্রিত করিলেও এক হয়না এবং এককে সহস্র কোটী অংশ করিলেও শূন্য হয় না। কিছু না, কখন কিছু হয়না, কিছু, কখন কিছুনা হয় না। পূর্ব্বে কখন কিছু ছিলনা অথচ বিশ্ব হইয়াছে এবং এক্ষণে বিশ্ব আছে, পরে কিছুই থাকিবে না, একথা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ এবং ইহা মানব বুদ্ধির অতীত। বোধ হয় এই কথার সমন্বয় করিতে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, পরমাণুর ধ্বংস নাই। পরমাণু পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, পরেও সেই রূপ থাকিবে। তাঁহারা কহেন, সেই পরমাণু পুঞ্জ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি এবং যখন বিশ্ব ধ্বংস হইবে, তখন সেই পরমাণু পুঞ্জ রহিয়া যাইবে। কেহ ২ বলেন যে, কিছু ছিলনা সত্য, কিন্তু ঈশ্বর ছিলেন। সেই ঈশ্বর হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যে রূপে বাস্প হইতে জলের উৎপত্তি এবং জীব হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, ঈশ্বর হইতে বিশ্বের উৎপত্তি কি সেই রূপ? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিশ্বের পূর্ব্বাবস্থা বলিতে হইবেক সুতরাং ঈশ্বরও বিশ্বের কারণ নহেন। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ বলেন না। তাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেন। ঘট সম্বন্ধে কুম্ভকার যেমন এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে স্বর্ণকার যেমন, তাঁহারা বিশ্ব সম্বন্ধে তাহা হইতেও ঈশ্বরকে অনেক উচ্চ বলেন। তাঁহারা বলেন পূর্ব্বে কিছুই ছিলনা; একমাত্র অনাদি অনন্ত ঈশ্বর ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল এবং সেই ইচ্ছা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। কিন্তু একথা কতদূর বিশ্বাস্য? অনাদি ব্যক্তির কার্য্য সাদি হওয়া কতদূর সঙ্গত? তুমি বিশ্বের সৃষ্টিকাল যতই অধিক বলনা কেন, অনাদি কালের সহিত তুলনায় নিতান্ত অল্প। এই অনন্তকাল ঈশ্বর নিশ্চিন্ত হইয়া

বসিয়া ছিলেন, সেদিন, কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন, একথা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহার উত্তরে যদি বলেন, ইচ্ছাই ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির কারণ; যতদিন ঈশ্বরের সে ইচ্ছা হয় নাই, ততদিন বিশ্বসৃষ্টি হয় নাই, যখন ইচ্ছা হইল, তখনই সৃষ্টি হইল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কি জন্য এতকাল ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় নাই এবং হঠাৎ একদিনেই বা সে ইচ্ছা হইল কেন? তাঁহারা যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই কূট তর্কের অবতারণা করেন, একথা সে যুক্তিরও বিরুদ্ধ। তাঁহাদের মূলযুক্তি এই যে, কারণ ভিন্ন কিছুই হয়না। এইজন্য তাঁহারা ভাবিলেন বিশ্বের অবশ্যই কারণ আছে এবং সেই কারণই ঈশ্বরের ইচ্ছা। যখন তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন, কারণ ভিন্ন কিছুই হয় না; তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার কি কারণ নির্দ্দেশ করেন? যখন বলিতেছেন, ঈশ্বর চিরকালই আছেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা ছিলনা, তখন হঠাৎ তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল কেন? ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে তাঁহাদের যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইল। কিন্তু যদি তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায় বিশ্বকেও অনাদি অনন্ত বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যুক্তিও দুর্ব্বলা হয় না এবং সকলদিক্ রক্ষা হয়। যখন আমরা কোন পদার্থেরই আদি দেখিতে পাইনা, তখন বিশ্বকে অনাদি বলায় দোষ কি? এস্থলে আর একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বের অনাদিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমরা কোন পদার্থেরই আদি দেখিতে পাইনা; কিন্তু তাহাতে এরূপ বুঝা যাইতে পারে যে, সে সকলের আদি থাকা সম্ভব, কেবল আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ততদূর যাইতে পারেনা বলিয়া তাহা আমাদের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু যদি আমরা এরূপ কিছু দেখিতে পাই যে, যাহার অসীমত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস আছে, তাহা হইলে বিশ্বের অসীমত্ব সম্বন্ধে কেন বিশ্বাস না জন্মিবে? এক্ষণে দেখা যাউক সেরূপ আমরা কিছু দেখিতে পাই কি না। আমরা মোটামুটী এ বিশ্ব সম্বন্ধে কি অনুভব করি? আধার, আধেয়, কার্য্য ও কাল। বোধ হয় এই চারিটী ভিন্ন বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই জ্ঞান নাই। যাহাতে কিছু থাকে, তাহাকে আধার, যাহা থাকে, তাহাকে আধেয়, আধেয়ের শক্তি বা গুণ প্রকাশকে কার্য্য এবং কার্য্যের ব্যাপ্তিকে কাল বলে। দুগ্ধের আধার ভাণ্ড, ভাণ্ডের আধার পৃথিবী, পৃথিবীর আধার কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবেক যে, যাহাকে আমরা শূন্য বা আকাশ বলি, তাহাই পৃথিবীর আধার,

সেই আকাশ সমুদায় জগতের আধার। সুতরাং আধেয় বলিতে পদার্থ মাত্রকেই বুঝাইতেছে। জগৎ সমূহের আধার শূন্যকে আমরা 'কিছুই না' বলিয়া থাকি। কিন্তু উহা যে নিশ্চয়ই কিছু না, তাহার নিশ্চয় কি? এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধার যে কিছুই না, তাহা কিরূপে বলা যায়? এমনও বলা যাইতে পারে যে, উহা আমাদিগের অতীন্দ্রিয় পদার্থে নির্ম্মিত, কেন না শূন্য ও জগৎ সমুদয় লইয়াই বিশ্ব অথবা আধার ও আধেয় লইয়াই বিশ্ব। এই জন্য আর্য্য পণ্ডিতেরা আকাশকে ভৌতিক পদার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু যাহাই হউক, বিশ্বের অংশভূত আকাশ যে অসীম, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। মানব! তুমি কখনও আধেয় শূন্য আধার দেখিয়াছ? অবশ্য বলিবে, না। তবে তুমি আকাশকে আধেয় শূন্য বল কেন? যখন জগৎ সকলের আধার আকাশ অসীম তখন উহার অধেয় জগৎ সংখ্যাও অসীম হইবে সুতরাং তোমাকে বলিতে হইবে যে বিশ্বের সীমা নাই; পরিমাণ সম্বন্ধে বিশ্ব অসীম। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা কিয়ৎ পরিমাণে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন কোন নক্ষত্র এত দূরে অবস্থিত যে তাহার আলোক অদ্যাপি পৃথিবীতে আইসে নাই, অথচ আলোকের গতি প্রতি সেকণ্ডে প্রায় ৯৬০০০ ক্রোশ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পদার্থের শক্তি প্রকাশের নাম কার্য্য। চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করিতেছে অর্থাৎ চুম্বক লৌহ আকর্ষণীশক্তি প্রকাশ করিতেছে। মনুষ্য গমন করিতেছে অর্থাৎ গতিশক্তি প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবেক যে কার্য্য, শক্তি প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কার্য্যের ব্যাপ্তির নাম কাল। উহাকে কার্য্যের আধারও বলা যাইতে পারে। যেমন যতখানি আকাশ অবলম্বন করিয়া কোন পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে তাহাকে তাহার পরিমাণ কহে, সেইরূপ যতখানি কাল অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য অর্থাৎ কোন পদার্থের শক্তি প্রকাশ হইতেছে তাহাকে তাহার স্থিতি কহে। কাল যে অনাদি অনন্ত সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। কাল অনন্ত হইলে উহার আধেয় কার্য্য কেননা অনন্ত হইবে? সুতরাং কার্য্যের আধার বিশ্বও অনাদি অনন্ত। বিশ্ব কখনও সৃষ্ট হয় নাই, কখনষ্টও নও হইবে না। উহা চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। দেখিয়া শুনিয়া যাহা জানা যায় যদি তাহারই নাম জ্ঞান হয়, মীমাংসা করিতে যদি যুক্তিরই সহায়তা লইতে হয়, আপ্তবাক্য

বলিয়া কিছু আছে যদি এরূপ বিশ্বাস না করা যায় তবে বিশ্বকে অনাদি অনন্ত বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর।

ঈশ্বর কি? কেহ কখনও কি ঈশ্বর দেখিয়াছেন? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে লোকে ঈশ্বর ২ করিয়া চিরকাল চীৎকার করে কেন? ঈশ্বর সম্বন্ধে পৃথিবীর ভিন্ন ২ জাতির, ভিন্ন ২ ব্যক্তির, ভিন্ন ২ মত। কেহ তাঁহাকে চতুর্ভুজ, কেহ দ্বিভুজ, কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ পুরুষ, কেহ প্রকৃতি, কেহ নিরাকার, কেহ ভক্তবৎসল, কেহ দীনবন্ধু, কেহ ত্রাণকর্ত্তা, কেহ ভূভারহারী ইত্যাদি নানা প্রকারে বর্ণন করিয়া থাকেন। কেহ কহেন অহিংসাই পরমধর্ম্ম, কেহ বলেন মনুষ্য ও পশুর শোণিত ঈশ্বরের নিতান্ত প্রিয়। কেহ বলেন আতপতণ্ডুল, কদলী, পুষ্প প্রভৃতি তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ, কাহারও মতে অনন্যমনে ধ্যান করিলেই তিনি সন্তুষ্ট। কেহ বলেন নিকৃষ্ট জাতির অন্নগ্রহণ মহাপাপ, কেহ বলেন জাতি বিচার তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতিকে বিধর্ম্মী বলেন। তাঁহাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত তাঁহারা দেশে ২ ধর্ম্মযাজক পাঠাইয়া থাকেন। যবনেরা আবার সকলকেই বিধর্ম্মী বলেন। যে পর্য্যন্ত বিধর্ম্মীগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন না করে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহাদিগের ধন, মান, প্রাণ, বিপুলকীর্ত্তি সকলি নষ্ট করেন। হিন্দুরা যদিও এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে পৈত্রিক ধর্ম্মে থাকিলে সকলেরই মুক্তি আছে কিন্তু তাঁহারা অন্য ধর্ম্মাক্রান্তদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া এতদূর ঘৃণা করেন যে, তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। এইরূপে দেখা যায়, পৃথিবীতে সহস্র ২ সম্প্রদায় ভিন্ন ২ রূপে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নিরূপণ করেন ও ভিন্ন ২ রূপে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ করেন। কোন সম্প্রদায়েরই পরস্পর সামঞ্জস্য নাই। পরস্পর সকলেই সকলকে পাপী বলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই মতে বিধর্ম্মীরা চিরকাল নরক ভোগ করিবে। এই সকলের সামঞ্জস্য করিবার জন্য সম্প্রতি একটী নবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহারা অপর সম্প্রদায়ী দিগকে পৌত্তলিক বলেন; বেদ কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতির ঈশ্বর প্রণীতত্ব অস্বীকার করেন এবং তাঁহারা বলেন ঈশ্বর নিরাকার, নির্ব্বিকার, বিশ্ব নিয়মে তাঁহার আজ্ঞা সকল প্রচারিত আছে, স্বতন্ত্র তাঁহার কোন শাস্ত্র নাই, অনন্যমনে তাঁহাকে চিন্তা করাই তাঁহার উপাসনা, তাঁহার

প্রিয়কার্য্য সাধন ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ধর্ম্ম এবং অনুতাপই প্রয়শ্চিত্ত। কিন্তু তাঁহাদের মতেও বিধর্ম্মীরা অনন্তকাল নরকগামী!

এক্ষণে আমরা কোন্ মত অবলম্বন করিব? কাহাকে প্রকৃত ঈশ্বর বলিব? য়িশু খৃষ্টকে? মহম্মদকে? বিষ্ণুকে? না দুর্গাকে? কোন্ ধর্ম্মের মত তাঁহার প্রকৃত আজ্ঞা? কোন্ পথে চলিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে না? স্বর্গভোগ-সুখের বাঞ্ছা না করিলেও চলে, কিন্তু নরকভোগের আশঙ্কা না করিয়া থাকা যায় না। সুতরাং আমাদের ঈশ্বর নিরূপণ করা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। যাঁহার উপাসনা করাই আমাদিগের মুখ্যকার্য্য, যিনি রুষ্ট হইলেই আমাদিগের সর্ব্বনাশ, যাঁহার করুণাবলে আমরা আহার বিহার করিতেছি, তাঁহাকে জানা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তিনি কে? তাঁহার স্বরূপ কি এবং উদ্দেশ্য কি? সকলেই বলিবেন যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহার কৃপায় আমরা সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনিই ঈশ্বর। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও এ বিষয়ে সকলের একমত। সকলেই একস্বরে বলিয়া থাকেন 'ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা'। কিন্তু পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিশ্ব অনাদি অনন্ত, যাহা অনাদি তাহার আবার সৃষ্টি কি? সুতরাং বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তাও হইতে পারেনা। ঈশ্বরের যে সর্ব্ববাদী সম্মত লক্ষণ, তদনুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। যদি বল সকল মনুষ্যই একাল পর্য্যন্ত যখন ঈশ্বরের সত্বা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তখন এক কথায় তাহা খণ্ডন হইতে পারে না। সর্ব্ববাদী সম্মত মত কখন মিথ্যা হয় না। আমরা বলি তাহা নহে, কেননা চিরকাল সর্ব্বদেশে নারীজাতি সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের এবং নিম্নশ্রেণীর মনুষ্য উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যের সম্পূর্ণ অধীন বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে তাহার বিপরীত বিবেচিত হয় কেন? চিরকাল রাজা সর্ব্বে সর্ব্বা; ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব সর্ব্বদা অত্যাচার করিত, দেবতার রাজ্য ছিল। মন্ত্রমহৌষধ ছিল। এক্ষণে সে সকলের অধিপত্য কোথায়? অসভ্যাবস্থায় সকল দেশেরই মত প্রায় একরূপ ছিল। এক্ষণে সে সকল মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় কেন? বিশেষ, ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্ববাদী সম্মত মত পৃথিবীতে নাই। বিশ্বকর্ত্তার নাম কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ দুর্গা বলিতেছেন। যদি বলা যায়, নাম ভিন্ন হইলেও সকলই ঈশ্বর প্রতিপাদ্য, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে, সর্ব্ববাদী সম্মত মত এই যে, জগতকর্ত্তা আছেন, বিশ্ব অকারণ সম্ভূত নহে। সেই কারণ অনাদি অনন্ত। কিন্তু প্রতিপন্ন হইয়াছে বিশ্বের আদি নাই,

এবং কারণ ভিন্ন যে কিছুরই উৎপত্তি হয় না, ইহাও স্বীকার্য্য। বিশ্ব যখন অনাদি, তখন বিশ্বব্যাপারের কারণও অনাদি। যে কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিবে, তাহার আদি পাইবে না। যতই অনুসন্ধান করিবে, ততই পশ্চাতে কারণের বিদ্যমানতা অনুভূত হইবে। পরিশেষে জ্ঞান অচল হইলে ক্ষান্ত হইতে হইবে, কখনও মূল পাইবে না। যদি সেই কারণ পরম্পরাকে ঈশ্বর বলিতে চাও, তবে বৃষ্টির কারণ বাস্প ঈশ্বর, বাস্পের কারণ জল ঈশ্বর, বৃক্ষের কারণ বীজ ঈশ্বর, সর্ব্বব্যাপারের সমুদায় কারণকে ঈশ্বর বলা যায়। যাহাকে প্রাকৃতিক শক্তি বলা যায়, তাহারই নামান্তর ঈশ্বর। সে স্বতন্ত্র কথা। মানবগণ ঈশ্বরের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সে ঈশ্বরে নাই। সে ঈশ্বর যদিও অসীম শক্তিমান্, দণ্ড ও পুরস্কার দাতা, কিন্তু উপাসনায় তুষ্ট নহেন। তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় নাই, জ্ঞানাজ্ঞান নাই, কৃতজ্ঞতাভিলাষ নাই, শক্তি ভিন্ন কল্পিত ঈশ্বরের কোনও গুণই সে ঈশ্বরে নাই। মানবগণের কল্পিত ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। তাহা যে মানবের কল্পনা সম্ভূত, তাহা পদে পদে অনুভূত হয়। কেননা মানবের যাহা জ্ঞানাতীত, তাহা মানব কখনও কল্পনা করিতে পারে না। দেখ স্বর্গ বর্ণনকালে মানবগণ স্বর্ণ অট্টালিকা, হীরক স্তম্ভ, অমৃতময়ী নদী, চির বসন্ত, শোক দুঃখহীন জীব ইত্যাদি যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহারই কল্পনা করিয়াছেন, ঈশ্বর কল্পনাও সেইরূপ। তাঁহারা বিশ্বমধ্যে মানবকেই শ্রেষ্ঠ দেখিয়াছেন, ঈশ্বরকে সেই মানবীয় গুণ সম্পন্ন করিয়াছেন। তবে সেইগুলি কিছু বেসি করিয়া বলিয়াছেন। সাকারবাদীরা মানবের ন্যায় ঈশ্বরের পুত্র কলত্র, ভোগৈশ্বর্য্য, বিপদ সম্পদ, শত্রু মিত্র, আহার বিহার, রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সমুদায়ই কল্পনা করিয়াছেন। যে নিরাকারবাদীরা সাকারবাদীদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারাও যে পৌত্তলিক, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। তাঁহারা মানবীয় শারীরধর্ম্ম ঈশ্বরে আরোপ করেন নাই বটে, কিন্তু মানসিক গুণ সকল অবিকল তাঁহাতে প্রদান করিয়াছেন। মানবের ন্যায় তাঁহার ইচ্ছা, প্রিয়াপ্রিয়, কৃতজ্ঞতাভিলাষ, তোষামোদ প্রিয়তা, দণ্ডপুরস্কারদানশীলতা, জ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় মানবীয় মানসিক ধর্ম্ম তাঁহাতে কল্পিত করিয়াছেন। এ সকল তাঁহাতে থাকা সম্ভব কিনা, তাহা কেহ বিবেচনা করেন নাই। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, সে সকল গুণ ঈশ্বরে থাকা নিতান্ত অসম্ভব।

মানবের অন্তরে কোন উদ্দেশ্য

আছে, এজন্য ইচ্ছা আছে। উদ্দেশ্য বিনা কখনও ইচ্ছা হইতে পারেনা। ঈশ্বরের কি উদ্দেশ্য আছে যে তাঁহার ইচ্ছা থাকিবে? যখন সমুদায়ই তাঁহার, যখন তাঁহার কিছুরই অভাব নাই; তখন তাঁহার উদ্দেশ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। মানব সুখাভিলাষী ও স্বার্থপর, সুখ তাহার প্রার্থনীয়, সুখাভিলাষই তাহার ইচ্ছা। ঈশ্বরকে স্বার্থপর সুখাভিলাষী না বলিলে এবং সেই সুখ প্রাপ্তি তাঁহার ক্ষমতাধীন নয় না বলিলে তাঁহার ইচ্ছা আছে বলা যায় না। কিন্তু তাহা বলিতে গেলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকিবে? কারণ মানবের যাহা স্বার্থের অনুকূল তাহাই প্রিয়, যাহা তাহার বিপরীত তাহাই অপ্রিয়। ঈশ্বরের যখন স্বার্থ নাই তখন প্রিয়াপ্রিয় কি? যদি তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি কেবল প্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করিতেন, অপ্রিয় কখনই সৃষ্টি করিতেন না। দুধকলা দিয়া কখনও সাপ পুষিতেন না। যদিও করিতেন তাহা হইলে কোন্ পদার্থ বা কার্য্য তাঁহার প্রিয় তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেন। যখন তাঁহার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানই আমাদিগের কর্ত্তব্য তখন তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া তাঁহার নিতান্ত উচিত। কিন্তু তিনি তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন নাই। কেননা তাহা হইলে তুমি যাহাকে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বল, আমি তাহাকে তাঁহার নিতান্ত অপ্রিয় বলিতাম না। কেহ বলেন জীবহিংসা ঈশ্বরের অপ্রিয়, কেহ বলেন জীবহিংসা তাঁহার অভিপ্রেত। নতুবা ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু ছাগাদিকে বিনাশ করিত না। এইরূপে দেখা যায় ঈশ্বরের প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধে জগতে সহস্র সহস্র বিপরীত মত প্রচলিত আছে। মনুষ্য মধ্যে যাহারা সমাজের বিঘ্নকারী তাহারা দুষ্ট এবং যাহারা হিতকারী তাহারা শিষ্ট। দুষ্টের দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হয়, এই জন্য আমরা তাহাদের দমন করি এবং শিষ্টের দ্বারা আমাদের উপকার হয়, এজন্য তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পুরস্কার দেই, কিন্তু ঈশ্বর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন কেন? আমাদের দ্বারা তাঁহার কোন হিতাহিত হইতে পারে না। যদি বিশ্বের হিতাহিত উদ্দেশ্যে করেন, তাহাও অসম্ভব। কেননা শিষ্ট দুষ্ট সকলই তাঁহার সৃষ্ট। দুষ্ট যদি তাঁহার অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে কখনও তিনি দুষ্টের সৃষ্টি করিতেন না। যখন তিনিই দুষ্টের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহার দণ্ড দেওয়া তাঁহার নিতান্ত অসম্ভব। অনেকে বলেন ঈশ্বর দুষ্টের সৃষ্টি করেন নাই, মানবগণ আপনারাই তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য করিয়া দুষ্ট হয়; কিন্তু একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। তাহা

হইলে মানবকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ শত্রু শয়তান বলিতে হয় এবং ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। তাঁহার ইচ্ছা, মানবগণ ভাল হউক, কিন্তু মানব তাহা হইতে দিল না; ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল? মানব ঈশ্বরকে পরাস্ত করিল। ঈশ্বর মৃত্যুর অন্তে তাহাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু জীবিত মনুষ্যের নিকট ঈশ্বরকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, মানব সেই ঈশ্বর বিজয়িনী শক্তি কোথায় পাইল? মানব যখন ঈশ্বরের সৃষ্ট, তখন সেই ঈশ্বরাজ্ঞা ভঙ্গকারিণী শক্তি কি সেই ঈশ্বর হইতে পায় নাই? মানবের নিজস্ব কি কিছু আছে? বুদ্ধি, বিবেক, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, প্রভৃতি মানসিক শক্তি সকল কি মানব নিজে আনিয়াছে? যদি না হয়, যদি সমুদায় ঈশ্বর দত্ত, তবে ঈশ্বর দত্ত শক্তি অনুসারে কৃতকার্য্যের জন্য সে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হইবে কেন? যদিও হয়, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না কেন? মানবগণ যে দণ্ড পুরস্কার প্রদান করে, তাহার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষাই দণ্ড পুরস্কারের উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইলে সে বুঝিতে পারে যে এই কর্ম্ম করিয়াছিলাম তজ্জন্য দণ্ড পাইলাম; পুনরায় এরূপ কর্ম্ম করিব না। সৎকর্ম্মে পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে ঐরূপ তাহার সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মায়। অপর ব্যক্তিগণও তাহার দৃষ্টান্তে সৎকর্ম্ম করিতে ও দুষ্কর্ম্ম না করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে যে দণ্ড বা পুরস্কার দেন তাহা কোন দুষ্কর্ম্ম বা সৎকর্ম্মের জন্য তাহা কিছুই জানা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্মের লক্ষণ ও তাহার দণ্ড পুরস্কারের কথা লিখিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। এক ধর্ম্মানুসারে যাহা সৎকর্ম্ম, অপর ধর্ম্ম অনুসারে তাহা নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম। তাহার কোন্‌টী সত্য জানিবার উপায় নাই। কোন কুকর্ম্মেরই আমরা প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করিতে পারি না। আহার না করিলে জীবন ধারণ হয় না, একথা যেরূপ কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না, ক্ষুধা আপনিই আহারে প্রবৃত্তি জন্মায়; সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ও কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য সেরূপ কোন বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নাই। কেহ কেহ ঐরূপ বৃত্তির সত্ত্বা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন সেই মনোবৃত্তির শক্তি দ্বারা আমাদের মনে কুকর্ম্ম করিলে গ্লানি ও সৎকার্য্য করিলে প্রসন্নতা জন্মে। আমরা বলি, সেটী কেবল আমাদিগের অভ্যাস ও সংস্কারের নিমিত্ত হইয়া থাকে। সামান্য মক্ষিকা নাশে ধার্ম্মিক ব্যক্তির

মনে গ্লানি জন্মে, কিন্তু সহস্র মনুষ্য বিনাশে দস্যু বা রাজার কষ্ট হয় না। কোন হিন্দু ঔষধের নিমিত্তও কিঞ্চিৎ সুরা পান করিলে আপনাকে ধিক্কার দেন, কিন্তু ইংরেজ প্রভৃতি জাতি অহরহ মদ্য পান করিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন। এইরূপ যাহার যে রূপ সংস্কার ও শিক্ষা, তদনুরূপ কার্য্য নিমিত্ত মনের গ্লানি বা প্রসন্নতা জন্মে, তাহা সকলের সমান নহে, সুতরাং ক্ষুধার ন্যায় প্রাকৃতিক বৃত্তি নহে। কেহ কেহ বলেন, কুভোজনের ফল রোগ, শ্রমের ফল লাভ, দানের ফল যশঃ ইত্যাদি প্রত্যেক কার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। আমরা বলি তাহা নহে। কতকগুলি কার্য্যের কিছু কিছু ফল জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাকে ঐশ্বরিক না বলিয়া সামাজিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল বলাই সঙ্গত। সে সকল অসভ্য বন্য জাতিরা নিতান্ত অল্প জানে; সভ্যেরা নানা প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া কিছু কিছু জানিয়াছেন; তাহাও নিতান্ত অল্প। কত লোক চিরকাল কুভোজন করিয়া দীর্ঘ জীবী হইতেছে আবার কত লোক অতি সুনিয়মে আহারাদি করিয়া রুগ্ন হইয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে। কেহ বিনা পরিশ্রমে অতুলৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ বা দিবারাত্রি ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া উদারান্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে কোন কার্য্যেরই একরূপ ফল দৃষ্ট হয় না। আবার অনেকে স্ত্রী-পুত্র বিয়োগ জনিত ক্লেশানুভব করে, কিন্তু কোন্ কার্য্যের ফলে তাহারা সেই ক্লেশ পায়, অনুসন্ধান করিলে তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় না। এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঈশ্বরের আমাদিগকে দণ্ড বা পুরস্কার দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

ঈশ্বর উপাসনাপ্রিয় অর্থাৎ যিনি তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করেন, তাঁহার প্রতি তুষ্ট হয়েন এবং যিনি তাহা না করেন, তাঁহার প্রতি রুষ্ট হয়েন। মনুষ্য ছোট বড় আছে এবং তাহার আত্মাভিমান আছে, এজন্য যে তাহার প্রশংসা করে তাহার প্রতি তুষ্ট হয়। তাহার বড় হইবার ইচ্ছা নিতান্ত প্রবল। সে যাহার মুখে শ্রবণ করে যে, তাহার সেই ইচ্ছা সফল হইয়াছে অর্থাৎ অনেক মনুষ্য অপেক্ষা সে অধিক গুণবান্ হইয়াছে, তাহার প্রতি সে তুষ্ট হয় কিন্তু যে তাহার সে গুণবাদ না করে, তাহার প্রতি রুষ্ট হয় না। যে নিন্দা করে তাহারই প্রতি রুষ্ট হয়। কিন্তু ঈশ্বর প্রশংসা না করিলে রুষ্ট হয়েন। মনুষ্য হইতেও তাঁহার নিজগুণানুবাদ শ্রবণ লালসা অধিক ইহা কি রূপে বিশ্বাস করা যায়। তিনি

কাহার উপর প্রভুত্বের অভিলাষ করেন? তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছে? কিজন্য তাঁহার এত আত্মাভিমান? তিনি কি এত ক্ষুদ্রচেতা যে, প্রশংসা শুনিয়া গলিয়া যান? যে মনুষ্য আপন কর্ণে আপনার প্রশংসা শুনিতে ভাল বাসে, লোকে তাহাকে নিতান্ত ক্ষুদ্রচিত্ত ও অহঙ্কারী বলিয়া ঘৃণা করে। ঈশ্বর কি তাহা হইতেও ক্ষুদ্রচেতা ও আত্মাভিমানী? তিনি কি প্রশংসা শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে জগতে আনিয়াছেন? যদি তাহা সত্য হয়, তবে এই বিশ্ব কেবল মানবে পরিপূর্ণ করিলেই পারিতেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি যাহারা তাঁহার উপাসনা করে না, তাহাদের সৃষ্টি কেন করিয়াছেন? মনুষ্যদিগকে আহারাদি চিন্তার দায় হইতে মুক্ত করিয়া কেবল তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত করিলেই পারিতেন।

আর একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, মনুষ্যকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। অর্থাৎ হে ঈশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সৃজন করিয়াছ, আমাদিগকে আহারাদি প্রদান করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছ, তোমার কৃপায় আমরা অশেষবিধ সুখজনক দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছি ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার কৃত উপকার স্বীকার করিতে হইবেক, না করিলে তিনি নিতান্ত রুষ্ট হইবেন, তাহার কারণ কি? মনুষ্য পরের উপকার করিলে তাহার নিকট অপরকে কৃতজ্ঞ হইতে হয়। কারণ মনুষ্য স্বার্থপর। নিজের সুখই তাহার উদ্দেশ্য, পরের সুখের প্রতি দৃষ্টি করা তাহার অনুগ্রহ, না করিলে কেহ তাহাকে দোষী বলিতে পারেন না। সুতরাং যে মনুষ্য পরের উপকার করে সে নিতান্ত অনুগ্রহ করে তন্নিমিত্ত উপকৃত ব্যক্তির তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়ার আবশ্যক কি? জন্ম দিয়া তিনি আমাদিগের কি উপকার করিয়াছেন? জন্ম না দিতেন, আমরা জন্মিতাম না। যখন আমাদিগের সত্ত্বা মাত্রই হইত না, তখন উপকার কি অপকার কিছুই হইত না। আমাদিগের জীবন রক্ষা বা সুখপ্রদান করেন বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কারণ নাই। কেননা আমরাই তাঁহার এবং আহার না করিলে যে আমরা মরিয়া যাই সে নিয়মও তাঁহার। আহার দেন, তাঁহার আমরা বাঁচিব, না দেন তাঁহার আমরা মরিব। তাহাতে তাঁহারই ক্ষতি, আমাদের কি? তাহাতে তাঁহারই কৃতকার্য্যের ধ্বংস হইবে। যদি আমরা তাঁহার সৃষ্ট না হইতাম, নিজের বা অপর কোন শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতাম, আর তিনি আহারাদি প্রদান করিতেন, আমাদিগকে বাচাইতেন, ও সুখী করিতেন,

তাহা হইলে অবশ্যই আমাদিগকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইত। বোধ হয় এই কথাটী রক্ষা করিবার জন্য আর্য্য শাস্ত্রকারেরা ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও শিব সংহার করেন। এমতে বিষ্ণুর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া নিতান্ত উচিত, কেন না, তিনি খাইতে না দিলে আমরা বাচিতাম না। বিশেষ যদি ঈশ্বর আমাদিগকে সুখী করিতেন, তাহা হইলেও একদিন আমাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতার আশা করিতে পারিতেন। কিন্তু জগতে কেহই সুখী নহে। কেহ অন্নের নিমিত্ত দিবারাত্রি লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছ, কেহ রোগ যন্ত্রনায় অস্থির, কেহ পরমসুন্দরী স্ত্রী বা স্নেহাস্পদ পুত্রশোকে কাতর, কেহ শত্রুকর্ত্তৃক অপমানিত, কেহ গৃহাভাবে অশ্রয়বিহীন, ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট মানবগণকে দিবানিশি যাতনা দিতেছে। কুলিরা আটটী পয়সার জন্য সমস্তদিন সূর্য্যোত্তাপে মাটী কাটিতেছে, তাহাও সকল দিন জুটিতেছে না, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবে? না কৃষকেরা সম্বৎসর রৌদ্রবাতাদি সহ্য করিয়া প্রাণান্তকর পরিশ্রম পূর্ব্বক শস্য বপনাদি করিয়া পরিশেষে অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কিছুই পাইতেছে না বলিয়া কৃতজ্ঞ হইবে? পেটের দায়ে ধাঙ্গড়েরা দুর্গন্ধময় ন্যক্কারজনক কৎসিত স্থান সকল পরিষ্কার করিতেছে বলিয়া কৃতজ্ঞ হইবে, না মেথরেরা বিষ্ঠা বহন করিয়া, জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে বলিয়া কৃতজ্ঞ হইবে? উড়িষ্যাবাসীরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া প্রাণান্তক কষ্ট পাইতেছে বলিয়া কৃতজ্ঞ হইবে, না প্রচণ্ড বাত্যাপীড়িত হইয়া গৃহদ্বার শূন্য হইয়াছে বলিয়া ডায়মণ্ড হারবর বাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে? মহামারিতে জনশূন্য হইয়াছে বলিয়া গৌড়বাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে, না আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ভস্মীভূত হইয়াছে বলিয়া নেপল্‌সবাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে? মুসলমান ও ইংরাজদিগের পদলেহন করিতেছে বলিয়া আর্য্যেরা কৃতজ্ঞ হইবে, না ঔপনিবেসিক ইয়ুরোপীয়দিগের দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছে বলিয়া আমেরিকাবাসিরা কৃতজ্ঞ হইবে? চক্ষু নাই বলিয়া অন্ধ ও কর্ণ নাই বলিয়া বধির কৃতজ্ঞ হইবে, না বাকশক্তি নাই বলিয়া মূক ও গমনোপযোগী পদ নাই বলিয়া খঞ্জ কৃতজ্ঞ হইবে? যাহারা পৃথিবীতে মহাসৌভাগ্যশালী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও রোগ শোক প্রভৃতির কষ্ট হইতে মুক্ত নহেন। এমন মনুষ্যই জগতে নাই যাহার কিছু না কিছু কষ্ট নাই। যখন ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনর্থক আমাদিগকে এইরূপ কষ্ট দিতেছেন, তখন কিসের জন্য আমরা তাঁহার

নিকট কৃতজ্ঞ হইব ? যখন না খাটিলে আমরা খাইতে পাইনা তখন তিনি কি-রূপে আমাদিগকে আহার দিতেছেন ? দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতেই যখন মানুষের সমুদায় সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, সুখের চেষ্টা করিতে অতি অল্প অবসর থাকে, তখন তিনি কি সুখ দিতেছেন ? কেহ কেহ বলেন এ সকল ঈশ্বরের দোষ নহে, মানবগণে পূর্ব্বজ-ন্মার্জ্জিত কার্য্য ফলে এসকল কষ্টভোগ করে কিন্তু মানবের সমুদয় শক্তিই যখন ঈশ্বর দত্ত তখন ইহজন্মই কি আর পূর্ব্বজন্মই কি ? যখন সে দুষ্কর্ম্ম করিবে তখন সে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে করিবে। যত পূর্ব্বে যাও, প্রথম জন্মে সে দুষ্কর্ম্ম করিল কেন ? সেবারকার দুষ্কর্ম্মের জন্য দোষী কেন।

ঈশ্বর মহাজ্ঞানী। জ্ঞান কা-হাকে বলে ? দেখিয়া শুনিয়াই জ্ঞান। বিশ্ব সম্বন্ধে যে যত অধিক জনিয়াছে, সে তত অধিক জ্ঞানী। শিশুরা বিশ্বের কিছুই জানেনা, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ। যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, তত অধিক দেখিতে শুনিতে পায়, ততই জ্ঞানী হইতে থাকে। মানবগণ নিতান্ত অল্পায়ু। তাহাদের চাক্ষুস জ্ঞান নিতান্ত অল্প। এজন্য পুর্ব্বে মনুষ্যেরা দেখিয়া শুনিয়া যে সকল জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সকল লিপি-বদ্ধ বিষয় শিক্ষা করিয়া অধিক জ্ঞানী হয়। অপরের জানিত বিষয় জানার নামই বিদ্যা শিক্ষা; ফল বিশ্বের পদার্থ সকলের শক্তি ও কার্য্য জ্ঞাত হওয়া ভিন্ন শিক্ষা ও জ্ঞান আর কিছুই নহে। ঈশ্বরের জ্ঞান কি ? সকলই তাঁহার কৃত। নিজ কৃত বিষয়ের জ্ঞানের আবশ্যকতা কি। নিজকৃত ভিন্ন আর কিছুই নাই সুতরাং তৎ সম্বন্ধে জ্ঞানও হইতে পারে না।

ঈশ্বর মঙ্গলময়। দেখা যাইতেছে সর্ব্বত্রেই সমূহ অমঙ্গল বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যাঘ্র মৃগ বধ করিতেছে, সর্প ভেক নাশ করিতেছে, কুম্ভীর মৎস্য আহার করিতেছে। অধিক কি জীবপ্রধান মানবেরাই আপনারা পরস্পর নষ্ট হইতেছে। সর্ব্বদাই দ্বেষ, হিংসা, জিগীষা, জিঘাংসা প্রভৃতির পরতন্ত্র হইয়া মানবগণ পরস্পর কাহারও ধনাপহরণ করিতেছে, কাহা-রও দারগ্রহণ করিতেছে, কাহারও প্রাণবধ করিতেছে, কাহারও গৃহদগ্ধ করিতেছে। বলোন্মত্ত হইয়া এক দেশবাসীরা অন্য দেশবাসীকে অধী-নে আনিবার নিমিত্ত কত নরহত্যা, কত ধননাশ ও কত মহান্ কীর্ত্তি সকল নিপাতিত করিতেছে। ইতিহাস পাঠে ইহার অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। চাক্ষুস প্রত্যক্ষ দ্বারাও অহোরহ অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। এই কি মঙ্গলময় ঈশ্বরের কার্য্য ?

ঈশ্বরের কৌশল সকল অতি চমৎকার। সুকৌশল কাহাকে বলে? যে কৌশল অবলম্বন করিলে সকল দিকেই ভাল হয়, কোন প্রকারেই মন্দ হয় না, তাহাকেই সুকৌশল বলিতে হয়। ঈশ্বরের কোন্ কৌশল বা কোন্ নিয়ম দোষ শূন্য? তাঁহার কৌশল মাত্রেই দোষের ভাগ অধিক ভিন্ন অল্প নহে। আমাদিগের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ যে ক্ষুধা দিয়াছেন সেই ক্ষুধাই আমাদিগের রোগ মৃত্যুর কারণ। আহারে যেমন সুখ, অনাহারে তাহা হইতেও অধিক কষ্ট। আবার কুদ্রব্য বা অতিরিক্ত ভোজনে পীড়া জন্মে। আমাদিগকে সংসারে আসক্ত করিবার জন্য স্নেহ ও প্রণয় দিয়াছেন, কিন্তু তাহাই আবার বৈরাগ্যের কারণ। প্রণয়ী বা স্নেহাস্পদের মিলনে যে সুখ, তাহাদের বিরহে তাহা হইতে অধিক দুঃখ। পুত্র জন্মিলে যত সুখ না হয়, মরিলে তাহা হইতে অনেক পরিমাণে দুঃখ হয়। যে জল, বায়ু, আতপ ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবন রক্ষা হয় না, তাহারাই আমাদের পরমশত্রু। এইরূপে দেখা যায়, ঈশ্বরের কৌশল মাত্রই দোষ যুক্ত। এমন কৌশলই দৃষ্ট হয় না, যাহা দোষস্পর্শশূন্য। তবে তাঁহাকে কিরূপ সুকৌশলী বলা যায়?

আশ্চর্য্য এই যে, যে সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। ঈশ্বর করুণাময়, ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্। যখন জীবগণ অহোরহ নানাবিধ কষ্ট পাইতেছে, তখন তাঁহাকে, কিরূপে করুণাময় বলা যায়? যখন তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহা তিনি করিতে পারেন, তখন মনে করিলে জীবগণ যাহাতে দুঃখ না পায় তাহা করিতে পারিতেন। তাহা যখন করেন নাই, তখন হয় তাঁহাকে নিষ্ঠুর, না হয় অক্ষম বলিতে হইবে। কিছুতেই তিনি এই উভয়গুণের অধিকারী হইতে পারেন না। ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ ও শুভাশুভ ফলদাতা। যখন ভবিষ্যত বিষয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান আছে, তখন যাহা ঘটিবে, তাহা নিশ্চিত। নিশ্চয়তা না থাকিলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হইতে পারেনা। কল্য হরি, রামকে মারিবে কিনা তাহার যদি নিশ্চয়তা না থাকে তবে তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলা যায় না। তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলিতে হইলে, হরি রামকে হয় মারিবে না হয় মারিবে না, ইহার একটী নিশ্চয় থাকা চাই। ঘটনাবলীর এরূপ নিশ্চয়তা থাকিলে মনুষ্য তাহার অন্যথা করিতে পারেনা। যাহা

ঘটিবে, তাহা ঘটিবেই। ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন, তদ্বিপরীতে মনুষ্যের সহস্র চেষ্টা বিফল; সুতরাং মনুষ্য শুভাশুভফলের অধিকারী নয়। কাজেই ঈশ্বর যদি ত্রিকালজ্ঞ হন্, তবে শুভাশুভ ফলদাতা নহেন। যদি শুভাশুভ ফলদাতা হয়েন, অর্থাৎ কার্য্য মাত্রেই যদি মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকে, তাহার চেষ্টায় শুভ বা অশুভ হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি ত্রিকালজ্ঞ নহেন। কেননা যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা মনুষ্যের ক্ষমতাধীন। মনুষ্য কি করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যৎ জ্ঞানও নাই। ঈশ্বর নির্ব্বিকার অথচ উপাসনা প্রিয়। যাঁহার বিকার নাই, তিনি কিছুতেই কষ্ট বা হন না। সুতরাং তাঁহাকে উপাসনা প্রিয় বলা যায় না। যদি তিনি উপাসনা করিলে তুষ্ট ও না করিলে কষ্ট হন তবে তাঁহাকে কিরূপে নির্ব্বিকার বলা যায়? তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিতে হইলে শুভাশুভ ফলদাতা ও কৃতজ্ঞতাপ্রিয় বলা যায় না। ঈশ্বর সমদর্শী, অথচ ভক্তবৎসল ও অনাথ বন্ধু। ভক্তবৎসল বলিলে অভক্তকে ভাল বাসেন না বুঝায় এবং অনাথ বন্ধু বলিলে সনাথের বন্ধু নহেন বুঝায়; তবে তাঁহাকে কি রূপে সমদর্শী বলা যায়; তিনি সমদর্শী অর্থাৎ সর্ব্বজীবে সমান দয়া। তবে বিশ্বে এত প্রভেদ কেন? কেহ নর, কেহ কীট কেন? কেহ রাজা কেহ প্রজা কেন? কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেন? কেহ বলবান্, কেহ দুর্ব্বল কেন? কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ নির্ব্বোধ কেন? কেহ রূপবান্, কেহ কদাকার কেন? যদি বল মনুষ্যের স্বীয় কার্য্য দোষে; তাহা হইলে মনুষ্যকে স্বাধীন বলিতে হয়, সুতরাং ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ নহেন এবং ঐ স্বাধীনতা যদি ঈশ্বরদত্ত হয়, যদি সকলকে সমান রূপ বল, বুদ্ধি, শক্তি, স্বাধীনতা সম পরিমাণে দিয়া থাকেন, তবে সকলে সমান হয় না কেন? যদি ভিন্ন পরিমাণে দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সমদর্শীত্ব কোথায়?

এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঈশ্বর মানবের মনঃকল্পিত। বিশেষ কল্পিত না হইলে, মানবে নাই, অন্ততঃ এমত একটী গুণও তাঁহাতে লক্ষিত হইত। পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে, বিশ্ব অনাদি অনন্ত। সুতরাং তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। তবে যদি বিশ্বের সম্বন্ধ রহিত ঈশ্বর স্বীকার করিতে চাও, ক্ষতি নাই, আবশ্যকও নাই, প্রমাণও নাই। যদি থাকেন, তাঁহার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তিনিও স্বতন্ত্র আমরাও স্বতন্ত্র। বিশ্ব শক্তিকে

ঈশ্বর বলিতে চাও, আপত্তি নাই। সেই অপ্রমেয়শক্তি বিশ্বের সমুদায় অবস্থার মূল। তাহার নামান্তর প্রকৃতি। (ক্রমশঃ)

বিমলা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সে এ সংসারের কে? যাহার হৃদয়ে মনুষ্য জীবনের সার সম্পত্তি প্রণয় নাই, সে এ সংসারের কে? প্রণয়, মমতা, আত্মীয়তা, মায়া প্রভৃতি মানব হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তি সমস্ত যাহাতে স্থান পায় নাই, বুঝিতে পারি না, সে এ সংসারের কে? তুমি কন্দ-মূল ফলাসী, বিমল ধবল জটা কেশ সমন্বিত মহর্ষি! হইতে পারে তোমার ধর্ম্মজ্ঞান অতি নিষ্কলঙ্ক ও তোমার নৈতিক উন্নতি উচ্চ, কিন্তু তুমি এ সংসারের কে? তুমি আসিয়া সংসারের কি অধিক উন্নতি হইল? তোমার জীবন জগতের কি কাজে লাগিল? সংসারের হিতার্থে যাহার জীবনের এক দিনও পর্য্যবসিত হইল না, বিপন্নের বিপদ মোচনার্থ যাহার হৃদয় এক দিনও বিগলিত হয় না, সংসারের অসংখ্যবিধ প্রলোভন সমস্তের একটীও যাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, তাহার হৃদয় পাষাণ—পাষাণ অপেক্ষা কঠিন। তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা বিহিত কি না, তাহা বিশেষ বিচার্য্য। ফলতঃ প্রণয়াদি কমনীয় প্রবৃত্তি সমস্ত মনুষ্য হৃদয়ের ভূষণ। স্বেচ্ছায় সেই ভূষণ সমস্ত পরিশূন্য হওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। যে তাহা করে সে কদাচই প্রশংসনীয় নহে। তোমাকে বিশ্বাস কি? তোমার দয়া নাই, মায়া নাই, স্নেহ নাই, সৌহৃদ্য নাই, তোমাকে বিশ্বাস কি? কেহ কেহ তোমাকে পরম জিতেন্দ্রিয় ও অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন কিন্তু আমরা বরং চৌর বা নরহন্তাকে বিশ্বাস করিতে পারি তথাপি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের উপস্থিত গ্রন্থের নায়ক উল্লিখিত রূপ জিতেন্দ্রিয় বা ধার্ম্মিক নহেন। তিনি বিমলার সদিচ্ছা প্রণোদিত, কিন্তু অসুখ-বিষ-পরিপূর্ণ অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া হৃদয়ের চিরদিনের আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। ভাল বল, মন্দ বল, তাঁহার হৃদয় বিমলার অনুরোধ শুনিল না। কয়দিনে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া তিনি বিমলা সন্নিধানে গমন করিলেন। পাঠক! এ

প্রণয়ী যুগল আপনাদের অনাগত জীবনের কি ব্যবস্থা করিতেছেন শুনি গিয়া চলুন।

বিমলার সেই প্রকোষ্ঠ। বিমলা সেই খট্টায় উপবিষ্টা। যোগেশ দাঁড়াইয়া। উভয়ের দক্ষিণ হস্ত পরস্পর নিবদ্ধ। নিবদ্ধ হস্ত যুগলের উপর বিমলার বদন মণ্ডল। বিমলার নেত্র নিঃসৃত অশ্রুবারি হস্ত বহিয়া তাঁহারই বস্ত্রে পড়িতেছে। বিমলা কাঁদিতেছেন। বহুক্ষণ পরে যোগেশ কহিলেন।—

"বিমলা! আমার যাহাতে ভাল হয় তৎপ্রতি কি আমার দৃষ্টি নাই। স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে আমি কি অন্ধ?" বিমলা সেইরূপ ভাবেই বলিলেন,—

"আমি তা বলিতেছি না। তোমার বুদ্ধি আমার অপেক্ষা সহস্রগুণ ভাল। তবে আমি এই জানি যে ভাল বাসায় মনুষ্যকে অন্ধ করে। তুমি আমাকে অপরিমিত ভাল বাস। হয়ত সেই ভাল বাসাই তোমাকে স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে অন্ধ করিতেছে। যোগেশ! তুমি অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া দেখ।"

যোগেশ বলিলেন,

"আমি কয়দিন সমস্ত ভাবিয়া দেখিয়াছি। বুঝিয়াছি তোমা ছাড়া হইয়া রাজপদও আমার পক্ষে অতিশয় অসুখ ও বিষাদময়।"

অতি দুঃখে সুখ। রোদনে হাসি। বিষাদে আনন্দ। বিমলা রোদন পরায়ণা ছিলেন; সহসা তাঁহার অধর প্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। কহিলেন,—

"আমিত ঐ জন্যই বলিতেছিলাম যে, ভাল বাসায় মনুষ্যকে স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে অন্ধ করে। ভাল বাসাই তোমাকে অন্ধ করিতেছে।" যোগেশের মূর্ত্তি গম্ভীর হইল। তিনি কহিলেন,

"বিমলা! তবে তোমার মত কি? তুমি কি বল, এত প্রণয়, এত আশা, এত ভরসা সমস্তই লয় প্রাপ্ত হউক। স্নেহ মমতা শূন্যে মিশাইয়া যাক।"

বিমলা নীরব।

যোগেশ ক্ষণেক পরে পুনরায় কহিলেন,—

"যদি তোমার তাহাই অভিপ্রায় হয়—হউক। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তোমার অভিপ্রায়ের বিরোধী কার্য্য করা আমার কদাচ ইচ্ছা নহে। কিন্তু তোমাকেই অনুরোধ করি, তুমিই বল দেখি তাহা কি সম্ভব?"

বিমলা বলিলেন,—

"উপায় কি? যোগেশ! আর উপায় কি?"

যোগেশ বিষণ্ণ হাস্য সহকারে কহিলেন,—

"কি আশ্চর্য্য কথা! উপায় নাই বলিয়া অসম্ভব ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা বাতুলের কার্য্য। আর কেনই বা উপায় নাই বিমলা? আমি তোমাকে বলিতেছি, বিবাহ হইলে আমার কোনই বিপদ হইবে না।"

বিমলা বিপন্নস্বরে ও নিরাশ দৃষ্টি সহকারে কহিলেন,—

"না না যোগেশ! তুমি ও কথা বলিও না। আমি বিশেষ শুনিয়াছি, এ হতভাগিনীর সহিত বিবাহ হইলে তোমাকে আজীবন কষ্ট পাইতে হইবে।"

যোগেশ বলিলেন,—

"আবার সেই কথা। তবে তোমার পরামর্শ মতে সমস্ত বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়ঃ?"

বিমলা বিনতমস্তকে বলিলেন,—

"তা পার না কি?"

যোগেশ জিজ্ঞাসিলেন,—

"তুমি পার?"

মৃদু সলজ্জ স্বরে বিমলা উত্তরিলেন,—

"না।"

যোগেশ প্রেমাশ্রু পরিপ্লুত নেত্র হইয়া কহিলেন,—

"বিমলা! তুমি যাহা বিস্মৃত হইতে পার না, আমি যে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব ইহার কারণ কি?"

বিমলা পূর্ব্ববৎ ভাবে কহিলেন,—

"তুমি পুরুষ।"

যোগেশ কহিলেন,—

"কোমল কমনীয় কামিনী হৃদয় যাহা সহ্য করিতে পারে না, পুরুষে অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বলে তাহা সহিতে পারে একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এরূপ অবস্থাপন্ন প্রণয় বিস্মৃত হওয়া মনুষ্য সাধ্যের অতীত। যাহা জীবনের সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, দেহের অস্থি মজ্জার সহিত যাহা বিমিশ্রিত হইয়াছে, শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে রক্তের সহিত যাহা বিচলিত হইতেছে এরূপ অতি অমূল্য প্রণয়ের কথা বিস্মৃত হওয়া কদাচ মনুষ্যের সাধ্য নহে। মনুষ্যের সাধ্য হইলেও কদাচ আমার সাধ্য নহে। জ্বলন্ত পাবকে সহাস্যে প্রবেশ করা যায়, অতিপ্রিয় জীবন অনায়াসে ত্যাগ করা যায়, গরল উদ্গারী সর্পকে স্বেচ্ছায় চুম্বন করা যায়, তথাপি তোমাকে কদাচ বিস্মৃত হওয়া যায় না। বিমলা তোমাকে বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যাতীত। তোমার কোন্ দিনের কোন্ কথাটী ভুলিব বিমলা? তোমার আশৈশব জীবনের সমস্ত ব্যাপার যেন অধুনা আমি চিত্রিত পটের ন্যায় সম্মুখে দর্শন করিতেছি, সে সমস্ত কি মধুর, কি সরল, কি আনন্দবিধায়ক। বিমলা, তোমার মনে পড়ে

কি না বলিতে পারি না—সেই একদিন তুমি "মেঘনাদবধ কাব্য" অধ্যয়ন করিতেছিলে। তখন তোমার বয়স নয় বৎসর। আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছিলাম। অশোককাননে সীতা ও সরমা কথোপকথন করিতেছিলেন। স্থানটী গ্রন্থমধ্যে অতি মনোরম। আমি অতি অনুরাগের সহিত তোমাকে তাহা বুঝাইতেছিলাম। তুমি অনেকক্ষণাবধি এক মনে আমার অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে। কিন্তু বালিকার চঞ্চল চিত্ত এক বিষয়ে বহুক্ষণ সংযত থাকা সম্ভাবিত নহে। তুমি অন্যমনস্ক হইলে। নিকটে কাঁচি ও কাগজ ছিল। তুমি কাঁচি দিয়া কাগজে ফুল কাটিতে লাগিলে। আমি হস্তস্থিত মেঘনাদ বন্ধ করিয়া তোমার নবনীত নিভ চিবুকে সাদরে একটী আঘাত করিলাম! তুমি প্রথমে হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলে। পর ক্ষণেই বলিলে "যোগেশ তুমি আমাকে আঘাত করিলে আমিও তোমাকে আঘাত করিব।" আমি হাসিলাম, তুমি মারিমার জন্য হাত উঠাইলে। আমি তোমার হাত ধরিলাম। তুমি অপর হস্তে মনোরথ সিদ্ধির চেষ্টা করিলে। আমি সে হস্তও ধরিলাম। তুমি হস্তদ্বয় উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইলে, পারিলে না। আমি হাসিলাম। তোমার বদন কমল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তুমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলে "আমার এক অনুরোধ শুনিতে হইবে।" আমি বলিলাম "কি অনুরোধ বল।" তুমি বলিলে "হাত ছাড়িয়া দেও, আমি মারিব।" আমি উচ্চ হাস্য হাসিলাম, তোমার পবিত্র মুখের পবিত্র ভাব, অসীম সরলতা ও বালিকা ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বলিলাম—"মার।" হস্ত ছাড়িয়া দিলাম। তুমি মারিবার জন্য হস্তোত্তোলন করিলে কিন্তু মারিতে পারিলে না। হাসিয়া আমার বক্ষ মধ্যে বদন লুকাইলে। কি মধুর! কি পবিত্র! জীবন যাইলেও কি এ সমস্ত কথা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব? বিমলা তুমি পাগলিনী।"

বিমলা যেন কিছু লজ্জিত ভাবে বলিলেন,—

"তোমার এতও মনে থাকে?"

যোগেশ বলিলেন,—

"একি ভুলিবার কথা? আরও বলি শুন।"

বিমলা বলিলেন,—

"না, আর বলিয়া কাজ নাই। ও সকল বলিয়া কি সুখ?"

যোগেশ বলিলেন,—

'ও সকল কথায় বিশেষ সুখ আছে, ও সকল স্মরণে যথেষ্ট আনন্দ আছে।' বিমলা নীরব হইলেন। যোগেশ বলিতে লাগিলেন,—

"আর এক দিনের কথা বলি শুন বিমলা। তখন আমি রামনগরে পড়ি। গ্রীষ্মকালের পর যখন বাটী হইতে রামনগর যাই তখন তুমি মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবার জন্য বলিয়া ছিলে। পড়া শুনার ব্যস্ততায় দুই সপ্তাহ তোমাকে পত্র লিখিতে পরিলাম না। দুই সপ্তাহ পরে বড় মন খারাপ হইয়া উঠিল।—সম্বাদ পাইলাম, তোমার যার পর নাই পীড়া হইয়াছে। ব্যস্ত হইয়া যেখানকার পুস্তক সেই খানেই রাখিয়া বাটী চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম রোগে তোমার ঢলু ঢলু বদন বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তোমার সোনার অঙ্গ কালী হইয়া গিয়াছে। তোমার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া য়াছে।"—

বিমলা মধ্যস্থলে বাধা দিয়া কহিলেন,—

"তখন যদি মরিতাম—"

যোগেশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়াই কহিলেন,—

"যথাসম্ভব চিকিৎসা হইতেছে কিন্তু কোনই উপকার হইতেছে না। আমি অতি কষ্টে মনকে দৃঢ় করিয়া তোমার ক্লেশ নিপীড়িত শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। তুমি নয়নোন্মীলম করিয়া আমার প্রতি চাহিলে, চাহিয়াই কহিলে, 'ছি! তুমি মিথ্যাবাদী!' অমনি তোমার নয়ন নিমীলিত হইল, অৰ্দ্ধ ঘণ্টা কাল আর তুমি চক্ষু মেলিলে না। লোকে ভাবিল, তোমার প্রলাপ আরম্ভ হইল। কিন্তু আমি বাক্যের যাথার্থ্য বুঝিলাম। ভাবিলাম আমিই কি তবে বিমলার ব্যাধির কারণ? নেত্র দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তোমার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। অৰ্দ্ধ ঘণ্টা কাল পরে তুমি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে আমি সমভাবে বসিয়া কাঁদিতেছি। তুমি বলিলে "যোগেশ! কাঁদিও না। আমি কঠিন কথা বলিয়াছি। তুমি বলিয়া বলিয়াছি। অন্য হইলে বলিতাম না। আমার পীড়া অনেক উপশম হইয়াছে।" এই বলিয়া তুমি হাসিলে। তোমার বদনে স্বাস্থ্যের চিহ্ন সমস্ত প্রদীপ্ত হইল। আমি রোদন সম্বরণ করিলাম। চিকিৎসক আসিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অৰ্দ্ধাধিক রোগ সারিয়াছে।" ঔষধ ব্যবস্থা হইল। আমি তোমাকে ঔষধ খাওয়াইতে গেলাম, তুমি হাসিয়া সমস্ত ঔষধ আমার বস্ত্রে ফেলিয়া দিলে। বলিলে,—"ঔষধ যথেষ্ট হইয়াছে।" প্রত্যুত দুই দিনে তোমার রোগ সারিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য প্রণয়! কি পবিত্র, নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক স্বভাব! তুমি এই সকল

ভুলিতে বলিতেছ। এ সকল কি ভুলিবার কথা বিমলা ?"

বিমলার নয়ন দিয়া অশ্রু বিন্দু পড়িতে লাগিল। যোগেশ কহিতে লাগিলেন,—

"তোমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই পবিত্র মধুরিমা ময়। প্রত্যেক কার্য্যই জ্বলন্ত অক্ষরে আমার হৃদয় ফলকে লিখিত রহিয়াছে। তাহার কোন্‌টী ফেলিয়া কোন্‌টীর কথা বলিব বিমলা ?"

বিমলা গলদশ্রুলোচনে কহিলেন,—

"আর বলিও না যোগেশ, বলিয়া কাজ নাই।"

যোগেশ বলিলেন,—

"তবে গত কথা উল্লেখ করিব না, তুমি কাঁদিতেছ কেন বিমলা ?"

বিমলা উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। যোগেশ বলিলেন,—

"তোমার যাহাতে কষ্ট হয় তাহা করিব না আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু বিমলে! তুমি যে আমার হইবে না একষ্ট সহি কি প্রকারে? সংসারের যাবতীয় ক্লেশাপেক্ষা এ গুরুতর নয় কি ?

বিমলা অনেক ক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা কহিলেন,—

"যোগেশ! আমি তোমারই, সংসার একদিকে, আর তুমি এক দিকে। তোমারই সুখের জন্য তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারি, এত পবিত্রতা, এত শ্রেষ্ঠতা, দুর্ব্বল হৃদয়া রমণী চরিত্রে থাকা অসম্ভব। অন্যের থাকিলেও আমার তাহা থাকিল না। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, যোগেশ, প্রিয়তম আমি তোমা ভিন্ন কাহারও নহি।"

বিমলার বদন মণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। লোচন দিয়া রশ্মি নিঃসৃত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ এত কথা যোগেশকে বলিলাম বলিয়া লজ্জার উদয় হইল। লজ্জায় চারুশীলা বিমলা যেন কোথায় লুকাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। বদন বিনত হইল। যোগেশ হাতে স্বর্গ পাইলেন। ধরণী-ধাম সুখের নিকেতন বোধ হইল। দেখিলেন যেন ঘর, দ্বার, চারিদিক হাস্য করিতেছে। সানন্দে বিমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

প্রাণেশ্বরী! এতক্ষণ আমার সহিত কি তামাসা হচ্ছিল ?"

বিমলা কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার বদন লজ্জায় ম্লান হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে যোগেশ বিমলার নিকট হইতে মহানন্দে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রলাপ ।

ঢাল্ ! ঢাল্ চাঁদ ! আরো আরো ঢাল্ !
সুনীল আকাশে রজত ধারা !
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হয়েছে পাগল পারা !
গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি !
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরাণ আজিকে উঠেছে মাতি!
হাসুক পৃথিবী, হাসুক জগৎ,
হাসুক্ হাসুক্ চাঁদিমা তারা !
হৃদয় খুলিয়া করিব রে গান
হৃদয় হয়েছে পাগল পারা !

আধফুটো ফুটো গোলাপ কলিকা
ঘাড় খানি আহা করিয়া হেঁট
মলয় পবনে লাজুক বালিকা
সউরভ রাশি দিতেছে ভেট !

আয়লো প্রমদা ! আয়লো হেথায়
মানস আকাশে চাঁদের ধারা !
গোলাপ তুলিয়া পরলো মাথায়
সাঁঝের গগনে ফুটিবে তারা।

হেসে ঢল্ ঢল্ পূর্ণ শতদল
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সুরভিরাশি
নয়নে নয়নে, অধরে অধরে
জোছনা উছলি পড়িছে হাসি !

চুল হ'তে ফুল খুলিয়ে খুলিয়ে
ঝরিয়ে ঝরিয়ে পড়িছে ভূমে !
খসিয়া খসিয়া পড়িছে আঁচল
কোলের উপর কমল থুয়ে !

আয়লো তরুণী ! আয়লো হেথায় !
সেতার ওইযে লুটায় ভূমে
বাজালো ললনে ! বাজা একবার
হৃদয় ভরিয়ে মধুর ঘুমে !

নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে আঙুল !
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে তান !
অবাক্ হইয়া মুখ পানে তোর
চাহিয়া রহিব বিভল প্রাণ !

গলার উপরে সঁপি হাত খানি
বুকের উপরে রাখিয়া মুখ
আদরে অস্ফুটে কত কি যে কথা
কহিবি পরাণে ঢালিয়া সুখ !
ওইরে আমার সুকুমার ফুল
বাতাসে বাতাসে পড়িছে দুলে
হৃদয়েতে তোরে রাখিব লুকায়ে
নয়নে নয়নে রাখিব তুলে ।
আকাশ হইতে খুঁজিবে তপন
তারকা খুজিবে আকাশ ছেয়ে !
খুঁজিয়া বেড়াবে দিক বধুগণ
কোথায় লুকাল মোহিনী মেয়ে ?

আয়লো ললনে ! আয়লো আবার
সেতারে জাগায়ে দেনালো বালা !
দুলায়ে দুলায়ে ঘাড়টি নামায়ে
কপোলেতে চুল করিবে খেলা ।

কি যে ও মূরতি শিশুর মতন !
আধ ফুটো ফুটো ফুলের কলি !
নীরব নয়নে কি যে কথা কয়
এ জনমে আর যাবনা ভুলি !

কি যে ঘুমঘোরে ছায় প্রাণমন
লাজে ভরা ওই মধুর হাসি !
পাগলিনী বালা গলাটি কেমন
ধরিস্ জড়িয়ে ছুটিয়ে আসি !

ভুলেছি পৃথিবী ভুলেছি জগৎ
ভুলেছি, সকল বিষয় মানে !
হেসেছে পৃথিবী—হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিলি কাহারো পানে !

আয় ! আয় বালা! তোরে সাথে লয়ে
পৃথিবী ছাড়িয়া যাইলো চলে !
চাঁদের কিরণে আকাশে আকাশে
খেলায়ে বেড়াব মেঘের কোলে !

চল যাই মোরা আরেক জগতে
দুজনে কেবল বেড়াব মাতি
কাননে কাননে, খেলাব দুজনে
বনদেবী কোলে যাপিব রাতি !
যেখানে কাননে শুকায় না ফুল !
সুরভি পূরিত কুসুম কলি !
মধুর প্রেমেরে দোষে না যেথায়
সেথায় দুজনে যাইব চলি !

৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা   চৈত্র. ১২৮২।

জ্ঞানাঙ্কুর

ও

প্রতিবিম্ব।

(মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।)

বিষয়   পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিংলাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮২

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

১। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য বিষয়ক নিয়ম ;—

বার্ষিক অগ্রিম	৩৲
ষাণ্মাষিক ,, ...	১৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	।৵০

এতদ্ব্যতীত মফঃসলে গ্রাহকদিগের বার্ষিক ।৵০ ছয় আনা করিয়া ডাক মাশুল লাগিবে।

২। যাঁহারা জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য স্বরূপে ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা কেবল অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন ; এবং প্রত্যেক টাকাতে ✓০ এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইবেন, কেননা বিক্রয় করণ কালে আমাদিগকে টাকাতে ✓০ আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

৩। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের কার্য্য সম্বন্ধে পত্র এবং সমালোচনের জন্য গ্রন্থাদি আমরা গ্রহণ করিব। রচনা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমাদের ঠিকানায় "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব সম্পাদক" শিরোনামা দিয়া লিখিতে হইবে।

৪। ব্যারিং ও ইন্সফিসেণ্ট পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট } শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্যানিং লাইব্রেরী } জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব কার্য্যাধ্যক্ষ।

মানবতত্ত্ব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সৃষ্টি।

বিশ্ব অনাদি অনন্ত। তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তা নাই। তবে কি বিশ্বের চিরকাল সমান অবস্থা? এক্ষণে বিশ্বের যে অবস্থা, পূর্ব্বে চিরকালই কি এইরূপ অবস্থা ছিল এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কাল এইরূপ অবস্থা থাকিবে? তাহা নহে। কেন না আমরা দেখিতে পাই-তেছি, পৃথিবীর কোন পদার্থ চিরকাল এক অবস্থায় থাকে না। দেখিতেছি, সমভূমি পর্ব্বত হইতেছে; পর্ব্বত সমভূমি হইতেছে; অরণ্য মরুভূমি ও মরুভূমি অরণ্য হইতেছে; জল স্থল ও স্থল জল হইতেছে; পূর্ব্বে যে খানে প্রকাণ্ড নগরী ছিল, এক্ষণে তাহা জন সমাগম শূন্য; পূর্ব্বে যে স্থলে মনুষ্য গমন করিতেও পারে নাই, এক্ষণে তাহা মহা-সমৃদ্ধি-শালী নগর; যে আর্য্যজাতি পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সর্ব্বোন্নত সুসভ্য ছিল, এক্ষণে তাহারা নিতান্ত হীন দশাপন্ন; যে ইংরেজেরা কিছু দিন পূর্ব্বে আম মাংস ভোজী ও নিতান্ত অসভ্য ছিল, এক্ষণে তা-হারা পৃথিবীর মধ্যে মহা পরাক্রান্ত ও সুসভ্য হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায় পৃথিবীর কোন বস্তুটি একভাবে থাকে না। অধিক কি একশত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল মানব এই পৃথিবীতে ছিল, তাহার একজনও এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, এবং এক্ষণে যে শতাধিক কোটী মানব বর্ত্তমান আছে, শত-বর্ষ পরে তাহার একজনও থাকিবে না। যেমন সমুদায় মনুষ্যেরই মৃত্যু হইতেছে, অথচ মানবের লোপ হইতেছে না, সেইরূপ বিশ্বের সমুদায় পদার্থেরই ধ্বংস হইতেছে, অথচ বিশ্বের লোপ হইতেছে না। যেমন মানবের জন্ম মৃত্যু আছে, সেইরূপ বিশ্বের সমুদায় পদার্থের উৎপত্তি ও নাশ আছে। উৎপত্তি ও নাশ অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। অনাদি অনন্ত বিশ্ব প্রতি মুহূর্ত্তে নবরূপ ধারণ করিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য, পূর্ব্বে ইহার কিছুই ছিলনা এবং পরেও ইহার কিছুই থাকিবে না। যেমন আমি ছিলাম না, কিন্তু আমার পিতা ছিলেন, সেইরূপ এই পৃথিবী ছিলনা কিন্তু ইহার উপাদান ছিল। বর্ত্তমান সূর্য্যের পূর্ব্বে অন্য সূর্য্য ছিল, বর্ত্তমান গ্রহ নক্ষত্রের পূর্ব্বে অন্য গ্রহ নক্ষত্র ছিল। যেমন শত-বর্ষের মধ্যেই বর্ত্তমান সমুদায় মনু-ষ্যেরই মৃত্যু হইবে, অথচ কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না, নিত্য ২। ১ জন করিয়া মরিয়া যাইবে। গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী সকলও ঐরূপে ক্রমে এক একটী করিয়া লুপ্ত হইবে ও তাহাদের

স্থানে নূতন গ্রহাদি উৎপন্ন হইবে। বিশ্ব অনাদি অনন্ত হইলেও সুতরাং পৃথিবী সৃষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞানবিৎ-পণ্ডিতেরা কহেন, পূর্ব্বে পৃথিবী বাষ্পময় ছিল, ঐ সকল বাষ্পময় পরমাণু রাশি ঘন হইয়া জল হইল, জল কঠিন হইয়া মৃত্তিকা হইল, কঠিন পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় কেবল অন্তরীভূত প্রস্তর মাত্র ছিল, ক্রমে সরের ন্যায় তাহাতে স্তর জমিতে লাগিল। ঐ স্তরাবলীতে ক্রমে ২ বৃক্ষ, লতা, মৎস্য, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী ও সর্ব্বশেষে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বন্য মানব ক্রমে সভ্য হইতেছে। তাঁহারা বলেন, মানব ক্রমেই উন্নত হইবে। যে বাষ্পরাশি হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যে পূর্ব্বে অন্য পৃথিবী ছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? যেমন বাষ্প জল হইতেছে ও জল বাষ্প হইতেছে, যেমন বৃক্ষ হইতে বীজ ও বীজ হইতে বৃক্ষ হইতেছে, সেইরূপ বাষ্পরাশি পৃথিবী ও পৃথিবী বাষ্পরাশি হইতেছে। যেমন মানবের বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও তৎপরে মৃত্যু, সেইরূপে পৃথিবীর বাল্য অর্থাৎ বন্য, যৌবন অর্থাৎ সভ্য, বার্দ্ধক্য অর্থাৎ স্থির ভাবের অন্তে লোপ হয়। বিশ্বের সমুদায় পদার্থেরই এই নিয়ম। পূর্ব্বে মানব জাতি নিতান্ত অসভ্য ছিল, ক্রমে সভ্য হইতেছে, পরে যখন উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইবে, তখন তাহাদের পতন হইবে। তাহার পর মানব হইতে উৎকৃষ্ট জীব পৃথিবীবাসী হইলেও হইতে পারে। পৃথিবী উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইলে ক্রমে তাহার ধ্বংস হইতে থাকিবে, পরিশেষে বাষ্পময় হইতে থাকিবে। এবিষয়ে আর্য্যজাতির পৌরাণিক মত অতি চমৎকার। ইয়ুরোপীয়গণের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পৃথিবী ৬ হাজার বৎসরমাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা বিজ্ঞান ও যুক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। দেখ আর্য্যেরা এবিষয়ে কি বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ৪ বৃন্দ ৩২ কোটী বৎসরে এক কল্প হয়। এই কল্প ব্রহ্মার দিবা ও তত্তুল্য সময় তাঁহার রাত্রি। রাত্রিকালে সমুদায় পৃথিবী লয় হইয়া যায়। পুনরায় দিবা ভাগে সৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান কল্পের প্রায় ২ বৃন্দ বৎসর অতীত হইয়াছে, অর্থাৎ বর্ত্তমান পৃথিবীর বয়ঃক্রম প্রায় ২ বৃন্দ বৎসর হইয়াছে। অদ্য আমরা যে যুক্তির অনুসরণ করিতেছি, কতকাল পূর্ব্বে আর্য্যজাতি তাহা স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন প্রলয় কালে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হইবে। প্রচণ্ড তাপ ব্যতিরেকে এই কঠিন পৃথিবী বাষ্প হইতে পারে না। বোধ হয় এই বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা এই রূপ অনুমান করিয়াছেন। বিশ্ব যে অনাদি অনন্ত, আর্য্য শাস্ত্রকারেরা তাহাও পদে পদে বলিয়াছেন। তাঁ-

যাঁহারা বলেন পরমাণু নিত্য, তাহার ধ্বংস নাই। আরও বলেন ৮৬৪ কোটী বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্রি। সেই অহোরাত্র হিসাবে বর্ত্তমান ব্রহ্মার ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রহ্মার পূর্ব্বেও অন্য ব্রহ্মা ছিলেন এবং পরেও অন্য ব্রহ্মা হইবেন। সুতরাং তাঁহারা বিশ্বের অনাদি অনন্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যাহাকে আর্য্যেরা পঞ্চভূত ও আধুনিক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ৬৬ ভূত বলিতেছেন, তাহাই প্রকৃত বিশ্ব। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি ক্ষয় নাই, কিন্তু সংযোগ ও বিয়োগে নানাবিধ পদার্থ জন্মিতেছে। ঐ ভূতের মিলনে জল, বায়ু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, গ্রহ, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, তাপ, তাড়িৎ, আলোক, মেঘ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের উৎপত্তি হইতেছে। যেমন মিলনের প্রকার ভেদে পারদ ও গন্ধক হইতে কর্জ্জলি, হিঙ্গুল ও পটপটি হইতেছে, সেইরূপ ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের সংযোগে ভিন্ন ২ পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে। বাষ্পকণা হইতে মানব পর্য্যন্ত সমুদায়েরই উপাদান এক। যদিও বিশ্ব অনাদি অনন্ত, কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি ও লয় আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মানব।

পূর্ব্বে বলা হইল বাষ্পকণা হইতে মানব পর্য্যন্ত সমুদায়ই এক উপাদানে উৎপন্ন কিন্তু আমরা দেখিতেছি মানব অতি শ্রেষ্ঠ প্রাণী। গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য প্রভৃতির সংবাদ আমরা জানিনা, তথায় শ্রেষ্ঠতর জীব থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু পৃথিবী মধ্যে মানবই সর্ব্ব প্রধান। মানবের শক্তি অতি অদ্ভুত; যে সকল কার্য্য মানবে সম্পন্ন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। যদি জন্ম মৃত্যু মানবের ইচ্ছাধীন হইত, তাহা হইলে তাহাকে এই পৃথিবীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলা যাইতে পারিত। মানবের যে শক্তি আছে, তাহার কোটী অংশের একাংশ শক্তি অপর জীবে বা পদার্থে নাই, তবে কি প্রকারে বলা যায় যে, অপর পদার্থ সমূহের সহিত মানব এক উপাদানে নির্ম্মিত? এই সংশয় দূরীকরণ করিবার জন্য অনেকে আত্মা নামক চেতন পদার্থের কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঐ আত্মার শক্তিতে মানবগণ গমন করে, চিন্তা করে, কার্য্য করে; আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের চেষ্টা করিবার শক্তি নাই। জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট, জড় হইতে মনুষ্য যে সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, তৎসমুদায়ই আত্মার শক্তি। তাঁহাদের যুক্তি অনুসারে

বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষীও মানবের ন্যায় আত্মাবান ও চেতন পদার্থ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে আত্মার স্বরূপ কি? কিরূপে আত্মা জড়দেহে প্রবেশ করে এবং কেনই বা সর্ব্ব শরীরে সমান শক্তি প্রকাশ করে না?

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে,—শুক্র শোণিতের যোগে জীবদেহের উৎপত্তি হয়; আত্মা কোন্ সময়ে সেই জড় দেহে প্রবেশ করে? অন্ন মধ্যে ও বিকৃত দ্রব্য হইতে যেসকল কীট জন্মে তাহাতে কোন্ সময়ে আত্মা প্রবেশ করে? যদি আত্মার সহিত শুক্র শোণিত যোগের ও বিকৃত দ্রব্যাদির অকাট্য সম্বন্ধ থাকিত তবে কেন সর্ব্ব সময় জীবের উৎপত্তি না হয়? স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন মাত্রেই কেন সন্তান না জন্মে? যদি জড় পদার্থের চেষ্টা শক্তি নাই, কেবল আত্মার শক্তিতে মনুষ্যাদির বল, বুদ্ধি, কার্য্য ও চিন্তা জন্মে তবে সকলেরই কেন সমান হয় না? যখন সকলেতেই আত্মা আছে তবে কেহ দুর্ব্বল, কেহ বলবান্, কেহ নির্ব্বোধ, কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ সৎ, কেহ অসৎ, কেহ শান্ত, কেহ ক্রুদ্ধ, কেহ বিনয়ী, কেহ অহঙ্কারী কি জন্য হয়? কি জন্য জন্মমাত্র বালকেরা সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানী না হয়? কি জন্য পশু পক্ষ্যাদি মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমতাশালী না হয়? কিজন্য চক্ষু না থাকিলে দেখিতে পায়না, কর্ণ না থাকিলে শুনিতে পায় না? এবং শোণিতের অপগমে জীবেরই বা নাশ হয় কেন? যখন ইহা স্বীকার্য্য যে আত্মা ভিন্ন জীবের আর সকলই জড় সম্ভূত এবং জড়ের চেষ্টা শক্তি নাই, তবে কি প্রকারে জড় পদার্থ আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, গমন প্রভৃতি কার্য্যের বাধা প্রদান করে? যাহার চেষ্টা নাই সে যেমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, সেইরূপ অন্যের অনুষ্ঠিত কার্য্যেরও বাধা দিতে পারে না। বিশেষ জিজ্ঞাস্য এই, আত্মা কি কেহ দেখিয়াছেন? আত্মার স্বরূপ কি কেহ অবগত আছেন? কেহ বলেন, আত্মা নিরাকার চেতন শক্তি বিশেষ; কেহ বলেন উহা ঈশ্বরের অংশ; কিন্তু সে সকলই অনুমান ভিন্ন কিছুই নহে। এইরূপ অনুমান করিবার কারণ কি? আত্মাবাদীরা বলেন যে, যখন জড়পদার্থ নিশ্চেষ্ট এবং জীব সকল সচেষ্ট, তখন জীবে জড়াতিরিক্ত অবশ্য কোন পদার্থ আছে। এই যুক্তিই তাঁহাদের আত্মা স্বীকারের মূল। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, জগতে কোন পদার্থ নিশ্চেষ্ট নহে। যে সকল পদার্থ জড় নামে অভিহিত, তাহারা জড় নহে। প্রত্যেক জড়

পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ স্বাভিমুখে আনিবার নিমিত্ত বল প্রয়োগ করে। প্রত্যেক পদার্থেরই আত্মীয় বা অভিপ্সিত পদার্থ আছে। তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে রাসায়নিক গুণে সংযুক্ত হয়। অনেক পদার্থের শত্রু অর্থাৎ অনভিমত পদার্থ আছে। সকল পদার্থেরই ঔদ্ধত্য বা তাপ আছে। চুম্বক প্রিয়পদার্থ লৌহকে আকর্ষণ করে, পদ্মপর্ণ বা তৈলের সহিত জলের মিলন হয় না; ক্ষার ও অম্ল একত্রিত হইলে ভয়ানক গতি ও তেজ প্রকাশ করে। বায়ু কখন মৃদু, কখন ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। জলের বেগ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইতেছে। দীপশিখা ও ধূম ঊর্দ্ধে গমন করিতেছে। এ সকলই জড় পদার্থ, অথচ এ সকলেরই চেষ্টা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। আবার যদি সুকৌশলে পদার্থ সকল সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহার কত সচেষ্টত্ব অনুভূত হয়! সময় নিরূপণ যন্ত্র কি চমৎকার কৌশলে সময় নিরূপণ করিতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা যে সকল অদ্ভুত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাড়িৎ বার্ত্তাবহ নিমেষ মধ্যে ৬ মাসের পথে সম্বাদ লইয়া যাইতেছে। আলোক চিত্র-যন্ত্র দ্বারা নিমেষ মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য চিত্র সকল চিত্রিত হইতেছে। এইরূপ জড় পদার্থ নির্ম্মিত অশেষ বিধ যন্ত্র যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য একত্রিত হইলেও তাহা পারে না। যদি বিশ্বাস কর, তবে আরও কয়েকটী চমৎকার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। খৃষ্টের জন্মের ৪শত বৎসর পূর্ব্বে টরেন্টম্‌নগরে আরকাইটাস্ নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত একটী কাঠের পায়রা নির্ম্মাণ করেন, সে উড়িতে পারিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মূলার নামক জর্ম্মন্ জ্যোতির্ব্বিদ্ একটী কাষ্ঠের চীল পক্ষী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে প্রতিদিন নগর হইতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাত করিয়া ফিরিয়া আসিত। তিনি একটী মক্ষিকা নির্ম্মাণ করেন, সে ভোজস্থলে তাঁহার হাত হইতে উড়িয়া সমুদায় গ্রহে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিত। আল্‌বার্ট সমাগ্নস্ ও বেকন্ বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সিডুজ নামে সুইজরলণ্ডীয় শিল্পী একটী ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাহাতে একটী ভেড়া স্বাভাবিক ডাক ডাকিত। একটী কুকুর এক ঝুড়ি ফল চৌকী দিত, কেহ তাহা স্পর্শ করিতে আসিলে দাঁত খিচাইত এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত। সেই সঙ্গে

কতকগুলি মনুষ্য মূর্ত্তি আশ্চর্য্যভাবে চলিয়া বেড়াইত। ঐ শিল্পী একটী মনুষ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, সে নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ধীরভাবে ক্রমান্বয়ে ৫। ৬ খানি ছবি চিত্রিত করিত। কেম্পলেন নামক হঙ্গেরি দেশীয় এক শিল্পকার এক আশ্চর্য্য দাবা খেলোয়ার প্রস্তুত করেন, এটী আজিও বিলাতে আছে। একটী মুসলমান মূর্ত্তি সম্মুখে একটী বাক্সের উপর দাবা সাজাইয়া বসিয়া আছে। তাহার সহিত দাবা খেলিতে আসিয়া কেহ তাহাকে হারাইতে পারে না। সে বাম হস্ত দিয়া খেলিয়া থাকে। কঠিন চাল্ উপস্থিত হইলে গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে। প্রতিপক্ষ কোন অন্যায় চাল্ চালিলে, তখনই তাহার প্রতি কট্মট্ করিয়া চাহে ও বাক্সের উপর দক্ষিণ হস্তের আঘাত করিয়া রাগ প্রকাশ করে। পারিস্ বিজ্ঞান সভার ভোকন্সন্ একটী বংশীবাদক ও আর একটী বাজাদার নির্ম্মাণ করেন। বংশীবাদক বাঁশীর সাত ছিদ্রে সাতটী অঙ্গুলি দিয়া অতি পারদর্শী বাদকের ন্যায় বাঁশী বাজাইত। বাজাদার ২০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সুর বাজাইতে পারিত। তিনি একটী হংসী প্রস্তুত করেন, সে স্বাভাবিক পক্ষীর ন্যায় পান ভোজন করিত, উহা পরিপাকও হইত। সুইজার্লণ্ড দেশীয় মেলাডেট্ নামক এক ব্যক্তি একটী স্ত্রী মূর্ত্তি দ্বারা পায়নাপোর্ট যন্ত্রে ১৮টী সুর আশ্চর্য্যরূপে বাজাইত। সেই রমণী যেরূপ সুন্দর ভাব ভঙ্গী সহকারে শরীর আন্দোলন করিত তাহা দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। উক্ত শিল্পকার একটী গায়ক পক্ষী নির্ম্মাণ করেন, সে লাফ দিয়া উঠিয়া পাখা ঝাড়িয়া শিষ ধরিয়া গান আরম্ভ করিত। পক্ষটী ৪ মিনিট্ করিয়া বাহিরে বসিয়া ৪ প্রকার পক্ষীর স্বর আলাপ করিত। এই শিল্পকার একটী বালকের মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিল। সে চিত্র এবং ফরাসী ও ইংরেজী অক্ষর অতি সুন্দররূপে লিখিতে পারিত। ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমোদ জন্য কয়েকটি কল প্রস্তুত হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য। তাহার একটী এই "এক খানি ছোট গাড়িতে দুইটী ঘোড়া যোড়া। তাহার উপরে একটী বিবি, একটি সইস ও বালক ভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া বসিয়াছেন। একটি বৃহৎ টেবিলের উপর গাড়ী খানি স্থাপিত হইলে গাড়োয়ান চাবুক মারিল এবং ঘোড়া দৌড়িল, ঠিক প্রকৃত ঘোড়া যেমন পা ফেলিয়া চলে তেমনি চলিল। টেবিলের অপর ধারে আসিয়া গাড়ী খানি বাঁকিয়া ঠিক্ ধার দিয়া দিয়া চলিল এবং যেখানে রাজা বসিয়া আছেন সেই

খানে গিয়া থামিল বালক ভৃত্য অমনি নামিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল এবং বিবি এক খানি দরখাস্ত হস্তে নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া রাজার হস্তে দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিবি পুনরায় সেলাম করিয়া যেন বিদায় লইলেন এবং গাড়ীতে চড়িলেন। গাড়োয়ান চাবুক মারিল, ঘোড়া আবার চলিল। সইস নামিয়াছিল, দৌড়িয়া গাড়ীর পশ্চাৎভাগে উঠিল. গাড়ী চলিয়া গেল।" ইবান্‌স নামক এক সাহেব তাঁহার জুবিনাইল টুরিষ্ট পত্রে পারিস নগরে যে আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রদর্শন হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম দৃশ্য—"প্রাতঃ কালে একটী বনের শোভা। সকল বস্তু ধুসর নবীন ও শিশির সিক্ত বোধ হইল, ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইয়া মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল, ঘরের ভিতর সাপ সকল চলিয়া যাইতেছে দেখা গেল. এক ছোট্ট শীকারী বন্দুক স্কন্ধে আসিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া শীকার সন্ধান করিতে লাগিল। একটী সরোবর হইতে একটী ছোট হংস উঠিল এবং শীকারির সম্মুখে উড়িয়া গেল। শীকারী ভাল করিয়া বন্দুক ছুড়িল, হংসটী ঘুরিয়া পড়িল। শীকারী তাহাকে স্কন্ধে ফেলিয়া বন্দুক কোমরে বাঁধিয়া চলিয়া গেল। চার বুরুল ঊর্দ্ধ ঘোটক সকল গাড়ী টানিতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষক সকল যাইতেছে, সম্মুখে নেপল্‌স উপসাগর ও তাহার বৃহৎ সেতু, তাহার উপর দিয়া গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে. জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ চলিতেছে, শেষে এক প্রলয় ঝড় উপস্থিত হইল জাহাজ ভগ্ন—নাবিক গণ জলে ভাসিতে ও ডুবিতে লাগিল, এক জন নাবিক ভাসিয়া পাহাড়ের ধারে গিয়া লাগিল, তাহার উদ্ধারার্থে নৌকা সকল আসিবার চেষ্টা করিল, ডুবিয়া গেল। ক্ষুদ্র নাবিককে অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিতে দেখা গেল, ঝড় থামিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি বাতিঘর হইতে পাহাড়ের ধারে আসিল, দড়ি নামাইয়া দিল, ক্লান্ত নাবিক তাহা ধরিয়া খানিক দূর উঠিয়া, হাত পিছলাইয়া পড়িয়া গেল, আবার প্রাণ পণে দড়ি ধরিয়া নিরাপদে পাহাড়ের উপরে উঠিল।"

এইরূপ ও অন্যরূপ বহুবিধ আশ্চর্য্য যন্ত্র মানবগণ জড়পদার্থ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অধিক কি অত্যন্ত দুরূহ গাণিতিক অঙ্ক ও প্রতিজ্ঞা সকলের প্রকৃত উত্তরও যন্ত্র বলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যখন এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার কেবল জড়পদার্থের সংযোগ মাত্রেই সম্পন্ন হইতেছে, তখন বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির কার্য্য সকল

জড় শক্তির দ্বারা হইবে না কেন? অনেকে বলেন, সত্য বটে, যন্ত্র সকল দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে চেতনের কার্য্য সম্পাদিত হয় কিন্তু তাহা একই নিয়মাধীন। সে যন্ত্র যে কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ সেই কার্য্যেরই অভিনয় হইয়া থাকে এবং যাহার পর যাহা ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহার পর তাহাই অনুষ্ঠিত হয়, নূতন কিছুই হয়না এবং পর্য্যায়েরও পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু জীবের সেরূপ নহে, তাহাদের যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহাই করে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এ কথা নিতান্ত ভ্রম পূর্ণ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবেক যে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী বর্গ এক নিয়মের অধীন। সকল বৃক্ষই প্রথমে অঙ্কুরিত পরে পল্লবিত তৎপরে শাখান্বিত হয়। বয়োবৃদ্ধি হইলে সকল উদ্ভিদ পুষ্পিত ও ফলবান হয়। যাহার যে সময় নিয়মিত তাহার সে সময়ে ফুল ফল হইয়া থাকে; বিশেষ কারণ ভিন্ন এ নিয়মের ব্যত্তয় হয় না। জীবগণের পক্ষেও সেইরূপ; তাহারা পর্য্যায় ক্রমে আহার বিহার নিদ্রা ও জননক্রিয়া নিষ্পাদন করে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিংহ ব্যাঘ্র পশু পক্ষী প্রভৃতি যে নিয়মে কাল যাপন করিয়াছে এখনও সেই নিয়মে করিয়া থাকে, নিয়মের ব্যত্তয় হয় না। যে কারণে যন্ত্র সকল বিকল হয় সেই কারণে জীবগণও পীড়িত হয়; যন্ত্র সকলের ন্যায় তাহারা আবার সুস্থ হয়। প্রভেদ এই জীবগণ অসময়ে ভয় ও ক্ষুধা প্রভৃতির অধীন হয়, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহাও এক নিয়মাধীন। যখনই তাহাদের ভয়ের কারণ উপস্থিত হয় তখনই ভয় পায় ও যখনই আহারীয় দ্রব্য উপস্থিত তখনই খাইতে ইচ্ছা হয়। অর্থাৎ সম্মুখে যে পদার্থ উপস্থিত হয় জীব দেহ গত পদার্থের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ তাহা এক নিয়মেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাহার সহিত দেহের আকর্ষণ আছে তাহা গ্রহণে ইচ্ছা হইবে এবং যাহার সহিত দেহের বিপ্রকর্ষণ আছে তাহা হইতে দুরে যাইতে ইচ্ছা হইবে, অর্থাৎ তাহা হইতে ভয় বা ঘৃণা জন্মিবে। এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে জীব সকল যন্ত্রের ন্যায় একই নিয়মের অধীন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, মানবগণ ঐ রূপ একই নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। যখন এমন পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে যে, তাহার সহিত মানবের আকর্ষণ আছে, তখন তাহাকে ভাল বাসিতেছে। যখন বিপ্রকর্ষণকারী পদার্থ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে তখন তাহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতেছে। আকর্ষণের

নামান্তর অনুরাগ। প্রণয়, স্নেহ ও ভক্তি সমুদায়ই আকর্ষণ মুলক। বিপ্রকর্ষণের নামান্তর বৈরাগ্য। ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি বিপ্রকর্ষণ মূলক। সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষে পরস্পর আকর্ষণ আছে। আবার তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে অধিকতর আকর্ষণ আছে। তাহাদিগের পরস্পর সাক্ষাত হইলেই অকৃত্রিম প্রণয় জন্মে। এই জন্য প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। এই জন্যই অতি কুৎসিতা রমণীর সহিত সুন্দর পুরুষের ও পরমা সুন্দরী রমণীর সহিত কদাকার পুরুষের প্রণয় জন্মে। এই কারণেই যে যাহাকে ভাল বাসে, তাহার মন্দ গুলিও ভাল দেখে। এই জন্যই অনেকে প্রিয়দর্শন হইয়া থাকে। যাহার দেহে বিপ্রকর্ষক পদার্থ অধিক আছে, তাহাকে দেখিলেই বিরক্তি জন্মে। তাহার সহস্র গুণ থাকিলেও, তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয়। মানব যে এত ভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়, উপাদানের ন্যূনাধিক্যই তাহার প্রধান কারণ। যে মানব দেহে আকর্ষণকারী পদার্থ অধিক আছে, সে অধিক প্রণয়ী হয়, সকলে তাহাকে ভাল বাসে এবং সকলকে সে ভালবাসে। যাহার দেহে বিপ্রকর্ষণ শক্তি অধিক, সংসারে তাহার আনুরক্তি থাকে না, সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে। যে দেহে তাপ অধিক, সে অধিক তেজী হয়। যাহাতে তাপ অল্প সে বিনয়ী হয়। এই রূপে যে শরীরে যে গুণের উপকরণ অধিক, সে শরীরে সেইগুণ অধিক দৃষ্ট হয়। বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, বিবেক, অভিমান, দম্ভ, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, প্রভৃতি মানবীয় গুণমাত্রই পদার্থের শক্তি বিশেষ। যে গুণের উপকরণ যে শরীরে যত অধিক আছে, সেই শরীর সেইগুণে তত অধিক ভূষিত হইবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। এই জন্যই বলিয়া থাকে, "অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন যায়তে"। এই জন্যই বলিয়া থাকে, "স্বভাব যায় মলে।" যেমন চুম্বকের লৌহাকর্ষণ শক্তি, অগ্নির উষ্ণত্ব কিছুতেই যাইবার নহে, সেইরূপ মানবের স্বভাবও চিরকাল অটল থাকে। যে উপকরণ হইতে দেহ গঠিত, তাহার শক্তি কোথায় যাইবে? এইজন্য বুদ্ধিমান্ নির্ব্বোধ হয় না, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান্ হয় না; সাধু অসাধু হয় না, অসাধু সাধু হয় না। যাহার যে শক্তি, তাহার অন্যথা কিছুতেই হয় না। তবে যদি কোন ক্রমে বিপরীত গুণসম্পন্ন পদার্থ দেহে প্রবেশ করে, তাহার গুণে জন্ম স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সময়ে ২ তাহা হইয়াও থাকে। আহারীয় পরিবর্ত্তন, স্থান পরিবর্ত্তন্ বা রোগাদি দ্বারা সময়ে ২

এরূপ ঘটিয়া থাকে। ফল, দেহে যে পদার্থ থাকে, তাহার শক্তি প্রকাশ অবশ্যই করিবে। তবে কি শিক্ষার কোন ফল নাই? আছে। শানিত হইলে লৌহাস্ত্র যেমন তীক্ষ্ণ হয়, বিনা ব্যবহারে তাহা যেমন আবার অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, শিক্ষা দ্বারাও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার যাহা নাই, শিক্ষা দ্বারা তাহা হইতে পারে না। কাষ্ঠ শানিত হইলে যদিও অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ ধার হয়, কিন্তু কখনও লৌহের তুল্য হইতে পারে না। দিগ্‌গজ পণ্ডিত সহস্র বৎসর শিক্ষা করিলেও রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় হইতে পারিবে না। কালিদাস যদি বিদ্যাশিক্ষা না করিতেন, তথাপি কবি হইতেন। তবে এত উৎকৃষ্ট হইতে পারিতেন না। রামবসু, হরুঠাকুর, মধুকাণ, দাশরথি রায় শিক্ষা না করিয়াও কবি। শিক্ষিত হইলে তাঁহাদের কবিতা অধিক মার্জ্জিত হইত মাত্র। যুধিষ্ঠির ও সক্রেটিস্ শিক্ষা না করিলেও সাধু হইতেন; ভীষ্ম, অর্জ্জুন শিক্ষিত না হইলেও বীর হইতেন এবং বিশ্বামিত্র শিক্ষিত না হইলেও যোগী হইতেন। শিক্ষার গুণ এই যে, যাহার যাহা আছে, শিক্ষা দ্বারা তাহার উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। যাহার যাহা নাই, শিক্ষা তাহা দিতে পারে না। এই জন্য প্রাকৃতিক কার্য্যের এত প্রশংসা। প্রাকৃতিক কবি যাহা বলেন, তাহাই মিষ্ট লাগে, প্রাকৃতিক প্রেমের সমুদায়ই সুন্দর, প্রাকৃতিক বীরের অদ্ভুত বীরত্ব, প্রাকৃতিক স্বরের এত মনোহারিত্ব ও প্রাকৃতিক রূপের এত সৌন্দর্য্য। যাহার হৃদয়ে করুণা আছে, তাহার ভাব অতি মধুর; যাহার ধৈর্য্য আছে, সে মহা বিপদেও অটল এবং যাহার বিবেক আছে, সে কিছুতেই কুকর্ম্মশালী হয় না। শিক্ষা দ্বারা যে গুণের উৎপাদন হয়, তাহার কখনও এত মনোহারিত্ব ও এত দৃঢ়তা থাকে না। পৃথিবীতে যত যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে মানব যন্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে যে কত কারুকার্য্য, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সকল যন্ত্রবলে মানব অসাধারণ কার্য্য করিয়া থাকে। অদ্যাপি সে সকল যন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ মানুষে করিতে পারে নাই, কখন যে পারিবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। বুঝিতে না পারিয়াই মানব স্বতন্ত্র চেতন আত্মার কল্পনা করিয়াছে, বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, সকলই ভূতের ব্যাপার। সমুদায়ই জড়ের কার্য্য। মানবের মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা হইতে নিকৃষ্ট উদ্ভিদ পর্য্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, প্রভেদ পরস্পর অতি অল্প। স্থূল

দৃষ্টিতে দেখিলে ঐ উদ্ভিদ ও ঐ মানবের অন্তর অত্যন্ত অধিক বটে, কিন্তু পর পর দেখিয়া আসিলে প্রভেদ অতি অল্প দৃষ্ট হইবে। এ সমুদায়ই উপাদান পদার্থের ন্যূনাধিক্য ও বিন্যাসের ইতর বিশেষ বশতঃ হইয়া থাকে। দেখ, শুক্র শোণিত ভিন্ন মানবের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু অনেক জীব বিকৃত গলিত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। যে পদার্থ মানব দেহের নিতান্ত অপকারক, সেই পদার্থ অপর জীবের প্রাণরক্ষক। মানব দেহ হইতে মল বলিয়া যাহা পরিত্যক্ত হয়, শূকরাদি জীবদেহ তাহাতেই পরিপুষ্ট হয়। যে মৃত্তিকায় রক্তকর দ্রব্য নাই বলিয়া মানব পরিত্যাগ করিয়াছে; সেই মৃত্তিকাই কত জীবের দেহ পোষক। যে বিষ ভোজনে মানবের প্রাণান্ত হয়, সেই বিষ কত জীবের প্রাণরক্ষা করে। যে আঙ্গারিকাম্ল জীবের নিতান্ত অনিষ্টকর, সেই আঙ্গারিকাম্ল ভিন্ন উদ্ভিদ্ একদণ্ডও বাঁচেনা। এ সকলের কারণ কি? যাহা অপকারী, তাহা সকলেরই অপকারক হয় না কেন এবং যাহা উপকারী তাহা সাধারণের উপকারী হয় না কেন? যন্ত্র নির্ম্মাণের ইতর বিশেষই ইহার কারণ; জীবগণের কার্য্য ভেদেরও ঐ কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ বিষয় আরও বিশদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন।

ক্রমশঃ।

আর্য্যজাতির ভূবৃত্তান্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বতন সংস্কৃত লেখকেরা কোন এক অংশে সাদৃশ্য দেখিলেই তাহা দৃষ্টান্তস্থলে উপনীত করিতেন; সুতরাং দার্ষ্টান্তিক বস্তু গুলি দৃষ্টান্তের অবিকল অনুরূপ হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব, পূর্ব্বকথিত ভৌবিক গোলতা অনুভব করাইবার নিমিত্ত যে তাঁহারা কদম্ব কুসুম, পুষ্কর পত্র, কন্দুক, ও কূর্ম্ম প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কেবল গোলত্ব সাম্য গ্রহণের নিমিত্তই বলিয়াছেন। ঋষিদিগের ভূ-গোল বিজ্ঞান জাহাজের মাস্তুল দর্শন বা আকাশের গোলত্ববিভ্রম মূলক নহে। তাঁহাদিগের ঐ জ্ঞান দিবা রাত্রি নির্ব্বাহক সূর্য্য গতি বা পার্থিবগতি এবং নদী সকলের সমুদ্রযায়িত্ব হইতেই সমুত্থিত হইয়াছিল। তত্তাবৎ পশ্চাৎ বক্তব্য। ফল, পৃথিবী গোল হইলেও ইহার গাত্র কন্দুক পৃষ্ঠের ন্যায় সর্ব্বত্র সম ভাবান্বিত নহে; ইহাতে বিলক্ষণ উচ্চ নীচ ভাব আছে

একথা বৃদ্ধ হিন্দু মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে অংশ উচ্চ, তাহাই বৃক্ষ লতাদি পরিপূর্ণ স্থল; আর যাহা নীচ, তাহা জলপূর্ণ সমুদ্র। "সমন্তাজ্জলবেষ্টিতং"। চতুর্দ্দিকে জল—তন্মধ্যে পৃথিবী নামক স্থল থাকাতে ইহার মানচিত্র দেখিলে জ্ঞান হয় পৃথিবী যেন এক সুবিস্তীর্ণ জল শয্যায় শয়ন করিয়া আছে।

বিদেশীয় ভূ-তত্ত্বজ্ঞেরাও এই রূপ বলিয়া থাকেন; পরন্তু তাঁহারা আরও কিছু বিশেষ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "পৃথিবীর উচ্ছ্রিত ভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগের আধিক্য প্রযুক্ত স্থল অপেক্ষা জল ভাগই অধিক। এমন কি সমুদায় পৃথিবীর ১০ ভাগের ৭ ভাগ জল; অবশিষ্ট (তিন ভাগ) স্থল।"*

* পৃথিবীর পরিমাণ জানিবার ইচ্ছা হইলে মাপদণ্ড হস্তে করিয়া ভ্রমণকরিতে হয় না। সূর্য্যের গতি (মত বিশেষে পৃথিবীর গতি) পরিচ্ছেদ করিলেই পৃথিবীর পরিমাণ স্থির হয়। পূর্ব্বতন আর্য্যেরাও এতদনুসারে পৃথিবীর পরিমাণ ফল স্থির করিয়াছিলেন। সূর্য্য ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বদিক্ ভ্রমণ করেন। এতদনুসারে "ত্রিংশদ্ভাগস্তু মেদিন্যা মুহূর্ত্তেন স গচ্ছতি"। এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ৩০ ভাগের ১ ভাগ গতি হয়। ৪৮ মিনিটে এক মুহূর্ত্ত হয়। যদি জানিতে ইচ্ছা হয় যে কলিকাতা হইতে জব্বলপুর কত দূর? ৩০ মিনিটের সূর্য্যগতি সঙ্কলন করিলেই জানা যায় যে, জব্বলপুর ও কলিকাতার দূরত্ব পৃথিবীর এত অংশ। এ সকল বর্ণনা ভবিষ্যতে হইবে।

স্থল অপেক্ষা জল ভাগ অধিক, তাহার আর সংশয় নাই। কিন্তু উল্লিখিত ভাগের সহিত বৃদ্ধ হিন্দুদিগের স্থল পরিমাণ সম্মিলিত হয় না, তাহা না হইলেও পারে। যে হেতু, বহু পুরাকালের নির্ণয় আর আধুনিক নির্ণয় সমঞ্জসভাব ধারণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ সামুদ্রিক ব্যাপার। আজ যে খানে সমুদ্র, ২০০ বৎসরান্তে হয়ত সেখানে মরুভূমি।

বৃদ্ধ দিগের নির্ণয় এই—

"ভূমি দশাংশতোন্যূনা।
কল্পিতাহপ্সিতি চিন্তয়েৎ।
(ভূতবিবেক)

জল অপেক্ষা দশভাগ ন্যূনা পৃথিবী জলের উপরে পরিকল্পিত। এই নির্ণয় অতি প্রাচীন কালের; আর "১০ ভাগের ৩ ভাগ"—এই নির্ণয় অধুনা কালের; অতএব ২ ভাগ মাত্র অধিক হওয়া অসম্ভব নহে।

"জলময় অংশ সমুদ্র"—এতদনুসারে সমুদ্র এক হইলেও মধ্যে মধ্যে তাহার আকার প্রকার ও সংস্থান সন্নিবেশের ভিন্নতা থাকাতে আর্য্যেরা উহার সপ্তত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্তই "সপ্ত সমুদ্রা;" বলিয়াছেন। এই সকল সমুদ্রের উদরবর্ত্তী স্থল সকল দ্বীপ নামে বিখ্যাত। দ্বীপ সংখ্যা বহুল হইলেও প্রধানতঃ সাতটি। সেই প্রাধান্য অনুসারে শাস্ত্র-

কারেরা "সপ্ত দ্বীপা বসুন্ধরা" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। নচেৎ ক্ষুদ্র দ্বীপ অনেক আছে। মহাভারতাদি গ্রন্থে "অষ্টাদশ দ্বীপবতী চ পৃথ্বী" অষ্টাদশ দ্বীপ, কোথাও বা তদধিক দ্বীপের উল্লেখ দেখা যায়।

এ পৃথিবীর পরিমাণ ফল সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত আছে। "ততো-যোজন বিংশানাং—
সহস্রাণি শতানিচ।"

(মহাভারত)

মহাভারতাদি পুরাণ গ্রন্থে ভুবন কোষের পরিমাণ ফল দ্বাবিংশ সহস্র যোজন। কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রমতের পরিমাণ ফল অনেক অল্প। জ্যোতিষের মতে পৃথিবীর পরিধি (বেষ্টন) ৪৯৬৭ যোজন, আর ব্যাস তত্তৃতীয়াংশের একাংশ। † ক্রমশঃ।

প্রলাপ সাগর।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

সাহিত্যিক তরঙ্গ

সাহিত্যই ভাষার জীবন। সাহিত্য গ্রন্থের বহুল প্রচার ভিন্ন কখনই ভাষার সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয় না। সাহিত্যের অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে, সেই সকলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ভিন্ন ভাষাজ্ঞান হয় না। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, অনেকেই অনেক প্রকার লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, কিন্তু সে গুলি যথার্থ স্ব স্ব নামের পরিচায়ক হইতেছে কি না, কেহই তাহার বিচার করেন না। পূর্ব্ব খণ্ডে মৎপ্রণীত আভিধানিক তরঙ্গে পাঠকবর্গ আমার পরিশ্রমের ফল জ্ঞাত হইয়াছেন; এবার আমি তাঁহাদিগকে কাব্য লিখন প্রণালী শিক্ষা দিব। আমার এ লেখা দেখিয়া অনেকেই হয় তো উপহাস করিবেন, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থকার মাত্রেই সমান সৌভাগ্যশালী নহেন; গৌরব সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যাহা হউক আমি সাহিত্যের আদর্শ প্রকাশ করিতেছি, সকলে অবহিত হইয়া পাঠ করুন। ভাষার প্রথম রচনা পদ্য, সেই জন্যই আমি প্রথমে পদ্য প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম, তৎপরে ক্রমান্বয়ে গদ্য কাব্য,

† যোজন দুই প্রকার দৃষ্ট হয়। এক মতে ৮ হাজার গজে ১ যোজন; আর এক মতে ১৬ হাজার গজে এক যোজন। এইরূপ আর্য্যদিগের শাস্ত্রের কোন কোন প্রদেশে কেবল ভূ-খণ্ডের পরিমাণ নির্ণীত আছে; কোথাও বা ভুবনকোষ অর্থাৎ জল স্থল সর্ব্বাত্মক পদার্থ পিণ্ডের পরিমাণ করা আছে। ইহারও সূক্ষ্ম হিসাব ভবিষ্যতে দেখিতে পাইবেন। পাঠকবর্গ তাচ্ছিল্য করিবেন না।

নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি প্রকাশ করিব।

অমিত্রাক্ষর লেখার আদর্শ।

শৈলধন্বা পার্ণোকরণ।

ত্রিদৃক্ বিগানাকর্ণি শৈলেশ কন্যকা
বিগত জীবিতা সতী পিতৃ নিকেতনে,
শূলোপরি শৈলধন্বা গ্রন্থিয়া সে বপু
নাচে,—পদ ভরে টল মল করে ধরা।
দর্শনি পাণ্ডবায়ন চক্রে খণ্ড খণ্ড
করি ফেলে ধরা পৃষ্ঠে—দূর দূরান্তরে।
তার পরে পুরীমোহ কর্ণ সীমন্তিনী
উদ্ভবিলা পর্ব্বতেশ গেহে, শৈলপত্র
লয়ে সদা শৈলধন্বে পূজে, ঋষিকেশে
পাইবার আশে। রদহীন বৃদ্ধ—হায়,
সম্বন্ধিলা, পাগল মহেশে, কাকোদর
শোভে যার শিরে। ভুশ্চ্যবন আদি দেব
সকলে মিলিয়া পাত্র, আনিল সভায়।
বৃষভ পাল্কী, নাহি বরারক কণ্ঠে,
না আছে বক্তত্র, নাহি পরিধেয় চীর।
কালের সর্ব্বাঙ্গে কাল, পুরীমোহ কর্ণে,
শুভ্র কান্তি শুভ দাতা উন্মাদ উমেশ।
বিভিল উমায়, দেয় সবে হুলু ধ্বনি।

এখন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সকলের প্রিয় বলিয়াই উপরি উক্ত বিষয় উদ্ধৃত করিলাম।

অমিত্রাক্ষার লেখকের প্রতি উপদেশ।

১। সম্মুখে এক খানি অভিধান খুলিয়া বসিবে, বাছিয়া বাছিয়া অপ্রসিদ্ধ আভিধানিক শব্দ সঙ্কলন করিয়া সন্নিবেশ করিবে।

২। যত কূটার্থ করিতে পার, তাহা সাধ্য মতে ত্রুটী করিবে না।

৩। অন্বয় করিবার নিয়ম গুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে।

৪। অলঙ্কারের দোষের ছড়াছড়ী করিবে।

মিত্রাক্ষরের অদর্শ।

চল চল প্রিয় সখী চঞ্চল চরণে,
নতুবা নিশ্চয় হবে তোমার মরণে।
তোমার মরণে আমি কতই কাঁদিব,
হাউ হাউ করে কেঁদে চক্ষু ফুলাইব।
পড়িবে সর্ব্বদা চক্ষে জল টস্ টস্,
নাসিকা করিবে সদা ফস্ ফস্ ফস্।
ঝাড়িব নাসিকা আমি শত শত বার
ছন্ ছন্ করিবে নাক, সর্দ্দি হবে আর।
অধিক লিখিতে হলে পুঁথি বেড়ে যায়,
মরোনা মরোনা সখী, হায় হায় হায়।

মিত্রাক্ষর লেখকের প্রতি উপদেশ।

১। প্রতি ছত্রে যেন ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকে।

২। অর্থ থাকুক বা না থাকুক, শেষ কথা টানিয়া মিলাইয়া দিবে।

৩। ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিবে না, সমুদায় লেখা হইলে অভাবও থাকিবে না, পাঠক টানিয়া ভাব বাহির করিবেন।

গদ্যলেখার আদর্শ।

বসুন্ধরা নিস্তব্ধা, কেননা সন্ধ্যাসমাগতা, তৎকরণক অন্ধকারাবৃতা প্রেতিনী সদৃশা কিম্ভূতা জন্তু বিশেষা

দর্শনে ভীতা; সুতরাং নিস্তব্ধা। চিত্ত ভয়াতুরতাচ্ছন্ন, এতৎভাবাপন্ন চিত্ত ভয়বিহ্বল না হইবে কেন? সমাগত সন্ধ্যা নিতান্ত সহজ সন্ধ্যা নহে, অমানিশির সমাগম। ঘোরা দ্বিপ্রহরা বিভাবরীগতে আর্য্যগৃহস্ত গৃহে নৃমুণ্ড-মালিনী কপালিনী শিবমোহিনী মহাকাল হৃদিবিলাসিনী রণোন্মত্তা শ্যামা মায়ের আবির্ভাব হইবে।

গদ্যলেখকের প্রতি উপদেশ।

১। সরল লিখিবার চেষ্টা করিলে ঠকিবে।

২। উৎকৃষ্ট শব্দ ব্যবহারে কৃপণতা করিবে না।

৩। এক ধার হইতে বর্ণন করিয়া যাইবে, লাগে তীর, না লাগে তুক্কা।

৪। বিশেষণের শ্রাদ্ধ করিবে।

৫। এক নিশ্বাসে যত খানি দৌড় দিতে পার, যাইয়া ছাঁপ ফেলিবে অর্থাৎ ছেদ দিবে।

আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই, যে বুদ্ধিমান হইবে সে দুকথায় বুঝিয়া লইতে পারিবে। মূর্খের ধন্দ লাগিবে, তার সন্দেহ কি?

সাহিত্যিক তরঙ্গের মধ্যে ঔপ-ন্যাসিক ও নাট্য স্রোত আজ কাল অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমা-ন্বয়ে আমি তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিতেছি। আমার এই প্রলাপ সাগর প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকে আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবেন, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি--আমি পাগল, জ্ঞান কাণ্ড বিবর্জ্জিত। শাস্ত্রকারেরা কবি ও পাগলকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এ কথায় এমন কেহ মনে করিবেন না যে, আমি কবি শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য পাগল বলিয়া পরিচয় দিলাম। তবে আমার এই সকল পাগ্‌লামীর পরিচয়ে কেহ আমাকে কবির শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বধীনতা দিলাম। যাহা হউক এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করি।

উপন্যাস লেখার অদর্শ।

বরবর্ণিনী হাসিলেন,—সুলোচনা আবার হাসিলেন,—ওষ্ঠের সীমাদ্বয় কিঞ্চিৎ ফেরালো হইল। কি মধুর হাসি,—পাঠক চেয়ে দেখ, ছিঃ—তুমি এমন বদ্‌রসিক,—এমন সময়ে চক্ষের পলক ফেলিলে! তোমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ—আমি কি করিব। আমি তোমাকেই দেখাইবার জন্য এত যত্ন করিয়া, যুবতীকে এত অনুরোধ করিয়া একটু হাসাইলাম। কাল পলক আসিয়া সে সময়ে তোমার চক্ষুকে অধিকার করিল,— এখন আমার দোষ দিলে চলিবে কেন? এখন পাঠক অন্য দিকে চল, আর কিছু নুতন দেখিতে পাইবে।

দেবালয়ে ঘণ্টা বাজিল,—আবার

বাজিল,—সকলে তটস্থ হইয়া দেবালয়ের দিকে দৌড়িতে লাগিল। আবার ঘণ্টা বাজিল,—আবার তিনবার বাজল,—কেন এত বাজে? বলিতে বলিতে আবার তিন বার বাজিল। পাঠক কিছু বুঝিতে পারিলে? উপন্যাসে এমন বাজিয়া থাকে—দরকার নাই, তথাপি বাজিবে, তোমার ইচ্ছা না হয়, কানে আঙ্গুল দিয়া থাক, কিন্তু তথাপি বাজিবে। পাঠক কহিলেন,—বাজুক, আমার তায় কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

উপন্যাস লেখকের প্রতি উপদেশ।

যুবক! তোমার উপন্যাস লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে? হইতে পারে,—এ তোমাদেরই কাজ, কিন্তু আমার এই উপদেশ কয়টীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিবে,—খুব বাহবা পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১। আর যাহা কিছু পার, না পার, মধ্যে মধ্যে পাঠককে লইয়া বিলক্ষণ টানাটানী করিবে। এমন করিবে, পাঠক যেন চোর দায় ধড়া পড়িয়াছেন। তুমি নিজে আবোল তাবোল বকিবে কিন্তু তাহার সাফাই করিবার জন্য পাঠককে সং সাজাইতে কসুর করিবে না।

২। আলঙ্কারিক দিগের পুনরুক্তি দোষকে দোষ বলিয়া গ্রাহ্য করিবেনা। যত পুনরুক্তি করিবে, তত আসর জমিবে।

৩। ব্যাকরণের মস্তকে পদাঘাত না করিলে তোমার উপন্যাস ভাল হইবেনা।

৪। বঙ্গভাষাকেই একমাত্র অবলম্বন করিলে লেখা ভাল হইবে না, ভাষান্তরের আশ্রয় লইবে।

সকল নিয়মই যদি এই স্থানে লিখিয়া শেষ করি, তবে আমি যে অলঙ্কার গ্রন্থ প্রস্তুত করিতেছি, তাহা কেহ ক্রয় করিবে না। সেই জন্যই আর আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করিব না। সময় অল্প,—অন্য বিষয়ের অবতারণা করি।

নাটক লেখার আদর্শ।

কমলিনী। বলি—ও কি করিতেছ?

অধর। ভাত খাইতেছি।

কম। ভাত খাইবার বুঝি আর সময় পেল না! রাত্রি কত হয়েছে,—শীঘ্র ভাত থুয়ে ওঠ,—চল শুয়ে দু,দণ্ড আয়েস করা যাক।

অধর। তথাস্তু—(অমনি উঠিলেন)।

আর লিখিতে হইলে ভদ্র রুচির বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে সুতরাং লিখিলাম না, লেখকদিগকে নিয়ম কয়টী শিখাইয়া দিলেই কার্য্য হইবে।

নাটক লেখকের প্রতি উপদেশ।

যুবক! তুমি নাটক লিখিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছ! বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, নচেৎ তোমার মত লোকেদের হাতে এমন কার্য্যের ভার

পড়িবে কেন? যাহা হউক উপদেশ কয়টী অবহিত হইয়া শ্রবণ কর;—

১। অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতার যত পরিচয় দিতে পারিবে, ততই নাটক ভাল হইবে। সে বিষয়ে তুমি সংকুচিত হইলে চলিবে না। তোমাকে আমি উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

বঙ্গদেশের প্রধান নাটককারের গ্রন্থ গুলি পাঠ করিলেই তোমার জ্ঞান জন্মিবে। বল দেখি—তাহার কোন্ খানি সুপাঠ্য? কোন্ খানি তুমি গুরুজনের নিকট বসিয়া পাঠ করিতে পার? কোন্ খানি তুমি পাঠ করিবার জন্য তোমার সরলা সহধর্ম্মিণীর হাতে দিতে পার? তুমি স্পষ্টাভিধানে বলিবে—'এক খানিও না'; কিন্তু বাজার বিক্রী খুব। নাটক লিখিতে হইলে সভ্যতার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া অসভ্যের আসরে নামিবে, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২। অস্বাভাবিক বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। একবার সাক্ষাতেই প্রণয়ীযুগলকে পাগল করিতে হইবে। প্রণয়ী সাহেব হইলে প্রণয়িনীকে প্রথম দর্শনেই বিবি সাজাইতে হইবে। না পার—তোমার বিবেকে নিবারণ করে, তোমার বিবেক লইয়া ধুইয়া খাও,—তোমার নাটক ভাল হইবে না।

৩। যেখানে যে গল্পটী শুনিবে, বাটী আসিয়া তাহা নোটবুকে লিখিয়া রাখিবে। সময় বুঝিয়া নাটক মধ্যে সেই সমস্ত ছাড়িতে পারিলেই সকলে সন্তুষ্ট হইবেন।

৪। যদি নাটক মধ্যে কোন সাহেবকে আনিয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে পার, তাহা হইলে আর বাহবার সীমা থাকিবে না।

৫। আমাদের বীরতা নাই, কিন্তু মুখে যার পর নাই বীরতা দেখাইতে হইবে।

৬। বঙ্গীয়া স্ত্রীলোকের হাতে শতমুখী দিয়া পুরুষের বাপ নির্ব্বংশ করাইতে পারিলে দর্শকের হাসির সীমা থাকিবে না।

সব লিখিলে কাজ চলিবে কেন, সুতরাং এই খানেই নাটক সম্বন্ধে বিশ্রাম।

দেশীয় সংবাদ পত্র।

দেশীয় সংবাদ পত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিলে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকে; এই জন্য এ বিষয়ের অবতরণা করা গেল।

কোন ভাষায় রীতিমত শিক্ষিত না হইয়া কখন সেই ভাষায় কোন প্রস্তাব লেখা যায় না। বঙ্গ ভাষার সংবাদ পত্র সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়াও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র চালান যাইতে পারে।

কেহ কেহ কহিতে পারেন, মাতৃভাষায় ইহা এক প্রকার চলিতে পারে; সে কথা নিতান্ত অন্যায়।

আমরা এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা আমাদের দেশীয় সংবাদ পত্র গুলি পাঠ করিয়া দেখুন্। অনেক গুলি সংবাদ পত্র নিতান্ত ভাষা জ্ঞান শূন্য ব্যক্তির হস্তে পড়িয়াছে, এবং তন্মধ্যে অধিকাংশই লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। দুঃখের কথা কি বলিব, সংবাদ পত্র মধ্যে এমন সকল প্রস্তাব স্থান প্রাপ্ত হয়, যাহা আদৌ সংবাদ পত্রের উপযোগী নহে। কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষকে গালিদিতে পারিলেই কাগজের গৌরব, ইহাই অধিকাংশ সম্পাদকের ধ্রুব জ্ঞান হইয়াছে। যদি কেহ উপযুক্ত সম্পাদক হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি আমার এই উপদেশ বাক্য গুলি শ্রবণ করুন।

১। যাহাতে ছাপা পরিস্কার রূপে না উঠে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে।

২। রুল ও লাইন প্রভৃতি যত আঁকা বাঁকা হয়, ততই ভাল।

৩। বর্ণাশুদ্ধি যত অধিক থাকিবে, ততই কাগজ গৌরবের হইবে।

৪। প্রস্তাবের কিয়দংশ পাঠ করিতে করিতে অবশিষ্ট অংশ খুজিয়া পাওয়া যাইবে না। আবার অন্য প্রস্তাব পাঠ করিতে করিতে ২। ৩ পৃষ্ঠা পরে পূর্ব্ব প্রস্তাবের অবশিষ্ট অংশ পাঠকের চক্ষে পড়িয়া ধাঁধা লাগিবে।

৫। দুই একটী প্যারেগ্রাফের অর্থ সঙ্গতি না হইলে ভাল হয়।

৬। অমুক ব্যক্তি বেশ্যাসক্ত, অমুকের এত দেনা, অমুক সুরাপায়ী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপার লিখিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

৭। যাহা মনে আসিবে, তাহাই লিখিবে,কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না।

৮। সাধারণের গুণ অন্বেষণ করিবে না, কেবল দোষ অনুসন্ধান করাই স্থির সংকল্প করিবে।

৯। প্রতি কথায় স্বার্থসিদ্ধির মুর্ত্তি প্রকাশ করিতে ক্রটী করিবে না।

১০। প্রতি সংখ্যায় গবর্ণমেণ্টের উপর এক হাত চাই, কিন্তু এক বার হাতে পাইলে মাথায় করিবে।

১১। যাহাকে অদ্য কটূক্তি করিলে কল্য প্রয়োজন হইলে তাহাকে পূজা করিবে।

১২। ভাষায় যত গ্রাম্যতা দোষ হইবে, ততই গ্রাহক বাড়িবে।

অধিক লেখায় প্রয়োজন, নাই কতিপয় প্রসিদ্ধ পত্রিকাকে আদর্শ করিলেই সকল বুঝিতে পারিবে।

অদ্য এই পর্য্যন্ত।

বিমলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্ম কালের এই সময়টী কি মনোরম! সূর্য্য ডুবে নাই কিন্তু ঐ ডুবে। পৃথিবী একটী মনোহর বর্ণে বিমণ্ডিত; রাঙ্গা নয়, স্বর্ণ বর্ণ নয়, হরিৎ নয়—একটী মনোহর বর্ণ। আকাশ নির্ম্মল—সাদা আর কাল-মেঘে পূর্ণ। এক খানি সাদা মেঘ সংসারের রঙ্গ দেখিতে দেখিতে ছুটিতেছে। কিন্তু ঐ যা—মেঘ খানি ভাঙ্গিয়া গেল। ভগ্ন অংশ দ্বয় আর দুই খানি মেঘের সহিত মিলিল। না মিলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। প্রকৃতি সকলকে সতত মিলিতে শিখাইতেছে। জড় মেঘ বিচ্ছিন্ন হইল, কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ পরের দেহে নিজ দেহ ঢালিয়া দিল। এ সংসারে মিলনই স্বভাবসিদ্ধ। যাহা স্বভাবসিদ্ধ তৎসাধনই সুখ। মিলন জগতের প্রধান সুখ। তুমি মনুষ্য, তুমি সময়ে সময়ে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কর কেন? ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, কিছুই তোমার সঙ্গে আইসে নাই। তুমি যখন জন্মিয়াছিলে তখন মাতৃগর্ব্ভ হইতেই সম্পত্তি রাশি সঙ্গে লইয়া আইস নাই। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিও তোমার সহিত আইসে নাই। যাহাকে তুমি মুর্খ বা দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছ, তাহার জন্মবৃত্তান্তও অবিকল তোমার ন্যায়। জানিও তজ্জন্য কোন প্রভেদ হয় নাই। তবে কেন ধনবান্! তুমি দরিদ্রের সহিত মিলিতে চাহ না? কেন বিদ্বান্! তুমি মূর্খের সহিত সহবাস ইচ্ছা কর না?—মেঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার মেঘের সহিত মিলিল। এইরূপে মেঘমণ্ডলী মিলিয়া আকাশে বড় রঙ্গ করিতেছে। এক স্থানে কতকগুলি মেঘ সমবেত হইয়া ভয়ানক রাক্ষসের ন্যায় আকার ধারণ করিতেছে; অপর স্থানে মেঘ সকল মিলিত হইয়া তুষারাবৃত শ্বেত গিরির ন্যায় শোভা প্রদর্শন করিতেছে। ঝির ঝির করিয়া অনতি শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী পক্ষী শূন্যে উঠিতেছে, নাচিতেছে, উড়িতেছে, পড়িতেছে। একটী ক্ষুদ্র পক্ষী অনেক দূর উঠিল,—ঐ গেল—অদৃশ্য হইল। উচ্চে উঠিয়া পাখী পাখা ছাড়িয়া দিল—একেবারে অনেক দূর নামিয়া পড়িল। পাখী বুঝি দেখাইল—অধিক উঠিলে এইরূপে পড়িতে হয়।

এইরূপ সময়ে বিমলা এক আশৈশব পরিচিতা আত্মীয়ার আলয় হইতে নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন। অদ্য আত্মীয়া বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে বিমলাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটী লইয়া গিয়াছিলেন। বিমলা সমস্ত দিন

আত্মীয়া সহবাসে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে বাটী ফিরিতেছেন। এরূপ পল্লিগ্রামে নিতান্ত সম্পন্ন না হইলে, লোক জন সঙ্গে লইয়া বা যানাদি আরোহণে গমনাগমন প্রথা নাই। বিমলা একাকিনী আসিতেছেন। একাকিনী বলিয়া কিছু ভীতি ও ব্যস্ততা সহ চলিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিমলাও নিজালয় সন্নিহিত হইলেন। এমন সময় সহসা পার্শ্বস্থ প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ ভবন হইতে শব্দ হইল,—

"বিমলা! একবার আমাদের বাটীতে এসো।"

স্বর নারী কণ্ঠ নিঃসৃত। যে বাটী হইতে শব্দ সমুত্থিত হইল, তাহা সুশীলা নাম্নী বিমলার ক্রীড়া সহচরীর আলয়। সুশীলা ধনীর কন্যা। কিন্তু কালধর্ম্মে ও অদৃষ্ট চক্রে নিদারুণ দীনতা তাঁহাদিগকে বিদলিত করিতেছে। সুশীলা পিতৃহীনা। তাঁহার জননী এক সুপাত্র সন্ধান করিয়া তনয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন। মাতা কন্যা সহ অন্য উপায়াভাবে জামাতৃ গৃহে বাস করিতেন। কখন কদাচিৎ অবন্তীপুর আসিয়া আপনাদের জীর্ণ ভবন দেখিয়া যাইতেন। ইদানীং তাঁহারা অনেক দিন এখানে আইসেন নাই। বিমলা আহ্বান শব্দ শ্রবণে অনুমান করিলেন, হয়ত সুশীলা ও তাঁহার মাতা আসিয়াছেন। মনে বড় আনন্দ হইল। বিমলা ব্যস্ততা সহ প্রবেশ দ্বার দিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যা কাল, তাহাতে মন সুশীলার দর্শনাশায় উল্লসিত, সুতরাং বিমলা অন্য কিছুই লক্ষ্য করিলেন না, নচেৎ তিনি বুঝিতে পারিতেন, ভবনে জন সমাবেশের কোনই লক্ষণ নাই। যাহাই হউক বিমলা ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন কই কেহই নাই! প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—তথায়ও কেহ নাই তো!

বিমলা সভয়ে বলিলেন,—

"তোমারা কোথা গা?"

প্রান্তের প্রকোষ্ঠ হইতে শব্দ হইল,—

"এ দিকের ঘরে।"

বিমলা সেই দিকে চলিলেন।

প্রকোষ্ঠ গুলির অবস্থা অতি ভয়ানক। জীর্ণ, অসংস্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন। ভিত্তির ইষ্টক সমস্ত শ্বেতাবরণাচ্ছাদিত নহে। তাহাও লোনা ধরিয়া বিকৃত দশা প্রাপ্ত। তলদেশ বন্ধুর ও অপরিষ্কার। স্থানে স্থানে স্তূপাকার ইঁদুরের মাটী। অধিকাংশ জানালা ও দ্বারের কপাট শীতবাতাতপ সহ্য করিয়া চরমে নিকটস্থ কোন গৃহস্থের চুল্লী মধ্যে দেহ সমর্পণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সাধিত করিয়াছে। ফলতঃ রাত্রি কালে বিনা আলোকে তন্মধ্য

দিয়া গমন করা দুঃসাধ্য। বিমলা কিয়দ্দূর গিয়া আর যাইতে পারিলেন না। বলিলেন,—

"তোমারা কি প্রদীপ জ্বাল নি? যাই কেমন করে?"

প্রান্তের প্রকোষ্ঠ হইতে পুনরায় শব্দ হইল,—

"যে বিপদ্ মা! কিছুই মনে নাই।"

বিপদের কথা শুনিয়া বিমলার মনে হইল, সুশীলা বুঝি পীড়িতা হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি এতক্ষণ স্বয়ং আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। বিমলা সমস্ত প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করিয়া অতিকষ্টে যথাস্থানোদ্দেশে চলিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"কোন্ ঘরে গা?"

সম্মুখের প্রকোষ্ঠ হইতে উত্তর আসিল,—

"এইঘরে।"

বিমলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় কেহই নাই। বিমলার মনে বড় ভয় হইল। বলিলেন,—

"হাঁ গা কোন্ ঘরে গা?"

কোনই উত্তর হইল না। কিন্তু সহসা গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ হইয়া গেল। বিমলা দারুণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহই তাঁহাকে সাহস দিল না। অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া বিমলা রুদ্ধদ্বার উন্মোচনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—পারিলেন না। অধিক কাতর ভাবে ভীতিবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"কে আছ, আমাকে দ্বার খুলিয়া দেও।"

উত্তর নাই। কাকুতি মিনুতি করিলেন তথাপি উত্তর নাই। বিমলা উৎকণ্ঠা হেতু স্রোতস্বিনী মধ্যগত তৃণখণ্ডের ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই নির্জ্জন, অন্ধকার, অপরিস্কৃত প্রকোষ্ঠের মধ্যে পারাবত, চর্ম্মচটিকা ও মূষিকের পুরীষ রাশির উপর বিমলা উপবেশন করিলেন। লোচন যুগল দিয়া অশ্রুরাশি প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিঙ্কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিমলা সেই অবরোধে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কে জানে বিমলার অদৃষ্টে কি আছে? ভবিষ্যতের গূঢ়তম প্রদেশের ঘটনাবলী কে বলিতে পারে? যে পারে নিশ্চয়ই সে মনুষ্য হইতে উচ্চ জীব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে অবন্তীপুরের জমিদার বরদাকান্ত রায়ের অন্তঃপুরের একতম প্রকোষ্ঠ মধ্যে যুবক যুবতী রহিয়াছেন। যুবক—জমিদার বরদাকান্তের এক মাত্র

পুত্র, তাঁহার নাম রুদ্রকান্ত। যুবতী—তাঁহারই পত্নী, নাম মালতী। কমলার সহিত বাগ্দেবীর বিসম্বাদ চির প্রচলিত কথা;—রুদ্রকান্তের লক্ষ্মী শ্রী আছে সুতরাং তিনি ঘোর মূর্খ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় মূর্খতা তাদৃশ দোষের কথা নহে। কারণ অভিনব সভ্যতার প্রণালীতে মূর্খতাকে আবরিত করিবার অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। রুদ্রকান্ত সে সকল উপায় সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন না, তথাপি কোন ক্রমেই তাঁহাকে মূর্খ বলা যাইতে পারে না। কারণ যথোচিত বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার সভ্যতা ও বিদ্যা উভয়ই বাড়িয়াছে। সেই সময় হইতেই তিনি অপরিমিত সুরা-সেবন করিতে শিখিয়াছেন, কেশরাশিতে গন্ধদ্রব্য দিয়া তিন স্থানে সিঁথী কাটিতে শিখিয়াছেন, গণ্ডস্থলে নবোদ্ভ্রান্ত শ্মশ্রুরাজি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নেত্রদ্বয় চস্‌মা সমাচ্ছন্ন করিতে শিখিয়াছেন এবং চুরোটের ধূম সেবন করিতে অভ্যাস করিয়াছেন। তবে তিনি মূর্খ কিসে? বাস্তবিকও তিনি যে ইংরাজি শিখেন নাই, এমন বোধ হয় না। কারণ তিনি দ্বারবান্, চাকর প্রভৃতির সহিত কথা কহিতে হইলে ইংরাজি ব্যবহার করিতেন এবং পিতা প্রভৃতি গুরুজনের সহিত সাক্ষাৎ মাত্রেই "গুড-মর্নিং" বলিতেন, "সেক্‌হণ্ড" করিতে যাইতেন, ও বিরক্ত হইলে "ইষ্টুপিট্" বলিয়া গালি দিতেন। লেখা পড়ার কথা উঠিলে, যদি সহজে পলায়ন করিবার উপায় না পাইতেন, তাহা হইলে অনায়াসে "হামিণ্টনস্ প্যারাডাইজ্ লষ্ট্" গোলড্‌স্মিথস্ স্পেক্টেটর" প্রভৃতি পুস্তকের বাদানুবাদ করিতেন। সুতরাং বোধ হয় ইংরাজি ভাষায় তাঁহার সুন্দর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার সভ্যতা সম্মত নীতি শিক্ষা হয় নাই এমন নয়। কলিকাতায় অবস্থান কালে রুদ্রকান্ত সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন। তদ্ধেতু তিনি "স্ত্রী স্বাধীনতা" "ভ্রাতৃভাব" "প্রেম" প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় শব্দই শিখিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে কি করিতে বল? তাঁহার ক্রুটী কি? পাঠক! এ হেন ব্যক্তিকে যদি আপনি মূর্খ বা অসভ্য বলেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার বুঝিবার ভুল!

পিতা মাতার নিকট রুদ্রকান্তের আদরের সীমা নাই। তাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের ছেলের মত ব্যক্তি এই "বিশ্ব বাঙ্গালায়" আর কখনই জন্মে নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, রুদ্রকান্ত কালেজের "ঔট্"। সুতরাং আনন্দ ও গর্ব্বের সীমা নাই। সে

যাহাই হউক এই আশ্চর্য্য জীবের দৌরাত্ম্যে অবন্তীপুর তোলপাড়, তথাকার লোক সমস্ত অস্থির ও জ্বালাতন।

মালতীর প্রকৃতি সর্ব্বথা রুদ্রকান্তের বিপরীত। তিনি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র তনয়া। কলিকাতা সন্নিহিত কোননগরে তাঁহার পিত্রালয়। পিতা মাতার যত্নে মালতী যে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, "কালেজের ঔট্" রুদ্রকান্তের হাতে না পড়িলে, তাহা বিশেষ গৌরবের হইত সন্দেহ নাই। স্বামীকে অন্তরের সহিত ভক্তি করা যে স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম মালতী তাহা বিশিষ্ট রূপে জানিবেন। এজন্য রুদ্রকান্তের স্বভাব যৎপরোনাস্তি কলুষিত জানিয়াও মালতী কদাচ তাঁহাকে ঘৃণা বা অবহেলা করিতেন না, বরং যাহাতে রুদ্রকান্তের স্বভাব সংশোধিত হয়, মালতী কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টা করিতেন। রুদ্রকান্ত মালতীকে দুই চক্ষের বিষ দেখিতেন। মালতীর সহিত কিয়ৎকাল সহবাস করিতে হইলে তিনি ঘোর বিপদ ও যাতনা বোধ করিতেন। স্বামীর বিরাগভাজন হওয়া অপেক্ষা রমণী জীবনে আর অধিক শাস্তি কিছুই হইতে পারে না। সুশীলা মালতীর ক্লেশের সীমা ছিল না। অন্ন, বস্ত্র, দাস, দাসী কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু রমণী জীবনের সার সম্পত্তি স্বামী প্রেম কেমন অমূল্য সামগ্রী তাহা তিনি কখন জানিতে পারিলেন না। এ ঘোর মর্ম্মবেদনার কে প্রতিবিধান করিবে? কে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্বামীর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিবে? পল্লিগ্রামের জমিদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। রুদ্রকান্ত একটী ছোট খাট সিরাজ উদ্দৌলা। কাহার সাধ্য তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কয়? প্রজাগণ নীরবে রুদ্রকান্তের উৎপাত সহ্য করিত। উপায় নাই। যদি বা জনরব এবম্বিধ কঠিন শাসন সমস্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া কখন পুত্রের কোন নিন্দার কথা পিতার কর্ণে বহন করিত, তিনি তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিতেন,—"যৌবনে এ দোষ অপরিহার্য্য।" সুতরাং মালতীর ক্লেশের প্রতিবিধান অসাধ্য।

মালতী পরমা সুন্দরী। তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ। ছয় বৎসর কালে তিনি সুবর্ণ পিঞ্জরের পক্ষিণীর ন্যায় রুদ্রকান্তের অবরোধ নিরুদ্ধা। ইতিমধ্যে এক দিনও তাঁহার স্বামী তাঁহাকে প্রীতিপূর্ণ পবিত্র সম্বোধনে সম্ভাবিত করেন নাই। সে ত দূরের কথা—ঘৃণা সূচক কথা ও অভদ্র জনোচিত ব্যবহার ভিন্ন তিনি কদাচ ভদ্র ব্যবহার করেন নাই। মালতীর এ অসুলভ সৌন্দর্য্য, পবিত্র সরলতা, মোহিনী বিনয়, অসাধারণ শিষ্টাচার প্রভৃতি সদগুণ সমস্তই ভস্মে ঘৃত হইল! দিবা-

কর চির মেঘাচ্ছন্ন রহিল— এ বিমল কমলকে প্রফুল্ল করিল না ; পৌর্ণমাসীর শশধর জলদ পটল সমাচ্ছন্ন হইল—চকোরিণী আনন্দ পাইল না ; প্রচণ্ড বাত্যা কাক চক্ষু সন্নিভ মেঘরাশি অপসারিত করিল—তৃষিতা চাতকিনী বরিধারা পাইল না। এ কুসুমের অনুপম শোভা যে দেখিবার সে দেখিল না ;—ইহার সন্তোষ সংশাধিনী সৌরভ যে সম্ভোগ করিবার সে সম্ভোগ করিল না। আশ্রয় তরুর শাখা নাই, এ লতিকা কিরূপে শোভা বিকাশ করে ? মালতীর দুঃখের সীমা নাই।

অদ্য মালতীর পরম সৌভাগ্য ! রুদ্রকান্ত অদ্য তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছেন। ভুলিয়া আসেন নাই, তাহা হইলে আসিবা মাত্র চলিয়া যাইতেন। না—ভুলিয়া আসেন নাই। মালতীর পর্য্যঙ্কে রুদ্রকান্ত উপবিষ্ট। মালতী সভয়ে, অবনত মস্তকে, অথচ সানন্দিত ভাবে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

মালতী ধীরে ধীরে মধুর স্বরে কহিলেন,—

"আজ যে দাসীর প্রতি বড় অনুগ্রহ।"

রুদ্রকান্ত রুক্ষভাবে বলিলেন,—

"আমার দরকার আছে।"

মালতী কহিলেন,—

"হতভাগিনীর অদৃষ্ট কি এত প্রসন্ন হবে যে, তুমি বিনা প্রয়োজনেও আমার নিকট আসিবে ? যাহাই হউক আমার নিকট যে তোমার কোন দরকার পড়িয়াছে, ইহাও আমার পরম সৌভাগ্য ; যদি তোমার প্রয়োজন আমাদ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পরমানন্দের বিষয়।"

মালতী যাহা বলিলেন, রুদ্রকান্তের শ্রুতি যুগলে তাহা প্রবেশ লাভ করে নাই ; তাঁহার মন অন্যদিকে ছিল। কহিলেন,—

"ওহো আমার বরাত আছে, শীঘ্র যাইতে হইবে।"

মালতী বলিলেন,—

"যদি দয়া করে এসেছ, একটু ব'স। দাসীর ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটে না।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"আমার এত সময় নাই যে, তোমার সঙ্গে এখানে বসে বৃথা সময় কাটাই।"

মালতী বলিলেন,—

"ভাল, তোমার যদি কাজ থাকে, কি সময় না থাকে, তা হলে আমি এমন বলি না যে, তুমি সব বন্ধ করে আমার কাছে থাক। সে সুখ বিধাতা এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে লেখেন নাই।"—

রুদ্রকান্ত রাগত স্বরে বলিলেন,—

"আঃ ! আমি তোর নাকে কান্না

শুন্তে আসি নাই। জ্বালাতন করিস্ না।”

মালতীর চক্ষে জল আসিল। কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—

“তুমিই তো আমাকে কাঁদাচ্চ। এ কান্না তুমি না শুন্‌লে কে শুন্‌বে?”

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

“আমার এত দায় নাই। আমি ঢের শাস্ত্র পড়িয়াছি। স্ত্রীর কাছে দিবারাত্রি বসে থাক্‌তে হবে, এমন কোন শাস্ত্রে লেখে নি।”

মালতী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—

“তা লিখে নি কিন্তু স্ত্রীকে সতত কাঁদাতে হবে, এমন ব্যবস্থা লিখেছে কি?”

মহাবিরক্তির সহিত রুদ্রকান্ত কহিলেন,—

“ভাল জ্বালা! কে তোরে ধরে মার্‌ছে যে তুই কাঁদছিস্?”

মালতী সজল নয়নে কহিলেন,—

“এ কষ্টের চেয়ে মার ভাল।”

রুদ্রকান্ত পরুষ ভাবে কহিলেন,—

“কষ্ট টা কি? যে তোর বিদ্যা না জানে তার কাছে গিয়ে কষ্টের কথা বলে কাঁদিস, তার দয়া হবে। আমি সব জানি; তোর বাপ্ বেটা মহা পাঁপুরে। তার বাপের জন্মে লক্ষ্মীর সংস্থান নাই। আমি যেই তোরে দয়া করে বিয়ে করেছি সেই তোর এত সুখ। তাই এত গহনা, ভাল কাপড়, চাকর, নফর, সুখের সীমা নাই, এততেও তোমার কষ্ট। ওরে আমার কষ্ট রে! এতেও যদি মন না উঠে, তবে না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে ঘুঁটে কুড়িয়ে খাওগে।”

মালতীর চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রুদ্রকান্ত মহা বিরাগের সহিত কহিলেন,—

“আমি এলেম ওঁর কাছে, তা ভাগ্য বলে মানা নেই, আবার উপরন্তু কান্না! থাক্ তোর কান্না নিয়ে,—আমি চল্লেম।”

বদনোম্মুক্ত করিয়া মালতী দেখিলেন, রুদ্রকান্ত যথার্থই চলিয়া গিয়াছেন। সরলা অভিমান-প্রবণ-হৃদয়া মালতী যথায় দাঁড়াইয়ছিলেন, তথায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইবে? কে তাঁহার মর্ম্মবেদনা বুঝিবে?

রুদ্রকান্ত চলিয়া গেলেন। পাষাণ সহজে অঙ্কিত হয় না। রুদ্রকান্তের হৃদয়ে মালতীর রোদন জন্য অঙ্কপাত হইল না। তিনি চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া কি মনে হইল। আবার ফিরিয়া মালতীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কহিলেন,—

“যে দৌরাত্ম্য—এখানে এসে তো কাজের কথা হবার উপায় নাই। আমি

যা জিজ্ঞাসা করি আগে তার উত্তর দে, তারপর সারাদিন বসে কাঁদিস্।”

মালতী বস্ত্রাঞ্চল অপসারিত করিলেন,—দেখিলেন রুদ্রকান্তের মূর্ত্তি আরও রুদ্র। অবার বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া মালতী রোদন করিতে লাগিলেন। রুদ্রকান্ত কহিলেন,—

“আস্পর্দ্ধা দেখ। যদি ভাল চাস্ তবে আমি যা বলি শোন্।”

মালতী সেই ভাবেই বলিলেন,—

“বল।”

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

“এক স্যুট গহনার আমার আজ্ এখনই দরকার। তোর গহনা আমাকে এখনই দে।”

মালতী কহিলেন,—

“গহনায় আমার কোন দরকার নাই। তুমি এখনই সব অলঙ্কার নিয়ে যাও।”

এই বলিয়া চাবির রিং ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিলেন। রিং মধ্যে অনেকগুলি চাবি ছিল। ব্যস্ত, অস্থির প্রকৃতি রুদ্রকান্ত বাক্সের যথার্থ চাবি না লাগাইয়া অপর চাবি লাগাইলেন। বাক্স খুলিল না। জড় প্রকৃতি সম্পত্তির বাধ্য নহে, সে সামান্য জ্ঞান তাঁহার নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন বাক্স, চাবি, রিং সকলই তাঁহার পিতার জমিদারির প্রজা। আর একটী চাবি লাগাইলেন। তাহাতেও হইল না। এ রূপে কয়েকটী অযথার্থ চাবি দিয়া বাক্স খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। এক সঙ্গে বাক্স, চাবি ও মালতী তিনেরই উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ জন্মিল। দেহে যত শক্তি আছে একটী অন্য চাবি লাগাইয়া, তাহার উপর সেই সমস্ত প্রয়োগ করিলেন। বাক্সের কলটী একেবারে খারাপ হইয়া গেল। না ভাঙ্গিলে খুলিবার আশা রহিল না। রুদ্রকান্তের অসহ্য ক্রোধ জন্মিল। তিনি বাক্সের উপর “ড্যাম” বলিয়া এক প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। বাক্সের কাঠ মজবুত ছিল— ভাঙ্গিল না। লাভের মধ্যে হস্তে ভয়ানক আঘাত লাগিল। আরও রাগ হইল।

এই সময় মালতী বলিলেন,—

“বাক্সের যথার্থ চাবি লাগান হয় নাই।”

রুদ্রকান্ত বাক্স হস্তে লইয়া মালতী সন্নিধানে আসিয়া উগ্র ভাবে কহিলেন,—

“কি আমার সহিত তামাসা ?”

মালতী সবিনয়ে কহিলেন,—

“আমি তামাসা করি নাই। তুমি হয় ত চাবি ভুল করিয়াছিলে।”

রাগের উপর রাগ। রুদ্রকান্তের ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিল। কম্পান্বিত কলেবরে কহিলেন,—

“এত বড় সাহসের কথা ? আমি

ভুল করিয়াছিলাম! আমার সহিত সমান উত্তর?"

এই বলিয়া পাষণ্ড, নৃশংস রুদ্রকান্ত মালতীর নবনীত নিভ সুকোমল, সুন্দর বদনে তিন চারি পদাঘাত করিয়া বাক্স হস্তে প্রস্থান করিলেন!!! মালতী ধরাবলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পাদুকার আঘাতে বদনের স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। সেই সকল ক্ষতমুখ প্রবাহিত রুধির ধারায় মালতীর অনুপম বদন-মণ্ডল প্লাবিত হইল!!!

যদি আমাদের সমাজের যাবতীয় নিয়ম অতি সুব্যবস্থা ও বিজ্ঞতার সহিত নির্ব্বাচিত হইয়াছে স্বীকার করা যায়; যদি আমাদের ধর্ম্ম প্রণালী, রীতি, নীতি সমস্তই নিরতিশয় উচ্চ সভ্যতার আদর্শ স্থল বলিয়া গ্রাহ্য করা যায়; যদি আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ভূতলস্থ সমস্ত জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়; তথাপি আমাদের পরিণয় সম্বন্ধীয় ঘোর অদূরদৃষ্ট, অবিমৃষ্য, নৃশংস নিয়ম চিরদিন আমাদের জাতীয় কলঙ্ক স্বরূপ থাকিবে। জাতীয় ইতিহাস অনন্তকাল এই নৃশংস কাহিনী জন সমাজে প্রচারিত করিবে, তাহার পৃষ্ঠ হইতে ইহা অপসারিত হইবে না। এ ঘোর শোকাবহ অত্যাচার আর কিছুতেই লুক্কায়িত রহিবে না। এই জঘন্য নিয়ম নিবন্ধন আমাদের সমাজ-কুসুমে অসততা কীট নিয়ত বাস করে, এই জন্যই অতুলনীয়া বঙ্গ সীমন্তিনীগণ পবিত্র মানব জন্ম পশুবৎ অতিবাহিত করে, এই জন্যই স্বর্গীয় শান্তি ও আনন্দ বঙ্গীয় পরিবার মধ্যে স্থান পায় না, এই জন্যই পবিত্র প্রণয় রূপ পরম সুখ বঙ্গীয় হৃদয়ে কদাচ প্রবেশ করে না, এই জন্যই নিত্য নিত্য শত শত নর নারী স্ব স্ব স্বর্গীয় সততা বিসর্জ্জন দিয়া পাপের পঙ্কিল হ্রদে প্রবেশ করে। এই ভয়ানক কঠোর সমাজ শাসন হইতে অহরহঃ বঙ্গদেশে যে কত শত অভিনব অনর্থপাত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? কে জানে কত দিনে বঙ্গীয় সমাজ হইতে এই নিষ্ঠুর নিয়ম বিদূরিত হইবে? কে জানে কত কালে বঙ্গ পরিবার সন্তোষ, আনন্দ ও সুখের নিলয় রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে? উচ্চশিক্ষাই দেশের প্রকৃত উন্নতির লক্ষণ নয়, দীর্ঘ উপাধি সমূহও উন্নতির কারণ নয়, অথবা আমরা যে কিছু লইয়া গৌরব করি তৎসমস্তও প্রকৃত উন্নতি নয়। প্রকৃত উন্নতি সামাজিক সুব্যবস্থার সহিত দৃঢ় সম্বদ্ধ। তৎসাধনে যত্নশীল হও উন্নতি লাভ করিবে, নচেৎ দেখিতে মনোরঞ্জন হইলেও পূর্ণ বিকসিত পলাস কুসুমবৎ এ উন্নতি অন্তঃসার বিহীন হইয়া থাকিবে।

রসসাগর।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যখন মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায়ের পিতৃব্য দিগ্‌বিজয় চন্দ্র রায় বারাণসী ধামে ছিলেন, সেই সময়ে রসসাগর একবার কাশী যান। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে দিগ্‌বিজয় চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন ;—"ছি ছি ছি অমৃত পান করেছিলাম কেনে ?" রসসাগর নিম্ন লিখিত রসভাব সমন্বিত কবিতা পূরণ করিলেন ;—

জলে কিম্বা স্থলে মৃত্যু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।
মহামন্ত্র মহেশ আপনি দেন কানে॥
মলে জীব হয় শিব যৎক্ষণে তৎক্ষণে।
দেবগণের আর্ত্তনাদ আত্ম অভিমানে॥
অবিমুক্ত বারাণসী মহিমা কে জানে।
অমর মরিতে চাহে আসি কাশী স্থানে॥
মলে হতেম দেবের দেব আনন্দ কাননে।
ছিছিছি অমৃত পান করেছিলাম কেনে॥

দেবগণ অমৃত পানে অমর হইয়াছেন ; কাশীতে মৃত্যু হইলে দেবের দেব মহাদেব হইয়া অনন্দ কাননে বিরাজিত হইতে পারিতেন, অমর বলিয়া দেব ভাগ্যে তাহা ঘটে না এই জন্য দেবগণ আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন—কেন না বুঝিয়া অমৃত পান করিয়াছিলাম। এরূপ চমৎকার রসভাব সম্বলিত দ্রুত রচনা অতি বিরল।

একদা রাজ সভায় প্রশ্ন হইল, "মক্ষিকার পদাঘাতে কাঁপে ত্রিভুবন।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

যশোদার কোলে কৃষ্ণ তুলিলা জৃম্ভন।
লীলাছলে মুখ মধ্যে দেখান ত্রিভুবন॥
পতঙ্গ পরশে ব্যস্ত মস্তক হেলন।
মক্ষিকার পদাঘাতে কাঁপে ত্রিভুবন॥

কপালে মক্ষিকা বসায় কৃষ্ণ মস্তক কাঁপাইলেন, সেই সঙ্গে তাঁহার মুখ মধ্যে প্রতিবিম্বিত ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল। এরূপ কূটভাব আনিয়া দ্রুত রচনা মধ্যে সন্নিবেশ করা সাধারণ ক্ষমতার বিষয় ।

একবার প্রশ্ন হইল "নিশিতে উদয় পদ্ম কুমুদিনী দিনে।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা পলো মনে।
চক্রান্ত করিল চক্রী চক্র আচ্ছাদনে॥
অকালেতে কাল নিশি উভয়ে না জানে।
নিশিতে উদয় পদ্ম, কুমুদিনী দিনে॥

অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হইলে অর্জ্জুন শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আগামী কল্য সূর্য্যদেব অস্ত যাইবার পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ করিব, যদি কৃতকার্য্য না হই, তবে অগ্নি প্রবেশ দ্বারা আত্ম জীবনের বিনাশ করিব। জয়-

দ্রথ বধ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে কৌশল করিয়া ছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহাই অবলম্বন করিয়া রসসাগর এই কবিতা পূরণ করিয়াছিলেন।

একদা রসসাগর কিঞ্চিৎ বেতন প্রার্থনায় রাজবাটীর প্রধান কর্ম্মচারী রামমোহন মজুন্দারের নিকট উপস্থিত হইলেন। মজুন্দার অতি সুচতুর লোক ছিলেন। রাজ বাটীর অবস্থা তখন অতি মন্দ হইয়াছিল, অতি সুকৌশলে মজুন্দার রাজসংসার চালাইতেছিলেন। সে সময়ে অনেকের টাকা পাইতে বিলম্ব হইত। ওদিকে প্লৌডিন সাহেব ব্রহ্মোত্তর কাড়িয়া লইয়া তাহার উপর কর সংস্থাপন করিতেছিলেন, এজন্যও রাজকোষে বিশেষ টানাটানী পড়িয়াছিল। রসসাগর মজুন্দার মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া টাকা চাহিবা মাত্র তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আর মেনে পারিনে।" রসসাগর উহার এই পাদ পূরণ করিলেন;—

দাঁড়ী ফেলে শ্রী ফেঁদে,
শুধু হাঁড়ী পাত বেঁধে,
বচনে রেখেছি ছেঁদে,
　আশা ভঙ্গ করি নে।

সবে বলে মজুন্দার,
দয়া ধর্ম্ম কি তোমার.
তিরস্কার পুরস্কার,
　তৃণ বোধ করি নে॥

খরচ চাই দণ্ড দণ্ড,
না মেলে রজত খণ্ড,
কোন রূপে কর্ম্ম কাণ্ড,
　ক্রিয়াপণ্ড করি নে।

কোম্পানী কুপিত তায়,
দ্বাদশ সূর্য্য উদয়,
প্লৌডিনের পূর্ণ দায়,
　বাঁচিওনে মরিনে॥

সকলি দুঃখের পড়া,
এ রস সাগরে চড়া,
শ্রীচরণ ছায়া ছাড়া,
　কারো ধার ধারি নে।

তিন দিকে তিন তেতম্বা,
কিবা হবে অপরম্বা,
কূল দেও জগদম্বা,
　আর মেনে পারি নে॥

একদা রাজীব লোচন নামা কোন ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া রসসাগরকে করিলেন "ঘোল খাবে হরিদাস, কড়ি দেবে নিধি।" রসসাগর পূরণ করিলেন;—

আত্ম বিস্মৃত হলে রাজীব লোচন।
এ রস সাগরে দেখে ভঙ্গ দশানন॥
কাটা গেল সেনাপতি দেখা দিল বিধি।
ঘোল খাবে হরিদাস, কড়ি দেবে নিধি॥

উপরিউক্ত শ্লোকটীর মর্ম্ম এই;— পূর্ব্বে রাজ সংসার ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাল ইজারা দেওয়া হইত। কাহাকে

কিছু টাকা দিতে হইলে রাজকর্ম্মচারিবর্গ ইজারদারের উপর বরাত্ চিটী কাটিতেন। ইজারদারেরা পাওনাদারের প্রয়োজন বুঝিয়া ডিস্কৌণ্ট বাদ দিয়া বরাতি টাকা দিতেন। রাজীব লোচন একজন ইজারদার। তাঁহার উপর রসসাগর এক দশটাকার বরাত চিটী আনিয়া দিলেন। রাজীব লোচন কহিলেন, 'যদি এই দশ টাকার ছয় টাকা বাদ দিয়া চারি টাকা গ্রহণ করেন, তবে এখনি দিতে পারি।' রসসাগর ইহাতে ইতস্ততঃ করায় রাজীবলোচন বিরক্ত হইয়া কহিলেন "ঘোল খাবে হরিদাস কড়ি দেবে নিধি।" অর্থাৎ রাজা শ্লোক শুনিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া নিজের তৃপ্তিসাধন করিবেন, কিন্তু টাকা দিবার সময় আমি। ইহাতে রসসাগর ঐ শ্লোক পূরণ করিলেন। ভঙ্গ দশানন অর্থাৎ দশটাকা ভঙ্গ হইল। কাটা গেলেন সেনাপতি দেখা দিলেন বিধি অর্থাৎ দশাননের মধ্যে সেনাপতি (ষড়াণন) কাটা পড়িলেন, এবং বিধি (চতুর্ম্মুখ) দেখা দিলেন। দশটাকার মধ্যে ছয় টাকা বাদ গেলে, চারিটাকা মাত্র থাকিল। এই শ্লোক শুনিয়া রাজীবলোচন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দশটাকাই দিলেন।

একদা এই কূটপ্রশ্ন হইল, "পিতার বৈমাত্র সেত আমার বৈমাত্র।" প্রশ্ন যতই কঠিন হউক না কেন, রসসাগরের ক্ষমতার নিকট উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। তিনি পূরণ করিলেন;—।

তর্পণ কালেতে কুন্তী প্রকাশিল মাত্র।
উচ্চরবে কাঁদে তবে মাদ্রীর দুই পুত্র॥
ষড়-যন্ত্রে বধিলাম এমন সুপাত্র।
পিতার বৈমাত্র সে ত আমার বৈমাত্র॥

মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কর্ণ বধের পর এ কথা কুন্তী পঞ্চপাণ্ডবের নিকট প্রকাশ করেন। কর্ণ এ সম্পর্কে মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলেন। আবার ও দিকে সূর্য্যনন্দন অশ্বিনীকুমার কর্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলেন। অশ্বিনীকুমার যুগলের পুত্র নকুল ও সহদেব। সুতরাং কর্ণ নকুল সহদেবের বৈমাত্রেয় এবং তাঁহাদের পিতারও বৈমাত্রেয়। রসসাগরের ঈদৃশী ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ক্রমশঃ।

জ্ঞাতব্য চিকিৎসা।

টাইফএড্ জ্বর।

এই জ্বর আরম্ভ হইয়া মৃত্যু বা উপশম পর্য্যন্ত একজ্বর অবস্থায় সমভাবে থাকে, জ্বরের বিরাম হয় না, গাত্র অতিশয় উষ্ণ, নাড়ী অতিশয়

দ্রুতগামী হয়। এ জ্বর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ;—(১) ইহাতে জ্বর প্রকাশের পর অনেকদিন পাকস্থলী বা অন্ত্রের উত্তেজন অনুভব করা যায় না। (২) এই জ্বরের প্রথম অবস্থা হইতে শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উত্তেজন সতত অনুভূত হয়। (৩) এই জ্বর প্রকাশ হইবার পরেই লক্ষণাদি এত প্রবল হয় ও ত্বরায় প্রকাশ হয় যে, রোগী যেন কোন উত্তেজক মাদকবৎ দ্রব্য সেবন করিয়াছে বোধ হয়।

প্রথম শ্রেণী।—জ্বরের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়াতে এই জ্বরের প্রারম্ভ কাল জানিতে পারা যায় না। ক্রমে ক্ষুধা মান্দ্য, শরীর দুর্ব্বল ও অবসন্ন, পরিশ্রমে অস্পৃহা, শিরঃপীড়া, হস্ত পাদাদিতে অল্প বেদনা, শ্রান্তি এবং কখন কখন শীত হয়, জিহ্বা আর্দ্র ও পরিষ্কার, ত্বক স্বাভাবিক উষ্ণ, মুখমণ্ডলের জ্যোতির হ্রাস, নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুতগমী হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। কিছুদিন এইরূপ থাকিয়া পরে বমনেচ্ছা জন্মে এবং সবুজবর্ণ বমনও হইতে থাকে। ত্বক শুষ্ক এবং উষ্ণ, জিহ্বা লেপযুক্ত, অতিশয় শিরঃ-পীড়া, উদর স্ফীত ও বেদনা যুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে তরল মল নির্গত হয়। বক্ষস্থলে, উদরে ও পৃষ্ঠদেশে বসন্তের প্রথমাবস্থার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ফুস্ কুড়ি দৃষ্ট হয়। ঐরূপ ফুস্কুড়ি কাহার বা অল্প, কাহার বা অধিক হয়। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উহা অদৃশ্য হইতে থাকে। ক্রমশঃ উদরাময় বাড়িয়া উদরাধ্মান হয়, মল তরল এবং জলবৎ হয়, রোগী প্রলাপ বকে, ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহে, শ্লেষ্মার সহিত রক্ত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী ক্রমে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় দুই চারি দিবস থাকার পর, জিহ্বা কোমল, স্ফীত, পার্শ্বে ক্ষত এবং মধ্যে ছিদ্রে হইতে পারে ; নাশারন্ধ্র ও দন্তমাড়ী হইতে রক্ত স্রাব হয় ; রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে ; কখন কখন রোগীর প্রচুর ঘর্ম্ম ও ত্বক শীতল হয়। এই রূপে রোগ উৎকট হইয়া উঠে এবং অবশেষে রোগী প্রাণত্যাগ করে।

দ্বিতীয় শ্রেণী।—এই জ্বরের প্রথমে শরীর অল্প অল্প অসুস্থ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পায়। তখন শিরঃ পীড়া, উদর বেদনা ও স্ফীত, তৃষ্ণা, বমনেচ্ছা, বমন, জিহ্বা আর্দ্র, শ্বেতবর্ণ ও পুরু হয়, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না, রোগী প্রলাপ বকে, প্লীহা এবং যকৃত স্থলে বেদনা হয়, ঘন ঘন শ্বাস, অল্প অল্প কাশী ও কখন কখন ফুস্ফুসে প্রদাহ উপস্থিত হয়, মুত্র সঞ্চিত হইয়া মুত্রাশয় ফোলে, দিবা-

রাত্রে মৃত্তিকাবৎ দুই তিন বার ভেদ হয়। এই অবস্থা ৭ দিন হইতে ১০ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। পরে জিহ্বা শুষ্ক, তাহার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ এবং মধ্যে পিঙ্গল বর্ণ হয়। ক্রমে অন্ত্র হইতে রক্ত শ্রাব হয় ও পরিশেষে অন্ত্র ছিদ্র হইয়া রোগীর প্রাণবিনষ্ট হয়। এই শ্রেণীর জ্বর ১৪ দিন হইতে ২৪ দিন স্থায়ী হয়।

তৃতীয় শ্রেণী।—এই জ্বর প্রথমেই প্রবল হইয়া উঠে। তখন অত্যন্ত মাথা ধরে, সর্ব্বদাই বমন হয়, রোগী প্রলাপ বকে, জিহ্বা শুষ্ক ও লাল-বর্ণ হয় এবং উদর স্ফীত ও তাহাতে বেদনা হয়। হরিতালের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট পাতলা পাতলা দুর্গন্ধময় মল অনবরত নিঃসৃত হয়। তৎপরে রোগ টাইফস্ অবস্থায় পরিণত হয় এবং রোগীর জীবন শেষ হয়।

কারণ।

এই পীড়া পৃথিবীর সকল স্থানেই হয়। অন্যান্য দেশাপেক্ষা ভার-তবর্ষে ইহার প্রাদুর্ভাব অল্প। এই পীড়া যৌবনাবস্থায় অধিক আক্রমণ করে। শরৎ কালে ও অতিশয় গ্রীষ্মের সময় এই পীড়া প্রবল হইতে দেখা যায়। কোন কোন চিকিৎসা শাস্ত্র বিশারদ মহাত্মা স্থির করিয়াছেন যে, যৎকালে বায়ুতে অধিক পরিমাণে অজোন থাকে, তখন এই পীড়ার সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়। পচা দৈহিক বা উদ্ভিদ্ পদার্থ হইতে যে এক প্রকার বাষ্প বিনির্গত হয়, তাহা আহার্য্য দ্রব্যের সহিত উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক রক্তের সহিত মিলিত হইয়া এই জ্বর উৎপন্ন করে। পীড়িত বা পচা মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলেও এ পীড়া জন্মিতে পারে। এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় টাইফস্, রিল্যাপ্সিং ফিবর অর্থাৎ পৌনঃ পুনিক জ্বর ও বসন্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে।

ভাবী ফল।

এ রোগের পরিণাম প্রায়ই মন্দ। প্রথমবস্থা হইতে উত্তম রূপ চিকিৎসা হইলে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। কবিরাজেরা ইহাকে বাত শ্লে-ষ্মিক জ্বর বলিয়া থাকেন। টাইফ-এড্ জ্বরের সহিত সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ সমূহের সমধিক একতা পরি-দৃষ্ট হয়। কিন্তু সান্নিপাতিক জ্বরের কতকগুলি লক্ষণ নিউমোনিয়ার সহিত সমান। সুতরাং টাইফএড্ জ্বরকে সান্নিপাতিক জ্বরও বলা যায় না। এ দেশে টাইফএড্ অপেক্ষা সান্নিপা-তিক জ্বর অধিক হইতে দেখা যায়, এজন্য সান্নিপাতিক জ্বরের বিবরণ স্বতন্ত্র করিয়া পরে লেখা গেল।

চিকিৎসা।

লক্ষণানুসারে চিকিৎসা করিলে শীঘ্র রোগ উপশমিত হইতে পারে।

যখন যে যে লক্ষণ বিদ্যমান থাকে; তখন সেই সেই লক্ষণের প্রতীকার করিয়া চিকিৎসা করিলে সুচিকিৎসা হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায়—উদরাময় প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে—আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলের কন্‌জেশ্চন বা রক্তাধিক্য দূর ও যকৃতের ক্রিয়া উত্তমরূপে চালাইবার জন্য, অন্ত্র উত্তেজিত না হয়, এরূপ অনুগ্র বিরেচক ব্যবহার করা বিধেয়। এজন্য কার্ব্বনেট অব ম্যাগনেশিয়া ৩০ হইতে ৪০ গ্রেণ বা রেউচিনি ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ অথবা ক্যাষ্টর অএল্ ১ ছটাক পরিমাণ সেবন করাইয়া উদর পরিস্কার করাইবে। পূর্ণ বয়স্কের প্রতি এই নিয়ম। বালক ও বৃদ্ধের প্রতি ইহার অর্দ্ধেক মাত্রা ব্যবস্থা। জ্বরের উষ্ণতা ও রক্ত সঞ্চালনের উদ্দীপকতা নিবারণ জন্য—

লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস	২ড্রাম
নাইট্রিক ইথর	১ ,,
পরিশ্রুত জল	৬ ঔন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ ছটাক পরিমণে সেবন করিতে দিবে।

যদি ইহাতে উপকার না হয় তাহা হইলে ইনফিউজন্ ডিজিটেলিস্ প্রয়োগ করা সুব্যবস্থা অর্থাৎ —

ডিজিটেলিস্	৩০ গ্রেণ
স্ফুটীত পরিশ্রুত জল	১০ ঔন্স

পাত্র মধ্যে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত আবৃত রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ২ ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে সেবন করাইবে।

উদরাময় ও বমন নিবারণার্থে—

খড়ি	৩০ গ্রেণ
খদির	২০ ,,
দারুচিনি	২০ ,,
মিছরি	২০ ,,

মিশ্রিত করিয়া পাঁচ পুরিয়া করিবে এবং ১ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া সেবন করাইবে। অথবা—

ভাইনম্ গ্যালিসাই	১ ঔন্স
সোডি বাইকার্ব্ব	২ ড্রাম
রক্ত চন্দনের ফাণ্ট	১২ ঔন্স

মিশ্রিত করিয়া ১বা ২ঘণ্টান্তর অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করিতে দিবে।

যদি ইহাতে উপকার না হয়, তবে

টিংচার ওপিয়াই	১ ড্রাম
ডাইলুট হাইড্রোসিনিক এসিড	॥০ ড্রাম
পরিশ্রুত জল	৮ ঔন্স

মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে।

কিন্তু যদি রোগী প্রলাপ বকে তবে উদরাময় নিবারণের চেষ্টা করিবে না। উদরে বেদনা থাকিলে উষ্ণ জলের সেক্ অথবা ব্যথিত স্থলে তার্পিন মাখাইয়া সেক দিবে। আবশ্যক হইলে শর্ষপের পুল্টিস্ লাগাইবে। উদরের স্ফীততা থাকিলে জলে হিঙ্গু গুলিয়া লংটিউব বা দীর্ঘ নলীর দ্বারায় পিচ-

কারি দিবে এবং উদরোপরে তার্পিণ তৈল মালিস করিবে। কৈশিক নাড়ী হইতে মধ্যে মধ্যে যদি অল্প রক্ত-শ্রাব হয়, তাহা নিবারণের বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজনীয় নহে। যদি অধিক পরিমাণে রক্তশ্রাব হয়, তাহা হইলে,

টিংচার ফেরিমিউরেট	১ ড্রাম
ফটকিরি	॥০ ,,
পরিশ্রুত জল	৬ ঔন্স

একত্র মিলিত করিয়া ১,২ বা ৩ ঘণ্টান্তর আধ ছটাক মাত্রায় সেবন করাইবে। মস্তিস্কে রক্তাধিক্য হইলে, মস্তক মুণ্ডন করাইয়া শীতল জল বা বরফ লাগাইবে। নিদ্রার অভাব হইলে,—

হাইড্রেড অব্ ক্লোরাল	১ ড্রাম
জল	॥০ ছটাক

একত্র সেবন করাইবে। একবারে উপকার না হইলে ২। ৩ বার দিবে। রোগীকে নিম্নলিখিত বলপ্রদ ঔষধ সেবন করাইবে,—

এসিড নাইট্রোমিউরেটিক	২ ড্রাম
ভাইনম পার্টু গ্যালিকম	১
টিং কার্ডেম্ কম্পাউণ্ড	৪ ড্রাম
ডিককৃট সিনকোনা	১২ ঔন্স

একত্রিত করিয়া এক ঔন্স পরিমাণে দিবসে ৩ বার সেবন করাইবে।

পথ্য।

সাগু, এরারুট, দুগ্ধ ও মাংসের কাথ প্রভৃতি লঘু ও বলকারক দ্রব্য সুসেব্য।

সান্নিপাতিক জ্বর।

এই জ্বর আরম্ভ হইয়াই ভয়ানক হইয়া উঠে, শরীর অতিশয় উষ্ণ, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগামী হয়। মৃত্যু বা উপশম পর্য্যন্ত জ্বর আদৌ ছাড়ে না। কখন শীত কখন বা দাহ হয়, অস্থি এবং সন্ধিতে বেদনা হয়, চক্ষে জল ঝরে এবং তাহা ঘোলাটে বা রক্তবর্ণ হয়, কর্ণ সন্ সন্ করে, কণ্ঠে সুয়াপোকা দংশনের ন্যায় ক্লেশানুভব হয়, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাশী, শ্বাস, অরুচি ও ভ্রম হয়। জিহ্বা কাল এবং কাঁটা কাঁটা, এবং অল্প অবস হয়। ষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু রক্তপিত্ত এবং কফ মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়; মাথা ঘোরে ও বেদনা হয়, তৃষ্ণা হয়, নিদ্রা হয় না, হৃদয়ে বেদনা হয়, নাড়ী সকল পাক পায়, উদর ভারি হয়, বোল্তা বা ভেমরুল কামাড়াইলে যেরূপ ফোলে, সর্ব্ব শরীরে তদ্রূপ রক্তবর্ণ চাকা চাকা বাহির হয়, কথা কহিতে পারে না, এবং কণ্ঠায় ঘড় ঘড়ী শব্দ হয়। এত কঠিন রোগ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু রোগীর শরীর তথাপি কৃশ হয় না। এই সমুদায় লক্ষণ একবারে প্রকাশ হয় না, যদি হয় তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। ১৪ দিন, ১৮ দিন বা ২২ দিন রোগের স্থিতি কাল। এই কাল মধ্যে মৃত্যু বা নীরোগ অবধারিত।

কারণ।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াধিক্য, যকৃত বা পিত্তের উগ্রতা ও শ্লেষ্মার প্রাদুর্ভাব এই কারণ সমস্ত সমবেত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। কুদ্রব্য ভোজন, অপরিমিত পরিশ্রম, ও দূষিত বায়ু সেবনেও এ পীড়া জন্মিতে পারে।

ভাবী ফল।

প্রায় মন্দ। প্রথমাবস্থা হইতে উত্তম রূপ চিকিৎসা করিলে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। রোগের প্রথম অবস্থায় যদি কর্ণ মুল ফোলে, তাহা হইলে রোগীর আর রক্ষা নাই। মধ্য অবস্থায় কর্ণমুল ফুলিলে বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করিলেও করিতে পারে। শেষ অবস্থায় কর্ণ মূল ফুলিলে ত্বরায় আরোগ্য হইতে পারে। এই জ্বর যদি একবার নরম পড়িয়া পুনরায় হঠাৎ ভয়ানক রূপে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা দুঃসাধ্য।

চিকিৎসা।

প্রথমে রোগীকে এক ছটাক ক্যাষ্টর অএল দ্বারা দাস্ত করাইবে, অন্ত্র পরিষ্কার হইলে ;—

লাইকর এমোনি এসিটেটিস্	২ ড্রাম
স্পিরীট ইথর নাইট্রিক	২ ,,
ভাইনম্ ইপিকাক	২ ,,
টিংচার হায়হায়থাস্	২ ,,
ডিকক্‌ট সিন্‌কোমা	৬ ঔন্স,

এক কাচ্চা পরিমাণে দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

অধিক ব্যবহারেও ফলপ্রদ না হইলে এ ঔষধ ত্যাগ করিবে। যদি অতিরিক্ত তৃষ্ণা থাকে তবে ডাইল্যুট সলফিউরিক এসিড্ পাঁচ বা দশ মিনিম, মিছ্‌রির জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। যদি মাথা ধরা বা চক্ষু রক্তবর্ণ থাকে তবে মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক শীতল জল বা বরফ প্রদান করিবে। বেদনা ও শ্বাস নিবারণার্থ বক্ষ স্থলে টার্পিণ তৈল মর্দ্দন করিবে। রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিবে। হিম বা অতিরিক্ত তাপ কিছুই লাগিতে দিবে না।

সৈন্ধব লবণ ও মরীচ চুর্ণ সমভাগ আদার রসে মর্দ্দন করিয়া রোগীর মুখ মধ্যে লাগাইয়া রাখিবে।

সৈন্ধব, শ্বেত মরীচ অর্থাৎ সজিনার বীজ, সরিষা, কুড়, গোমুত্র, দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রোগীকে নস্য করিতে দিবে।

জাতী পুষ্পের পত্র, সৈন্ধব, প্রবাল, বচ, দুর্ল্লভা, গোমুত্র দ্বারা মর্দ্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিবে।

যদি উক্ত মুষ্টিযোগ সমস্ত প্রয়োগ করিয়া কোন প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ অধিক দিন সেবন করিতে দিবে।

এসিড্ নাট্রো মিউরোটিক   ২ ড্রাম

টিংচার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড ১ ঔন্স
টিংচার নক্স ভূমিকা ২৪ ফোটা
ইনফিউজন ক্যালম্বা ৬ ঔন্স
এক কাচ্চা পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

পথ্য।

প্রথমে রসের পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। রসের পরিপাক হইলে লঘু অথচ শ্লেষ্মা বৃদ্ধি না করে এমন দ্রব্য, যথা বেদানা, কিচ্‌মিচ্‌, সাগু, এরারুট, মাংসের ক্বাথ প্রভৃতি দ্রব্য অল্প পরিমাণে বারে বারে সেবন করিতে দিবে। পরে ক্রমে রোগের উপশম দেখিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

বনফুল।

তৃতীয় সর্গ

যমুনার জল করে থল্ থল্
কলকলে গাহি প্রেমের গান।
নিশার আঁচোলে, পড়ে ঢোলে ঢোলে
সুধাকর খুলি হৃদয় প্রাণ!
বহিছে মলয় ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে
নুয়ে নুয়ে পড়ে কুসুমরাশি
ধীরি ধীরি ধীরি ফুলে ফুলে ফিরি
মধুকরী প্রেম আলাপে আসি!
আয় আয় সখি! আয় দুজনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথিলো মালা
ফুলে ফুলে আলা বকুলের তলা
হেথায় আয়লো বিপিনবালা!
নতুন ফুটেছে মালতীর কলি
ঢলি ঢলি পড়ে এ ওর পানে!
মধুবাসে ভুলি প্রেমালাপ তুলি
অলি কত কিযে কহিছে কানে।
আয় বলি তোরে, আঁচলটি ভোরে
কুড়া না হোথায় বকুল গুলি
মাধবীর ভরে লতা নুয়ে পড়ে
আমি ধীরি ধীরি আনিলো তুলি।
গোলাপ কত যে ফুটেছে কমলা
দেখে যা দেখে যা বনের মেয়ে!
দেখ্‌ সে হেথায় কামিনী পাতায়
গাছের তলাটি পড়েছে ছেয়ে।
আয় আর হেথা ওই দেখ ভাই
ভমরা একটি ফুলের কোলে,
কমলা ফুঁ দিয়ে দেনালো উড়িয়ে
ফুলটা আমিলো নেব যে তুলে।
পারিনালো আর, আয় হেথা বসি
ফুল গুলি নিয়ে দুজনে গাঁথি!
হেথায় পবন, খেলিছে কেমন
তটিনীর সাথে আমোদে মাতি!
আয় ভাই হেথা, কোলে রাখি মাথা
শুই এক টুক্ ঘাসের পরে
বাতাস মধুর বহে ঝুরু ঝুর
আঁখি মুদে আসে ঘুমের তরে!
বল্ বনবালা, এত কিলো জ্বালা!
রাত দিন তুই কাঁদিবি বসে
আজো ঘুম ঘোর ভাঙ্গিল না তোর
আজো মজিলিনা সুখের রসে!

তবে যালো ভাই! আমি একেলাই
রাশ্ রাশ্ করি গাঁথিয়া মালা
তুই নদী তীরে কাঁদ্‌গেলো ধীরে
যমুনারে কহি মরম-জ্বালা!

আজো তুই বোন! ভুলিবিনে বন?
পরণ কুটীর যাবিনে ভুলে?
তোর ভাই মন, কেজানে কেমন।
আজো বলিলিনে সকল খুলে?"

"কিবলিব বোন! তবে সব শোন!"
কহিল কমলা মধুর স্বরে
"লভেছি জনম, করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভোরে!

ভুলিব সে বন?—ভুলিব সে গিরি?
সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে?
মৃগেযাব ভুলে—কোলে লয়ে তুলে
কচি কচি পাতা দিতাম ছিঁড়ে!
হরিণের ছানা একত্রে দুজনা
খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াত সুখে!
শিঙ্গ ধরি ধরি খেলা করি করি
আঁচল জড়িয়ে দিতাম মুখে!
ভুলিব তাদের থাকিতে পরাণ?
হৃদয়ে সে সব থাকিতে লেখা?
পারিব-ভুলিতে যতদিন চিতে
ভাবনার আহা থাকিবে রেখা?

আজ কত বড় হয়েছে তাহারা
হয়ত আমার না দেখা পেয়ে
কুটীরের মাঝে-খুজে খুজে খুজে
বেড়াতেছে আহা ব্যাকুল হয়ে!

শুয়ে থাকিতাম দুপর বেলায়
তাহাদের কোলে রাখিয়ে মাথা
কাছে বসি নিজে গল্প কত যে
করিতেন আহা তখন মাতা

গিরিশিরে উঠি, করি ছুটাছুটি
হরিণের ছানা গুলির সাথে
তটিনীর পাশে দেখিতাম বসে
মুখ ছায়া যবে পড়িত তাতে!

সরসী ভিতরে ফুটিলে কমল
তীরে বসি ঢেউ দিতাম জলে
দেখি মুখ তুলে—কমলিনী দুলে
এপাশে ওপাশে পড়িতে ঢলে!

গাছের উপরে—ধীরে ধীরে ধীরে
জড়িয়ে জড়িয়ে দিতেম লতা
বসি একাকিনী আপনা আপনি
কহিতাম ধীরে কত কি কথা!
ফুটিলে গো ফুল হরষে আকুল
হতেম, পিতারে কতেম গিয়ে!
ধরি হাত খানি আনিতাম টানি
দেখাতেম তাঁরে ফুলটি নিয়ে!
তুষার কুড়িয়ে—আঁচল ভরিয়ে
ফেলিতাম ঢালি গাছের তলে
পড়িলে কিরণ, কত যে বরণ
ধরিত, আমোদে যেতাম গলে!
দেখিতাম রবি বিকালে যখন
শিখরের শিরে পড়িত ঢোলে
করি ছুটাছুটি-শিখরেতে উঠি
দেখিতাম দূরে গিয়াছে চোলে!
আবার ছুটিয়ে যেতাম সেখানে
দেখিতাম আরো গিয়াছে সোরে!
শ্রান্ত হয়ে শেষে, কুটীরেতে এসে
বসিতাম মুখ মলিন কোরে!
শশধর-ছায়া পড়িলে সলিলে
ফেলিতাম জলে পাথর কুচি
সরসীর জল, উঠিত উথুলে
শশধর-ছায়া উঠিত নাচি,

ছিল সরসীতে—এক হাটু জল
ছুটিয়া ছুটিয়া যেতেম মাঝে
চাঁদের ছায়ারে, গিয়া ধরিবারে
আসিতাম পুনঃ ফিরিয়া লাজে!

তট দেশে পুনঃ ফিরি আসি পর
অভিমান ভরে ঈষৎ রাগি
চাঁদের ছায়ায় ছুঁড়িয়া পাথর
মারিতাম, জল উঠিত জাগি!

যবে জলধর শিখরের পর
উড়িয়া উড়িয়া বেড়াত দলে
শিখরেতে উঠি বেড়াতাম ছুটি
কাপড় চোপড় ভিজিত জলে!

কিছুই-কিছুই —জানিতাম নারে
কিছুই হায়রে বুঝিতাম না
জানিতাম হারে—জগৎ মাঝারে
আমরাই বুঝি আছি কজনা!

পিতার পৃথিবী, পিতার সংসার
একটি কুটীর পৃথিবী তলে—
জানিনা কিছুই ইহা ছাড়া আর
পিতার নিয়মে পৃথিবী চলে!

আমাদেরি তরে উঠেরেতপন
আমাদেরি তরে চাঁদিমা উঠে
আমাদেরি তরে বহেগো পবন
আমাদেরি তরে কুসুম ফুটে!

চাইনা জেয়ান, চাইনা জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে।
বনের কুসুম—ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতেম বনের কোলে।

জানিব আমারি পৃথিবী ধরা—
খেলিব হরিণ শাবক সনে—
পুলকে হরষে হৃদয় ভরা,
বিষাদ ভাবনা নাহিক মনে।

তটিনী হইতে তুলিব জল,
ঢালি ঢালি দিব গাছের তলে
পাখীরে বলিব "কমলা বল"
শরীরের ছায়া দেখিব জলে!

জেনেছি মানুষ কাহারে বলে!
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে!
জেনেছিরে হায় ভাল বাসিলে
কেমন আগুণে হৃদয় জ্বলে!

এখন আবার বেঁধেছি চুলে
বাহুতে পরেছি সোনার বালা!
উরসেতে হার দিয়েছি তুলে,
কবরীর মাঝে মণির মালা!

বাকলের বাস ফেলি রাছি দূরে—
শত শ্বাস ফেলি তাহার তরে,
মুছেছি কুসুমরেণুর সিঁদূরে
আজো কাঁদে হৃদি বিষাদ ভরে!

ফুলের বলয় নাইক হাতে
কুসুমের হার ফুলের সিঁথি—
কুসুমের মালা জড়ায়ে মাথে
স্মরণে কেবল রাখিনু গাঁথি!

এলো এলো চুলে ফিরিব বনে
রুখো রুখো চুল উড়িবে বায়ে!
ফুল তুলি তুলি গহনে বনে
মালা গাঁথি গাঁথি পরিব গায়ে!

হায়রে সেদিন ভুলাই ভালো!
সাধের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে!
এখন মানুষে বেসেছি ভালো—
হৃদয় খুলিব মানুষ কাছে!

হাসিব কাঁদিব মানুষেরি তরে
মানুষের তরে বাঁধিব চুলে—
মাখিব কাজল আঁখিপাত ভরে
কবরীতে মণি দিবরে তুলে!

মুছিনু নীরজা! নয়নের ধার,
নিভালাম সখি হৃদয় জ্বালা!
তবে সখি আয় আয় দুজনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথিলো মালা!

এই যে মালতী তুলিয়াছ সতি!
এই যে বকুল ফুলের রাশি;
জুঁই আর বেলে—ভরেছ আঁচলে
মধুপ ঝাঁকিয়া পড়িছে আসি!

এই হলো মালা আর নালো বালা
শুইলো নীরজা! ঘাসের পরে।
শুন্‌চিস্ বোন্! শোন্ শোন্ শোন্!
কে গায় হোথায় সুধার স্বরে!
জাগিয়া উঠিল হৃদয় প্রাণ!
স্মরণেরজ্যোতি উঠিল জ্বলে!
ঘা দিয়েছে আহা মধুর গান
হৃদয়ের অতি গভীর তলে!
সেই যে কানন পড়িতেছে মনে
সেই যে কুটীর নদীর ধারে!
থাক্ থাক্ থাক্ হৃদয়বেদন
নিভাইয়া ফেলি নয়ন ধারে!

সাগরের মাঝে তরণী হতে
দূর হতে যথা নাবিক যত—
পায়-দেখিবারে সাগরের ধারে
মেঘলা মেঘ্‌লা ছায়ার মত!

তেমনি তেমনি উঠিয়াছে জাগি
অফুট অফুট হৃদয় পরে
কিদেশ কি জানি কুটীর দুখানি
মাঠের মাঝেতে মহিষচরে!

বুঝিসে আমার জনম ভুমি
সেখান হইতে গেছিনু চলে!
আজিকে তা মনে জাগিল কেমনে
এত দিন সব ছিলুম ভুলে।

হেথায় নীরজা! গাছের আড়ালে
লুকিয়ে লুকিয়ে শুনিব গান
যমুনাতীরেতে জ্যোছ্‌নার রেতে
গাইছে যুবক খুলিয়া প্রাণ!

কেও কেও ভাই? নীরদ বুঝি?
বিজয়ের* আহা প্রাণের সখা!
গাইছে আপন ভাবেতে মজি
যমুনা পুলিনে বসিয়ে একা!

যেমম দেখিতে গুণ ও তেমন
দেখিতে শুনিতে সকলি ভালো
রূপে গুণে মাখা দেখিনি এমন
নদীর ধারটি করেছে আলো!

আপনার ভাবে আপনি কবি
রাত দিন আহা রয়েছে ভোর!
সরল প্রকৃতি মোহন-ছবি
অবারিত সদা মনের দোর!

মাথার উপরে জড়ান মালা—
নদীরে উপরে রাখিয়া আঁখি!
জাগিয়া উঠেছে নিশীথ বালা
জাগিয়া উঠেছে পাপীয়া পাখী!

আয়নালো ভাই গাছের আড়ালে
আয় আরেকটু কাছেতে সরে
এই খানে আয় শুনি দুজনায়
কি গায় নীরদ সুধার স্বরে!

গান।

মোহিনী কল্পনে! আবার আবার—
মোহিনী বীণাটি বাজাও না লো!
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার
হৃদয়ে, শ্রবণে, জীবনে ঢালো!

* কমলাকে যিনি সংসারে আনেন।

ভুলিব সকল—ভুলেছি সকল
কমল চরণে ঢেলেছি প্রাণ!
ভুলেছি—ভুলিব—শোক অশ্রু জল
ভুলেছি বিষয়, গরব, মান!
শ্রবন, জীবন, হৃদয় ভরি
বাজাও সে বীণা বাজাও বালা!
নয়নে রাখিব নয়ন—বারি
মরমে নিবারি মরম-জ্বালা!
অবোধ হৃদয় মানিবে শাসন
শোক বারি ধারা মানিবে বারণ
কি যে ও বীণার মধুর মোহন
হৃদয় পরাণ সবাই জানে—
যখনি শুনি ও বীণার স্বরে
মধুর সুধায় হৃদয় ভোরে
কি জানি কিসের ঘুমের ঘোরে
আকুল করে যে ব্যাকুল প্রাণে!
কি জানিলো বালা! কিসের তরে
হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া উঠে!
কি জানি কি ভাব ভিতরে ভিতরে
জাগিয়া উঠেছে হৃদয় পুটে!
অফুট মধুর স্বপনে যেমন
জাগি উঠে হৃদে কি জানি কেমন
কি ভাব কে জানে কিসের লাগি!
বাঁশরীর ধ্বনি নিশীথে যেমন
সুধীরে গভীরে মোহিয়া শ্রবন
জাগায় হৃদয়ে কি জানি কেমন
কিভাব কেজানে কিসের লাগি।
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত এ মনে
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত স্মরণে
ঘুমন্ত পরাণ উঠেছে জাগি!
ভেবেছিনুহায় ভুলিব সকল
সুখ দুখ শোক হাসি অশ্রু জল
আশা, প্রেম যত ভুলিব—ভুলিব—
আপনা ভুলিয়া রহিব সুখে!
ভেবেছিনু হায় কল্পনা কুমারী
বীণা-স্বর-সুধা পিইয়া তোমারি
হৃদয়ের ক্ষুধা রাখিব নিবারি
পাশরি সকল বিষাদ দুখে!
প্রকৃতি শোভায় ভরিব নয়নে
নদী কল স্বরে ভরিব শ্রবনে
বীণার সুধায় হৃদয় ভরি!
ভুলিব প্রেম যে আছে এ ধরায়
ভুলিব পরের বিষাদ ব্যথায়—
ফেলে কিনা ধরা নয়ন বারি!
কই তা পারিনু শোভনা কল্পনে!
বিস্মৃতির জলে ডুবাইতে মনে
আঁকা যে মূরতি হৃদয়ের তলে
মুছিতে লো তাহা যতন করি!
দেখলো এখনো অবারি হৃদয়
মরম আধার হুতাশন ময়
শিরায় শিরায় বহিছে অনল
জ্বলন্ত জ্বালায় হৃদয় ভরি!
প্রেমের মুরতি হৃদয় গুহায়
এখনো স্থাপিত রয়েছে রে হায়!
বিষাদ অনলে আহুতি দিয়া
বল তুমি তবে বল কলপনে
যে মূরতি আঁকা হৃদয়ের সনে
কেমনে ভুলিব থাকিতে হিয়া।
কেমনে ভুলিব থাকিতে পরাণ
কেমনে ভুলিব থাকিতে জ্ঞেয়ান
পাষাণ নাহলে হৃদয় দেহ!
তাই বলি বালা! আবার—আবার
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার—
ঢালগো হৃদয়ে সুধার স্নেহ।

শুকায়ে যাউক সজল নয়ান
হৃদয়ের জ্বালা নিভুক হৃদে
রেখোনা হৃদয়ে একটুকু খান
বিষাদ বেদনা যে খানে বিঁধে।

কেনলো—কেনলো—ভুলিব কেনলো—
এত দিন যারে বেশেছিনু ভাল
হৃদয় পরাণ দেছিনু যারে—
স্থাপিয়া যাহারে হৃদয়াসনে
পূজা করেছিনু দেবতাসনে
কোন্ প্রাণে আজি ভুলিব তারে!—

দ্বিগুণ জলুক হৃদয় আগুণ।
দ্বিগুণ বহুক বিষাদ ধারা।
স্মরণের আভা ফুটুক দ্বিগুণ
হোক হৃদি প্রাণ পাগল পারা।

প্রেমের প্রতিমা আছে যা হৃদয়ে
মরম-শোণিতে আছে যা গাঁথা—
শত শত শত অশ্রু বারি চয়ে—
দিব উপহার দিবরে তথা।

এত দিন যার তরে অবিরল
কেঁদেছিনু হায় বিষাদ ভরে,
আজিও—আজিও—নয়নের জল
বরষিবে আঁখি তাহারি তরে।

এত দিন ভাল বেসেছিনু যারে
হৃদয় পরাণ দেছিনু খুলে—
আজিওরে ভাল বাসিব তাহারে
পরাণ থাকিতে যাবনা ভুলে

হৃদয়ের এই ভগন কুটীরে
প্রেমের দীপ করেছে আলা।—
যেনরে নিভিয়া না যায় কখনো
সহস্র কেনরে পাই না জ্বালা।

কেবল দেখিব সেই মুখ খানি
দেখিব সেই সে গরব হাসি।
উপেক্ষার সেই কটাক্ষ দেখিব
অধরের কোণে ঘৃণার রাশি।

তবু কল্পনা কিছু ভুলিব না!
সকলি হৃদয়ে থাকুক গাথা—
হৃদয়ে, মরমে, বিষাদ-বেদনা
যত পারেতারা দিক না ব্যথা।

ভুলিব না আমি সেই সন্ধ্যা বায়
ভুলিব না ধীরে নদী ব'হে যায়
ভুলিব না হায় সে মুখ শশি।
হব না—হব না—হব না বিস্মৃত,
যত দিন দেহে রহিবে শোণিত—
জীবন তারকা না যাবে খসি—

প্রেম গান কর তুমি কল্পনা!
প্রেম গীতে মাতি বাজুক বীণা।
শুনিব, কাঁদিব হৃদয় ঢালি!
নিরাশ প্রণয়ী কাঁদিবে নীরবে।—
বাজাও বাজাও বীণা সুধারবে
নব অনুরাগ হৃদয়ে জ্বালি!

প্রকৃতি শোভায় ভরিব নয়নে
নদী কলস্বরে ভরিব শ্রবনে
প্রেমের প্রতিমা হৃদয়ে রাখি
গাওগো তটিনী প্রেমের গান
ধরিয়া অফুট মধুর তান
প্রেম গান কর বনের পাখী"

কহিল কমলা "শুনেছিস্ ভাই
বিষাদে দুখে যে ফাটিছে প্রাণ!
কিসের লাগিয়া-মরমে মরিয়া
করিছে অমন খেদের গান?

কারে ভাল বাসে ? কাঁদে কার তরে ?
কার তরে গায় খেদের গান ?
কার ভাল বাসা পায় নাই ফিরে
সঁপিয়া তাহারে হৃদয় প্রাণ ?

ভাল বাসা আহা পায় নাই ফিরে !
অমন দেখিতে অমন আহা !
নবীন যুবক ভাল বাসে কিরে ?
কারে ভাল বাসে জানিস্ তাহা ?

বসেছিনু কাল ওই গাছ তলে
কাঁদিতে ছিলেম কত কি ভাবি—
যুবক তখনি, সুধীরে আপনি
প্রাসাদ হইতে আইল নাবি।

কহিল 'শোভনে ! ডাকিছে বিজয়
আমার সহিত আইস তথা।'
কেমন আলাপ ! কেমন বিনয় !
কেমন সুধীর মধুর কথা !

চাইতে নারিনু মুখ পানে তাঁর
মাটির পানেতে রাখিয়ে মাথা
শরমে পাশরি বলি বলি করি
তবুও বাহির হ'লনা কথা !

কাল হতে ভাই ! ভাবিতেছি তাই
হৃদয় হ'য়েছে কেমন ধারা !
থাকি, থাকি, থাকি, উঠিলে, চমকি
মনে হয় কার পাইনু সাড়া !

কাল হ'তে তাই মনের মতন,
বাঁধিয়াছি চুল করিয়া যতন,
কবরীতে তুলে দিয়াছি রতন,
চুলে সঁপিয়াছি ফুলেরমালা

কাজল মেখেছি নয়নের পাতে
সোনার বলয় পরিয়াছি হাতে
রজত কুসুম সঁপিয়াছি মাথে
কি কহিব সখি! এমন জ্বালা !

প্রাপ্তগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বীরবালা নাটক। (সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকবীর সিলিউকস এবং মগধেশ্বরের যুদ্ধ) শ্রীউমেশ চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ঢাকা-গিরিশ যন্ত্রে শ্রীমওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ইং ১৮৭৫। ১৫ ই জুলাই। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বাবু উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারে সর্ব্বত্র সুপরিচিত না হইলেও তন্মধ্যে নূতন লোক নহেন। তাঁহার আরও গ্রন্থ আছে। উপস্থিত নাটক খানি তিনি কি জন্য প্রকাশিত করিয়া সাধারণকে পাঠার্থ প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সর্ব্বসাধারণের সন্তোষ সাধনার্থ উমেশ বাবু এ নাটক প্রণয়ণ করেন নাই। উৎসর্গ পত্রে লিখিত আছে—"তুমি জান যে গ্রামস্থ অভিনেতৃদিগের অনুরোধবাধ্যেই এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছি। ইহা শীঘ্র অভিনীত হইবে বলিয়া এত অল্প সময়ে লিখিত হইয়াছে যে শুনিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। গ্রামীন মহোৎসব সময়ে বন্ধুবর্গ মিলিয়া সানন্দে ইহার প্রদর্শন করিবেন, এতদ্ব্যতীত

আর কোন আশা লুব্ধ হইয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই।” পল্লিগ্রামে অভিনীত হইবে বলিয়া যে নাটকের জন্ম, তাহা সাধারণ পাঠককে না দিলেই ভাল হইত। নাটক খানির মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয় কিছুই নাই। “অনুরোধ বাধ্যেই” লোকের সর্ব্বনাশ হয়। ভরসা করি উমেশ বাবু “পুরু বিক্রম” প্রণেতার গৌরব প্রতিদ্বন্দিতায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

মহারাষ্ট্র কলঙ্ক। আরঙ্গজেবের সাময়িক প্রকৃত ঘটনা মূলক দৃশ্যকাব্য। শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা ২১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ জি পি রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥৵

বীরবালা ও মহারাষ্ট্র কলঙ্ক একই লেখনীর ফল। মহারাষ্ট্র কলঙ্কের প্রারম্ভে ‘গ্রন্থ সম্বন্ধে একটী কথা’ আছে। সে কথাটী আমরা এস্থলে আমূল — উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। “জনৈক বন্ধু আমার বীরবালা গ্রন্থ, উপহার প্রাপ্ত হইয়া আমাকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই কএকটী কথা ছিল, ‘নির্ব্বোধ! রুচির দিকে চাহিয়া এখন নাটক লিখিতে হয়, এখনকার রুচি, নায়ককে ডনকুইকৃসটের মত সাজাইয়া এবং নায়িকাকে হারমণিয়ম বাজাইতে বাজাইতে গান করাইয়া পাঠকের এবং গ্রন্থ অভিনয় কালে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখবর্ত্তী করা, দুই একটী জজ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে নায়ক দ্বারা বা কোন উপায়ে জুতা লাঠি পিস্তল মারা, কিম্বা প্রাণে বধ করা, একটী বাঙ্গালী বালিকা কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক গোরা সৈনিকের প্রতি বন্দুক বা পিস্তল ছোড়া, এ সকল তোমার বীরবালাতে কিছুই নাই, গতিকেই ইহা মিষ্ট লাগিলেও দুর্গন্ধ-যুক্ত; আর এক কথা, মাথামুণ্ড তোমার ইতিহাসের প্রতি এত রোখ্ কেন? কল্পনাসূত্রে কি একটী আজ্‌গবি গল্প গাঁথিতে পার না? তাহা হইলে তোমার বহি অপেক্ষাকৃত সমাদৃত হইত, আর তাহা হইলে আমিই উহার সহস্র খণ্ড বিক্রয় করিয়া দিতে পারিতাম, অতএব ভবিষ্যতে আমার কথা রক্ষা করিও।’ প্রিয় পাঠক! আমি তাহারই প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই গ্রন্থ খানি লিখিলাম। বন্ধুবর ইহাতেই বুঝিবেন যে, আমি তাঁহার কথা কতদূর রক্ষা করিলাম।” সত্য বটে এখনকার পাঠক ও দর্শকের রুচির হীনতা জন্মিয়াছে; সত্য বটে এখনকার দর্শক মণ্ডলী ও রঙ্গ ভূমি বিশেষ নিন্দনীয়। বাঙ্গালী জাতি উত্তেজনা প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে—তাহারা উত্তেজক নাটক লিখিতে, পড়িতে ও দেখিতে অনুরাগী। বাঙ্গালীর

এবম্বিধ রুচির পরিবর্ত্তন কি অকারণ সম্ভূত ? যে যত দুরবস্থাপন্ন—সে তত মহদবস্থার আকাঙ্ক্ষী। যে ভিক্ষুক সে নিয়ত রাজপদের আকাঙ্ক্ষা করে, যে মূর্খ সে বিদ্বান হইয়া কি সুখ জানিতে চায়, যে দুর্ব্বল সে এক মুষ্ট্যাঘাতে সিংহ বধ করিবার শক্তি প্রার্থনা করে, যে বালক সে সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে ইচ্ছা করে, যে বালিকা সে যুবতী হইয়া গৃহ কর্ম্মে নিযুক্তা হইতে চায়। এইরূপে উন্নত পদে সুখ থাকুক বা নাই থাকুক মানব তাহা আয়ত্ত করিতে লোলুপ। ইহা মানব হৃদয়ের অপরিবর্ত্তনশীল প্রবৃত্তি। মানব এইরূপে উন্নত হইতে চাহে বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাহার যথোচিত যত্ন বা বিলম্ব করিতে ভর সহে না। ভিক্ষুক যথাবিহিত যত্ন, উদ্যম ও পরিশ্রম সহকারে সংসার ক্ষেত্রে অদৃষ্ট চালনা করিলে কালে নরেশবৎ সম্পত্তিশালী হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহার সে বিলম্ব সহে না—সে প্রাতে উঠিয়াই আপনাকে ত্রিভুবনের অধীশ্বর দেখিতে চাহে। বালক অপেক্ষা করিলে অবশ্যই সময়ে বৃদ্ধ হইয়া সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার ইচ্ছা, এখনই এমন কিছু হয় যে বাটীর রামা চাকর তাহাকে কর্ত্তা মহাশয়ের মত ভয় করে ও বড় গিন্নি তাহার খাবার লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন। মানবের বাসনা সমস্তই এবম্বিধ অসম্ভব। অসম্ভব বাসনা সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন। সিদ্ধ হয় না বলিয়া বাসনা কদাচ হৃদয় হইতে নির্ম্মূল হয় না,—তাহার আলোচনা করিয়াও মানব সুখী হয়। মনে মনে সেই বাসনার আলোচনা করে কিন্তু কেহ প্রকাশ করে না,—যে প্রকাশ করে আমরা তাহাকে পাগল বলি। বাঙ্গালিও মনুষ্য। সুদীর্ঘ কাল দাসত্বের কঠিন নিগড় নিবদ্ধ থাকিয়া তাহারা হীন ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদের মানসিক বৃত্তি নিচয় যে বিলীন হইয়াছে ইহা আমরা মনেও স্থান দিতে সংকুচিত হই। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালির বাসনা অসীম হইয়াছে। সে বাসনা চরিতার্থ হওয়া সুদূর পরাহত। বিশেষ চেষ্টা, বিশেষ যত্ন ও বিশেষ সময় ব্যয় ব্যতীত তাহা সফলিত হওয়া অসম্ভব। অগত্যা তাহারা মনের বাসনা আলোচনা করিয়া সুখ ভোগ করিতেছে। এই জন্যই তাহাদের রুচির নিন্দা। এই জন্যই উমেশ বাবুর এত বিদ্রূপ। কিন্তু আমরা বলি বাঙ্গালি তজ্জন্য দোষী নহে। যাহা স্বাভাবিক, বাঙ্গালি কি সাহসে তাহার অন্যথা করিবে ? বাঙ্গালি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি স্রোতে ভাসিয়া

যাইতেছে—তজ্জন্য অপরাধী নহে। তবে তাহাদের এক অপরাধ এই যে তাহারা মনের কথা খুলিয়া বলিতেছে—বাঙ্গালি পাগল হইয়াছে। এ পাগ্‌লামি নিবারণের চেষ্টা করা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। উমেশ বাবু সেরূপ যত্ন করিলে বড়ই ভাল হইত। তিনি তাহা না করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। কাজটী ভাল করেন নাই। তাঁহাকে প্রশাংসা করিতে পরি না। রুচির নিন্দা করিতে গিয়া তিনি স্বীয় রুচির দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শিবজীর ঘোর উদ্যম, অমিত যত্ন ও অসাধারণ অধ্যবসায় বলে যে মহারাষ্ট্র রাজ্য সংস্থাপিত এবং যাহার অভ্যুদয় ও প্রতাপে মোগল সিংহাসনকেও সময়ে সময়ে কম্পিত হইতে হইয়াছিল, শম্ভুজির বিলাসানুরাগিতা হেতু সেই মহান্ রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই ঘোর শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে সমালোচ্য নাটক খানি লিখিত। এরূপ ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া নাটক রচনা করা বড়ই ভাল। উমেশ বাবুর ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ বিশেষ প্রশংসার কথা।

কিন্তু এ নাটক খানি ভাল হয় নাই। বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া আশা করিয়াছিলাম বুঝি এক খানি মার্জ্জিত রুচির ভাল নাটক পড়িয়া আনন্দ লাভ করিব। তাহা হইল না। ইতিহাসের সহিত আধুনিক ঘৃণার্হ রুচির মিশ্রণে মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক এক অদ্ভুত জিনিস হইয়াছে।

এখনকার নাটকে মেয়েরা বিবিরূপে দেখা দেন, তাহার অনেক মার্জ্জনা আছে। কিন্তু আরঙ্গজীবের সমসাময়িক কঙ্কনস্থ রত্নপতি বণিকের কন্যা সুশীলাকে যে উমেশ বাবু বিবি সাজাইয়া বাহির করিয়াছেন, তদপেক্ষা হাস্য জনক বিষয় আর কি হইতে পারে? তিনি হারমনিয়াম্ বা পিয়ানো বাদন করেন না সত্য কিন্তু তিনি চিত্র লেখেন, তাহাতে "সেড্" দেন, পত্র লেখেন, প্রণয়ের গান ও পদ্য রচনা করেন এবং প্রণয়ীকে নাম ধরিয়া ডাকেন। এসকল কার্য্য মিস্ ইলাইজা হোলিংব্রূকের শোভা পায়। এ সকল গুলি দোষ কি গুণ তাহা আমরা বলিতেছি না। এই মাত্র আমাদের বোধ হয় যে স্বভাবের নিয়ম ক্রমে বাঙ্গালি এই সকল ব্যবহারের অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। উমেশ বাবু বাঙ্গালি। হাজার নিন্দাই করুন আর যাই বলুন তিনি হাস্যাস্পদ হইয়াও স্বাভাবিক রুচির পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। এখনকার লোক পিস্তল দিয়া গোরা মারা দেখিতে চায়। কিন্তু আরঙ্গজীবের সময়ে তদ্রূপ কার্য্য করিলে

লোকে গ্রন্থকারের গায়ে ধূলা দিত। বোধ করি উমেশ বাবুর মনে সেরূপ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ধূলার ভয়ে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি রমণী হস্তে বন্দুকের পরিবর্ত্তে অসি দিয়া উগ্রচণ্ডা সাজাইয়াছেন এবং অনেক যবন বধ করাইয়াছেন। ইত্যাদিরূপ উদ্রেক-কারী ঘটনা সমাবেশ করিতে গ্রন্থকার বিবিমতে প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কুত্রাপি কৃতকার্য্য হন নাই। ১১১ পৃষ্ঠা নাটক খানির মধ্যে কবিত্ব অতি বিরল। পড়িলে গাত্র রোমাঞ্চ হয়, নেত্রে অশ্রু দেখা দেয়, হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং আনন্দে মগ্ন হয় ইত্যাদি রূপ বর্ণনা কোথাও নাই। গ্রন্থ মধ্যে গান ও কবিতা আছে। গান গুলি মন্দ নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা গুলি গ্রন্থের হাস্যরসাভাব পরীহার করিতেছে।

কাশ্মীর-কুসুম অর্থাৎ কাশ্মীরের বিবরণ। শ্রীরাজেন্দ্র মোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৩০ নং করনওয়ালিস ষ্ট্রীট—মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে শ্রীঅদ্বৈতচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। শকাব্দাঃ ১৭৯৭। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

রাশি রাশি নাটক, নবেলের মধ্যে এরূপ এক খানি পুস্তকের আবির্ভাবও নিতান্ত আনন্দের কথা। নাটক নবেল ভাল হইলে অতি উপাদেয় সামগ্রী হয়; অবিনশ্বর কীর্ত্তিরূপে গ্রন্থকারের নাম অনন্ত কালের সহিত স্থায়ী করে। কৃষ্ণকুমারীর ন্যায় নাটক, বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলার ন্যায় নবেল কয় খানি আছে? উক্ত-বিধ নাটক বা নবেল গ্রন্থকার—গ্রন্থকার কেন সমগ্র জাতির—গর্ব্ব স্বরূপ। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালি অহর্নিশ নাটক নবেল লিখিতেছে ও নিষ্কর্ম্মা মুদ্রাযন্ত্রও নিয়ত তৎসমস্ত প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু এক খানিও সুপাঠ্য হইতেছে না। প্রত্যুত ভাল নাটক নবেল লিখিতে যে ক্ষমতা প্রয়োজনীয়, তাহা নিরন্তর যত্ন করিলেও লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতি যাহার হৃদয়োদ্যানকে সেই অনুপম ক্ষমতা কুসুমে সুশোভিত করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্যে সহস্র চেষ্টা করিলেও কদাচ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। আমাদের দেশীয় গ্রন্থকারগণ এই প্রত্যক্ষ সত্য অবগত নহেন। তাঁহারা চেষ্টা দ্বারা নাটক লিখিতে প্রয়াস না পাইয়া যদি অন্য দিকে চেষ্টা পরিচালিত করেন, তাহা হইলে দেশের ও ভাষার যথেষ্ট উপকার হয় এবং আপনারাও আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট অভাব আছে। যে কোন বিদ্বান তৎপ্রতি মনোযোগী হইতেছেন, তিনিই

যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। বৃথা কার্য্যে সময় পাত না করিয়া ও মস্তিষ্ককে অনর্থক বিঘূর্ণিত না করিয়া, আমাদের দেশীয় গ্রন্থকার-পদবী-লোলুপ বিদ্বানবৃন্দ যদি কাশ্মীরকুসুমবৎ পুস্তক লিখিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে অবশ্যই যথেষ্ট গৌরব-ভাজন হইবেন সন্দেহ কি ?

প্রত্যুত, "কাশ্মীর-কুসুম" অতি আদরের সামগ্রী হইয়াছে। আমরা যত্ন সহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকারের লিখিবার ক্ষমতা আছে। ক্ষমতার সহিত, যত্ন বিনিয়োজিত হইলে পরম রমণীয় কুসুম সমুৎপাদন করিবেই করিবে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মোহন বসুজ মহাশয় বিশেষ যত্ন সহকারে কাশ্মীর সম্বন্ধীয় বহুতর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সংকলন করিয়াছেন। কাশ্মীর ভারতবর্ষের মধ্যে অতি মনোরম স্থান। অতি পুরাকাল হইতে এই নগ-কন্দর পরিবেষ্টিত, সুষমাময়ী প্রসূন মালা বিশোভিত, হ্রদ, তড়াগ, নির্ঝরিণী পরিবৃত, স্বভাবের পরমরমণীয়তার নিকেতন স্বরূপ ভূখণ্ড " ভূলোক স্বর্গ " নামে প্রথিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান যে কোন জাতি যে কোন সময়ে ভারতের অদৃষ্ট চক্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছেন, তাঁহারা কাশ্মীর প্রদেশের অতি রমণীয় শোভা নিকরে মুগ্ধ হইয়া তথায় আপনাদের কোন না কোন অনপনেয় চিহ্ন পরিরক্ষিত করিয়াছেন। এরূপ অনুপম সৌন্দর্য্য সম্পন্ন নগেন্দ্র কন্দরে পরিভ্রমণ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? সেই তুষার রাশি সমাচ্ছন্ন গম্ভীর গিরিবর দেখিতে—সেই পরমরমণীয় নেত্রমন স্নিগ্ধকারী সুদূর বিস্তৃত স্বভাব সমুৎপন্ন পুষ্পক্ষেত্র মধ্যে প্রজাপতি রূপে উড্ডীন হইতে,—সেই সমশীর্ষ পাদপপুঞ্জ পরিবেষ্টিত অগণ্য উৎসমালা সম্পন্ন গিরিশিরে সুশীতল শিলাতলে সংসার মমতা বিরহিত হইয়া, আপনাকে আপনি ভুলিয়া তাপসরূপে উপবেশন করিতে,—সেই নভোমণ্ডল বিশোভিনী মেঘমালাকে স্বীয় পদতলে বিচরিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া তৎসহ বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতে,—এবং সেই বসন্তাগম জনিত তেজস্বী মহর্ষিবৎ ভীতি অথচ প্রীতি জনক সর্ব্বথা মুগ্ধকর একটী গিরিশৃঙ্গের নিকুঞ্জ কানন মধ্য হইতে অপর গিরিশৃঙ্গের নিকুঞ্জে পক্ষিরূপে পলায়ন করিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? যাহার সে ইচ্ছা হয় না নিশ্চয় জানিও সে হৃদয়হীন। ইচ্ছা হয় বটে কিন্তু সকলের ভাগ্যে এ অতুল সুখ ঘটিয়া উঠা সুকঠিন। যাঁহাদের ঘটিবার আশা আছে তাঁহাদের

পক্ষে "কাশ্মীর কুসুম" অতি সুযোগ্য সহায়। এতৎপাঠে তাঁহারা পন্থা আদি ও অবশ্য দৃষ্টব্য রম্য স্থান সকলের তালিকা পরিজ্ঞাত হইয়া যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে পারিবেন। আর যাঁহাদের ভাগ্যে কাশ্মীর সন্দর্শন ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তাঁহারাও "কাশ্মীর কুসুমের" যথাযথ বর্ণনা সমস্ত পাঠ করিয়া দর্শনের সুখ উপলব্ধি করিতে পারেন। "কাশ্মীর কুসুম" সর্ব্বাবস্থার লোকেরই উপকারী ও আদরের সামগ্রী। আমরা সকলকে ইহা অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি এবং এরূপ সারবান পুস্তক প্রণয়ন জন্য গ্রন্থকারকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

কাশ্মীর কুসুম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানে স্থানে দুই এক খানি চিত্র ও প্রারম্ভে এক খানি কাশ্মীরের মানচিত্র দিলে বড়ই ভাল হইত। যাহা হউক তজ্জন্য গ্রন্থকারকে দোষ দেওয়া যায় না। দোষ আমাদের অদৃষ্টের। অদৃষ্টের দোষ কেন বলি?—১॥০ মূল্য দিয়া এরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয় করিতে আমাদের দেশীয় অনেক সম্পত্তিশালী ব্যক্তিও অপব্যয় মনে করেন। মানচিত্রাদি দিলে অবশ্যই গ্রন্থের মূল্য অনেক বাড়িত। নিশ্চয় বলিতে পারা যায় তাহা হইলে গ্রন্থকার বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। এ দোষ কাহার স্কন্ধে দিব? দোষ আমাদের অদৃষ্টের।

উপন্যাস

প্রথম অধ্যায়।

আজ নয়—আর এক দিন।

জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতী নন্দনগাছী গ্রামের প্রান্তভাগে, অতি পূর্ব্ব কালে এক ঘর বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ বাস করিতেন। গৃহস্বামীর নাম গুরু-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে রায় মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিত, এবং গ্রামের মস্তক বলিয়া মানিত। তাঁহার সুন্দর সৌধের চারি দিকে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত এক পরিপাটী উদ্যান ছিল। ঐ উদ্যানে বিবিধ সুখাদ্য ফলের ও সুগন্ধ ফুলের গাছ ছিল। গ্রামস্থ ভদ্রলোক সর্ব্বদাই সেই উদ্যানে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। সাধারণে উহাকে "রায়ের বাগান" বলিয়া উল্লেখ করিত। এই উদ্যানের প্রধান দ্বার হইতে বোড়াল নদীর তীর পর্য্যন্ত এক সুপ্রশস্ত পথ ছিল। ঐ পথের উভয় পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শ্রেণী সন্নিবিষ্ট থাকায় শোভার সীমা ছিল না। প্রখর সূর্য্য তাপ কখনও সে পথের পথিককে ক্লান্ত করিতে পারে নাই। আলোক প্রবেশের অবসর না থাকায় উহা দিবাভাগে ছায়াময় থাকিত, এবং রাত্রিকালে ঘোর অন্ধকারময় হইত। এমন কি যখন পৌর্ণমাসীর অমল ধবল জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক বিকসিত কুসুমের ন্যায় শোভা সম্পন্ন হইত, তখনও ঐ পথ অমানিশার তমসাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইত। পথ পার্শ্বে স্থানে স্থানে লোকের বসতি ছিল। তাহারা ঐ বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের প্রতিপাল্য বলিয়াই বোধ হইত।

শ্রীপঞ্চমীর রাত্রি—দশদণ্ড জ্যোৎস্নালোক থাকিবে। রাত্রি প্রায় ৮ বাজিল, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক অর্দ্ধমলিন বস্ত্র পরিধান এবং গাত্রে এক খানি শীত নিবারক বস্ত্র প্রদান করিয়া রায় বাগানের পথে যাইতেছে। অবস্থা দর্শনে, তাহাকে দরিদ্রা রমণী বলিয়া বোধ হয়। কলেবর শীর্ণ, বর্ণ শ্যাম, বয়স প্রায় ৪০ চল্লিস বৎসর। স্ত্রীলোকটী অনেক দূর হইতে আসিতেছে বোধ হইল, কারণ এক একবার পথ পার্শ্বস্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। এমন সময় আর এক জনের পদশব্দ শুনিতে পাওয়া

গেল। সে ব্যক্তি রায়ের বাগানের দিক্ হইতে নদীতীরে যাইতেছে। সে যুবা পুরুষ, রায়ের বাগানের কোন কর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হইল। তাহাকে দেখিয়াই স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসিল,—

"রায় বাগান আর কত দূর?"

যুবক অপরিচিত স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"বাছা! তুমি কে?"

স্ত্রীলোক কহিল,—

"বাবা! আমাকে চিন্‌তে পারবে না। আমি অনেক দূর হতে আস্‌ছি। রায় বাগানে যাব।"

যুবক কহিল,—

"রায় বাগানে কার নিকট যাবে?"

স্ত্রীলোক কহিল,—

"কর্ত্তার নিকট যাব।"

যুবক কহিল,—

"কর্ত্তা নাই। আজ দশ বৎসর হইল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তুমি তাও জান না?

স্ত্রীলোক কহিল,—

"তবে কর্ত্রীঠাকুরাণী আনন্দময়ী দেবীর কাছেই যাব।"

যুবক কহিল,—

"বাছা! তুমি কি এখানকার কোন খবরই জান না। আজ শ্রীপঞ্চমী, আজ আনন্দময়ী কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, কি কথা বার্ত্তা করেন না। আজ নয়, আর এক দিন এলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হতে পারে।"

স্ত্রীলোক কহিল,—

"না বাপু—আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনেক দূর হতে এসেছি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেও আমি যেতে পারি না।"

যুবক কহিল,—

"তোমার পরিশ্রম বৃথা হইবে। তিনি শ্রীপঞ্চমীর দিন কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না, কথাও কহেন না। আপনার ঘরেই বসে থাকেন।"

স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসিল,—

"এবড় আশ্চর্য্য! আজ শ্রীপঞ্চমী, বৎসরকার দিন,—সকল ঘরেই আনন্দ, তবে তিনি এত নিরানন্দে থাকেন কেন? এর কারণ কি কেহই জানে না?"

যুবক কহিল,—

"কেহই জানে না—তবে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করে থাকে, কিন্তু কোন্ অনুমানটী সত্য, তাহা অদ্যাপি কেহই স্থির কর্ত্তে পারে নাই।"

স্ত্রীলোক কহিল, "এত দুঃখ কিসের?

যুবক কহিল,—

"সে কথার উত্তর কেহই দিতে পারে না। ধন সম্পত্তির অভাব নাই, সংসারে আর কোন অসুখের বিষয়ই দেখা যায় না, তবে

এমন ভাব কেন হয়, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। আমরা অনেক অনুসন্ধানেও কিছু জানিতে পারি নাই।"

স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসিল,—

"তবে অদ্য তাঁর কাছে কেহই থাকে না? তিনি দিন রাত্র একাই থাকেন?"

যুবক কহিল,—

"কয়েক বৎসর হতে তিনি এক সঙ্গিনী পেয়েছেন, কেবল সেই নিকটে থাকে; তাহার উপরেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এমন মেয়েও আমরা কখনো চক্ষে দেখি নাই! যেমন রূপ তেমনি গুণ!"

স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসিল,—

"আনন্দময়ী দেবীর যে এক পুত্র ছিল তাঁরও কি মৃত্যু হয়েছে।"

যুবক কহিল,—

"মরেন নাই, জীবিত আছেন। কিন্তু তিনি মায়ের নিকট প্রায়ই আসেন না। তিনি মিষ্ট স্বভাবের লোক নন। তাঁর নাম শশিশেখর রায়।"

স্ত্রীলোকটী এই কথা শুনিয়া একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল এবং অনুচ্চ স্বরে কহিল,—

"শশিশেখর রায়; নামটী শুনিতে মধুর!"

তৎপরে যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিল,—

"যাহা হউক, আমি আজ একবার আনন্দময়ী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো। বাবা! যদি আমাকে পথ দেখাইয়া দেও, তবে আমি একবার তাঁর কাছে যাই।"

যুবক কহিল, —

"পথ বরাবর সোজা, কোন দিকে বেঁকিতে হইবে না। তবে আমি একথা ঠিক করে বল্‌তে পারি যে, তোমার পরিশ্রম বৃথা হইবে। বাছা কেন কর্ম্মভোগ করিতে যাবে?"

স্ত্রীলোক কহিল,—

"কর্ম্মভোগ হলেও হতে পারে, কিন্তু বাপু আমি অনেক দূর হতে এসেছি—একবার শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ফিরে যেতে পারি না। আর আমার বোধ হয় যে আনন্দময়ী দেবী আমার প্রতি দয়া করিয়াও তাঁর নিয়ম ভঙ্গ কর্‌তে পারেন। বাপু! আমাকে বারণ কর না—আমি একবার যাই। এই পথেই যাব কি?"

পুরুষ কহিল,—

"এই পথেই যাও—সারি গাছের জন্য পথ ঘোর অন্ধকার হয়েছে। সাবধানে যাবে। একটু গেলেই সদর দরজা; বাগানে প্রবেশ করেই বাড়ী দেখ্‌তে পাবে।

স্ত্রীলোক কহিল,—

"বাব তুমি চিরজীবী হয়ে থাক। আমি চল্লেম।

এতক্ষণে স্ত্রীলোকটীর ক্লান্তি অনেক বিগত হইয়াছিল ; আস্তে আস্তে রায় বাগানের দিকে চলিল। ততক্ষণ পাঠকগণ একবার রায় বাগানে চলুন, সেখানে কি হইতেছে দেখা মন্দ নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রায় বাগানের মধ্যস্থিত প্রাসাদের গঠন প্রণালী নিতান্ত প্রাচীন। আমরা সচরাচর যে সকল প্রাসাদ দেখিয়া সেকেলে বলিয়া থাকি, উহা সেই প্রকার। উহাতে প্রশস্ত কক্ষ বা বাতায়ন নাই—সাসীর কপাট নাই —পেনেল শোভিত দ্বার নাই। এ সকল বর্ত্তমান কালের প্রাসাদ পরম্পরায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন প্রাসাদ মাত্রেরই সিঁড়ি অতি অপ্রশস্ত—দ্বার ও বাতায়ন অতি ক্ষুদ্র —কক্ষ গুলিও অল্পায়তন বিশিষ্ট। রায় বাগানের প্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রাসাদ যে সেই সকল গুণসম্পন্ন তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রাসাদ সংলগ্ন আর কতিপয় ক্ষুদ্র গৃহও ছিল। তাহার কোনটীতে রন্ধন হইত, কোনটীতে বা দাস দাসীগণ অবস্থিতি করিত এবং একটী শশিশেখরের জন্য নিরূপিত ছিল। এই গৃহে শশিশেখর স্বীয় বয়স্যগণ সঙ্গে সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতেন। সংলগ্ন গৃহ গুলির মধ্যে শশিশেখরের কক্ষ কথঞ্চিৎ প্রশস্ত এবং অপেক্ষাকৃত সৌষ্ঠব সম্পন্ন। ঐ গৃহে সুচারু শয্যা ও বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত উপাধান সকল সুপ্রণালীক্রমে সজ্জিত থাকিত। শশিশেখর প্রায় সর্ব্বদাই ঐ গৃহে থাকিতেন। তাঁহার সহচর বর্গের মধ্যে দুই এক জন প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিত।

মধ্যস্থিত প্রাসাদ দ্বিতল উপরের দক্ষিণ দিকের একটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত কক্ষে এক বৃদ্ধা ও এক যুবতী বসিয়া আছেন। এক খানি গালীচা মাত্র তাঁহাদের আসন। কতকগুলি চিত্রপট কক্ষ ভিত্তিতে সংলগ্ন ছিল। উহা—রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব মূর্ত্তিতে শোভিত। এখানে অন্য কোন প্রকার গৃহ শয্যা নাই। বৃদ্ধার সম্মুখে হস্তদ্বয় দূরে যুবতী বসিয়া আছেন।

যুবতী 'সুন্দরী' এই কথা মাত্র বলিলেই সকলের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু কি কাল পড়িয়াছে, পুংক্ষানুপুংক্ষ রূপে সর্ব্বাঙ্গের সৌষ্ঠবাদি বর্ণন না করিলে কেহই সন্তুষ্ট হন না। আমরা দেখিতেছি, কোন গ্রন্থ মধ্যে কোন সুন্দরী যুবতীর বর্ণন সময়ে অধিকাংশ গ্রন্থকার নায়িকার পক্ষপাতী হইয়া সৌন্দর্য্য প্রকাশক যাবতীয় শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন।

তাঁহাকে নিখুঁত সুন্দরী প্রতিপন্ন করিতে যার পর নাই যত্ন করেন। অবশেষে তাহাতেও মনের তৃপ্তি সাধন হয় না দেখিয়া "এমন হয় নাই, হইবে না,—দেখি নাই দেখিব না" ইত্যাদি বাক্য-বিন্যাস করিতেও ক্রটি করেন না। নিখুঁত সুন্দরী জগতে কেহ দেখিয়াছেন কি ? নিখুঁত সুন্দরীর বিদ্যমানতা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না — মনেও ধারণা করিতে পারি না। যে যুবতীর সর্ব্বাবয়বের সমষ্টি দর্শনে দর্শকের চিত্ত-প্রফুল্ল হয়, তাহাকেই আমরা সুন্দরী বলিতে পারি। তাহার শরীরে অবশ্যই খুঁত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠবের কোন হানি নাই। আমরা যে যুবতীর কথা উল্লেখ করিতেছি, তিনি সুন্দরী—পরমাসুন্দরী। তাঁহার রূপে মন মোহিত হয়। যাহা দেখিলে মন মোহিত হয়, অন্তর প্রফুল্লিত হয়, আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, দেখিলে যেন সুখী হই, তাহাকে অবশ্যই ভাল বলিব। যুবতী পরমাসুন্দরী। তাঁহার নাম সুকুমারী; যুবতীর হস্তে এক থানি হস্তলিখিত পুস্তক রহিয়াছে। তাঁহার চক্ষু সেই পুস্তকেই নিবিষ্ট। বৃদ্ধা নিবিষ্ট মনে যুবতীর গ্রন্থ পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। বৃদ্ধা যে গৃহস্বামিনী আনন্দময়ী দেবী এ কথা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসরের অধিক নহে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে ৫০ কি ৫৫ বৎসরের বলিয়া বোধ হয়। যুবতী পাঠ করিতেছেন,—

"পুত্র দরশনে দেবী অজ্ঞান হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল ॥
পঞ্চ পাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল ॥
সম্বিত পাইয়া তবে গান্ধার তনয়া।
কৃষ্ণকে বলিল অতি শোকাকুল হয়া ॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে না দেখি কেন কর্ণ দুঃশাসন ॥"

বৃদ্ধা কহিলেন,—

"সুকুমার! আর পড়ায় এখন প্রয়োজন নাই। গান্ধারীর বিলাপে বুক ফেটে যায়। আর শুন্তে পারি না। পুঁথি রাখ—এখন অন্য অন্য কথা বার্ত্তা কহা যাক।"

সুকুমারী পুস্তক রাখিলেন—রাখিয়া আনন্দময়ী দেবীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবেশিত করিলেন।

বৃদ্ধা কহিলেন,—

"সুকুমার ! আমি তোমার কথা শুন্তে বড় ভাল বাসি। তোমার গুণে আমি মোহিত হয়েছি। যত ক্ষণ তুমি আমার কাছে থাক, ততক্ষণ আমার মন আনন্দে ভাস্‌তে থাকে। তোমাকে আমি নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহ করি। তুমি আমাকে মায়ের মত ভাব বলেই আমার এত স্নেহ।"

অতীব বিনয় ও ভক্তি গদ্গদ স্বরে সুকুমারী কহিলেন,—

"মা! স্নেহ, ভালবাসা এ সকল কাকেও শিখাতে হয় না। শিখালে চলেও না। এ সকল মনের কাজ। আপনি আমাকে কন্যার অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন, কাজেই মনে মনে আপনার উপর অকৃত্রিম ভক্তি এবং ভালবাসা জন্মিবে তার আর সন্দেহ কি?"

আনন্দময়ী দেবী মুগ্ধার ন্যায় সুকুমারীর বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার বদনে আনন্দ চিহ্ন সমস্ত দেখা দিল। হাসিয়া কহিলেন,—

"সুকুমার! তোমার পূর্ব্ব বিবরণ আমি তোমার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি। এখন সেই বিবরণের এক বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত। বয়স দোষেও বটে, মনের অস্থিরতায়ও বটে, যা শুনি তা সব ঠিক মনে থাকে না। বাছা! আজ্ একবার তোমার সেই কাহিনী বল তো?"

সুকুমারী হাসিয়া বলিলেন,—

"মা! সে পুরাণ কথা ভালও লাগে তো?" আনন্দময়ী কহিলেন,—

"বাছা! তোমার কথা হাজার পুরাণ ও নীরস হলেও আমার কর্ণে অমৃতবর্ষণ করে।"

যুবতী কহিলেন,—

"শুনুন তবে। বলিহারের নিকট আমাদের বাস। নাটোরের রাজ সংসারে কর্ম্ম করিয়া পিতা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মাতা পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে আর সসম্পর্কীয় কেহই থাকিলেন না। মাতা পিতা আমাকে পথের ভিখারিণী করিয়া গেলেন। সংসার যেন অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। পিতা বৃদ্ধবয়সে কিছু ঋণগ্রস্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর জানিতে পারিলাম যে, বাটী খানি পর্য্যন্ত বন্ধক আছে। গৃহে যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া অনেক ঋণ পরিশোধ করিলাম। যাহার নিকট বন্ধক ছিল, সে ব্যক্তিও ক্রমে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। বাটী ছাড়িয়া দিয়া এক প্রতিবেশিনীর গৃহে আশ্রয় লইলাম। সে আশ্রয়ে কত দিন চলে? মনে কত কি ভাবিতে লাগিলাম—কিছুতেই মনস্থির হয় না। দিবা নিশি কেবল কাঁদিয়াই কাল যাপন করি। এমন সময় লোক পরম্পরায় জানিতে পারিলাম আপনার একজন সহচরীর প্রয়োজন। গ্রাম পথ কিছুই জানি না। দশহরার গঙ্গাস্নান করিতে আমাদের গ্রামের কতকগুলি যাত্রী যাইতেছিল। আমি সেই সঙ্গে বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। এখানে আসিয়া আপনার সন্ধান লইয়া জানিলাম যে আপনার

যথার্থই এক জন সহচরীর প্রয়োজন। আমি প্রার্থনা করিবা মাত্র আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল। আশ্রয় পাইলাম—আপনার স্নেহে বশীভূত হইলাম। দেখিলাম জগদীশ্বর আমাকে মা মিলাইয়া দিলেন। শোক তাপ ভুলিয়া গিয়া আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত হইলাম—আপনিও দিন দিন আমার উপর সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সুকুমার! তোমার গুণে কে না বশীভূত হয়! সকল স্থানেই তুমি মা পাইতে, তবে ভগবান অনুকূল হয়ে তোমাকে আমায় মিলিয়ে দিয়েছেন। তোমার আসা অবধি আমি আর দুঃখ কাহাকে বলে তা জানি না।"

যুবতী কহিলেন, — "মা! আপনার সুখেই আমার সকল সুখ। আপনাকে সুখী করিতে পারিলেই আমি সুখে থাকিব, তার আর সন্দেহ কি?"

আনন্দময়ী দেবী পুলকিত হৃদয়ে ও হাস্য বদনে সুকুমারীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন— "মা এখন একটু বিশ্রাম কর—রাত্রি অনেক হয়েছে।"

যুবতী সোৎসুকে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। আনন্দময়ী একাকিনী রহিলেন। এমন সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া কহিল,—"এক অপরিচিতা স্ত্রীলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।"

বৃদ্ধা চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন, "কি! অপরিচিত স্ত্রীলোক! আজ শ্রীপঞ্চমী—আমি তো আজ কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না।"

ভৃত্য কহিল, "আমি সে কথা বলিয়াছি কিন্তু সে কোন মতেই শুনিল না। সে বলে যে আমি অনেক দূর হতে এসেছি, সাক্ষাৎ না করে যেতে পারি না। আমার বিষয়ে দেবী অবশ্যই একটু অনুগ্রহ করবেন।"

বৃদ্ধা কহিলেন "আমি কোন মতেই নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি না। আজ তাকে বিশ্রাম করিতে বল—কল্য সাক্ষাৎ হইবে।

ভৃত্য বলিল "আমি সে কথা বলিয়াছি কিন্তু সে কোন মতেই শুনে না। শেষে আপনার দেখিবার জন্য এই পত্র খানি দিয়াছে।

আনন্দময়ী দেবী পত্র খানি পাঠ করিয়া সিহরিয়া উঠিলেন—করকপোল সংলগ্ন হইয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; ক্ষণেক চিন্তার পর কহিলেন,— "ভাল, সে স্ত্রীলোককে আসিতে বল, কিন্তু সাবধান যতক্ষণ সে আমার নিকট থাকিবে, ততক্ষণ যেন অন্য কেহ এ ঘরে না আসে।

ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদেশিনী।

ক্ষণ বিলম্বেই অপরিচিতা আনন্দময়ীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবা মাত্র আনন্দময়ীর মুখ শুষ্ক হইল, এবং সমস্ত শরীর যেন পাণ্ডু-বর্ণ হইয়া গেল। তখন যদি কেহ তাঁহার বক্ষস্থলে হস্ত বিন্যাস করিয়া দেখিত, তবে সে জানিতে পারিত যে, তাঁহার হৃদয় কাঁপিতেছে। যাহা হউক তিনি কথঞ্চিৎ সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"তুমিই কি আমার নিকট আসিয়াছ? তোমার প্রয়োজন কি?"

অপরিচিতার মুখশ্রী দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন দারিদ্র্যদুঃখ তাহার সহিত বহুকাল একত্র বাস করিতেছে। অপরিচিতা আনন্দময়ীর প্রতি স্বীয় কোটর গত লোচনের স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কহিল,—

"দেবি! আমি আমার পুত্র দেখিতে আসিয়াছি।"

আনন্দময়ী চমকিত হইয়া কহিলেন,

"পুত্র দেখিতে আসিয়াছি কেমন! কোথায় তোমার পুত্র ?'

অপরিচিতা কহিল,—

"আপনার নিকটেই আমার পুত্র আছে। শশিশেখর আপনার পুত্র নয়, আমার পুত্র। আমি তাহাকে দশ-মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছিলেম। আমার নাম মন্দাকিনী। এই গ্রামেই আমার বাপের বাড়ী ছিল, এখন আর সে ভিটাও নাই।"

মন্দাকিনী সাহস সহকারে এবং অতি গম্ভীর ভাবে যতক্ষণ এই কথা গুলি বলিতেছিল, আনন্দময়ী দেবী ততক্ষণ নিতান্ত বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সে দৃষ্টি নিতান্ত উৎসাহ শূন্য ও নিস্তেজ। সে সময় তাঁহাকে কেহ দেখিয়া নিশ্চয়ই অনুমান করিতে পারিত, যে অপরিচিতার এই কথা-গুলি তাঁহার হৃদয় পর্য্যন্ত ভেদ করিতেছিল। আনন্দময়ী "হা ভগবান" বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শেষে করকপোল সংলগ্ন হইয়া আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন,—

"হায়! এক জনের পাপে আমাকে চিরজীবন পুড়িয়া মরিতে হইল। অবশেষে বোধ হয় ইহা সকল লোকে জানিতে পারিয়া আমাকে যার পর নাই অপমানিত করিবে। উঃ! অদৃষ্টে কি আছে কিছুই বলিতে পারি না।"

আবার ক্ষণকাল কি ভাবিলেন —ভাবিয়া যেন ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপরিচিতা মন্দাকিনীর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই

আবার বসিয়া পড়িলেন। তখন মৃদু-স্বরে কহিলেন,—

"শশিশেখর তোমার পুত্র—তুমি তার গর্ভধারিণী। তোমার এ অতি সাহসের কথা—ভয়ানক কথা। তোমার এ সকল কথা যে সত্য তার প্রমাণ কি? প্রমাণ ভিন্ন এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

মন্দাকিনী কহিল,—

"আমার বিশেষ প্রমাণ আছে। আর তোমার বর্ত্তমান অবস্থাই আমার উত্তম প্রমাণ।"

আনন্দময়ী সাহসভরে কহিলেন,—

"আমার কি অবস্থা দেখিলে?"

মন্দাকিনী কহিল,—

"তোমার চক্ষে তেজ নাই—কথায় সাহস নাই। অধিক কি বলিব, হয়তো আমার কথায় তোমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে।"

আনন্দময়ী বহুক্ষণ পরে হতাশ ভাবে কহিলেন,—

"তোমার অনুমান যথার্থ। এখন তোমার অভিপ্রায় কি? কিরূপে তুমি এই গুপ্ত বিষয়ের অনুসন্ধান পাইলে? এ কথা জীবিত লোকের মধ্যে আর এক জন মাত্র জানে।"

মন্দাকিনী কহিল "সেই একজন, বোধ হয় তোমার ধাই।"

আনন্দদময়ী উত্তর করিলেন,—

"হাঁ সেই বোধ হয় এ কথা তোমার নিকট প্রকাশ করেছে। এ বিশ্বাস-ঘাতকতা তারই কাজ!"

অপরিচিতা কহিল,—

"না। প্রথমে সমুদায় বন্দোবস্ত শেষ হইল। ধাই আমার সন্তানকে তোমার সুতিকায় এবং তোমার সন্তানকে আমার সুতিকায় রাখিয়া গেল। আমার সন্তান সৌভাগ্যের কোলে নাচিতে লাগিল, কিন্তু তোমার সন্তান দারিদ্র্য দুঃখে পড়িয়া—"

আনন্দময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে সজল নয়নে ও কাতর বচনে কহিলেন—"মন্দাকিনি! আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানি না। আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, ইহা আমার জ্ঞানকৃত পাপ নয়। উঃ! কি দুর্দৈব!"

মন্দাকিনী কহিল "তার পর আর সে ধাইয়ের সঙ্গে কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু আমার স্বামী—যিনি এই সকল অনর্থের মুল—"

আনন্দময়ী অমনি কহিলেন—"আমার স্বামীও এই সকল অনর্থের মূল।"

মন্দাকিনী পুনরায় কহিতে আরম্ভ করিলেন—"আমার স্বামী ইহাতে অনেক টাকা পয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সহিত ধাই এই বন্দোবস্ত করে যে তিনি এই গুপ্ত বিষয়ের মুল অনুসন্ধান না করেন। তাঁর ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না, তিনি ভাবিলেন যে গোপনে ধাইয়ের পশ্চাৎ গিয়া আর কিছু টাকা

আদায় করা মন্দ পরামর্শ নয়। তিনি তাহাই করিলেন, এবং তোমার স্বামীর নিকট আসিয়া আরও কতক গুলি টাকা লইয়া গেলেন।”

আনন্দময়ী কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—“এখন তোমার আসার আবশ্যক! আবার কিছু টাকা আদায় করাই তোমার মনস্থ; তোমার স্বামী বুঝি এবার তোমাকে সেই জন্য পাঠিয়াছেন।”

মন্দাকিনী গর্ব্বিত ভাবে কহিলেন,

“না দেবি! আমার আসিবার সে কারণ নয়। আমার স্বামী নাই—আমি বিধবা। তুমি অন্য মনস্ক বলেই আমাকে বিধবা বলে জান্‌তে পার নাই। আমার স্বামী জীবিত থাক্‌লেও আমি টাকার জন্য তোমার নিকট কখনই আসিতাম না। এখানে আমাকে কে আনিল? সন্তানবাৎসল্য আমাকে এত দূর আনিয়াছে—মাতৃস্নেহে আমি এখানে এসেছি। আমি আমার পুত্র—আমার প্রাণসম প্রিয় পুত্র দেখ্‌বার জন্য এখানে এসেছি। এ খানে এসে পুত্র মুখ দেখ্‌তে পাব বলে এই দুর্গম পথকেও সুখের সিঁড়ি মনে করেছি। আমি একবার আমার সেই পুত্রের মুখচন্দ্র দেখ্‌বো। আমার সেই এক মাত্র সন্তান—আমি তাকে গর্ভে ধারণ করেছি মাত্র। আমি তার চাঁদ মুখ খানিও ভাল করে দেখ্‌তে পাই নাই। আমার বড় সুখের সময়ে তাকে আমার ক্রোড় হতে কেড়ে এনেছে। একবার আমি মরিবার আগে সেই প্রিয় পুত্রের মুখ দেখ্‌বো। আনন্দময়ী! আমার বুক ফেটে যায়—আর আমি ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে পারি না। একবার অনুমতি কর আমি তার চাঁদ মুখ দেখি। আমি এই জন্যই এখানে এসেছি, মনোরথ সিদ্ধ না হলে এখান হতে যেতে পরি না। যদি তোমার রক্ত মাংসের শরীর হয়, তবে একবার ভাবিয়া দেখ আমার এক মাত্র পুত্র—যার মধু মাখা ‘মা মা’ শব্দ শুনে কাণ পবিত্র, মন পবিত্র, দেহ পবিত্র কর্‌তে পারি নাই—তাকে একবার দেখ্‌বার জন্য মন অস্থির হয় কি না? আমি তোমার পায় ধরি—বিনয় করি—একবার আমি শশিশেখরের চাঁদ মুখ দেখ্‌বো।” এই বলিয়া মন্দাকিনী আনন্দময়ীর চরণ সমীপে জানু পাতিয়া বসিলেন।

মন্দাকিনীর দুই চক্ষে শত ধারা বহিতে লাগিল। আনন্দময়ীও বদনে বসনাঞ্চল প্রদান পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন“মন্দাকিনি! আমার কাছে দয়া প্রার্থনা করায় তোমার যে অধিকার আছে, তোমার কাছেও আমার সেই অধিকার! তুমি যে কথা-

গুলি বলিলে, আমিও কি সেই কথা গুলি বলিতে পারি না! সন্তানের মধুমাখা মা মা শব্দে আমার কর্ণ কুহর পবিত্র হয় নাই। আমার কি সেই মধুমাখা মাতৃসম্বোধন শুন্‌তে ইচ্ছা হয় না? মন্দাকিনি! তোমা অপেক্ষাও আমার কষ্ট অধিক। তোমার পুত্রের জন্য তুমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলে, কেননা সে ধনবানের আশ্রয়ে এসেছে। তোমার কাছে থাক্‌লে দুঃখে তার দিনপাত হতো; তোমার চিন্তা ছিল না—সুখের কোলে পুত্রকে নিক্ষেপ করে এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলে। কিন্তু মন্দাকিনি! একবার আমার মনের কষ্টের বিষয় ভাবিয়া দেখ দেখি। আমি দুঃখের সাগরে এক মাত্র প্রিয়তমা কন্যা সন্তানকে ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছি। আমি পাষাণী, আমি রাক্ষসী, আমি পিশাচী, আমার এ রক্ত মাংসের শরীর নয়। তাহলে এতদিন জীবিত থাক্‌তে হতো না। মন্দাকিনি! তুমি যেমন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলে আমার মরিবার পূর্ব্বে একবার পুত্রের চাঁদ মুখ দেখ্‌বো—আমারও সেই কথা বলিবার অধিকার। মন্দাকিনি! তোমার হাতে ধরে বিনয় করে বলি—একবার আমার প্রিয়তমা কন্যাকে দেখাও। বল—আমার কন্যা কোথায়? তুমি যে কথা কহিতেছ না! তবে কি আমার কন্যা নাই! একবার অনুগ্রহ করে বল—আমার কন্যা অদ্যাপি জীবিত আছে কি না।"

মন্দাকিনী কহিল—"সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার কন্যা জীবিত আছে। কিন্তু এখন আর তোমার কন্যা আমার কাছে নাই, কিছু দিন পরেই সে অন্যের হস্তগত হয়েছে। তথায় সে সুখসচ্ছন্দে আছে।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "কি—তোমার কাছে নাই! তবে এখন আমার কন্যা কোথায়? মন্দাকিনি! আমাকে বিশেষ করে বল।"

মন্দাকিনী কহিল—"শুন, আমি সকল কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি। তোমার কন্যার যখন দুই বৎসরমাত্র বয়স, তখন আমার স্বামী সংবাদ পেলেন, যে এক জন বড় লোকের স্ত্রীর এক মাত্র কন্যা সন্তান মারা পড়েছে, তিনি একটী ঐ বয়সের কন্যা পাইলে প্রতিপালন করেন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে আমার স্বামীর ধর্ম্মজ্ঞান ভাল ছিল না—তিনি এই একটী সুযোগে আবার কিছু অর্থ সঞ্চয়ের উপায় করিলেন। অনেক টাকা মূল্য লয়ে তোমার কন্যাকে তাঁদের নিকট বিক্রয় করিলেন। তোমার কন্যার প্রতি আমার বিশেষ

স্নেহ জন্মে নাই—তাকে দেখলেই অমার পুত্রশোক উথ্‌লে উঠ্‌তো—তথাপি তাহাকে কাছে রাখ্‌তে বড় ভাল বাস্‌তাম। তোমার কন্যাকে আমরা সেখানে লয়ে গেলাম। তাঁহারা কন্যার রূপ দেখে মোহিত হলেন। অনেক টাকা বন্দোবস্ত হ'ল—কিন্তু এইটী প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হলো যে ইহজন্মে আর আমরা সে কন্যাকে দেখিতে পাইব না। আমি কাঁদিতে লাগিলাম দেখিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী দুঃখ করে বল্যেন—'হায়! দরিদ্র হওয়া অপেক্ষা সংসারে আর কি দুঃখ আছে? ধনের লোভে—উদরের জ্বালায় প্রাণসম কন্যাকেও ত্যাগ কত্যে হলো।' পরে আমাকে বল্যেন কন্যা তোমাকে মা বলে জান্‌বে না, কিন্তু তুমি যে কন্যার এক জন আত্মীয়া, তাহা যাতে জান্‌তে পারে, আমরা এমন শিক্ষা সর্ব্বদাই দিব। বাছা! তোমার মূর্ত্তি কন্যার হৃদয়ে অঙ্কিত করে দিবার উপায় নাই, থাকুলে তাহাও করে দিতাম।' আমি অমনি কহিলাম 'আমার এক খানি অঙ্কিত মূর্ত্তি আছে, যদি সেই খানিতে কোন কাজ হয়, তবে দিতে পারি।' এই কথা বলিয়া আমি আমার অঙ্কিত মূর্ত্তি তাহার হস্তে দিলাম। তিনি কহিলেন, 'উত্তম হইয়াছে, বাছা তোমার উপর কন্যার স্নেহ ভক্তি অচলা থাকিবে।' আমরা চলিয়া আসিলাম। আমার স্বামী কিছু দিন মুক্ত হস্তে ঐ টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। আয় না থাকিলে সঞ্চিত ধন কত দিন থাকে! সব ফুরাইয়া গেল। আবার তিনি একবার টাকা আদায় করিবার দুষ্ট অভিপ্রায়ে সেই বড় লোকদের অনুসন্ধানে গেলেন, কিন্তু তাঁদের দেখা পেলেন না। তাঁহারা সে বাড়ী ত্যাগ করে কোথায় গিয়াছেন, গ্রামস্থ কেহই সে সংবাদ বলিতে পারিল না।"

আনন্দময়ী দেবী উচ্চ ক্রন্দনের সহিত কহিলেন,—

"মন্দাকিনি! আর বলিতে হইবে না। আমি বুঝেছি—আর তাকে পাইবার কোন আশা নাই। তার জন্য আমার চির দিন কাঁদিতে হইবে। আমার কন্যা নাই।" এই কথা বলিয়া আনন্দময়ী নিস্তব্ধ ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল।

মন্দাকিনী বিনয় নম্র বচনে কহিলেন,—

"দেবি! তোমার মনোবেদনায় বুঝিতে পারিতেছি, আমার হৃদয় কেমন আগুনে পুড়িতেছে। একবার আমাকে শশিশেখরের চাঁদ মুখ দেখাও।"

আনন্দময়ী তীব্র বেগে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—

"মন্দাকিনি! পরের পাপের জন্য আমাকে নষ্ট করিও না। যদি তোমার শরীরে কিছুমাত্র দয়া থাকে, তবে আর আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে দশজনের কাছে অপমানিত করো না। যেন এ কথার বিন্দু মাত্রও প্রকাশ না হয়।"

মন্দাকিনি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া কহিলেন,—

"আমার এ কথা প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শশিশেখর যে মা বলিয়া আমার নিকট আসিবে, আমি সে প্রার্থনাও করি না। কেবল মাত্র আমি একবার দেখিব। সে চাঁদ মুখ দেখে মরিতে পেলেও সার্থক জন্ম মনে করিব। মনের আকর্ষণ, মনের বেগ—সকলই আপনার চক্ষের জলে বিসর্জ্জন দিলাম। একবার দেখা মাত্র আমার প্রার্থনা। সেই প্রার্থনা পূর্ণ হলেই পরিশ্রম সফল।"

এই কথায় আনন্দময়ী দেবীর মনে কিঞ্চিৎ শান্তি হইল। তিনি মন্দাকিনীকে কহিলেন—"তবে আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দি।"

উভয়ে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আর্য্য জাতির ভূবৃত্তান্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এ যাবৎ যে কিছু বলা হইল, তদ্দ্বারা আর্য্যদিগের পৃথিবীর গোলত্ব, শূন্যোপরিনিহিতত্ব, কদম্ব কেশরের ন্যায় সর্ব্বদিগে বসতিসত্বা, স্তরবিশিষ্টা, অন্তর্গর্ভে অগ্নিপ্লাবনাদি চিহ্নে চিহ্নিতা, ধাতুগর্ভতা, রত্নগর্ভতা, এসকল জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল। পৃথিবীর আকার, সংস্থান, ভূ-কম্পাদির কারণ ও সামুদ্রিক বিবরণ যে তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন, তাহাও প্রকাশ পাওয়া গেল। সম্প্রতি পৃথিবী নিষ্ঠ শক্তির বিষয় কত দূর অবগত ছিলেন তাহার অনুসন্ধান করা যাউক।

শুনা যায় পৃথিবীর নাকি আকর্ষণ শক্তি আছে। তদ্বলে উর্দ্ধস্থান হইতে ফল পত্রাদির পতন, মেঘ হইতে বারিবর্ষণ ও এবমাদি বহুতর কার্য্য সংঘটন হইয়া থাকে। এই মতটির সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা অস্মদাদির নাই। পরন্তু বৃদ্ধ ঋষিদিগের হৃদয় অনুসন্ধান করিলে লক্ষ্য হয় যে, এই মতের একটি অনুপরিমাণ বীজ তাঁহাদের নির্ম্মিত বিপুল বৈদিক গ্রন্থের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আছে। যথা;—

একদা আশ্বলায়ন গোত্রোৎপন্ন কৌশল্য নামা ঋষি মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "হে ভগবন্! আপনি যে সকল প্রাণের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, সেই সকল প্রাণ কোথা হইতে ও কি প্রকারে জন্ম লাভ করে এবং কি প্রকারেই বা এই শরীরে সংযুক্ত হয়, কি প্রকারেই বা আপনা আপনি বিভক্ত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান করে, এবং কি প্রকারে এই ভৌতিক দেহকে ধারণ করে ?"

পিপ্পলাদ কৌশল্যের প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করণানন্তর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিলেন। "প্রাণ সকল কি প্রকারে ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া রাখে—দেহ উৎক্ষিপ্ত না হয় কেন ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি থাকা স্পষ্ট প্রতীত হয়। যথা ;—

"পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য—" (ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষৎ দৃষ্টি কর)

ভাষ্যকার শঙ্করস্বামী এই অংশের ব্যাখ্যা করিলেন ;—

"পৃথিব্যভিমানিনী যা দেবতা প্রসিদ্ধা, সৈষা পুরুষস্য অপান বৃত্তিমবষ্টভ্য আকৃষ্য বশীকৃত্য অধএবাকর্ষনেনানুগ্রহং কুর্ব্বতী বর্ত্তত ইত্যর্থঃ, অন্যথা হি শরীর গুরুত্বাৎ সাবকাশে পতেৎ—" ইত্যাদি।

এই অংশের টীকাকার লিখিলেন,—

"অবষ্টভ্যেত্যনন্তরং—অধ্যাহারেণ বাক্যং পুরয়তি—অধএবা কর্ষণেনেতি। নৃত্যার্থং স্তম্ভাদে রূর্দ্ধমুখেন নিখতাস্য পরিতো বিদ্যমান রজ্জুভি রধএবা কর্ষনেন পতনাভাববৎ অধএবাকর্ষণেন শরীরস্য পতনাভাবঃ সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। অন্যথেতি—পৃথিবীদেবতায়া বিধারণা করণে সাবকাশে ভূম্যাদি পতন প্রতি বন্ধকাভাব স্থলে পতেৎ—" ইত্যাদি।

এই সমস্তের সংক্ষেপ অর্থ এই যে, পৃথিবীদেবতা প্রাণিগণের অপানবৃত্তি অবষ্টব্ধ অর্থাৎ বশীভূত করিয়া অধঃ অর্থাৎ স্বাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন—তদ্বলে এই গুরুভার ভৌতিক দেহ বিধৃত আছে। উৎক্ষিপ্ত হয় না।

যেমন নৃত্যকৌশল প্রদর্শন কারীরা বংশদণ্ডকে ঊর্দ্ধাভিমুখে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার চতুর্দিক্ রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট করে, সেই আকর্ষণ প্রভাবে বংশ দণ্ডের পতনাভাব সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ, পৃথিবীরই আকর্ষণ প্রভাবে দেহের পতন, উৎপতন ও তীর্য্যক্‌পাত প্রভৃতি নিরুদ্ধ আছে। পৃথিবীদেবতা এইরূপ অনুগ্রহ অর্থাৎ স্বীয় আকৃষ্ট শক্তি দ্বারা বিধারণ না করিলে শরীর

অবশ্যই ভূত সকলের সংঘাতিত্ব, অপানের অধঃকর্ষণ ও উদানের উৎপ্রেরণা বশতঃ সাবকাশ অর্থাৎ প্রতিবন্ধক রহিত প্রদেশে পতিত হইত।

এখন বিবেচনা করুন।—কথিত বৈদিক গল্পটির মর্ম্মাংশে যে আকর্ষণ শক্তির কথা আছে, তাহার প্রচার ভূমি কোথায়?—কেবল দেহস্থ অপান বৃত্তি বা দেহের আকর্ষণে? কি সর্ব্বত্র? ঐ বাক্‌ভঙ্গির উদ্দেশ্য পৃথিবীর আকৃষ্ট শক্তি প্রকাশপর কি না?—ফলতঃ শাস্ত্রহৃদয়ে নিপুণ হইয়া লক্ষ্য করিলে প্রতীত হইবে যে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির অস্তিত্ব বিদিত করাই ঐ অংশের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার সত্ত্বা যেমন দেহ বিষয়ে, তেমনি দেহ ভিন্ন অন্য পদার্থ বিষয়েও বটে। আর ঐ বাক্যের একদেশে যে পুরুষ শব্দ আছে, তাহা উপলক্ষ মাত্র, বস্তুত অগ্নিবায়ু জল প্রভৃতি ভূত পদার্থ মাত্রেরই আকৃষ্ট শক্তি আছে। বিশেষ এই যে অগ্নি আদি ভূত স্বজাতীয় পদার্থ ব্যতীত বিজাতীয় পদার্থকে আকর্ষণ করে না, পৃথিবীভূত তাহাও করে।

পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণও আছে, তাহা পরে লেখা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রলাপ সাগর।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

বৈয়াকরণ তরঙ্গ।

ব্যাকরণ ভিন্ন সাহিত্যের সম্যক উন্নতি হয় না। বঙ্গভাষায় ব্যকরণের অভাব নাই, কিন্তু যে রূপ ব্যাকরণ হইলে ভাষা সহজ হইয়া আইসে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। সে অভাব দূর করিতে অদ্যাপি কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। যত দিন সে রূপ এক খানি ব্যাকরণের অসঙ্গতি থাকিবে, তত দিন বঙ্গ ভাষার উন্নতি হওয়ার পক্ষে নিতান্ত সন্দেহ।

এখন যিনি যত ব্যাকরণ লিখিতেছেন, তন্মধ্যে কেহই নূতন হাত দেখাইতে পারিতেছেন না। সুতরাং তাঁহাদের দূরদর্শন নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থকারবর্গের মধ্যে প্রায় কেহই কোন নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন নাই। প্রায়ই পূর্ব্ব প্রচারিত লব্ধ প্রতিষ্ঠ কোন গ্রন্থের একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াই বগল বাজাইতে

থাকেন। ব্যাকরণ সম্বন্ধেও ঠিক এই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র,—সাধারণে কোন নূতন পদার্থ পাইয়া নূতন জ্ঞান লাভ করিবে, এরূপ উদ্দেশ্য নব্য গ্রন্থকারগণের মধ্যে প্রায় অনেকের দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকারের প্রধান মনোবৃত্তি লোভ,—সুতরাং লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। যাহার মূলে অসৎবৃত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহা কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। কোন ব্যক্তির এক খানি গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছা হইল, অমনি বাজারে কোন্ প্রকার গ্রন্থ অধিক বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহাই তিনি অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিলেন ভূগোল, কি ইতিহাস, কি ব্যাকরণ—ইহার যে খানিই হউক—প্রত্যেকেই ঘরে টাকা আনিয়া দিতে পারে। ইহারই একখানির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। তদ্বিষয়ক রাশি রাশি গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। তস্কর বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইলেন। দুই চারি দিনের মধ্যে গ্রন্থ প্রস্তুত হইল। মুরুব্বি খাড়া করিলেন, পুস্তক কোন কোন বিদ্যালয়ে চলিতে লাগিল। গ্রন্থ প্রচারের এখন এই দুর্গতি, সুতরাং নূতন বিষয় পাওয়া কঠিন

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আমিই এক খানি নূতন ব্যাকরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্য তাহার কিছু আদর্শ পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিব।

বঙ্গভাষায় এই কয়টী ব্যঞ্জনবর্ণ আছে;—ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য় র ল স হ। পাঠক মহাশয় দেখুন, একবারে কতগুলি বর্ণ কমাইয়া দিয়াছি। বর্ণগুলি কমাইবার কারণ কি তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা সকলে আমাকে পাগল বলিতে পারেন। কিন্তু যিনি পাগল বলিবেন, তিনি যেন আমার পূর্ব্ব কথাটী স্মরণ রাখেন। পাগল বলিলে আমাকে অতি উচ্চ পদবী প্রদান করা হয়।

ঙ এবং ঞ এই বর্ণদ্বয়ের ব্যবহার বঙ্গভাষায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং বর্ণমালা মধ্যে উহাদের স্থান হওয়া উচিত নহে। নিরর্থক বর্ণের প্রয়োজন নাই।

বঙ্গভাষায় দুইটী নয়ের উচ্চারণ গত বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না; তাহাতে আবার মুদ্রাকরের প্রেত মহাশয়ের অনুগ্রহে তাহার কিছুই ইতর বিশেষ দেখিতে পাই না। সুতরাং একটী ন থাকিলে যথেষ্ট। যদি এই নকার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সর্ব্ববাদী সম্মত না হয়, তবে মোটামুটী এই সূত্রটী জানা থাকিলেই কাজ চলিতে পারিবে, যথা; "রান্তে নির্মাত্রিক"

অর্থাৎ রকারের পর যে ন বসিবে, তাহার মাত্রা দিবে না, নেড়া করিয়া রাখিবে।

দুইটী বয়ের আকারগত ও উচ্চারণগত কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই; সুতরাং উহাদের একটীর প্রয়োজন নাই। একটী মাত্র থাকিলেই প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে।

জ এবং য এই বর্ণদ্বয়ের কোন বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাই না। যে একটু প্রভেদ আছে তাহা কোন কার্য্যের নহে; তবে যখন য কোন শব্দের মধ্যে বা শেষে পড়িয়া যায়, তখন তাহার নীচে একটী শূন্যের আগম হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হয়। সে জন্য য না রাখিয়া য় রাখা গেল।

তিনটী সয়ের প্রয়োজনাভাব, সুতরাং বর্ণমালা হইতে উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই।

এক্ষণে স্বরবর্ণের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সমুদায়ে এই কয়টী স্বরবর্ণ আছে, যথা;—অ ই উ ঋ এ ঐ ও ঔ

অ, ই, উ, ঋ ইহাদিগের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 'অ'র নিকট আর একটী 'অ' আনিয়া দেও, অমনি 'আ' হইয়া যাইবে। 'ই'র নিকট আর একটী 'ই' আসিয়া বসিবামাত্র 'ঈ' হইবে। দীর্ঘ আর কিছুই নহে, ডবল মাত্র, সুতরাং পুনরুক্তি দোষ পরিহার সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ। বর্ণজ্ঞান বিষয়ে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

এখন যে সকল ব্যাকরণ প্রচলিত, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইলে অনেক শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তত শিখিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। এখন যে নূতন নূতন গ্রন্থকার হইতেছেন, ব্যাকরণের নিয়মগুলির উপর তাঁহাদিগের যার পর নাই আক্রোশ। সে গুলিকে পদদলিত করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। এমন স্থলে অধিক আড়ম্বর করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। সংক্ষেপে দুই চারি কথা কহিয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

ব্যাকরণের মধ্যে সন্ধি একটা বড় মজার জিনিস। দুইটী বর্ণ কাছাকাছি হইলেই মিলিয়া যাইবে, ইহাই সন্ধির মূল পত্তন। উহারা মিলিয়া একটী নূতন আকার ধারণ করে, তাহা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। জাতীয় সম্মিলনে ডবলীভূত হয়, সুতরাং তাহার বলও অধিক। বিজাতীয় সম্মিলনে দো আঁসলা হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সুতরাং তাহার আকারগত বৈলক্ষণ্য হওয়া কোন মতে অসম্ভব নহে। অ, ই, উ, ইহাদের জাতীয় মিলনে দীর্ঘতা প্রাপ্তি হয়, যথা; অ+অ=আ; ই+ই=ঈ, উ+উ=ঊ ইত্যাদি। সজাতি সম্মিলনে যে বর্ণের জন্ম হইল, তাহাও সেই জাতি

মধ্যে পরিগণিত, এই জন্য ঐ উৎপন্ন বর্ণের সহিত মূল বর্ণের মিলনেও দীর্ঘতা প্রাপ্তি হয়। বিজাতীয় মিলনে যে অপরূপ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা মুল জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যথা; অ+ই=এ ইত্যাদি। 'ই'র সহিত অন্য স্বরবর্ণ মিলিতে আসিলে এককালে তাহার ব্যঞ্জনত্ব প্রাপ্তি হয়। 'উ'র সহিতও তদনুরূপ। ইতে 'য', 'উ'তে 'ব' ইত্যাদি। স্বর সন্ধির মোটামোটী নিয়ম এই পর্য্যন্ত।

ব্যঞ্জন সন্ধি সম্বন্ধে লিখিবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থী দিগকে একটী বিষয় বলিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ব্যঞ্জন সন্ধিতে অনুস্বার ও বিসর্গের প্রকৃতি অগ্রে জ্ঞাত না হইলে কোন কার্য্যই হইবে না। অনেকে অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলেন, কিন্তু আমরা তত মূর্খ নই যে বৃথা গণ্ডগোল বাড়াইব। 'ম'য়ের হাপ অনুস্বার এবং সয়ের হাপ বিসর্গ। মকারকে সন্ধি দ্বারা যত বাদ দিবার চেষ্টা কর না কেন, কখনই অনুস্বার অপেক্ষা ন্যূন করিতে পারিবে না; সকেও বিসর্গ অপেক্ষা কমাইতে পারিবে না। ইহা ব্যঞ্জন সন্ধির মূল নিয়ম জানিবে।

সন্ধির সহিত শ্রবণ সুখকারিতার অনেক সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ সন্ধি করিলে যদি সন্ধি শ্রুতি কটু হয় বিবেচনা কর, তবে তাহাতে হাত দিয়া অযশভাগী হইবার কোন আবশ্যক নাই। ব্যঞ্জন সন্ধিতে অনেক সময়ে এই দোষ ঘটে, এই জন্য সকল সময়ে সন্ধি না করিলেই ভাল হয়। অতএব ব্যঞ্জন সন্ধির উৎকট নিয়ম সকল এ স্থলে প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না।

বর্ণমালায় যে কারীগরী করা হইয়াছে, তাহাতে আর ণত্ব ও ষত্ব বিধির কোনই প্রয়োজন নাই।

দ্রব্য মাত্র বিশেষ্য, আবার যদ্দ্বারা তাহাকে বিশেষ করা যায় তাহার নাম বিশেষণ।

পাঠকবর্গ যেখানে কোন নিয়ম না পাইবেন, সেখানে সকলই নিপাতনে সিদ্ধ করিতে পারিবেন। নিপাতনটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সময়ে সময়ে ইহার দ্বারা অনেক মান বাচিয়া থাকে।

সমাস সন্ধির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাহারা ছয় ভাই।

লিঙ্গ বিষয়ে বঙ্গ ভাষায় অত্যন্ত গোলযোগ আছে, সে জন্য তৎসম্বন্ধীয় দুই একটী কথা এই 'আদর্শ মধ্যে প্রকাশ করা উচিত। জীব সমষ্টি মধ্যে পুংজাতি মাত্রই পুংলিঙ্গ, স্ত্রী জাতি মাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ। যাহাদিগের জীবন নাই, তাহারা ক্লীব লিঙ্গ। লিঙ্গ বিষয়ক এই নিয়মটী মূল নিয়ম মাত্র, কিন্তু নির্জীব জড় পদার্থ মধ্যেও শাস্ত্রকারেরা লিঙ্গভেদ করি-

য়াছেন। তাহা এত দূর কঠিন যে পণ্ডিতেরাও সময়ে সময়ে আয়ত্ব করিতে পারেন না। সেই অনুসারে বঙ্গীয় বৈয়াকরণেরা পদার্থ মাত্রের লিঙ্গত্ব বিষয়ে ভারি গোলযোগ করিয়াছেন। লিঙ্গ ভেদ বিষয়ে গুটিকতক মোটা কথা জানিয়া রাখিলেই কার্য্য চলিতে পারে। সে কথা গুলি এই ;—

আকারান্ত হইলেই স্ত্রীলিঙ্গ হইবে, তন্মধ্যে বাবা, দাদা, খুড়া, জ্যাঠা, মামা, কাকা, প্রভৃতি কতকগুলি বর্জ্জিত বিধির মধ্যে জানিবে। ঈকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু বটীকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিতে পারি না, কারণ বটীতে দ্রব্যাদি কাটিয়া থাকে ; কাটা মারা প্রভৃতি গোঁয়ারতুমির কাজ স্ত্রীলোকে সম্ভবে না। এই জন্য উহাকে পুংলিঙ্গ বলিতে হইবে। কোন শব্দ বাস্তবিক পুংলিঙ্গ কিন্তু তাহার অর্থ লইয়া বিচার করিলে তাহা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া যায়। বৃক্ষ শব্দ পুংল্লিঙ্গ, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিবে যে উহা স্ত্রী লিঙ্গ। কারণ বৃক্ষে ফল পুষ্প প্রসব করে ; প্রসব শক্তি স্ত্রী লোক ভিন্ন পুরুষের নাই, এই জন্যই উহাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিতে হইবে। ইহার মধ্যেও বর্জ্জিত আছে—যথা ; মান্ধাতা। এই রূপ অর্থ ভেদ করিয়া লিঙ্গ ভেদ করিলে কোন প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা নাই।

ব্যাকরণের যাবতীয় নিয়ম বিবেচনা সাপেক্ষ, শাস্ত্র সাক্ষেপ নহে। এরূপ সৎযুক্তি অনুসরণ করিয়া যিনি ব্যাকরণ লিখিবেন, তিনিই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। যুক্তি হইতেই শাস্ত্রের উৎপত্তি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়ে এত স্বতন্ত্র হইয়াছে, যে প্রথম হইতে দ্বিতীয়ের উৎপত্তি ইহা আদৌ বুঝিতে পারা সুকঠিন। যে যুক্তি যাবতীয় শাস্ত্রের মূল, এবং যে শাস্ত্র অনুসারে সমুদায় বিষয় সম্পন্ন হইতেছে, তাহার মুল হইতে যে ব্যাকরণ হইবে, তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা পক্ষে সন্দেহ মাত্রই নাই। এই জন্যই আমার মত যে, যুক্তি অবলম্বন করিয়া ব্যাকরণ প্রস্তুত করিলে তাহা নিঃসন্দেহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি ভিন্ন বঙ্গভাষায় অপর কেহ ব্যাকরণ লিখিতে সমর্থ হইবে না, ইহা যেন কাহারও মনে উদয় না হয়। ব্যাকরণ লেখা নিতান্ত সহজ, তাহা না হইলে আমি কখনই ব্যাকরণ ঘটিত এ সকল কথা বলিয়া দিতে পারিতাম না। অদ্য এই স্থানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।

রস সাগর।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

এক জন প্রশ্ন করিলেন "গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল।" রস-সাগর পূরণ করিলেন ;—

হেন উপকার আর না করিবে কেহু।
বিরহিণী বলেন কল্যাণে থাক রাহু॥
যদি বল শশী খেয়ে মন্দানল হল।
গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল॥

প্রশ্নের ভাবার্থ এই যে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে কোন রমণী নাশাগ্রস্থিত নোলক দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দিলেন। রসসাগর প্রশ্নকারীর মনোগত ভাব উপলব্ধি করিয়া সেই রমণীকে বিরহিণী সাজাইলেন। পূর্ণচন্দ্রের সহিত বিরহিণীর যে সম্বন্ধ, তাহা দারুণ বৈষম্যে পরিপূর্ণ। চন্দ্রনদর্শণে বিরহিণী রমণীর মনোবেদনা বর্দ্ধিত হয়, এই জন্যই চন্দ্রদেব বিরহনীর শত্রুগণ মধ্যে পরিগণিত। গ্রহণ সময়ে রাহু কর্ত্তৃক চন্দ্রের দারুণ দুর্গতি দর্শনে পুলকিত হইয়া রাহুকে 'কল্যাণে থাক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। চন্দ্রদেবকে আহার করিয়া পাছে রাহুর মন্দানল হয়, এজন্য বিরহিনী, লবঙ্গ ফেলিয়া দিলেন, তাহা খাইলে সমুদায় পরিপাক হইয়া যাইবে। রসসাগরের ঈদৃশ পাদপূরণ সমুহ পাঠ করিয়া তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এক জন ডেপুটী কালেক্টর রসসাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "ওরে আমার তুমি!" রসসাগর উত্তর করিলেন ;—

সোনা রূপা পার কল্যে দেশে দিলে গমি
টাকার আনন দয়েম কানন জমিদারের জমি॥

দেবতা ব্রাহ্মণ হিংসা লাখেরাজ ভূমি।
ডেপুটী কালেক্টর বাবু ওরে আমার তুমি।

প্রশ্নকারী মহাশয় এই শ্লোকে যার পর নাই অপ্রতিভ হইলেন। কেহ কেহ এ শ্লোকটীর পাঠান্তর করিয়াছেন। যথা ;

কোম্পানীর কৃপাবলে পদ পাইয়াছ।
অন্যায় আইন জারি করে বসিয়াছ॥
বাজেয়াপ্ত করে নিলে ব্রহ্মোত্তর ভূমি।
ডেপুটী কালেক্টর বাবু ওরে আমার তুমি॥

কোন্ পাঠ সত্য তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। শেষেরটী নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়।

একবার প্রশ্ন হইল "গগণমণ্ডলে শিবে ডাকে হোয়া হোয়া।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

শক্তিশেলে ম্রিয়মান
লক্ষণের হতজ্ঞান,
রামাজ্ঞায় হনুমান,
　গন্ধমাদনে যায়।

ঔষধ সহিত গিরি,
অন্তরীক্ষে শিরে ধরি,
নন্দীগ্রাম পরিহরি,
　ঊর্দ্ধপথে যায়॥

জাগ্রেত ভরত রায়,
শ্রীরাম চরিত গায়,
হৃদয় ভাসিয়ে যায়,
　নেত্র জলে ধোয়া।

শত্রুঘ্ন দেখ ভেবে,
বিধির আশ্চর্য্য কিবে,
গগন মণ্ডলে শিবে,
　ডাকে হোয়া হোয়া॥

সময়ান্তরে রসসাগর মহাশয় এই ভাবে আর একটী সমস্যা পূরণ করেন, তাহার প্রশ্ন এই'— "গগনে ডাকিছে শিবে হোয়া হোয়া করি।"

শক্তি শেলে পড়ে যবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পর্ব্বত লইয়া যায় পবন নন্দন॥
গমন বেগেতে গিরি কাঁপে থরহরি।
গগনে ডাকিছে শিবে হোয়া ২ করি॥

একদা চন্দ্রগ্রহণ সময়ে রাজা দেখিলেন, সর্ব্বগ্রাস হইল না। আর একটু হইলে, সর্ব্বগ্রাস হইত। রাজা রসসাগরকে কহিলেন, "খেতে খেতে খেলে না।" রসসাগর উত্তর করিলেন;—

খেদে কহে বিরহিনী,
মনিহারা যেন ফণী,
অভাগীর পক্ষে হিত,
　কেহত করিলে না।

অবলার ভাগ্য ফলে,
পশুপতির কোপানলে,
মদনেরে এক কালে,
　দহিয়ে দহিলে না॥

সেতুবন্ধে নানা গিরি,
উপাড়িয়ে বাঁধে বারি,
হনুমান্ বলবান,
　মলয়া ভাঙ্গিলে না।

হেদে বেটা চণ্ডালিয়ে,
পূর্ণশশী মুখে পেয়ে,
গ্রহণেতে গ্রাসিয়ে
　খেতে খেতে খেলে না॥

এরূপ রসভাব সমন্বিত কবিতা পাঠে কাহার না হৃদয় পুলকিত হয়! প্রশ্ন হইল "সেইত যেতে হলো!" রসসাগর পূরণ করিলেন;—

চন্দ্রাবলী সহ কেলী যদি বাঞ্ছা ছিল।
সঙ্কেত করিতে তোমায় কেবা নিষেধিল॥
সুখের যামিনী তব দুখে পোহাইল।
প্রভাতে রাধার কুঞ্জে সেইত যেতে হলো॥

একদা প্রশ্ন হইল "শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী।" রসসাগর উত্তর করিলেন;—

শক্তি শেলে লক্ষ্মণ পড়িলে রণ ভূমি।
কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী॥
শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবার আগে আমি।
শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী॥

এক জন প্রশ্ন করিলেন, "হায় হায় হায় রে।" রসসাগর পূরণ করিলেন;—

দৈতবনে দৈবদশা,
দুর্জ্জয় মুনি দুর্ব্বাসা,
দুর্য্যোধনে পূর্ণ আশা,
করিবারে যায় রে।

দ্রৌপদীর দেখি ক্লেশ,
ব্যস্ত হয়ে হৃষিকেশ,
স্বহস্তে বাঁধিয়ে কেশ,
আপনি জাগায় রে॥

উঠ উঠ প্রিয় সখী,
পাকস্থলী দেখ দিখি,
মেলিতে না পারি আঁখি,
বিষণ্ণ ক্ষুধায় রে।

পাকস্থলী করে ধরি,
ভাসিল নয়ন বারি,
দায়ের উপরে হরি,
ঘটাইল দায় রে॥

নিজ পদ্ম করাঙ্গুলি,
তপাসিয়া পাকস্থলী,
তৃপ্তোস্মি জগৎ বলি,
ভুঞ্জে শ্যাম রায় রে।

অখিল ভুবন তৃপ্ত,
উদ্গারে বিস্ময় প্রাপ্ত,
ঋষিগণ ভয়ে ব্যস্ত,
পলাইয়ে যায় রে॥

গদাহস্ত ভীম রায়,
বাহুড়িয়া পুন রায়,
পঞ্চভাই গুণ গায়,
ধরি রাঙ্গা পায় রে।

যে ছিল মনের বক্রী,
এ রাঙ্গা চরণে বিক্রী,
কত চক্র জ্ঞান চক্রী,
হায় হায় হায় রে॥

প্রশ্নকারী রসাগরের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য কহিলেন, 'আমার মনের মত হয় নাই'; তখন রসসাগর আবার অন্য ভাবে এই মত পূরণ করেলেন ;—

অক্রূর আসিয়া রথে,
লয়ে যায় ব্রজনাথে,
বলরাম তাঁর সাথে,
মধুপুরে যায় রে।

কাঁদি গোপীগণ যত,
প্রেমধারা অবিরত,
যমুনা তরঙ্গ মত,
নয়নে বহায় রে॥

শুনি রাণী যশমতী,
কাঁদিয়ে লোটায় ক্ষিতি,
বলেন রোহিণী সতী,
একি হল দায় রে।

দুপুরে ডাকাতি করি,
প্রাণধন প্রাণ হরি,
কে মোর নিলরে হরি,
হায় হায় হায় রে॥

ইহাতেও প্রশ্নকারীর মনস্তুষ্টি হইল না। রসসাগরের পুঁজি কিছুতেই ফুরাইবার নহে। তিনি আবার

ভাবান্তর পরিগ্রহ করিয়া নিম্নমত শ্লোক রচনা কলিলেন ;—

ব্রজকুলবধূ বলে,
পূর্ব্ব জন্ম পুণ্য ফলে,
পেয়েছিনু তপোবলে,
মনোমত তায় রে।

এবে মোর মন হরি,
শ্রীনন্দ নন্দন হরি,
যান বুঝি মধুপুরী,
বধি অবলায় রে॥

মুখে, কুলে, দিয়া কালী,
না ভজিতে বনমালী,
রসের কলঙ্ক ডালী,
তুলিনু মাথায় রে।

আরে নিদারুণ বিধি,
মোর সঙ্গে বাদ সাধি,
দিয়ে নিলি হেন নিধি,
হায় হায় হায় রে॥

ইহাতেও প্রশ্নকারীর মনস্তুষ্টি হইল না দেখিয়া রসসাগর অন্য ভাবে আর একটী শ্লোক পূরণ করিলেন। যথা ;—

রাজ্যত্যজি রঘুপতি,
পঞ্চবটী অবস্থিতি,
অনুজে বনেতে রাখি,
মৃগপিছে ধায় রে।

ভেকধারী নিশাচর,
সীতার ধরিয়া কর,
অন্তরীক্ষে রথ লয়ে,
চোরা পথে যায় রে॥

জটায়ু শুনিয়ে নাট,
মারে বীর পাকসাট,
রথ সহ রাবণেরে,
গিলিবারে যায় রে।

বজ্রবানে কাটে পাখ,
পলাইয়া মারে ডাক,
এসময় রাম নাই,
হায় হায় হায় রে॥

যখন দেখিলেন ইহাতেও প্রশ্নকারীর আশা মিটিল না, তখন নিম্নমত রচনা করিলেন ;—

রাহু আঁসি ঘেরে শশী,
চকোর খায় সুধারাশি,
বিপ্রঋষি উপবাসী,
ধিক্ বিধাতায় রে।

সুরসিক বিজ্ঞজন,
মান নাহি কদাচন,
অপাত্রে উত্তম দান,
একি দেখি দায় রে॥

হতচ্ছিরে যত মূঢ়,
করে সদা হুড়া হুড়,
মিছুরী ফেলে কোতুরাগুড়,
গাদ মাত্র খায় রে।

আশার সুসার নয়,
দশার বিগুণ হয়,
খোঁড়ার পা খালে পড়ে,
হায় হায় হায় রে॥

প্রশ্নকারী আর তুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এই শেষোক্ত শ্লোকে প্রশ্নকারীর উপর একটু শ্লেষ আছে, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। এমন

লোকের রচনার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কি দুঃখের বিষয় হইতে পারে

ক্রমশঃ

মানবতত্ত্ব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট।

পূর্ব্বে কথিত হইল, যাহার যে প্রকৃতি, তাহার কার্য্য তদনুরূপ হয়। কেবল শিক্ষা দ্বারা কিঞ্চিৎ উৎকর্ষতা হয় মাত্র, কিন্তু অনেক সময় আমরা তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া থাকি। দেখিতে পাই অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধিমান বিশেষ যশস্বী হইতেছে, অর্থাৎ অধিক বুদ্ধিমানকে কেহ চিনিতেও পারিতেছে না। আরও বলা হইয়াছে যে পদার্থের যে শক্তি, তাহা কখনও যায় না, সুতরাং যেমন কার্য্য সেইরূপ ফল হয়। ঐ নিয়ম অনুসারে সমশক্তিমান দুই জন সমান কার্য্য করিলে সমান ফল প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ইহার অসংখ্য উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চেষ্টার ফল কার্য্য। যে যত অধিক চেষ্টা করিবে, তাহার তত অধিক কার্য্য হইবে। কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশেষবিধ কৌশলে নিয়ত চেষ্টা করিয়াও সামান্য ফল প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ কেহ বিনা যত্নে বা সামান্য যত্নে, বুদ্ধির সাহায্য ভিন্ন, অশেষ ফল লাভ করিতেছে। কৃষ্ণপান্তি ছোলা বেচিয়া বড় লোক হইলেন এবং রামকান্ত এক জন সামান্য ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিকে ক্ষণকালের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়া বিখ্যাত ধনী হইলেন। ছোলা কি আর কেহ বেচে নাই, কি আর কেহ কাহাকে আশ্রয় দেয় নাই? তবে ইঁহারা কেন এরূপ সামান্য কার্য্যে এরূপ অধিক ফল লাভ করিলেন? ইহা হইতে সহস্র গুণ কার্য্য করিয়া অপরে কেন ইহার সহস্রাংশ লাভ পায় না? এইরূপ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, সামান্য লোক এইরূপ সামান্য কারণে দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন এবং অনেক মহৎলোক সামান্য কারণে নিস্ব হইয়া গিয়াছেন! কয়েক জন মাত্র সেনা সমভিব্যাহারে ক্লাইব মহাপরাক্রান্ত সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজয় করিলেন কিন্তু মহাপরাক্রান্ত চিতোররাজ প্রতাপ সিংহ অশেষ চেষ্টা করিয়া যবন রাজ্যের কিছুই করিতে পারিলেন না। সামান্য কারণে মলহাররাও রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হইলেন, কিন্তু অলাউদ্দীনা

সহস্র দুষ্কর্ম্ম করিয়াও অক্ষুণ্ণ ছিলেন। অনেক সময়ে অনেক দোষী নির্দ্দোষী হইতেছে এবং নির্দ্দোষী দোষী হইতেছে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, কেহ পূর্ব্ব জন্মের ফল, কেহ বিধিকৃত ললাটলিপি ও কেহ অদৃষ্টকে কারণ বলিয়া থাকেন। অনেকে, যাহার কারণ দৃষ্ট নয়, অর্থাৎ কি কারণে হইল জানা যায় না, তা-হাকে অদৃষ্ট বলেন। আমরা তাহাকে পড়তা বলি; পড়তার নামান্তর অদৃষ্ট। সকল কার্য্যেরই যে এক একটী পড়তা আছে, তাহা বিশেষ রূপে জানা যায়। কিন্তু কি কারণে সেই পড়তা হয় তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। যাহারা অভি-নিবেশ সহকারে তাস খেলিয়া ক্লান্ত হন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, পড়তা কি। যে দিন যে দিকে তাসের পড়তা হয়, সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা ভাঙ্গা যায় না। পড়তার দিকের খেলওয়ার নিতান্ত অজ্ঞ হইলেও জয়ী হইবে, বি-শেষ ক্রীড়ানিপুণ হইলেও পড়তা না হইলে হারিতে হইবে। দেখা গিয়াছে এক দিকে তাসের পড়তা সময়ে সময়ে চারি, পাঁচ বা ততোধিক দিন থাকে। কখন কখন এক দিনেই পড়তা ২। ৩ বার ভাঙ্গিয়া যায়। কেন কোন দিন কোন পক্ষেই পড়তা হয় না। ইহার কারণ কি? এই পড়তা বিনা চেষ্টায় হয়, বিনা চেষ্টায় ভাঙ্গে। আবার চেষ্টা করিলেও হয় না, চেষ্টা করিলেও ভাঙ্গে না। ৩২ খানি কাগজে ক্রমা-গত খেলা করিয়া যখন তাহার পড়তার মর্ম্ম কিছুই বুঝা গেল না, তখন এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্যাপারের পড়তার কারণ কি রূপে বুঝা যাইবে? ফলতঃ তাসের ন্যায় আমাদের কার্য্যেরও পড়তা আছে। সেই পড়তার নাম অদৃষ্ট। এই পড়তা যে সময় হয়, তাহাকে সু-সময় বলে ও যে সময় তাহা হয় না তাহাকে কুসময় বলে; তাহার কারণ স্বরূপে সুগ্রহ বা কুগ্রহের কার্য্য ব-লিয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব ও পরকাল।

মৃত্যুপর্য্যন্তই কি মানবের শেষ, না মৃত্যুর পরে মানব বর্ত্তমান থাকে? মরিলে কি হয়? কেহ বলেন মৃত্যুর পর মানব ভূত হয়; কেহ বলেন, কর্ম্ম ফলানুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে এবং কেহ বলেন, মানব অন্য দেহ অব-লম্বন করে। বোধ হয় শেষোক্ত মতটী সত্য। কিন্তু তাঁহারা যে আত্মার সঞ্চা-লন বলিয়া থাকেন তাহার কোন প্র-মাণ নাই। পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে, জড় পদার্থ হইতে মানবের উৎপত্তি এবং কোন পদার্থের হানি নাই। কেবল পদার্থ সকল এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র। মানব জ-

ন্মিবার পূর্ব্বে পিতৃ মাতৃ দেহে শুক্র শোণিত রূপে ছিল, তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের আহারীয় নানা পদার্থে ছিল এবং তৎপূর্ব্বে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিতে ছিল। মানবদেহ ধ্বংস হইলে পুনরায় মৃত্তিকা জল প্রভৃতিতে পরিণত হইবে; যাহা ছিল, তাহাই হইবে। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে পঞ্চে পঞ্চ মিশান কহেন। আমার দেহ হইতে যে মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতি উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে পুনরায় যে আর একটী দেহ উৎপন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাকেই আমার পরকাল বলা যাইতে পারে। যে পদার্থ হইতে আমার দেহ গঠিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে অবশ্যই কোন দেহরূপে বর্ত্তমান ছিল; তাহাই আমার পূর্ব্বজন্ম। কিন্তু পূর্ব্বে কি ছিলাম এবং পরে কি হইব তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমার এই দেহ হইতে উদ্ভিদ জন্মিতে পারে, কীট বা পতঙ্গ জন্মিতে পারে, পশু বা পক্ষী জন্মিতে পারে এবং মানবও জন্মিতে পারে। যদি আমি পুনরায় মানব হই, তাহা হইলে যদিও তখন বুঝিতে পারিব না যে, পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, কিন্তু সে যে এই আমি, তাহাতে সন্দেহ কি? যদি আমি ভবিষ্যতের জন্য জগতের কোন উপকার করিয়া যাই এবং সে সময়ে তাহার ফল-ভোগ করিতে পারি, তাহা হইলে সে যে আমার কার্য্যের ফল ভোগ করা হইল, তাহাতে সন্দেহ কি? এই আমি যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই আমিও যখন তাহা হইতে উৎপন্ন, এবং এই আমি যখন সুখকর বিষয় লাভে সুখী হই ও সে আমিও যখন সেই রূপ হইব, তখন এই আমাতে ও সে আমাতে প্রভেদ কি? সে আমারই পরকাল মাত্র। পরকালে মানব ভিন্ন অন্য জীব দেহ প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে আমার আমিত্ব থাকিবে। তাহাও আমার পরকাল। যদি আমি কখনও পুনরায় মানব হই, তাহা যে কত কাল পরে হইব, তাহার নিশ্চয়তা কি? ইহার মধ্যে কতরূপ দেহ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? বোধ হয় আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা এই সকল বিবেচনা করিয়াই বলিয়াছেন অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানবদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বের অনন্ত গতি। এই আমি মানব হইয়া ব্যাঘ্রকে হিংস্র বলিয়া ঘৃণিত করিতেছি, আবার এই আমি ব্যাঘ্র হইয়া মানবকে কণ্টক বিবেচনা করিতে পারি। এক্ষণে আমি ভাবিতেছি, কি রূপে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু পৃথিবী হইতে দূরীভূত হইবে ও মানব নিরাপদে বাস করিবে। অবস্থান্তরে হয় ত ভাবিব যে, কত দিনে মানব উচ্ছিন্ন হইবে যে, ব্যাঘ্রের আর শঙ্কার স্থান থাকিবে না।

এক্ষণে হিতকর বলিয়া যাহার অনুষ্ঠান করিব, পরকালে তাহাই আমার অনিষ্টের মূল হইতে পারে। আবার যদি মানব দেহ প্রাপ্ত হই, তবে এক্ষণে যে যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহার শুভফল সে সময়ে প্রাপ্ত হইতে পারিব। পরকালে এইরূপ সুখের আশা আছে, বলিয়াই বোধহয় মানবগণ মৃত্যুকালেও জগতের হিতচিন্তা করে। যে পরকালের বিষয় লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন অন্যকোন রূপ পরকাল যে আছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত পূর্ব্বে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহার বিপরীতই প্রমাণ হইতেছে। বিশ্ব ভিন্ন স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং শক্তি ভিন্ন অপর আত্মার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই বিশ্বশক্তি সকলের মূল। তাহার অপর নাম প্রকৃতি। আমরা সেই প্রকৃতির একবার স্তব করিব। চিরন্তন অভ্যাস আমরা এককালে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

শ্মশানে রজনীগন্ধা

মরি কি ফুল ফুটেছে আজ সকালে!
রাত্রযোগে গেছে ঝড়, মহীরুহ দড়মড়—
জানিনে যে এতসুখ ছিল মোর কপালে!
কি ফুল ফুটেছে আজ সকালে!
ভীষণ প্রলয় ঝড়ে, গোলাপ গিয়াছে পোড়ে,
ফুটন্ত কামিনী গাছ ধরাসাৎ হয়েছে!
বেলী যুঁই যুথি জাতি—সকলেই হীনভাতি
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সব ভুঁয়ে পড়ে রয়েছে।
ভেবেছিনু বুঝি হায়, বাগান শ্মশানপ্রায়—
ভেঙ্গেগেছে সবগাছ এই ভাঙ্গাকপালে!
তানয়—তানয় সখি, একি অপরূপ দেখি
শ্মশানে রজনীগন্ধা ফুটে আছে সকালে।
সুন্দর মোহন কায়—সুন্দর সুরভি তায়
আপন রূপের ভরে ঢলঢল করিছে!
পরশে মলয় বায়—হরষে কম্পিতকায়—
প্রেমাবেশে হেসেহেসে ঢুলেঢুলে পড়িছে
সুরূপ গোলাপচয়—সেওগো কণ্টকময়
কামিনীর পাপ্‌ড়ি সখি! একদণ্ডে খসিবে!
চাঁপার যে অহঙ্কার—গন্ধলয় সাধ্যকার
গরবে উচ্চেতে রয় কেবা তাহা পাড়িবে?
সুন্দর যদিও বেলা—ফুটে সে দিনের বেলা
চাহে সে আপনরূপে জগজ্জনে মোহিতে
পদ্মের মৃণালে কাঁটা সুধায় নাযায় আঁটা
কতযে কোটরে অলি কেবা পারে গণিতে
চাহিনা ওসব ফুল—হোক্ গাছ নিরমূল
খোসে যাক্ পুড়ে যাক্ যাবে যাক্ যেখানে
প্রাণের রজনীগন্ধা ফুটে থাক বাগানে।

ভবভূতি।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ভবভূতি কোন্ সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সূক্ষ্ম রূপে এ প্রশ্নের মীমাংসা করা অসম্ভাবিত। যাঁহার জীবনী ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, অব্দ মাস ও তারিখের সমাবেশ করিয়া তাঁহার জীবিত কাল নির্ণয় করা নিরবচ্ছিন্ন অহম্মুখতার পচিায়ক। গবেষণার প্রসাদে এ পর্য্যন্ত যতদূর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া একটী স্থূল গণনার অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

কাশ্মীর-ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, ভবভূতি কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন (১)। অধ্যাপক উইলসন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে এই যশোবর্ম্মা খৃষ্টীয় ৭২০ অব্দে কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (২)। সুতরাং এতদ্দ্বারা ভবভূতি খ্রীষ্টীয় ৭২০ অব্দের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য বৈজয়ন্তী সেনা সমভিব্যাহারে দিগ্‌বিজয়ে নির্গত হইয়া কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মাকে সমরে পরাজিত করেন (৩)। ইতিবৃত্ত অনুসারে ললিতাদিত্য খৃষ্টীয় ৭১৪ হইতে ৭৫০ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর ৭ মাস ১১ দিন রাজ্য ভোগ করেন (৪)। রাজতরঙ্গিণীতে যখন ললিতাদিত্যের রাজ্যের প্রথমাবস্থায় কান্যকুব্জ বিজয়ের প্রসঙ্গ আছে তখন খৃষ্টীয় ৭২০ অব্দে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার বর্ত্তমান থাকা অস-

১। কবির্ব্বাক্‌পতিরাজ শ্রীভবভূত্যাদি সেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতি বন্দিতাং॥
রাজতরঙ্গিণী। ৪র্থ তরঙ্গ। ১৪৫শ্লোক।

২ Theatre of the Hindus. Vol. II. Introduction P. 4. comp: Indian wisdom, P. 479. Colebbrooke's Essays. edited by E. B. Cowell, Vol 11. P. 123. note (3).

৩। "প্রীতঃ পঞ্চ মহাশব্দভাজনং তৎ ব্যধত্ত সঃ।"
যশোবর্ম্মনৃপং তঞ্চ সমুলমুদপাটয়ৎ॥
রাজতরঙ্গিণী। ৪। ১৪২।

৪ সৈকাদশ দিনান্ সপ্ত মাসান্ ষট্‌ত্রিংশতং সমাঃ। এবমাহ্লাদ্য স মহীং প্রজাচন্দ্রোঽস্তমা যযৌ॥
রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ তরঙ্গ। ৩৬৬।
Comp. As. Res. Vol. XV. P.-52.

স্তাবিত নয়। রাজতরঙ্গিণীতে ভবভূতি ব্যতীত বাক্‌পতি রাজেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়(৫)। ভবভূতি যেমন রসভাব পূর্ণ না রচনা করিয়া ভূমণ্ডলে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, বাক্‌পতি রাজের লেখনী-প্রসূত তাদৃশ কোন গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্বৎসমাজের সুপরিচিত হয় নাই। ধনঞ্জয় প্রণীত দশরূপ গ্রন্থে বাক্‌পতি রাজদেবের একটী কবিতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়(৬) উক্ত গ্রন্থের স্থানান্তরে ঐ কবিতাই মুঞ্জ-প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে (৭)। ইহাতে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ফিট্‌জ্‌ এড্‌বার্ড হল সাহেব অনুমান করেন মুঞ্জ ও বাক্‌পতি উভয়েই অভিন্ন ব্যক্তি (৮)। অতীতসাক্ষী পুরাবৃত্ত মুঞ্জকে সুপ্রসিদ্ধ ধারনগরাধিপতি মহারাজ ভোজের পিতৃব্য বলিয়া পরিচিত করে। মহারাজ ভোজ নিরতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পণ্ডিতবর ভাওদাজী প্রাচীন অনুশাসন লিপির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া স্থির করিয়াছেন, ভোজ খৃষ্টিয় ১০৪২ অব্দে ধার নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (৯)। এদিকে মুঞ্জ এই ভোজের পূর্ব্ববর্ত্তী। পুরাবৃত্তে দৃষ্ট হয়, মুঞ্জ চালুক্যবংশীয় তৈলপ নৃপতি কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। খৃষ্টিয় ৯৭৩ অব্দে তৈলপের রাজত্ব আরম্ভ হয় (১০) সুতরাং এই প্রমাণানুসারে মুঞ্জের জীবিত কাল দশম ও একাদশ শতাব্দীতে নিবেশিত হইতেছে। বাক্‌পতি রাজদেব, মুঞ্জের নামান্তর হইলে, তৎসমকালবর্ত্তী ভবভূতিও খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে পরিগণিত হয়েন। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রামাণিক ইতি-

৫ স্বর্গীয় পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব রাজতরঙ্গিণীর উক্ত শ্লোক হইতে বাক্‌পতি, রাজশ্রী ও ভবভূতি এই তিন জন পণ্ডিতের নাম বাহির করিয়াছেন। কিন্তু দশরূপে যখন যথা 'বাক্‌পতি রাজ দেবস্য' এই বাক্যের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তখন রাজশ্রী নামে কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তির কল্পনা না করিয়া বাক্‌পতি রাজের অর্থ বাক্‌পতি রাজদেব, শ্রীভবভূতির অর্থ শ্রীকণ্ঠ ভবভূতির করাই অধিকতর সঙ্গত।

৬। যথা বাক্‌পতি রাজদেবস্য, প্রণয়কুপিত তাং দৃষ্ট্বা দেবীং সসম্ভ্রম বিস্মিতং ত্রিভুবনগুরুর্ভীত্যা সদ্যঃ প্রণাম পরোঽভবৎ। নমিত শিরসো গঙ্গালোকে তয়া চরণাহতা, ববতু ভবত স্ত্র্যক্ষস্যৈতদ্ বিলক্ষমবস্থিতম্॥

হলসাহেবের প্রকাশিত দশরূপ। ১৮৪ পৃষ্ঠা।

৭। হল সাহেবের প্রকাশিত দশরূপ। ১৮৬ পৃষ্ঠা।

৮ Dasarupa, Ed. by Fitz. Edward Hall, Preface p. 2.

৯ Journal, Royal Asiatic Society Vol 11. P. 412.

১০ Ibid. P. 412

হাস রাজতরঙ্গিণী ভবভূতি ও বাক্‌পতি রাজদেবকে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার সহিত এক সময়ে সন্নিবদ্ধ করিয়াছে। যশোবর্ম্মা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের শাসন দণ্ড গ্রহণ করেন। ভবভূতি ও বাক্‌পতিরাজও এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং মুঞ্জ অপেক্ষা ইঁহারা এক শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। ইহাতে মুঞ্জ ও বাক্‌পতির অভিন্নতা সমর্থিত হইতেছে না। এক শত বৎসর যাঁহাদিগের জীবিত কালের পার্থক্য সম্পাদন করিতেছে, তাঁহাদিগকে এক সময়ের এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অসঙ্গত। পুরাবৃত্তানুসারে মুঞ্জ রাজবংশ সম্ভূত এবং স্বয়ং সামন্ত বহুল জনপদ বিশেষের রাজ উপাধিধারী শাস্তা, পাতা ও বিধাতা। ঈদৃশ মণ্ডলেশ্বরের জনৈক রাজার আশ্রিত ও বৃত্তিভোগী হইয়া থাকা একান্ত অসম্ভাবিত। বোধ হয় লিপি প্রমাদ বশতঃ দশরূপের একটী কবিতাই একবার বাক্‌পতিরাজও পুনর্ব্বার মুঞ্জের প্রণীত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। একবিধ রচনার শীর্ষ-দেশ দুই জন বিভিন্ন সংজ্ঞাধারী রচয়িতার সমাবেশ দেখিয়াই হল সাহেব এই রূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যে দেশের গ্রন্থাবলী পূর্ব্বে কেবল তাল ও ভূর্জ্জ পত্রে বংশময়ী লেখনীর ব্যায়াম ক্রিয়ায় সমূৎপন্ন হইত, সে দেশে গ্রন্থ সমূহের পাঠ পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

যদিও ভবভূতির সতীর্থ বাক্‌পতি রাজের বিষয় ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তথাপি ভবভূতি ও বাক্‌পতি এক সময়-সূত্রে সন্নিবদ্ধ বলিয়া আমরা বাক্‌পতির সম্বন্ধে আরও কয়েককটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। হল সাহেবের প্রকাশিত দশরূপ স্থল বিশেষে একবিধ কবিতার শীর্ষস্থানে মুঞ্জ ও বাক্‌পতির নাম সমাবেশিত করিয়া যে রূপ সংশয়গুলি বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে উহা বিচ্ছিন্ন না হইলে ভবভূতির আবির্ভাব সময় নিঃসন্দিগ্ধ রূপে স্থিরীকৃত হইবে না।

বর্ত্তমান প্রস্তাবের ৫ সংখ্যক টিপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে, রাজতরঙ্গিণী-লিখিত বাক্‌পতিরাজ ও শ্রীভবভূতির অর্থ বাক্‌পতিরাজদেব ও শ্রীকণ্ঠভবভূতি। অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক দশরূপ গ্রন্থও এই অর্থের সমর্থন করিতেছে। আমাদিগের বোধ হয়, ভবভূতির সতীর্থের নাম রাজদেব, আর 'বাক্‌পতি' এই রাজদেবের উপাধি। রাজদেব নামে অমরকোষের একজন টীকাকার আছেন। পণ্ডিতবর কোল্‌ব্রুক্‌ স্ব প্রকাশিত অমরকোষের ভূমিকায় উক্ত গ্রন্থের যে সমস্ত টীকাকারের নাম দিয়াছেন, তাহাতে রাজদেবের নাম

দৃষ্ট হয় (১)। সুতরাং রাজদেবের নামে এক জন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকিতেছে না। ইহাতেই আমরা অনুমান করিতেছি, এই রাজদেব ভবভূতির সতীর্থ এবং বাক্‌পতি তাঁহার উপাধি। আমাদিগের এই অনুমান অমূলক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। রাজদেব যখন অমর কোষের ন্যায় এক খানি প্রসিদ্ধ শব্দার্থমূলক গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন, তখন তাহার বাক্‌পতি উপাধিও অন্বর্থ হইয়া উঠিয়াছে।

রাঘবপাণ্ডবীয় নামক প্রসিদ্ধ দ্ব্যর্থ কাব্যে গ্রন্থকারের নাম কবিরাজ পণ্ডিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ কষ্ট কল্পনা বলে রাজতরঙ্গিণীর বাক্‌পতিরাজের অর্থ বাক্‌পতি কবিরাজ করিয়া রাঘবপাণ্ডবীয় কার ও এই বাক্‌পতি কবিরাজকে এক ব্যক্তি মনে করিতে পারেন। এইরূপ কল্পনার আশ্রয়গ্রাহিদিগের ভ্রম দূর করিবার জন্য আমরা বিষয়ান্তরের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় স্বপ্রণীত 'সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবের' স্থানান্তরে লিখিয়াছেন, "রাঘব পাণ্ডবীয়ের উপক্রমণিকাংশে গ্রন্থকর্ত্তার নাম কবিরাজ পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বোধ হয়, ইহা তাঁহার উপাধি, নাম নহে। উপাধি দ্বারাই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, এই নিমিত্ত গ্রন্থকর্ত্তা আপন গ্রন্থে উপাধিরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বাক্যে অনাস্থাবান্ হইতেছি না। রাঘবপাণ্ডবীয় প্রণেতা সম্ভবতঃ কবিকীর্ত্তি লোলুপ ও পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া নিজ নামের অপহ্নব পূর্ব্বক স্বরচিত কাব্যের উপক্রমনিকা ভাগে উপাধিরই উল্লেখ করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এই কবিরাজ কোন্ সময়ের লোক এক্ষণে তাহারই মীমাংসা করা আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। কবিরাজ স্বপ্রণীত রাঘবপাণ্ডবীয়ের প্রথম সর্গে সুবন্ধু, বাণভট্ট ও আপনাকে শ্লেষবাক্যকুশল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন(১২)। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, সুবন্ধু ও বাণভট্ট,কবিরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী। বাসবদত্তাকার সুবন্ধু প্রাকৃত প্রকাশকার বররুচির ভাগিনেয় (১৩)। পুরাবৃত্তজ্ঞদিগের মতানুসারে এই বররুচি

১ Colebooke's Amara Kosha. Preface. P. 5.

১২। সুবন্ধুবাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি-ত্রয়ঃ। বক্রোক্তি-মার্গ-নিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা॥

রাঘবপাণ্ডবীয়। ৪১।

১৩। বাসবদত্তার সমাপ্তিতে "ইতি শ্রীবররুচি ভাগিনেয় মহাকবি সুবন্ধু

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হর্ষ বিক্রমাদিত্যের সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে সুবন্ধুর বর্ত্তমান থাকা অসম্ভাবিত নয়। কাদম্বরী ও হর্ষচরিত প্রভৃতির প্রণেতা বাণভট্ট কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ। এই হর্ষবর্দ্ধন সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। পরন্তু রাঘবপাণ্ডবীয়ে লিখিত আছে কবিরাজ কাদম্ব বংশকুলতিলক জয়ন্তীপুররাজ কামদেব কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া রাঘবপাণ্ডবীয় প্রণয়ণ করেন(১৪)। এতন্নিবন্ধন কবি স্বপ্রণীত কাব্যের প্রথম সর্গের কয়েকটী শ্লোকে উক্ত রাজার গুণগান করিয়াছেন। ইহার অন্যতম শ্লোকে ধারনগরাধিপতি মহারাজ মুঞ্জের নাম দৃষ্ট হয়। কবি এই শ্লোকে মুঞ্জকে অধঃকৃত করিয়া কামদেবের মহিমা বর্দ্ধিত করিয়াছেন (১৫)। ইহাতে বোধ হয়, কামদেব মুঞ্জের সময় জয়ন্তীপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, অন্যথা তদাশ্রিত কবিরাজ মুঞ্জের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সহিত কামদেবের তারতম্য করিতেন না। এতদ্দ্বারা কবিরাজ মুঞ্জের সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। এক্ষণে এই বাক্‌পতি এই কবিরাজের উপাধি হইলে বাক্‌পতিরাজ ও মুঞ্জ সমসাময়িক হইয়া উঠেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাক্‌পতিরাজ যশোবর্ম্মা নৃপতির সভাসদ ও ভবভূতির সতীর্থ, এবং মুঞ্জ অপেক্ষা প্রায় একশতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং রাঘবপাণ্ডবীয় প্রণেতার কবিরাজ' উপাধির সহিত বাক্‌পতির কোনও সংশ্রব লক্ষিত হইতেছে না।

ভবভূতি স্ব প্রণীত উত্তরচরিতের ষষ্ঠাঙ্কে লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সামরিক দৃশ্যে বিদ্যাধর মিথুন সমাগত হইয়া কুমার যুগলের বিক্রম দর্শন করিতেছেন। বিদ্যাধর চন্দ্রকেতু প্রযুক্ত বায়ব্যাস্ত্র কর্ত্তৃক লবপ্রেরিল বারুণাস্ত্রের সংহার দেখিয়া প্রশংসাবাদ সহকারে বলিতেছেন—

সাধু বৎস চন্দ্রকেতো সাধু স্থানে
বায়ব্যাস্ত্রমীরিতন্ যতঃ।
বিদ্যাকম্পেন মরুতা মেঘানাং

বিরচিতা" ইত্যাদি বাক্য Comp: Vasavadatta. Ed. By Fitzedward Hall. Preface, p. 6.

১৪। রাঘবপাণ্ডবীয়ের সমাপ্তিতে "ইতি শ্রীধরণীধরপ্রসূত কাদম্বকুলতিলক চক্রবর্ত্তি বীর-কামদেব-প্রোৎসাহিত শ্রীকবিরাজ পণ্ডিত বিরচিতে" ইত্যাদি বাক্য।

১৫। শ্রীবিদ্যাশোভিনো যস্য শ্রীমুঞ্জাদিয়তী ভিদা।
ধারাপতিরসাবাসীদয়ং তাবন্ধরাপতিঃ। রাঘবপাণ্ডবীয়। ১৮।

ব্রহ্মণীব বিবর্ত্তানাং ক্বাপি বিপ্রলয়ঃ কৃতঃ।'

'সাবাস চন্দ্রকেতু সাবাস উপযুক্ত সময়েই বায়ব্যাস্ত্র মায়া প্রপঞ্চ প্রয়োগ করেছ। কারণ যেমন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ত্বৎপ্রযুক্ত এই বায়ব্যাস্ত্র লবের অস্ত্র সম্ভূত মেঘরাশিকে একবারে উড়াইয়া ফেলিল(১৭)।"

এই কবিতায় ভবভূতি যে, মায়াবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভাবিত। পূর্ব্বতন বৈদান্তিকগণ পরিণাম বাদেরই আশ্রয়গ্রাহী হইয়া তর্কপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের মতে ঈশ্বর ও জগৎ উভয়ই বিভিন্ন। কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য এই মতে আস্থাবান্ না হইয়া বিবর্ত্তবাদের (মায়াবাদ) প্রচার করেন। বিবর্ত্তবাদের মতানুসারে ঈশ্বর জগৎ হইতে অভিন্ন। মায়া আপাততঃ কুহক জাল বিস্তার করিয়া সাধারণের হৃদয়ে ব্রহ্মকে জগৎ হইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতেছে। যখন এই মায়ার অপগম হয় তখন ব্রহ্ম ও ও পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মধ্যে কোন দ্বৈধ থাকে না অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বতম বৈদান্তিক গণের মত খণ্ডন করিয়া এই বিবর্ত্তবাদের প্রচার করাতে সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যধৃত পদ্মপুরাণে তাহা আধুনিক ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১৮)। যাহা হউক, ভবভূতি যখন পূর্ব্বোক্ত কবিতার উপমাস্থলে এই বিবর্ত্তবাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উহা যে শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভাবিত মত হইতে আহৃত হইয়াছে,তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। এতদ্দ্বারা ভবভূতি শঙ্করাচার্য্যের পর সাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন

১৭। শাঙ্কর শারীরক ভাষ্য। প্রথম অধ্যায়।

১৮। পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতি মহেশ্বর বাক্যং বৌদ্ধ শাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্নশীল পঙ্টাদিকম্। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা। অপার্থং শ্রুতি বাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্॥ কর্ম্ম স্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে। সর্ব্ব কর্ম্ম পরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্যং তত্র চোচ্যতে।। পরাত্ম জীবয়ো রৈকং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মাণোহস্য পরংরূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া।। সার্ব্বস্য জগতোহপ্যস্য নাশনার্থং কলৌযুগে। বেদার্থ বন্মহা শাস্ত্রং মায়াবাদ মবৈদিকম্।। ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণাৎ।

সাংখ্য প্রবচনভাষ্য। Halls Edition. ভূমিকা। ৬-৭ পৃষ্ঠা।

হইতেছেন। পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিত গ-ণের মতে শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন (১৯)। রাজতরঙ্গিনী অনুসারে ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। সুতরাং ভবভূতি যে শঙ্করাচার্য্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে। উত্তরচরিতে মায়াবাদের উল্লেখ আছে বলিয়াও ভবভূতি মুঞ্জের সমসাময়িক হইতে পারেন না। আমরা রাজ তরঙ্গিণীর মত স্থিরতর রাখিবার জন্যই বিষয়ান্তু-রাগত তর্কজাল বিস্তার করিয়া এত বাগাড়ম্বর প্রদর্শন করিলাম। ফলে হল সাহেবের মতানুসারে মুঞ্জ ও বাক্‌পতিকে এক ব্যক্তি না বলিয়া রাজতরঙ্গিণীর অনুসরণ পূর্ব্বক বাক্‌-পতি রাজদেবকে ভবভূতির সতীর্থ বলিয়া স্বীকার করাই অধিকতর সঙ্গত।

(ক্রমশঃ)

১৯। As Res. Vol. X V P. II.180.

সহানুভূতি।

মনুষ্য মনের এমন ক্ষমতা আছে যে, তাহা অপরের হৃদয়ে প্রবেশ ক-রিয়া তাহার শোক দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে পরে। তাহারই নাম সহানুভূতি। যখন আত্মীয় বিয়োগ জনিত দুরন্ত শোকে মানব অস্থির হ-ইয়া রোদন করিতে থাকে, তখন তাহা-র প্রতিবেশী আসিয়া তাহার হইয়া যে দুই বিন্দু অশ্রুপাত করে তাহাই সহানুভূতি। এক জনকে রোদন পরায়ণ দেখিয়া, কারণ না জানিলেও সন্নিহিত মানবমন যে উদ্বেলিত হইয়া উঠে সহানুভূতি তাহার কারণ। সহানুভূতির উজ্জ্বল উদাহরণ সমস্ত সতত দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্বয়ং ও অনুভব করা যায়। সুতরাং তাহা বুঝাইতে প্রয়াস করা অনাব-শ্যক। মানবহৃদয় মাত্রেই সহানুভূতি প্রবৃত্তি অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে। কাব্য নাটক প্রভৃতিতে ভূরি ভূরি সহানুভূতির নিদর্শন আছে।

যখন অশোক কাননে জানকীর জীবনের শোকাবহ কাহিনী শ্রবণ করি-য়া রক্ষকুল বধূ সরমা কহিতেছেন—

"শুনিলে তোমার কথা, রাঘবরমণি,
ঘৃণা জম্মে রাজ ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি রাজ্য সুখ, যাই চলি হেন বনবাসে!"

তখন সরমার হৃদয়ে সহানুভূতি প্রবৃত্তি প্রবল। কিন্তু কাব্য মধ্য হইতে স-হানুভূতির উদাহরণ আলোড়ন করিতে যাওয়া নিরতিশয় ধৃষ্টতা। যেখানে উচ্চ চরিত্রের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে

কবি সেই স্থলেই অন্যান্য গুণের সহিত সহানুভূতির আবির্ভাব করাইয়াছেন। এক জন কোন ভায়ানক যাতনায় অধীর হইয়া ছট্ ফট্ করিতেছে, আর একজন অম্লানবদনে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। কে তাহার প্রশংসা করিবে? সহানুভূতি ব্যতীত সততা, সাধুতা ও মহত্তা অপূর্ণ থাকে।

ফলতঃ সহানুভূতি মানবমনের নিরতিশয় রমনীয় মনোবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি না থাকিলে মানব সমাজের প্রকৃতি অন্যরূপ হইয়া যাইত। যে, জীবনে কখন সহানুভূতি পায় নাই তাহার বৃথায় জন্ম। সে সকল কার্য্যেই নিরুৎসাহী সকল বিষয়েই উদ্যম শূন্য। সংসার তাহার চক্ষে শূন্য। যাহাকে কেহ "আহা" বলিতে নাই, যাহার বিপদে কেহ "হায় হায়" করিতে নাই, যাহার শোকে কেহ অশ্রু ফেলিতে নাই, তাহার জীবন ভারভূত সে জগতে আসিয়া মানবের প্রধান সৎপ্রবৃত্তি দেখিতে পাইল না। সে ভাবিয়া গেল মানব মাত্রেই নিষ্ঠুর ও নারকী।

সাধারণতঃ এই বিশ্বাস যে অপরের বিষাদে আমাদের সহানুভূতি যেরূপ প্রবল হইয়া উঠে আনন্দে সেরূপ হয় না। এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী দার্শনিকগণ আপনাদের মত দৃঢ়ীকরণার্থ নিম্ন লিখিত রূপ হেতুবাদ সংস্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন, সুখী ব্যক্তি স্বতঃই সুখী। আমরা তাহার সুখে যোগ না দিলেও তাহার সুখের অন্যথা হয় না। কিন্তু দুঃখী ব্যক্তির পক্ষে আমাদের সহানুভূতি ও সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুঃখী দেখিয়া তাহার দুরবস্থা, পরকীয় করুণার উপর তাহার নির্ভরতা এবং আমাদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা, সমস্তই এক কালে উপলব্ধ হয়। এই জন্য বিবেচনা হয় যে বিপন্নের বিপদ মোচনার্থ চেষ্টা করিলে তাহার সহিত বাধ্য বাধকতা জন্মিবে। কিন্তু সুখী ব্যক্তির সম্বন্ধে এরূপ হয় না। অপরের সুখে সুখী হইলাম বলিয়া সে কখন আমার নিকট বধিত থাকিতে পারে না। বরং পরের সুখে আমি সুখ সম্ভোগ করিয়াছি বলিয়া আমাকেই কিয়ৎ পরিমাণে বাধিত থাকা যুক্তিযুক্ত। অতএব সুখের সহানুভূতি অপেক্ষা দুঃখের সহানুভূতি আমাদের সমধিক বাঞ্ছনীয়।

উক্তরূপ যুক্তিতে কোন সার নাই। বাস্তবিকই যদি আনন্দ অপেক্ষা বিষাদ আমাদের সমধিক সহানুভূতি আকর্ষণ করে, তাহা হইলে সহানুভূতি প্রবৃত্তির একদিকে অধিক আকর্ষণ স্বীকার করিতে হয়। এবং স্বর্গীয় সহানুভূতিকে কিয়ৎ পরিমাণে নিকৃষ্ট করিতে হয়। কিন্তু তাহা নহে।

যে যাহা ভোগ করিয়াছে সে তাহার পরিমাণ সহজে অনুমান করিতে পারে। সুখ অপেক্ষা শোক মনুষ্য অদৃষ্ট ক্ষেত্রে সমধিক ক্রীড়া করে এবং অনপনেয় অঙ্ক রাখিয়া যায়। এই জন্যই আমরা সুখ অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণ সহজেই অনুমান করিতে পারি এবং এই জন্যই তাহা অধিক পরিমাণে আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। এ যুক্তির যাথার্থ্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কেহ কেহ বলেন, সহানুভূতি অনুমান সাপেক্ষ। ডাক্তার ব্রাউন (Dr. Bronw) প্রমাণ করিয়াছেন যে, যেমন কোন আত্মীয়ের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন, বা কোথায় তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র সেই আত্মীয় সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা মনে পড়ে, তদ্রূপ কাহারও বাহ্যে কোন বিশেষ আন্তরিক ভাবের চিহ্নাদি পরিলক্ষিত হইলে আমাদের হৃদয়েও সেইরূপ ভাবের আবির্ভাব হয়; ইহা অনুমানের কার্য্য। অতএব সহানুভূতি অনেক অংশে অনুমান সাপেক্ষ। ছিন্ন মলিন বস্ত্র, রুক্ষ কেশ, কোটরগত নেত্র, ধূলিপূরিত দেহ, মন্থর ক্ষীণ গতি দেখিলেই সহজেই অনুমান হয় তন্নিষ্ট ব্যক্তি দীনতার অসহ্য যাতনা সহ্য করিতেছে। অমনি তাহার জন্য দুঃখ হয়। সহানুভূতির আবির্ভাব হয়। তাহার দুঃখ বিদূরিত করিতে ইচ্ছা হয়। ডাক্তারপেন (Dr. Payne) সহানুভূতির অনুমান সাপেক্ষতা আরও একটু অগ্রসর হইয়া পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন আমরা যেরূপ ক্লেশ রাশি উপভোগ করিয়াছি, যদি কোন দুস্থ ব্যক্তির অবস্থা সমস্ত তাহার ন্যায় হয়, তাহা হইলে সে ঘটনায় আমাদের সহানুভূতি অধিকতর প্রবল হয়। যাহাতে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে আমরা তাহাই ভাল বুঝিতে পারি, যাহাতে আমাদের জ্ঞান আছে আমরা তাহাই ভাল অনুমান করিতে পারি। ডাক্তার পেন এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগও করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সমুদ্র বক্ষে ঝটিকা জনিত দারুণ ক্লেশভোগ করিয়া কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়াছে, সে যদি দূরে সমুদ্র হৃদয়ে নিমজ্জপ্রায়, সাহায্য রহিত, বিপদাপন্ন পোত সন্দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে যেরূপ সহানুভূতির আবির্ভাব হয়, অন্যের তদ্রূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। কারণ সে যেমন সেই বিপদের পরিমাণ অনুমান করিতে পারে, অন্যে তদ্রূপ পারে না। একমাত্র সন্তান বিয়োগে জননী যেরূপ যন্ত্রণা অনলে বিদগ্ধিতা হন, মৃতবৎসা নারী ভিন্ন অন্যে তাহার পরিমাণ অনুমান করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু এইরূপে সহানুভূতির অনুমান সাপেক্ষতা প্রমানিত হইলে অনেক

গুলি দোষ জন্মে। তৎসমস্তের বিচার ও সমালোচন নিরতিশয় কূট ও নীরস।

কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন সহানুভূতির সহিত ভাল বাসার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। একথা নিতান্ত যুক্তি বিহীন। দুঃখী দেখিলে দুঃখ হইবে, সুখী দেখিলে আনন্দ জন্মিবে ইহাই সহানুভূতির ধর্ম্ম। তাহার সহিত প্রণয় থাকুক বা নাই থাকুক, দয়ার পাত্র দয়া আকর্ষণ করিবে। সন্তোষের পাত্র সন্তোষ আকর্ষণ করিবে। সত্য বটে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শত্রুর বিপদে মনুষ্য সময়ে সময়ে উল্লসিত হয় এবং তাহার সম্পদে আন্তরিক ক্ষুণ্ণ হয় এবং প্রণয়াস্পদ সুহৃদের বিপদে ব্যথিত ও সম্পদে আনন্দিত হয়। ইহা দেখিয়া সহানুভূতিকে প্রণয় সম্বদ্ধ বলা কদাচ সঙ্গত নহে। কারণ শত্রু মিত্র সম্বন্ধে সহানুভূতির ইতর বিশেষ হওয়ার অন্য কারণ আছে। ঈর্ষা, অসূয়া, গর্ব্ব, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি তাহার কারণ। যে ব্যক্তির সহিত আমাদের প্রণয় বা অপ্রণয় কিছুই নাই তাহার ঘটনা দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করিলে সমস্ত পরিস্ফুট হইবে। যদি অপরিচিত ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যক্তির বিপদে বা সম্পদে সহানুভূতি প্রবৃত্তি নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, সহানুভূতি প্রণয় সাপেক্ষ। কিন্তু কদাচ সেরূপ ঘটেনা। সুতরাং সহানুভূতির যে প্রণয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে তাহা বোধ হয় না।

ব্যক্তিগত দোষ গুণ বিচার করিয়াও তাহার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। যখন দেখি, কোন নিমজ্জপ্রায় ব্যক্তি নদীগর্ভে জীবনাশায় অপরিসীম যাতনা ভোগ করিতেছেন—যখন দেখি, ভীষণ হলাহল ধারী ভুজঙ্গ কোন ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাহার জীবননাশার্থ বদন ব্যাদান করিয়াছে—যখন দেখি, নরহন্তা তামসী রজনীতে নিরপরাধী পথিকের জীবন সংহারার্থ অসি উত্তোলন করিয়াছে—যখন দেখি, দুরন্ত সিংহ পর্য্যটকের রুধির পানাশয়ে লম্ফ ত্যাগের উপক্রম করিতেছে, তখনই আমরা তাহার সাহায্যার্থে পরিধাবিত হই। সে ব্যক্তি সৎ কি অসৎ, তাহার দ্বারা জগতের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইবে তাহা মুহুর্ত্তেকের নিমিত্তও ভাবনা করি না। দৃষ্টি মাত্র তাহার উদ্ধারার্থ ধাবিত হই, অসাধ্য হইলে অন্ততঃ তজ্জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হই। সহানুভূতি তাহার প্ররোচক। সহানুভূতি কোন দোষ গুণ সাপেক্ষ নহে।

কোন কোন দার্শনিক সহানুভূ-

তিকে মানব হৃদয়ের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়া বিবেচনা করেন না। কিন্তু স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, যদিও সহানুভূতির অন্য কোন ধর্ম্মের সহিত কোন রূপ সম্বন্ধ থাকে, তথাপি ইহা যে মানব হৃদয়ের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।

ফলতঃ যাহাই হউক সহানুভূতি মানব হৃদয়ের অতি উচ্চ মনোবৃত্তি। সহানুভূতি মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব দিতেছে, ও মনুষ্য নামের অযথা গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। সহানুভূতি না থাকিলে জগতের অর্দ্ধাধিক আনন্দ বিলয় প্রাপ্ত হইত। সংসার সমভাবাপন্ন ও বিরক্তি জনক হইয়া উঠিত। সকলেই সকল সময় সুখ ভোগ করিবে বা সকলেই সময় ক্লেশ ভোগ করিবে প্রাকৃতিক নিয়ম ইহার বিরোধী। সহানুভূতি এই বিরোধিতার মধ্যস্থ। সম্পদে কি সুখ তাহা তুমি জানিতে পারিলে না। কিন্তু তোমার পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী সম্পন্ন। তুমি তাঁহার সুখেই সুখী। তাহার বাটীতে মহোৎসব সময়ে যখন অগণ্য লোক উদর পূরিয়া আহার করিতেছে ও মহানন্দে রত রহিয়াছে, তখন যাহার হৃদয়ে ঈর্ষা বা কপটতা নাই, সে আত্মবৎমনে করিয়া প্রতিবেশীর আনন্দে আনন্দ ভোগ করিতেছে। আর যে ব্যক্তি শোকের দুঃসহ ভারে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে তোমার আত্মীয়তায়, তোমার চক্ষের জলে, তোমার উৎসাহে, সে সমস্ত ভুলিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, বিষয় ব্যাপারে নিমগ্ন হইতেছে। সহানুভূতি হৃদয় ভাণ্ডারের অতি মহার্হ রত্ন। সহানুভূতি না থাকিলে সুখী দুঃখীর সংসর্গ হইতে দূরে পলায়ন করিত ও দুঃখী সুখীর অনায়ত্ব সুখের অংশ লইত না। এইরূপে সংসার উদ্যম শূন্য, চেষ্টা শূন্য, উৎসাহশূন্য, বিষাদপূর্ণ স্থান হইয়া উঠিত। কোন বিপন্নের বিপদ, উপবাসীর কষ্ট, নিরাশ্রয়ের ক্লেশ, ব্যাধির যাতনা প্রভৃতি অসংখ্যবিধ সাংসারিক ক্লেশ অপর কেহই হৃদয়ঙ্গম করিত না। সংসার কি বিসদৃশ স্থান হইত!

প্রলাপ।

আয় লো প্রমদা! নিঠুর ললনে
বার বার বল কি আর বলি!
মরমের তলে লেগেছে আঘাত
হৃদয় পরাণ উঠেছে জ্বলি!

আরবলিব নাএই শেষবার
এই শেষবার বলিয়া লই
মরমের তলে জ্বলেছে আগুণ
হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সই!

পাষাণে গঠিত সুকুমার ফুল!
হুতাশনময়ী দামিনী বালা!
অবারিত করি মরমের তল
কহিব তোরে লো মরম জ্বালা!

কত বার তোরে কহেছি ললনে!
দেখায়েছি খুলে হৃদয় প্রাণ!
মরমের ব্যথা, হৃদয়ের কথা,
সে সব কথায় দিস্‌নি কান।

কত বার সখি বিজনে বিজনে
শুনায়েছি তোরে প্রেমের গান,
প্রেমের আলাপ—প্রেমের প্রলাপ
সে সব প্রলাপে দিস্‌নি কান!

কত বার সখি! নয়নের জল
করেছি বর্ষণ চরণতলে!
প্রতি শোধ তুই দিস্‌নিকো তার
সুধু এক ফোঁটা নয়ন জলে!

সুধা ওলো বালা! নিশার আঁধারে
শুধা ওলো সখি! অমার রেতে
আঁখি জল কর্ত করেছে গোপন
মর্ত্ত্য পৃথিবীর নয়ন হ'তে!

শুধা ওলো বালা নিশার বাতাসে
লুটিতে আসিয়া ফুলের বাস
হৃদয়ে বহন করেছে কিনা সে—
নিরাশ প্রেমীর মরম শ্বাস!

সাক্ষী আছ ওগো তারকা চন্দ্রমা!
কেঁদেছি যখন মরম শোকে—
হেসেছে পৃথিবী, হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিয়া হেসেছে লোকে!

সহেছি সে সব তোর তরে সখি!
মরমে মরমে জলন্ত জ্বালা!
তুচ্ছ করিবারে পৃথিবী জগতে
তোমারি তরে লো শিখেছি বালা!

মানুষের হাসি তীব্র বিষমাখা
হৃদয় শোণিত করেছে ক্ষয়!
তোমারি তরেলো সহেছি সে সব
ঘৃণা উপহাস করেছি জয়!

কিনিতে হৃদয় দিয়েছি হৃদয়
নিরাশ হইয়া এসেছি ফিরে;
অশ্রু মাগিবারে দিয়া অশ্রু জল
উপেক্ষিত হয়ে এয়েছি ফিরে।

কিছুই চাহিনি পৃথিবীর কাছে—
প্রেম চেয়েছিনু ব্যাকুল মনে।
সে বাসনা যবে হ'ল না পূরণ
চলিয়া যাইব বিজন বনে!

তোর কাছে বালা এই শেষ বার
ফেলিল সলিল ব্যাকুল হিয়া;
ভিখারি হইয়া যাইব লো চলে
প্রেমের আশায় বিদায় দিয়া!

সেদিন যখন ধন, যশ, মান,
অরির চরণে দিলাম ঢালি
সেই দিন আমি ভেবেছিনু মনে
উদাস হইয়া যাইব চলি

তখনো হায়রে একটি বাঁধনে
আবদ্ধ আছিল পরাণ, দেহ।
সে দৃঢ় বাঁধন ভেবেছিনু মনে
পারিবে না আহা ছিঁড়িতে কেহ!

আজ ছিঁড়িয়াছে, আজ ভাঙ্গিয়াছে,
আজ সে স্বপন গিয়াছে চলি।
প্রেম ব্রত আজ করি উদ্যাপন
ভিখারি হইয়া যাইব চলি!

পাষাণের পটে ও মূরতি খানি
আঁকিয়া হৃদয়ে রেখেছি তুলি
গরবিনি ! তোর ওই মুখ খানি
এ জনমে আর যাব না ভুলি !

মুছিতে নারিব এ জনমে আর
নয়ন হইতে নয়ন বারি
যত কাল ওই ছবি খানি তোর
হৃদয়ে রহিবে হৃদয় ভরি।

কি করিব বালা মরণের জলে
ঐ ছবি খানি মুছিতে হবে !
পৃথিবীর লীলা ফুরাইবে আজ,
আজিকে ছাড়িয়া যাইব ভবে !

এ ভাঙ্গা হৃদয় কত সবে আর !
জীর্ণ প্রাণ কত সহিবে জ্বালা !

মরণের জল ঢালিয়া অনলে
হৃদয় পরাণ জুড়াল বালা !

তোরে সখি এত বাসিতাম ভাল
খুলিয়া দেছিনু হৃদয়-তল
সে সব ভাবিয়া ফেলিবি না বালা
স্মুধু এক ফোটা নয়ন জল ?

আকাশ হইতে দেখি যদি বালা
নিঠুর ললনে ! আমার তরে
এক ফোটা আহা নয়নের জল
ফেলিস্ কখনো বিষাদ ভরে !

সেই নেত্র জলে—এক বিন্দু জলে
নিভায়ে ফেলিব হৃদয় জ্বালা !
প্রদোষে বসিয়া প্রদোষ তারায়
প্রেম গান সুখে করিব বালা !

—০০——

বিমলা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তিন দিন হইল বিমলার উদ্দেশ নাই। সহসা তিনি কোথায় গেলেন বা তাঁহার কি হইল তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। আত্মীয়বর্গ ঘোর চিন্তায় আকুল। তাঁহার জননী অহর্নিশ রোদন করিতেছেন। বিমলার বাটী অন্ধকার। বিমলার পরিষ্কার প্রকোষ্ঠ ধূলি জঞ্জাল সমাচ্ছন্ন। তাঁহার পুস্তক সমস্ত অব্যবস্থিত।

অতি প্রত্যুষে যোগেশ স্বীয় নিবাসালয় সন্নিধানে পদব্রজে বায়ু সেবন করিতেছেন। তাঁহার মুখ মণ্ডল বিশুষ্ক, ঘোর চিন্তায় আকুল, আকৃতি শ্রীভ্রষ্ট, লোচন যুগল অস্থির, বদনে কালিমা; আহার ও নিদ্রার অন্যথায় দেহ বিশীর্ণ।

সময়টী অতি মনোহর। বৃক্ষপত্র কাঁপাইতে কাঁপাইতে, বিলম্বিত ফল দুলাইতে দুলাইতে, বনলতিকা নাচাইতে নাচাইতে, অল্প অল্প শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। পথ পার্শ্বস্থ গুল্ম সমস্ত শিশিরাবরণে আবরিত রহিয়াছে। এখনও প্রকৃতি-নীরব। কেবল সময়ে সময়ে এক এক জন "তারা দুর্গতি নাশিনী মাগো" বলিয়া সুপ্তোত্থিত হইতেছে। এক বৃদ্ধ উঠিয়া ঘরের দাবায় বসিয়া তামাক খাইতেছে,

ও কাসিতেছে, সময়ে সময়ে উচ্চস্বরে হাই তুলিতেছে, তুড়ি দিতেছে ও দুর্গা নাম উচ্চারণ করিতেছে। দুইটী কুকুর খেলা করিতেছে। একটী ছুটিতেছে আর একটী তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। নিকটস্থ হইয়া উভয়ে উভয়কে কামড়াইতেছে, উল্লঙ্ঘন করিতেছে, একটী পড়িতেছে, আবার ছুটিতেছে আবার নিকটস্থ হইতেছে। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিল। পার্শ্বস্থ আম্র বৃক্ষ হইতে সপ্তস্বর নিনাদিনী মধুময়ী কণ্ঠে পাপিয়া "চোখ্ গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য দেখা দিলেন। বৃক্ষ, গৃহ, দ্বার, বন সমস্ত পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

চিন্তাকুল চিত্ত যোগেশ আপন মনে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন। অস্থির চিত্তের নিয়মানুসারে যোগেশ ভ্রমণ করিতেছেন, তাহার সীমা নাই। কখন বা একটু দূরে গিয়া পড়িতেছেন। কখন বা মধ্য পথ হইতে বিপরীত দিকে ফিরিতেছেন। পশ্চাতে কোন শব্দ হইতেছে, তিনি ভাবিতেছেন, কে বুঝি আমায় ডাকিতেছে। পার্শ্বে কোন অব্যক্ত ধ্বনি হইতেছে, তিনি ভাবিতেছেন, কে বুঝি কাঁদিতেছে। যোগেশ এইরূপ নিদারুণ চঞ্চল চিত্তে পরিভ্রমণ করিতেছেন,—কখন বা বিনা প্রয়োজনে একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন। যোগেশ যখন এবম্বিধ অবস্থায় অবস্থাপিত, সেই সময় একজন লোক তাঁহার নিকটস্থ হইল। যোগেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না। লোক বিশেষ নিকটস্থ হইল। যোগেশের সে দিকে লক্ষ্যও নাই—মনোযোগও নাই। লোক নিকটস্থ হইয়া বুঝিল, যোগেশ বাবুর মনের অবস্থা ভাল নাই। আগন্তুক "হাঃ হাঃ," শব্দে হাসিয়া উঠিল। যোগেশ চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন—দেখিলেন ব্যক্তিটা রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী অতি ব্যঙ্গ ব্যঞ্জক বিকট হাস্য সহকারে কহিল,—

"হাঃ হাঃ, কেও যোগেশ বাবু যে, হাঃ হাঃ—"

যোগেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"মহাশয়! অতি প্রত্যূষে কোথায় গমন কচ্চেন?"

রামকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন,—

"যাব আর কোথা, মহাশয়ের নিকটেই আসা।"

যোগেশ অপেক্ষাকৃত বিস্ময় সহকারে কহিলেন,—

"আমারই নিকটে? আসুন বাটী গিয়া বসি চলুন।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—

"সময় অল্প, এখন বসা ভার।"

যোগেশ ভদ্রতা সহকারে কহিলেন,—

তবে কি অভিপ্রায়ে আসা বলুন।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"অভিপ্রায় এমন কিছু নয়। রুদ্রকান্ত বাবাজীর তোমার সহিত কি দরকার আছে; একবার যেতে পারবে কি?"

যোগেশ বিনীত ভাবে বলিলেন,—

"যে আজ্ঞা, আমি সময়ান্তে গিয়া সাক্ষৎ করিব।"

রামকৃষ্ণ প্রস্থান করিলেন। যোগেশ অব্যবস্থিত ভাবে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত আরও অস্থির হইল। নানাবিধ চিন্তা আসিয়া হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কি মনে হইল, সত্বর বাটী আসিবার নিমিত্ত পুনরাবর্ত্তন করিলেন। সহসা একটী পরিচিতা প্রতিবেশিনী বালিকা তাঁহার নিকটে আসিল। তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না। দেখিলেন—কিন্তু সে দেখা শূন্য দৃষ্টি। বালিকাকে পশ্চাতে রাখিয়া যোগেশ চলিয়া গেলেন। বালিকা তখন সংকুচিত ভাবে কহিল,—

"দাদা—"

যোগেশ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া বালিকার বদনের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিলেন। বালিকা ভীতা হইয়া যাহা বলিবে, তাহা ভুলিয়া গেল। ক্ষণপরে কোমল স্বরে যোগেশ জিজ্ঞাসিলেন,—

"কুসুম! কোথা যাচ্ছ?"

কুসুমের সাহস হইল। বলিল,—

"দাদা তোমার এই চিঠী।"

যোগেশ কুসুমের হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন,—শিরোনামে তাঁহারই নাম লেখা। পত্র তাঁহারই বটে। লেখাটী যেন স্ত্রীলোকের মত। হস্ত বিকম্পিত হইল। মন অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যস্ততা সহ যোগেশ পত্রিকা উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এই কয়টী কথা লিখিত ছিল।

"বিমলা রুদ্রকান্ত বাবুর চাতুরীতে অবরুদ্ধা হইয়াছেন। কোথায় আছেন জানিনা। আপনারা তাঁহার জন্য ঘোর চিন্তিত বলিয়া যাহা জানিতাম তাহা জানাইলাম। অনুসন্ধান করিলে সহজে সন্ধান পাইবেন। হতাশ হইবেন না।

"পত্র খানি পড়িয়া ছিন্ন করিবেন নচেৎ আমার বড় বিপদ হইবে।

"যিনি এই কার্য্যের মূল, তাঁহার নাম আপনাকে জানাইলাম। অনুরোধ করি তাঁহাকে বিপদাপন্ন বা অপমানিত করিবেন না,

"আমি কে তাহা জানিয়া কাজ নাই। ইতি"

পত্রে তারিখ নাই। লেখকের নামও নাই। যোগেশ পত্র পড়িয়া বাতুলের ন্যায় অস্থির হইলেন। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিঙ্কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া যোগেশ প্রথমতঃ অজ্ঞাত লেখকের অনুরোধানুযায়ী পত্র খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কুসুম ভাবিল, পত্র খানি দিয়া সে বুঝি কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিবে। ভয়ে,—এক দৌড়ে যোগেশের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল। যোগেশ তাহাকে আরও কি জিজ্ঞাসিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না।

ব্যস্ত হইয়া যোগেশ ভবনে প্রবেশ করিলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া যোগেশ রুদ্রকান্তের সহিত সাক্ষাতাশয়ে প্রস্থান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রকান্ত ও রামকৃষ্ণ বৈঠকখানায় বসিয়া চরস ফুকিতেছেন। মন বড় প্রফুল্ল। উভয়ে যেন আনন্দ সাগরে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"মামা! তোমার কি বন্দোবস্ত আমি বুঝিতে পারি না, এখনও তুমি যে যেতে বারণ কর এর মানে কি?"

মাতুল রামকৃষ্ণ বলিলেন,

"হাঃ হাঃ বাবা! ভাল ভিন্ন মন্দ কথা তোমার মামা কখন বলেন না।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—"তা যাক, যোগেশের রকমটা কি দেখ্‌লে বল তো বাবা।"

"আর বাবু সে কথা কও কেন?"

"কি রকম?"

"দেখ্‌তেই পাবে, আস্‌বে এখনি।"

"এলে তার সঙ্গে কোন অভদ্র ব্যবহার করা হবে না, লোকটা শক্ত।"

"তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ! ওর কি ক্ষমতা আছে?"

"না বাবু তুমি জান না।"

"তুমি রেখে দেও। ঢের ঢের লোক দেখেছি। তুমি ভয় খেও না। আমি থাক্তে, তোমার কোন ভয় নাই।"

মাতুল ও ভাগিনেয় যখন এবম্বিধ সদালাপে ব্যাপৃত সেই সময় উন্মত্তবৎ অস্থিরতা সহকারে যোগেশ তথায় প্রবেশ করিলেন। অতি কষ্টে মনোবেগ সম্বরণ করিয়া যোগেশ বলিলেন;—

"মহাশয়! আমাকে কি অভিপ্রায়ে স্মরণ করিয়াছিলেন?"

রুদ্রকান্ত সহাস্যে বলিলেন,—

"বসুন, ব্যস্ত হতেছেন কেন?"

যোগেশ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"কেন ব্যস্ত জানেন না কি?"

রুদ্রকান্ত পূর্ব্ববৎ ভাবে বলিলেন,—

"কই না, কি বলুন দেখি?"

কথার প্রত্যেক অক্ষরে যেন দুঃসহ পরিহাসের স্বর প্রকাশিত হইতে লাগিল। যোগেশ কষ্টে তাহা সহ্য করিলেন। বলিলেন,—

"সে কথা শুনিয়া মহাশয়ের বিশেষ কোন লাভ নাই। আপাততঃ কি জন্য আমায় ডাকিয়াছিলেন বলুন।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"যোগেশ বাবু! ঘোড়ায় চড়ে এসেছ না কি?"

যোগেশ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"কেন ব্যঙ্গ করেন? আমার শরীর ও মন বড় অসুস্থ আছে। আপনাদের যদি কোন কার্য্য থাকে বলুন।"

রুদ্রকান্ত ব্যঙ্গ স্বরে কহিলেন,—

"যোগেশ বাবু? একটী বড় বিস্ময়-জনক সংবাদ শুনলাম, সত্য কি?"

যোগেশ বলিলেন,

"কি?"

রুদ্রকান্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যঙ্গ সহকারে কহিলেন,—

"আপনার বিমলা না কি,—"

যোগেশ আর বলিতে দিলেন না। তাঁহার সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল। তাঁহাকে যেন নিদ[illegible] সর্পে দংশন করিল। প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—

"মহাশয়, কি আমাকে পরিহাস করিবার নিমিত্ত ডাকিয়াছিলেন!"

"এ কথায় কি পরিহাস হলো?"

যোগেশ বলিলেন,—

"আপনি জানেন মনুষ্যকে নিরর্থক কষ্ট বা যাতনা দেওয়া মহা পাপ।"

রামকৃষ্ণ গাল টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। রুদ্রকান্ত কহিলেন,-

"মহাশয়! আমার উপর রাগ করিবেন না। আমি শুনিয়াছি মাত্র।"

যোগেশ পূর্ব্ববৎ ভাবে কহিলেন,—

"রুদ্রকান্ত বাবু! আপনি ভদ্র সন্তান, ধনবান। আপনার ব্যবহার সকলের আদর্শ স্থল হওয়া আবশ্যক। প্রভুতার সহিত সততা মিশ্রিত হইলে অতি মনোরম হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার রীতি, নীতি, কার্য্য ব্যবহার এতই নিন্দনীয় যে, তাহা মনে করিতেও লজ্জা ও ঘৃণার উদয় হয়। কোথায় আপনি সমাজের মস্তক স্বরূপ হইয়া দেশের দুর্নীতি সমস্ত বিদূরিত করিবেন, না আপনার দুর্নীতিতে জন সাধারণ জ্বালাতন। ভাবিয়া দেখুন, রুদ্রকান্ত বাবু! একবার ভাবিয়া দেখুন, আপনি সম্প্রতি কি ঘোরতর দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। আমার সহিত প্রতারণা করিবেন না; বলুন বিমলা কোথায় আছেন?"

রুদ্রকান্ত হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিলেন,—

"যোগেশ বাবু বেশ লেক্‌চর দিতে পারেন তো? রামনগরে আপনি মধ্যে

মধ্যে লেক্‌চর দিতেন বুঝি? আমিও কলিকাতায় বার কতক লেক্‌চর দিয়াছিলাম। একবার পুলোগামি নিবারণ জন্য টৌউনহলে এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা করি। তাহার সার মর্ম্ম সব কাগজে বেরিয়েছিল। ইংলিস ম্যান কাগজ বলেছিল বাঙ্গালিতে এমন লেক্‌চর আর কেহ দিতে পারে না।—"

যোগেশ রুদ্রকান্তের আত্মগরিমা স্রোত থামাইয়া বলিলেন,—

"মহাশয় বলিলেন না, বিমলা কোথায় আছেন?"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"বিলক্ষণ কথা, আমি তা কোথ্যেকে জানবো? আমি যেমন বাজার গুজব শুনেছিলেম তাই মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেম, আর কিছু জানি না।"

যোগেশ বলিলেন,—

"বড় দুঃখের বিষয় নিয়ত পাপাচরণে আপনার হৃদয় পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছে। পাপে আর কষ্ট বোধ হয় না। যাহা হইয়াছে তাহার আর উপায় নাই। এখনও সতর্ক হউন। আর পাপের উপর পাপ করিবেন না। প্রতারণা করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনি জানেন না বোধ হয়, যে আপনার এই কার্য্য কতজনের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক যাতনা উৎপাদন করিয়াছে, এই কার্য্য কতজনের সর্ব্বনাশের মূল স্বরূপ হইয়াছে। এখনও ক্ষান্ত হউন, আমাকে ক্ষমা করুন। সমস্ত কথা বলিয়া, আমাকে সুস্থির করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জগতে এ কথা আর কেহ জানিতে পারিবে না।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"যোগেশ বাবু! আপনি যে পাগলের মত কথা বলছেন, দেখতে পাই। বড় দুঃখের বিষয় যে, আপনার বুদ্ধি এরূপ খারাপ হয়ে গিয়াছে। আপনি স্থির হউন।"

রামকৃষ্ণ বিকট হাস্য করিলেন!

যোগেশ কহিলেন,—

"রুদ্রকান্ত বাবু, আপনি সহজে এ কথা না বলিলে কোন জোর নাই। কিন্তু জানিবেন, কিছুই আমার অগোচর থাকিবে না। এখন না হয় দুই দণ্ড কাল পরে আমি সমস্তই জানিব। রুদ্রকান্ত বাবু ব্যাপারটী সহজ নয়। চেষ্টা করিলাম, সহজে মিটিল না, আমার আর দোষ নাই। মনে করিবেন না যে আমি এ বিষয়ের এই পর্য্যন্ত মাত্র অনুসন্ধান করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে যতদূর সম্ভব মর্ম্মবেদনা দিয়াছেন। কিন্তু আমি এতদূর নীচ ও ইতর নহি যে এজন্য আপনার সহিত কোন অভদ্র ব্যবহার করি। সহজে শেষ হয় ইহাই আমার ইচ্ছা, তাহা হইল না। অগত্যা আমাকে উপায়ান্তর অবলম্বন

করিতে হইবে। ভাবিবেন না যে, আপনার সম্পত্তি রাশি আপনার এই ঘোর বিগর্হিত কার্য্য লুকাইয়া রাখিতে পারিবে। ভাবিবেন না যে, আপনার অবিসম্বাদিত ও অযথা প্রভুতা সমস্ত ঢাকিয়া রাখিবে। অমি কিছুতেই ভীত নহি। বিমলা আমার প্রাণপেক্ষা প্রিয়-তর তাহা কে না জানে! সেই বিমলার জন্য কোন কার্য্যই আমার পক্ষে কঠিন নহে। আমি অকাতরে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইব, কিন্তু রুদ্রকান্ত বাবু আপনার নিস্তার নাই জানিবেন। আপনি বুঝিতেছেন না, কিন্তু আমি দেখিতেছি আপনার জন্য অগণ্য বিপদ উপস্থিত। অধিক কথা নিষ্প্রয়োজন। আমি এক্ষণে বিদায় হই। আপনি স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান থাকুন।"

এই বলিয়া যোগেশ গাত্রোত্থান করিলেন। রুদ্রকান্ত ও রামকৃষ্ণ সমস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"পিপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।"

যোগেশ প্রস্থান করিলেন। মাতুল ও ভাগিনেয় বসিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন

কমলেকামিনী। শ্রীকানাইলাল মিত্র প্রণীত। শ্রীদেবকী নন্দন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ৩৩ নং ভবানী চরণ দত্তের লেন, দাস এণ্ড কোম্পানির সাএন্স প্রেসে শ্রীদেবকী নন্দন সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১লা জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ সাল।

কমলেকামিনী নামটী বড় মধুর। এই নামের সহিত আমাদের কতকগুলি চিরসঞ্চিত জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া আছে। শুভক্ষণে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সম্মোহিনী বীণা কমলেকামিনীর গীত প্রচার করিয়াছে। কমলেকামিনী শুনিলেই মনে হয় যেন হৃদয়মনবিহ্বলকারী দিগন্ত বিস্তৃত বারিরাশি মধ্যস্থ কমলাসন সমাসীনা নবীনা ললনা বাম হস্তে দুর্জ্জয় করিরাজকে ধারণ করিয়া অক্লেশে গলাধঃ করিতেছেন এবং পণ্য ভারপূর্ণ তরণীস্থিত প্রবাসী বণিক শ্রীমন্তের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও ভীতি সঞ্চার করিতেছেন। আর কমলেকামিনী শুনিলে মনে হয় যে, কাছাড় রাস মণ্ডপে ব্রহ্মরাজকুমারী, লাবণ্য-

ময়ী, প্রেমোন্মত্তা রণকল্যাণী, বীরবর শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে মূর্চ্ছিতা রহিয়াছেন। আমাদের সমালোচ্য কমলে-কামিনী নূতন জিনিষ। এ কমলে-কামিনী কবির কল্পনার মধুময় ফল। তিনি প্রণয় স্বরূপিণী সম্মোহিনী কামিনী। কমলে-কামিনী ক্ষুদ্র পদ্য ময় গ্রন্থ। ইহার রচনা ভাষা ও ভাব প্রশংসনীয়। স্থানে স্থানে হৃদয়ের ভাব সকল অতি দক্ষতা সহকারে লিখিত হইয়াছে। আমরা পাঠক গণের গোচরার্থ এক স্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

ভারতের যেরূপ হীনাবস্থা তাহাতে এক্ষণে প্রণয় স্বরূপিণী "কমলে কামিনীর" ইহা বাসোপযুক্ত স্থান নহে। এজন্য কবি তাঁহাকে এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

তা যদি না যাও যাও তবে তুমি,
তাজিয়া গো সতি এ ভারত ভূমি,
যেখানে মানস যাও তবে তুমি,
পার হয়ে শীঘ্র ভারত সাগর ;

কি কায এখন ও বিধুবদনে,
কি কায এখন প্রেম আলাপনে,
বিষম নিগড় পড়েছে চরণে,
কারাগারে আমি ভবন ভিতর।

জননীর কণ্ঠে লৌহহার যার,
প্রণয় মালিকা গলে দোলে তার !
ছিছিছি সাজেনা এসময়ে আর
কমলিনী—কান্ত—কমল জীবন ;

দাবানল দগ্ধ হরিণীর মত,
আজি গো সুন্দরি বর্ষ শপ্ত শত,
ছটফটি হায় ভ্রমিছে ভারত,
শীতল সলিলে জুড়াতে জীবন।

হায়রে বিধাতঃ কত কাল আর,
একাল আগুণ বক্ষস্থলে মার
রবে প্রজ্বলিত ? বল একবার
কজন মরিলে বাঁচিবে ভারত ?

বাঁচিবে কি হায় ! মুমূর্ষু পরাণ,
ভারতের ভাগ্যে হবে পরিত্রাণ ?
না হয় হোক্ এ ভারত শ্মশান,
নিশান থাকিবে চিরদিন মত।

কি সুখের চিন্তা ! এই গঙ্গাজলে,
তরণীতে যাবে বিদেশীর দলে,
সন্তাষি নাবিক কহিবে সকলে
"এই সে ভারত হয়েছে শশ্মান"

"বহুদিন সহি যন্ত্রনা অপার,
জননীর দুঃখ নয়নেতে আর
না পারি দেখিতে, হায়রে ইহার
"কোটী কোটী কোটী মরিল সন্তান।'

এই মহাবাক্য লিখিবে লেখনী,
ক'বে ইতিহাস শুনিবে ধরণী,
শিখরে শিখরে হবে প্রতিধ্বনি,
কোটী কোটী কোটী মরিল সন্তান"—

হায়রে সে দিন কাল পঞ্জিকায়,
কোথা লিখা আছে কে দেখিতে পায়.
কে দেখিতে পায় বিধিরই ইচ্ছায়
কবে ভারতের যুড়াবে পরাণ !

এসময়ে কেন হৃদয় মোহিনি,
প্রণয় কমলে তুমি প্রণয়িনি ?
এসময়ে সতি চিত্ত-বিনোদিনি
ভারত তোমায় হইবে ত্যজিতে ;

একান্ত যদি না ত্যজিবে ভারত
এস তবে দুহে গাই অবিরত,
পিঞ্জরে আবদ্ধ শুক শারি মত,
এভারতে কেহ পারেনা মরিতে।"

আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছ। লেখকের যেরূপ কল্পনা ও ক্ষমতার আভাস পাওয়া গেল, তাহাতে তাঁহাকে বর্ত্তমান যশস্বী কবিগণের একতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। অনুরোধ করি কানাই বাবু ক্ষমতার চালনা রাখিবেন, আর অল্পেতে অধিক বাড়াবড়ি করিবেন না।

সুখ-বোধ। অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত প্রচলিত সাধু-ভাষার ব্যাকরণ, শ্রী শ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। ময়মনসিংহ। ভারতমিহির যন্ত্রে শ্রীযদুনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯৭ শকঃ। মূল্য ৵১০ আনা।

পুস্তকের অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। ব্যাকরণ ভাষা শিক্ষার মূল ভিত্তি। ব্যাকরণ সম্বন্ধে যত উন্নতি হয়, ততই দেশের মঙ্গল। কিন্তু ক্রমশঃ সহজ বোধ্য করিতে গিয়া ব্যাকরণ এত সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে যে, ভবিষ্যতে হয়ত কোন গ্রন্থকার কেবল ব্যাকরণ নাম সংযুক্ত আবরণ পত্র পড়িতে উপদেশ দিবেন। সমালোচ্য ব্যাকরণ সহজ ও সুখবোধ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহাতে কয়েকটী মোটা মুটী সূত্র মাত্র স্থান পাইয়াছে।

সভ্যতার ইতিহাস প্রথম খণ্ড। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস প্রণীত। ৩৩ নং ভবানী চরণ দত্তের লেন, সাএন্স প্রেসে শ্রীদেবকী নন্দন সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আমরা আনন্দের সহিত এই গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ইহার সমালোচন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। সভ্যতার ইতিহাস জ্ঞানাঙ্কুরের সম্পত্তি। ইহা সংখ্যাক্রমে জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহার সমালোচন করিতে হইলে আত্ম-নিন্দা বা আত্ম-প্রশংসা করা হয়। জ্ঞানাঙ্কুর শ্রীকৃষ্ণ বাবুর যত্নে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত। তজ্জন্য জ্ঞানাঙ্কুর তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর কার্য্য দেখিলেই জ্ঞানাঙ্কুর আনন্দিত হইবে। এজন্য জ্ঞানাঙ্কুর সানন্দে সাধারণেকে সভ্যতার ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছে। পুস্তক ভাল হইয়াছে কি না, তাহাতে কোনও সার আছে কি না তাহা পাঠান্তে সাধারণে বিচার, করিবে।

৪র্থ খণ্ড, । ৭ম সংখ্যা । জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৩ ।

ও

প্রতিবিম্ব।

(মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।)

পৃষ্ঠা

বিষয়

কলিকাতা।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিং লাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৩

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

১। জ্ঞানাঙ্কুরের মূল্য বিষয়ক নিয়ম ;—

বার্ষিক অগ্রিম .... ৩৲
ষাণ্মাষিক ,, ... ১৷৹
প্রত্যেক খণ্ডের মুল্য .... ।৵৹

এতদ্ব্যতীত মফঃসলে গ্রাহকদিগের বার্ষিক ।৵৹ ছয় আনা করিয়া ডাক মাশুল লাগিবে।

২। যাঁহারা জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য স্বরূপে ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা কেবল অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন ; এবং প্রত্যেক টাকাতে ৴৹ এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইবেন, কেননা বিক্রয় করণ কালে আমাদিগকে টাকাতে ৴৹ আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

৩। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের কার্য্য সম্বন্ধে পত্র এবং সমালোচনের জন্য গ্রন্থাদি আমরা গ্রহণ করিব। রচনা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমাদের ঠিকানায় "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব সম্পাদক" শিরোনামা দিয়া লিখিতে হইবে।

৪। ব্যারিং ও ইন্সফিসেণ্ট পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট
ক্যানিং লাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
জ্ঞানাঙ্কুর কার্য্যাধ্যক্ষ।

রণ-চণ্ডী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

জ্ঞানাঙ্কুর হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রাহা প্রণীত নূতন উপন্যাস। মূল্য টাকা ১৲ টাকা। ডাকমাসুল ৵৹ আনা। ঢাকা ন্যাশনাল ডিপজিটরীতে এবং ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীব্রজমাধব বসু।

শ্রীপঞ্চমী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শশিশেখর।

যে প্রাসাদে শশিশেখর বন্ধু বান্ধব সহ সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতেন, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত প্রাসাদ সংলগ্ন বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। সংলগ্ন অথচ দূর, একথা অনেকেই অসঙ্গত মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাহা নহে। কতকগুলি একতল ক্ষুদ্র কক্ষ পার হইয়া তথায় যাইতে হয়, এই জন্যই দূর বলা যাইতেছে। তথাকার কথাবর্ত্তা আনন্দময়ীর কক্ষ হইতে শুনা যায় না বটে, কিন্তু উচ্চ হাস্যের শব্দ বিলক্ষণ শুনিতে পাওয়া যায়।

শশিশেখর অনেকগুলি বন্ধুর সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ করিতেছেন। শশিশেখর সৎস্বভাবের লোক নহেন। তিনি দোষাবহ আমোদে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতেন। তিনি আনন্দময়ীর বশীভূত ছিলেন না, বরং শীঘ্র যাহাতে সম্ভ্রম হানি ও নাম লুপ্ত হয়, সর্ব্বদাই তদনুরূপ কার্য্যই করিতেন। মাদক সেবন ও দ্যূতক্রীড়া তাঁহার নিত্যব্রত ছিল। সুতরাং এবম্বিধ উচ্ছৃঙ্খল ধনীসন্তানের নিকট যে নিতান্ত অনক্ষর ও অভদ্র লোকের সর্ব্বদা সমাগম হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

এইরূপ স্বভাবের লোকেরা পর্ব্বরাত্রে কিছু অধিক আমোদ প্রমোদে রত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্য শ্রীপঞ্চমীর রাত্রি—আমোদের সীমা নাই। কেহ নাচিতেছে—কেহ গাইতেছে— কেহ ছড়া কাটিতেছে— কেহ খেলা করিতেছে— আর কেহ বা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। আমোদের 'হৈ হৈ, রৈ রৈ' শব্দে গৃহের ছাদ ফাটিয়া যাইতেছে। শশিশেখর সকলের সঙ্গেই সমান তালে আমোদ করিতেছেন। কখনও নাচিতেছেন,— কখনও গাইতেছেন,— কখনও হাসিতেছেন,— কখনও কাঁদিতেছেন। রায় গোষ্ঠীতে যাহা কখনও হয় নাই—শশিশেখরের দ্বারা তাহা হইল। কিন্তু শশিশেখরের তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। আকরের টান কোথায় যাইবে?

এমন সময়ে একটী বাতায়নের দ্বার নড়িয়া উঠিল, বিলক্ষণ শব্দও হইল, কিন্তু গৃহস্থিত উন্মত্তদিগের তাহাতে কর্ণ গেল না। শুনিবার সামর্থ্য নাই। বাতায়নের অর্দ্ধ মুক্ত দ্বারে দুইটী স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল।

পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ঐ মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে একটী আনন্দময়ী দেবীর এবং অপরটী মন্দাকিনীর।

আনন্দময়ী দেবী অঙ্গুলি সঙ্কেত-দ্বারা মন্দাকিনীকে দেখাইলেন, "ঐ দেখ শশিশেখর।" মন্দাকিনী দেখিয়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন। তাহাতে কথঞ্চিৎ ঘৃণার লক্ষণই প্রতিভাত হইল।

আনন্দময়ী দেবী কহিলেন,—

"মন্দাকিনি! দেখিলে, তোমার শশিশেখরকে দেখিলে? তোমার গুণ নিধিকে দেখিলে? বিবেচনা করে দেখ—আমি কেমন রত্নকে পাইয়াছি! কুলকলঙ্ক—"

মন্দাকিনী কহিল,—

"দেখিলাম,—আকৃতি আমার স্বামীর মতন হয়েছে। কিন্তু শশিশেখরকে আমি এরূপ স্বভাবের দেখিব, মনে করি নাই। যা হউক সন্তানের মায়া কখনই যায় না। কুসন্তান জগতে অনেক, কিন্তু কুমাতা প্রায় পাওয়া যায় না।"

এই বলিয়া মন্দাকিনী অনিমেষ লোচনে শশিশেখরকে দেখিতে লাগিলেন।

আনন্দময়ী মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—

"আমি এই নরাধমের সহিত রমণীরত্ন সুকুমারীর বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেছি! উঃ কি ভয়ানক! পাপের উপর পাপ! বানরের হাতে মুক্তাহার, কিন্তু তা করিতেই হইবে।—ধর্ম্মবুদ্ধির সহবাসে পাপীর মুক্তি সম্ভাবনা। সুকুমারীর দ্বারা শশিশেখরের চরিত্র শোধন হতে পারে। এই কার্য্য শীঘ্রই সম্পাদন কত্যে হবে।"

এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন এবং মন্দাকিনীর থাকিবার উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আনন্দময়ী বিশ্রাম গৃহে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যুবক যুবতী।

প্রভাতে পূর্ব্ব দিকের প্রহরী কে?—সূর্য্যদেব। সূর্য্যদেব উঠিবার পূর্ব্বে শৃগাল এবং পক্ষীগণ নকিবের ন্যায় অরুণোদয় জ্ঞাপন করিল। যাহার যেমন অভ্যাস, সে তেমনি গাত্রোত্থান করিতে আরম্ভ করিল। রায় বাগানের সকলকেই উঠিতে দেখিলাম। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে, সে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইবে না। কাহার সাক্ষাৎ পাইবে না? সুকুমারীর। সুকুমারী যে কক্ষে শয়ন করেন, তাহা অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু সেখানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। শয্যা ও কক্ষের অবস্থা

দেখিয়া বোধ হইল, তিনি অধিকক্ষণ কক্ষ ত্যাগ করেন নাই। পাঠক—উদ্যান মধ্যে অনুসন্ধান করুন— মনোমোহিনী সুকুমারীকে দেখিতে পাইবেন। পুষ্প চয়ন করিবার জন্য গুণময়ী হয় তো উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন।

রায় বাগানের উত্তর প্রান্তে একটী সুন্দর বৃক্ষ বাটিকা ছিল। তন্মধ্যে রমণী-কুল-কমলিনী সুকুমারী উপবিষ্টা। উদ্যান মধ্যে স্থানে স্থানে যথেষ্ট উপবেশন উপযোগী আসন আছে। তাহারই একতম আসনে সুকুমারী সমাসীনা। অরুণোদয়ে বাহ্য জগৎ হাসিতেছে, প্রকৃতি খল্ খল্ করিতেছে, কমলিনী নাচিতেছে, বনলতিকা দুলিতেছে, বনের পাখী গাইতেছে কিন্তু নবীনা নবনীত পুত্তলি সুকুমারী বিষণ্ণা! কে জানে জগতে সুখ দুঃখের কি নিয়ম!

ধীরে ধীরে এক নবীন যুবক সুকুমারীর পশ্চাতে আসিলেন। সুকুমারী তাহা জানিতে পারিলেন না। যুবকের হস্তে এক গুচ্ছ পুষ্প ছিল। যুবতীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া যুবক অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। পরে সজোরে হস্তস্থিত পুষ্পগুচ্ছ সুকুমারীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। সুকুমারী চমকিতা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। যুবক যুবতী উপবেশন করিলেন।

সুকুমারী কহিলেন,—

বিনোদ আমি গত রজনীতে একটী দুঃস্বপ্ন দেখেছি, সেই জন্যই আজ এত সকালে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতাশয়ে এখানে আসিয়াছি।'

বিনোদ সুকুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি দুঃস্বপ্ন সুকুমারি?"

সুকুমারী বিনোদের বক্ষস্থলে মস্তক রাখিয়া কহিলেন,—

"বিনোদ! রাত্রিশেষে যেন আনন্দময়ী দেবী আসিয়া আমার মুখ চুম্বন করিলেন। আর আমাকে বধূ সম্বোধন করে কোলে নিলেন। আমার অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।"

বিনোদ কহিলেন,—

"তাহাতে দোষ কি?"

সুকুমারী গদ্‌গদ্ স্বরে কহিলেন,—

"তাহাতে দোষ নাই কেন? আমার বোধ হচ্যে— বিধাতা বুঝি আমাকে শশিশেখরের সঙ্গে এক সূত্রে বদ্ধ কর্‌বেন।"

বিনোদ সুকুমারীর চিবুক ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"সুকুমার! আমার সঙ্গে বিবাহ হলেও আনন্দময়ী দেবী তোমাকে বধূ সম্বোধনে ক্রোড়ে কোত্তে পারেন।

আমি তাঁর মাতুলের দৌহিত্র। তোমার ন্যায় আমারও জগতে আনন্দময়ী ভিন্ন আর কেহই নাই। আমি তাঁকে মায়ের মত দেখি—তিনিও আমাকে সন্তানের ন্যায় দেখেন। শশিশেখর নিতান্ত কুস্বভাব—বিষয়-কর্ম্ম কিছুই দেখেননা—আমিই সমুদায় বিষয় কর্ম্ম তত্ত্বাবধান করে থাকি। আমাকে তিনি সন্তান হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন দেখেন না। সে সম্পর্কে তোমার আমার বিবাহ হইলে, তিনি যে তোমায় বধূ সম্বোধনে ক্রোড়ে লইবেন, তার আর বিচিত্র কি! এ স্বপ্নে তুমি ভীত হও কেন?"

সুকুমারী কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—

"স্বপ্নে আমি নিতান্ত কাতর হয়েছি। আনন্দময়ী দেবীর মনোগত অভিপ্রায়ও আমি কতক বুঝেছি—সেই জন্যই অধিক ভীত হয়েছি। শশিশেখরের সহিত আমার বিবাহ দেওয়া তাঁর মনোগত ইচ্ছা—বাক্য-ছলে এমন আভাস পেয়েছি।"

বিনোদ কহিলেন,—

"আমার বোধ হচ্যে—বোধ কেন, কে যেন এসে আমার কানে কানে বল্‌চে, যে বিনোদ ও সুকুমারী শীঘ্র স্বামী-স্ত্রী রূপে সংসার সাগরে প্রবেশ করিবে।"

সুকুমারী কহিলেন "তোমার কথা-ই যেন সত্য হয়।"

বিনোদ উপহাসের সহিত কহি-লেন,—

"সত্য হলে কি সুখী হবে?"

সুকুমারী গদ্‌গদ স্বরে কহি-লেন,—

"আমার অদৃষ্টে কি সে সুখ আছে?"

বিনোদ কহিলেন,—

"তুমি অসময়ে মাতৃ পিতৃ হীন হয়েও এমন সুন্দর আশ্রয় লাভ করেছ দেখে তোমার অদৃষ্টকে নি-তান্ত নিন্দা কত্যে পারি না। এক্ষণে আমাদের এ প্রস্তাব কত দিনে কার্য্যে পরিণত হবে?"

সুকুমারী কহিলেন,—

"আনন্দময়ী দেবী বল্‌তে পা-রেন?"

বিনোদ কহিলেন,—

"বিবাহ উভয়ের সম্মতিতেও হতে পারে। তায় কি তোমার মত নাই?"

সুকুমারী কহিলেন,—

"আমি এত দূর সাহস করিতে পারি না। আর বিশেষ একালে সে প্রথা চলিত নাই।"

বিনোদ কহিলেন,—

"আমি তোমার এরূপ সাহসহী-নতায় যার পর নাই সন্তুষ্ট হলেম। তুমি সুযোগ দেখিয়া আমাকে বলি-লে, আমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট প্র-স্তাব করবো। আমার এমন সাহস

আছে যে, আমার প্রস্তাবে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না।”

সুকুমারী কহিলেন,—

“আমার সে সাহস নাই বলিয়াই মন এত ব্যস্ত হয়েছে।”

বিনোদ সুকুমারীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন,—

“ভীত হইবার কোন কারণ নাই।”

সুকুমারী বিনোদের বাহুবন্ধ হইতে নিজ শরীর মুক্ত করিয়া কহিলেন,—

“বিনোদ! অদ্য এই পর্য্যন্ত। বেলা হইল। এখনি আনন্দময়ী দেবী আমাকে ডাক্‌বেন, আমি যাই। সময় পাইলে সাক্ষাৎ করিব।”

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন; বিনোদ ক্ষণকাল তথায় নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া পরে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আনন্দময়ীর প্রস্তাব।

আনন্দময়ী দেবী নিত্য প্রাতঃস্নান করিতেন। স্নানান্তে তপযপাদি সমাপন করিয়া বসিয়া আছেন। সুকুমারী একখানি রামায়ণ হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। আনন্দময়ী একটু রামায়ণ শুনিলেন। তাঁহার চিত্ত অন্য দিনের ন্যায় শান্ত বলিয়া বোধ হইল না, যেন কিছু অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হইল। তিনি গতরজনীর মন্দাকিনী ঘটিত বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। তাঁহার এরূপ ভাব দেখিয়া সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা—আজ যেন আপনাকে কিছু চিন্তাযুক্ত দেখ্‌তেছি।”

আনন্দময়ী মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া কহিলেন,—

“বাছা— যে চিন্তা করিতেছি, শুনো। আমি কল্যই তোমাকে বলিব মনে করেছিলাম, কিন্তু শ্রীপঞ্চমীর দিন আমি কোন গুরুতর কার্য্যে মন দেই না, সেই জন্যই বলি নাই। আজ বলিতেছি। বাছা! আমার ইচ্ছা তোমাকে বধূরূপে বরণ করি,—আমি অবর্ত্তমানে তুমি এই সকল বিষয়ের কর্ত্রী হও, এই আমার ইচ্ছা।”

সুকুমারী “মা আমি—” এই পর্য্যন্ত বলিয়া লজ্জায় কথা কহিতে পারিলেন না। হৃদয়ে লজ্জা ও ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল। মস্তক নত করিলেন।

আনন্দময়ী কহিলেন “কি বল্‌ছিলে বল—মাতা হেঁট করে থাক্‌লে কেন? আমি বুঝ্‌তে পেরেছি এ বিবাহে তোমার মত হইবে না। শশিশেখর তোমার উপযুক্ত পাত্র নয়।”

সুকুমারী বিনম্র বচনে কহিলেন,—

“মা আমি নিতান্ত অজ্ঞাত কুলশীলা।”

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন,—

“আমার সে আপত্তি নাই। আকার

দেখলেই বংশ বুঝা যায়। কাচে কখনো হীরা হয় না। তোমার সৎস্বভাব, সুনীতি, শিক্ষা এ সব দেখ্‌লে তোমার কুলগৌরব লুকান থাকেনা। তুমি যে রায় গোষ্ঠীর গৃহলক্ষ্মীর উপযুক্ত পাত্রী, তার আর সন্দেহ নাই।"

সুকুমারী কহিলেন "আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন বলেই এমন কথা বল্‌ছেন।"

আনন্দময়ী পুনরায় কহিতে আরম্ভ করিলেন,—

"সে যাই হউক, আমার প্রস্তাবে তোমার মত কি?"

সুকুমারী অবনত মস্তকে মৌনী হইয়া রহিলেন। তাঁহার যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। গত রজনীতে তিনি যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাই ফলিল। বিনোদ স্বপ্নের যে অর্থ করিয়াছিলেন, তাহা ঘটিল না। শীতকাল, তথাপি তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। না হইবে কেন? দারুণ শীতের সময়ে ভয়, ক্রোধ ও লজ্জার আতিশয্যে শরীর হইতে স্বেদ জল নির্গত হইয়া থাকে। তাঁহার মন যে কিরূপ ভাবাপন্ন হইল, তাহা তিনিই বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ,—অন্যের সাধ্য কি? আনন্দময়ী তাঁহাকে যে প্রকার স্নেহ ও যত্ন করেন, তাহাতে কি তাঁহার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারেন! অসম্ভব—জগদীশ্বরের নিকট অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে! ঘোর নরকে পচিয়া মরিতে হইবে! ভাবনায় সুকুমারী নিতান্ত অধীর হইলেন।

আনন্দময়ী কহিলেন,—

"আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি—এ প্রস্তাবে তোমার মত হইবে না। তথাপি আমার অনুরোধ।"

দেবী সুকুমারীর হস্ত ধরিলেন। হাত ধরিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"তুমি যে শশিশেখরের স্ত্রী হইয়া সুখে থাকিবে, তা আমি একবারও ভাবি না। আমি তোমার সুখের কণ্টক হইলাম, তাহাও জানিতেছি। তথাপি আমার ইচ্ছাকে নিবারণ কত্তে পারিতেছি না। তোমাকে পিশাচের নিকট বলিদান দিতেছি। আমি তোমাকে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিতে বলিতেছি। সত্য —সুকুমারী এ সকলি সত্য। তোমার ভবিষ্যৎ কষ্ট ভাবিয়াও আমার প্রাণ কাঁদিতেছে। কিন্তু কি করি—উপায় নাই। আমার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সৎ সহবাসে অসৎও সৎ হইতে পারে। মহতের সঙ্গে থাকিলে মহত্ত্ব লাভেরই সম্ভাবনা। তোমার ধর্ম্ম বুদ্ধি দেখে— ধর্ম্ম উপদেশ শুনে, আমার শশিশেখরেরও ধর্ম্ম বুদ্ধি হতে পারে। সৎ সহবাসে পাপীর মুক্তি হয়। আমি সেই জন্যই বলিতেছি—তুমি এই বিপুল সম্পত্তির অধিশ্বরী হও। আমার

এই মিনতি রক্ষা করিতে হইবে। আমি তোমায় হাতে ধরে বলছি, আমার এই কথাটী রক্ষা করে আমাকে সুখী কর।"

সুকুমারী মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। উপকারিণী আনন্দময়ীর অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কঠিন বোধ হইল। তাঁহার ন্যায় সৎস্বভাব স্বরূপিনী রমণী কি অকৃতজ্ঞ হইতে পারে! যাঁহার নিকট তিনি আশ্রয় পাইয়াছেন, যাঁহার যত্নে তিনি পরম সুখে বাস করিতেছেন, সেই পরমোপকারিণী আনন্দময়ীর নিকট অকৃতজ্ঞ হইয়া, তাঁহার হৃদয় বেদনার কারণ হওয়া অপেক্ষা নিজ সুখে জন্মের মত জলাঞ্জলি দেওয়াও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর বোধ হইল। সুকুমারী মনে মনে চিরদিনের জন্য সুখে জলাঞ্জলি দিলেন। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। আনন্দময়ীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়াই স্থির করিলেন। কহিলেন,—

"মা! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আপনি আশীর্ব্বাদ করিলেই আমরা সুখী হইব।"

আনন্দময়ী আহ্লাদে প্রমত্তা হইয়া সুকুমারীকে আলিঙ্গন করিলেন। বার বার নবীনার মুখ-চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"মা! চিরসুখিনী হও। তুমি আজ আমাকে যেমন সুখী করিলে, আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা চিরদিন সেই প্রকার সুখে কাল হরণ কর।'

বেলা অধিক হইল, উভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৃক্ষবাটিকা।

মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। শীতকালের মধ্যাহ্নে এমন কোন চটক থাকে না, যাহা বর্ণন করিয়া পাঠকের সময় নষ্ট করি। সুতরাং পাঠকের সহিত চটাচটীর প্রয়োজন নাই।

বৃক্ষবাটিকার শিলাতলে কর কপোল সংলগ্ন হইয়া সুকুমারী বসিয়া আছেন। তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাই ফলিল। বিনোদের কথা কোন কাজে আসিল না। প্রণয়ে অনেক প্রতিবন্ধক। সুখের প্রতিপদে কণ্টক।

স্নানাহার সমাপনান্তে বিনোদের নিতান্ত মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তিনি শান্তি লাভের জন্য বৃক্ষবাটিকায় আসিলেন। দেখিলেন সুকুমারী চিন্তায় মগ্না। বিনোদ অন্তরালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুকুমারী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন,—

"হায়! যার ছায়া স্পর্শ কত্তেও ঘৃণা করি, তাকে পতিত্বে বরণ কত্তে হবে! হয় তো অদৃষ্টে আরও কত কি আছে! বিনোদকে কি বলিব? কি বলিয়া তাঁহার আশা ভঙ্গ করিব? হা বিনোদ! বিনোদ! বিনোদ!" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

বিনোদ আর থাকিতে পারিলেন না। অন্তরাল হইতে আসিয়া "ভয় কি! ভয় কি!" বলিয়া সুকুমারীর মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া বসিলেন। নবীনার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতে লাগিল—ঘর্ম্ম ক্ষণিক, ক্রমে অল্প চৈতন্য,—পরে নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রিতাবস্থায় যেন তাঁহাকে নিতান্ত অস্থির বোধ হইতে লাগিল। স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্ন বিবরণ অস্ফুট বাক্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"যাও, আমাকে স্পর্শ করিও না। তোমার মাতার নিকট আমি চির-ঋণে আবদ্ধ—তাতেই এই দুর্দ্দৈব ঘটেছে। কি পাপ! এখনো বিবাহ হয় নাই—আমাকে স্পর্শ করিবার তোমার অধিকার নাই। পিশাচ—রাক্ষস—পাতকী—নারকী—আমার হৃদয় নাই—সে অন্যের। তায় তোর অধিকার কি? দূর হ।"

সুকুমারীর নিদ্রাভঙ্গ হইল—দেখিলেন বিনোদের, ক্রোড়ে মস্তক রহিয়াছে; ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বসিলেন।

বিনোদ কহিলেন "আমি সকলি জানিতে পারিয়াছি—আর তোমার কষ্ট পাইয়া বলিতে হইবে না।"

সুকুমারী জিজ্ঞাসিলেন,
"কি রূপে জানিলে?"

বিনোদ উত্তর করিলেন,—
"প্রথমে অন্তরাল হইতে—শেষে তোমার স্বপ্ন হইতে

সুকুমারী বাষ্পগদগদস্বরে বিনোদের হস্ত ধরিয়া কহিলেন,—

"বিনোদ! আমাকে রক্ষা কর। আমাকে যেন অকৃতজ্ঞ হইতে না হয়। উপকারিণীর কথায় আমি 'না' বলিতে পারিলাম না। আমি কতবার অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কে যেন আসিয়া আমার জিহ্বা টানিয়া রাখিল। আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছি।"

এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিনোদ উত্তরীয় বস্ত্রে সুকুমারীর নয়ন মার্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন—

"সুকুমার! তুমি অন্যায় কাজ কর নাই। তুমি যদি তাঁর প্রস্তাবে অস্বীকার করিতে, তাহা হইলে আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইতাম না। আমরা উভয়েই তাঁর নিকট যার পর নাই উপকার পাইয়াছি,—তাঁর অভিমতের বিরুদ্ধ কাজ করিলে আমাদের পাপ আছে। লোকতঃ ধর্ম্মতঃ পাপ। তুমি

সে জন্য ব্যস্ত হতেছ কেন? আনন্দময়ী দেবী আমাদের জন্য না করিতেছেন কি? আমাদের সুখ সচ্ছন্দের জন্য তাঁর ভাণ্ডার মুক্ত রয়েছে। আমরা তাঁর নিকটে যে ঋণে বদ্ধ, তাহা কি ইহজন্মে পরিশোধ হতে পারে, তাঁর আদেশ পালন করিবার জন্য আমাদের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করা উচিত। তুমি এত ভীত হইতেছ কেন? সাহসে নির্ভর কর। যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন তোমাকে প্রিয়তমা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিব।"

সুকুমারী বিনোদের বক্ষে মস্তক রক্ষা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিনোদ পুনরায় কহিলেন,—

"সুকুমার! কাঁদিয়া আর কাঁদাও কেন? তোমার ক্রন্দন দেখিলে আমার বুক ফেটে যায়। ধৈর্য্য ধর—অস্থির হও কেন? আমাদের উভয়েরই কাঁদিবার সমান কারণ, কিন্তু কাঁদিয়া কোন ফল নাই।"

সুকুমারী, "হা বিধাতঃ তোর মনে কি এই ছিল!" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বিনোদ কহিলেন,—

"আমাদের সুখের আশা এই খানেই ভঙ্গ হউক। সুকুমার! এক্ষণে তুমি গৃহে যাও—আমাদের স্নেহ চিরদিন সমান থাকিবে, সে জন্য চিন্তা নাই।

সিরাজ-উদ্দৌলা

(উপক্রমণিকা।)

এই অদূরদর্শী, নৃশংস, হতভাগ্য নরপতির নাম বঙ্গভূমে কাহারও অবিদিত নাই। অপরিপক্ক-মতি, বিদ্যা-বিবর্জ্জিত, কুসংসর্গী, দুর্বিনীত বালকের হস্তে রাজকীয় ভার সমর্পিত হইলে রাজ্য যেরূপ বিপর্য্যস্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হওয়া সম্ভাবিত, সিরাজ-উদ্দৌলার সাশন কালে বঙ্গভূমির সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। অতুল সম্পত্তি রাশি যাহার পদাবনত, অমিত ও অবিসম্বাদিত প্রভুতা যাহার দক্ষিণ হস্ত, সেরূপ জ্ঞানকাণ্ড বিরহিত ব্যক্তি না করিতে পারে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই। সিরাজ-উদ্দৌলা জীবদ্দশায় এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা স্বয়ং সম্পাদিত করেন নাই। সেই জন্যই এক শতাব্দী উত্তীর্ণ হইল, তথাপি অদ্যাপি বঙ্গভূমির আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সভয়ে "নবাব সিরাজউদ্দৌলার" নাম সতত উচ্চারণ করিয়া থাকে। সিরাজউদ্দৌলার দুষ্ক্রিয়া-

কলাপ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার প্রধান কারণ বটে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণে তাঁহার নাম কি সতত স্মৃতিপথবর্ত্তী হয় না? সিরাজ-উদ্দৌলা বঙ্গদেশের অদৃষ্ট নেমির অপর এক আবর্ত্তন সংঘটন কর্ত্তা। অতি অশুভক্ষণে রাজন্য কুল-কলঙ্ক, শত্রু ভীত, কাপুরুষ লক্ষ্মণ সেন অর্দ্ধভুক্ত অন্ন ত্যাগ করত বৃদ্ধা মহিষীর অঞ্চল ধরিয়া, অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় কম্পিত কলেবরে, স্বাধীন হিন্দু রাজদ্বার যবনদিগের নিমিত্ত নির্ম্মুক্ত রাখিয়া পলায়ন করেন এবং চিরগৌরবান্বিত রাজ নামে অনপনেয় কলঙ্ক-রাশি ঢালিয়া যান। খৃষ্টীয় ১২০৩ অব্দে এই ঘোর শোকাবহ, লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। সেই কলঙ্ক-কালিমা পরিপূর্ণ দিনের পর হইতে, প্রায় ছয় শত বৎসর কাল, বঙ্গভূমি দুর্দ্দান্ত যবন ভূপতিগণের পদতলে বিলুণ্ঠিতা ও বিদলিতা হইতে থাকে। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ে বঙ্গদেশের অদৃষ্ট চক্রের অন্যরূপ গতি হয়; সেই সময় হইতে বঙ্গ রঙ্গভূমে স্বতন্ত্র অভিনয় আরম্ভ হয়; সেই সময় হইতে বঙ্গবাসীগণ স্বতন্ত্র জাতীয় রাজপদলেহনে প্রবৃত্ত হয়; সেই সময় হইতেই বঙ্গদেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, সভ্যতা বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্ম স্রোত স্বতন্ত্র দিকে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়; সেই সময় হইতেই বঙ্গভূমি নূতন স্থান হইয়া উঠে; সংক্ষেপতঃ, সেই সময় হইতে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ বিদূরিত হয়েন ও সুদূরস্থিত সম্পর্কশূন্য ইংরেজ জাতি তাঁহাদের স্থানাধিকার করেন। এরূপ পরিবর্ত্তন বঙ্গবাসী জনগণের পক্ষে কল্যাণ-জনক কি অনিষ্ট উৎপাদক তাহার বিচারে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি সেই পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হইত—যদি পলাশী ক্ষেত্রে বঙ্গ-রাজলক্ষ্মী ইংরেজ জাতির প্রতি কৃপা না করিতেন— ভাবিয়া দেখ পাঠক! তাহা হইলে বঙ্গদেশের অবস্থা অদ্য কি হইত!!! বঙ্গভূমি তাহা হইলে অদ্যাপি সেই দীর্ঘকাল পরিচিত, স্বদেশ বাসী, মুসলমানগণের পদাবনত থাকিত, যাবনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ত্রিপুণ্ড্রক শোভিত ললাট ও দীর্ঘশিখা সম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজকার্য্য-সাধন করিতেন, সর্ব্বত্র হিন্দু যুবকগণ দুলিতে দুলিতে রাজভাষা পারসীক অনুশীলন করিতেন। সেই এক অবস্থা থাকিত। আর পাঠক—আর যদি,—রাজনীতি শাস্ত্রে অধিকার থাকে, চিন্তা করিয়া দেখ, বঙ্গভূমির আরও কি থাকিত। নিমেষগামী বাষ্পীয় শকট, অত্যাশ্চর্য্য তাড়িত বার্ত্তাবহ, আদরের ইংরাজী উচ্চ শিক্ষা, কোমত্ প্রভৃতি দার্শনিকগণের মত,

সাম্যবাদীর স্ত্রী স্বাধীনতা, ইংরাজী রীতি নীতির প্রশংসা, মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব, সংবাদ পত্র ও নাটক নবেলের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি অসংখ্য অচিন্ত্যপূর্ব্ব উন্নতি কোথায় থাকিত? এক শতাব্দী মধ্যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! শত বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী এক জন বাঙ্গালী যদি এ সময়ে সহসা আবির্ভূত হন, তাহা হইলে বঙ্গভূমির এবম্বিধ পরিবর্ত্তন সমস্ত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠে; তিনি এ সকল ধারণা করিতে না পারিয়া উন্মত্তবৎ অস্থির হইয়া উঠেন। ফলতঃ বঙ্গদেশের পরিবর্ত্তন অতি বিস্ময়কর। পৃথিবীর ইতিহাসে এবম্বিধ পরিবর্ত্তনের উদাহরণ সুলভ নহে। নবাব সিরাজ-উদ্দৌল্লার সময় হইতে এই পরিবর্ত্তনের সূত্রারম্ভ হয়। বঙ্গবাসীগণ অধুনা যে উন্নতি স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, যে সভ্যতা সরসীতে সন্তরণ করিতেছে, যে বিদ্যা বিমানে নিয়ত উড্ডীন হইতেছে, হতভাগ্য নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ে তাহার মূল ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। ভাল হউক, মন্দ হউক, সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ে তাহার আরম্ভ।

এই সকল কারণে সিরাজউদ্দৌলার নাম কস্মিন কালেও বঙ্গইতিহাস, বঙ্গইতিহাস কেন, ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে না। যখন তুমি একান্তে বসিয়া এই পরিবর্ত্তনের, এই উন্নতির আলোচনা করিবে, তখনই তোমার মনে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার নাম সমুদিত হইবে, তখনি পলাসী ক্ষেত্রের রণরঙ্গিনী রুধিরাপ্লাবিত বেশ মনে পড়িবে, তখনই কল্পনা তোমার সম্মুখে সেই চিরপরিচিত মুসলমানগণের দুর্দ্দশা ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব ইংরেজ জাতির অভ্যুদয় জনিত গৌরবপরিপুষ্ট কান্তির ছবি আনিয়া উপস্থিত করিবে। সিরাজ উদ্দৌলা পাপী, নৃশংস, অত্যাচারী, অবিবেকী, জ্ঞান কাণ্ড বিবর্জ্জিত পশুবৎ জীব হইলেও তাঁহার জীবনে সার আছে, তাঁহার ইতিহাস আলোচনা আনন্দজনক না হইলেও কৌতূহল উদ্দীপক, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার ইতিহাস অধ্যয়নে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের সঞ্চার হয়। আর, ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ সিরাজ উদ্দৌলার স্কন্ধে যে অপরিমিত দোষ রাশি সমর্পণ করিয়া স্ব স্ব দেহ, পূত সুরধুনী বারি বিধৌত পবিত্র বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহারমধ্যে কি ভ্রান্তি থাকা সম্ভাবিত নহে? শত্রুবিচিত্রিত শত্রু প্রতিমূর্ত্তি কি অযথা হওয়া সম্ভাবিত নহে? স্বীয় পাপ স্খালনার্থ কি পরকীয় পাপ অতিরঞ্জিত হইয়া চিত্রিত হয় না? এ সকল স্বাভাবিক। সহস্র সাধুতা, সহস্র উচ্চতা,

সহস্র উদারতা থাকিলেও এ সমস্তের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা মনুষ্য সাধ্যের অতীত। মনুষ্যের তিল প্রমাণ দোষ জগৎ সংসারে প্রচারিত হইবার সময়ে তাল প্রমাণ হইয়া থাকে। জনরব দোষাঙ্কুর পাইলে সত্বর তাহাকে পল্লবিত করিয়া তুলে, ইহা নূতন কথা নহে। সিরাজউদ্দৌলার জীবনী নিরতিশয় জঘন্য হইলেও তাহা যে এবম্বিধ অবশ্যম্ভাবী, অপরিহরণীয় পরিণাম নিচয়ের অধীন হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? ফলতঃ যাহাই হউক, তাঁহার ইতিহাস সকলেরই সম্যক আলোচ্য। আমরা সিরাজউদ্দৌলার সেই লোমহর্ষণকারী ইতিহাস যথাসম্ভব যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিয়া পাঠক মহাশয় দিগকে উপহার দিতেছি।

সিরাজ উদ্দৌলার যথাযথ ইতিহাস সঙ্কলনের পূর্ব্বে অতি সংক্ষেপে দেশের তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসের স্থূল মর্ম্ম ও দেশের তৎকালীন অবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা অতি অল্প কথায় এই উভয় কার্য্য সমাপনের চেষ্টা করিতেছি।

খৃষ্টীয় ১২০৩ সালে সাহেব-উদ্দীন ঘোরীর শাসন কালে বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশের স্বাধীনতার মূলে বিষম কুঠারাঘাত করেন। অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী লক্ষণাবতী নগরী তৎকালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। ঐ সময় হইতে ১৩৯৯ সালে তৈমুর লঙ্গের আক্রমণ কাল পর্য্যন্ত, প্রায় দুই শতাব্দী কাল বঙ্গদেশ নিয়ত দিল্লীশ্বরগণের শাসনাধীন থাকে। ইতি মধ্যে কখন বা কোন সাশনকর্ত্তা স্বয়ং স্বাধীনতা পরিগ্রহ করিয়া তখনি পর্য্যুদস্ত হইয়াছিলেন, কখন বা দিল্লীশ্বর কোন নিকট জ্ঞাতিকে স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। তৈমুরলঙ্গের উপদ্রবে ভারতবর্ষের তৎসাময়িক শাসন প্রণালীর যথেষ্ট বিপর্য্যয় ঘটে। যে যেখানে সুবিধা পায়, সে তথায় স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করে। দেশ মধ্যে এইরূপ কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইলে, শাসন প্রণালীর এবম্বিধ অব্যবস্থা অপরিহরণীয়। ঐ সুবিধায় ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচারিত করিয়া দেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের স্বাধীন ভূপতি আলাউদ্দীন সমান বন্দোবস্তে দিল্লীশ্বর বাদশাহ সেকন্দর সাহের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের অবস্থা ঐ রূপই চলিতে থাকে। পরে অমিততেজা অসম সাহসী বাবর দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ ও অধিকার করেন। কিন্তু কোন স্থানে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত করিতে হইলে,

সে ব্যক্তির কার্য্যের সীমা থাকে না। বাবর কার্য্যসাগরের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেন। বঙ্গরাজ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে সময় পাইলেন না। সের খাঁ নামক এক জন দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহীর দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ বাবর-তনয় বাদশাহ হুমায়ুন একবার এ অঞ্চলে আইসেন। সেই সময় বঙ্গদেশের স্বামিত্ব মোগল কর-কবলিত হয়। কিন্তু সেও অতি অল্প দিনের নিমিত্ত; কারণ হুমায়ুনের প্রত্যাগমন কালে পথি মধ্যে সের খাঁ তাঁহাকে পরাভূত করেন এবং ১৫৪২ অব্দে স্বয়ং বাদশাহরূপে দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন হয়েন। সুতরাং বঙ্গদেশ তখন তাঁহারই হয়। তিনি ১৫৪৫ অব্দে পরলোক প্রস্থান করেন। সের খাঁ এবং ত্বদীয় পুত্র সেলিমের অধিকার কালে বঙ্গদেশে অন্য কোন উপদ্রব আরম্ভ হয় নাই। সেলিমের বিয়োগের পর সের বংশীয় তিন জন ভূপতি সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় বঙ্গদেশের অধিকার লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং অনেকে তাহার প্রার্থী হইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ১৫৫৫ অব্দে হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে পুনরধিকার সংস্থাপন করেন, এবং সেই সঙ্গে বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয়। অতি কষ্টে হুমায়ুন বিগত রাজ্য উদ্ধার করিলেন বটে কিন্তু অধিক কাল তাঁহাকে তাহা ভোগ করিতে হইল না। বৎসরেক পরে, ১৫৫৬ অব্দে, তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। বঙ্গদেশে স্বতন্ত্র ভূপতি স্বাধীনরূপে রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। ১৫৭৪ অব্দে জগদ্বিখ্যাত আকবরের সৈন্যাধ্যক্ষগণ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার কিয়দংশ অধিকার করিয়া মোগলশাসনাধীনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬২৪ অব্দে জাহাঙ্গীর তনয় সাহজিহান পিতার অবাধ্য হইয়া স্বয়ং বঙ্গদেশ অধিকার করত স্বাধীনতা সহকারে শাসনারম্ভ করেন। পর বৎসরেই তাঁহার সে স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। খৃষ্টীয় ১৬২৭ অব্দে সাহজিহান পিতৃসিংহাসন লাভ করেন এবং ১৬৩৮ অব্দে স্বীয় পুত্র সুজাকে বঙ্গদেশের সাশন কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়া প্রেরণ করেন। সাহজিসহানকে পর্য্যুদস্ত করিয়া পিতৃদ্রোহী আরঙ্গজীব সিংহাসনাসীন হন। ত্বদীয় ভ্রাতার উজীর মীরজুম্‌লা ১৬৬৯ অব্দে সুজাকে আক্রমণ করেন। সুজা পলায়ন করিয়া আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর সিরাজ-উদ্দৌলার সাময়িক মহাবিপ্লব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ মোগলাধীন থাকে।

সিরাজ উদ্দৌলার পতনে ইংরেজদিগের অভ্যুদয়। সিরাজউদ্দৌলার ঐতিহাসিক জীবনের সহিত ইংরেজজাতির সবিশেষ সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়।

একের কথা লিখিতে হইলে অন্যের বিবরণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল হইতে ইংরাজদিগের ভারতাগমন সম্বন্ধীয় বিবরণ সর্ব্বথা আবশ্যক। ইহার আর এক আবশ্যকতা আছে। কিরূপে সুকৌশলী ইংরেজ জাতি বঙ্গদেশে প্রবেশ লাভ করেন এবং কিরূপে অনধিককাল মধ্যে তাঁহারা অধীশ্বর হইয়া উঠেন, তাহা বিদিত হওয়া বিধেয়।

১৬৩৬ অব্দে বাদশাহ সাহজিহানের এক কন্যা সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্তা হন। তাঁহার চিকিৎসার্থ সুরাট হইতে বউটন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক আহূত হন। তাঁহার চিকিৎসায় সাহজিহান তনয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া বউটনকে বিবিধ ধন রত্ন দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন এবং তাঁহার সাম্রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার আজ্ঞা ও ক্ষমতা প্রদান করিলেন। বউটন বঙ্গদেশ হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া তৎসমস্ত সাগরপথে সুরট প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গালায় আসিলেন। সম্রাটের আজ্ঞা বশবর্ত্তী হইয়া নবাব তাঁহাকে সহজে দেশ মধ্যে বাণিজ্য করিতে দিতেন না। কিন্তু বাঙ্গালার প্রত্যেক ঘটনাই ইংরাজদিগের অনুকূল হইয়াছিল। তাঁহাদের উন্নতির ও অভ্যুদয়ের পথ বাঙ্গালায় সহজ হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেই সময় নবাবের এক প্রিয়তমা কামিনী কঠিন পীড়াগ্রস্তা হন। বউটন তাঁহাকেও আরোগ্য করিলেন। নবাব পরম পরিতুষ্ট হইয়া বউটনকে যথেষ্ট বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া নিজ সন্নিধানে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। বউটন বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সম্রাটাজ্ঞা পাইয়াছিলেন। নবাব তাহাও বলবৎ করিয়া দিলেন এবং সমস্ত ইংরাজজাতিকে বিনা শুল্কে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। বউটন এই শুভ সমাচার সুরটের গবর্ণরকে জানাইলেন। তাঁহার পরামর্শ ক্রমে ১৬৪০ অব্দে "ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" বাঙ্গালায় ২ খানি বাণিজ্য তরি প্রেরণ করিলেন। বউটন তরির এজেণ্টগণকে নবাবের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। নবাব তাঁহাদের অতি শিষ্টাচার সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের ব্যবসায় উন্নতির নিমিত্ত যথোচিত সাহায্য প্রদান করিলেন।

এইরূপে ইংরেজজাতি বণিকরূপে বঙ্গভূমে প্রবেশ করিলেন। পাঠক! মুসলমান ভূপতির উদারতা ও ইংরেজ বণিকের আগমন প্রকৃতি স্মরণ করিয়া রাখিবেন। ভারতে সেই বণিক্ জাতির অবস্থা অদ্য কি উচ্চ! সেই বণিক সম্প্রদায় অদ্য ভারতের ঈশ্বর—

ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ভারত অদ্য সেই বণিকগণের চরণ সেবা করিতেছে। ভারতীয় সন্তানগণ আপনাদের যথা-সর্ব্বস্ব সেই বণিকদের দান করিয়া অদ্য অন্নাভাবে তাহাদের বদনের প্রতি লালায়িত ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। অদ্য বৈদেশিক বণিক ভারতের ভূপতি! ভারতের স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, তাঁহাদের আজ্ঞা শিরে বহন করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। বণিকগণের আজ্ঞায় ও ইচ্ছায় মলহর রাও গুহকুমার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসিত হইতেছেন এবং জন গ্রেগরি নামক অপরিপক্কমতি বালক রাজ্য শাসন করিতেছেন। অদ্য তাঁহাদের আজ্ঞায় ভারতের ভূপতিবর্গ পুত্তলিবৎ ক্রীড়া করিতেছে। অদ্য ভারতের কি অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! কালের অনন্তলীলা, অপার মহিমা! কে জানিত যে সুদূরদ্বীপ-নিবাসী, ইংরাজজাতি বণিকবেশে ভারতে প্রবেশ করিয়া তাহার অদৃষ্ট দেবীকে এতাদৃশ অবিসম্বাদিত আয়ত্তাধীন করিবে। কালে সকলই হয়। সুদূরদর্শী ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

বিধাতৃবিহিতং মার্গং
ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে।
কাল মূলমিদং সর্ব্বং
ভাবাভাবৌ সুখাসুখে॥
কালঃস্বজতি ভূতানি
কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
সংহরন্তং প্রজাঃ কালং
কালঃ শময়তে পুনঃ॥
কালোহি কুরুতে ভাবান্
সর্ব্বলোকে শুভাশুভম্।
কালঃ সংক্ষিপ্যতে সর্ব্বাঃ
প্রজাবিস্বজ্যতে পুনঃ॥
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি
কালোহি দুরতিক্রমঃ।
কালঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু
চরত্যবিধ্বতঃ সমঃ॥
অতীতানাগতা ভবো
যে চ বর্ত্তান্তি সাম্প্রতম্॥
তান্ কাল নির্ম্মিতান্ বুদ্ধা
ন সংজ্ঞাং হাতুমর্হসি॥

এই স্বর্গীয় ঋষিবাক্যের প্রত্যেক কণিকা অকাট্য সত্যে পরিপূর্ণ। 'অদ্য বণিক ভারতের ভূপতি!

নর বানর

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর কালে রাধাকৃষ্ণ ঘোষ ঘরের দাবায় বসিয়া গুড়াকুসেবন করিতেছেন। মুখের উভয় দিক দিয়া রাশি রাশি ধূম নির্গত হইতেছে। গোঁপের ভিতর দিয়া চোঁয়ান ধূম বাহিরিতেছে। যেন তৃণাচ্ছাদিত অগ্নি হইতে ধূম পুঞ্জ উদ্গাত হইতেছে। রাধাকৃষ্ণ প্রাণ ভরিয়া তা-

মাকু খাইতেছেন। নিকটে কলিকা চাহিবার আর লোক নাই—এই মহানন্দ। রাধাকৃষ্ণ গাঁজা খাইয়া থাকেন। অধিক খান না—সমস্ত দিনে হদ্দ ২০। ৩০ ছিলিম। অধিক হউক আর অল্প হউক, রাধাকৃষ্ণের গাঁজাখোর বলিয়া খ্যাতি সংসারময় রাষ্ট্র। কিন্তু সকলে যাই বলুক, রাধাকৃষ্ণ কখন কোন অন্যায় কার্য্য দ্বারা জগৎকে উত্যক্ত করেন নাই। তিনি ভাল হউন বা মন্দ হউন, লোকের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। সংসারের ব্যাপারে তিনি লিপ্ত নহেন। ক্ষুধা পাইলে আহার করেন, ঘুমের আবশ্যক হইলে নিদ্রা দেন, আবশ্যক না হইলেও গাঁজা খান। সংসারের সহিত তাঁহার এবম্বিধ সম্বন্ধ। রাধাকৃষ্ণ মূর্খ নহেন। দেশীয় শাস্ত্রাদি ও ইংরেজিতে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তবে সঙ্গদোষে যখন তিনি অবিমুক্ত বারাণসী ধামে থাকিয়া গুরুর নিকট দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, সেই সময় এই রোগ তাঁহাকে আশ্রয় করে। আত্মীয় স্বজন তাঁহার এই পরিবর্ত্তন জন্য নিতান্ত ক্ষুণ্ণ, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ ভ্রমেও এজন্য কাতর নহেন। রাধাকৃষ্ণ লোক ভাল। তাঁহার "সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ," তিনি লোক ভাল।

রাধাকৃষ্ণ ঘরের দাবায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মন কোথায়? মন তামাকে নাই, হুকায় নাই, ধূমে নাই, বিশ্ব সংসারে নাই। তামাকু খাইতেছেন। তামাকু পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাধাকৃষ্ণ তথাপি হুকা টানিতেছেন। ধূম বন্ধ হইয়া গেল, তথাপি তামাকু টানিতেছেন। তাঁহার মন কোথায়?

মন কোথায় গিয়াছিল, আবার আসিল। সম্মুখস্থ পেয়ারা গাছের শাখায় বিকট শব্দ করিয়া প্রকাণ্ড এক হনুমান লাফাইয়া পড়িল। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের মন ফিরিয়া আসিল। রাধাকৃষ্ণ চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন বৃক্ষে প্রকাণ্ড এক মুখপোড়া বানর। গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—

"আর্য্য! পাঁচীর (তাঁহার শ্যালকপুত্রী) পেয়ারা খাইবেন না।

বানরাবতার মুখ খিঁচাইলেন। রাধাকৃষ্ণ বলিলেন,—

"আর্য্য, পিতামহ! আপনি হাসিতেছেন, এ রহস্য নহে। পাঁচী আমাকে গালি দিবে।"

হনুমন্ত আবার মুখ খিঁচাইলেন। রাধাকৃষ্ণ আবার কহিলেন,—

"পিতামহ! আপনি কুপিত হইতেছেন? সর্ব্বনাশ। খান খান যথাভিরুচি পেয়ারা খান। আপনি রাগিবেন না। অধীন আপনার বংশধর।"

বানর আপন মনে পেয়ারা খাইতে

লাগিল। বুঝিল ব্যক্তিটা কদাচ শক্রুতা করিবে না। শক্রতা থাকিলে প্রথমেই তাড়াইতে আসিত। বানর নির্ভয়ে পেয়ারা খাইতে লাগিল। রাধাকৃষ্ণ বুঝিলেন বানরদেব নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কহিলেন,—

"তাত! আপনি দীন সন্তানের উপর কুপিত হইলেন? আমার অপরাধ? না বুঝিয়া যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি ক্ষমা করুন। এ দাসকে শ্রীচরণে রাখিবেন।"

বানর প্রাণ ভরিয়া পেয়ারা খাইতে লাগিল। রাধাকৃষ্ণ দেখিলেন, দেবের ক্রোধ শান্তি হইল না। কহিলেন,—

"গুরুদেব! আপনার কি অবিচার! আমি অধম, যদি একটা মন্দ কথাই বলিয়া থাকি, তাই বলিয়া কি আশ্রিত জনের প্রতি এত রাগ করা উচিত? আপনি হাসুন,—শ্রীমুখে একবার মধুর হাসি হাসুন। আমার প্রাণ শীতল হউক। আমি দাস মাত্র। আমার উপর রাগ করিয়া থাকা নিন্দার কথা। একবার হাসুন। আপনার হাসির অভাবে সমস্ত অন্ধকার দেখাইতেছে, একবার হাসুন, অন্ধকারে আলো হউক।"

বানর রাধাকৃষ্ণের কথায় কর্ণপাত করিল না। রাধাকৃষ্ণ মহা দুঃখিত হইলেন। দুঃখে চক্ষে জল আসিল। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া গলদশ্রুলোচনে কহিলেন,—

"প্রভো! দয়াময়! একবার হাসুন। অধীনের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া একবার হাসুন।"

রোদন-জনিত ভগ্ন কণ্ঠে, দাঁড়াইয়া রাধাকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন। বানর তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া একটু উত্ত্যক্ত হইল। একবার মুখ খিচাইল। রাধাকৃষ্ণ হাসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার চিত্তের ভার কমিল। সানন্দে বলিতে লাগিলেন,—

'দেব, আর্য্য, তাত! আপনি দয়াময়। আপনি নির্দ্দয় হইলে জগৎ অচল হইবে। আপনি জগৎপতি। আপনার অসীম ক্ষমতা। আপনি মঙ্গলময়। আপনি জীব শরীরের তেজ, মানবের আত্মা, বুদ্ধি, প্রাণ, সর্ব্বস্ব। আপনি আদমের আদম, ব্রহ্মার ব্রহ্মা। আপনি মানবের নিয়ন্তা, আপনি শ্রষ্টা, আপনি সংসারের কর্ত্তা। সর্ব্বত্র আপনার বুদ্ধি, ভাব ও মহিমা জ্বলন্ত অক্ষরে আপনার সত্ত্বা, ও করুণা প্রচার করিতেছে। পাপ, ভণ্ড, মায়া মোহাদি পূর্ণ, মানবগণ আপনার অপার মহিমা বুঝে না। তাহারা আপনাকে ত্যক্ত করে, আপনার আহারে বিঘ্ন জন্মায়, আপনার সহিত যথোচিত মন্দ ব্যবহার করে। হায়! এই ভ্রান্ত মানবগণের অবস্থা

কি হইবে, ঘোর নরকেও তাহাদের স্থান হইবে না। মানব বুদ্ধির দোষে অধঃপাতে যাইতেছে। কে তাহাদের উদ্ধার করিবে? হায়! দয়াময়! আপনি সদয় হইয়া তাহাদের সদুপদেশ দিন। জ্ঞানের পবিত্র আলোক বিস্তার করিয়া তাহাদের মনের অজ্ঞান তিমির নাশ করুন। আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি কি না বুঝেন? আপনি যাহা বুঝিতে না পারেন, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মানব তাহা কিরূপে বুঝিবে! অতএব আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে,—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যু-
পহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহু-
রিববামনঃ।"

দয়াময় আমাকে ক্ষমা করুন। আমি না বুঝিয়া যদি কিছু অন্যায় বলিয়া থাকি, অকিঞ্চনের সে দোষ লইবেন না। আমি মানব—আমি দীন—আমি মায়াচ্ছন্ন। প্রভুর অনন্ত-লীলা, অপার মহিমা হৃদ্গত করা কি আমার সাধ্য! দীনবন্ধো! আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে উদ্ধার করুন। আমার পাপ ভার মোচন করুন।

"ত্রাহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ
হর হরি!।"

হে দয়াময় বানরবংশাবতংস প্রভো! তোমার অনন্ত লীলা। আমি "যেদিকে ফিরাই আঁখি তোমারই মহিমা দেখি।" নাথ! তুমি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত। তুমি কামরূপী, দয়াসিন্ধু, গুণময়! তোমার প্রতাপ অনন্ত, তোমার ক্ষমতা অনন্ত, তোমার অনন্ত লীলা।

"ত্রাহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ।"

প্রভো! তুমি কোথায় নাই? কোন্ কার্য্যে তোমার সত্ত্বা নাই? দয়াময়! ঐ যে ধবলাঙ্গ রাজপুরুষ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া সন্নিহিত জনগণের প্রতি মুখ খিচাইতেছেন, তোমার মধুময় কণ্ঠ নিঃসৃত মধুময় ভাষার অনুকরণে বাক্য সুধা বর্ষণ করিতেছেন এবং তোমার ন্যায় স্বর্গীয় উদারতা সহকারে "আধা ডিক্রি আধা ডিস্‌মিস্" করিতেছেন, তাহাতে ভবদীয় স্বরূপ বিলক্ষণ উপলব্ধ হইতেছে। প্রভো! আপনি সেখানে আছেনই আছেন। প্রভুর দয়া সেস্থলে বিলক্ষণ প্রকাশ। প্রভুর স্বর্গীয় আকৃতি পর্য্যন্ত তথায় দেদীপ্যমান।

আর প্রভু! সম্পাদকীয় মহোচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া অতি মহৎ, অতি কঠিন সম্পাদকীয় কার্য্য, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তি সুসম্পন্ন করিতেছে, সে আপনার করুণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আপনি তাহার স্কন্ধে আবির্ভূত ও অধিষ্ঠিত না থাকিলে তাহার কি সাধ্য ও সাহস যে

সে তাদৃশ গুরুকার্য্য সুনির্ব্বাহিত করে? সম্পাদকের প্রবন্ধ সমস্তও আপনার অপার মহিমা নিরন্তর ঘোষণা করে। পবিত্র বানুরে বুদ্ধি না পাইলে লেখনী-মুখ হইতে তৎসমস্ত বিনির্গত হওয়া কদাচ সম্ভাবিত নহে। সম্পাদকের পুস্তক সমালোচন পাঠ করিয়া আমার বোধ হয়, যেন প্রভু স্বয়ং আসিয়া সে সময় লেখনী গ্রহণ করিয়া দীনহীন সম্পাদকের সহায়তা করেন। প্রভু আপনি সম্পাদকের সম্পাদক। আপনার অনন্ত দয়া। অপার মহিমা!

"ত্রাহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ।"

গুরুদেব! ঐ যে নিরীহ ব্যক্তি সমবেত বালকমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া গম্ভীরভাবে শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিলে আমার মনে আপনার অচিন্ত্য মহিমা সমুদিত হয়। আপনার দেব প্রকৃতি, তাহার পরিবর্ত্তন নাই। যাহা মূলে জানিয়াছেন, অদ্যাপি তাহাই জ্ঞাত আছেন; আপনার বুদ্ধির অন্যথা নাই। সমভাবে, সমধর্ম্মশীল হইয়া নিয়মিত কার্য্যে, আপনার পবিত্র জীবন পর্য্যবসিত হইতেছে। শিক্ষকের পক্ষেও অবিকল সেইরূপ। তাঁহারা যাহা শিখিয়াছেন, তাহাই শিখাইতেছেন। তাঁহাদের জীবনও আপনার ন্যায় সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। প্রভুর আর এক গুণ শিক্ষক শরীরে সবিশেষরূপে লক্ষিত হয়। প্রভু যদি রাগত হন, তাহা হইলে উভয় হস্তে সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র মানবকে চপেটাঘাত করিয়া থাকেন এবং মুখ খিঁচাইয়া স্বীয় পবিত্র মনোহর বদনমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া থাকেন; শিক্ষক শরীরে সময়ে সময়ে এই সকল গুণ সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের উপরে দয়াময়ের সমূহ কৃপা না থাকিলে কখনই এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ভগবন্! আপনি শিক্ষকের শিক্ষক, আপনি মানবের মহাগুরু। অধীনকে দয়া করিবেন।

পুরুষোত্তম! যে সকল ব্যক্তি গ্রন্থ লিখিয়া অধুনা মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিতেছে, তাহাদের প্রতি কি আপনার করুণা নাই? এ মহৎকার্য্য আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত কিরূপে ঘটিতে পারে? আমি দেখিতে পাই তাহারা ভবদীয় মাহাত্ম্য বলেই ঐ গুরুকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহারা যখন অহমিকা পূর্ণ হইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকে এবং আলাপপ্রত্যাশী জনগণের সহিত মস্তক অন্দোলন ও দন্ত বাহির করিয়া হাসেন, তখন প্রভুর মূর্ত্তি মনে পড়ে। প্রভুর অবস্থা সময়ে সময়ে অবিকল ঐরূপ হয়। প্রভু যখন শাখাদ্বয়ের সন্ধিস্থলে গম্ভীরভাবে উপবেশন করিয়া থাকেন, তখন আপনার সম্মুখে কোন মানব উপস্থিত হইলে, আপনি গ্রন্থকারগণের ন্যায় মস্তক আন্দোলন করিয়া দন্ত বাহির করিয়া

থাকেন। প্রভুর সহিত কোন নিকট সম্বন্ধ না থাকিলে গ্রন্থকারগণের সহিত এতাদৃশ ঐক্য হইবে কেন? তাঁহাদের পুস্তকাদিতেও আপনার দৈবী বুদ্ধির পরিচয় দেখিতে পাই। প্রায় নবপ্রকাশিত পুস্তকের প্রত্যেক অক্ষরে ভবদীয় মহৎ মনের প্রমাণ বহন করে। আপনার মন তাঁহাদের মনের সহিত বিমিশ্রিত না হইলে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? সুতরাং নিঃসংশয়ে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক গ্রন্থকার বর্গ প্রভুর অংশ বিশেষ। প্রভু দয়াময়! আপনার করুণা বোধাতীত। আপনি দয়া করিয়া দীন হীন বঙ্গীয় যুবক বৃন্দকে গ্রন্থকার পদবী প্রদান করিতেছেন। আপনার অপার মহিমা, আপনি এ অধীনকে উদ্ধার করুন।

নরনাথ! আপনি জগতের কাহাকেও তো কখন ভুলিয়া থাকেন না। যে সকল পরম পবিত্র পুণ্যাত্মা ব্রাহ্ম--আত্মীয়, স্বজন, জনক জননী প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ সভ্যতার প্রমাণ দিতেছে, তাহাদের উপরও ভবদীয় বিশেষ দৃষ্টি নিয়ত সন্দর্শন করিয়া থাকি। দেব! আপনি যতদিন নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় থাকেন, ততদিন আত্মীয়ের অধীন থাকেন। সংসার প্রান্তরে স্বেচ্ছায়, স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার ক্ষমতা জন্মিলে আপনি আর কাহারও নহেন। তখন আপনি স্বয়ং মল্লবেশে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। নির্ব্বোধ মানব এই উদার প্রকৃতির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে পশু স্বভাব বলিয়া থাকে। তাহাদের বুঝিবার ভুল। সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া ভবদীয় পবিত্র ভাব সমস্ত না পাইলে সমস্তই অঙ্গহীন হয়। এজন্য অধিকাংশ নবীন ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ আপনার উদার ভাব অবলম্বন করিয়া মহত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। কে তাঁহাদের নিন্দা করে? যে নিন্দা করে তাহার মুখ খসিয়া পড়ুক।

কে বলে বঙ্গভূমির উন্নতি হইতেছে না? যে বলে সে অহম্মুখ। বঙ্গভূমির ভরসা স্বরূপ নব্যবঙ্গ ভ্রাতৃগণ যথেষ্ট উন্নতির চিহ্ন দেখাইতেছেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতি আপনার অবতার বলিয়া খ্যাত হইতেছে, এবং আপনি মনুর মনু অর্থাৎ মানবের আদি পুরুষ, একথা যে দেশ হইতে প্রচার, আমাদের নবীন ভ্রাতৃগণ সেই জাতির অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ করিতেছেন। আপনার অবতারানুরাগী হইলে ও তদুপাসনা করিলে অবশ্যই আপনার প্রতি সমূহ অনুরাগ প্রদর্শন করাও অবশ্যই আপনার উপাসনা করা হয়। ফলতঃআমাদের ভরসা স্বরূপ যুবক বৃন্দ যে বানরানুরাগী বানরোপাসক

ইহা অবশ্যই সবিশেষ আনন্দের কথা। তাহাদের দ্বারা অবশ্যই দেশের হিত সাধিত হইবে। তাহাদের অনুরাগ এত প্রবল যে, তাহারা যৎকালে তদ্গত চিত্তে প্রভুর চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তখন যেন বোধ হয় যে, তাঁহারা প্রভুর আকৃতিও প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা যখন প্যাণ্টালুন পরিধান, টাইট্ চাপকান গায়, নেত্রে চস্মা, বদনে চুরট দিয়া, যষ্টির উপর ভর করিয়া দণ্ডায়মান হন, তখন আমি তাহাদিগকে মূর্ত্তিমান হনুমানাবতার বিবেচনায় ভক্তিভাবে বার বার নমস্কার করি; এবং আমার চক্ষু দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু নিঃসৃত হয়। আপনার ন্যায় শ্বেতাবয়ব করিবার নিমিত্ত তাঁহারা শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কখন কখন কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিতেও দেখা যায়। প্রভুর অন্য বর্ণে এক অংশ আছে। কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ সেই অংশের অনুকরণে। প্রভুর লোচন যুগল পিঙ্গলবর্ণ। লোচন প্রভুর সদৃশ করিবার জন্য আমাদের সুযোগ্য ভ্রাতৃবর্গ তাহা পিঙ্গলাবরণে আবরিত করিয়া রাখেন। প্রভু লঙ্কাদাহন কালে দগ্ধ লাঙ্গুল বার বার বদন মধ্যে দিয়াছিলেন। ভগবান যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, ভক্তের অবশ্য তাহা স্মরণ করা বিধেয়। সেই স্মৃতি জাগরিত রাখিবার নিমিত্ত আমাদের বিচক্ষণ অনুজগণ নিরন্তর ক্ষুদ্র লাঙ্গুলবৎ দ্রব্য অগ্নি সংযুক্ত করিয়া বদনে রাখিয়া থাকেন। আর আমাদের ভ্রাতৃগণের সামাজিক ব্যবহারের প্রত্যেক অংশ মহাশয়ের অনুরূপ। তৎসমস্তের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিলক্ষণ আশা জন্মে যে, আজি হউক বা দশদিন পরে হউক, অবশ্যই এই নবীন মহাত্মা, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ভারতের অভ্যুদয় হইবে, মাতৃভূমির দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইবে। নব্য বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ! তোমাদের জয় হউক। তোমরা সুখে থাক। প্রভু! আপনি যে দেশের আশাতীত দুর্দ্দশা দেখিয়া ভারতের আশাস্থল নবীন ভারত সন্তানগণের হৃদয়ে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, ইহা আপনার নিতান্ত উদারতার পরিচয়। আমার কি ক্ষমতা যে আপনার অসীম মহিমা আমি কীর্ত্তন করিব! আমি দীন, অন্য উপায়াভাবে আপনার শ্রীপদপঙ্কজে বার বার নমস্কার করি।

জগতের কোন্ দিকেই বা আপনার চিহ্ন, অস্তিত্ব ও সত্বা উপলব্ধ না হয়, তাহা বলিতে পারি না। এই জন্যই বলিতেছিলাম—

"যে দিকে ফিরাই আঁখি
তোমারি মহিমা দেখি।"

যখন অন্তঃপুর মধ্যে রমণীমণ্ডলে প্রবেশ করি, তখন দেখিতে পাই আপনার স্বর্গ মর্ত্ত চরাচর ব্যাপী করুণা সে স্থানকে এক নিমেষের নিমিত্তও বিস্মৃত হয় নাই। পাঁচীর মা যে চুল খুলিয়া বড় গিন্নির স্কন্ধে মস্তক বিন্যাস করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, এবং বড় গিন্নী যত্নের সহিত তাহার কেশ মধ্যস্থ উৎকুন বাছিতেছেন, তাহা দেখিলে কোন্ ভক্তের হৃদয়ে আপনাদের উদার প্রেমময় ভাবের কথা না সমুদিত হইবে এবং কোন্ ভক্তই বা তদ্দর্শনে প্রেমাশ্রু বর্ষণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিবে? আহা! আর যখন পাঁচীর মা, পাঁচীর অপরাধ জন্য তাহার গণ্ডে নখরাঘাত করিতেছে, তখন তাহা দেখিলে, আপনারই সময় বিশেষের অবস্থা ভিন্ন কি মনে পড়িবে? আহা পাঁচীর মা লোক ভাল। পাঁচীর মা যখন একটা কাঁঠাল লইয়া একা বিরলে খাইতে বসে তখন তাহার আত্মায় অবশ্যই আপনার আবির্ভাব হয়। নচেৎ সে মধুর ভাব কিরূপে জন্মিবে? তাহা দেখিলেও পুণ্য আছে। প্রভুর আলোচনায় যত থাকা যায় ততই মঙ্গল। যাহাতে প্রভুর কথা মনে পড়ে তাহাই ভাল। আমি সেই জন্য, 'পাঁচীর মা যখন ঐরূপে কাঁঠাল খায়, তখন অন্তরাল হইতে হা করিয়া দেখি। লোকে তাহার কাঁঠাল খাওয়া দোষের জন্য তাহাকে রাক্ষস বলে। ছিঃ! ছিঃ!!! সে লোকদের কখন মুক্তি হইবে না। খুদীর (তাঁহার স্ত্রী) কথা যখন মনে পড়ে, তখন প্রভুর সমস্ত লীলা মনে হয়। খুদী যখন আমার উপর রাগ করিত, তখন যদি আমি তাহার নিকটস্থ হইতাম, খুদী তাহা হইলে মুখের যেরূপ বিকৃত ভাব করিত এবং যেরূপ উগ্রচণ্ডা বেশে আমার নিকট ধাইয়া আসিত ও যেরূপ বিকট চীৎকার করিত, তাহা দেখিলে আমার নিশ্চয় বোধ হইত যে, ভগবান বিকৃত বদন হনুমন্তজীর রক্তের সহিত আমার দাঁর রক্তের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে। (আমার মনে কোন দূষ্য ভাব নাই) নচেৎ আমার খুদী এমন হয় কেন? খুদী কি পুণ্যাত্মা! তাহার উপর প্রভুর অনুগ্রহ ছিল, তাহার সার্থক জন্ম। আমি অধম, আমার উপায় কি হইবে? প্রভো! খুদীকে উদ্ধার করিয়াছ, আমাকে উদ্ধার কর।

দয়াময়! দীনবন্ধো! অখিলনাথ! অনাথশরণ! ভবভয়বারণ! ভগবান ভবানীপতি! আপনার কোন্ গুণের কথা বলিব? আপনার গুণের সীমা নাই। দুঃখের বিষয় সকলে আপনার শক্তি, গুণ, মহিমা বুঝে না। আমার ভরসা আছে, জগতে এবম্বিধ নাস্তিকতা অধিক দিন থাকিবে না। কারণ আধুনিক নব্য বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ, দেশীয়

সম্পন্ন ভূস্বামীগণ, ও রাজপুরুষগণ বিশেষ গুণজ্ঞ, চিন্তাশীল ও সদ্বিবেচক। তাঁহারা সকলেই আপনার পক্ষপাতী। তাঁহারা সকলেই বানরোপাসক। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই ভগবদ্ভক্তিবৎ বানর ভক্তি উপলব্ধি হয়। তাঁহারা ধন্য। তাঁহাদের জয় হউক। দেশ যত সভ্য হইবে, ততই বানরানুরাগ সম্বর্দ্ধিত হইবে তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সভ্যতার অত্যুচ্চ স্থান ইংলণ্ডে আপনার মহিমা সবিশেষ প্রচার। তথাকার জনগণ আপনার লীলা সমস্তের এতই অনুরাগী যে, তাঁহারা ভবদীয় অবতার নামে প্রথিত হইতেছেন। সেই মর্কটাবতারগণ অধুনা জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই আপনার অনুকরণে সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহারা ধন্য। তাঁহাদের কুশল হউক। রাজশাসনে দেশের সমস্ত পরিবর্ত্তনই সম্ভাবিত। রাজপুরুষ একটু যদি মনোযোগী হন তাহা হইলে অনায়াসে আমাদের দেশের এই নাস্তিকতা বিদূরিত হইতে পারে। আমার বিবেচনায় দেশহিতৈষী জনগণ সমবেত হইয়া একটী কমিটী করা উচিত। সেই কমিটী হইতে বানরোপাসনা বিধি হইবার নিমিত্ত ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে এক মেমোরিয়েল প্রেরণ করা আবশ্যক। এ অনুষ্ঠান যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম মিত্র, অতি সুবিবেচক ডারউইন যুক্তি ও তর্কশাস্ত্র অবলম্বনে বাহির করিয়াছেন যে, মনুষ্য বানর বংশ সম্ভূত। হাঃ হাঃ কি গোল! এই প্রত্যক্ষ সত্য সপ্রমাণ করিতে ভ্রাতৃবর এত কষ্ট কেন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এ কথা তো সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। ইহার জন্য প্রমাণ প্রয়োগের কোনই প্রয়োজন নাই। যাহা হউক আপনার সম্বন্ধে আলোচনা হওয়াই শুভ। ডারউইন ভায়া ভাল চেষ্টাই করিয়াছেন। তিনি সুখে থাকুন।

আমি মূঢ়মতি আর অধিক কি বলিব? আপনার মহিমা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ আপনার অপার মহিমা কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে পারেন। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার আত্মাকে উদ্ধার করুন। আমাকে মুক্ত করুন। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, মূঢ়মতি, আপনার গুণ সমস্ত উল্লেখ করিয়া স্তব করিতে পারিলাম না। আপনার সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করা মনুষ্য সাধ্যের অতীত। কালিদাস ভায়া যে বলিয়াছেন,—

"মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য
তব সংহ্রীয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা
ন হি গুণানামিয়ত্তয়া॥"

এ কথা সর্ব্বথা আপনাতেই প্রযুজ্য। দেব! আমার প্রতি অনুগ্রহ রাখিবেন। 'ত্রাহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ।' আমেন্।"

রাধাকৃষ্ণ নীরব হইলেন। ভক্তিজনিত উৎসাহে, তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি অতৃপ্ত নয়নে বানরের পাদপদ্মে দৃষ্টি রাখিয়া উপবেশন করিলেন। বানরের পেয়ারা ভক্ষণ শেষ হইল। গাছ উজার হইল। বানর প্রস্থানের উপক্রম করিল। রাধাকৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া বৃক্ষ সন্নিধানে গমন করিলেন। কহিলেন,—

"প্রভো! আহার সাঙ্গ হইল। এক্ষণে প্রস্থান করিতেছেন। একান্ত যদি যাইবেন তবে অধীনের মস্তকে একবার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া দিন।"

বানর শুনিল না। সে শাখা হইতে স্বতন্ত্র শাখায় লাফাইয়া পড়িল। রাধাকৃষ্ণ "প্রভো! প্রভো!" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রভু শুনিলেন না। পেয়ারা বৃক্ষ ত্যাগ করিলেন।

"প্রভো! কোথায় যান। আমার উপায় কি হইবে নাথ! পদরজ দিয়া যান গুরুদেব।"

বলিতে বলিতে সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ ছুটিতে লাগিলেন। বানর সন্নিহিত আম্রবৃক্ষের উপরে উঠিল। লাঙ্গুল দুলিতে লাগিল। রাধাকৃষ্ণ কহিলেন,—

"দয়াময়! অধীনের উপর ক্রোধ করিবেন না। ভক্তবৎসল! শান্ত হউন।"

বানর মুখ খিচাইল। রাধাকৃষ্ণ "প্রভু আমি আপনাকে ছাড়িব না। পদরজ দিয়া আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।" বলিয়া বানরের লম্বমান লাঙ্গুল টানিয়া ধরিলেন। বানর মুখ খিচাইল, শব্দ করিতে লাগিল। অবশেষে উপায়াভাবে বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাধাকৃষ্ণের গণ্ডে বিষম চপেটাঘাত করিল। প্রহারের জ্বালায় রাধাকৃষ্ণ লাঙ্গুল ছাড়িয়া দিলেন। বানর প্রস্থান করিল। রাধাকৃষ্ণ সেই স্থলে শুইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ইতি।—

শ্রীগদাধর মিশ্র।*

* অনুল্লঙ্ঘনীয় অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আমরা গদাধর বাবুর পত্রখানি প্রকাশ করিলাম। কোথায় কোন্ গাঁজাখোর কি বলিয়াছে, তাহা জানিতে কেহই উৎসুক নহেন। বিশেষ পত্রখানি অত্যন্ত রূঢ় কথায় পূর্ণ। গাঁজাখোরের মত কদাচ অনুমোদনীয় নহে। ভরসা করি গদাধর বাবু ভবিষ্যতে এরূপ অসার প্রবন্ধ পাঠাইয়া আমাদিগকে উত্ত্যক্ত করিবেন না।

(জ্ঞাঃ সং)

রস-সাগর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রশ্ন, "যাও যাও যাও হে।" রস-সাগরের পূরণ,—হিমালয়ের প্রতি মেনকার উক্তি।

পরশিয়ে রাঙ্গা পায়,
কি বলে ছিলে উমায়,
স্নেহে লোমাঞ্চিত কায়,
ভূমিতে লোটায় হে।
মেনকার হত ভাগ্যে,
ভুলে গেলে সে প্রতিজ্ঞে,
পাষাণের নাহি সংজ্ঞে,
তাই কি জানাও হে॥
মনস্তাপ খণ্ডি চণ্ডি-
মণ্ডপে বসিয়া চণ্ডী,
চণ্ডীকে শুনাও চণ্ডী,
কত নাচ গাও হে।
সম্বৎসর গেল বয়ে,
উমা আছে পথ চেয়ে,
আন মাহেশ্বরী মেয়ে,
যাও-যাও যাও হে॥

প্রশ্ন,—"গজের উপরে গজ তদুপরি অশ্ব।" রস-সাগর মহাশয় পূরণ করিলেন,—

হু হু হু হু হুহুঙ্কার,
পদাঘাতে দেহ কার।
হয় বুঝি ছার খার,
রসাতল বিশ্ব।
হি হি হি হি অট্টহাসি,
অষ্ট দিকে অষ্ট দাসী,
শিবের হৃদয়ে বসি,
না করিল দৃশ্য।
কিং কিং কিং কিমাভাসে,
অনায়াসে দৈত্যনাশে,
শোণিত সাগরে ভাসে,
শিবের সর্ব্বস্ব।
হা হা হা হা হাহাকার,
গ্রাস করে চমৎকার,
গজের উপরি গজ,
তদুপরি অশ্ব।

একদা প্রশ্ন হইল "সতীবাক্য রক্ষা হেতু বেদবাক্য নড়ে।" রস-সাগর একটী প্রবাদ বাক্য অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিলেন।

রুগ্ন পতি লয়ে সতী প্রবেশিল ঘরে।
রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে॥
ভয়ে সূর্য্য লুকাইল সুমেরুর আড়ে।
সতীবাক্য রক্ষা হেতু বেদবাক্য নড়ে॥

উপরি উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে একটী প্রবাদ-বাক্য বিষদ রূপে বর্ণন করা উচিত বিবেচনায়, এখানে তাহার অবতারণা করা যাইতেছে। অতি পুরাকালে এক সতী স্ত্রী বাস করিতেন। তাঁহার পতি কুষ্ঠ রোগে পঙ্গু হওয়ায়, সতী তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া প্রয়োজন স্থানে লইয়া যাইতেন। একদা লক্ষহীরা

নাম্নী স্বর্গবেশ্যা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পুঙ্গের নয়নপথবর্ত্তিনী হওয়ায় কুষ্ঠীর চিত্তবৈকল্য জন্মে, এবং ঐ বেশ্যাকে সম্ভোগ করিবার জন্য তাহার মন যারপরনাই ব্যাকুল হয়। সতী, পতির এতাদৃশ চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া রাত্রি-যোগে লক্ষহীরার আবাস উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নগরপ্রান্তে মাণ্ডব্য মুনি শূলোপরি পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতেছেন। তিনি বাল্যকালে কীটপতঙ্গ দিগকে খড়িকায় বিদ্ধ করিয়া যৎপরোনাস্তি যাতনা দিতেন, এই জন্য পরিণামে শূলদণ্ড হয়। শূলে সংস্থাপিত হইয়াও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। তাঁহারই নিম্নদিয়া পতিপরায়ণা সতী, রুগ্ন পতিকে স্কন্ধে লইয়া যাইতে ছিলেন। মাণ্ডব্য মুনির পদে রুগ্নের মস্তক স্পর্শ হওয়ায় তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তখন শূলের যন্ত্রনায় কাতর হইয়া অভিসম্পাত করিলেন, "যে দুরাচার আমার ধ্যানের বিঘ্ন করিয়াছে, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তাহার মৃত্যু হইবে।" সতী তৎক্ষণাৎ উদ্দেশ্যস্থান গমনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রুগ্ন পতিকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং কহিলেন "আমি যদি সতী হই—আমি যদি কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করিয়া থাকি, তবে কার সাধ্য আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা দেয়!" সতীর অনিষ্ট-সাধন দেবগণেরও সাধ্য নহে। সূর্য্য বিবেচনা করিলেন, আমি উদিত হইলেই সতী বিধবা হইবেন, এবং তাহাতেই আমাকে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইতে হইবে। এই ভয়ে তিনি সুমেরুর আড়ে লুকাইলেন। সূর্য্যোদয় হইল না। সতীর বাক্য রক্ষার জন্য বিধির নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইল। এই প্রবাদ বাক্য অবলম্বন করিয়া রস-সাগর মহাশয় সমস্যা পূরণ করিলেন। তাঁহার সংগ্রহের ক্রটী ছিল না। প্রশ্ন করিবামাত্র এই সকল উদ্ভট ভাব আহরণ করিয়া সমস্যা পূরণ করা সহজ ক্ষমতার বিষয় নহে। দুঃখের বিষয় এমন অসাধারণ ব্যক্তির রচনা সকল লোপ পাইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য!

এক জন প্রশ্ন করিলেন, "ললাটে নুপুর ধ্বনি অপরূপ শুনি।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন;—

শ্রীরাধার প্রেমে বাঁধা শ্রীনন্দনন্দন।
দুর্জ্জয় মানেতে রাধা মজেছে যখন॥
কৃষ্ণচন্দ্র সেই মান ভঞ্জন কারণ।
পীতাম্বর গলে দিয়া ধরেন চরণ॥
শেষে পদ মস্তকেতে নিলেন চক্রপাণি।
ললাটে নুপুরধ্বনি অপরূপ শুনি॥

একদা কথায় কথায় এক জন কহিলেন, "নিশি অবসান।" রস-সাগর চুপ করিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। পূরণ করিলেন;—

চন্দ্রাবলী বলে শুন হে বংশীবয়ান।
শুকতারা আগমনে শশী ম্রিয়মাণ॥
লোকেতে দেখিলে হবে মোর অপমান।
গাত্রোত্থান কর নাথ নিশি অবসান॥

মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ঘটনা সমুদায়, এবং দেশ প্রচলিত প্রবাদ বাক্যগুলি সর্ব্বদা রস-সাগরের মনে জাগরূক থাকিত। প্রশ্ন পড়িবামাত্র তাহার একটী না একটী ঘটনাসূত্রে উত্তর গ্রন্থণ করিতেন, সুতরাং উত্তর মাত্রই ভাব শুদ্ধ হইত। দ্রুতকবিদিগের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। একদা প্রশ্ন হইল, "ধরাতল স্বর্গস্থল কিছুমাত্র ভেদ তায় নাই।" তৎক্ষণাৎ রস-সাগর দণ্ডীপর্ব্ব অবলম্বন করিয়া শ্লোক রচনা করিলেন। একদা উর্ব্বসী শাপগ্রস্তা হইয়া অশ্বিনী রূপে বিচরণ করেন। পৃথিবীতে অষ্ট বজ্র একত্র হইলে তাঁহার শাপ বিমোচন হইবে। দণ্ডী নৃপতি অশ্বিনীকে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া দণ্ডীর নিকট অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। দণ্ডী অস্বীকৃত হইলে সসৈন্যে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। নৃপতি প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ঐ অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক নৃপতির নিকট উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই কৃষ্ণের বিপক্ষতা করিতে সাহসী হইলেন না; অবশেষে দণ্ডী ভীমের নিকট গমন করিলেন। ভীম তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। পাণ্ডবদের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং তদুপলক্ষে সমস্ত দেবগণ রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে যমের দণ্ড, শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, ইন্দ্রের বজ্র ইত্যাদি অষ্ট বজ্র একত্রিত হইবামাত্র উর্ব্বসী শাপ মুক্তা হইলেন। রস-সাগরের শ্লোক এই ;—

সুরপুর শূন্য করি, কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধরি
ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
দণ্ডিনৃপদণ্ডে দণ্ডী,ভাবিয়া সহিত চণ্ডী,
অবনীতে উপনীত হন॥
উর্ব্বসীর শাপ খণ্ড, দণ্ডি নৃপতির দণ্ড,
অষ্ট বজ্র মিলে এক ঠাঁই।
ভীম জন্যে এত হল, ধরাতল স্বর্গস্থল,
কিছু মাত্র ভেদ তায় নাই॥

একদা প্রশ্ন হইল, "তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে।" রস-সাগর পূরণ করিলেন ;—

কৈকেয়ী বচনে রাজা রামে বনে দিয়ে
মনস্তাপে ব্রহ্মশাপে জর্জ্জরিত হয়ে॥
দশরথ অযুত বৎসর আয়ু পেয়ে।
তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে॥

প্রশ্ন "কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলঙ্ক।" রস-সাগরের পূরণ ;—

লম্পট কপট রোগ,
অবলার কর্ম্মভোগ,
নন্দালয়ে কীর্ত্তিযোগ,
গোকুল আতঙ্ক।

কেঁদে কন যশোমতি,
জটিলা কুটিলা সতী,
আন জল শীঘ্রগতি,
উভয়ে নিঃশঙ্ক ॥
মায়ে ঝিয়ে একি লাজ,
পড়িল কলঙ্ক বাজ,
ক্ষিতিতলে বৈদ্যরাজ,
পাতিলেন অঙ্ক।
ব্রজে মাত্র সতী রাই,
হরে রাম ঘরে যাই,
কলঙ্ক ঘুচাতে এসে,
হইল কলঙ্ক ॥

ক্রমশঃ—

বনফুল।

চতুর্থ সর্গ।

নিভৃত যমুনা তীরে, বসিয়া রয়েছে কিরে
কমলা নীরদ দুই জনে?
যেন দোঁহে জ্ঞান হত—নীরব চিত্রের মত
দোঁহে দোঁহা হেরে এক মনে।

দেখিতে দেখিতে কেন-অবশ পাষান হেন
চখের পলক নাহি পড়ে।
শোণিত না চলে বুকে-কথাটি না ফুটেমুখে
চুলটিও না নড়ে না চড়ে!

মুখ ফিরাইল বালা-দেখিল জ্যোছনা মালা
খসিয়া পড়িছে নীল যমুনার নীরে—
অস্ফুট কল্লোল স্বর-উঠিছে আকাশ পর
অর্পিয়া গভীর ভাব রজনী গভীরে!

দেখিছে লুটায় ঢেউ, আবার লুটায়
দিগন্তে খেলায়ে পুনঃ দিগন্তে মিলায়।
দেখে শূন্যে নেত্রতুলি—খণ্ডখণ্ড মেঘগুলি
জ্যোছনা মাখিয়া গায়ে উড়ে উড়ে যায়।
এক খণ্ড উড়ে যায় আর খণ্ড আসে
ঢাকিয়া চাঁদের ভাতি-মলিন করিয়া রাতী
মলিন করিয়া দিয়া সুনীল আকাশে।

পাখী এক গেল উড়ে নীল নভোতলে,
কেন খণ্ড গেল ভেসে নীল নদী জলে,
দিবা ভাবি, অতিদূরে-আকাশ সুধায় পূরে
ডাকিয়া উঠিল এক প্রমুগ্ধ পাপীয়া।
পিউ, পিউ, শূন্যে ছুটে-উচ্চ হতে উচ্চে উঠে
আকাশ সে সূক্ষ্ম স্বরে উঠিল কাঁপিয়া,
বসিয়া গণিল বালা-কত ঢেউ করে খেলা
কত ঢেউ দিগন্তের আকাশে মিলায়
কত ফেন করি খেলা-লুটায়ে চুম্বিছে বালা
আবার তরঙ্গে চড়ি সুদূরে পলায়।

দেখিদেখিথাকিথাকি-আবারফিরায়েআঁখি
নীরদের মুখ পানে চাহিল সহসা—
আধেক মুদিত নেত্র—অবশ পলক পত্র
অপূর্ব্ব মধুর ভাবে বালিকা বিবশা!
নীরদ ক্ষণেক পরে উঠে চমকিয়া
অপূর্ব্ব স্বপন হতে জাগিল যেনরে।
দূরেতে সরিয়া গিয়া—থাকিয়া থাকিয়া
বালিকারে সম্বোধিয়া কহে মৃদুস্বরে।
"সেকি কথা শুধাইছ বিপিন রমণী!

ভাল বাসি কিনা আমি তোমারে কমলে?
পৃথিবী হাসিয়া যেলো উঠিবে এখনি!
কলঙ্ক রমণী নামে রটিবে তা হলে?
একথা শুধাতে আছে?ওকথাভাবিতেআছে?
ওসব কি স্থান দিতে আছে মনে মনে?
বিজয় তোমার স্বামী-বিজয়ের পত্নীতুমি
সরলে! ওকথা তবে শুধাও কেমনে?
তবুও শুধাও যদি দিব না উত্তর!—
হৃদয়েযালিখাআছে-দেখাবোনাকারোকাছে
হৃদয়ে লুকান রবে আমরণ কাল!
রুদ্ধ অগ্নি রাশিসম—দহিবে হৃদয়মম
ছিড়িয়া খুঁড়িয়া যাবে হৃদ গ্রন্থিজাল!
যদি ইচ্ছা হয় তবে, লালাস মাপিয়াভবে
শোণিত ধারায় তাহা করিব নির্ব্বাণ।
নহে অগ্নি শৈলসম—জ্বলিবে হৃদয় মম
যত দিন দেহ মাঝে রহিবেক প্রাণ!
যে তোমারে বন হোতে এনেছে উদ্ধারি,
যাহারে করেছ তুমি পানি সমর্পণ,
প্রণয় প্রার্থনা তুমি করিও তাহারি—
তারে দিও যাহা তুমি বলিবে আপন!
চাইনা বাসিতে ভাল, বাল বাসিব না!
দেবতার কাছে এই করিব প্রার্থনা—
বিবাহ করেছ যারে, সুখে থাক লয়েতারে
বিধাতা মিটান তব সুখের কামনা!”
“বিবাহ কাহারে বলে জানিনা তাআমি”
কহিল কমলা তবে বিপিন কামিনী!
“কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী-
কারে বলে ভাল বাসা আজিও শিখিনি
এই টুকু জানি শুধু এই টুকু জানি,
দেখিবারে আঁখি মোর ভাল বাসে যারে
শুনিতে বাসি গো ভাল যার সুধা বাণী-
শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে!
ইহাতে পৃথিবী যদি কলঙ্ক রটায়
ইহাতে হাসিয়া যদি উঠে সব ধরা
বল গো নীরদ আমি কি করিব তার?
রটায়ে কলঙ্ক তবে হাসুক না তারা।
বিবাহ কাহারে বলে জানিতে চাহি না—
তাহারে বাসিব ভাল, ভাল বাসি যারে!
তাহারই ভালবাসা করিব কামনা
যে মোরে বাসেনা ভাল ভালবাসি যারে”!
নীরদ অবাক রহি কিছুক্ষণ পরে
বালিকারে সম্বোধিয়া কহে মৃদুস্বরে,
“সেকি কথা বলো বালা যেজন তোমারে
বিজন কানন হতে করিয়া উদ্ধার
আনিল, রাখিল যত্নে সুখের আগারে—
সেকেনগো ভালবাসা পাবেনা তোমার?
হৃদয় সঁপেছে যেলো তোমারে নবীনা
সেকেন গো ভালবাসা পাবেনা তোমার?”
কমলা কহিল ধীরে “আমিতা জানিনা”
নীরদ সমুচ্চ স্বরে কহিল আবার—
“তবে যালো দুশ্চারিনি! যেথা ইচ্ছাতোর,
কর তাই যাহা তোর কহিবে হৃদয়—
কিন্তু যত দিন দেহে প্রাণ রবে মোর—
তোর এ প্রণয়ে আমি দিব না আশ্রয়!
আর তুই পাইবিনা দেখিতে আমারে—
জ্বলিব যদিন আমি জীবন অনলে—
স্বরগে বাসিব ভাল যাখুসী যাহারে—
প্রণয়ে সেথায় যদি পাপ নাহি বলে!
কেন বল পাগলিনি! ভালবাসি মোরে
অনলে জ্বালিতে চাস এ জীবন ভোরে
বিধাতা যে কি আমার লিখেছে কপালে!
যে গাছে রোপিতে যাই শুকায় সমূলে!”
ভৎসনা করিবে ছিল নীরদের মনে—
আদরেতে স্বর কিন্তু হয়ে এল নত!
কমলা নয়ন জল ভরিয়া নয়নে,
মুখ পানে চাহি রয় পাগলের মত!

নীরদ উদ্গামী অশ্রু করি নিবারিত
সবেগে সেখান হতে করিল প্রয়াণ।
উচ্ছ্বাসে কমলা বালা উনমত্ত চিত
অঞ্চল করিয়া সিক্ত মুছিল নয়ান।

পঞ্চম সর্গ।

বিজয় নিভৃতে—কি কহে নিশীথে ?
কি কথা শুধায়—নীরজা বালায়—
দেখেছ, দেখেছ হোথা ?
ফুল পাত্রহতে, ফুল তুলি হাতে
নীরজা শুনিছে কুসুম গুণিছে
মুখে নাই কিছু কথা।
বিজয় শুধায়—কমলা তাহারে
গোপনে গোপনে, ভালবাসে কিরে ?
তার কথা কিছু বলে কি সখীরে ?
যতন করে কি তাহার তরে।
আবার কহিল, "বলো কমলায়—
বিজন কানন হইতে যে তায়—
করিয়া উদ্ধার সুখের ছায়ায়—
আনিল, হেলা কি করিবে তারে ?
যদি সে ভাল না বাসে আমায়
আমি কিন্তু ভাল বাসিব তাহায়—
যত দিন দেহে শোণিত চলে।"
বিজয় যাইল আবাস ভবনে
নিদ্রায় সাধিতে কুসুম শয়নে।
বালিকা পড়িল ভুমির তলে।
বিবর্ণ হইল কপোল বালার—
অবশ হইয়া এল দেহ ভার—
শোণিতের গতি থামিল যেন !
ওকথা শুনিয়া নীরজা সহসা
কেন ভূমি তলে পড়িল বিবশা ?
দেহ থর থর কাঁপিছে কেন ?

ক্ষণেকের পরে লভিয়া চেতন,
বিজয়-প্রাসাদে করিল গমন
দ্বারে ভর দিয়া চিন্তায় মগন
দাঁড়ায়ে রহিল কেন কেজানে ?
বিজয় নীরবে ঘুমায় শয্যায়,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিতেছে বায়;
নক্ষত্র নিচয় খোলা জানালায়
উঁকি মারিতেছে মুখের পানে !
খুলিয়া, মেলিয়া অসংখ্য নয়ন
উঁকি মারিতেছে যেনরে গগন,
জাগিয়া ভাবিয়া দেখিলে তখন
অবশ্য বিজয় উঠিত কাঁপি !
ভয়ে, ভয়ে ধীরে মুদিত নয়ন
পৃথিবীর শিশু ক্ষুদ্র প্রাণমন—
অনিমেষ আঁখি এড়াতে তখন,
অবশ্য দুয়ার ধরিত চাপি !
ধীরে, ধীরে, ধীরে, খুলিল দুয়ার,
পদাঙ্গুলি পরে সপি দেহভার—
কেও বামা ডরে প্রবেশিছে ঘরে—
ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলিয়া ভয়ে
এক দৃষ্টে চাহি বিজয়ের মুখে
রহিল দাঁড়ায়ে শয্যার সমুখে,
নেত্রে বহে ধারা মরমের দুখে,
ছবিটির মত অবাক হয়ে !
ভিন্ন ওষ্ঠ হতে বহিছে নিশ্বাস—
দেখিছে নীরজা ফেলিতেছে শ্বাস
সুখের স্বপন দেখিয়ে তখন
ঘুমায় যুবক প্রফুল্ল মুখে !
'ঘুমাও বিজয় ! ঘুমাও গভীরে
দেখোনা দুখিনী, নয়নের নীরে
করিছে রোদন, তোমারি কারণ
ঘুমাও বিজয় ঘুমাও সুখে !
দেখোনা তোমারি তরে একজন

সারা নিশি দুখে করি জাগরণ—
বিছানার পাশে করিছে রোদন—
তুমি ঘুমাইছ—ঘুমাওধীরে!
দেখোনা বিজয়! জাগি সারা নিশি—
প্রাতে অন্ধকার যাইলে গো মিশি—
আবাসেতে ধীরে—যাইব গো ফিরে—
তিতিয়া বিষাদে নয়ন নীরে—
ঘুমাও বিজয়! ঘুমাও ধীরে!

বিমলা।

দশম পরিচ্ছেদ।

যোগেশ ব্যস্ত হইয়া বাটী আসিলেন, তথা আসিয়া খুল্লতাতকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন। বিমলার মাতাকে এত কথা জানাইবার ইচ্ছা ছিল না। তথাপি তিনিও সমস্তই জ্ঞাত হইলেন।

রুদ্রকান্ত কর্ত্তৃক এই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে শুনিয়া গঙ্গাগোবিন্দ অবাক হইলেন। নিসংশয়ে স্থির হইল, বিমলা অবন্তীপুরে নাই। তাঁহাকে রুদ্রকান্ত কোন স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। সে স্থান কোথায়, কেহ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। যোগেশ বলিলেন,—

"যখন অবন্তীপুরে বিমলা নাই, তখন ইহা একরূপ স্থির হইতেছে যে, যে কয় স্থানে বরদাকান্তের জমিদারী বা কুঠী আছে, তাহারই কোন না কোন স্থানে অবশ্যই বিমলা আছেন।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"অনুমান যথার্থ বটে, কিন্তু সে স্থান সকলের অনুসন্ধান করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে।"

যোগেশ বলিলেন,—

"এ বিপদের পরিমাণে সমস্তই সহজ।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—

"ভাল, সে সন্ধান পাইলেও বিমলাকে উদ্ধার করা সহজ হইবে না।"

যোগেশ বলিলেন,—

"আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি অদ্য রামনগরে গিয়া পুলিসে সমস্ত জনাইব। পুলিসের সাহায্যে সমস্তই সহজ হইবে।"

গঙ্গাগোবিন্দ অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"তবে আর বিলম্বে আবশ্যক নাই। তথায় নরেন্দ্রর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা উচিত তাহা করিও। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার বুদ্ধি এ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে না। দেখিও যেন নূতন বিপদ উপস্থিত না হয়। যে কার্য্য করিবে, বিশেষ

বিবেচনা করিয়া করিবে। দুর্জ্জনকে পরীহার, বিজ্ঞের পরামর্শ। তুমি ও দিকে যথাবিহিত যত্ন ও চেষ্টা কর ; আমিও একবার বরদাকান্তের নিকট যাইব। যদিও তিনি বিন্দু মাত্র সৎ-স্বভাবান্বিত নহেন, তথাপি তিনি প্রবীণ। আমি জানি, তিনি সমস্তই জানিয়াছেন এবং তিনিই পুত্রের সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার উৎসাহ দাতা—তথাপি একবার তাঁহাকে অনুরোধ করা ভাল।”

যোগেশ সোৎসাহে কহিলেন,—

“তবে আমি অদ্যই প্রস্থান করি।”

গঙ্গাগোবিন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

বেলা ৩।৷০ বা ৪ টার সময় পাল্কী বাহকাদি সমস্ত প্রস্তুত হইল। যোগেশ খুল্লতাত প্রভৃতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রামনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পরে বাহকেরা উভয় গ্রামের মধ্যবর্ত্তী এক প্রান্তর পার্শ্বস্থ বৃক্ষ মূলে পাল্কী নামাইয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন, বারি সেবন ও বিশ্রামার্থ অনতিদুরস্থ জলাশয় সমীপে গমন করিল। যোগেশ পাল্কী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মন উদাস—অস্থির, অনন্ত চিন্তা সমাচ্ছন্ন। কি করিতে কোথা যাইতেছেন, বা, কি করিলে কি হইবে, কিছুই যেন অবধারিত নাই। প্রান্তরের দিকে পশ্চাত করিয়া, পাল্কীর উপর ভর দিয়া যোগেশ অনন্ত শূন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন যেন, অনন্ত শূন্য সাগর মধ্যে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছে। একাকী—সঙ্গে আর কেহ নাই। এক সঙ্গে, এককালে, বহুবিধ ঘটনা হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিলে, মন বিচলিত, অস্থির, ও ধারণা শূন্য হইয়া পড়ে। একটী ঘটনার চিন্তা হইলে, ন্যায়ের নিয়মানুসারে, ধারাবাহিকরূপে ঘটনার পরিণাম চিন্তা করা যায়, কিন্তু বহু ঘটনা সমাগত হইলে কদাচ তদ্রূপ হয় না। তখন চিত্তের উপর আর আধিপত্য থাকে না, ভাবনার ক্রম বা ধারা থাকে না, আবশ্যক অনাবশ্যক জ্ঞান থাকে না। তখন চিত্ত যেন উদাসীন ভাবে অনন্ত নীল নভস্থলে কপোতিনীবৎ উড্ডীন হইতে থাকে, অনন্ত সাগর বক্ষে বায়ু বিতাড়িত তরণীর ন্যায় বিচলিত হইতে থাকে—উদ্দেশ্য শূন্য, লক্ষ্য শূন্য, বাসনা ও চেষ্টা শূন্য। যোগেশের চিত্তের অবস্থা অধুনা সেইরূপ! তিনি ঘোর চিন্তার সমাচ্ছন্ন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার এক্ষণেকোনই বিশেষ চিন্তা নাই। তাঁহার চিত্তের অবস্থা হৃদ্‌গত করিয়া দিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বন।

সহসা পশ্চাতের দিক হইতে এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি সমাগত হইল। যোগেশ তাহার আগমন জানিতে পারিলেন না। আগন্তুক নিকটস্থ হইয়া যোগেশের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা এক বিষম আঘাত করিল। অব্যর্থ আঘাতে যোগেশ সংজ্ঞা শূন্য হইয়া ভুমিতলে পড়িয়া গেলেন। মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ তাঁহার শরীরে প্রকাশ পাইল। হত্যাকারী যোগেশের মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া এক দৌড়ে পলায়ন করিল। যোগেশের সংজ্ঞা শূন্য দেহ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া রহিল। তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, বাহক প্রভৃতি কেহই এ বিপদের সংবাদ পাইল না।

কালের কুটিল নিয়মের কে অন্যথা করিবে? মনুষ্য! তুমি কিসের গর্ব্ব কর? ভাবিয়া দেখ, তোমার যাবতীয় গর্ব্বের মূলস্থান দেহ ও জীবন কি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তি! আশা চক্রে নির্বদ্ধ থাকিয়া মানব কি না করিতেছে? মানবের প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয় যেন মানব স্থির করিয়াছে, তাহার জীবন অবিনশ্বর, বা কল্পান্তস্থায়ী। কি ভ্রান্তি! প্রত্যেক কার্য্যে দেখিতেছি, জানিতেছি ও বুঝিতেছি যে, আমি যে কিছু লইয়া গর্ব্ব করি তাহার কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সকলই ক্ষণবিধ্বংসী। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, হৃদয় ক্ষণকালের নিমিত্তও এই সিদ্ধান্তকে স্থান দেয় না। এই আশ্চর্য্য, কৌশলময় মোহই মানবকুলের সাংসারিক কার্য্য সমস্তের নিয়ন্তা। এই মোহ না থাকিলে মানব-জীবনের, উৎসাহ, আনন্দ, আশা, সুখ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি সমস্তই বিদূরিত ও তিরোহিত হইয়া যাইত—সংসার বিসদৃশ স্থান হইয়া উঠিত—মানব জীবন নিরতিশয় ভারভূত হইয়া পড়িত। এই মোহ না থাকিলে, মানব আজি কি তুমি সংসারে থাকিতে পারিতে? এই মোহ না থাকিলে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তুমি কি স্বীয় অদৃষ্টের উন্নতি করিতে? এই মোহ না থাকিলে, রোগ, শোক, দুঃখরাশি পরিবৃত বিশ্বধামে তুমি কি ক্ষণকালের নিমিত্তও তিষ্ঠিতে? এই মোহ না থাকিলে, মানব তুমি অঙ্গুলি পরিমিত ভূমির জন্য প্রাণাধিক সহোদরের সহিত কদাচ অবক্তব্য কলহানল প্রজ্বলিত করিতে? এই মোহ না থাকিলে, তুমি দরিদ্র! নিত্য শাকান্ন সেবন করিয়া কদাচ কি অসন্তুষ্ট হইতে? এই মোহ না থাকিলে সংসারের সকল বন্ধনই নির্ম্মূল হইয়া যাইত। ফলতঃ, সংসার যেরূপ প্রণালীক্রমে সংঘটিত, মোহ তাহার প্রধান সূত্র।

যোগেশের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত রহিল। কোথায় বিমলা?

যে বিমলার জন্য যোগেশের এই বিপদ, সে বিমলা এক্ষণে কোথায়? কোথায় সংসার? কোথায় স্নেহময় খুল্লতাত? কোথায় পরম শত্রু রুদ্রকান্ত? মানবের এ বড় আশ্চর্য্য অবস্থা! এ অবস্থায় শত্রু মিত্র নাই, দ্বেষ হিংসা নাই, খলতা কপটতা নাই, প্রণয় অপ্রণয় নাই, মায়া মমতা নাই। সংসারের যাবতীয় স্পৃহা, আশা, ইচ্ছা এই অবস্থায় বিলীন হয়। মানবের এ অবস্থা নিতান্ত আশ্চর্য্য! যোগেশের মনে এখন আর কামিনীকুল-কুসুম বিমলার প্রণয় নাই, মানবকুল-কলঙ্ক রুদ্রকান্তের শত্রুতা নাই, সংসারের কোন প্রবৃত্তিই নাই!!! যোগেশের অচেতন দেহ ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত রহিল। তাঁহার বিপদের সময় কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না, কেহ দেখিল না। তাঁহার বিপদে কেহ আহা বলিল না, কেহ হায় হায় করিল না। দেহ-সমভাবে পড়িয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে বরদাকান্ত রায় তামাক খাইতে খাইতে স্বকীয় বারান্দায় পরিভ্রমণ করিতেছেন। বরদাকান্তের বয়স পঞ্চাশের উপর। মাথার চুলের অর্দ্ধাধিক পাকা। তাঁহার গোঁপ বড় জাঁকাল। পাকা গোঁপ কলপ প্রয়োগে কাল মিচমিচে। দেহের বর্ণ-শ্যাম। তনু লোমশ ও স্থূল। আকৃতি খর্ব্ব।

বরাদাকান্ত রায় তামাক খাইতেছেন। এমন সময় তথায় গঙ্গাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রায় মহাশয়ের মুখে সভতা ও সৌজন্যের ক্রুটী নাই। তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিবা মাত্র যথোচিত ভদ্রতা সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। উভয়ের শিষ্টাচার প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইলে নিপতিত কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। রায় মহাশয় কহিলেন,—

"মুখোপাধ্যায় মহাশয়! কি মনে করিয়া শুভাগমন।"

মুখোপাধ্যায় কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণেক চিন্তার পর কহিলেন,—

"বিশেষ মনে কিছুই নাই। আপনার সহিত সাক্ষাতাদি করাই উদ্দেশ্য। রুদ্রকান্ত বাবু আছেন ভাল?"

বরাদাকান্ত যেন কিছু বিষণ্ন স্বরে কহিলেন,—

"কাল ইংরাজি পড়ার দোষ বিস্তর।'

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"কেন, বলুন দেখি?"

বরদাকান্ত বলিলেন,—

"ও পাপ যেখানে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগ। মস্তিষ্কের ও চক্ষুর পীড়া হবেই হবে। একটী ছেলে। আগে না জানিয়া ইংরাজি অভ্যাস করিতে দিয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। এখন আর হাত নাই।"

গঙ্গাগোবিন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেন, রুদ্রকান্ত বাবুর মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিয়াছে নাকি?"

বরদাকান্ত উত্তরিলেন,—

"সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন। বাবাজি মাথা ও চক্ষু লইয়া সমস্ত দিন কাতর।"

গঙ্গাগোবিন্দ সমস্তই বুঝিলেন। বুঝিলেন, মস্তিষ্কের পীড়াটা কেবল নেশার ঘোর। চক্ষুর ব্যাধি কেবল চস্‌মা ব্যবহারের সখ্। সে কথা গোপন করিয়া কহিলেন,—

"তবে তো বড় দুঃখের বিষয়! একটী সন্তান, অতুল বিষয়। অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিয়া জীবিকা যাপন করিবেন। এ দৈব বিড়ম্বনা বড় যাতনা। সকলই বিধাতার ইচ্ছা।"

বরদাকান্ত পরমভক্তের ন্যায় কহিলেন,—

"ভগবান তুমি সকলই করিতে পার।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"বিশেষ যত্ন রাখিবেন।"

বরদাকান্ত কহিলেন,—

"যত্নের কোনই ক্রটী নাই।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—

"আপনার কুবেরের ভাণ্ডার। এক মাত্র সন্তানের ব্যাধি শান্তির নিমিত্ত আপনার দ্বারা যত্নের ক্রটী হওয়া কদাচ সম্ভব নহে। তবে এরূপ পীড়ায় অর্থব্যয় ছাড়া আরও কিছু সাবধানতা আবশ্যক।"

বরদাকান্ত ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি রকম?"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"যৌবনে মনুষ্য শরীরে কতকগুলি দোষ জন্মে। সেই দোষ গুলি যাহাতে কম হয় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।"

বরদাকান্ত দন্তে রসনা কটিয়া কহিলেন,—

"রাধামাধব। বাবাজিউর শরীরে কোনই দোষ নাই। তবে যদি কখন কিছু শুনিতে পান, সে অতি সামান্য। যৌবনে নিতান্ত সাধু ব্যক্তিরও তাহা থাকেই থাকে। সেজন্য পীড়ার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।"

গঙ্গাগোবিন্দ মনে মনে বলিলেন,—"তোমার সর্ব্বনাশ।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"এমন দোষও শুনা যায় যাহা কোন ক্রমেই সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।"

বরদাকান্ত কুপিত স্বরে বলিলেন,—

"বলেন কি মুখোপাধ্যায় মহাশয়? রুদ্র আমার সচ্চরিত্রের একশেষ। আপনি যদি তার বিরোধে কখন কিছু শুনে থাকেন, নিশ্চয় জান্‌বেন সেটা ভুল।"

গঙ্গাগোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—

"আমাদের বিমলার ব্যাপারটীও কি ভুল?"

বরদাকান্ত কিছু থতমত খাইয়া বলিলেন,—

"সেটা জনরব মাত্র।"

গঙ্গাগোবিন্দ উচ্চ হাস্য সহকারে বলিলেন,—

"রায় মহাশয়! কি কথা বলেন? অপনি পুত্রের দোষ সংশোধন করিতে আরম্ভ করুন। এ সকল বড় সর্ব্বনেশে কথা হইয়া উঠিতেছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—

"আপনি প্রবীণ হইয়া এ কথা বলেন এ বড় দুঃখের বিষয়। বালকের কথায় কি জনরবে বিশ্বাস করিবেন না। রুদ্র বড় সৎ। আমি বলিতেছি তাহার কোন দোষ নাই।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—

"চখে দেখা বিষয় যেমন কদাচ অবিশ্বাস করা যায় না, তেমনি এ ব্যাপারের এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, তাহা কদাচ অবিশ্বাস করা যেতে পারে না। আপনি হাজার বলুন তথাপি এ আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, রামকৃষ্ণ ও রুদ্রকান্তই এই ভয়ানক কাণ্ডের মূল।"

বরদাকান্ত একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"এ আপনার অন্যায় কথা। এমন বিশ্বাস হলে কি করা যেতে পারে?"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—

"কল্লা সবই যেতে পারে। আপনি একটু মনোযোগী হলে সকলই হয়। আপনার উৎসাহ না পাইলে, রুদ্রকান্তের কি সাধ্য এমন করে।"

বরদাকান্ত চটিয়া বলিলেন,—

"আপনি আমায় কি করিতে বলেন? বালক যদি একটা মন্দ কাজ করেই থাকে, তাই বলিয়া কি তাকে মেরে ফেলা বিধি?"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"পিতা মাতার চক্ষে সন্তান চির দিন বালক। আপনার বালক সংসারে যার পর নাই দৌরাত্ম্য করিবে, আপনি বালক বলিয়া সমস্তই উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু লোকে তাহা সহ্য করিবে কেন? অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। আপনাকে বলিয়া যদি তাহার উপায় না হয়, তাহা হইলে অগত্যা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।"

বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"আমার ছেলে যা খুসি করিয়াছে, তাহাতে লোকের যা ক্ষমতা থাকে করে যেন। কারো পাঁচীরে আমার এক চালা নয়। আমি কাকেও ভয় করি না।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"কারো পাঁচীরে আপনার এক চালা নয় সত্য এবং কাকেও আপনি ভয় করেন না তাও যথার্থ। কিন্তু রায় মহাশয়! অধর্ম্ম কার্য্য কদিন চাপা রাখিবেন? পাপের ফল ভুগিতেই হইবে। আমি আপনাকে বলিতেছি আপনি সাবধান হউন, পুত্রকে সাবধান করুন এবং বিমলা কোথায় আছে, বলিয়া দিউন।"

বরদাকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—

"আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন নাকি? সাহস তো মন্দ নয়।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন —

"সাহস অসাহসের কোন কথা নাই। আপনাকে ভয় দেখাতেও আমার আসা নয়। আপনি প্রবীণ। ভাবিয়াছিলাম আপনি এ সকল শুনিলে অবশ্যই কোন সদ্‌যুক্তি হইবে। বুঝিলাম, তাহা হইবে না। আমার অপরাধ কি? প্রকৃত কথা বলিয়া যাই। রুদ্রকান্ত কৃত যাবতীয় দুষ্কৃতি লোকে এতদিন সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এ কার্য্য কেহ সহ্য করিবে না। জানিবেন, এ জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইবে।"

বরদাকান্ত বলিলেন,—

"আপনি যান তার তদ্বির করুন গে। সাহসের কথাও মন্দ নয়।"

এই বলিয়া বরদাকান্ত রায় সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। দেহ কাঁপিতে লাগিল। আবার বলিলেন,—

"আস্পার্দ্ধা কম নয়। লোক সব বড় বাড়িয়ে তুলেছে। এর প্রতিবিধান না কল্লে নয়।"

সম্পত্তিশালী, দুর্দ্দান্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গেলেও সে ভাবিয়া থাকে যে, তাহাকে গালি দেওয়া হইল। যাহার মত ও অভিপ্রায় নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন ও পরিচালিত হইয়া থাকে, সে কখন ঘটনাক্রমে তাহার অভিপ্রায়ের অন্যথা বা প্রতিবাদ হইতে দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হয় ও মর্ম্মান্তিক যাতনা পায়। অভ্যাসের দোষেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই বরদাকান্ত মনে করিতে লাগিলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দ প্রতি বাক্যে তাঁহাকে অযথা অপমানিত করিলেন। এ সিদ্ধান্ত মনে হইয়া তাঁহার আরও যাতনা হইল। তিনি

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হউক এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে হইবে। দমন না করিলে স্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া উঠিবে।

গঙ্গাগোবিন্দ দেখিলেন, বরদাকান্ত নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত আর কথাবার্ত্তা হওয়া অসম্ভব। বলিলেন,—

"মহাশয় আমি এক্ষণে চলিলাম।"

বরদাকান্ত সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। গঙ্গাগোবিন্দ বিরক্ত, দুঃখিত ও বিমর্ষ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

যখন গঙ্গাগোবিন্দ বাটী ফিরিলেন তখন রাত্রি অনেক। তাঁহার মনের অবস্থা বড় ভয়ানক। কথঞ্চিৎরূপে আহারাদি শেষ করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ শয়ন করিলেন কিন্তু নিদ্রা আসিল না। কোথায় যোগেশ? কোথায় বিমলা? অত্যাচারী ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিয়ত অত্যাচার করিবে, তাহা অবাধে সহ্য করিতে হইবে, এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে বিষম হইয়া উঠিল। মনুষ্য মন স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয়। স্ব স্ব স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে মানব নিতান্ত ব্যাকুল। গঙ্গাগোবিন্দ বরদাকান্তের এবম্বিধ ন্যায়বিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ প্রভুতায় যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজি হউক, বা কালি হউক বরদাকান্তের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেই হইবে যেরূপে হউক, তাঁহার এ অন্যায় দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে। গঙ্গাগোবিন্দের মন এবম্বিধ চিন্তা পরম্পরায় অস্থির হইয়া উঠিল। নিদ্রা আসিল না।

রাত্রি অনেক হইল। তিন প্রহর অতীত। পৃথিবী নিস্তব্ধ, শান্ত ও স্থির। শন্ শন্ শব্দে নৈশ সমীর প্রধাবিত হইতেছে। চন্দ্র দেব মেঘ হইতে মেঘান্তরালে লুকাইতে লুকাইতে সত্বর স্বকার্য্য সাধন করিয়া পলায়ন করিতেছেন। আকাশ নির্ম্মল ও প্রশান্ত—যেন অনন্তলীলা সমুদ্র। আকাশ হাসিতেছে, তাহার তারা হাসিতেছে, তাহার চন্দ্র হাসিতেছে। এত হাসি কেন হাসে? পৃথিবীর রঙ্গ দেখিয়া তাহারা সকলে হাসিতেছে। ফলতঃ রাত্রিতে ধরণীর অনেক রঙ্গ। দিনে মানবগণ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত হয়, সংসার মহা কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকে সত্য কিন্তু তখন এত রঙ্গ থাকে না। আকাশ চন্দ্র, তারা রজনীর রঙ্গের চিরন্তন স্বাক্ষী, সেই জন্য তাহাদের এত হাসি। হাসুক—হাসিতে, উপহাসে বা বিদ্রূপে এ রঙ্গ কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, শান্ত ও স্থির।

সহসা একি বিপদ? গঙ্গাগোবিন্দের গোশালা, রন্ধনশালা, নিবাসগৃহ সমস্ত এককালে ধূ ধূ শব্দে

জ্বলিয়া উঠিল। এ রাত্রে কে এ বিপদ ঘটাইল! রমণীগণের ভয় বিকলিত আর্ত্তনাদ ও কোলাহল উঠিল। গাভীগণ বিপদ ব্যঞ্জক স্বরে শব্দ করিতে লাগিল। সন্নিহিত বৃক্ষসমূহস্থিত পক্ষিগণ ঘোর চীৎকার করিয়া উঠিল। কুকুর সকল প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি গঙ্গাগোবিন্দ জল জল শব্দে চীৎকার ও পরকীয় সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিস্তৃত অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতে লাগিল। এক এক জন করিয়া কয়েক জন প্রতিবেশী সমবেত হইল। কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে গঙ্গাগোবিন্দের ভবন বহ্নিচর্ব্বিত ভস্মাবশেষ হইয়া ভূমিতলে মিশাইয়া গেল! আলয় স্থিত জীববৃন্দের দশা কি হইল? যেরূপ ভাবে অগ্নি লাগিয়াছিল, তাহাতে তন্মধ্য হইতে কাহার নিষ্কৃতি লাভ করা অসম্ভব। ভবনস্থিত মানবগণ কি ভস্মস্তূপে মিশাইয়া গেলেন? অদৃষ্টের ফল কাহার সাধ্য বিপর্য্যয় করে?

অকারণ প্রতিহিংসার গতি এতদপেক্ষা অধিক হয় না। প্রভুতা ও ক্ষমতা বলে মানুষ এত অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। যে বিধাতা তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমাদ্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই সেই উপাদানে এই জঘন্য জীবগণের হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য। বরদাকান্ত ও তাঁহার পুত্রের অন্যায় অত্যাচারে একটী নিরীহ ভদ্র পরিবার এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পাপের কি শাস্তি নাই? দৌরাত্ম্যের কি প্রতিফল নাই?

জ্ঞাতব্য চিকিৎসা।

ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবর বা পালা জ্বর।

এই জ্বর প্রকাশ হইবার ৫।৭।১০ দিবস পুর্ব্বে প্রথম গাত্র অপ্পোস্ফ এবং পৃষ্ঠদেশের ও হস্ত পদাদির পেশীতে বেদনা হয়, অল্প অল্প শীতানুভব হয়, ভাল ক্ষুধা হয় না, গা বমি বমি করে। উক্ত লক্ষণগুলি এত মৃদু ভাবে প্রকাশ পায় যে, তাহা অনেকেই অনুভব করিতে পারে না। যদি উক্ত লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাওয়ার দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জ্বর প্রকাশ পায়, তবে সে জ্বরে রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায়, প্রশ্রাব পা-

শ্যাশে বর্ণ হয়, ও রোগ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে।

এ জ্বর প্রথমে শীতলাবস্থা, পরে উষ্ণাবস্থা তৎপরে ঘর্ম্মাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, বিরাম অবস্থা প্রকাশ পায়। এই জ্বর তিন শ্রেণিতে বিভক্ত; (১ম) কোটীডিয়েন বা ঐকাহিক,—এই জ্বর প্রত্যহ প্রাতেঃ আক্রমণ করে। (২য়) টার্শিয়েন বা দ্বৈহিক,—এই জ্বর এক দিন অন্তর দুই প্রহর বেলার সময় আক্রমণ করে। (৩য়) কোয়ার্ট্যান বা ত্রৈহিক,—এই জ্বর দুই দিবস অন্তর হয় এবং ইহার আক্রমণ প্রায় দিবার শেষভাগে। ইহা ভিন্ন আরও চারি প্রকার সবিচ্ছেদ জ্বর হইয়া থাকে।

(১ম) ডবল টার্শিয়েন,—এই জ্বর ঐকাহিক জ্বরের ন্যায় প্রত্যহ আইসে কিন্তু এক দিবস নরম থাকে, এক দিবস ভারি বৃদ্ধি হয়। (২য়) ট্রিপল টার্শিয়েন—এই জ্বর, এক দিন দিবসে দুইবার প্রকাশ পায় এবং এক দিন একবার প্র কাশ পায়। (৩য়) ডিউপ্লিকেটেড টার্শিয়েন—এই জ্বর এক দিন দিবসে দুইবার প্রকাশ পায় ও এক দিন বিরাম থাকে। (৪র্থ) ডবল কোয়ার্ট্যান—এই জ্বর প্রথম দিন প্রবল হইয়া আক্রমণ করে, দ্বিতীয় দিন কিছু কম হয়, তৃতীয় দিবস বিরাম থাকে। ঐকাহিক জ্বর, ৪ ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। দ্বৈহিক জ্বর, ৬ ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। এবং ত্রৈহিক জ্বর ৪ হইতে ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। পালা জ্বরের ১০।১৫ মিনিট হইতে ৫।৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শীতলাবস্থার সময়। অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে ২২। ২৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উষ্ণাবস্থা থাকিতে পারে। অবশেষে ঘর্ম্মাবস্থা অল্পক্ষণ থাকিয়া বিরামাবস্থা প্রকাশ পায়। ঐকাহিক জ্বরের শীতলাবস্থা অল্পকাল স্থায়ী কিন্তু উষ্ণ অবস্থা অধিকক্ষণ থাকে। দ্বৈহিক জ্বরের শীতলাবস্থা অধিককাল স্থায়ী উষ্ণাবস্থা অল্পকাল স্থায়ী। ত্রৈহিক জ্বরের শীতলাবস্থা অধিক সময়, উষ্ণ অবস্থা অতি অল্পকাল। এই জ্বর শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হৃত-পি-ণ্ডের কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন না হইলে, আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তাধিক্য হয়, নিদ্রা কর্ষণ হয়, কর্ণে ঝন্ ঝন্ শব্দ অনুভূত হয়, ফুস ফুসে, হৃৎপিণ্ডে, ও রক্তবহা নাড়ীতে রক্তাধিক্য হয়, বক্ষস্থল ভার বোধ হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভূত হয়, নাড়ী ক্ষীণ ও শীতল হয়। পাকস্থলি যকৃত এবং অন্ত্রে হইলে বমন বা বমনেচ্ছা হয়, এবং রক্তাধিক্য ঈষৎ ময়লা বর্ণ পাতলা মল নির্গত হয়, হস্ত পদাদিতে প্রথমে শীতানুভব হয়, ক্রমে পৃষ্ঠদেশে, তৎপরে সর্ব্বশরীরে শীত হয়, ত্বক আকুঞ্চিত হয়, নখ ওষ্ঠ ও নাসাগ্র নীল বর্ণ হয়, ক্রমে কম্প

উপস্থিত হইয়া শরীর মলিন, ত্বক শুষ্ক এবং রুক্ষ্ম হয়, ক্রমে শীত বৃদ্ধি হইয়া দাঁত কপটী লাগে এবং শরীর কাঁপিতে থাকে,বক্ষঃস্থল ভার বোধ হয়,মাথা দপ দপ করে, ও বেদনা হয়, কখন বমনেচ্ছা বা কখন বমন হয়, অত্যন্ত পিপাসা হয়, এবং কখন কখন মূত্রপিণ্ডের উত্তেজন প্রযুক্ত রোগী অম্লযুক্ত বিবর্ণ মূত্র পরিত্যাগ করে, উষ্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কম্পের সহিত গাত্র অল্প অল্প উষ্ণ হয়, ক্রমে সর্ব্ব শরীর উষ্ণ হইয়া গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারা যায় না, নাড়ী স্থূল ও বেগবতী হয়, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহে, কখন কখন বমন বা বমনেচ্ছা হয় ও অত্যন্ত শিরঃপীড়া ও পিপাসা হয়, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও লেপযুক্ত হয়, সিক্রিসন বা প্রস্রাবণের অল্পতা হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে রোগীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হয়, পরে সর্ব্ব শরীর ঘামিয়া গাত্র ভিজিয়া যায়। (সে ঘামটী পুচিয়া ফেলা কর্ত্তব্য) ক্রমে গাত্র শীতল হইয়া নাড়ী সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট থাকে না, শরীর সুস্থাবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু ঘর্ম্মাবস্থায় কাহার কাহার নাড়ী ছিন্ন হইয়া হঠাৎ সাংঘাতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কখন কখন বা হৃতপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হয়। এই জ্বর অধিক দিন ভোগ করিতে করিতে প্লীহা যকৃত বৃদ্ধি পাইয়া রোগ ক্রমে জটিল হইয়া উঠে।

কারণ।

ম্যালেরিয়া বায়ুই এই জ্বরের উদ্দীপক কারণ।

ভাবী ফল।

প্রথম হইতে নিয়মিতরূপে চিকিৎসা হইলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

চিকিৎসা।

যদি জিহ্বা লেপযুক্ত ও অপরিষ্কার হয় এবং পাকস্থলীতে অজীর্ণ আছে অনুভব হয়, অথচ রক্ত সঞ্চালনের গতি মন্দ বা রক্তের হীনাবস্থা না থাকে এবং পাকাশয় ও অন্ত্রমধ্যে প্রদাহ না থাকে, তবে টার্টর এমেটিক, ॥০ গ্রেণ বা ইপিকাক্ ১০। ১৫ গ্রেণ, অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। (ইহাতে যে মাত্রা লেখা হইল, তাহা পূর্ণবয়স্কের প্রতি) যদি কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, কেষ্টর অইল্ বা শোনাসাল্ট দিয়া উদর পরিষ্কার করাইবে। যদি ম্যালেরিয়া-জনিত জ্বরে শরীর দুর্ব্বল অনুভব হয়, তবে দাস্ত করান বিবেচনাধীন। প্রস্রাব যদি রক্ত বর্ণ ও অল্প হয় এবং প্রস্রাব করিতে কষ্ট অনুভব হয়, তবে—

বাই কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা,১ ড্রাম
লডেনম......॥০ ড্রাম

পরিশ্রুত জল......৬ আউন্স

অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে, তিন ঘণ্টা অন্তর ক্রিয়া বিবেচনা করিয়া সেবন করিতে দিবে। কোন কোন মহাত্মার মতে শীতলবাস্থায় লডেনম্ একেবারে ॥০ ড্রাম প্রয়োগ করিতে পারা যায়, কিন্তু এ অবস্থায় সহসা কোন ঔষধ ব্যবহার না করা ভাল। পুরু বস্ত্রের দ্বারায় সর্ব্বদা রোগীর গাত্র ঢাকিয়া রাখিবে, এবং চার জল সেবন করিতে দিবে। কখন কখন বা গাত্রে উত্তাপ দিবে। অর্থাৎ বালুকা স্বেদ, অথবা বোতলের মধ্যে উষ্ণ জল পুরিয়া, সর্ব্বশরীরে বুলাইবে এবং উষ্ণকর ঔষধও আবশ্যক মত প্রয়োগ করিবে। উষ্ণ অবস্থা প্রকাশ হইলে, পিপাসা আদি নিবৃত্তির জন্য মিছরির জলে লেবুর রস দিয়া সেবন করিতে দিবে। মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ ও বেদনা হইলে মস্তকে জলের পটি কিম্বা বরফ প্রদান করিবে এবং,—

ভাইনম্ ইপিক্যাক্......১ ড্রাম
ইথর নাট্রিক্.........১ ড্রাম
পটাশি সাইট্রস......২ ড্রাম
কর্পূর বাসিত জল...৬ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া ॥০ছটাক পরিমাণে ৩ তিন ঘণ্টা অন্তর দিবে, অথবা—

লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস,...............২ ড্রাম
পটাশি নাইট্রাস......১ ড্রাম
মৌরির জল...........৮ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে৩ ঘণ্টান্তর সেবন করিতে দিবে। কিন্তু ঔষধ সেবন করিতে করিতে যদি রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ সে ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া উষ্ণকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং রোগীকে সাবধানে রাখিবে। ঘর্ম্মাবস্থা আরম্ভ হইলে রোগীর গাত্র হইতে বস্ত্র উঠাইয়া না লওয়া হয়, কারণ হঠাৎ বাষ্প নির্গমন হইয়া গাত্র অত্যন্ত শীতল হইতে পারে কিন্তু উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা, গাত্র আবৃত করিয়া রাখিবে না; কারণ তাহাতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া রোগী অত্যন্ত কাহিল হইতে পারে। জ্বরের বিরাম অবস্থায়—

কুইনাইন.........গ্রেণ ২৪
সাল্ফিউরিক এসিড্ ডিল্স্ ১....ড্রাম
পরিশ্রুতজল......আউন্স ৬

মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধছটাক পরিমাণে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। কোন কোন মহাত্মা ১২ হইতে ৩০ গ্রেণ অথবা তাহা হইতে অধিক মাত্রায় কুইনাইন এই সময়ে প্রয়োগ করিতে বিধি দেন কিন্তু অধিক কুইনাইন ব্যবহারে অধিক বিপরীত হইতে দেখা যায়। ৩।৪ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন ২।৩ ঘণ্টান্তর সেবন করিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। কুইনাইন সেব-

নান্তে রোগীকে উত্তমরূপে সুস্থির রাখি-বে, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করি-তে দিবে না। জ্বর ত্যাগ হওয়ার পর ৫। ৭। ১০ দিন পর্য্যন্ত কুইনাইন অল্প পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। এজন্য

কুইনাইন......১২ গ্রেণ,
রুবার্ব চূর্ণ.........১২ গ্রেণ
শুঁট চূর্ণ............১২ গ্রেণ

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩গ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিন বার সেবন করিতে দিবে।

যদি প্লীহা বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় তবে,—

কুইনাইন...............১২ গ্রেণ,
সালফিউরিক এসিড ডিল্ ১ ড্রাম
হিরাকস...............১২ গ্রেণ
কলম্বার জল...........৩ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিন বার সেবন করিতে দিবে।

কেহ২ এই জ্বরে আর্শেনিক, ষ্ট্রিকনিয়া প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা অধিক। এই জ্বরে

নিমের ছালের গুড়া...১০ রতি
নাটার ফলের গুড়া...৮ রতি
চিরেতার গুড়া......২০ রতি

মিশ্রিত করিয়া ৬ আউন্স পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অথবা চাঁপা ফুলের ছাল ।।০ ছটাক, জল ১।। পোয়া সিদ্ধ করিয়া ৩ ছটাক থাকিতে নামাইয়া, নিমের পাল ২৪ রতি মিশাইয়া, ।।০ ছটাক পরিমাণে দিবসে দুইবার সেবন করিতে দিবে।

পথ্য।

সাগু, এরারুট, বেদানা, কিচমিচ, একবল্কা অল্পোষ্ণ দুগ্ধ, মাংসর যুষ, পোর্ট প্রভৃতি লঘু বলকারক বিধেয়।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

মণিহারা ফণী ভারত-জননী। পদ্য। শ্রীপার্ব্বতী নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে শ্রীনবীন চন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮৩। মূল্য /০ এক আনা।

যুবরাজ ভারতে আসিলেন, তাহার নানা প্রদেশে পরিভ্রমণ করিলেন, অধীন ভূপবর্গকে করমর্দ্দনে আপ্যায়িত করিলেন, ভারতের অর্থরাশি ভস্মীভূত হইতে দেখিলেন এবং ভারতবাসীর ভক্তির চিহ্ন সমস্ত স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া, নিরাপদে স্বদেশে বসিয়া স্ত্রী পুত্র সমীপে তাহার গল্প করিতে লাগিলেন। সকলই শেষ হইয়া গেল। সকলই মিটিয়া গেল। কলিকাতা নগরীর আলোক-সজ্জার চিহ্ন সমস্ত উত্তোলিত হইল, পথ-মধ্যস্থ যুবরাজের পট ও চিহ্ন সমস্ত বিদূরিত

হইল, বেলগেচিয়ার আটচালা নিপাতিত হইল, হগ সাহেব ও দিগম্বর মিত্রের উপাধি পুরাণ হইয়া গেল, ক্রমে যুবরাজের আগমন বার্ত্তা কিম্বদন্তী স্বরূপ হইয়া উঠিল, সে কথা সকলের রসনা ত্যাগ করিল। কিন্তু বাঙ্গালীর লেখনী তো আজিও থামিল না! এত কাল পরে বাবু পার্ব্বতী নাথ চট্টোপাধ্যায় মণিহারাফণী ভারতজননী লইয়া উপস্থিত। পার্ব্বতী বাবুর বিজ্ঞাপন দেখিয়া বুঝা যায় যে, অসঙ্গতি হেতু তিনি ইহা যথাসময়ে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। অধুনা দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর সাহায্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, এ সময়ে উহা প্রকাশিত না হইলে ভাল হইত। ওরূপ পুস্তকে যে সকল কথা ও যে সকল ভাব বর্ণিত থাকে, তাহা সমুচিত সময়েই কার্য্যকরী ও হৃদয়গ্রাহী হয়। 'নীলদর্পণ' নাটক যদি এখন প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে তাহা এরূপ সমাদর ও প্রতিষ্ঠা পাইত কি না সন্দেহ। 'ভারত-ভিক্ষা' যদি অদ্য প্রকাশিত হইত,তাহা হইলে তাহা কখনই এত হৃদয়গ্রাহী হইত না। এবম্বিধ পুস্তক সমস্ত সময় সাপেক্ষ। পার্ব্বতী বাবু এখন আর ইহা প্রকাশ করিয়া বুদ্ধির কার্য্য করেন নাই।

যাহাই হউক পদ্যটী মন্দ হয় নাই। অধিকাংশ স্থলেই হৃদয়গ্রাহী ও উত্তেজক হইয়াছে। নানা স্থানে ভাষার দোষ ও মিলের দোষ লক্ষিত হইল। গ্রন্থকার ভবিষ্যতে পদ্য লিখিবার সময় উক্ত দোষ সমস্ত পরিহারের চেষ্টা করিবেন। গ্রন্থের কথা সমস্ত অধিকাংশই পুরাতন।

ভারত-বন্দিনী। (রূপক) শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুহ ঠাকুরতার অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রী দ্বারকা নাথ বসু প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮২। ২৫ শে চৈত্র। মূল্য ৶০ আনা।

যবন ও ভারত আমাদের জ্বালাতন করিয়া তুলিল। আজি কালি যবন বিদ্বেষ-বিধায়ক গ্রন্থ অধিক পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে। এ যবন কাহারা? এবম্বিধ গ্রন্থ সমস্ত পাঠ করিয়া বোধ হয়, মুসলমানগণই যবন শব্দের লক্ষ্য। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে এ অসময়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যবন বিদ্বেষ সমুৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে কেন? যবনদিগের অত্যাচার সমস্ত স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হওয়াই ভাল; সেই অত্যাচার সমস্ত বর্ণনা করিয়া কাব্য লেখার প্রয়োজন নাই। যবন ভারতে আধিপত্য ও অত্যাচার করিয়াছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে যবন ভারত ভূমি

ত্যাগ করিয়াছে। এখন বিদ্বেষ জন্মাইয়া অনর্থক নিরীহ টিকেওয়ালা, দরজি ও বাবরচিগণের সহিত বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন কি ? আমরা বলি বঙ্গীয় নবীন কবিগণ 'যবন ভারত' ত্যাগ করিয়া অন্য দিকে মস্তিষ্ক চালনা করুন।

'ভারত বন্দিনী'ও 'যবন ভারত'। কিন্তু এ গ্রন্থখানি অনেক ভাল। ইহার বীররস সমস্ত দয়গ্রাহী ও উদ্দীপক। শেষ দৃশ্যে বীরশিশু ভারত ভূমির দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া উন্মত্তাবস্থায় সমরে যাইতেছেন, এমন সময় ধৈর্য্য ও ক্ষমা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতেছে। এ বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে স্থানে স্থানে পদ্য আছে। পদ্যগুলি অধিকাংশই প্রীতিপ্রদ। আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ এক স্থান হইতে একটী পদ্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পদ্যটী একটু দীর্ঘ হইল।

"জাগরে জাগরে জাগ জাগরে ভারত!
নিদ্রা কিরে সাজে আর, দেখনাকি দশা মার—
করেছে দুরন্ত রিপু (কিরূপ হালত) (?)
উঠি
একবার বীরদর্পে জাগরে ভারত!

২

সেই ধনু সেই ছিলা যা ছিল তখন,
রয়েছে অসংখ্য বাঁশ, রমণীর কেশ পাশ
ভারত সন্তান কেন নিদ্রায় গমন ?
জাগ
কাজনাই দেখে আর সুখের স্বপন।

মাতার রোদন অই প্রবেশিছে কানে!
হৃদয় ফাটিয়া যায়, প্রাণ বাহিরিতে চায়
এঘোর যাতনা আর সহেনারে প্রাণে,
আহা!
কেচায় রাখিতে প্রাণ হীন হয়ে মানে?
অপমানে বেঁধেছি কি আমাদের হিয়া ?
জননী যবন দাসী, কিসুখে আমরা ভাসি
কোন্‌মুখে হাঁসি লোকে মুখ দেখাইয়া ?
ঘৃণিত যবন পদ মস্তকে ধরিয়া ?

এদশায় কে রাখিতে চায়রে জীবন ?
"কলঙ্কের চন্দ্রহার" "অধীনতা কণ্ঠহার"
"দাসত্ব শৃঙ্খল" কিরে হিন্দুর ভূষণ ?
শেষে
ভারতীর ভাগ্যে ছিল এই আভরণ ?

"দাসত্ব" ! ঘৃণিত! উঃ! কি অসহ্য বচন!
শেল সম বিধেঁ গায়, আর কিরে সহা যায়
কতকাল সহিবিরে দাসত্ব বন্ধন ?
থাকি
শত্রুর পাদুকা করি মস্তকে ধারণ ?

৭

সেই হিন্দুজাতি মোরা সমরে অমর,
"সিন্ধু" পার হয়ে আসি, মোদের সমরে নাশি
অন্যজাতি আমাদের কেন অধীশ্বর ?
কেন
যবনের দাস হবে আর্য্য বংশধর ?

৮

এ ভারত ভূমি কিরে আমাদের নয় ?
কেরে ওরা দলে দলে, সদর্পে সগর্ব্বে
চলে ?
আমরা পলাই কেন পশ্চাতে সভয় ?
রক্তযুক্ত শরীরে কি এ যাতনা সয় ?

৯

আমাদের জন্মভূমি, আমাদের দেশ,
কিপাপে আমরা পাপী, যবন দেখিলে
কাঁপি ?
কত আর সহ্য যায় এ অসহ্য ক্লেশ ?
তবে
ঘুচারে শত্রুর রক্তে যন্ত্রনা অশেষ।

১০

শূন্যহস্তে আজি মোরা ভারত নন্দন
মিলি বিশকোটী ভাই, যদি রণ স্থলে
যাই
কিসাধ্য, কাহার শক্তি করিতে বারণ ?
ভারতে যবন সৈন্য আছে কয় জন ?

১১

সবে মিলে কোন্ কার্য্য না হয় সাধন ?
নখে বারিতুলি যদি, ক্ষণে হয় শুষ্ক নদী
একটী করিয়া পত্র করিলে গ্রহণ
নিষ্পত্র করিতে পারি মুহূর্ত্তে কানন।

১২

শুভকার্য্যে তবে কেন বিলম্ব রে আর ?
রক্ত মাংস শক্তিযুত, মায়ের অসংখ্য সুত
তিলেকে করিতে পারে ভারত উদ্ধার
তবে
ছাড়্রে ঘোর ঘর্ঘরে কোদণ্ড টঙ্কার
অবশ্য মরিতে হবে, জান সবে, কেন
তবে;—
এখন শরীরে আছে রক্তের সঞ্চার
হবেনা হবেনা কিন্তু এর পরে আর।

১৪

হাটে ঘাটে মাঠে গাও স্বাধীন সঙ্গীত
করে অসি নাচ রঙ্গে, মাতি সমর প্রসঙ্গে
ধর অসি কর কার্য্য ক্ষত্রিয় উচিত
বহুক জাহ্নবী সত্তী শত্রুর শোণিত।

১৫

যাতনায় ভারতীর ব্যাকুল অন্তর
ও বরাঙ্গ ভূমিসাৎ, যবনের পদাঘাৎ
মুহুর্মুহু পড়িছেরে তাহার উপর !
আহা !
কনক কমল কান্তি ধূলায় ধূসর।

১৬

জাগরে জাগরে যদি হিন্দু থাক কেহ
করে অসি নাচ রঙ্গে, মাতি সমর প্রসঙ্গে
মনে করি একবার জননীর স্নেহ
কেনা চায় ত্যজিবারে অনিত্য এ দেহ ?

১৭

জাগরে জাগরে জাগ হিন্দুসুত চয় !
করেতে ধরি কৃপাণ, শত্রুরক্তে কর স্নান ?
জননীর রক্ষা হেতু মরিতে কি ভয় ?
জাননা, জীবন কিছু চিরস্থায়ী নয় ?

১৮

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাঁরা খ্যাত ত্রিসংসার
নরকুল অবতংশ, তোরা যে তাঁদের বংশ
কেমনে সরমে মুখে বলিবিরে আর ?
উঠি
বীরদর্পে একবার খোল্ তরবার।

১৯

ক্ষত্র গর্ব্ব ক্ষত্র তেজে করি সংমিলন
ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ি, রোষে সুমেরু উপাড়ি

শেষ রজ্জু করি কর্ সমুদ্র মন্থন
দেখ্রে কোথায় আছে স্বাধীনতা ধন?

২০

কাঁপুক কৈলাস ধমে শঙ্কর শঙ্করী
ভয়ে পরমাদ গনি, গর্জ্জুক অনন্ত ফনি
কাঁপুকরে শক্রদল রাজ্য পরিহরি

২১

এত ডাকি তবু কিরে নিদ্রা ভাঙ্গিলনা?
খেয়েছ পরেছ যার, দেখনা কি দশা
তাঁর?
তোমারা থাকিতে মার এহেন যাতনা?
তবে
কিহেতু জননী করে সন্তান কামনা?

২২

জাগরে জাগরে আর্য্য বংশের কুমার!
পিতৃ সিংহাসন 'পরে যবন রাজত্ব করে
থাকিতে তোদের দেহে রক্তের সঞ্চার।
কেনরে বিলম্ব আর সংহার সংহার!

নিসর্গসুন্দরী। শ্রীশারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ঢাকা গিরিশ যন্ত্র। শ্রীসেখ মুন্সি মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৮৭৬। ১৫ই মার্চ্চ, মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

পূর্ব্ববঙ্গ আজি কালি সকল বিষয়েই উন্নতি দেখাইতেছে। বিদ্যা, সভতা, স্বদেশানুরাগ, উদারতা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই আমাদের পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া উঠিতেছেন। ঢাকা,ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা আজি কালি অনেক ভাল ভাল পুস্তকাদি উপহার পাইতেছি। তৎসমস্তের অধিকাংশই সুপাঠ্য। "নিসর্গ সুন্দরী" পূর্ব্ববঙ্গের উর্ব্বর হৃদয়ের ফল। এখানি উচ্চ শ্রেণীর কাব্য না হইলেও সুপাঠ্য ও মনোরম তাহার সন্দেহ নাই। আমরা ইহা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পাঠকগণের পরিদর্শনার্থ আমরা ইহার একটী পদ্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, পদ্যটী আমরা বিশেষ নির্ব্বাচন করিয়া উদ্ধৃত করি নাই।

ক্ষত্রিয় যুবা ও ক্ষত্রিয় রাজলক্ষ্মী।

কে তুমি জলধি-তলে বসি একাকিনী,
অয়ি শুভে, ত্রিভুবন-মোহনকারিণী!
অনাথার সম আহা বাম করতলে,
অর্পিয়া মলিনকান্তি কপোল মণ্ডলে?
কেন বা জলদরূপে উদিয়া বিষাদে,
আবরিল আহা মরি, হেন মুখ-চাঁদে?
কি চিন্তা সহসা পশি হৃদয় সদনে,
হরিল অমূল তব সুখের রতনে?
অশোক-কাননতলে বিনা রঘুপতি,
রঘুকুল-কমলিনী যেন সীতা সতী।
তবু আলো করে রূপে কৃশাঙ্গী অবলা,
জলদের আড়ে আহা হেম শশি-কলা,
কিরূপের ছটা! অঙ্গে নাহি আভরণ
যেন হৈমলতা বিনা কুসুম-রতন;
হেরি তোমা দুঃখে মোর বিদরে হৃদয়,
এরূপের হেন দশা এহেন সময়?
করিলা কি কেহ গুরু-অবজ্ঞা তোমায়;
কুমুদিনী হৃদি খর কর পাত প্রায়?
অথবা বিধাতা বুঝি বাম তব প্রতি,
হারায়েছে হেথা বুঝি প্রাণপ্রিয় পতি?
অগাধ সাগর-গর্ভে তাই কি বসিয়া,
তাই কি নয়ন জলে ভাসিতেছে হিয়া?
বল শুভে! সবিশেষ, কাহার হৃদয়-দেশ,

অমুল মণির রূপে, করিতে শোভিত,
যে মণি এ খনি মাঝে এবে বিলুণ্ঠিত ?
দারুণ হৃদয়-দুঃখ-দহন-তাপিত
নিশ্বাস পবন-ভরে-করি বিকম্পিত,
অধর-পল্লবে, বামা মধুময় রবে,
(ভ্রমর-গুঞ্জন-ভ্রম যা শুনি সম্ভবে ।
কহিলা সদয়ে. সৌম্য ! এই ধরাতলে,
হেন অভাগিনী আর নাহি কোন স্থলে ।
হৃদয়-কবাট খুলি দুঃখের আঁধারে ।
কি ফল হইবে বল; আবরি সবারে ?
স্মরিলে সুখের দশা আহা উজ্বলিত,
দুঃখের তিমির ঘোর হয় দ্বিগুণিত ।
তথাপি বাসনা তব পূরিব, কি শ্রম ?
হইলে কাহারও সুখ, সেই সুখ মম ।
এই যে ভারত-ভূমি, হেম-প্রসবিনী,
অমল সুনীল-সিন্ধু দুকূল-ধারিণী ;
এই স্থানে অত্যুত্তম সিংহাসনোপরি,
বসি রাজরাজরূপে বিক্রমে কেশরী,
শাসিয়া ইহারে যাঁরা সুচির বিক্রমে,
কালের করাল গ্রাসে গেলা ক্রমে ক্রমে ;
তাঁহাদেরই রাজলক্ষ্মী আমি অভাগিনী,
তাঁদেরই বিরহ-বহ্নি-প্রদাহ ভাগিনী ।
অনার্য্য কতেক জাতি সেই সিংহাসনে,
বসিল, হেরিনু হায়, এপোড়া নয়নে :
অধীনতা নিগড়িত হেরি আর্য্যগণ,
অদ্যাপি রয়েছে দেহে কঠোর জীবন ;
জীবিত থাকিতে মোর মৃত প্রায় পতি,
নিবারিবে কেবা বল, এমোর দুর্গতি ?
হরের চরণতলে, বিরাজে যে ফুলদলে,
পূজা-অবসানে বল, কে তারে আদরে ?
অনায়াসে ফেলে যথা সলিল-উপরে ;
তেমতি এ অভাগিনী, পতিপদ-বিয়োগিনী
ভাসিছে অপার এবে দুঃখের সাগরে ।
কার না ললাটে ক্রূর নিয়তি বিহরে ?
সরোষ বিস্ময়ভরে অধীর অন্তরে,
কহিনু—অপূর্ব্বকথা শ্রবণ কুহরে
প্রবেশিল আজি মোর ; নারি বিশ্বসিতে,
একাহিনী নাহি পায় স্থান মম চিতে।
জনমি সহস্র রশ্মিকুলে সমুজ্বল
করিলা যে মহাবীর, অজেয়, অটল ;
অদ্যাপি ভীষণরূপে গাইছে উদধি,
কল্লোল নিনাদে যার যশঃ নিরবধি,
অদ্যাপি গগণতল ছায়াপথচ্ছলে,
সেতুবন্ধ গাম্য যার ধরে কুতূহলে ;
যশের ধবল ছত্র রাজচ্ছত্রসম,
বিরাজিত যাঁর ; মত্তমাতঙ্গ বিক্রম-
দশকণ্ঠ কণ্ঠীরব * সেই রঘুমণি,
ভার্গবের গুরু গর্ব্ব-পর্ব্বত-অশণি,
তাঁরই বংশধর, ধরা-অধীশ মণ্ডলে
ক্ষত্রিয় অখ্যায় যাঁর, খ্যাত পৃথীতলে
ঈদৃশ দুর্দ্দশা রাহু-কবলিত কায় !
নির্ব্বীর্য্য এমতি স্থূল জড়পিণ্ড-প্রায় ?
তাঁহাদেরই রাজলক্ষ্মী, যশঃ প্রসবিনী
এহেন দশায় ? একি বিচিত্র কাহিনী !
অথবা সংশয়, তব কথায় কি আর ?
হেরিনু স্বচক্ষে হীন অবস্থা তোমার ;
অর্পিব তোমায় আজি নৃপতি চরণে,
নারি হেন হীন দশা হেরিতে নয়নে ।
শুনি মোর বাণী, বামা কহিলা চকিতে—
এমতি প্রবল আশা মানবের চিতে !
না বিচারি নিজ দশা ; বর্ত্তমান কাল,
ভাবী সুখ আশে মত্ত, একি ইন্দ্রজাল !
জাগ্রতে নিদ্রিত সম দেখি তোমা সবে,
কাল বশে আরও কত নিহারিতে হবে !
চরণের পানে করি আঁখি সঞ্চালন,
অধীনতা-শৃঙ্খলার হেরহ বন্ধন ।
হইলে শশাঙ্ক মুক্ত জলদ-নিকরে,
কে বল লক্ষ্মীরে অর্পি আসে তাঁর করে ?
হউন নৃপতি মুক্ত দারুণ বন্ধনে,
আপনি যাইব তবে তাঁহার চরণে ।
ক্ষান্ত হও, বৃথা চেষ্টা না শোভে সম্প্রতি
সদা-শুভকরী আগে ধর ধীর মতি;
অন্নের সংস্থান কর, ধর ঐক্য-বল,
তবে উপাড়িও হস্তে উত্তুঙ্গ অচল ।

৪র্থ খণ্ড, । ৮ম সংখ্যা।

আষাঢ়, ১২৮৩।

ও

প্রতিবিম্ব।

(মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।)

কলিকাতা।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিং লাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৩

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

১। জ্ঞানাঙ্কুরের মূল্য বিষয়ক নিয়ম ;—

বার্ষিক অগ্রিম	৩৲
ষাণ্মাষিক ,, ...	১৸৹
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	।৵৹

এতদ্ব্যতীত মফঃসলে গ্রাহকদিগের বার্ষিক ।৵৹ ছয় আনা করিয়া ডাক মাশুল লাগিবে।

২। যাঁহারা জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য স্বরূপে ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা কেবল অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন; এবং প্রত্যেক টাকাতে /৹ এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইবেন, কেননা বিক্রয় করণ কালে আমাদিগকে টাকাতে /৹ আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

৩। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের কার্য্য সম্বন্ধে পত্র এবং সমালোচনের জন্য গ্রন্থাদি আমরা গ্রহণ করিব। রচনা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমাদের ঠিকানায় "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব সম্পাদক" শিরোনামা দিয়া লিখিতে হইবে।

৪। ব্যারিং ও ইন্সফিসেন্ট পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট — শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্যানিং লাইব্রেরী — জ্ঞানাঙ্কুর কার্য্যাধ্যক্ষ।

রণ-চণ্ডী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

জ্ঞানাঙ্কুর হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রাহা প্রণীত নূতন উপন্যাস। মূল্য টাকা ১৲ টাকা। ডাকমাসুল ৵৹ আনা। ঢাকা ন্যাশনাল ডিপজিটরীতে এবং ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীব্রজমাধব বসু।

শ্রীপঞ্চমী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যখন বৃক্ষ বাটিকায় পূর্ব্ব অধ্যায় বর্ণিত ঘটনা হইতেছিল, তখন আনন্দময়ীর কক্ষে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। আনন্দময়ী উপবিষ্টা, সম্মুখে শশিশেখর দণ্ডায়মান। যেন একটু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের কথা বার্ত্তা চলিতেছিল।

শশিশেখর কহিলেন,—

"তা বলিলে কি হয়? আমার এ বিবাহে মত নাই। অনেক দিন অবধি অমি তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছি—আমার সাক্ষাতে এত দিন ভাঙ্গিয়া বল নাই—সুতরাং আমিও কোন কথা বলি নাই। আজ তুমি মনের কথা ভাঙ্গিলে, আমিও মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। বলিতে কি, —সুকুমারী আমার মনের মত হইবে না।"

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

শশিশেখর কহিলেন,—

"কেন আবার কি? আমার ইচ্ছা নয়,—সুকুমারীকে আমি কখনই বিবাহ করিব না। আমি স্বীকার করি, তোমার সুকুমারী সুন্দরী, কিন্তু যে সকল গুণে আমি মোহিত হই, তাহার একটি গুণও সুকুমারীতে নাই।"

আনন্দময়ী কহিলেন,—

"তোমার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ। সুকুমারীর রূপ গুণ দেখে তাকে দেবকন্যা বলে বোধ হয়। তুমি যেমন অসার ও অপদার্থ, কানা ঘোষালের মেয়ে ভূতী তোমার উপযুক্ত পাত্রী।"

শশি কহিলেন,—

"মা তুমি ঠিক অনুভব করেছ, বাস্তবিক আমি তাকেই মনোনীত করেছি। আমার চক্ষে তাকে দেবকন্যা বলে বোধ হয়। অল্প দিনের মধ্যেই আমি তাকে রায় বাগানের অধিশ্বরী করিব স্থির করেছি।"

আনন্দময়ী দেবী ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, "বংশ গৌরব স্মরণ কর। ভূতীকে তুমি কখনই বিবাহ করিতে পাবে না।"

শশিশেখর রূঢ় স্বরে কহিলেন,—

"তাকে বার বার ভূতী ভূতী কর না—ভুবনমোহিনী বলে ডাকতে কি তোমার গায় কাঁটা ফোটে?"

আনন্দময়ী পুনরায় ক্রোধভরে কহিলেন,—

"কাঁনা ছেলের নাম পদ্মলোচন,—ভূতী আবার ভুবনমোহিনী হলো। তা যাই হউক, তাকে বিবাহ কত্তে পাবে না।"

শশিশেখর কহিলেন, "আইবুড়ো থাকিব, তথাপি ভুবনমোহিনী ভিন্ন অপর কোন রমণীর পানিগ্রহণ করিব না।"

আনন্দময়ী কহিলেন,—

"তাহাকে বিবাহ করে এনে আমার গৃহ অপবিত্র করিতে পাইবে না। তোমার কি কুলমর্য্যাদা জ্ঞান নাই।"

শশিশেখর হাসিয়া কহিলেন,—

"কুলমর্য্যাদা আবার কি? টাকা থাকলেই সব হয়। টাকায় কুলীন, টাকায় বড় লোক, টাকায় মর্য্যাদা।"

আনন্দময়ী ক্রমেই অধিক বিরক্ত হইতে লাগিলেন। এবার গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "টাকাতেই সব হয় বটে! তোমার সম্মুখে যে ঘোর বিপদ তা তুমি দেখতে পাইতেছ না। টাকার অহংকার তোমার শীঘ্রই ঘুচিবে। তুমি যে প্রকার কুলাঙ্গার, তাতে রায় গোষ্ঠীর সহিত তোমার কোন সংশ্রব থাকা উচিত নয়। যদি তুমি কানা ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ কর, তবে চিরদিনের জন্য টাকা, মান ও মর্য্যাদায় বঞ্চিত হবে।"

শশিশেখর হাসিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ ভঙ্গিতে যেন নিতান্ত উপেক্ষা লক্ষণ দৃষ্ট হইল। তিনি কহিলেন,—

"তোমার নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা দেখিতেছি,— আমাকে ধনে মানে বঞ্চিত করিবার তুমি কে? আমি আর এখন নাবালিক নই। এত দিন যে তুমি নির্ব্বিবাদে ধন সৌভাগ্য ভোগ করেছ এই যথেষ্ট; এখন আর তা হবেনা। আর এ বাড়ীতে তোমার থাকিবার অধিকার নাই। যদি সহজে যাও—ভালই। মুরসিদাবাদে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের যে গঙ্গাবাসের বাটী আছে তথায় যাও, নিয়মিত মাসিক খরচ পাইবে। যদি সহজে না যাও, তবে গলায় হাত দিয়া দূর করিয়া দিব। এখন আমি কর্ত্তা, তা জান? এই বাড়ীতে এখন আমার আজ্ঞাই প্রবল হবে। আমি তোমার সাক্ষাতে প্রকাশ করে বল্‌ছি, ঘোষালনন্দিনী ভুবনমোহিনী আমার স্ত্রী হইয়াছেন। আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

আনন্দময়ী কহিলেন,—"কি? বিবাহ হইয়া গিয়াছে! এত দূর সাহস!"

শশিশেখর কহিলেন,—

"তিন মাস হইল আমাদের বিবাহ হইয়াছে। আর এক সপ্তাহ পরে ভুবনমোহিনী আসিয়া গৃহের অধিশ্বরী হইবেন।"

আনন্দময়ী কহিলেন,—

"কিসের অধিশ্বরী হইবে? এ সকলে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই।"

শশিশেখর কহিলেন,—

"সে কথা বলে তোমার বোকা বুঝাইতে হইবে না। আমি আমার মাতামহের দানপত্র দেখিয়াছি। বিষয় বিভব যাহা কিছু আছে, সকলই আমার, এক কপর্দকেও তোমার অধিকার নাই।

এত দিন তোমাকে ভোগ করিতে দিয়াছি—কোন কথা কহি নাই, ইহাই যথেষ্ট।”

আনন্দময়ী সকল কথাই শুনিলেন, ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—

“একটী অতি প্রাচীন মান্য বংশের কলঙ্ক হওয়া অপেক্ষা এ দুরাচারকে দূর করাই শ্রেয়ঃ।” এক জন দাসীকে ডাকিয়া কহিলেন “গত রজনীতে যে স্ত্রীলোকটী আসিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট আসিতে বল।” দাসী চলিয়া গেল। আনন্দময়ী কহিলেন,—

“দুর্ভাগ্য! তুমি নিজেই তোমার সর্ব্বনাশের মূল! সে জন্য তুমিই দোষী! তুমি যখন বংশ মর্য্যাদা পরিত্যাগ করে কানা ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেছ, তখন তুমি রায় গোষ্ঠীর ধনে বঞ্চিত হয়েছ। আমি তার হাতে হাতেই প্রমাণ দিতেছি।”

শশিশেখর কহিলেন,—

“তথাপি তোমার সেই কথা গেল না? তোমার যায় অধিকার নাই তা বার বার বলিবার প্রয়োজন কি? আমি তোমার কথা তুচ্ছ করিতেছি।”

আনন্দময়ী কহিলেন,—

“শুনো—তোমার পক্ষে মারাত্মক সংবাদ। জান—তুমি কার সন্তান?”

শশিশেখর কহিলেন,—

“তোমাদের চরিত্রে কলঙ্কপাত করিতে ইচ্ছা নাই। আমি তোমাদের সন্তান।”

আনন্দময়ী কহিলেন,—

“তোমাদের কি?”

শশিশেখর কহিলেন,—

“তোমার ও তোমার স্বামীর!”

আনন্দময়ী কহিলেন,—

“তা নয়; তুমি আমাদের সন্তান নও। চম্‌কিয়া উঠিলে যে! শুনিতে প্রস্তুত হও, আমি বলিতেছি। শ্রীপঞ্চমীর দিন আমি এরূপ অবস্থায় থাকি কেন, তা কি তুমি জান?”

শশিশেখর শান্ত ভাবে কহিলেন,—

“আমি জানি না; অনেকেই সে বিষয়ে অনেক কথা বলিয়া থাকে; আমার বোধ হয় কোন পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য শ্রীপঞ্চমীর দিন তুমি ঐ ভাবে থাক।”

আনন্দময়ী উত্তর করিলেন,—

“হাঁ, সে কথা সত্য। কিন্তু আমি সে বিষয়ে নির্দ্দোষী। আমার পিতা হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায় নবাব সরকারে অনেক দিন কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট ধন-রত্ন সঞ্চয় করেন। শেষে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খেলাত ও রায় উপাধি দেন। পিতার পুত্রসন্তান ছিলনা, দুই কন্যা ছিল, আমি ও আমার কনিষ্ঠা ভগিনী। পিতা দেখিলেন মান মর্য্যাদা সম্পন্ন প্রাচীন বংশের নাম পর্য্যন্ত

একবারে লুপ্ত হয়। কি করেন, মনুষ্যের হাত নয়। আমাদের বিবাহ দিলেন। বংশের নামটী বজায় রাখিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উভয় জামাতাকে রায় উপাধি দেওয়াইলেন, এবং নবাব সরকার হইতে হুকুম বাহির করিলেন যে, উভয় কন্যার প্রথম যে পুত্রসন্তান হইবে, সে রায় উপাধি পাইবে, এবং সেই পুত্রের বংশ পরম্পরা চির দিন রায় উপাধি ধারণ করিবে। আর সেই পুত্র তাঁহার সমুদায় বিষয় বিভবের অধিকারী হইবে। নতুবা উভয় কন্যা কিছু কিছু বিষয় পাইবে এবং অবশিষ্ট বিষয় অন্যান্য সৎকর্ম্মে ব্যয় হইবে, এরূপ এক দানপত্র করিলেন। ক্রমে আমি এক কন্যা সন্তান প্রসব করিলাম। আমার স্বামী বিষয় লাভে নিতান্ত হতাশ হইয়া কি পরামর্শ করিলেন, আমার পিতার সমস্ত বিষয় হস্তগত করিবার লোভ জন্মিল। আমি প্রসব যন্ত্রণা হইতে চৈতন্য পাইয়া দেখি, আমার ক্রোড়ে পুত্র সন্তান রহিয়াছে। আমি এ বিষয় জানিবার পূর্ব্বে 'রায়ের পুত্র সন্তান হইল' এরূপ রটনা হইয়া গিয়াছে। শ্রীপঞ্চমীতে এই ঘটনা ঘটে। আমি কন্যার জন্য অনেক কাঁদিলাম, কিন্তু এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জান্‌তে পারিলাম না। স্বামী পাছে অপমানিত হন, এই ভয়ে এ কথা প্রকাশ করিতেও পারিলাম না। পর বৎসর আমার ভগিনীর মৃত্যু হইল; তাঁর সন্তান হয় নাই শুনিয়া কতক শান্ত হইলাম। আমি তখন মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলাম যে, এই বিপুল ধনরত্নে আমরা উভয়েই তুল্য অংশী। নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় আমার দ্বারা তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। শুনিলে শশিশেখর! তুমি আমাদের সন্তান নও।"

শশিশেখর স্তম্ভিতভাবে এই কথা গুলি শুনিলেন। নম্রভাবে কহিলেন,—

"যদি তোমার কথা গুলি সত্য হয়, তবে এ পাপে ঘোরতর দণ্ড তা জান।"

আনন্দময়ী গর্ব্বিত ভাবে কহিলেন,—

"জানি। কিন্তু বংশ মর্য্যাদার কলঙ্ক হওয়া অপেক্ষা আমি সে দণ্ড ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি।"

শশিশেখর কহিলেন,—

"এ কথা তুমি প্রমাণ কর্ত্তে পার্‌বে না।"

আনন্দময়ী কহিলেন,—

"প্রমাণ আমার নিকটেই আছে।"

শশিশেখর জিজ্ঞাসিলেন,—

"তবে কে আমার জনক জননী?"

আনন্দময়ী উত্তর করিলেন,—

"তোমার পিতা নাই, মাতা

আছেন ; তিনি এখনি এখানে আসিতেছেন।”

এই কথা বলিতে বলিতে মন্দাকিনী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি উভয়ের মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, সকলই প্রকাশ হইয়াছে, কিছুই আর অপ্রকাশ নাই। শশিশেখরের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। সন্তানের মায়া কিছুতেই যায় না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বাহু বিস্তার পূর্ব্বক শশিশেখরের প্রতি ধাবমানা হইলেন। কহিলেন,—

“শশি—শশি—আমি রে তোর দুঃখিনী জননী। আমি ভিক্ষা করে এনেও তোয় মানুষ করিতাম। আমি তোরে ত্যাগ করি নাই—সে বিষয়ে আমার কোন দোষ নাই।”

শশিশেখর আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“ইনিই কি আমার জননী?”

আনন্দময়ী কহিলেন “হাঁ।”

শশিশেখর জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

“তবে কি আমি এত দিনে আমার জননীকে পাইলাম? মা—মা—চল, তোমার কুটীরে চল, আমার এ রাজপ্রাসাদে প্রয়োজন নাই—আমার এ দাসদাসীতে প্রয়োজন নাই। দুঃখীর সন্তানের এ সকলে প্রয়োজন কি? মা একবারে বধূসঙ্গে গৃহে চল।”

মন্দাকিনী কহিলেন,—

“চল বাবা—দুঃখিনীর ধন ঘরে চল।”

শশিশেখর কহিলেন,—

“মা আমি ভিক্ষা করে এনে তোমাকে প্রতিপালন করিব। চল—”

আনন্দময়ী কহিলেন স্থির হও যাইবার বিলম্ব আছে, তোমাকে এরূপে ত্যাগ করায় নিতান্ত অধর্ম্ম আছে। তোমাকে এত দিন প্রতিপালন করেছি—এখন এমন অবস্থায় কিরূপে বিদায় দেই।”

এই বলিয়া সিন্দুক হইতে সহস্র মুদ্রা বাহির করিয়া শশিশেখরের হস্তে দিয়া কহিলেন,—

“যেখানেই থাক—তিন মাস অন্তর আসিয়া এমনি হাজার টাকা লইয়া যাইবে। তুমি বার্ষিক চারি হাজার টাকা আমার নিকট পাইবে, তাহাতেই তোমার উত্তমরূপে চলিয়া যাইবে।”

শশিশেখর দেখিলেন পয়সা না হইলে তাঁহার এক দণ্ডও চলিবার উপায় নাই, সুতরাং দান গ্রহণে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অম্লান বদনে গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—

“ইহা আমার নিজস্ব ভাবিয়া লইলাম।”

আনন্দময়ী মন্দাকিনীকে কহিলেন,—

'এ সকল কথা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।"

মন্দাকিনী তাহাতে স্বীকার করিলেন। মন্দাকিনী ও শশিশেখর কক্ষ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সুকুমারী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়াই তিনি যেন স্তম্ভিত হইলেন। মনে মনে কহিলেন "ইনি কি অদ্যাপি জীবিত আছেন। আমার মা সর্ব্বদা বলিতেন ইনি আমার পরম আত্মীয়।'

মন্দাকিনীও সুকুমারীর সুবদন দৃষ্টে যেন কোন কালে দেখিয়াছেন বোধ করিতে লাগিলেন। তিনিও স্তম্ভিত প্রায় হইলেন। আনন্দময়ী উভয়ের মুখের ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। মনে মনে কতই তর্ক করিলেন। শেষে সুকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মা সুকুমারি! মন্দাকিনীকে দেখে তোমার কারে মনে পড়্‌ছে বাছা? আমার মনে ঘোরতর সন্দেহ হয়েছে, শীঘ্র বলে আমার মনোবেগ দূর কর।"

সুকুমারী কহিলেন,—

"আমার মা আমাকে এক খানি চেহারা দিয়ে সর্ব্বদা বল্‌তেন, ইহাতে যাঁর চেহারা আঁকা আছে, ইনি তোমার পরম আত্মীয়—এমন কি ঠিক মায়ের মত। আমার সেই চেহারা ঠিক মনে পড়েছে। আমি এঁকে কখনও দেখি নাই। শুধু সেই চেহারায় উত্তম বুঝ্‌তে পারছি। সে চেহারা খানি আমার কাছে আছে।" এই বলিয়া অঙ্কিত চিত্রপট খানি আনিয়া দিলেন। আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট থাকিল না।

মন্দাকিনী কহিলেন,—

"দেবি! কি আশ্চর্য্য ঘটনা! আপনি আমাকে আমার পুত্র দিলেন, আমিও আপনাকে আপনার কন্যা দিলাম। এই পটে আমারই মূর্ত্তি অঙ্কিত, আমি পূর্ব্বেই এই অঙ্কিত পটের কথা বলিয়াছি। সুকুমারী আপনার কন্যা।"

আনন্দময়ী দেবী পুলকাশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে কহিলেন,—

"বিধাতা তুমি ধন্য! সুকুমার! আমি তোমাকে পেলাম—তুমিই আমার সেই হারা নিধি প্রিয়তম কন্যা। স্বভাবে স্নেহ টানিয়া আনে। আমি তোমাকে ঠিক কন্যার ন্যায়ই স্নেহ করিতাম। এস মা! আমার কোলে এস

এই বলিয়া সুকুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া বার বার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। মন্দাকিনী শশিশেখর

ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভুবন মোহিনীকে লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই আনন্দময়ী দেবী সুকুমারী ও বিনোদের মনের ভাব জানিতে পারিলেন। বিনোদকে তিনি পুত্রনির্বিশেষে ভাল বাসিতেন। শুভ দিনে শুভ ক্ষণে বিনোদ ও সুকুমারীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। তাঁহারা সমুদায় বিষয় বিভবের অধিকারী হইলেন। আনন্দময়ী সুখে কাশীধামে যাইয়া বাস করিলেন।

সমাপ্ত

রসসাগর।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

একজন প্রশ্ন করিলেন,—"সেই সীতে অসিতে।"

রসসাগর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিলেন,—

কহেন রাম, হে রাম! কি হারাইলাম সীতে!
কেন বা চাহিলে সীতে সংগ্রামে আসিতে?
সান্ত্বাইলেন হনুমান হাসিতে হাসিতে।
জান কি জানকীনাথ জনক-জনিতে?
অচৈতন্য না থাকিতে তবেত জানিতে!
শতস্কন্ধ বধি রণে, করাগ্র অসিতে।
সমর-সাগরে নাচে সেই সীতে অসিতে॥

যখন রামচন্দ্র শতস্কন্ধ রাবণকে বধ করিতে যান, তখন সীতা দেবী তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। রাম ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে শতস্কন্ধের শরবর্ষণে অচেতন হইয়া পড়েন। জনকনন্দিনী মহাবীর রামচন্দ্রের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে এবং শতস্কন্ধের গর্ব্বিত বচন শ্রবণে, স্বয়ং অসীতা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শতস্কন্ধকে বধ করিলেন। রাম সংজ্ঞা লাভ করিলেন, কিন্তু নিকটে সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তখন সীতা দেবী রণোন্মত্তা বেশে রণস্থলে নৃত্য করিতেছেন। হনুমান রামচন্দ্রের কাতরতা দেখিয়া সমুদায় বিবরণ আমূল বর্ণনা করিলেন।

রসসাগরের নিকট সময়ে সময়ে এমন উৎকট প্রশ্ন পড়িত যে, অন্যান্য লোকে তাহার কি উত্তর হইবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না। একদা প্রশ্ন হইল;—"যখন ছেলে জন্মাইল, মা ছিল না ঘরে।"

রসসাগর উত্তর করিলেন,—

পুত্রবতী সীতা সতী যান সরোবরে।
ঋষি আসি প্রবেশিল আশ্রম কুটীরে॥
কুশময় কুমার স্থাপিল শূন্য ঘরে।
জানি কি জানকী যদি মনস্তাপ করে॥
একে কৈল যুগল বাল্মীকি মুনিবরে।
যখন ছেলে জন্মাইল, মা ছিল না ঘরে॥

পুত্রবতী সীতা দেবী স্নান করিতে গমন করিলে বাল্মীকি কুটীর মধ্যে আগমন করিয়া দেখিলেন, লব কুটীর মধ্যে নাই। অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া কুশ দ্বারা লবের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার জীবন দান করিলেন। সুতরাং কুশের জন্ম সময়ে সীতা কুটীরে উপস্থিত ছিলেন না। ঐ মূর্ত্তি লবের অভেদাকৃতি হইল। তাহারই নাম কুশ। এটী শাস্ত্রীয় কথা নহে, প্রবাদমাত্র। ইহাই অবলম্বন করিয়া উপরিউক্ত শ্লোক রচিত হয়।

কোন সময়ে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করিলেন,—

"আর না, আর না।"

রসসাগর পূরণ করিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণ হলেন যবে শ্রীরাম ধানুকী।
রুক্মিনীরে আজ্ঞা দিলেন হইতে জানকী॥
রুক্মিনী কহেন নাথ মনে বড় ঘেন্না।
অভাগীরে সীতে হতে আর না আর না॥

একদা দ্বারকা নগরে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, তাঁহার আদরে, সত্যভামা, সুদর্শন চক্র ও গরুড় এই তিন জনের অতিশয় গর্ব্ব হইয়াছে। গর্ব্বহারী তাহাদের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য এক কৌশল করেন, এবং সেই কৌশলের পরিসমাপ্তি সময়ে তাঁহাকে রামরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। রুক্মিনীকে সীতা রূপ ধারণ করিতে আদেশ করিলে দেবী পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া কহেন, 'আর না'। এই শ্লোকে প্রশ্নকারী ব্রাহ্মণের মনস্তুষ্টি না হওয়ায়, কবি রচনা করিলেন,—

পতিত হবার লাগি পরের বাড়ী ধন্না।
পতিত হইয়া কন বৃথা ঘরকন্না।
আপন বাটী একাদশী, পরের বাটী পারনা।
ফলারে ব্রাহ্মণের জন্ম আর না আর না।

রাজা গিরীশ চন্দ্র অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। একদা তাঁহার কোন বিশ্বাসী ভৃত্যকে অপর কোন আত্মীয়ের ঘরে গাঁটা দিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য আদেশ প্রতিপালন করিয়া মহারাজের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে যে যে কথা কহেন, তাহা সমুদায়ই মহারাজ জ্ঞাত হইয়া রসসাগরকে প্রশ্ন করিলেন,'দিতে হয় দেয়া নয়,দেই কিনা দেই।"

রসসাগর উপরি উপরি চারি ভাবে চারিটী শ্লোক রচনা করিলেন, কিন্তু তাহাতে রাজার মনস্তুষ্টি না হওয়ায় শেষে অশ্লীল ভাবের এক কবিতা রচনা করিলেন, এবং তাহাই রাজার মনোগত ভাবের সহিত মিলিল। আমরা ঐ অশ্লীল ভাবের কবিতাটী ছাড়িয়া দিয়া নিম্নে পূর্ব্ব চারিটী শ্লোক প্রকাশ করিলাম। যথা ;—

রামকে আনিতে গেল বিশ্বামিত্র মুনি।
শুনি দশরথ রাজা লোটায় ধরণী ॥
না দিলে সঁাপয়ে মুনি এখন করি কি।
দিতে হয় দেয়া নয় দিই কি না দি ॥ ১

শ্রীরাম হবেন রাজা, সীতা হবেন রাণী।
বনেতে যাবেন রাম স্বপনে না জানি ॥
রাম সীতে বনে দিয়ে প্রাণে কিসে রই।
দিতে হয় দেয়া নয় দিই কি না দিই ॥ ২

যখন হেমন্ত কন্যা করেছিল দান।
ডাক দিয়া আনিলেন যত এয়োগণ ॥
জয়া বিজয়া আর চন্দ্রমুখী হীরে।
সকলেতে আসিলেন এয়ো করিবারে ॥
চরণে আল্‌তা দিতে নাপিতের ঝি।
দিতে হয় দেয়া নয় দিই কি না দি ॥ ৩

ভীম বলে কীচকেরে শাস্তি দিতে পারি।
অজ্ঞাত হইবে ব্যক্ত এই ভয় করি ॥
না দিলে ছাড়য়ে প্রাণ পাঞ্চালের ঝি।
দিতে হয় দেয়া নয় দিই কি না দি ॥

একদা মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।" রস-সাগর পূরণ করিলেন ;—

মহারাজ রাজধানী নগর বাহির।
বারোইয়ারি মা ফেটে হলেন চৌচির ॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ॥

মহারাজ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে নগর প্রান্তে যাইয়া দেখিলেন, বারইয়ারি প্রতিমা প্রস্তুত হইতেছিল। প্রখর রৌদ্র তাপে অর্দ্ধ প্রস্তুত মূর্ত্তিগুলি ফাটিয়া চৌচির হওয়ায় সিংহের শরীরস্থ খড় দড়ি গাভীতে টানিয়া ভক্ষণ করিতেছে। রাজার মনে মনে এই ভাব জাগরূক ছিল, রস-সাগরকে তাহাই প্রশ্ন করিলেন। রস-সাগর যেন দৈবী শক্তিপ্রভাবে রাজার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া দিলেন। বাস্তবিক ইহা দৈবীশক্তির পরিচায়ক।

একদা প্রশ্ন হইল, "হরি নামে খোজ নাই ফট্‌কে রাঙ্গা খোপ।" রস-সাগরের পূরণ ;—

ত্রাস পেয়ে গন্ধকালী বলে হনূমানে।
সাবধান হও বাপু কালনিমার স্থানে ॥
অতিথি করিয়ে বেটা ধর্ম্ম কল্যে লোপ
হরি নামে খোজ নাই ফট্‌কে রাঙ্গা খোপ॥

প্রশ্ন ;— "জাঙ্গাল বয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি।" রস-সাগরের পূরণ ;—

সখের প্রাণ সদা খান গাঁজা কিম্বা পাতি
যে নেশাতে কিন্তে চান নবাবের হাতি॥
এক টানেতে অন্ধকার দিনে জ্বালান বাতি
জাঙ্গাল বয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি

প্রশ্ন ;— "হাটের নেড়ে হুজুক চায়।" রস-সাগরের পূরণ ;—

উকীল খোজেন মোকদ্দমা,
　　কোকিলে বসন্ত গায়।
অগ্রদানী নিত্য গণে,
　　কোন্ দিনে কে গঙ্গা পায় ॥
সাধু খোজেন পরমার্থ,
　　লম্পট খোজেন বেশ্যালয়।
গোলমালেতে রেস্ত মেলে,
　　হাটের নেড়ে হুজুক চায় ॥

ক্রমশঃ—

প্রলাপ-সাগর।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

ঐতিহাসিক তরঙ্গ।

সুসভ্য দেশ মাত্রেই ইতিহাসের প্রাচুর্য্য; লেখকবর্গ মধ্যে ইতিহাস-বেত্তা অতি উচ্চ স্থান পাইয়া থাকেন। তাঁহারা কীর্ত্তিনিকেতন প্রবেশার্থী কীর্ত্তিলিপ্সুগণের পরিচায়ক,—ভূমণ্ডলস্থ সাম্রাজ্য পরম্পরার পতনোত্থান, রাজন্যবর্গের বীরতা, ধীরতা, প্রজাপালকতা প্রভৃতির আমূল বৃত্তান্ত গায়ক,—রাজ্য ও সাম্রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনার দর্পণ। অধিক কি ইতিহাস পাঠ ভিন্ন জ্ঞানের দ্বার বিনির্ম্মুক্ত হয় না। ইতিহাসই জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। এই জন্যই সুসভ্য দেশ মাত্রেই ইতিহাস ও ইতিহাস-বেত্তার এত আদর।

ইতিহাস দুইভাগে বিভক্ত; পুরাবৃত্ত এবং ইতিবৃত্ত। যাহাতে প্রাচীন কালের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম পুরাবৃত্ত, এবং যাহাতে ইতি অর্থাৎ শেষ কালের বিবরণ সমূহের জ্ঞান জন্মে তাহার নাম ইতিবৃত্ত। কিন্তু ইতিহাস শব্দটী এরূপ ওতপ্রোতভাবে পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত শব্দদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে যে, এক হইতে অন্যের উদ্ধার সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ ঘটনা যে কেবল আমাদের দেশেই ঘটিতেছে এমন নহে, যাবতীয় সুসভ্যদেশে সকল সময়ে এরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এরূপ হইবার কারণ কি? কেহই ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন না। ইতিহাস শব্দের প্রকৃত অর্থ কেহই জ্ঞাত নহেন, এই জন্যই প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে কেহই সমর্থ হন না। আমি অনেক অনুসন্ধান ও চিন্তা শক্তির পরিচালনা দ্বারা ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি, এবং আমার সেই জ্ঞান সাধারণকে উপহার প্রদান করিতেছি। তাহা পাঠ করিলে সকলে আমার চিন্তাশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাইবেন।

ইতিহাস কাহাকে বলে?—যাহার ইতি অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে হাস্য করিতে হয়, তাহারই নাম ইতিহাস। সুতরাং পুরাবৃত্ত এবং ইতিবৃত্ত এই উভয় শ্রেণী মধ্যেই ইতিহাস থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কোন ইউরোপীয় নরপতি এক জনকে

অকারণ অনবরত হাস্য করিতে দেখিয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এব্যক্তি এত হাস্য করিতেছে কেন ?" তাহাতে মন্ত্রীমহাশয় উত্তর করিলেন, "এব্যক্তি হয় পাগল, না হয় তো ডনকুইকসট্ পাঠ করিয়াছে।" ডনকুইকসট্ একখানি অতি উৎকৃষ্ট হাস্যরস প্রধান গ্রন্থ ; উহার ঘটনাগুলিকে গ্রন্থকার এরূপ হাস্যরসোদ্দীপক করিয়াছেন, যে তাহারা যখন স্মরণ পথে আসিবে, তখনই হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যাইবে না। আমিও ইতিহাস সম্বন্ধে সেই কথা বলিতে পারি। যদি কেহ অকারণ অনবরত হাস্য করে তবে সে ব্যক্তি হয় পাগল, না হয় তো ইতিহাস পাঠ করিতেছে, এবং তদ্বর্ণিত ঘটনাবলী তাহার মনে উদিত হইতেছে।

আমার এ কথা বলিবার অধিকার কি ? সর্ব্বজন আদরণীয় ইতিহাসের প্রতি আমার এত উপহাস করিবার কারণ কি ? সাধারণের এ প্রশ্ন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমিও এ প্রশ্নের উত্তর দিবার অনুপযুক্ত পাত্র নহি। যখন স্বয়ং আমি এ গোল তুলিয়াছি, তখন ইহার মীমাংসার জন্য অপরে মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া মরিবেন কেন ? তবে এক কথা এই যে, আমি নিজের স্বার্থের জন্য এত পরিশ্রম করিতেছি না ; সাধারণের শিক্ষার জন্য আমার এ পরিশ্রম ; অতএব যাহাতে সাধারণের মঙ্গল দেখা যাইতেছে, তাহাতে সকলেরই এক একটু চিন্তা করা উচিত। হাজার বল,—"ভবি ভুলিবার নয়।" আমাদের দেশের লোকের কিছুতেই চৈতন্য হইবে না। তাহারা কিছুরই মূল অন্বেষণ করিবে না, অনুবাদেই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সার সংগ্রহ করিবে। আমাদের দেশের ইতিবৃত্ত—তাহাও ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিতে হইবে। আমাদের দেশের ভূগোল,—তাহাও ইংরাজী হইতে অনুবাদ না করিলে চলিবে না। বিষ্ণুপুরাণের সার মর্ম্ম কি? —উইলসন পাঠ কর, জানিতে পারিবে। এতক্ষণে বোধ হয় অনেকে বুজিতে পারিয়াছেন, ইতিহাস পাঠ করিলে কেন হাস্য করিতে হয় ? স্বদেশহিতৈষী নিরপেক্ষ ব্যক্তি, যদি নিজ দেশের ইতিবৃত্ত লিখিতেন, তাহা হইলে আমরা এমন কথা বলিতাম না ; কিন্তু সেরূপ প্রায়ই ঘটে না। যাঁহারা ভারতবর্ষ কখন চক্ষে দেখেন নাই, তাঁহারাও ইহার ইতিবৃত্ত লিখিতে ক্রুটী করেন না। তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তককে ইতিবৃত্ত না বলিয়া শ্রুতি বলা যাইতে পারে, কারণ তাঁহারা লিখিত বিষয় সকল শ্রবণ পরম্পরায় অবগত হইয়াছেন। বাস্তবিক উহা আমাদের দেশে আর্য্যগণ পূজনীয় শ্রুতি (বেদ) অপেক্ষাও

সমধিক আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখের কথা কি বলিব, আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন বিশেষ প্রসঙ্গ জানিতে হইলে উইলসন, জোন্স, গোল্‌ডস্টুকার, মোক্ষমূলর, মুয়ার, ওয়েবর, কোলব্রুক প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণের পদলেহন করিতে হয়। ভারতইতিহাস সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। যদি কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাস সংগ্রহে যত্নবান হয়েন, তবে তাহার উপকরণ সকল সাগরপার হইতে আহরণ করিতে হইবে, নতুবা গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে না। এ সকল দুঃখের কথা কাহার কাছে কহিব ? কে শুনিবে ? পাশ্চাত্য সভ্যতায় দেশ মাতিয়াছে, সে মত্ততা হইতে দেশকে উদ্ধার করা সহজ ব্যাপার নহে। এ সকল প্রস্তাবান্তরের কথা, সুতরাং এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করি।

এক দেশের লোকের দ্বারা সংগৃহীত দেশান্তরের ইতিবৃত্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া সুকঠিন। এক কালে হইতে পারে না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। লিখিতব্য বিবরণের বিশেষজ্ঞ, নিরপেক্ষ লেখক হইলে অবশ্যই ঈপ্সিত ফল লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সচরাচর সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ? ইতিহাস সম্বন্ধে আরও একটী দোষ ঘটিয়াছে। যাঁহার যাহা মনে আইসে, তিনি তাহাই লেখেন। সুতরাং সময়ে সময়ে ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপ লিখিবার অপর কোন উদ্দেশ্য দৃষ্ট হয় না, বোধ হয় লেখক মহাশয়েরা কেবল বাহাদুরী লইবার জন্যই এরূপ করিয়া থাকেন। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ লিখিয়া কতিপয় ভৌতিক, আবধৌতিক যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে অদূরদর্শী পাঠক মণ্ডলী সমীপে পুরাতত্বজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইলেন। দেশে বিচার নাই—কেবল অবিচার।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিলেন,—

"মহাভারত বর্ণিত ঘোরতর যুদ্ধের অনেক পরে রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।"

এ কথা তাঁহাকে কে বলিয়া দিল ? লেখক স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, সুতরাং বিবিধ সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ইহার কোন যুক্তি বাহির করিতে পাপারেন নাই, কেবল স্বকোপলকল্পিত কতিপয় অসম্বন্ধ যুক্তি দ্বারা নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। লেখক যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, সে গুলি লোক ভুলাইবার জন্য, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার মনে যে প্রকৃত যুক্তি রহিয়াছে, তাহা হয় তো প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। সে যুক্তি বোধ হয় আমরা কতক বুঝিতে পারিয়া থাকিব ; পাঠক বর্গের তদ্বিষয়ে অভিপ্রায় কি তাহা

জানিবার জন্য এস্থলে তাহার উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিলাম। স্বচক্ষে দর্শন করা ও কর্ণে শ্রবণ করা, এ দুইটী পরস্পর অনেক বিভিন্ন। যেটী চক্ষে দর্শন করা যায়, তাহা কর্ণে শ্রবণ করা বিষয় অপেক্ষা অনেক দিন স্মরণ থাকে, এবং সেই জন্য কখনো কখনো শ্রুত বিষয় সমধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। নূতন মত আবিস্কারক পুরাবৃত্তবিৎ মহাশয়ও লঙ্কাকাণ্ডের বর্ণিত বিষয় গুলি স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন, অথবা তাহার কোন বিশেষ কার্য্যে, বিশেষরূপে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই রামায়ণের বিষয় তাঁহার মনে সম্পূর্ণরূপে জাগরূক রহিয়াছে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া তাঁহার বোধ হইতেছে। মহাভারতের যুদ্ধে তাঁহাকে প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং তাঁহার অদৃষ্টে উহার দর্শন ঘটে নাই, এই জন্যই সে বিষয় তাঁহার অধিক স্মরণ নাই; ইহাতেই তাহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাদৃশ লিখন প্রণালীর, এতদ্ভিন্ন অন্য কারণ আমাদের উপলব্ধি হয় না। পাঠকগণের অভিপ্রায় কি, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন! আবার যে সকল মহাত্মারা উহাঁর লেজ ধরিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারাও সেই পথের পথিক। এক্ষণে সাধারণে বিবেচনা করুন, এরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পক্ষে অমৃত কি বিষ? মৎপ্রদত্ত ব্যুৎপত্তির সহিত ঈদৃশ ইতিহাসের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহাও পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

কেহ লিখিলেন, "জানকী রামের ভগিনী।" এস, কে কত হাসিতে পারি, হাসো। এই প্রকার কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রলাপ সংগ্রহ করিতে পারিলে এক খানি অতি উৎকৃষ্ট হাস্যার্ণব গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল লেখক "পুরাতত্ত্বজ্ঞ" উপাধি পাইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত, যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া ফেলেন। ভারতলাওয়ারিশ খনি হইতে যখন যাহা প্রাপ্ত হন, তখন তাহাই সংগ্রহ করিয়া তাহাতে একটু স্বদেশী খাদ মিশাইয়া, দশ জনের নিকট প্রকাশ করেন। বিজ্ঞ লোকে তাঁহার বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড বুঝিতে বাকী রাখেন না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা গুটি দুই তিন আল্‌ফেবেট তাঁহার কপালে আঁটিয়া দিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টাইটেল আজ কাল বড় মূল্যবান্ পদার্থ; বোধ হয় নিলাম ডাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ লাভ হইতে পারে।

কেহ লিখিলেন, "রাধা নন্দ ঘোষের কন্যা।" হরি বোল হরি, হেসে হেসে মরি। এই সকল বিদ্যা বাহির করিবার

জন্য কি তাঁহাদের ঘাড়ে সময়ে সময়ে ভূত আসিয়া চাপে! তাঁহারা যখন তখন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করেন বলিয়া, ভূতে রাগান্ধ হইয়া তাঁহাদের ঘাড় ভাঙ্গিতে বসে।

লবণাসুর তীব্র শক্তির প্রভাবে কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, "সেন রাজারা বৈদ্য নহেন, কায়স্থ।" পুরাতত্ত্বজ্ঞের অনুসন্ধান, কিছু বলিবার যো নাই। দেশীয় চর্ম্মাবরণে বিলাতি অস্থিমাংশ আবরিত, সুতরাং এবম্প্রকার না হইবার বিষয় কি?

কোন মহাত্মা এদেশীয়দিগের চরিত্র চিত্র করিতে বসিয়া লিখিলেন "মহিষের যেমন শৃঙ্গ থাকিবেই, ব্যাঘ্রের যেমন থাবা থাকিবেই, বাঙ্গালী তেমনি চাতুরী সম্পন্ন হইবে।" তিনি যে সকল উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী ভ্রম দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। "তাঁহার নিজের যেমন লাঙ্গুল থাকিবেই" এ বাক্যটী কেন তিনি আমাদের মাথা খাইতে ভুলিয়া গেলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে এই প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে এমন সকল বিষয় আমাদের ইতিবৃত্ত মধ্যে স্থান পাইবে, যাহা কখনই আমাদের দেশে সংঘটিত হয় নাই। ভবিষ্যতে কি রূপ ইতিহাস হইবে, তাহার একটী নমুনা দিতেছি।—

নর বানরের হাতে মরে চতুর্ম্মুখ!
হনুমান কেড়ে লয় ইন্দ্রের বন্দুক॥
কল্কে ফেটে রক্ত পড়ে কাঁদে কালকেতু।
নলে নীলে বেঁধে গেল কলিকাতার সেতু॥

কে সুন্দর।

"কে সুন্দর, প্রেয়সি! তুমি না আমি?" পাঠক! ক্ষমা করিবেন। লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতেছি যে, একদিন এই বিষয়ে আমার প্রেয়সীর সঙ্গে তর্ক হইয়াছিল। আমিই প্রথমে প্রশ্ন তুলিয়া প্রেয়সীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সুন্দর, প্রেয়সি, তুমি না আমি?" আমার খাতিরেই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, তিনি উত্তর করিলেন, "প্রিয়! আমার চক্ষে তুমিই সুন্দর।" আমি পড়া পাখির মত তাঁহারই কথায় তাঁহাকে উত্তর

করিলাম, বলিলাম, "প্রেয়সি! আমার চক্ষে তুমিই সুন্দরী।"

পাঠক, ! তোমার বিবেচনায় কে সুন্দর? তুমি, না তোমার ভাল বাসা? পুরুষ পাঠক, তোমার বিবেচনায় কে সুন্দর, তুমি না তোমার প্রেয়সী? সুন্দরী পাঠিকা, তোমার বিবেচনায় কে সুন্দর, তুমি না তোমার প্রিয়-জন?

সুন্দরীই সুন্দর কি সুন্দরই সু-ন্দর এ বিষয়ে মনুষ্যসমাজে মতভেদ আছে। এক্ষণকার পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ২ পুরুষকেই অধিক সুন্দর বলেন। তাহার কারণও দেখান; বলেন, পুরুষের সৌন্দর্য্য অধিক দিন স্থায়ী; পশু পক্ষিগণের মধ্যেও পুংজাতি অধিক সুন্দর; তাহার সাক্ষী কুক্কুট কুক্কুটী, ময়ূর ময়ূরী, বৃষ গাভী, সিংহ সিংহী ইত্যাদি। তাঁহারা আরো বলেন, বিধাতা পুরুষজাতিকে অধিক সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমরা ঐ বিষয়ে আপনাদের মত বলিতেছি। আমাদের মত এই, স্ত্রী জাতির দৃষ্টিতে পুংজাতি ও পুংজা-তির দৃষ্টিতে স্ত্রী জাতি অধিক সুন্দর বা সুন্দরী। আমার প্রেয়সী যে বলি-য়াছিলেন, "প্রিয়, ! আমার চক্ষে তুমিই সুন্দর?" তাহার অর্থ এই, তিনি আমাকে ভাল বাসেন। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহাতে দোষ খুঁজিয়া পায় না। ভালবাসার চক্ষে সকলই সুন্দর। শশিতে কলঙ্ক আছে, তুমি বল; কিন্তু কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, সে বলিবে ঐ কালো দাগটী না থাকিলে চন্দ্রকে বড় বিশ্রী দেখা-ইত। আমি যে আমার প্রেয়সীকে বলিয়াছিলাম, "প্রেয়সি! আমার চক্ষে তুমিই সুন্দরী" তাহারও কারণ ঐ। তুমি বলিয়া থাক যে, কমলের কণ্টক বড় অসুখকর। কিন্তু কমলিনীপ্রাণ দি-বাকর তাহা বলেন না। তুমি বল যে, রামতনু বাবুর স্ত্রীর চক্ষু দুটী নিতান্ত ছোট, কিন্তু রামতনু বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, "তাঁহার ভার্য্যার নয়ন যুগল দেখিয়াই ঈর্ষ্যাবশত হরিণী বনবাসিনী হইয়াছে।" তোমার বিবে-চনায় হরিবাবুর ভার্য্যা বিশুদ্ধ গৌ-রবর্ণা নহেন; কিন্তু হরিবাবু বলেন, "তাঁহার প্রেয়সীর বর্ণভাতি দেখিয়াই সৌদামিনী ক্ষণস্থায়িনী হইয়াছে।" হে সুন্দরী পাঠিকা! তুমি বলিয়া থাক, কামিনীর স্বামীর গাত্রের স্বেদবিন্দু সংগ্রহ করিলে ইংরাজি কালি প্রস্তুত হয়। কিন্তু কামিনী কেন যে এমন কৃষ্ণকায় স্বামীর প্রেমের এত বশী-ভূতা, তা সেই জানে। তুমি যাকে ভাল বাস, তোমার চক্ষে সেই সুন্দর। কেন যে নগনন্দিনী স্রোতস্বতী দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া সাগরের অন্বেষণ করে, তা তুমি কি জানিবে! যে সাগ-

র কল্লোল শুনিলে তোমার অন্তরাত্মা উড়িয়া যায়, নদী অকাতরে তাহাকে আলিঙ্গন করে। কণ্টকময় বৃক্ষে কি লতা বলম্বন দৃষ্টি কর নাই? কাঠুরিয়া কুঠ-রাঘাতে ক্রমে২ সে বৃক্ষকে ভূপতিত করে, তবু লতা তাহাকে ত্যাগ করে না; বৃক্ষের সহিত, সে কালের হিন্দু সতীদের ন্যায়, আপনিও প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু কেন যে লতা ওরূপ করে, তাহার কারণ তুমি জান না। বাসুকার পৃথিবীর প্রতি ভাল বাসার কথা শুনিলে তুমি হাসিবে। বাসুকী পৃথ-বীকে এত ভালবাসে যে, এত কাল বসুধাকে মস্তকে করিয়া বহিতেছে। বাসুকীর চক্ষে বসুধা কেন যে এত সুন্দরী, তা তুমি জান না। এক্ষণকার কোন সুন্দরা রূপে গুণে পার্ব্বতীর ন্যায় হইয়া মাতাল শিরোমণি মহা-দেবকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন? রমণীরা পুরুষের গুণ আর ধন খুজেন। শিবের কিছিল? শিব দরিদ্র হইয়াও ভগবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ ছিল, কেন না পার্ব্বতী সুন্দরী ছিলেন। সুন্দরী রমণীর পাণি-গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? কিন্তু পা-র্ব্বতী কি প্রকার সুন্দরী ছিলেন? আমরা আসল পার্ব্বতী দেখি নাই—নকল পার্ব্বতী অনেক দেখিয়াছি। পার্ব্বতীর চক্ষু ছিল তিনটী, হস্ত দশটী, আমরা দশহস্ত বিশিষ্টা ত্রিনয়না কোন সজীব সুন্দরী দেখি নাই, সুতরাং দশ হাতে ও তিন চক্ষে কেমন সুন্দর দেখায়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পার্ব্বতীর যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করা হয়, তাহা অতি সুন্দর, তথাপি যে স্ত্রী লোকের দুই চক্ষের চোখ্‌রাঙ্গানি খা-ইলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কোন্ আধু-নিক বাঙ্গালী সাহস করিয়া তিন চখো মেয়ে বিবাহ করিত? আর দেখ, বাঙ্গালী, দাস্যবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ভার্য্যার দুই হাতের গহনা যোগাইতে সর্ব্বস্ব যায়, অতএব এক্ষণকার কোন্ বাঙ্গালী দশভুজা মেয়ে বিবাহ করিত! কিন্তু মহাদেব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁ-হার দৃষ্টিতে ভগবতী নির্দ্দোষ সুন্দরী ছিলেন, কেননা চন্দ্রশেখর পার্ব্বতীকে ভাল বাসিয়াছিলেন। ভগবতী মহা-দেবকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন। সে-কালে স্বামী স্ত্রীতে ঐ প্রকার ভক্তি ভাব ছিল। ইংরাজ রমণীরা স্বামীকে বন্ধুবৎ জ্ঞান করেন, আর আধ ইংরাজ ও আধ বাঙ্গালী মতে আধুনিক বঙ্গ-বাসীরা স্বামীকে অনুগত দাসবৎ জ্ঞান করেন। অনেক বাঙ্গালী কোন্‌তের শিষ্য, তাঁহাদের ভার্য্যারা আপনাদি-গকে দেবতা ও স্বামিদিগকে স্ব স্ব উপাসক জ্ঞান করেন। কিন্তু অগ্রেই বলিয়াছি, পার্ব্বতী মহাদেবকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন, এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালী

সুন্দরীরা যেমন স্বামিমুখে আখ্যায়িকা বা নাটক পাঠ শ্রবণ করেন, তদ্রূপ তিনি হরমুখে পরমার্থ কথা শুনিতেন। পার্ব্বতীর চক্ষে সুরাপান, জনিত শোণিতাক্ষ, হাড়মালা বিভূষিত, ভস্মাঙ্গ মহাদেব বড় সুন্দর ছিলেন; আর মহাদেবের চক্ষেও ত্রিনয়না, দশভুজা, সিংহবাহিনী বড় সুন্দরী ছিলেন। কেবল অকৃত্রিম ভালবাসা এ সৌন্দর্য্য জ্ঞানের মূল।

সৌন্দর্য্য কাহাকে বল?—তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ বর্ণভাতি হইলেই কি সুন্দর হয়? আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নযুগল হইলেই কি সুন্দর হয়? শারদীয় পূর্ণশশধর তুল্য উজ্জ্বল ও প্রশস্ত ললাটদেশ হইলেই কি সুন্দর হয়? তিলফুল সদৃশ নাসিকা হইলেই কি সুন্দর হয়? কলিকাতার সুবর্ণ বণিক বালকদের ন্যায় অলক্ত-রঞ্জিত ওষ্ঠ যুগল হইলেই কি সুন্দর হয়? শ্বেত মারবল সদৃশ হংসগ্রীবা হইলেই কি সুন্দর হয়? বিলাতী বিবিদের গৌনের ন্যায় ধরণী-বিলুণ্ঠিত কেশ-রাজি হইলেই কি সুন্দর হয়? পদ্মমৃণালবৎ সুগোল বাহু যুগল হইলেই কি সুন্দর হয়? চম্পক কলিকাতুল্য হস্তাঙ্গুলি হইলেই কি সুন্দর হয়? খঞ্জনবৎ সুচঞ্চল নয়ন হইলেই কি সুন্দর হয়? গজেন্দ্র সদৃশ গমন হইলেই কি সুন্দর হয়? অজাধরোষ্ঠ শোভিত শ্মশ্রু সদৃশ শ্মশ্রু হইলেই কি সুন্দর হয়? তুমি যদি এই সকলকে সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া থাক, তবে প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি, তাহা তুমি জান না। হে সুন্দরি! তুমি যদি এই সকল লক্ষণ দেখিয়া স্বামী মনোনীত কর, তবে নিতান্ত ঠকিবে। হে যুবক! তুমি যদি এই সকল লক্ষণ দেখিয়া কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হও, তবে জানিব যে, তুমি কেবল স্ত্রীপদার্থ ভালবাস। ইহাকে সৌন্দর্য্য বলে না। সৌন্দর্য্য কেবল শরীরে নহে, আসল সৌন্দর্য্য হৃদয়ে। যাহার হৃদয়গত মাহাত্ম্য দেহলাবণ্যে প্রকাশ, যাহার আন্তরিক সরলতা মুখাকৃতিতে প্রকাশ, যাহার আন্তরিক বিশুদ্ধতা শরীরে প্রকাশ, তাহাকে বলি সুন্দর। রেবেকা রেওয়েনা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী ছিলেন, কিসে? কেবল শরীরে নহে; শরীরে ও হৃদয়ে উভয়ে। স্কটলণ্ডের রাণী মেরিকে সুন্দরী বলি না, কেননা তিনি কেবল বাহ্যে সুন্দরী ছিলেন, অন্তরে নহে। সীতা সুন্দরী ছিলেন, কিসে? বাহ্যে ও অন্তরে উভয়ে। শারীরিক সৌন্দর্য্য ও বাহ্যিক অসৌন্দর্য্যের উপমা স্থলে আমাদের দেশের লোকেরা মাকাল ফলের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন। মধুসূদন শারীরিক সুন্দর কিন্তু অধর্ম্ম পথগামিনী স্ত্রীলোকের সহিত বিষধর সর্পের তুলনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন,—

"—মেরে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম্মপথ ভুলে।"

তবে সৌন্দর্য্য কেবল শরীরে নহে; প্রকৃত সৌন্দর্য্য হৃদয়ে। যাহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের সহিত আন্তরিক সৌন্দর্য্যের ঐক্য আছে, সেই সুন্দর।

কেহ২ বলেন, স্ত্রী জাতির সৌন্দর্য্য অল্পকাল স্থায়ী। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পুরুষের সৌন্দর্য্য কতকাল থাকে?

পুরুষেরই হউক, আর স্ত্রী লোকেরই হউক, বাল্যে এক সৌন্দর্য্য, যৌবনে এক সৌন্দর্য্য, পরিণত বয়সে আর এক সৌন্দর্য্য। বয়োধিক্য সহকারে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ও আন্তরিক বৃত্তি সমূহের যে প্রকার পরিবর্ত্ত সংঘটিত হয়, সৌন্দর্য্যেরও তেমনি পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। বাল্য কালে কামিনীর উদরটী নবনীতপল্লিবনীর জগদম্বার ন্যায় ঢক্কাকার ছিল, যৌবনে সেই উদরের স্থূলতা বক্ষস্থল ও ঊরু যুগল ভাগ করিয়া লইয়া কটিদেশের ক্ষীণতা সম্পাদন করিয়াছে। বাল্যে কামিনী সরলা, অবোধ বালিকা ছিল, যৌবনের আবির্ভাবে নবলাবণ্যের সহিত তাহার সমস্ত অবয়বে লজ্জা আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বালিকা কামিনী একদিকে অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিয়া থাকিত, এখন মন চাহে, কিন্তু লজ্জা তাহা করিতে দেয় না, তাহার দৃষ্টি কেবল পৃথিবীর দিকে, যেন পৃথিবী আপন মাধ্যাকর্ষণ শক্তিগুণে তাহার নয়নের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। পরিণত বয়সে সেই কামিনীর প্রতিদৃষ্টি কর। বয়ঃগুণে তাহার আকৃতির অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে—তাহার যৌবন সুলভ স্বতঃজাত সাহঙ্কার ভাব মাধুর্য্যে পরিণত হইয়াছে; সাংসারিক বিষয়ে উদাসীনা যুবতী কামিনী এখন গৃহিণী হইয়াছে; কেবল পতিসুখ সম্পাদন যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সে পুত্র কন্যা প্রভৃতি পাঁচ জন লইয়া ব্যস্ত; আপনার বেশভূষা সম্পাদন যাহার প্রধান কার্য্য ছিল, সে এখন পুত্র কন্যার বেশভূষা সম্পাদনে ব্যস্ত; কামিনী যৌবনে যে সকল অলঙ্কার সঞ্চয় করিয়াছিল, এখন গৃহিণী হইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া গহনা গড়াইয়া পুত্র কন্যাকে সাজাইতেছে; কামিনী এখন পরের সুখসাধনে ব্যস্ত, পরকে সাজাইতে ব্যস্ত, আর আপনার সুখ চাহে না। স্বামীর বিরষ বদন দেখিলে যে কামিনীর আন্তরিক গাঢ় চিন্তায় ললাট দেশ ঘামিত, এখন পীড়িত পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া প্রাণসম পুত্রের শুষ্কমুখ দেখিয়া সেই কামিনীর ললাট দেশ বহিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম পড়িতেছে। কামিনী এখন কেবল পতি সোহাগিনী যুবতী ভার্য্যা নহে, কামিনী এখন গৃ-

হিণী ; কামিনী এখন জননী ; কামিনীকে এখন কেবল পতির ভাবনা ভাবিতে হয় না ; আর পাঁচ জনের ভাবনা ভাবিতে হয়। বয়ঃগুণে স্ত্রীলোকের এই এক সৌন্দর্য্য। এই বাহ্য অবয়বের সহিত আন্তরিক গুণের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া ইহাকে সৌন্দর্য্য বলিলাম। অতএব স্ত্রী সৌন্দর্য্য অল্পকাল মাত্র স্থায়ী নহে ; আমরা ইহাকে পরিবর্ত্ত সৌন্দর্য্য কহি, সৌন্দর্য্যের অবনতি কহি না। যাঁহারা বলেন, কুড়ি হইলে স্ত্রী লোক বুড়ী হয়, তাঁহাদিগকে বলিয়া রাখি যে, এই সময়ে স্ত্রীপুরুষে ভালবাসা দৃঢ়তর হয় ; নানা বন্ধনে ভালবাসা বাঁধা পড়ে ; ভালবাসার বন্ধন অকাট্য হয়।

অতএব আমাদের মতে পুরুষের দৃষ্টিতে স্ত্রী সুন্দরী ও স্ত্রীর দৃষ্টিতে পুরুষ সুন্দর।

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এতক্ষণ যোগের সামান্য প্রকরণ বিষয়ে বলা হইল ; অতঃপর যোগের বিশেষ বিশেষ প্রকরণ সকলের বিষয় পর্য্যালোচিত হইতেছে।

পাতঞ্জল মতে অন্তঃকরণে যাহাতে ক্লেশের বিন্দুমাত্রও থাকিতে না পায়, এরূপ উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। ক্লেশের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক নিবৃত্তিই চরম পুরুষার্থ। ক্লেশের কেবল শাখা প্রশাখা কর্ত্তন করিলে হইবে না, ক্লেশের একেবারেই মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। ক্লেশের মূল কি ? না, অবিদ্যা। অবিদ্যাকে উচ্ছেদ করিতে পারিলেই ক্লেশ সমূলে উন্মূলিত হয়। কি রূপে অবিদ্যাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে ? বিবেক দ্বারা প্রজ্ঞাকে পরিস্ফুট করিতে পারিলেই অবিদ্যা দূরীভূত হয়। কি রূপে বিবেক লব্ধ হইতে পারে ? না। অষ্ট প্রকার যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা বিবেক আবির্ভূত হয়।

ক্লেশ পাঁচ প্রকার। "অবিদ্যাস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ" অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। অবিদ্যা কি ?— "অনিত্যাশুচি দুঃখানাত্মসুনিত্য শুচিসুখাত্ম খ্যাতিরবিদ্যা।" অনিত্যকে নিত্য বলিয়া জানা, অশুচিকে শুচি বলিয়া জানা, দুঃখকে সুখ বলিয়া জানা এবং অনাত্মাকে অর্থাৎ জড়-

বস্তুকে আত্মা বলিয়া জানা, ইহার নাম অবিদ্যা। অস্মিতা কি?—"দৃক্ দর্শন শক্ত্যো রেকাত্মতৈব অস্মিতা।" দৃক্ শক্তি এবং দর্শন শক্তি অর্থাৎ আত্মা এবং মনোবৃত্তি এই দুই বিভিন্ন বস্তুকে একই বস্তু মনে করাই অস্মিতা। অর্থাৎ মনোবৃত্তি. রাগ দ্বেষাদি দ্বারা, বিচলিত হইলে আত্মা বিচলিত হইতেছে এই রূপ মনে করা, অথবা আত্মার অধিষ্ঠান বিস্মৃত হইয়া মনোবৃত্তিকে আমি বলিয়া মনে করা, এই রূপে পরস্পরকে পরস্পরের স্থলে অভিষিক্ত করাকেই অস্মিতা কহে। রাগ কি?—"সুখানুশায়ী রাগঃ।" সুখসাধক বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত ভাবকেই রাগ কহা যায়। দ্বেষ কি?—"দুঃখানুশায়ী দ্বেষঃ।" দুঃখসাধক বিষয়ের প্রতি বিরক্ত ভাবকেই দ্বেষ কহা যায়। অভিনিবেশ কি?— "স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তন্বনুবন্ধোঽভিনিবেশঃ"। আবহমান সংস্কার জনিত শরীরের প্রতি যে এক মনের টান, যাহা হইতে বিদ্বান্ ব্যক্তিও নিস্তার পান না, তাহাকেই অভিনিবেশ কহে। এই যে পাঁচ প্রকার ক্লেশ ব্যাখ্যাত হইল—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, ইহার মধ্যে "অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং" অবিদ্যাই অপর চারিটির ক্ষেত্রস্বরূপ; অর্থাৎ অবিদ্যা হইতেই অস্মিতা রাগ দ্বেষ এবং অভিনিবেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানা, অবিদ্যা; মনোবৃত্তিকে আত্মা বলিয়া জানা অস্মিতা। প্রথমটি হইতে যে দ্বিতীয়টি অনুসৃত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। মনোবৃত্তিকে আমি বলিয়া স্বীকার না করিলে রাগ, দ্বেষ, দেহাভিমান, কিছুই থাকিতে পারে না; অতএব অবিদ্যা যেমন অস্মিতার মূল, অস্মিতাও সেইরূপ রাগ দ্বেষ এবং অভিনিবেশের মূল। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানা যে অবিদ্যা তাহাই সমুদায় ক্লেশের মূল। কথিত রূপ অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশের প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য এ জন্য উক্ত হইয়াছে যে. "হেয়ং দুঃখমনাগতং।" ভাবি দুঃখের প্রতীকার করিবে, অর্থাৎ যে দুঃখ অতীত হইয়াছে তাহা হইয়াছে, ভবিষ্যতে আর যাহাতে দুঃখ আসিতে না পারে তাহার জন্য উপায় অবলম্বন করিবে। দুঃখের হেতু কি? না, "দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয় হেতুঃ।" দ্রষ্টা আত্মা এবং দৃশ্য বিষয় এ দুয়ের যে সংযোগ তাহাই ভাবি দুঃখের কারণ। আত্মা এবং বিষয় এ দুইকে পৃথক্ করিতে পারিলেই ভাবি দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে। দৃশ্য বিষয় কিরূপ? না, প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতি শীলং। প্রকাশগুণ, চেষ্টা গুণ এবং জড়তাগুণ, এই তিন

প্রকার গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক; "ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং" ইন্দ্রিয়ের বিষয় পঞ্চভূত এবং মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমস্ত উভয় সম্বলিত। দৃশ্য বিষয়ের প্রয়োজন কি? না, "ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যং।" দ্রষ্টা যে পুরুষ তাঁহারই ভোগ এবং মুক্তির নিমিত্তে দৃশ্য বিষয় সকল প্রয়োজনীয়। দ্রষ্টা কিরূপ? না, "দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" দ্রষ্টা নিজে বিশুদ্ধ চেতন মাত্র হইয়াও বিষয় কলুষিত বুদ্ধিকে অব্যবহিত রূপে দর্শন করেন। আত্মা মুখ্য রূপে বুদ্ধিকেই বিষয়রূপে গ্রহণ করেন, এবং বুদ্ধিতে যে হেতু বহির্বিষয় সকল প্রতিবিম্বিত হয়, এজন্য বুদ্ধির আনুষঙ্গিকরূপে বহির্বস্তু সকলকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই দুইটি কথা এক কথায় বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে যে, দ্রষ্টা কিনা আত্মা, প্রত্যয়কে কিনা বিষয়োপরক্ত বুদ্ধিকে অব্যবহিতরূপে দর্শন করেন। "তদর্থ এব দৃশ্যাত্মা" দৃশ্যস্বরূপ বিষয় সকল আত্মারই জন্য। 'তস্য পুরুষস্য ভোক্তৃত্ব সম্পাদনং নাম স্বার্থ-পরিহারেণ প্রয়োজনং;" অর্থাৎ দৃশ্য বিষয়ের নিজের কোন স্বার্থ নাই। কেবল পুরুষের ভোগ সাধন এবং মুক্তিসাধন করাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। "নহি প্রধানং প্রবর্ত্তমানং আত্মনঃ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং অপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে" প্রকৃতি আপনার কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না কিন্তু "পুরুষস্য ভোগং সম্পাদয়ামীতি," পুরুষের ভোগ সম্পাদন করিব এই বলিয়াই প্রকৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। "স্ব স্বামি শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধি হেতু সংযোগঃ" স্বশক্তি কিনা, প্রকৃতির নিজশক্তি স্বামি শক্তি কিনা, দ্রষ্টার শক্তি উভয়ের স্বরূপ উপলব্ধি হেতু উভয়ের সংযোগ, অর্থাৎ দৃশ্য বিষয় ভোগ্য স্বরূপ, দ্রষ্টা আত্মা ভোক্তৃ স্বরূপ এইরূপ উভয়ের স্বরূপ উপলব্ধির জন্যই উভয়ের সংযোগ হইয়াছে। 'তস্য হেতুরবিদ্যা' অবিদ্যাই উক্তরূপ সংযোগের হেতু। অতএব অবিদ্যাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যত্ন করিবে। প্রথমে বলা হইয়াছে ভাবি দুঃখের প্রতিবিধান করিবে, পরে বলা হইয়াছে দ্রষ্টা আত্মা এবং দৃশ্যবিষয় উভয়ের সংযোগই দুঃখের মূল, এক্ষণে বলা হইতেছে যে অবিদ্যাই উক্ত রূপ সংযোগের মূল, অতএব অবিদ্যা উচ্ছেদ করিলেই ভাবি দুঃখের মূলচ্ছেদ করা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যা বশতঃ আমরা যতক্ষণ বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া অর্থাৎ আমি বলিয়া স্বীকার করি, ততক্ষণ বুদ্ধিতে যে কিছু সুখ দুঃখ উপস্থিত হয় তাহা আমার সুখ দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করিতে কাযে

কাযেই বাধ্য হই। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে অবিদ্যার প্রভাবেই আমি আপনাকে সুখ দুঃখ মোহের ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করি এবং সুখ দুঃখের মোহাত্মক বিষয় সকলকে ভোগ্য বলিয়া উপলব্ধি করি। এই রূপে আত্মা এবং বিষয়ের মধ্যে একটা অকাট্য যোগ নিবদ্ধ হইয়া যায়। "তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হ্বানং তৎদৃশেঃ কৈবল্যং" অবিদ্যার অভাব হইলেই সংযোগের অভাব হয় এবং আত্মার কৈবল্য লাভ হয়। কি উপায়ে অবিদ্যাকে দূর করা যায়? না, "বিবেক খ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ" নিরবচ্ছিন্ন বিবেকই অবিদ্যানাশের উপায়। পুরুষ স্বতন্ত্র এবং সুখ দুঃখাদির গুণ স্বতন্ত্র এই রূপ আত্মাকে বিষয় হইতে পৃথক্ করাকে বিবেক কহে। "তস্য সপ্তধা প্রান্ত ভূমৌ প্রজ্ঞা" কথিত রূপ বিবেক যাঁহাতে বর্ত্তিয়াছে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রান্ত ভূমিতে সপ্ত প্রকার হয়। প্রান্ত ভূমিতে অর্থাৎ "সকল সাবলম্বন সমাধি ভূমি পর্য্যন্তং" অর্থাৎ সংপ্রজ্ঞাত সমাধির চরম সীমা পর্য্যন্ত। তাহার মধ্যে প্রথম চারি প্রকার প্রজ্ঞা কার্য্য-বিমুক্তিরূপ। প্রথম প্রকার প্রজ্ঞা এই যে, "জ্ঞাতং ময়া জ্ঞেয়ং" জ্ঞেয় বিষয় আমার জানা হইয়াছে; দ্বিতীয় প্রকার প্রজ্ঞা এই,—জানিবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; তৃতীয় প্রকার প্রজ্ঞা এই যে, আমার ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; চতুর্থ প্রকার প্রজ্ঞা এই যে, আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি, আমি বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছি। এইচারি প্রকার প্রজ্ঞা কার্য্য বিমুক্তি রূপ অর্থাৎ বাহ্য বিষয় সকল জ্ঞান হইতে উক্ত চারি প্রকারে বিরত হয়। পঞ্চম প্রকার প্রজ্ঞা এই যে, আমার বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়াছে; অর্থাৎ বুদ্ধির উদ্দেশ্য যে আমার ভোগ সাধন তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। ষষ্ঠ প্রকার প্রজ্ঞা এই যে, গুণ সকল অধিকার ভ্রষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ আমার উপর সুখ দুঃখ মোহাত্মক ত্রিগুণের এখন আর কোন অধিকার নাই; গিরিশিখর ভ্রষ্ট শৈলখণ্ডের ন্যায় গুণ সকল পুনরায় আর স্বস্থানে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না। এবং অবিদ্যা রূপ মূলকারণ যখন আর নাই, এবং আত্মার ভোগ সমাপ্ত হওয়াতে যোগ্য বিষয়ের যখন আর প্রয়োজন নাই, তখন প্রলয়োন্মুখ গুণ সকল কি রূপেই বা এবং কেনই বা অঙ্কুরিত হইবে। সপ্তম প্রকার প্রজ্ঞা এই যে, আমার সমাধি আত্মনিষ্ঠ হইয়াছে, আমি আত্ম স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। যাহা বলা হইল তাহা এই যে, বিবেক দ্বারা আত্মা এবং গুণত্রয় পরস্পর হইতে পৃথক্কৃত হইলে, অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, সম্প্র-

জ্ঞাত সমাধির প্রান্ত ভূমিতে কথিত সপ্তপ্রকার প্রজ্ঞা পরিস্ফুট হয়। কি রূপে অনুষ্ঠান দ্বারা বিবেক উৎপন্ন হইতে পারে? না, "যোগাঙ্গানুষ্ঠানা দশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞান দীপ্তি বা বিবেক খ্যাতিঃ" যোগাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে বিবেকোদয় পর্য্যন্ত জ্ঞানের দীপ্তি হয়। যোগাঙ্গ কি কি? না, "যম নিয়মাসন প্রাণা-য়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়ো-ঽষ্টাবঙ্গাদি। যম, নিয়ম, আসন, প্রা-ণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমা-ধি, এই আটটি যোগাঙ্গ বলিয়া উক্ত হয়। যম কি? "অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্র-হ্মচর্য্যা পরিগ্রহাঃ যমঃ" অহিংসা, সত্য-কথন, অস্তেয় (অর্থাৎ পরধন অপহরণ না করা) ব্রহ্মচর্য্য আর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, অপরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগ সাধন বিষয় সকল অস্বীকার করা, এই পাঁচটি যম শব্দে উক্ত হয়। "এতে জাতি দেশ কাল সময়া নবচ্ছিন্নাং সার্ব্বভৌম মহাব্রতং"-এই গুলি যাহা বলা হইল অর্থাৎ অহিংসা, সত্য-কথন, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এগুলি জাতি দেশকাল কর্ত্তৃক অবচ্ছিন্ন নহে, এগুলি সার্ব্বলৌকিক মহাব্রত অর্থাৎ হিংসা না করা, সত্য কহা, চৌর্য্য না করা, ইন্দ্রিয় সংযম করা এবং ভোগসাধন বস্তু সকল অস্বীকার করা, এই যে কয়টি মহাব্রত যাহা যম শব্দে উক্ত হইয়াছে তাহাকে জাতি বিচার করিবে না ও দেশকাল বিচার করিবেনা, উহাদিগকে সার্ব্বলৌকিক বলিয়া জানিবে। নিয়ম কি? না 'শৌচ সন্তোষতপঃ স্বাধ্যা-য়েশ্বর প্রণিধানানি।" শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা ওঙ্কার প্রভৃতি মন্ত্রের জপ এবং ঈশ্বর প্রণিধান এই কয়টি কার্য্য নিয়ম শব্দে উক্ত হয়। আসন কি? না 'স্থির সুখ মাসনং' যাহাতে শরীরের স্থিরতা এবং সচ্ছন্দতা হয় তাহাই আসন। 'তদ্‌যথা স্থিরং নিষ্কম্পং, সুখং অনুদ্বেজনীয়ং ভবতি তদ্‌যোগা-ঙ্গতাং ভজতে,' যখন আসন স্থির এবং নিষ্কম্প এবং সচ্ছন্দ কিনা উদ্বেগ রহিত, তখন তাহা যোগাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। যোগের আসন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। যোগাসন চতুরশীতি প্রকার, অর্থাৎ চৌরাশি প্রকার। তাহার মধ্যে কোন মতে পদ্মাসন, কোন মতে সিদ্ধাসন সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দত্তাত্রেয় সংহিতা যাহা যোগশাস্ত্রের একটি প্রধান গ্রন্থ তাহাতে পদ্মাসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গোরক্ষ সংহিতাতে পদ্মাসন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—

" বামোরূপরিদক্ষিণং হি চরণং,
　　সংস্থাপ্য বামং তথা
প্যান্যোরূপরি তস্য বন্ধন বিধৌ ধৃত্বা
　　করাভ্যাং দৃঢ়ং।

অঙ্গুষ্ঠং হৃদয়ে বিধায় চিবুকং
নাশাগ্রমালোকয়েৎ।
এতদ্ব্যাধি বিনাশকারি যতিনাং
পদ্মাসনং প্রোচ্যতে”

বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদ এবং এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম পদ সংস্থাপন করত এবং পৃষ্ঠদেশ দিয়া দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ট দৃঢ়রূপে ধারণ করত ও উক্ত রূপে বাম হস্ত বাড়াইয়া বাম পদের অঙ্গুষ্ট দৃঢ়রূপে ধারণ করত, এবং বক্ষ দেশে চিবুক সংস্থাপন পূর্ব্বক নাশিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিবে। যতিদিগের এই আসন ব্যাধি বিনাশক পদ্মাসন শব্দে উক্ত হয়। হঠ প্রদীপিকা গ্রন্থে সিদ্ধাসন শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পদ্মাসনে যেমন বক্ষে চিবুক সংস্থাপন পূর্ব্বক নাশিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিবার বিধি আছে, সিদ্ধাসনে সেই রূপ বক্ষোপরি চিবুক স্থাপন করত ভ্রূর মধ্যভাগ দৃষ্টি করিবার উপদেশ আছে। অবশিষ্ট-অংশে পদ্মাসন হইতে সিদ্ধাসন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পাতঞ্জলের পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা কথিত প্রকার কষ্ট সাধ্য আসন বিধির বাহুল্য করিয়াছেন। কিন্তু পাতঞ্জলের মূলগ্রন্থে তাহাকেই যোগাসন বলে, যাহাতে শরীরের স্থিরতা এবং সচ্ছন্দতা হয়। ভগবদ্গীতাতে যোগাসনের এই রূপ একটি সহজ প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে ;—

শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ
উপবেশ্যাসনেযুঞ্জ্যাৎযোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাশিকাগ্রংস্বংদিশশ্চানবলোকয়ন্
প্রশান্তাত্মা বিগতভী ব্রহ্মচারি ব্রতেস্থিতঃ
মনঃসংযম্য মচ্চিত্তো যুক্তআসীত মৎপরঃ।

অর্থাৎ শুচিদেশে, অতি উচ্চও না হয় অতি নীচও না হয় এই রূপ এক আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রথমে কুশাসন। তাহার উপর ব্যাঘ্র চর্ম্মাদি। তাহার উপর চৈল বস্ত্র অর্থাৎ চেলির কাপড় উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত করত একাগ্রচিত্ত হইয়া এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া সকলকেই সংযত করিয়া আসনে উপবেশন করত আত্মাবিশুদ্ধির নিমিত্ত যোগ করিবে। স্থির হইয়া কায়া মস্তক এবং গ্রীবাদেশ সমান রূপে এবং অটল রূপে ধারণ করত নাশিকার অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, দিক্ বিদিক্ অবলোকন না করিয়া, প্রশান্তাত্মা ভয় রহিত ও ব্রহ্মব্রতে অবস্থিত হইয়া, মনঃ সংযম করিয়া, সচিত্ত এবং মৎপর হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বর গত চিত্ত এবং ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া, যোগে আসীন হইবে। উপরে যে উক্ত হইয়াছে, প্রথমে কুশাসন, তাহার উপরে ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি, তাহার উপর চৈল বস্ত্র বিন্যস্ত করিয়া আস-

ন প্রস্তুত করিবে। ইহার বোধ করি কোন গূঢ় অর্থ থাকিবে। তাড়িতবেত্তা পণ্ডিতেরা হয়ত অনুসন্ধান দ্বারা, শরীরের সচ্ছন্দতার সহিত উক্ত রূপ আসনের উপযোগিতা সপ্রমাণ করিতে পারেন। কেন না চৈল বস্ত্র এবং পশুলোম তাড়িত ঘটিত ব্যাপারে প্রায়শই আবশ্যক হইতে দেখা গিয়া থাকে; কুশও হয়ত সেইরূপ কোন তাড়িত উপকরণ হইবে ইহা অনুমান সঙ্গত। পাতঞ্জলের পূর্ব্ববর্ত্তী উপনিষদাদি গ্রন্থের যোগাসন বিধি আরও সহজ এবং স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়ানি মনসা সন্নিবেশ্য ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বানি ভয়াবহানি।" বক্ষ গ্রীবা এবং শিরোদেশ উন্নত করিয়া মন এবং ইন্দ্রিয় সকল হৃদয়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেলা দ্বারা সংসারের ভয়াবহ স্রোত সকল অতিক্রমণ করিবে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বক্ষ,গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করিয়া সুস্থির, সহজ ও সচ্ছন্দ ভাবে উপবেশন করাই যোগাসন বিধির প্রকৃত মর্ম্ম। তবে যে নানা প্রকার আসন, গ্রন্থ বিশেষে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ব্যাধি বিশেষের প্রতিকার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। যথা;—পদ্মাসন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "এতদ্ব্যাধি বিনাশ কারি যতিনাং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে" এই যে পদ্মাসন ইহা যতিদিগের ব্যাধিবিনাশক বলিয়া উক্ত হয়। যোগাসনের মর্ম্ম এইরূপ বোধ হয়, যে তদ্দ্বারা মাংসপেশী ব্যায়ত হয়, এবং তৎপ্রযুক্ত হস্তপদাদি সঞ্চালন-ক্রিয়ার ফল প্রকারান্তরে সাধিত হইয়া থাকে। যদি শরীরে কোন ব্যাধি না থাকে, তবে যোগসাধনের জন্য নানারূপ কষ্টসাধ্য আসনের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভগবদ্গীতাতে এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যেরূপ সহজ যোগাসন উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই যোগসাধন পক্ষে যথোচিত উপকারজনক হইতে পারে। সে যাহা হউক, এক্ষণে পাতঞ্জলের মূলগ্রন্থে কিরূপ আসনবিধির ব্যবস্থা আছে দেখা যাউক। পাতঞ্জলের যোগসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যাহাতে স্থিরতা হয় এবং স্বচ্ছন্দতা হয়, তাহাই যোগাসন। কিরূপে আসনের স্থিরতা এবং স্বচ্ছন্দতা হয়? না "প্রযত্ন শৈথিল্যানন্ত্য সমাপত্তিভ্যাং" যত্নের শৈথিল্য দ্বারা এবং আকাশগত অনন্ত ভাবে মনঃ সমর্পণ দ্বারা আসনের স্থিরতা এবং সচ্ছন্দতা সাধিত হইতে পারে। "যদা যদাসনং বধ্নামীতি ইচ্ছাং করোতি প্রযত্ন শৈথিল্যেঽপ্যল্প ক্লেশেনৈব তদাসনং নিষ্পদ্যতে"

যখন যে আসন বন্ধন করিতে ইচ্ছা করা যায়, তখন অক্লেশে সেই আসন নিষ্পাদিত হইলেই প্রযত্নের শৈথিল্য অনুভূত হয়। "যদা আকাশগতে আনন্ত্যে চেতসঃ সমাপত্তি, ক্রিয়তে অবধানেন তাদাত্ম্য মাপদ্যতে তদা দেহাহঙ্কাবান্নাসনং দুঃখজনকং ভবতি" যখন আকাশগত অনন্তভাবে চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া, অনন্ত আকাশের সহিত তাহাকে তন্ময়ভাবে পরিণত করা যায়, তখন দেহাভিমান বিলুপ্ত হওয়াতে আসন দুঃখজনক হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রযত্ন শৈথিল্য দ্বারা আসনের স্থিরতা হয় এবং শেষোক্ত আনন্ত্য সমাপত্তি দ্বারা আসনের দুঃখজনকত্ব নিবারিত হয়। এইরূপে আসনের স্থিরতা এবং স্বচ্ছন্দতা উভয়ই নিষ্পন্ন হয়।

ক্রমশঃ।

কৈরে সে দিন ?

১

কৈরে সুখের শারদ চন্দ্রিমা,
নয়নের প্রীতি সাধিত যখন ?
কৈরে সুখের মানস প্রতিমা,
দরশনে চিত্ত হইত মোহন ?

২

কৈরে হৃদয়ের পবিত্র ভাব
স্বচ্ছ নিরমল সলিল সমান ?,
কেন এ সবের বিপরীত ভাব
দেখিয়া দেখিয়া কাঁদিছে পরাণ ?

৩

কৈরে প্রাণের প্রিয়তম সখা
হৃদয়ের ছায়া পরাণে পরাণ ?
আর কি আর কি এই ভবে দেখা
পাব সে জগত দুর্ল্ভ বয়ান ?

৪

কৈরে সে দিন আনন্দ সাগর
উথলিত যবে প্রণয় হিল্লোলে ;
আছে কি এমন হায় রে ! দুস্তর
বিশাল সংসার জলধি তলে ?

৫

ডাকিতেছে মেঘ ডাকিত যেমন,
বরষিছে তারা বর্ষিত যেমন ;
বহিছে সমীর বহিত যেমন,
কৈরে সে দিন কৈরে এখন ?

৬

ক্ষরিতেছে ভানু ক্ষরিত যেমন
প্রচণ্ড ময়ূখ তাতিয়া ভুবন ;
হাসিতেছে চাঁদ হাসিত যেমন,
কৈরে সে দিন কৈরে এখন ?

৭

মিটি মিটি তারা করিত যেমন,
করিতেছে অই আজও তেমন ;
নাচিছে চপলা নাচিত যেমন,
কৈরে সে দিন কৈরে এখন ?

৮

দুলিতেছে লতা দুলিত যেমন
সোহাগ দোলনে হায় রে সে দিন !
বহিছে তটিনী বহিত যেমন
কৈরে কৈরে কৈরে সে দিন ?

৯

ডাকিত পাখী মধুর স্বরে
যুড়াইত প্রাণ, ডাকিছে তেমন
বাজিতেছে বাঁশী বাজিত যে স্বরে
কৈরে সে দিন কৈরে এখন ?

১০

কে নিল হরিয়া সুখের দিন ?
কে করিল চুরি হৃদয়ের ভাব ?
কে করিল সুখ দুঃখেতে বিলীন ?
কে দিল পুরিয়া হৃদয়ে অভাব ?

১১

আয় রে জগত ! আয় রে দেখি
খুলিয়া বারেক স্মৃতির মুকুর !
দেখিয়া দেখিয়া হৃদয়ে আঁকি
সুখের দিনের আনন্দ মধুর ।

১২

আয় রে চাঁদ ! আয় একবার
নয়ন ভরিয়া করি নিরীক্ষণ :
দেখিলে সুচারু বদন তোমার
সে সুখের দিন হয় কি স্মরণ ?

১৩

আয় উড়ুবালা ! নয়ন ভরিয়া
দেখি একবার যতন করিয়া
সে সুখের দিন আসে কি ফিরিয়া ?
দেখি একবার যতন করিয়া ।

১৪

চমক চপলা ! চমক আবার ?
প্রকাশ হৃদয়ে রূপের ভাতি ;
সুখের দিনের আনন্দের ধার
ঢালিয়া পূর্ণ কর গো স্মৃতি ।

১৫

ডাকরে পাখি ! সুমধুর স্বরে
শ্রবণ ভরিয়া করিব শ্রবণ
ভরিয়া দেখিব যতন করে
সে সুখের দিন হয় কি স্মরণ ?

১৬

বহ সমীরণ স্বন স্বন স্বনে
তরুলতা শীর্ষ করিয়া কম্পণ
জুড়াতে কি পারি তাপিত প্রাণে
সে সুখের দিন করিয়া স্মরণ ?

১৭

এস এস সখা এস একবার
দেখি দুই জনে হৃদয় মিশিয়ে ;
সে সুখের দিন আসে কি আবার
ভাবিয়া দেখিব বিরলে বসিয়ে ।

১৮

দেখি একবার যতন করিয়া
আসে কি আবার সে সুখের দিন ।
বেড়াব আবার আনন্দে ভাসিয়া
সুখের সাগরে হইয়া মীন ।

১৯

বিশাল সাগর অবনিমণ্ডলে
কারে জিজ্ঞাসিব কে আছে এমন ?
কে বলিয়া দিবে মন প্রাণ খুলে ?
"কৈরে সে দিন কৈরে এখন ?"

সিরাজ-উদ্দৌলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হুগলীর কুঠী।—নবাবের আপত্তি।-আপত্তির যৌক্তিকতা।—ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মত।—তাহার প্রতিবাদ।—ইরাংজগণের লক্ষ্য।—তাঁহাদের বাণিজ্যোন্নতি।—নবাবের বিরোধিতা।—যুদ্ধের প্রয়োজন।—নবাব কর্ত্তৃক হুগলীর কুঠী আক্রমণ।—চার্ণকের পলায়ণ।— আওরাঙ্গজেবের দূত।—সন্ধি সংস্থাপন।—উলুবেড়িয়ার ইংরাজগণের ডক্ ও বারুদখানা।—স্থতানুটীতে পরিবর্ত্তন।—তাঁহাদের ব্যবহার।—নবাবের ক্রোধ।—চার্ণকের চাতুর্য্য।—হীথের ব্যবহার।—পুনরায় সন্ধি।—বঙ্গের কয়েকজন রাজার বিদ্রোহ।—আজিমল সাহের আগমন।—ইংরাজগণের, স্থতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার স্বত্ব ক্রয়।—বাণিজ্যের ও কলিকাতার উন্নতি।—নূতন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্ভব।—উভয় কোম্পানীর সম্মিলন।—জাফর খাঁ বঙ্গের নবাব।—তাঁহার অন্যবিধ চেষ্টা।—বাদশাহ ফেরকসিয়ার সমীপে ইংবাজগণের দূত ও উপহার।—ঈপ্সিত আজ্ঞা।—বাণিজ্যের উন্নতি।

ইংলণ্ডীয় বণিক সম্প্রদায় বঙ্গদেশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা হুগলীতে একটী কুঠি সংস্থাপন করিলেন। কুঠী নির্ম্মাণ কালে নবাবের কর্ম্মচারীবর্গ ভবন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাণিজ্যালয় যেরূপ হওয়া আবশ্যক তদ্ব্যতীত অন্যবিধ নির্ম্মাণ সমস্তে আপত্তি করিতে লাগিলেন। এ আপত্তিতে ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ অল্প বা অধিক পরিমাণে নবাবের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে এ ব্যবহারে নবাবের প্রতি দোষ দেওয়া যায় না। কুঠির ছলনায় ইংরাজেরা দুর্গ নির্ম্মানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কোন্ ভূপতি স্বেচ্ছায় স্বীয় রাজ্য মধ্যে অপরকে দুর্গ সংস্থাপনের অনুমতি দিবে? বিশেষতঃ, ইতি পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি অন্য ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় যে যে স্থানে কুঠির ছলনায় দুর্গ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান বা রাজ্য, অর্থবলে বা বাহুবলে, তাঁহারা স্বকীয় অধীন করিয়াছিলেন। কুঠির ছলনায় দুর্গ এবং দুর্গের সাহায্যে রাজ্য অধিকার, এই বণিকগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন্ রাজা বা নবাব এবম্বিধ পরিণাম সমস্ত চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিবিধান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ইংরাজ ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতগণ নবাবের এই ব্যবহারে উপহাস করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বার্থ সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া তাঁহারা বিদ্রূপ করিতে পারেন। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে নবাবকে সমধিক

দোষী বলিয়া বোধ হয় না। আর এক বিষয়ে নবাব গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করেন। ইংরাজেরা আপনাদের কারবার মধ্যে প্রয়োজনাধিক সৈন্য রাখিতে চাহেন। নবাব তাহা রাখিতে দিলেন না। ইংরাজগণ বিশেষতঃ লার্ড মেকলে, গর্ব্বের সহিত বলিয়া থাকেন, কয়েকজন মাত্র ইংরাজ বাণিজ্য অভিপ্রায়ে গমন করিয়া প্রকাণ্ড ভারতবর্ষকে পদাবনত করিল।* আমরা এ কথার এক বিন্দুও অস্বীকার করি না। সুদূরস্থিত, বীচিবিক্ষেপিনী বিপদ সঙ্কুল সাগর বারি ব্যবহিত, অপরিচিত ইংলণ্ডবাসী কয়েকজন ব্যক্তি বাণিজ্যতরি সঙ্গে লইয়া আসিয়া, অনতিকাল মধ্যে, বহুবিধ মানব-নিবাস-ভূমি, সুবিস্তৃত ভারত ভূমির অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন, ইহা নিরতিশয় গর্ব্বের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথমাগমনে না হউক, অন্ততঃ পরে কি ইংরাজগণের মনোমধ্যে, কালে ভারতকে অধিকার করিতে হইবে, এ বাসনা সমুদিত হয় নাই? তাঁহারা কি ভাবেন নাই, ধীরে ধীরে প্রশান্ত ভাবে, অলক্ষিত রূপে অনুষ্ঠাণ করিয়া সমুচিত সময়ে কার্য্য করিলে উদ্দেশ্য সফলিত হইবে? যদি তাহা না ভাবিয়া থাকেন, তবে এ দুর্গ নির্ম্মাণের প্রযত্ন কেন? তবে প্রয়োজনাধিক সৈন্য রাখিবার ইচ্ছা কেন? স্বীকার করুন বা না করুন, ভারত ইংরাজদের অতি উপাদেয় আহার্য্য, এ কথা ইংরাজেরা এখানে পদার্পণ করিয়াই জানিয়াছিলেন। সেই সুখাদ্য অস্বাদনার্থ তাঁহাদের রসনা নিরন্তর লোলুপ ছিল। স্বকীয় লোভ বা দুরভিসন্ধি কে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করিতে চাহে? যে তাহা করে, সে নির্ব্বোধ। ইংরাজগণ তাদৃশ নির্ব্বোধ নহেন। তাঁহারা কেন সে কথা বলিবেন? লার্ড মেকলে যে বুক ফুলাইয়াছেন তাহাও অসঙ্গত নহে। তিনি উত্তম করিয়াছিলেন। সুবিধা পাইলে যশরেণু বিকীর্ণ করিতে চেষ্টা করাই বুদ্ধির কার্য্য। তবে ইতিহাস লিখিতে বসিয়া প্রকৃত কথা গোপন করিতে চেষ্টা করা ভাল নহে। ইংরাজী ইতিহাসের মধ্যে অর্মের ইতিহাস বিশেষ বিখ্যাত। অর্ম প্রকারান্তরে এ কথার আভাস দিয়াছেন।*

যাহা হউক, নবাব ইংরাজদিগের দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে বা সৈন্যবল রাখিতে অনুমতি দিলেন না। অগত্যা

* Macaulay's Essay On Lord clive.

* Ormes Histroy of Military Trasactions of the British Nation in Indostan. Vol. 11 P. 10.

তাঁহারা বাণিজ্য বিষয়েই সমস্ত চিত্ত বিনিযুক্ত করিলেন। বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল। বঙ্গের নবাব বা সুবাদার দেখিলেন যে, এ বাণিজ্যে ইংরাজেরা যে পরিমাণে উপকৃত হইতেছেন, বঙ্গবাসীগণ তত হইতেছে না। আরও দেখিলেন যে, বাণিজ্য ব্যপদেশে তাঁহারা প্রজাগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং নবাব বাণিজ্যে বাধা দিলেন। বউটনকে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত যে সনন্দ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অস্বীকৃত হইল বা, তাহার বিপরীত অর্থ কল্পিত হইল।* অনেক প্রজা কোম্পানীর ঋণজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার নিমিত্ত নবাবের শরণাপন্ন হইল। অনেক আশ্রয়-বিহীন ইংরাজও কোম্পানীর নিয়মের অন্যথা করিয়া আশঙ্কা প্রযুক্ত নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করিল। নবাব অভিযোগ সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাহার বিচার করিতে লাগিলেন। নবাবের আজ্ঞার অন্যথা করিলে তিনি কোম্পানীর বাণিজ্য রহিত করিতে আদেশ করিলেন। এ কার্য্যে নবাবের দোষ কি,তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রাজ্য মধ্যস্থ সকলের ক্লেশ নিবারণ, অপরাধীর দণ্ড প্রদান, গুণের পুরস্কার বিধান প্রভৃতি কার্য্য নবাবের কর্ত্তব্য। নবাব কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার অপরাধ কি?

নবাবের বিরোধে যুদ্ধ করাই সঙ্গত বিবেচিত হইল। ১৬৮৫ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ডেশ্বর ২য় জেম্‌সের সম্মতিক্রমে প্রায় সহস্র সৈন্য সহ দশ খানি রণতরি প্রেরিত হইল। চট্টগ্রাম আক্রমণ করা স্থির হইল। নবাব পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইলেন। তিনিও হুগলীর কুঠী আক্রমণ করিলেন।* কোম্পানীর হুগলীস্থ চানক বা চার্ণক নামক এজেণ্ট, সমরে সুবিধা হইবে না দেখিয়া গঙ্গার তীরস্থ চাউল লবণ প্রভৃতির গোলা সমস্ত ভস্মীভূত করিতে করিতে, নদী মোহানাস্থ ইংজেলী দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রস্থান করিলেন। এই অস্বাস্থ্য কর দ্বীপে তিনি সৈন্য সমস্ত সহ নিবাস সংস্থাপন করিলেন। বলা বাহুল্য রোগে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য জীবন ত্যাগ করিল। অন্য দিকে ইংরাজদিগের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত সুফল প্রসব করিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেব দিল্লী হইতে ইংরাজদিগের বিরোধিতার কারণ জানিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন। নবাবকেও

* Ormes History of Military Transactions of the British Nation in Indostan. Vol. II.

* Taylor's Manual of Indian History. P. 393.

Orme's Indostan. Vol. II.

ক্ষান্ত হইতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। অতি সুসময়ে বাদশাহের এই আজ্ঞা উপস্থিত হইয়াছিল। নচেৎ সেই পূতি পরিপূর্ণ জলাময় দ্বীপে ইংরাজগণের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা থাকিত না। সন্ধি হইয়া সমস্ত বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত হইল। ইংরাজরা যাহা প্রার্থনা করিলেন, তাহাই হইল। উলুবেড়িয়ার ইংরাজগণের ডক্ ও বারুদখানা স্থাপিত হইল। জব চার্ণক দেখিলেন, উলুবেড়িয়া বড় সুবিধার স্থান নহে। এজন্য অনতিকাল মধ্যে তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া সুতানুটী নামক স্থানে আবাস স্থাপন করিলেন। ইংরাজরা নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহেন। যে সন্ধি হইল তদ্বারা তাঁহারা আত্ম কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইলেন। আর সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। সুরাটে ইংরাজরা পুনরায় সমরানল জ্বালাইলেন। নবাব এ সংবাদে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। ইংরাজদের যথাসম্ভব দুর্দ্দশা করিতে আজ্ঞা দিলেন ও গত যুদ্ধ জনিত ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত যথেষ্ট অর্থের দাওয়া করিলেন। চার্ণক বুঝিলেন যে, বাহুবল বা ধনবল উভয়ই দুরাশা। তখন "ভিজে বিড়ালের" ন্যায় বিনয় ও শিষ্টাচারে কার্য্য সিদ্ধ করিবার মানসে ঢাকায় নবাব সমীপে ২ জন লোক পাঠাইলেন। ইত্যবসরে চার্ণকের স্থানে হীথ নামে একব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সামান্য কারণে এই ব্যক্তি বালেশ্বরের শাসন কর্ত্তার সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। একব্যক্তি তোষামোদে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত দরবারে দূত প্রেরণ করিলেন, অপর সামান্য কারণে সমস্ত যুক্তির বিপর্য্যয় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সকল কি রাজনীতি তাহা ইংরাজ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন। যাহা হউক হীথের ব্যবহার লইয়া আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বাতুল।* ফলতঃ যাহাই হউক নবাব পুনরায় ভদ্রতা সহকারে ইংরাজ দূতের সহিত সন্ধি বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। হীথ প্রস্থান করিলেন। চার্ণক পুনরায় সুতানুটীতে আসিলেন। নবাবের নিদেশানুযায়ী হুগলীর শাসন কর্ত্তা তাঁহাকে ভদ্রতা সহকারে গ্রহণ করিলেন।

এই সময় নবাবের অধীনস্থ কয়েক জন রাজা সমবেত হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলেন। কাশীমবাজার, মুরসিদাবাদ প্রভৃতি স্থান সকল বিলুণ্ঠিত হইল। বৈদেশিক বণিকগণ নিরতিশয় ভীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভয়ের কোনই কারণ ছিল না। কমলা তাঁহাদের প্রতি

*Ormes History of the Military Transactions of the British nation in Indostan. Vol II.

কৃপালু। তাঁহাদের ভাগ্যে অজ্ঞাত পূর্ব্ব সুবিধার উদয় হয়। ঘোর বিপন্মধ্যে সুবিধা, সঙ্কটে সুখ, এ সকল অদৃষ্ট দেবীর নিরতিশয় অনুগ্রহ ব্যতীত কদাচ ঘটে না। ভারতে ইংরাজদিগের অদৃষ্ট খুলিয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের পাশার পড়তা পড়িয়াছিল। এত বিপদে তাঁহারা যাহা ভ্রমেও আশা করেন নাই তাহা ঘটিল। বাদশাহ অওরাঙ্গজেব এই বিদ্রোহ সংবাদে শঙ্কিত হইয়া স্বীয় প্রপৌত্র আজিম-অস্-সাহকে সমস্ত নিবারণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। এ ব্যক্তি নিরতিশয় অর্থগৃধ্নু। অর্থের সুবিধা দেখিলে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া আজিম সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। ইংরেজরা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, এ ব্যক্তিকে বশ করিতে পারিলে অনেক উপকার সম্ভাবিত। কেমন করিয়া মানবকে আয়ত্ত করিত হয়, তাহা ইংরেজরা বেশ জানিতেন। অর্থাদি উপহার দ্বারা তাঁহারা আজিমকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ইংরাজেরা আজিমকে বশ করিয়া সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই স্থান ত্রয় ও সেই জেলার জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিলেন। এ স্থান সকলে তাঁহাদের একাধিপত্য হইল। বাণিজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহাদের সহিত বাণিজ্যসূত্রে বিস্তর দেশীয় লোকের সম্বন্ধ। এক স্থানে থাকিতে পারিলে কার্য্যের সুবিধা হয়। এজন্য সেই সকল লোক আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ কলিকাতায় জন সংখ্যা সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয় দর্শনে লোভাকৃষ্ট হইয়া ইংলণ্ডে অপর এক বণিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। সাতবৎসর পরে এই বিরোধী কোম্পানী দ্বয় সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইল। উভয় সম্প্রদায় সম্মিলিত হওয়ায় কোম্পাণীর বল ও সাহস সম্বর্দ্ধিত হইল।

জাফর খাঁ নামক এক তাতার বংশ সম্ভূত ব্যক্তি বঙ্গের শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। এই পরিবর্ত্তনে ইংরাজদিগের যথেষ্ট বিব্রত হইতে হইল। * জাফর ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন। আজিম কৃত ব্যবস্থার বিপর্য্যয় না করিয়া, জাফর ইংরাজদিগকে দমন করিবার যথা সম্ভব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। †

* Mill's History of British India. Vol. II.

† Ormes History of the military Transactoins of the British nation in Indostan.

এবম্বিধ উৎপাত সমস্তের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিবার মানসে কোম্পানী বাদশাহ ফেরোকসিয়ারকে পরিতুষ্ট করিয়া বাসনা সিদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। তদভিপ্রায়ে কয়েক জন সুদক্ষ কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে বাদশাহ সকাশে বহুল মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার স্বরূপে প্রেরিত হইল দূত কয় জন বিস্তর প্রযত্নে সুবিধাজনক সম্রাট অনুজ্ঞা লাভ করিলেন। অন্যান্য অনুজ্ঞা ব্যতীত কলিকাতা প্রেসিডেন্সি সম্বন্ধে তাঁহারা নিম্নলিখিত আজ্ঞা পাইলেনঃ—"ইউরোপীয় বা এ দেশীয় যে কোন ব্যক্তি ঋণ বা অন্য কারণে কোম্পানীর নিকট বদ্ধ তাহাদিগকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সিতে থাকিতে দিতে হইবে; কোম্পানীর টাকা প্রস্তুত করিবার জন্য নবাবের মুরসিদাবাদস্থ টাকশালের কর্ম্মচারীগণকে সপ্তাহ মধ্যে তিন দিন ছাড়িয়া দিতে হইবে; কোম্পানীর কলিকাতাস্থ প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষরিত দস্তখ্ বা পাস থাকিলে নবাবের লোক পরীক্ষা না করিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের মালামাল ছাড়িয়া দিবে; এবং ইংরেজরা যেরূপ আজিম আল্-সাহের নিকট হইতে কলিকাতা সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আরও ৩২ খানি গ্রাম খরিদ করিতে পাইবেন।" * এইরূপে ক্রমে ক্রমে কোম্পানীর বাণিজ্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুবিধা হইয়া গেল। তাঁহাদের বাণিজ্যের আর কোনই প্রতিবন্ধক থাকিল না। বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের আশাতীত সুবিধা হইল। দৃঢ় অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য সহায় থাকিলে, সকল কার্য্যই যে সুসিদ্ধ হইতে পারে, ইংরাজদিগের এই ব্যাপার তাহা সুচারু রূপে শিক্ষা দিতেছে। জাফরের প্রতিরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ইংরেজরা যথাভিরুচি বাণিজ্য করিতে লাগিলেন।

* Mill's History of British India vol. II., Ormes History of the Military Transactions of the British nation in Indostan vol. II.

বিমলা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘোর তিমিরারজনী। জাহ্নবী কুল্ কুল্ শব্দে প্রবাহিতা। প্রকৃতি শান্ত ও নিস্তব্ধ। চতুর্দ্দিক জনশূন্য। বহুদূরে বলরামপুরের জমিদারী কাছারির দ্বি-

তল গৃহে যে আলোক জ্বলিতেছে, তাহারই ক্ষীণ ভাতি মাত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে।

সুরধুনী তীরে এক খানি নৌকা সংলগ্ন। নৌকায় আরোহী নাই,তথাপি নাবিকগণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, যেন এখনি নৌকা ছাড়িতে হইবে। পাহাড়ের উপর কৃষকের ক্ষেত্র পরিরক্ষণার্থ এক খানি কুটীর রহিয়াছে। সেই কুটীর হইতে মনুষ্যের অপরিস্ফুট ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে। এই ঘনান্ধকারময়ী রাত্রিকালে, পবিত্র সলিলা জাহ্নবী তীরে, কুটীর মধ্যে বসিয়া যুবক যুবতী কাঁদিতেছেন !

আলোক নাই। যুবক যুবতীর আকৃতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। দেখিলে বুঝিতে তাঁহাদের দেব কান্তি। অন্ধকার—দেখা গেল না।

অশ্রু সংক্ষুব্ধ স্বরে যুবক বলিতেছেন,—

"মনোরমে ! কাঁদিয়া কি ফল, চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

মনোরমা আরও কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"নরেন্ ! গৃহে কাহার নিকট যাইব ?"

নরেন্দ্র কহিলেন,—

"কেন মনোরমে! তোমার বৃদ্ধা জননীর নিকট যাইবে। তুমি ভিন্ন তাঁহার আর কে আছে ?"

মনোরমা কহিলেন,—

"তোমারও তো বৃদ্ধা জননী ভিন্ন আর কেহ নাই।"

নরেন্ কহিলেন,—

"সে কথা যথার্থ। কিন্তু উপার্জ্জন না করিলে আমার চলিবে না। আমাকে অগত্যা বিদেশে যাইতেই হইবে। আমার বৃদ্ধা জননীকে আমি যে ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতেছি, সেও কেবল তোমারি ভরসায়।"

মনোরমা ক্ষণেক কি ভাবিলেন। সহসা নরেন্দ্রর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"নরেন্ ! আমাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছ ! তুমি ভিন্ন আর সকলেই আমাকে ঘৃণা করে। জন সমাজে মুখ দেখাইতে আমার লজ্জা হয়, লোকেও আমার মুখ দেখিতে চাহে না। নরেন্ ! আমি কাহার নিকট থাকিব ?

নরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনোরমা পুনরপি কহিতে লাগিলেন,—

"আমার এ জীবনে কি সুখ হইবে নরেন্দ্র ? যদি তুমি ভাবিয়া থাক যে, আমাকে সুখে রাখিবে নরেন্দ্র এখনও সে আশা ত্যাগ কর। এ জীবনে আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। কিছুতেই সুখ হইবে না। তুমি বৃথা চেষ্টা করিও না। আমি বালবিধবা, দরিদ্রতনয়া,

শূন্য মনে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতাম, সেও আমার সুখ ছিল। সেও আমার আনন্দ ছিল। সকলে তখন আমার সহিত আদর করিয়া কথা কহিত,আমাকে লইয়া সমবয়স্কেরা খেলা করিত, সকলে ডাকিয়া কথা কহিত। সে একদিন ছিল। সে দিন আর কিছুতেই আসিবে না। সে সুখের দিন গিয়াছে, সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, সে আশা মিটিয়াছে। নরেন্! এখন আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও ঘৃণ্য। আমার ছায়া স্পর্শ করিতেও লোকে সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু আমার দোষ কি? আমি কি পাপ করিয়াছি? সংসারের অবিচার! পরের পাপে আমাকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে! এই কি সমাজের নিয়ম? এই কি সংসারের ব্যবস্থা? পাপ, প্রেত, পিশাচ রুদ্রকান্তের জন্য আ"—

বলিতে বলিতে যুবতী মনোরমা উন্মাদিনীর ন্যায় কম্পান্বিত কলেবরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার লোচন যুগল আকর্ণ বিশ্রান্ত হইল। ললাটে কৃষ্ণ শিরা উদ্ভ্রান্ত হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্ন স্বরে যুবতী মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—

"পিশাচ রুদ্রকান্তের জঘন্য ব্যবহার জন্য আমি নিরপরাধিনী আজীবন কাল যন্ত্রণানলে ভস্মীভূত হইব? আমার অপরাধ কি? পাপীর শাস্তি হইল না। সে নারকী ঘোর দুষ্কার্য্য করিয়া পুণ্যাত্মারূপে সংসারে সমাদৃত হইতে লাগিল। আর আমি নিরপরাধিনী পরকৃত পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। হায়! ইহারই নাম শাসন! ইহাকেই সমাজ বলিয়া লোকে সম্মান করে! এই পাপ রাজ্যের নাম পুণ্যময় সংসার। নরেন্দ্র, প্রাণেশ্বর! প্রিয়তম! কিসে আমার এ যন্ত্রনা অপগত হইবে? কি করিলে আমার শাস্তির অন্যথা হইবে? কি উপায়ে জগত সংসার আবার আমাকে নিষ্পাপী বলিবে? ওঃ! আমি পাপী নই, অথচ লোকে আমাকে পাপী বলিবে? এ কষ্ট সহে না নরেন্দ্র! এ কষ্ট অসহ্য। ইহার উপায় কর।"

মনোরমার ক্লেশের সীমা নাই। নির্দ্দোষীকে দোষী বিবেচনায় যদি সমাজ চিরদিনের মত অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে তদপেক্ষা ক্লেশের কারণ আর কি হইতে পারে? মনোরমার হৃদয়ে এককালে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সুন্দরী মনোরমা হৃদয়ের ক্লেশ শান্তির উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সুশীলার কষ্ট দেখিয়া নরেন্দ্র যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার লোচন দিয়া দর দরিত ধারায় অশ্রু নিঃসৃত হইতে লাগিল। রোদন পরা-

য়ণ নরেন্দ্র মনোরমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। নরেন্দ্রর নেত্র নিঃসৃতবারি মনোরমার পবিত্র ললাটে নিপতিত হইল। মনোরমা আবার বলিলেন,—

"নরেন্দ্র উপায় নাই। আমার যন্ত্রণা নিবারণের উপায় নাই। বৃথা চেষ্টা! নরেন্! আমার জন্য তুমি কাঁদিতেছ? কেন নরেন্দ্র! তুমি সে দিন আমায় বাঁচাইলে? যদি না বাঁচাইতে নরেন্দ্র! যদি তুমি আমাকে আসন্ন মৃত্যু মুখ হইতে না বাঁচাইতে, তাহা হইলে অদ্য আর কাঁদিতে হইত না। নরেন্দ্র! তাহা হইলে আমি কি সুখী হইতাম? তোমারও কি সুখ হইত না নরেন্! তোমারও ভাল হইত। এ পাপীয়সীর জন্য তোমার আর কাঁদিতে হইত না। আমি তোমার গলগ্রহ হইতাম না। আমার জন্য তোমার আর চিন্তা করিতে হইত না। তোমার অসংখ্য চিন্তার মধ্যে এ চিন্তা থাকিত না। নরেন্দ্র! কেন আমাকে বাঁচাইলে?"

নরেন্দ্র কহিলেন,—

"তোমায় কেন বাঁচাইলাম, মনোরমে! তোমায় কেন বাঁচাইলাম জিজ্ঞাসিতেছ? কি বলিব মনোরমা? প্রাণাধিকে! কি বলিয়া তোমার কথার উত্তর দিব? আমি জানি না, কেন বাঁচাইলাম। আমার হৃদয় জানে, কিন্তু আমি জানি না কেন বাঁচাইলাম। মনোরমা! তুমি যদি আমার হৃদয়ের ধন হও, তবে তুমিও জান আমি তোমায় কেন বাঁচাইলাম। মনোরমে! প্রিয়তমে! জীবিতাধিকে—কি হইল, আমি তোমাকে শান্তি দিতে পারিলাম না।"

নরেন্দ্র বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মনোরমা কহিলেন,—

"দেখ নরেন্! বিধাতার কি বিড়ম্বনা? তোমার সহিত এত আত্মীয়তা কেন হইল? এ অপাত্রে তুমি কেন প্রণয় স্থাপন করিলে? আমার জন্য তোমার এত কষ্ট কেন নরেন্দ্র? হতভাগিনী নিজে পুড়িল। আবার তোমাকেও পুড়াইল। নরেন্দ্র তুমি কেন পাপে ডুবিলে? যে কথা সংসারকে বলিবার উপায় নাই, যে কথা শুনিলে জগত মুখ বিকৃত করিবে, লোকে নিন্দা করিবে, সমাজ দোষ দিবে, তাহা তো সুখের নহে। নরেন্! তুমি দেবতা। তোমাকে আমার নিমিত্ত এই কলঙ্করাশি বহন করিতে হইল।"

নরেন্দ্র মুগ্ধের ন্যায় মনোরমার কথা শুনিতেছিলেন। কথা থামিল। তাঁহার চৈতন্য হইল, কহিলেন,—

"মনোরমা! আজি এই নির্জ্জন প্রান্তরে, গম্ভীর রজনীতে, তরঙ্গাভিঘাতিনী জাহ্নবী তীরে, কুটীর মধ্যে তোমাকে ক্রোড়েধারণ করিয়া কহিতেছি যে-সংসার, জগত, সমাজ, সমস্ত

একদিকে হইলেও তোমা হইতে আমার মন বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। কিসের ভয় মনোরমে! সমাজের ভয়? আমি সমাজের ভয় করিতাম, সমাজের শাসন শুনিতাম, সমাজের অনুগামী হইতাম যদি, সমাজের নিয়ম, ব্যবস্থা ও সততা থাকিত। সমাজের নিয়ম নাই, সততা নাই। যে সমাজে দুষ্টের জয় ও শিষ্টের পরাজয় ঘোষণা করে, আমি সে সমাজের ভয়ে মনের ইচ্ছা ভাসাইতে পারি না। মনোরমা যাহার যত ক্ষমতা সে আমার তত নিন্দা করুক,আমার কুৎসা সংসারময় প্রচারিত হউক, আমি তথাপি এ বিচারবিহীন,পক্ষপাতী সমাজের কথায় কর্ণ দিব না। মনোরমা! তুমি বালিকা। অত্যল্পে তোমার হৃদয়কে আঘাত করে। আমরা অনেক দেখিয়াছি। দুর্ব্বলকে উৎপীড়িত করা আমাদের জাতীয় স্বভাব, তুমি যদি আমার মত সমাজকে অবহেলা করিতে শিখিতে, তুমি যদি আমার মত জাতীয় চরিত্র সম্যক বিদিত থাকিতে, তাহা হইলে তুমি লোকের কথায় কাতর হইতে না। মনোরমা তুমি কাতর হইও না, কষ্ট করিও না।"

মনোরমা নরেন্দ্রর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

"প্রিয়তম! আমি তোমার জন্য বড় কাতর। তোমার কি হইবে? আমি তোমার কোন কাজে লাগিব? এ রহস্য কতদিন থাকিবে? সংগোপনে আর কতদিন চলিবে? আর নরেন্! আমরা কি পাপ করিতেছি? আমাদের এ প্রণয় কি ধর্ম্ম বিগর্হিত? নরেন্! সত্য করিয়া বল, আমরা কি অসাধু কার্য্যে রত? যদি তাহা হয় নরেন্! যদি আমাদের এ প্রণয় নীতিবিগর্হিত হয়, তবে আমার অনুরোধ—অদ্য আমাদের প্রণয়ের শেষ সাক্ষাৎ। আমি আমার জন্য বলিতেছি না। ভাবিও না নরেন্! আমি সন্তোষের সহিত একথা বলিতেছি—তাহা নহে। আমি যে জন্য, যে ভাবে এ ভয়ানক কথা বলিলাম তাহা আমি বুঝিতেছি। আমি তোমার জন্য ভাবিতেছি। যদি আমরা পাপে রত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি পাপীয়সী আমার অধিক ক্ষতি হইবে না। আমার সমুদ্রে শয্যা, শিশিরের ভয় কি নরেন্? আমি যদি আজ হইতে পরম সাধুতায় জীবন পর্য্যবসিত করি, তাহা হইলেও জন সমাজ আমাকে আর পূর্ব্ববৎ সমাদর করিবে না। আমার এ কলঙ্ক আর কিছুতেই ঢাকিবে না। কিন্তু নরেন্! তুমি সাধু, পুণ্যাত্মা, তোমার নাম নিষ্কলঙ্ক। তুমি যে এই হতভাগিনীর সংসর্গে কলঙ্কিত হইবে, ইহা তো আমার প্রাণ থাকিতে সহিবে না। আমি সমস্ত ক্লেশ অবাদে সহ্য করিব কিন্তু তোমায় কেহ যদি নিন্দা করে, কি

তোমার নামে কলঙ্ক ঘোষণা করে, তাহা আমার প্রাণ থাকিতে সহিবে না। নরেন্! আজি তুমি আমায় সত্য করিয়া বল, আমাদের প্রণয়ে দোষ আছে কি না।”

মনোরমার প্রত্যেক কথা যেন নরেন্দ্রর হৃদয়ে অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি যেন ভাবিতে লাগিলেন, এমন কথা আর কখন শুনি নাই। সস্নেহে মনোরমার বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

“মনোরমে! তুমি পাগলিনী। আজি অসময়ে তোমার হৃদয়ে এ নূতন কথার আবির্ভাব হইল কেন? একি কথা মনোরমে?”

মনোরমা কহিলেন,—

“নরেন্! আজি তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইতেছ। কবে আসিবে স্থির নাই। আসিয়াই আমার দেখা পাইবে কি না সন্দেহ। কি জানি এ পাপজীবন যদি নাই থাকে। সেই জন্য নরেন্! আজি সমস্ত মনের কথা বলিতেছি।”

নরেন্দ্রর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কহিলেন,——

“মনোরমা! আর কাঁদাইও না। তোমার কথায় আজি আমার হৃদয় উদাস হইয়া যাইতেছে। মনোরমা অন্য কথা বল।”

মনোরমা কহিলেন,—

“নরেন্দ্র আমি তোমার ভরসায় সকল সহি। তোমাকে দেখিতে পাইব, এই আশায় সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করি। কিন্তু প্রিয়তম! তুমি যখন এখানে না থাকিবে, তখন আমি কি সাহসে কোন ভরসায় লোক গঞ্জনা সহ্য করিব? নরেন্! তুমি কতদিন পরে আসিবে? আসিয়া হয়ত আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।”

নরেন্দ্র মনোরমার বদনে বদন রাখিয়া বলিলেন,—

“মনোরমে! আমি যাইব না।”

মনোরমা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—

“না না নরেন্দ্র, তাহা হইবে না। তোমাকে যাইতে হইবে। ভালবাসার কি এই রীতি? তোমার যাহাতে ভাল হব, তোমার যাহাতে ইষ্ট আছে, তাহাতে বাধা দিব। ছি ছি! নরেন্দ্র ও কথা বলিও না। তোমাকে যাইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। তুমি আমার জন্য ভাবিও না।”

নরেন্দ্র বলিলেন,—

“সে কি কথা মনোরমা? তোমার একথা শুনিয়া তোমার নিকট হইতে একপদ অন্তরে যাওয়াও আমার অসাধ্য।”

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন,—

“আমার মিছে কথা।”

নরেন্দ্র মনোরমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

"এ কি পরিহাস মনোরমে ?"

'আমি দেখিতেছিলাম তুমি আমায় যথার্থ ছাড়িতেছ কি না।'

নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—

"শুন মনোরমে! তোমায় মনের কথা বলি শুন। এ জগতে আমার এক বৃদ্ধা জননী ভিন্ন আর কেহ নাই। তাঁহারও যে দশা তাহাতে তাঁহার দীর্ঘ জীবনের আশা নাই। বল মনোরমে আমাকে সংসারে বদ্ধ করিবার আর কি বন্ধন আছে ? মনোরমে। আজিও আমি সংসারে স্বাধীন হই নাই। জননীর ক্লেশাশঙ্কায় আমাকে অনভিমত কার্য্যও করিতে হইতেছে। আজ যদি আমি স্বাধীন হই—তুমি দেখিবে মনোরমা! কালি আমি এ জগতে আর কাহার ভয়ে ভীত হইব না। যদি এ স্থান আমাদের না চাহে,আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, মনোরমে! এমন স্থান এ জগতে যথেষ্ট আছে,যথায় এ প্রণয়ের বিরোধী নাই। মনোরমা! আমি তোমার জন্য জগৎ ত্যাগ করিব, সংসার ত্যাগ করিব, কলঙ্ক বহন করিব, সকলি উপেক্ষা করিব। আর মনোরমা! আজ যদি তুমি বল, নরেন্দ্র তোমার কেহ নহে, কালি হইতে তাহা হইলে আর তুমি নরেন্দ্রর নাম শুনিতে পাইবে না। নরেন্দ্র জন সমাজ ত্যাগ করিয়া কল্য হইতে অরণ্যচারী হইবে। সেই নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া গিরি নিঃসৃত নির্ঝরিণী সহ স্বীয় অশ্রুবারি মিশাইবে, বন বিহঙ্গিনীর সহিত স্বীয় স্বর মিশাইয়া প্রেমের গীতি গাইবে, বন কপোতকে নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কপোতিনীর প্রেমে ভাসিতে নিষেধ করিবে, সহকারকে সোহাগে মাধবীলতা বক্ষে জড়াইতে বারণ করিবে, আর তপস্বী বেশ ধরিয়া ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় আজীবন তোমার নাম জপিবে। মনোরমা! আমি তোমাতেই জীবন সমর্পণ করিয়াছি। সুখ, দুঃখ তোমারই উপর ঢালিয়া রাখিয়াছি। তুমি দুঃখিত হইওনা মনোরমা তোমার দুঃখ দেখিলে আমার বড় দুঃখ হয়। মনোরমা! আমি পাষাণ নহি।"

মনোরমা নরেন্দ্রর বক্ষ মধ্যে বদন রাখিয়া কহিলেন,—

"এ দুঃখিনীর অদৃষ্টে এ কি সুখ নরেন্দ্র ? এত সুখ আমার কপালে! আমার এত সুখ সহে না। সত্য বলিতেছি নরেন্দ্র! আমি যখন তোমার নিকট থাকি, তখন যেন বোধ হয় যে আমি সুখ সাগরে ভাসিতেছি। হতভাগিনীর অদৃষ্টে এত সুখ। এ সকল ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব ? তুমি বিদেশে গেলে আমার কি হইবে নরেন্দ্র ? আমি তোমার সঙ্গে গেলে হয় না ?"

"সে কি সম্ভব ?"

"সম্ভব নয় তা আমি জানি। দেখ

নরেন্দ্র আজি আমরা কি দুঃসাহসিক কার্য্যে মগ্ন রহিয়াছি। আজি আমার সংসারের ভয় গিয়াছে। তোমার পাছে কলঙ্ক হয়, এই আমার বড় ভয়। আজি আমার সে ভয় কই নাই তো। আমার এখন ইচ্ছা করিতেছে, কোন দৈববলে তোমার শরীরের সঙ্গে আমার শরীর মিশাইয়া যায় তো হয় ভাল।"

নরেন্দ্র মনোরমার বদনে চুম্বন করিলেন। কি যেন বলিবেন মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু কথা মুখ দিয়া বাহিরিল না। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—

"রাত্রি অনেক হইয়া গেল। প্রাতঃকালের আর বিলম্ব নাই বোধ হয়।"

মনোরমা যেন চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক নীরবে রহিলেন। পরে কহিলেন,—

"তুমি যাইবে বলিতেছ? তোমার যাইবার সময় হইয়াছে। নরেন্! তুমি এখনি যাইবে? আ—"

মনোরমা আর বলিতে পারিলেন না। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। নরেন্দ্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন, আমি যদি দরিদ্র না হইতাম। বলিলেন,—

"আমি যাইব না।"

মনোরমা ব্যগ্র ভাবে কহিলেন,—

"না নরেন্দ্র তুমি যাও। আমি অসাবধানতায় কি বলিয়া ফেলিয়াছি, সে কিছু নয়।"

এই সময় নৌকা হইতে মাঝি উচ্চস্বরে বলিল,—

"বাবু! সময় বয়ে যায়।"

মনোরমা এই কথা শ্রবণ মাত্র কাঁদিয়া উঠিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন,—

"মনোরমে! অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, আমি যাইব না।"

মনোরমা অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। পরে বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন করিয়া কহিলেন,—

"নরেন্! তুমি যাও। বিলম্ব করিও না। সময় বহিয়া গেলে পথে কষ্ট পাইবে।"

নরেন্দ্র কহিলেন,—

"মনোরমে! তোমাকে কাঁদাইয়া আমি স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত নহি।"

"আমি আর কাঁদিব না।"

"না?"

"না, ভুলিয়া কাঁদিয়াছিলাম।"

"মনোরমে! মনের কথা খুলিয়া বল।"

"বলিলাম—তুমি যাও!"

"আমার জন্য সতত কাঁদিবে না?"

"না—তুমি আমাকে প্রত্যহ পত্র খিবে?"

"লিখিব—তুমিও লিখিও।"

"লিখিব।"

মাঝি আবার ডাকিল। নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমার বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"মনের কথা বল মনোরমে।"

মনোরমা আবার নীরব। আবার নরেন্দ্র বলিলেন,—

বল মনোরমে! যা মনে থাকে বল।"

মনোরমা বলিলেন,—

"যাও।'

নরেন্দ্র পুনরায় মনোরমাকে প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"মনোরমে! তবে যাই।"

নরেন্দ্রর লোচন প্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু। মনোরমা ঘাড় নাড়িলেন। আলিঙ্গন ছিন্ন হইল। একপদ, দুইপদ, তিন পদ। নরেন্দ্র ক্রমে পাহাড়ের নীচে গেলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন— মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন না। লোচন দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু পড়িতে-লাগিল। পাষাণে বুক বাঁধিয়া নৌকায় উঠিলেন। শুকতারা সমুদিত হইয়াছে। উষা সমাগতা প্রায়। রজনী এখন শুভ্র বর্ণ। নরেন্দ্র নৌকায় উঠিলেন, মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা অনেক জলে গেল। নরেন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন—দেখিলেন মনোরমা গঙ্গানীরে আবক্ষ নিমগ্না। মাঝিকে কহিলেন,—

"মাঝি! শীঘ্র নৌকা ফিরাও।"

মাঝি বিরক্ত হইয়া নৌকা ফিরাইল। নিকটস্থ হইয়া নরেন্দ্র নৌকার উপর হইতে ঝম্প দিয়া মনোরমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন।

মাঝিকে বলিলেন,—

"মাঝি! আমার যাওয়া হইল না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কাহার জন্য কে কাঁদে? তুমি অনাথা! পতিবিয়োগ বিধুরা, অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে রোরুদ্যমানা কিন্তু বল দেখি, তোমার দুঃখে পৃথিবীর কটা লোক কাঁদে? যে তোমায় দেখিল, হয়ত সে একবার আহা বলিল, এক মুষ্টি তণ্ডুল দিল, বা যৎসামান্য সাহায্য করিল। জগতে সহানুভূতি শ্রোত এই পর্য্যন্ত প্রধাবিত। কিন্তু বল দেখি কে তোমার হৃদয়ের সহিত নিজ হৃদয় মিশাইয়া বিরলে বসিয়া কাঁদিল? বল দেখি কে তোমার দুঃখ নিজদুঃখ বিবেচনায় তাহা বিদূরিত করিতে বিচেষ্টিত হইল? তোমার ক্লেশরাশিতে কাহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইল? এরূপ কাঁদিবার লোক এ জগতে বড় কম। যদি এই পাপ, স্বার্থ, লোভ, দুরাকাঙ্ক্ষাময় পৃথিবীরাজ্যে তদ্বিধ লোক দেখিয়া থাক, নিশ্চয় জানিও তিনি দেবতা, তিনি এ জগতের লোক নহেন। সাধারণ উপাদানে তাঁহার হৃদয় বিনি-

র্ম্মিত নহে। তিনিই সাধু, উদার, মহৎ ও উপাস্য।

কাহার জন্য কে কাঁদে? আজি আমি প্রাণাধিক প্রিয়তম আত্মীয় বিয়োগে উন্মত্তবৎ অধীরতা সহকারে ধূলি ধূসরিত কায়ে চীৎকার করিয়া মেদিনী বিদীর্ণ করিতেছি, সংসার কেবল যন্ত্রণার আলয় বলিয়া বোধ করিতেছি, চতুর্দিক শূন্য ও নিরানন্দময় দেখিতেছি, কিন্তু ঐ দেখ আমার পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীর নবকুমার হইয়াছে। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি বাটীতে নহবৎ উঠাইয়াছেন, আনন্দ ধ্বনিতে তাঁহার বাটী তোলপাড় হইতেছে। কাহার জন্য কে কাঁদে? আবার ঐ দেখ, আমার শোক বিকলিত চীৎকারে তাঁহার আমোদের বিঘ্ন জন্মিতেছে বলিয়া তাঁহার লোক আসিয়া আমাকে কাঁদিতে বারণ করিতেছে। হায়! এ সংসারে কাহার জন্য কে কাঁদে?

কাঁদিলে কি কাঁদার সীমা হইবে? মানুষ কত কাঁদিবে? প্রত্যেকের জন্য যদি প্রত্যেককে কাঁদিতে হয়, তবে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সংসার ক্রন্দনের বিরাম পাইবে না। মানুষকে অহর্নিশ কাঁদিতে হইবে। সংসার ক্রন্দনরোলে পরিপূরিত হইয়া উঠিবে। কাঁদিয়া পার পায় না এজন্যই কাহারও জন্য কেহ কাঁদে না।

বিমলার বিপদের সীমা নাই, যোগেশের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয়, গঙ্গাগোবিন্দ বিপদ বিদলিত। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যৎপরোনাস্তি বিপদ। কিন্তু তুমি কি বল, যতদিন তাঁহাদের বিপদ বিদূরিত না হয়, যতদিন তাঁহারা পূর্ব্ববৎ আনন্দসাগরে ভাসিয়া না বেড়ান, ততদিন সংসারের সমস্ত লোক অনন্যকর্ম্ম হইয়া তাঁহাদের দুঃখে যোগ দিউক, তাঁহাদের সহিত সমভাবে কাঁদুক, আপনাদিকেও তাঁহাদের ন্যায় বিপদাপন্ন মনে করুক। সাম্যবাদী, যদি তোমার যুক্তিতে এরূপ উপদেশ দেয়, তবে নিশ্চয় জানিও তোমার উপদেশ কখন কার্য্যে পরিণত হইবে না। বিমলা প্রভৃতির বিপদ যথেষ্ট হইলেও, সংসার তজ্জন্য আত্মামোদ ত্যাগ করিল না। সংসারে কাহার জন্য কে কাঁদে?

ঐ যে জাহ্নবী বক্ষ বিদারণ করিয়া অতি প্রত্যূষে ক্ষুদ্র তরণী খানি ভাসিয়া যাইতেছে, উহার আরোহী কাহার জন্য কাঁদিতেছে? আত্ম কার্য্যে সংসারের সকলেই ব্যাপৃত। কাহার জন্য কে কাঁদে?

পবিত্র সলিলা ভাগীরথী হৃদয়ে প্রত্যূষ। কি মনোহর দৃশ্য! গ্রীষ্ম কালের প্রাতঃ সমীরণ সলিল সম্বলিত হওয়ায় নিরতিশয় শীতল। নৌকা আরোহীগণ শীতানুভব করিতেছে।

নদী বক্ষে কুজ্ঝটিকা। তরণী সেই ঘোর কুজ্ঝটিকা রাশি ভেদ করিয়া মেঘ মধ্যস্থ কপোতিনীর ন্যায় ভাটার স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে।

তরণী তীরবেগে চলিতেছে। তন্মধ্যে দুই জন আরোহী। সেই দুই জন নরেন্দ্র ও মনোরমা। সেই স্রোত প্রবাহী তরণী মধ্য হইতে কোকিল বিনিন্দিতা মধুময়ী কণ্ঠে অমৃত নিঃসারিনী সঙ্গীত সমুত্থিত হইয়া দিগন্ত ছাইয়া ফেলিল। মনোরমা গাইতেছেন। সেই মনোহর সময়ে, হৃদয়ের অতি গূঢ়তম প্রদেশের অতি গূঢ়তম ভাব, বীণা বিনিন্দিত স্বরে মনোরমার বদন বিনির্গত হইতে লাগিল। সঙ্গীত যেন জাহ্নবী দেহাবরণকারী কুজ্ঝটিকা রাশির সহিত মিশিয়া গেল, যেন ভাগিরথীর কুল কুল শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া গেল, যেন সেই শীতল সমীরণ সেই সম্মোহিনী সঙ্গীত শব্দ সঙ্গে করিয়া কোথায় লইয়া গেল, যেন সেই সঙ্গীতধ্বনি হৃদয়, মন, প্রাণ উদাস করিয়া আত্মাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। যে শুনিল সে ভাবিল, হায় কি শুনিলাম। মনোরমা গাইতে লাগিলেন,—

" জীবন মরণ মম
তোমারি অধীন কান্ত।
তোমারি কারণে নাথ
তুচ্ছ এ বিশ্ব নিতান্ত।

মানবের বাক্যবাণ,
বিঁধে বিহঙ্গিণী প্রাণ,
গঞ্জনার অপমান,
সরলা অবলার
সদা করে, বঁধু! প্রাণান্ত।

সহেছি সব সহিব,
ভুগেছি আর ভুগিব,
মারিলেও না মরিব
তোমারি করুণা লোভে
রহেছি প্রিয়! প্রশান্ত।

মিটে না মনের আশা,
তব দর্শন পিপাসা,
মনাবাসে বাঁধি বাসা
আশা রাশি মিলি রহে
সদা হে কান্ত! অশান্ত।

যদি নাথ কর ঘৃণা,
সব সহে তা সবে না,
জীবন যাবে রবে না,
তখনি অবনী হতে
যাবে এ নাম একান্ত।"

নরেন্দ্র তন্মন হইয়া সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। সঙ্গীত থামিল। তাঁহার চেতনা হইল। মনোরমার নিরুপম বদন মাধুরীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি দিয়া কহিলেন,—

"মনোরমে! তোমার কি বিশ্বাস হয়, কখন তোমার ভয় ফলিবে? প্রিয়তমে! অদ্যাপি যদি তোমার ঐ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে বল কি করিলে তোমার বিশ্বাস বিদূরিত হইবে? মনোরমা! তোমার শান্তি

ও সুখ আমার এ জীবনের এক মাত্র প্রার্থনা। তাহাই আমার জীবনের এক মাত্র কার্য্য স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনোরমে! আমি কিছুতেই তোমাকে শান্তি ও সুখ দিতে পারিলাম না। এ ঘোর দুঃখ কিছুতেই যাইবে না, মনোরমে।"

"নরেন্! তুমি আমার জন্য দুঃখিত হইও না। আমার জন্য আর ভাবিও না। আমার জন্য তুমি যথেষ্ট ভাবিয়াছ। তুমি আমার জন্য ভাব বলিয়াই আমি তোমাকে এত ভাবাই। আর নরেন্! তুমি ভিন্ন আমার জন্য আর কে ভাবিবে? আমার আর আছে কে? থাকিলেও তোমাকে মনের কথা বলিয়া, তোমার নিকট হৃদয় খুলিয়া কাঁদিয়া যে সুখ, আর জগতে এমন কে আত্মীয় আছে, যাহার নিকট আমি সেই সুখ প্রত্যাশা করিতে পারি? নরেন্! তুমি আমার জন্য আর ভাবিও না।"

নরেন্দ্র বিষাদ ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—

"মনোরমে! তুমি আপনি যে আপনাকে ঘৃণা কর সে জন্য আমার বড় দুঃখ হয়। বল মনোরমে! কি করিলে তোমার মন সুস্থ হয়। মনোরমা! কেন তুমি এমন করিয়া কষ্ট ভোগ কর।"

মনোরমা কহিলেন,—

"নরেন্! তুমি কষ্ট মনে করিও না। আমি রমণী। আমার হৃদয় দুর্ব্বল। আমার যখন মনে হয় যে, এ জীবনের মত সততা আমাকে এককালে ত্যাগ করিয়াছে, যখন মনে হয় যে, সংসারে লোক আমাকে অসতী, কুলটা, বারবণিতাগণের সহিত সমান বলিয়া মনে করে, যখন মনে হয় এ জীবন আমাকে ঘৃণার্হ হইয়া পাত করিতে হইবে, নরেন্! তখন আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। তখন আমার মনে হয় যে, আমি কেন এতদিন মরিলাম না। তখন ভাবি আমি বুঝি তোমাকেও কলুষিত করিতেছি। নরেন্! আমি তো কোন্‌কালে মরিতাম। মরি নাই এক কারণে। এক বন্ধন আমি ছিন্ন করিতে পারিলাম না। সে কারন, সে বন্ধন তুমি। নরেন্! আজি যদি আমি মরিয়া যাই, কালি হইতে আর তোমাকে দেখিতে পাইব না, তোমার সহিত আত্মীয়তা তো ঘুচিয়া যাইবে। তবে মরিয়া সুখ কি নরেন্? তোমাকে ছাড়িয়া মরিলেও সুখ হইবে না। এ জীবনের যত গঞ্জনা তাহাও ভাল, তথাপি তোমাকে ছাড়িয়া মরা ভাল নয়। নরেন্! আমি তোমাকে ছাড়িয়া মরিতে পারিলাম না, পারিবও না। স্বর্গের দ্বার যদি এখনি আমার নিমিত্ত নির্ম্মুক্ত হয়, আর যদি এখনি না যাইলে আমার জন্য সে দ্বার চিররুদ্ধ হয়, তথাপি নরেন্দ্র আমি তোমাকে

ফেলিয়া স্বর্গে যাইতে পারিব না। নরেন্! আমার মরা হইবে না।”

মনোরমা কথার উপাসংহারকালে স্বীয় মনোহর মৃণালবৎ ভুজলতাদ্বারা নরেন্দ্রনাথকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। নরেন্দ্র মনোরমার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—

“মনোরমা! আর ও কথা বলিও না। তোমার ঐ সমস্ত কথা আমার হৃদয়ে বিষাক্ত ফলার ন্যায় বিদ্ধ হয়। মনোরমে তুমি কি ভাবিয়াছ, আমায় ছাড়িয়া মরিতে পাইবে?”

মনোরমা ব্যস্ততা সহকারে আলিঙ্গন ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন,—

“ছি ছি ছি! নরেন্। ও কথা মুখেও আনিও না।”

“কেন?”

“শুনিলে আমার গা শিহরিয়া উঠে, হৃদয় অস্থির হয়।”

নরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন,—

“জানিও সকলেরই হৃদয় সমান।”

মনোরমা বলিলেন,—

“আমি ও কথা আর মুখেও আনিব না।”

নরেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

‘আমি মনে মনে বলিব।’

‘কেন?’

“তুমি যে মনে আনিবে।”

“না।”

“আমি ভাবিব?”

“কেন নরেন্?”

“তুমি জান।”

“আমি কখন ভাবিব না।”

“আমিও কখন না।”

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন,—

“নরেন্! মরার পর কি হয়?”

“আমি আজি মরিয়া দেখিব।”

“কেন নরেন্! আবার ওকথা কেন?”

“তুমি আবার ওকথা তুলিলে কেন?”

“আর বলিব না।

“আমিও মরিয়া দেখিব না। শুন মনোরমা! তুমি যখন ঐ কথা বল তখন যেন আমি সংসার শূন্য দেখি। তখন যেন আমার সংসার দারুণ অসার মরুভূমিবৎ হয়। আমার যেন বোধ হয় এই বিশ্বরাজ্যে আমি একাকী আসিয়াছি, আমার আর কেহ নাই। মনোরমা! তোমার মুখে ঐ পাপ কথা শুনিলে আবার বড় মর্ম্ম পীড়া হয়। মনোরমে! তোমায় বিনতি করি আর ও পাপ কথা বলিও না।”

মনোরমা সস্নেহে নরেন্দ্রর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

“না।”

দেখিতে দেখিতে নৌকা আসিয়া হরিপাড়া নামক গ্রামের নীচে লাগিল। তখন প্রভাত হইয়াছে।

সূর্য্যদেব তখন পুর্ব্বাকাশে সমুদিত।

বলরামপুর হইতে হরিপাড়া জলপথে প্রায় এক ক্রোশ হইবে, স্থলপথে তদপেক্ষা কম। হরিপাড়া হইতে রাম নগর ৫ পাঁচ ক্রোশ দূরে স্থিত। অবন্তীপুর এখান হইতে দশক্রোশ পশ্চিম দক্ষিণ।

নরেন্দ্র নাথ ও মনোরমাকে বহন করিয়া নৌকা প্রাতঃকালে আসিয়া হরিপাড়ার ঘাটে লাগিল। প্রণয়ীযুগল নৌকা হইতে নামিলেন। সহসা দক্ষিণপার্শ্বে অঙ্গুলি ভঙ্গ করিয়া মনোরমা কহিলেন,—

"দেখ দেখ নরেন্! ঐ বালির উপর একটী ভদ্র লোক শয়ন করিয়া রহিয়াছে!"

নরেন্ সহাস্যে মনোরমার গাল টিপিয়া কহিলেন,—

"পাগলিনী! ওটী মৃতদেহ।"

"না নরেন্ মৃতদেহ নহে। গায়ে কাপড় চোপড় রহিয়াছে। ওটী মৃতদেহ নয়।"

নরেন্ বলিলেন,—

"আমি সন্দেহ মিটাইতেছি।"

এই বলিয়া নরেন্দ্র নাথ দেহ সন্নিধানে গমন করিলেন। মনোরমাও সঙ্গে গেলেন। নিপতিত নরদেহের বদন বস্ত্র সমাচ্ছন্ন। নরেন্দ্র তাহা নির্ম্মুক্ত করিলেন না; অন্য প্রকারে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—

"দেহ মৃত নয় কিন্তু মৃতপ্রায়।"

মনোরমা সবিনয়ে কহিলেন,—

"বল কি?"

"দেখিলাম দেহে জীবন আছে। অযত্নে থাকিলে মরিয়া যাইবে। যত্ন করিলে বাঁচিবার আশা আছে।"

মনোরমা সোদ্বেগে কহিলেন,—

"নরেন্! উপায়।"

"দেখা যাউক!"

তাঁহারা অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কাদম্বিনী।

গগনের ভালে
এক নীল কাদম্বিনী,
সুমন্দ সমীর সঙ্গে,
চলে যায় মনোরঙ্গে,
সাগর উদ্দেশে
যথা ধায় তরঙ্গিনী।

কত আহ্লাদের ভরে,
নদ নদী হ্রদ স্বরে,
আপনার মুখ খানি
নিরখি আপনি,
বিদ্যুত ছটার ছলে,
হাসে নীল নভস্থলে,

মুকুরে হেরিয়া মুখ
যেমন রমনী।
লজ্জা-বিজরিত স্বরে,
গুড়ু গুড়ু গুড়ু করে,
কেমন সংগীত এক
গাইছে মধুর।
সে গানে উন্মত্ত হয়ে,
প্রাণ-প্রিয়া সঙ্গে লয়ে,
কলাপ বিস্তারি নাচে
কৌতুকে ময়ূর।

বিশ্বপূর্ণ স্তব্ধতায়,
সঙ্গীতে অজ্ঞান প্রায়,
সকলে গম্ভীর স্থির
শুনিতে আবার।
কি সংগীত অই গায়,
গায় আর চলে যায়,
দূর শূন্য দেশে অই
ঘন শোভাধার।

যবে পতি নিজ পাশে
না দেখি কোথায়,
চাতকী চঞ্চল হয়ে,
বায়ু ভরে শূন্যে রয়ে,
রোদন রবেতে ঢাকে
ব্যোম বসুধায়,
বিনায়ে বিনায়ে কত,
বিলাপয়ে নানা মত,
কেবা শুনে তার সেই
করুণ ক্রন্দন।

যদিও করুণা ভরে,
সে খেদ অঞ্জলি করে,
মারুত মানব কর্ণে
করয়ে বহন।

যে মানব স্বার্থ তরে,
ফণী ধ'রে কুল্লাধরে,
হৃদয়ে পরিছে ভাবি
মনোহর হার।
যদিও সে ফণিবর,
হৃদে দংশি নিরন্তর,
ঢালিতেছে তীব্রতর
বিষ আপনার।

কিন্তু এর কান্না রবে,
কাদম্বিনী শুনে যবে,
অমনি দয়ায় পূর্ণ হয়
তার চিত।
অমনি দুঃখের ভরে,
চাতকীর কার্য্য করে,
গলিয়া জীবন রূপে
হয় নিপতিত।

মাখা মাখি দুই জনে,
যে সান্ত্বনা পায় মনে,
দুঃখে কেহ দুঃখী কার
হইলে কখন;
যে দুখ পেয়েছে আগে;
সেই দুঃখ নাহি জাগে,
হৃদয়ে আনন্দে মগ্ন
পূর্ব্বের মতন!
দাঁড়া কাদম্বিনি!
তুই মুহূর্ত্তের তরে।

চড়িয়া কল্পনা রথে,
যাই আমি শূন্য-পথে,
শিষ্য করি মোরে তুমি
লহ সঙ্গে করে।
পরের দুঃখেতে গলে,
যেতে পারি যে কৌশলে,

শিখাইতে হবে তাহা,
যে কৌশলে তুমি,
চাতকী কাতর স্বরে,
যাও গলে একেবারে,
যাহে শান্তি-সিক্ত হয়
তার চিত্ত ভূমি।
আমি তোর মত করে,
বেড়াইব দেশান্তরে,
যথায় শুনিব কার করুণ রোদন।
যথায় শুনিব কাণে,—
ভাল বাসা পোড়া প্রাণে
কত ব্যথা দিইয়াছে—
'গেলরে জীবন———'
এ বলিয়া শোক ভরে,
কাঁদে কেহ উচ্চস্বরে।
আমি তথা গিয়ে গলে
পড়িব অমনি,
সমবেদনার ভরে
কাঁদিয়া তখনি!
আমি তার কার্য্য করে,
মিশে যাব দুঃখভরে,
অবশ্য কতক তার
হইবে সান্ত্বনা।
ভুলিবে ক্ষণেক তরে,
যাহে প্রাণ দগ্ধ করে.
অহো! সেই বিষ মাখা
বিরহ—বেদনা।
দাঁড়া মুহূর্ত্তের তরে,
কাদম্বিনী! শূন্য ভরে,
অই খানে একবার
সুদূর গগনে।
ততক্ষণ—যতক্ষণ
না মিলি দুজনে

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

প্রবোধমালা। শ্রীদীন বন্ধু গোস্বামী প্রণীত। বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মুল্য ৵১০।

প্রবোধ-মালা কতকগুলি সদুপদেশ-পূর্ণ পদ্যময় গ্রন্থ। সংগীত ও পদ্য যে উপদেশ সমস্ত বহন করে, তাহা গদ্যের উপদেশ অপেক্ষা সমধিক হৃদয়গ্রাহী হয়। বিশেষতঃ সুকৌশলী কবির লেখনী হইতে তৎসমস্ত প্রসূত হইলে মন বিমোহিত হইয়া যায়। আমরা প্রবোধ-মালা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহাতে যে সমস্ত উপদেশ নিহিত আছে, তাহা অতি সাধারণ ও সর্ব্বজন বিদিত। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় এমনি কৌশল সহকারে তৎসমস্তের আবির্ভাব করিয়াছেন যে, সে গুলি যেন নুতন হইয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইতেছে। ভাষা স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক ছিল।

৪র্থ খণ্ড, । ৯ম ও ১০ম সংখ্যা ।　　　　শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১২৮৩ ।

ও

প্রতিবিম্ব ।

(মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন ।)

বিষয়　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　পৃষ্ঠা

কলিকাতা ।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিং লাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত ।

নুতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

১২৮৩

মূল্য ৺৹ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

১। জ্ঞানাঙ্কুরের মূল্য বিষয়ক নিয়ম ;—

বার্ষিক অগ্রিম	......	......	... ..	......	৩৲
ষাণ্মাষিক ,,	......	......	......	...	১৸৹
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	......	......	......	......	।৵৹

এতদ্ব্যতীত মফঃসলে গ্রাহকদিগের বার্ষিক ।৵৹ ছয় আনা করিয়া ডাক মাশুল লাগিবে।

২। যাঁহারা জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য স্বরূপে ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা কেবল অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন ; এবং প্রত্যেক টাকাতে /৹ এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইবেন, কেননা বিক্রয় করণ কালে আমাদিগকে টাকাতে /৹ আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

৩। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের কার্য্য সম্বন্ধে পত্র এবং সমালোচনের জন্য গ্রন্থাদি আমরা গ্রহণ করিব। রচনা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমাদের ঠিকানায় "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব সম্পাদক" শিরোনামা দিয়া লিখিতে হইবে।

৪। ব্যারিং ও ইন্সফিসেণ্ট পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট — শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্যানিং লাইব্রেরী — জ্ঞানাঙ্কুর কার্য্যাধ্যক্ষ।

রণ-চণ্ডী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

জ্ঞানাঙ্কুর হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রাহা প্রণীত নূতন উপন্যাস। মূল্য টাকা ১৲ টাকা। ডাকমাসুল ৵৹ আনা। ঢাকা ন্যাশনাল ডিপজিটরীতে এবং ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীব্রজমাধব বসু।

অভিজ্ঞান শকুন্তল উপলক্ষে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্ব্বশীর উল্লেখ।

শকুন্তলা কালিদাসের জীবনসর্ব্বস্ব, ভারতের অমূল্য রত্ন, জগতের অদ্বিতীয় প্রেম প্রস্রবণ। যিনি যেরূপ ভাবুক, যেরূপ প্রেমিক হউন না কেন, শকুন্তলা সকল নয়নেরই অমৃত বর্ত্তিকা, সকল হৃদয়েরই আকর্ষণী বিদ্যা। শকুন্তলা যুবতী—ইহা বলিয়া যে কেবল যুবকেরই হৃদয়ের ধন, তাহা নহে, শকুন্তলা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরি সমান আদরের পাত্র, সমান স্নেহের সামগ্রী। সরলতা-প্রিয় বালক বালিকার নিকট শকুন্তলা সারল্যের প্রতিকৃতি, যুবকের নিকট অদ্বিতীয় রূপ গুণবতী যুবতী, প্রেমিকের প্রেমিকা, বৃদ্ধের স্নেহের পুত্তলী, বনিতার প্রিয়তমা সখী ও পূজ্যতমা পাতিব্রত্যের মূর্ত্তিময়ী প্রতিমা। যিনি যে ভাবে কথা কহুন, শকুন্তলা সহাস্য বদনে তাঁহাকে সেই ভাবেই উত্তর প্রদান করিতেছেন। কেহই শকুন্তলার নিকট হতাদর হন না। কিন্তু—

অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং।
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি ভুবি॥

বস্তুত সে পুষ্পের প্রকৃত আঘ্রাণ কয়জনে পাইয়াছেন? বিধাতা কাহার করতল এমন প্রেমময় নখরে রঞ্জিত করিয়াছেন, যে যাহাতে ছিন্ন হইয়াও সে কিসলয় সজীব থাকিতে পারে? এমন কণ্ঠই অতি বিরল, যাহা সেই রত্নের উপযুক্ত, বা সেই সুমধুর মধুরসাস্বাদনে প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন, জগতে এমন কয়জন ব্যক্তি আছেন? কেহ না কেহ আছেন।

যদিএবং প্রত্যাদেশঃ খলু ভাবুকানাম্।

শকুন্তলার কালিদাস শকুন্তলাকেই দেখিয়াছেন, শকুন্তলার কালিদাস শকুন্তলাকেই জানিয়াছেন, অন্যের বুদ্ধি অন্যের হৃদয় তাহা জানিবার অধিকারী নহে। শকুন্তলার কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি—সুলেখক লিখিত শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহাতে যদি শকুন্তলার প্রকৃতভাব হৃদয়গ্রহ হইত, তাহা হইলে লোকের মুখে শুনিয়া বা চিত্র দেখিয়া দুষ্মন্তেরও শকুন্তলা জন্য বিরহ নির্ব্বাপিত হইত। সে চিত্র কে চিত্রিত করিবে?

"চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্ব যোগা রূপোচ্চযেন মনসা বিধিনা কৃতা নু। স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে ধাতুর্ব্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ।।"

গঠনে অঙ্গ কঠিন হইবে, এই আশঙ্কায় বিধাতা স্বয়ং যে অঙ্গ চিত্রিত করিয়া চেতনাদান করিয়াছেন, যে চিত্রে তিনি এই কঠিনতর পাঞ্চভৌতিক বর্ণ কি তুলিকার সম্পর্ক রাখেন নাই, তাঁহার আয়ত্তীভূত সমস্ত রূপ রাশিই যাহার বর্ণ এবং বিধাতার মনই যাহার আঁকিবার তুলিকা ; অধিক কি, যে বিধাতা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থেরই এক মাত্র বিভুত্বের নির্ণায়ক, যে শকুন্তলা সেই বিধাতারও বিভুত্বের নির্ণায়ক হইয়াছেন ; তাহা কে আঁকিবে ?

দুষ্মন্তের প্রবেশ হইতে প্রস্থান পর্য্যন্ত হৃদয়ের সহিত যিনি শকুন্তলাকে দেখিয়াছেন, তিনি জানেন যে শকুন্তলার মূর্ত্তি চিত্রিত হইবার নহে। শকুন্তলা মনের সম্পত্তি—যিনি জগতের সমস্ত ভাবুকের শিরোভূষণ, সেই কালিদাসেরই মনের সম্পত্তি ; মনের সমগ্র শক্তি নিয়োগ কর, দেখিতে পাইবে শকুন্তলার কোন একটী প্রত্যঙ্গও মনের আয়ত্তের বিষয় নহে। যত দেখ, ততই শোভার আতিশয্য ; যত ভাব, ততই সুমধুর।

শক্তির লেখনী কালিদাসের করসংস্পর্শে কেবল যে এই রত্নই প্রসব করিয়াছেন, তাহা নয়। ঐলেখনীই কাব্যে রামগিরি শিখরে যক্ষের বিরহে উন্মাদিনী, ভব সংসারে কুমারের জননী, এবং ধরাধামের অতুল্য নরপতি বংশ রঘুবংশের জনয়িত্রী। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ প্রভৃতি ঋতু লক্ষ্মী সেই লেখনীরই অমূল্য সম্পত্তি, সেই লেখনীই ভবমাতা ভবগেহিনীকে স্তবে তুষ্ট করিয়াছেন, সেই লেখনীই শ্লোকাষ্টকে সমস্ত আদিরস নিবদ্ধ করিয়াছেন ; নাটকে শকুন্তলার ন্যায় বিক্রমোর্ব্বশীও সেই লেখনীর অন্যতর সম্পত্তি।

কেহ কেহ বলেন, এই সকল কাব্য নাটকাদির ন্যায় মালবিকাগ্নিমিত্রও কালিদাসের সম্পত্তি। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় যখন মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাস-গ্রথিত-বস্তু বলিয়া উল্লেখ আছে, তখন অবশ্য আমরা উহা কালিদাস প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিলাম ; কিন্তু যে কালিদাস শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, রঘু, কুমার প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন, উহার প্রণেতাও কি সেই কালিদাস ? কখনই না। বাল্যকালের রচনা, হইলেও কি, যে কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীর প্রস্তাবনায় "যাবদার্য্যাবিদগ্ধমিশ্রান্ শিরসা প্রণিপত্য বিজ্ঞাপয়ামি,

প্রণয়িষু দাক্ষিণ্যবশাৎ অথবা সদ্বস্তুবহুমানাৎ।

শৃণুত জনা অবধানাৎ ক্রিয়ামিমাং

কালিদাসস্য ॥”

শকুন্তলার প্রস্তাবনায়।

“ আপরিতোষাৎ বিদুষাং।
ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানাং
আত্মান্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।”

রঘুবংশের প্রারম্ভে।

মন্দঃ কবিযশঃ-প্রার্থী
গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভা-
দুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥”

লিখিয়াছেন, সেই কালিদাস কি মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায়,—

“পরিপার্শ্বিকঃ। প্রথিতযশসাং-ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্বতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ?

সূত্র। অয়ি বিবেকশূন্যমভিহিতম্; পশ্য।

“ পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং।
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥”

লিখিতে পারেন? বিশেষ যে কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র সমগ্র রচনা করিয়াও পরে রত্নাবলীকার প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐ রূপ কবিতা ঐ স্থলে রাখিতে পারিয়াছেন, পরে শকুন্তলা প্রভৃতির নাম মনে হওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মালবিকাগ্নিমিত্রের গল্প ও ভাব আদ্যোপান্ত রত্নাবলী হইতে গৃহীত, অথচ রত্নাবলী হইতে যতদূর হইতে পারে, ততদূর নিকৃষ্ট। যিনি তাহাও বুঝিতে না পারিয়া ঐ রূপ কঠোর ভাষায় নিজের গরিমা প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই কি পরে লেখনী হস্তে শকুন্তলার নিকট উপস্থিত হইবেন? ইহা হইতে হাসিবার বিষয় আর কি হইতে পারে?

মালবিকা কালিদাসের নিতান্ত বাল্যকালের সখী, স্বীকার করিলাম, কিন্তু যিনি মালবিকাকে লইয়া রঙ্গ মধ্যেই অতদূর পীড়া পীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার বালকত্ব কিরূপ? মালবিকার গ্রন্থকার যে একজন পূর্ণ বয়স্ক উদ্ধত যুবক, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভাল, প্রথম যৌবন বিকারে লোকে উদ্ধত স্বভাব হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থাই কালিদাসের কাব্য রচনার প্রথম অবস্থা, স্বীকার করিলেও যে কালিদাস,—রাম কালে রাবণ বধ করিয়াছিলেন বলিয়া, বাল্যকালে তাড়কা বধেও রামের ঘৃণার ভাব উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কালিদাস, শকুন্তলা রচনার পর নিজের সম্পত্তি হইলে সমগ্র মালবিকাগ্নিমিত্র খানি কি ভস্মসাৎ করিতে পারেন নাই? অন্ততঃ ঐ কবিতাটীর বিষয় কি একবার ভাবিতেও পারেন নাই?

মালবিকাগ্নিমিত্র যে কালিদাসের প্রণীত নয়, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। যদি কালিদাসের প্রণীত হইত, তাহা হইলে কাব্যপ্রকাশকার প্রাচীন কাব্যকার মাত্রেরই কাব্যের কোন না কোন স্থল স্বপ্রণীত কাব্যপ্রকাশে উদ্ধৃত করিয়া অলঙ্কারের উদাহরণ ও কাব্যের দোষ গুণ বিচার করিয়াছেন, উহাতে কালিদাসের অন্যান্য প্রায় সমুদায় গ্রন্থেরই শ্লোক ও স্থল বিশেষের উল্লেখ দেখা যাইতেছে, কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রের নাম গন্ধ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? এরূপ প্রমাণ যে ঐ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ, তাহা আমরাও স্বীকার করি না। কিন্তু ঐ মালবিকাগ্নিমিত্রই যে কালিদাসের সত্ত্বাসত্ত্ববিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহাতে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। এ বাক্যের সত্যাসত্য বিষয়ে যাহাঁদের সন্দেহ হইবে, তাহাঁরা কালিদাসের যে কোন গ্রন্থের সহিত মালবিকাগ্নিমিত্রের একবার তুলনা করিয়া দেখিবেন যে, ভাষা, ভাব, রচনা কৌশল, নায়ক নায়িকার বংশগরিমা, বর্ণনার সারূপ্য কিছুই কালিদাসের সহিত মিলিবে না। সাধারণের বিশেষ দৃষ্টির জন্য আমরা এস্থলে উহার দুই একটী স্থলের উল্লেখ করিতেছি।

ভাব গ্রহণ করিতে গিয়া ভাষা ও ভাবের ব্যত্যয়,—

মালবিকাগ্নিমিত্রে—

প্রথমামিব পল্লবপ্রসূতিং
হরদগ্ধস্য মনোভবদ্রুমস্য ॥ (১)

শকুন্তলায়—

হরকোপাগ্নিদগ্ধস্য দৈবেনামৃতবর্ষিণা।
প্ররোহঃ সম্ভৃতো ভূযঃ কিংস্বিৎ
কামতরোরয়ম্ ॥ (২)

(১) এস্থলে প্রথমত দগ্ধবৃক্ষের পল্লবপ্রসূতিইত অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, কর্কশ ভাষার অপরিপক্কতা এবং ভাবেরও ব্যত্যয় ঘটিয়াছে।

(২) ইহা শুনিতেও যেমন কর্ণসুখকর ভাবেও সেইরূপ হৃদয় তৃপ্তিকর। দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার করস্পর্শ করিয়াছেন, তখন তাহাঁর মনোবৃত্তি শকুন্তলার অন্যান্য অঙ্গের অবধারণে সক্ষম হয় নাই, কামরূপ বীজের যাহা কিছু সম্পাত্তি তাহা তিনি সেই করেই পাইয়াছিলেন,এইজন্যই কালিদাস ওস্থলে মনোভবদ্রুমের পল্লব করেন নাই অঙ্কুর মাত্রই করিয়াছেন। শুদ্ধ উহা বলিয়াই যে কবির চিত্তবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাহা নয়; যে অঙ্কুর দুষ্মন্ত করে নিহিত হইয়াছিল সে অঙ্কুর দৈবদত্ত অমৃতরসেই অঙ্কুরিত. অমৃতরসেই আপ্লুত। অমৃত-স্পর্শে নির্জীব সজীব হইয়া থাকে, উহাই হরকোপাগ্নিদগ্ধ কামের সজীবতার কারণ। আবার দুষ্মন্ত যে শুদ্ধ সজীব কামাঙ্কুর করে পাইয়াছেন, তাহা নয়, যে অমৃতের বলে দেবতারা অমর, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্, সেই অমৃতেই রঞ্জিত কামের অঙ্কুর

মালবিকাগ্নিমিত্রে,

রাজা। মূর্দ্ধ্না প্রতিগৃহীতং বচঃ সিদ্ধিদর্শিনো ব্রাহ্মণস্য।

বিক্রমোর্ব্বশীতে।

রাজা। প্রতিগৃহীতং ব্রাহ্মণবচনম্॥ (৩)

মালবিকাগ্নিমিত্রে—

বৈতালিকঃ।

পত্রচ্ছায়াসু হংসা মুকুলিতনয়না দীর্ঘিকাপদ্মিনীনাং।
সৌধান্যত্যর্থতাপাদ্বলভিপরিচয়দ্বেষিপারাবতানি।
বিন্দূৎক্ষেপাৎ পিপাসুঃ পরিসরতি শিখী ভ্রান্তিমদ্বারিযন্ত্রং
সর্ব্বৈরুস্রৈঃ সমগ্রস্ত্বমিব নৃপ গুণৈর্দীপ্যতে সপ্তসপ্তিঃ॥ (৪)

তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন; একে রক্ষা নাই, দুইএর সমবায় আজ তাঁহার করতলে—কে কত দূর যাইতে পার যাও। কালিদাসের ভাবুকতার সীমা বুদ্ধির বিষয়াতীত। ' প্রথমামিব" এই ইব শব্দের পরিবর্ত্তে কালিদাস "কিংস্বিৎ কামতরোরয়ম্" কিংস্বিৎ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এস্থলে ইব শব্দ ও কিংস্বিৎ শব্দের অর্থগত তারতম্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে, যে, যে কালিদাসের ওরূপ স্থলে কিংস্বিৎ শব্দের ব্যবহারের ক্ষমতা আছে, সে কালিদাস কখনই ওরূপ স্থলে আর নির্জ্জীব ইব শব্দের ব্যবহার করিতেন না।

(৩) "প্রতিগৃহীতং ব্রাহ্মণবচনম্।" এই অর্থে মালবিকাগ্নিমিত্রের গ্রন্থকার "মূর্দ্ধ্না প্রতিগৃহীতং বচঃ সিদ্ধিদর্শিনো ব্রাহ্মণস্য" ঈদৃশ বাগাড়ম্বর ও যার পর নাই কর্কশ করিয়া তুলিয়াছেন।

(৪) হংসগণ রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া দীর্ঘিকাস্থিত পদ্মবন সকলের পত্রচ্ছায়াতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, পারাবত কুল সন্তপ্ত অট্টালিকাসকলের বলভি সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছে। ময়ূর সলিল পানে অভিলাষী হইয়া জল বিন্দুর উদ্গাম বশত কার্য্যনিরত জল যন্ত্রাভিমুখে গমন করিতেছে। এবং তপননেব সমগ্র গুণে পরিগত তোমার ন্যায় সমগ্র কিরণে পরিগত হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন। —এই কি কালিদাসের উপমা? এস্থলে "পদ্মবন (সকলের)" সকল শব্দটী নিরর্থক। সন্তাপ জন্য যদি শীতল স্থলের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একদেশ সন্তপ্ত সলিলের অন্যস্থল শীতল হইতে পারে না। যদি শুদ্ধ মস্তকোপরি রৌদ্রতাপ নিবারণার্থ পত্রচ্ছায়ার উল্লেখ, হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সলিলোপরি হংসগণকে মুকুলিত নয়নে অবস্থিতি করিতে দেখা যায় না। "ভ্রান্তিমৎ" অর্থ যদি কার্য্যনিরত হয়, তাহা হইলে "জলবিন্দুর উদ্গামবশত" এই হেতুবাদ নিরর্থক। জযন্ত্রের কার্য্যই যখন জলবিন্দুর উৎক্ষেপ, তখন জলবিন্দুর উৎক্ষেপ বশত একথা বলা এক জন কবির যোগ্য হয় নাই। বাক্য সন্নিবেশ দোষে ইহার কোন কোন স্থলের প্রকৃত অর্থ সহজত অন্যরূপে প্রতীয়মান হয়। ভ্রান্তিমৎ বিন্দূৎক্ষেপ প্রভৃতি অপ্রচলিত পদ বিন্যাস দোষও ইহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিক্রমোর্ব্বশীতে—

উষ্ণালুঃ শিশিরে নিষীদতি তরোর্মূলা-
লবালে শিখী।
নির্ভিদ্যোপরি কর্ণিকারকুসুমান্যাশেরতে
ষট্পদাঃ।
তপ্তং বারি বিহায় তীবনলিনীং কারণ্ডবঃ
সেবতে।
ক্রীড়াবেশ্মনিবেশিপঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো
জলং যাচতে। (৫)

(৫) ময়ূর গ্রীষ্মতাপে তাপিত হইয়া তরুমূলস্থিত সুশীতল আলবালে নিষণ্ণ রহিয়াছে, ভ্রমরগণ কর্ণিকার কুসুমের উপরিভাগ ভেদ করিয়া কুসুমমধ্যে অবস্থান করিতেছে, কারণ্ডব (হংসবিশেষ) উত্তপ্ত সলিল পরিত্যাগ করিয়া তীরনলিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং ক্রীড়াগৃহ নিবিষ্ট পিঞ্জরস্থ শুকপক্ষী ক্লান্ত হইয়া জল প্রার্থনা করিতেছে।—কারণ্ডব খড়-হাঁস, ইহারা গৃহপালিত নহে, জলই ইহাদের আশ্রয়, জল মধ্যে ইহারা বাসও করিতে পারে। কিন্তু সমুদায় সলিলের উষ্ণতা বশত এক্ষণে ইহারা স্বেচ্ছায় তীরনলিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীষ্ম সাতিশয় প্রবল না হইলে তির্য্যক্ জাতির গ্রীষ্ম জন্য ক্লেশ অনুভব হয় না। এই জন্য গ্রীষ্মাধিক্য বর্ণনাভিপ্রায়ে এস্থলে কেবল তির্য্যক জাতিরই উল্লেখ হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রের কবিতাতেও তির্য্যক জাতির উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু গ্রীষ্মধিক্য বশত যে তাহাদিগেরও গ্রীষ্মাধিক্য ঘটিয়াছে, তাহা কিছুতেই প্রকাশ হয় নাই, হংস গণ আতপ ভয়ে পদ্মপত্রের ছায়ায় উষ্ণ জলের উপর বসিয়াই নিদ্রা যাইতেছে, বলভি সন্তপ্ত হওয়াতেই পারাবত কুল তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ময়ূর জলপানার্থ ধারাযন্ত্রাভিমুখে গমন করিতেছে। শীতেও তৃষ্ণার সম্ভব। কিন্তু বিক্রমোর্ব্বশীর ময়ূরের গ্রীষ্মাতিশয় বশত স্বেচ্ছায় বৃক্ষশাখাকেও পরিহার ও সজল আলবাল আশ্রয়, ষট্পদের সুস্নিগ্ধ কর্ণিকার মধ্যে অবলম্বন এবং গৃহমধ্যস্থ হইলেও শুকপক্ষীর গ্রীষ্মজন্য ক্লান্তি এবং সেই ক্লান্তি জনাই জল প্রার্থনা উহাদিগের গ্রীষ্মাধিক্য প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ প্রত্যেক স্থলেরই দোষ গুণ বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইবে। বাহুল্য ভয়ে আমরা প্রত্যেক স্থলের অনুবাদ করিতে পারিলাম না। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলে ভাবুকমাত্রেই দুই কালিদাসের তারতম্য বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে কালিদাস সর্ব্বাঙ্গীন কবিত্ব গুণে পরে ভারতের শিরোমুকুট হইয়াছিলেন, প্রথম রচনা বলিয়া কি সমগ্র মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যে এক পংক্তিতেও তাঁহার কবিত্বগুণের ঘুণাক্ষরেও এক অংশ রক্ষিত হইল না? ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

মালবিকাগ্নিমিত্রে—

মাল। দুল্লহো পিও তস্মিং ভব হিঅঅ
নিরাসং
অম্মো অপঙ্গও সে ফুরই কিম্পি বামও।
এসো সো চিরদিট্টো কহং উণ দট্টব্বো।
নাহ মং পরাহীণং তুই গণঅসতিণ্ণম্॥

বিক্রমোর্ব্বশীতে—

রাজা। অসুলভা সকলেন্দুমুখী চ সা
কিমপি চেদমনঙ্গবিচেষ্টিতং।
অভিমুখীষ্বিব বাঞ্ছিতসিদ্ধিষু
ব্রজতি নির্ব্বৃতিমেকপদে মনঃ।

একরূপস্থলে ঘটনা সাম্যে বর্ণনা ভাব ও ভাষার তারতম্য।

মালবিকাগ্নিমিত্রে—

হরদত্তঃ। রাজার সমীপগমন
দ্বারে নিযুক্তপুরুষানুমতপ্রবেশঃ।
সিংহাসনান্তিক চরেণ সহোপসর্পন্।
তেজোভিরস্য বিনিবর্ত্তিতদৃষ্টিপাতৈঃ
বাক্যাদৃতে পুনরিব প্রতিবারিতোঽস্মি॥

শকুন্তলায়—

শার্ঙ্গরবঃ। মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ।
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব॥

মালবিকাগ্নিমিত্রে—

রাজা। বোঢ়া কুরুবকরজসাং কিসলয়পুটভেদশীকরানুগতঃ।
অনিমিত্তোৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসোং মলয়বাতঃ।

বিক্রমোর্ব্বশীতে—

রাজা। নিষিঞ্চন্ মাধবীং লক্ষ্মীং লতাং কান্দীঞ্চ লাসয়ন্।
স্নেহদাক্ষিণ্যয়োর্যোগাৎ কামীব প্রতিভাতি মে।

আর অধিক দেখাইবার আবশ্যক নাই, ভাবুকমাত্রেই দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন, কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত মালবিকাগ্নিমিত্র একত্র সন্নিবিষ্ট হইলেও যেন কালিদাসকে অপমানিত করা হয়। মালবিকাগ্নিমিত্রে নূতন কিছু নাই, নূতনের মধ্যে,—যাহা কুৎসিত, লোকের অরুচিকর, তাহাই মালবিকাগ্নিমিত্রের নূতন। সাধারণের দৃষ্টির জন্য আমরা এস্থলে একাদিক্রমে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

মালবিকা মুগ্ধা,—মুগ্ধার মুগ্ধত্ব ও রাজার প্রণয় মালবিকাগ্নিমিত্রের কালিদাস এস্থলে কেমন রক্ষা করিয়াছেন, তাহা এই উদ্ধৃত অংশ পাঠেই বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

রাজা মালবিকা, বিদূষক ও বকুলাবলিকা একত্র মিলিত।

বকুলা। সহি বহুসো কিল ভট্টা বিপ্পলদ্ধো, তা অত্তা বিস্সণীও করীঅদু। (৬)

মাল। মম উণ মন্দভাগাএ সিবিণঅসমাগমোপি দুল্লহো আসী। (৭) (রাজা ও বিদূষক উভয়ের সম্মুখে মুগ্ধা কুলবালার উক্তি!)

(৬)। বিদূ। ভোদি সাঅরিএ বিসদ্ধা ভবিঅ পিঅবঅস্সং আলাবেহি। রত্না॰

(৭)। রাজা। প্রজাসারাৎখিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ　শকু॰

রাজা। কথমুপলভে নিদ্রাং স্বপ্নে সমাগম কারিণীম্।　বিক্র॰

বকুলা। এদু ভট্টা দেহি সে উত্তরম্। (৮)

(রাজার পরিচারিকার রসিকতা!)

রাজা। উত্তরেণ কিমাত্মৈব পঞ্চবাণাগ্নিসাক্ষিকম্। তব সখ্যৈ ময়া দত্তো ন সেব্যঃ সেবিতা রহঃ॥ (৯)

(উত্তর নির্জ্জনের কামনা।)

বকুলা। অনুগ্‌গহিদম্হি। (১০)

বিদূ। পরিক্রম্য সসম্ভ্রমম্। বউলাবলিত্র অশোঅপল্লাবাইং অহিলম্ভইদুং ইচ্ছদি হরিণো এহি ণিবারেম ণং। (১১)

বকু। তহ। ইতি প্রস্থিতা। (১২)

রাজা। এবমেবাস্মিন্ রমণীয়েবিলম্বিতেন ভবিতব্যম্।

(রাজা প্রণয়ী!)

বিদূ। এব্বম্পি গোদমো ণিদ্দিসদি।

বকু। অজ্জ গোতম হং অপ্যআসে চিট্টামি। তুমং দুবাররক্‌খও হোহি।

বিদূ। জুজ্জদি।

নিষ্ক্রান্তা কুলাবলিকা।

বিদূ। ইমং দাব ফটিঅত্থম্ভং সংসিদো ভোমি। তথা কৃত্বা। অহো সুহ-ফরিসদা সিলাবিসেসস্স। ইতি নিদ্রায়তে। (১৩)

(রঙ্গভূমিতেই অবস্থান, ও অঘোর নিদ্রা!)

রাজা। মালবিকা সসাধ্বসং তিষ্ঠতি। বিসৃজ সুন্দরি সমাগমসাধ্বসং, তব চিরাৎপ্রভৃতি প্রণয়োন্মুখে।

পরিগৃহাণ গতে সহকারতাং

ত্বমতিমুক্তলতাচরিতং ময়ি॥ (১৪)

(কি সুন্দর রচনা কৌশল! রাজা বহুদিন হইতে প্রণয়ে উন্মুখ ছিলেন, আজ সেই প্রণয় চরিতার্থ হইবে। গ্রন্থকারের প্রণয় জ্ঞান মন্দ নয়।)

---

(৮)। সুসং। পিঅসহী সাআরিআ চিট্টদি, তা গদুঅ এসা পসাদীঅদু।রত্না০

(৯)। রাজা। অনির্দ্দেশ্যসুমং স্বর্গং কথং বিস্মারয়িষ্যতে।

অনন্যনারীসামান্যো দাসশ্চায়ং পুরূরবাঃ॥ বিক্রং০

রাজা। পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বেপ্রতিষ্ঠে কুলে মম। সমুদ্র রসনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্॥ শকু০

(১০)। চিত্র। অণুগ্গাহিদম্হি। বিক্রং০

(১১)। প্রিয়ং। সদৃষ্টিক্ষেপং। জহ এসো ইদো দিণ্ণদিট্টী উস্‌সুও মিঅপোদও, মাদরং অণ্ণেসদি এহি সংজোএ মণং। শকু০

(১২)। উভে। প্রস্থিতে।শকু০

(১৩) "রাজা। এবমেবাস্মিন্ রমণীয়ে" হইতে "বিদূ নিদ্রায়তে" পর্য্যন্ত এইটুকু নূতন। কোন নাটকে এরূপ স্থলে এতদূর কুৎসিৎ রসের অবতারণা নাই বলিয়াই এইটুকু নূতন।

(১৪)। মাধ। জীবয়ন্নিব সমূঢ়সাধ্বসস্বেদবিন্দুরধিকণ্ঠমর্প্যতাং। বাহুরৈন্দবময়ূখচুম্বিতস্যন্দিচন্দ্রমণিহারবিভ্রমঃ॥ মালতী০

রাজা। ইত্যাহ্লাদকরাখিলাঙ্গি রভসান্নিঃশঙ্কমালিঙ্গ্য মাং অঙ্গানি ত্বমনঙ্গতাপবিধুরাণ্যেহেহি নির্ব্বাপয়॥ রত্না০

মাল। দেবীভআদো অত্তণোবি পিঅং কাদুং ণ পারেমি। (১৫)

রাজা। ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং। (কি ভাষার পরিপাট্য!)।

মাল। সোপালম্ভং (কি মুগ্ধার ভাব!)। জো ণ ভাঅদি সো মএ ভট্টিণী-দংশণে দিট্টসমত্থো ভট্টা। (১৬)

রাজা। দাক্ষিণ্যং নাম বিম্বোষ্ঠি নায়কানাং কুলব্রতম্।

তন্মে দীর্ঘাক্ষি যে প্রাণাস্তে ত্বদাশা-নিবন্ধনাঃ ॥ (১৭)

তদনুগৃহ্যতাং চিরানুরক্তোঽয়ং জনঃ। ইতি সংশ্লেষমুপজনয়তি। (রঙ্গভূমিতেই এইরূপ ব্যাপার! কি কুৎসিত অভিরুচি!)

---

(১৫)। এরূপ উক্তি দেবীর পালিতা মুগ্ধা মালবিকার সদৃশ হয় নাই। রত্নাবলিতে এরূপ ভাব অন্য প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

সাগ। বিমৃশ্য সাশ্রম্। বরং দাণিং সঅং জ্জেব অত্তাণঅং উব্বন্ধিঅ উবরদ ভবিস্সং। ণ উণ বিদিদসঙ্কেদবুত্তন্তাএ সুসঙ্গদাএ সহ দেবীএ পরিভূদা চিট্টিস্ত। রত্না০

(১৬)। সাগ। ভট্টা কিংএদিণা অলিঅদাকৃখিণ্যেণ, জীবিদাদোবি অধিঅবল্লভাএ দেবীএ পুণোবি অত্তাণঅং অবরাহিণং করেসি। রত্না০

(১৭)। রাজা। ইত্থংনো সহজাভিজাত্যবনিতা সেবৈব দেব্যাঃ পরম্। প্রেমাবন্ধবিবর্দ্ধিতাধিকরসা প্রীতিস্তু যা সা ত্বয়ি॥ রত্না০

মালবিকা নাট্যেন পরিহরতি।

রাজা। রমণীয়ঃ খলু নবাঙ্গনানাং মদনবিষয়াবতারঃ, এষা হি।

হস্তং কম্পয়তে রুণদ্ধি রসনাব্যাপারলোলাঙ্গুলীঃ

স্বৌ হস্তৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাৎ।

পাতুং পক্ষ্মলনেত্রমুন্নময়তঃ সাচী করোত্যাননম্।

ব্যাজেনাপ্যভিলাষপূরণসুখং নির্ব্বর্ত্তয়ত্যেব মে॥ (১৮)

রঙ্গভূমির উপযুক্ত অভিনয়ই বটে, গ্রন্থকার কালিদাসই বটেন।

(১৮)। রাজা। অহো কোঽপি কামিজনস্য স্বগৃহিণীসমাগমপরিভাবিনোঽভিনবজনং প্রতি পক্ষপাতঃ।

প্রণয়বিশদাং দৃষ্টিং বক্ত্রে দদাতি ন শঙ্কিতা, ঘটয়তি ঘনং কণ্ঠাশ্লেষে রসান্ন পয়োধরৌ। বদতি বহুশো গচ্ছামীতি প্রযত্নধৃতাপ্যহো, রময়তিতরাং তথাপি হি সঙ্কেতস্থা কামিনী॥ রত্না০

রত্নাবলিতে সঙ্কেতস্থলে একাকী বসিয়া রাজা এইরূপ কল্পনা করিতেছেন, কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রে রাজা রঙ্গভূমিতে মালবিকাকর্ত্তৃক শ্লোকোক্ত ঐ ঐ বিষয়ে প্রতিহত হইয়াই আক্ষেপ করিতেছেন, কেবল রঙ্গভূমি বলিয়াই গ্রন্থকার বল প্রকাশে সাহসী হইতে পারেন নাই।

এই রূপ বোধ হয় পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কয় খানি পুস্তকের সহিত প্রত্যেক অংশ মিলান যাইতে পারে। কিন্তু যে যে পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে তাঁহার ভাষা ভাব গল্প কৌশল রক্ষিত হইয়াছে, কেবল ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, এই মাত্র বিশেষ।

রসসাগর।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

একদা প্রশ্ন হইল, "তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে।" রসসাগর পূরণ করিলেন;—

করি, হরি, হরিণী, মরাল, সুধাকর।
পিক আদি তোর নামে ফরিদী বিস্তর॥
এই কথা দূতী গে জানায় শ্রীরাধারে।
তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে॥

উপস্থিত বক্তার পক্ষে এরূপ ভাবশুদ্ধ কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকগুলি ফরিয়াদী একত্রিত হইয়া শ্যামচাঁদের নিকট শ্রীরাধার নামে অভিযোগ করিয়াছে। সেই সকল ফরিয়াদীর মধ্যে করি, হরি, হরিণী, মরাল, সুধাকর ও পিক প্রধান। তাহাদের অভিযোগের কারণ এই;—রাধিকা করির কুম্ভ, হরির মধ্যস্থান, হরিণীর নয়ন, মরালের গমন, সুধাকরের সুধা, পিকের স্বর চুরি করিয়াছেন। দূতী রাধিকাকে জানাইতেছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট তোমার নামে এই রূপ অভিযোগ হওয়ায়, তাঁহার দরবারে তোমার তলব হইয়াছে। রসসাগর মহাশয় যে কীদৃশ অসাধারণ শক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

এক সময়ে প্রশ্ন হইল "বাহবা বাহবা বাহবা জী।" রসসাগর এই প্রশ্নের দুইটী উত্তর রচনা করেন। প্রথমটী বাঙ্গলা, দ্বিতীয়টী হিন্দী। দ্বিতীয়টী এখন প্রকাশ করা গেল না, রসসাগরের সকল হিন্দী শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিয়া শেষে লিখিত হইবে। বাঙ্গলা শ্লোকটী এই;—

রাধা কলঙ্কিনী, ব্রজপুরে ধ্বনি,
জানি বৈদ্যরাজ কহিল কি।
আজ্ঞা শিরে ধরি, করিল শ্রীহরি,
ভানুর ঝি তায় ভানুর ঝি॥
তব কৃপা হরি, এ কুম্ভ ঝাঝরী,
পুরিয়া সে বারি আনিয়াছি।
বদন তুলিয়ে, চাও হে কালিয়ে,
বাহবা বাহবা বাহবা জী।

এস্থলে "ভানুর ঝি" এই শব্দদ্বয়ে বৃকভানু নন্দিনী রাধিকা এবং সূর্য্যতনয়া যমুনা বুঝাইবে।

প্রশ্ন "কোন ছার পতঙ্গ?" রসসাগরের পূরণ;—

আপনি বলেন বানী যাহার বদনে।
হেন কালিদাস হত বেশ্যার ভবনে॥
মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ভীমরণে ভঙ্গ।
এ রস-সাগর ভবে কোন ছার পতঙ্গ॥"

প্রশ্ন "ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এই মাত্র।" রসসাগরের পূরণ;—

বার বার যাতয়াত নিজ কর্ম্ম সূত্র।
পূর্ব্বকথা নাহি মনে কি নাম কি গোত্র ॥
জঠরে পরমানন্দে ছিলাম পবিত্র।
ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এইমাত্র।

প্রশ্ন "হাট শুদ্ধ এই তো।" রসসাগরের পূরণ;—

দেহের গৌরব মন,
পর ভার্য্যা পর ধন,
বাঞ্ছা করে সর্ব্বক্ষণ,
পুণ্যাঙ্কুর নাই তো।
পশু পক্ষী কীটে খাবে,
অথবা অনলে দিবে,
দেহরত্ন কেড়ে লবে,
আটকান সেই তো ॥
এ রস সাগরে মত্ত,
সম্পদ গিরীশ দত্ত,
থাকিলে কিঞ্চিৎ সত্ত্ব,
পরিচয় দেই তো।
মন তুমি বড় মন্দ,
ত্যজে কালী পাদ পদ্ম,
কাল পাশে হলে বদ্ধ,
হাট শুদ্ধ এই তো।

একবার প্রশ্ন হইল "হাটে মামা হারালাম।" এই সময়ে রাণাঘাট নিবাসী প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী নীলকমল পাল চৌধুরীর ছাগল মারার মোকদ্দমা সকলের স্মৃতিপথে জাগরিত ছিল। উক্ত বাবুর মাতুল এই মোকদ্দমায় কারাগারে যান। রসসাগর মহাশয় এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া সমস্যা পূরণ করিলেন।

ঘরে ঘরে বাধা বাধি কেন লাঠী ধরালাম।
অভাগী খুল্লনার মত বনে ছাগ চরালাম॥
যে ছিল সঞ্চিত ধন নেড়েন বুক ভরালাম।
নীলকমল বাবু কাঁদে হাটে মামা হারালাম॥

এক সময়ে প্রশ্ন হইল, "দণ্ডভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে।" রসসাগর মহাশয় পূরণ করিলেন;—

মৃত্যুকালে পাতকী পড়িয়া খাবি খায়।
সন্নিকটে শ্মশানে ঘেরিল ধর্ম্ম রায় ॥
আকার ইঙ্গিতে ভাষে হেনু লয় চিত্তে।
শি-কার বি-কার কিম্বা ব্র-কারের দিত্বে ॥
যদি ব্যক্তি করে উক্তি কার শক্তি ধরে।
দণ্ড ভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে ॥

শি-কার অর্থাৎ শিব, বি-কার অর্থাৎ বিষ্ণু, ব্রকার অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইহাদিগের দিত্ব অর্থাৎ এই কয়টী নাম দুই দুই-বার উচ্চারণ করিলে দণ্ডধর দণ্ডভয়ে নমস্কার করিবেক।

প্রশ্ন "বন্ধ্যা নারীর অন্ধপুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়।" রসসাগরের পূরণ;—

যামিনী কামিনী বন্ধ্যা সুমেরুর ছায়।
উপজিল তম পুত্র অন্ধকার প্রায় ॥
ক্রমে ক্রমে উগরায় ক্রমে ক্ষয় পায়।
বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখতে পায় ॥

"বন্ধ্যা নারীর সন্তান" ইহাই নিতান্ত অসম্ভব, তাহার পরে আবার তাহার "অন্ধপুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়" তাহাও সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব। এরূপ উৎকট প্রশ্নের যিনি সদুত্তর দান করি-

তে পারেন, তিনি যে অপ্রাকৃত মনুষ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? যামিনীকে বন্ধ্যা কামিনী সাজাইয়া রসসাগর মহাশয় উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন।

এক জন অতি দরিদ্র ছিলেন, হঠাৎ কোন রাজসংসার ভাঙ্গিয়া এক কালে ধনসম্পত্তিশালী হইয়া উঠেন। এক সময়ে তিনি অনেক অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া তুলা করেন। তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন, রসসাগরও তন্মধ্যে ছিলেন। রসসাগরের অবয়ব দেখিলে তাঁহাকে বড় লোক বলিয়া বোধ হইত না। কৃতী দান দিবার সময়ে রসসাগরকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়াছিলেন, কিন্তু নিকটে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তিনি রসসাগরকে বিলক্ষণ রূপে চিনিতেন, তিনি কহিলেন, মহাশয় করিলেন কি! ইনি নবদ্বীপাধিপতির সভাপণ্ডিত রসসাগর। কর্ম্মকর্ত্তা ঈষৎ পরিহাসের সহিত কহিলেন "ইনিই কি রসসাগর? সাবাস সাবাস, সাবাস!" এই পরিহাস বাক্যে রসসাগর কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া নিম্ন লিখিত শ্লোক রচনা করিলেন;—

ধন্য রে বিধাতা তুই
যারে যখন যা পাস।
রাজ্য ভেঙ্গে হাতীর বোঝা
গাধার পিঠে চাপাস॥
তুলো কত্যে মূলো দান,
বেরিয়ে পলো কাপাস।
ডল্‌তে ডল্‌তে মাকাটী বেরুলো
সাবাস, সাবাস সাবাস॥

একদা প্রশ্ন হইল "অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল।" রসসাগর তাহার এই রূপ পূরণ করিলেন;—

হাঁরে বিধি নিদারুণ কত খেলা খেল।
সংসারের যন্ত্রণা যত হাবাতের ঘাড়ে ফেল॥
বেতোরোগা কেঁদে বলে কোন্ দিন বা ভাল
অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণ মাসী এল

এক দিন মহারাজ আনন্দময়ী দর্শনে গমন কালে পথিমধ্যে দেখিলেন, যে এক জন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া জনৈক রাজ সহচর কহিলেন "ইনিই আবার বড় লোক?" মহারাজ রসসাগরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রশ্ন করিলেন 'ইঁদুর বড় সাঁতারু তার মার্গে খুদের পরো!" রসসাগর তৎক্ষণাৎ উপস্থিত ঘটনা সূত্রে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী পূরণ করিলেন।

ভক্ত হলেন খ্রীষ্টান,
দেবতা হলেন ঈশু।
সেই ধর্ম্মে রত হলেন,
যত নর পশু।

সতী গেলেন অধোগতি,
স্বর্গে যাবে জেরো।
ইঁদুর বড় সাঁতারু তার,
মার্গে খুদের পরো॥

এ স্থলে জেরো শব্দে জারজ বুঝাইবে।

একদা প্রশ্ন হইল "ধান ভান্তে মহীপালের গীত।" রসসাগরের পূরণ;—

অম্বিকা নগরে ভাই চিত্ত চমকিত।
মরা মানুষ জিয়ে এসে করে রাজনীত॥
পরাণে না সহে আর এত বিপরীত।
খেতে শুতে ধান ভান্তে মহীপালের গীত॥

জাল প্রতাপ চাঁদ অম্বিকা কালনায় আসিয়া রাজা বলিয়া জাহির হন। এই বিষয়ে পরিহাস করিবার জন্য উপরিউক্ত শ্লোক রচিত হয়।

প্রশ্ন "কি করে তা দেখি।" রসসাগরের পূরণ;—

আশুতোষ দেহি গঙ্গা আশুতোষ হয়ে।
নারায়ণ বলে মরি তব জলে রয়ে।
আমি হে পাতকী অতি যমে দিয়া ফাঁকি
যমদূতে বিষ্ণু দূতে কি করে তা দেখি॥

ক্রমশঃ।

আর্য্যজাতির ভূবৃত্তান্ত।

(চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ সংখ্যক পত্রিকার অনুবৃত্তি

চতুর্থখণ্ডের ষষ্ঠ সংখ্যক জ্ঞানাঙ্কুরে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি থাকার সুষ্পষ্ট প্রমাণ দিব, এই জন্য অগ্রে তাহাই ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী, তয়া যৎ, খস্থং গুরু স্বাভিমুখং —" (ইত্যাদি সিদ্ধান্তশিরোমণি দৃষ্টি কর)। অর্থ এই যে, এই পৃথিবী আকর্ষণ শক্তিমতী; পৃথিবী সেই স্বীয় আকর্ষণশক্তি দ্বারা আকাশস্থিত গুরু বস্তুকে আপনার অভিমুখে আনয়ন করিয়া থাকে।

ভাস্করাচার্য্যের এই উক্তি যদিও বৈদিক কাল অপেক্ষা আধুনিক, তথাপি উহা ইংরাজজাতির গৌরবাস্পদ নিউটনের নিকট অতি পুরাতন। নিউটনের আয়ুঃ এক্ষণে অনধিক দুইশত বৎসর; কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের আয়ুঃ সহস্রাধিক বৎসর;—সুতরাং ভাস্করাচার্য্যের নিকট নিউটন অতি বালক। আমাদের ভাস্করাচার্য্যের পুরাতনত্ব আর নিউটনের বালকত্ব নির্ণয় করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ইংরাজজাতির শ্লাঘাস্থান নিউটনের পূর্ব্বেও যে আর্য্যজাতিরা পার্থিবতত্ব বিদিত ছিলেন, তন্মাত্র ব্যক্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে দেখা যাউক যে "পৃথিবী সচলা কি অচলা," অর্থাৎ ঐ দুই পক্ষ লইয়া কোন্ আর্য্য কি বলিয়াছেন, তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক।

পুরাণাদি প্রাচীন মতে পৃথিবী

অচলা। আর, নব্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে পৃথিবী সচলা। এই দুই পক্ষ এ পর্য্যন্ত অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইয়াছে কি না বলা যায় না। ফল আর্য্য শাস্ত্রের যেরূপ গতি দৃষ্ট হয়, তাহাতে উভয় রূপই প্রতিপন্ন হইতে পারে। স্ফুট গণনা, সঞ্চার গণনা, গ্রহণ গণনা, —যে কিছু জ্যোতিষিক কার্য্যযোগ, সমস্তই পৃথিবী বা রাশিচক্র, একটা ঘুরিলেই" সিদ্ধ হয়। যুক্তি ও খণ্ডন উভয় পক্ষেই তুল্য রূপে বর্ত্তমান। সুতরাং, কোন মত যে সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। যাহাই হইক, আমরা যখন জ্যোতিঃ শাস্ত্রের কথা বলিতেছি না, তখন সে সকল যুক্তি ও খণ্ডন উদ্‌ঘাটিত না করাই ভাল। তথাপি, কিয়দ্দূরে তাহার কিছু কিছু বলিব। আর্য্যজাতির জ্ঞান উহার কত দূর স্পর্শ করিয়াছিল, তাহাও দেখাইব। বস্তু কথা এই যে, শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা উভয় পক্ষই সমর্থিত হইতে পারে। যে শাস্ত্রে পৃথিবী অচলা বলিয়া পরিচিত, সেই শাস্ত্রের বচনান্তর দ্বারাই পৃথিবীর চলবত্বা সিদ্ধি করা যাইতে পারে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থে পৃথিবী অচলা বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। তদনুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরাও অচলা পক্ষে বিশ্বাস রক্ষা করিতেছে; সুতরাং সে পক্ষ প্রকট করিবার আবশ্যক নাই। তবে চল পক্ষের বিষয়ই আমাদের এখন বিচার্য্য।

এই চল পক্ষে অন্য কোন আর্য্যের আস্থা থাকুক বা না থাকুক, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা আর্য্যভট্ট এই মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। যথা,—

"ভ-পঞ্জরঃ স্থিরো ভু-রেবাবৃত্ত্যাবৃত্ত্য প্রাতিদিবসিকাং বুদয়াস্তৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহানাম্।"

(ইত্যাদি আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থ দেখ)

অর্থ এই যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডল স্থির; পৃথিবীই স্বয়ং আবর্ত্তন দ্বারা গ্রহ নক্ষত্র গণের প্রাতিদিবসিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে।

এই মহাত্মা আধুনিক জ্যোতির্বিদ্গণের ন্যায় পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক দ্বিবিধ গতি স্বীকার করেন। *

* "পৃথিবী আবর্ত্তিত হয়" এই কথা শুনিয়া মনে করিবেন না যে, আর্য্যভট্ট অধুনিক। পৃথিবী যৌবন কালে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধর সন্তান প্রসব করেন নাই, আর বৃদ্ধ বয়সে গ্যালেলিওর ন্যায় একটিমাত্র মনীষাসম্পন্ন সন্তান প্রসব করিয়াছেন, ইহা মনে স্থান দিতে নাই। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ব্রহ্ম গুপ্ত, যিনি ৫৫০ শকে জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহার পৌর্ব্বকালিক বিষ্ণু গুপ্ত, শ্রীসেন, দুর্গ সিংহ,—ইহাঁরা যাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া সম্মান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে (আর্য্যভট্টকে) বৃদ্ধের ন্যায় মান্য না করা তরল বুদ্ধির কার্য্য।

ফল, পূর্ব্বকালে আর্য্যদিগের মধ্যে উভয়বিধ মতাক্রান্ত লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে কি না, অ-

ব্রহ্ম গুপ্ত ও বরাহ মিহির প্রভৃতিকে আর্য্য ভট্টের নামোল্লেখ ও তাঁহার বচন গ্রহণ এবং বিক্রমাদিত্যের শাক ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কিন্তু আর্য্যভট্ট তাহা না করিয়া যুধিষ্ঠিরের শাক গ্রহণ ও লুপ্তকীর্ত্তি আর্য্যগণের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দৃষ্টে এবং অন্যান্য প্রমাণ আলোচনা দ্বারা নির্ণয় হয় যে, আর্য্য ভট্ট অন্যূন ১৪ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

চল পক্ষের লোকই অধিক। তন্মধ্যে যাঁহারা পৃথিবীর গতি স্বীকার করিতেন তাঁহারা অচল পক্ষের প্রতিকূলে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আবার যাঁহারা রাশিচক্রের গতি অঙ্গীকার করেন, পৃথিবীর গতি স্বীকার করেন না, তাঁহারাও পৃথিবীর গতি নিরূপক মতের দোষ এবং তাহার প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সকল কথা আগামী মাসের জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশ করা যাইবেক।

(ক্রমশঃ।)

বিমলা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রামনগরের প্রান্তভাগে প্রশস্ত ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে সরমা ও আর একটী বালিকা বসিয়া রহিয়াছেন। সরমা অধ্যয়নে নিযুক্তা। তাঁহার হস্তে "বীরাঙ্গনা কাব্য।" সরমা পড়িতেছেন—সময়ে সময়ে উদ্বিগ্নের ন্যায়, যেন কি কোথায় হারাইয়াছেন ভাবিয়া, চারিদিকে চাহিতেছেন, আবার পড়িতেছেন।

সরমা সুন্দরী। তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। দেহের গঠন অতি পরিপাটী। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, অতি স্নিগ্ধকারী ও মনোরম। লোচন যুগল নিবিড় কৃষ্ণ ও আয়ত। সরমা নিতান্ত কৃষাঙ্গী নহেন বা নিতান্ত স্থূলাও নহেন। তাঁহার দেহ হাড়ে মাসে জড়িত।

সরমার নিকটে যে বালিকা বসিয়া আছে, সে তাঁহার স্বামী সূর্য্যকুমারের সোদরা। তাহার বয়স অনুমান সাত বর্ষ। বালিকা একটী বাক্স লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। বাক্স মধ্যে নানাবিধ পুত্তলী। বালিকা কাহাকে পুত্র, কাহাকে কন্যা, কাহাকে পৌত্র, কাহাকে দৌহিত্র রূপে সাজাইয়া সংসারের সমস্ত সাধ মিটাইতেছে। কখন বা কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইল দেখিয়া তাহার বিবাহের নিমিত্ত ঘোর চিন্তা

করিতেছে, কখন বা পুত্রবধূ সুন্দরী হয় নাই বলিয়া দুঃখিতা হইতেছে। বালিকার বাক্স মধ্যে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা বা তদপেক্ষা অল্প সময়ে, সূর্য্যোদয় হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত হইতেছে ও তদনুযায়ী সাময়িক কার্য্য সমস্তও সম্পন্ন হইতেছে।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া সরমা পুস্তক রাখিলেন। বালিককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

" হিমু! কি হচ্চে ? "

হেমাঙ্গিনী তখন নাতিনীর বিবাহে লোকজন খাওয়াইতে বড় ব্যস্ত। সরমার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সরমা আবার কহিলেন,—

" হিমু! হাসছিস, বকাছিস, হাত নাড়ছিস তুই পাগল হলি নাকি ? "

হিমু এবারেও সরমার কথা শুনিল না। সরমা ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া হেমাঙ্গিনীর একটী পুত্তলী অপহরণ করিলেন। যেটী চুরি করিলেন সেটী হেমাঙ্গিনীর ছেলে। চোরে হেমাঙ্গিনীর ছেলে চুরি করিল, হেমাঙ্গিনী তখন তাহা জানিতে পারিলেন না। ক্ষণপরে হেমাঙ্গিনীর অপহৃত পুত্রের প্রয়োজন হইল। চারিদিকে সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। তখন দুঃখিত স্বরে সরমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"বৌ! আমার ছেলে কি হলো ?"

বধূ সরমা হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—

"হিমু! তোমার কি লুকিয়ে বিয়ে হয়েছিল ?"

বালিকা এ পরিহাসে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। বলিল,—

"বল, আমার ছেলে কোথায় ?"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"আগে তোমার বর হউক, তার পর তবে ছেলে।"

হেমাঙ্গিনী কুপিত ভাবে বলিল,—

"যাও।"

সরমা বলিলেন,—

"কেন বর কি চাও না ?"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন,—

"যাও, আঁ্যা, আমার ছেলে কোথায় বল।"

পরিহাস প্রিয়া সরমা হেমাঙ্গিনীর পুত্তলী দিলেন। বলিলেন,—

"বিয়ে হলে আর তো খেলা হবে না।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন,—

"তবে বিয়ে হবে না।"

"বিয়ে হবে না তবে কি অইবুড় থাকবি ?"

হেমাঙ্গিনী ঈষৎ হাস্য করিলেন।

সরমা আবার বলিলেন,—

"তবে সেই কথাই ভাল। আজ সকলকে বলিব এখনি যে, হিমুর বিয়াহের দরকার নাই।"

সরমার এ কি প্রকৃতি! তাঁহার চিরপরিচিতা পরমাত্মীয়া বিমলার বিপদ সংবাদ তাঁহার অগোচর নাই। অন্য বিপদ সমস্তের বার্ত্তা অদ্যাপি নানাবিধ কারণে তাঁহাদের কর্ণগোচর হয় নাই। না হউক—তথাপি এক বিমলার বিপদই কি তাঁহার পক্ষে কম? তবে সরমার এ ভাব কেন? এ হাস্য মুখ কেন? সরমা নবনীত পুত্তলী। সরমা তো পাষাণী নহেন। এ সুকুমার দেহ মধ্যে কি আয়স হৃদয় প্রতিষ্ঠিত আছে? সরমা বিমলার যৎপরোনাস্তি দুর্বিপাক সংবাদ জানিয়া কই বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছেন না তো; কই সে জন্য উদ্বেগ নাই তো। সরমা পড়িতেছেন, হাসিতেছেন ও বিদ্রূপ পরিহাস করিতেছেন। এ সংসারে যে না কাঁদিবে, তাহাকে কে কাঁদাইতে পারে? এ সংসার পাপ, তাপ, ক্লেশ, শোক, দুঃখ পরিপূর্ণ। ইহা কাঁদিবারই উপযুক্ত স্থল। এই ঘোর বিষাদ ও যন্ত্রণা রাশি পরিবেষ্টিত বিশ্ব ধামে যে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে, তাহার ক্ষমতা প্রশংসনীয়। সে ব্যক্তি মহৎ। যে না কাঁদিবে তাহাকে কে কাঁদাইতে পারে? এ কথা যথার্থ। কিন্তু সংসারে না কাঁদিয়া কটা লোক থাকিতে পারে? প্রতিহিংসার তীব্র আক্রমণ কে উপেক্ষা করিতে পারে? কৃতান্তের কঠোর শাসন কে হাসিয়া উড়াইতে পারে? যন্ত্রণার জ্বলন্ত শিখায় দগ্ধ হইয়া কে স্থির থাকিতে পারে? অবনীর অসংখ্য আপদে কাহার মস্তক সর্ব্বদা অচঞ্চল থাকে? এ সংসারে না কাঁদিয়া কে, থাকিতে পারে? যে বুঝিয়াছে যে দিবারাত্রি ক্রন্দন ধ্বনিতে স্বর্গ মর্ত্ত চরাচর বিদারণ করিলেও কৃতান্তের করাল কবল হইতে বিগতজীব সুহৃদের পুনর্জীবন প্রাপ্তি অসম্ভব, যে বুঝিয়াছে যে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে আজীবন কাল প্রজ্জ্বলিত পাবক রাশি প্রতিষ্ঠিত রাখিলেও এ সংসারে মনের বাসনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, যে বুঝিয়াছে যে, নেত্র নিঃসৃত অশ্রুবারি সমবেত হইয়া যদি অতি বিস্তৃত জলধি পরিমিত করা যায়, তথাপি জীবনের আশা সম্পূর্ণ হয় না, যে বুঝিয়াছে যে, অবক্তব্য চেষ্টা করিলেও যে বিপদের প্রতিবিধান করা মনুষ্য সাধ্যের অতীত তজ্জন্য চিন্তা করা মূঢ়ের কার্য্য, সে সহজে কাঁদে না। সেইরূপ লোককে জগতে সকলেই প্রশংসা করে। তিনিই স্থির, ধীর শান্ত ও বিবেকী বলিয়া উক্ত হন। জগতে সেরূপ উদার দেব প্রকৃতির লোক বড় অল্প। মায়া মোহাবৃত মানব হৃদয়ের তদ্রূপ উন্নতি সহজে হয় না। যদি কেহ সে উন্নতির নিকটস্থ হন তিনি প্রশংসনীয়। সরমার প্রকৃতি

অনেকাংশে এইরূপ স্বর্গীয় উদারতার নিকটস্থ। তিনি পাষাণী নহেন। তাঁহার হৃদয় দয়া দাক্ষিণ্যাদি কমনীয় গুণ সমূহে পরিপূর্ণ।

সরমা হেমাঙ্গিনীর সহিত পরিহাস করিতেছেন। এত দুঃখের অবস্থায় যাহার মুখে হাসি সে সংসারের অতি আদরণীয় সম্পত্তি।

হেমাঙ্গিনী বলিল,

"বৌ! তুমি যে বই পড়ছ, আমাকে তাই পড়াবে?"

সরমা বলিলেন,—

"এ বই বিয়ের পর স্বামীর কাছে পড়তে হয়।"

"তবে আমার বিয়ে হউক।"

"কার সঙ্গে?"

"যার সঙ্গে হয়।"

"আমার সঙ্গে?"

"দূর!"

"কেন?"

"মেয়ে মানুষে মেয়ে মানুষে কি বিয়ে হয়?"

"তবে রাঙ্গাবর খুঁজতে বলি।"

হেমাঙ্গিনী নীরব। সরমা বলিলেন,—

"আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি তোমায় পুতুল খেল্‌তে দিব।"

"আচ্ছা আর কারও সঙ্গে বিয়ে হলে খেলা করতে দেবে না?"

"না।"

"কেন?"

"স্বামীকে যে মান্য করতে হয়। তাঁর ইচ্ছায় চল্‌তে হয়।"

"স্বামী কি মারে?"

সরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—

"না। স্বামী ভালবাসে, আদর করে।"

"মিথ্যা কথা। তা হলে স্বামী আমাকে খেলা করতে, আমোদ করতে, দেবে না কেন?"

"যে তোমাকে ভাল বাসে, তুমি তাকে ভাল বাস না?"

"বাসি; তোমাকে, দাদাকে, মাকে আমি সবাইকে ভাল বাসি।"

"তোমার স্বামী তোমাকে ভাল বাস্‌লে তুমি তাঁকে ভাল বাস্‌বে?"

"বাসিব।"

"যাতে স্বামী খুসী হন তা না করলে তোমার ভাল বাসা হলো কই?"

"আমি যাতে খুসী হই তা না করলে স্বামীরই বা আমাকে ভাল বাসা হলো কই?"

সরমা মনে মনে বলিলেন,—

"প্রণয়ের প্রথম কথা কাহাকেও শিখাইতে হয় না। কি আশ্চর্য্য! কিন্তু বঙ্গদেশ"—

অপর প্রকোষ্ঠে পদধ্বনি হইল। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যকুমার সরমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সূর্য্যকুমারের বয়স পঞ্চবিংশ বৎ-

সরের ন্যুন নহে তাঁহার দেহ পূর্ণ ও আয়ত, বক্ষ বিশাল, বাহুদ্বয় মাংসল লোচন যুগল উজ্জ্বল ও বুদ্ধি প্রকাশক। বদন সুন্দর—সাহস,ভদ্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ব্যঞ্জক।

সূর্য্যকুমার বিদ্বান্। ভদ্র ও অমায়িক বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি ও তিনি সাধারণের প্রিয় পাত্র। লোকের বিপদ বা সম্পদ উভয় অবস্থাতেই সূর্য্যকুমার অগ্রসর। সূর্য্যকুমারকে দেখিয়া যেন বোধ হয় যে, ধন ও বিদ্যা এক সঙ্গে থাকিতে পারে না, এ কথা মিথ্যা। সূর্য্যকুমার অপেক্ষা ধনে রামনগরে অনেকে প্রধান। কিন্তু সূর্য্যকুমারের প্রতি সাধারণের যেরূপ অনুরাগ সেরূপ আর কাহারও প্রতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। সূর্য্যকুরের নিরহঙ্কার, অমায়িকতা, ভদ্রতা ও পরোপকার প্রবৃত্তিই তাহার কারণ। সূর্য্যকুমারের সাহসও বড়। যে কার্য্যে লোকে ভয় ক্রমে হস্তক্ষেপ করে না, সূর্য্যকুমার আবশ্যক হইলে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

সূর্য্যকুমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যকুমার সূর্য্য হাসিতে হাসিতে উদয় হইলেন। আর সরমা কমলিনীও বিকশিতা হইলেন। সূর্য্যকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—

"সরমা! কি হইতেছে?"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তোমার ভগ্নীর বিবাহের পরামর্শ হচ্ছিল।"

হেমাঙ্গিনী পুত্তলীর বাক্স ফেলিয়া এক দৌড়ে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। সূর্য্যকুমার হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"তা কি স্থির হলো?"

"ও বিবাহ কর্‌বে না।"

"কেন?"

"ও প্রণয় চায়। পুরুষ তো ভাল বাসিতে জানে না।"

সূর্য্যকুমার হাসিয়া বলিলেন,—

"ভেবে ভেবে খুব স্থির করেছ তো!"

সরমা গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন,—

"এ কি মিছে কথা?"

সূর্য্যকুমার সরমার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—

"হাঁ, তা কি হতে পারে? তোমার মুখের কথা আর বেদ একই।"

সরমা বদনে কাপড় দিয়া হাসিলেন।

সূর্য্যকুমার কহিলেন,—

"যোগেশের কি অন্যায় দেখ দেখি। বিমলার সেই সংবাদ দিল, আর তো কিছু লিখিল না। কি জানি কি হইল। আমি তো বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। রুদ্রকান্ত বড় দুর্ব্বুদ্ধির লোক। কি করি বল দেখি?"

সরমা বলিলেন,—

"তুমি একটী লোক পাঠাও।"

সূর্য্যকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"না, লোক পাঠাইলে হইবে না। কালি প্রাতে আমি স্বয়ং যাইব স্থির করিয়াছি।"

সরমা কহিলেন,—

"আমি অনেক দিন তাঁহাদের দেখি নাই। আমিও তোমার সঙ্গে যাই না কেন?"

"না॰ এ সঙ্গে তোমার গিয়ে কাজ নাই। তুমি বরং পরে যাইও। আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না।"

সরমা বলিলেন,—

"কি জানি।"

"দেখ কালি আমার সহিত পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে যত দূর জানিতাম সমস্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, 'অবন্তীপুরের জমীদার বড় মন্দ লোক। এ ব্যাপারে তাহার কোন চক্রান্ত আছে বোধ হয়।' কথাটী আমার মনে লাগিয়াছে। আমি বড় অস্থির হইয়াছি। কালি প্রাতে যাই, কি বল?"

সরমা বলিলেন,—

"দেখ তুমি একা গিয়ে কোন কার্য্য উদ্ধার হবে না। আমি সঙ্গে থাকলে সব কাজ হতো।"

"এ কথা আমি অস্বীকার করি না। এ হৃদয়ে তুমি বুদ্ধি, এ দেহে তুমি প্রাণ তা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি।" সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তবে বুদ্ধি প্রাণ ছেড়ে ভেড়াকান্ত হয়ে গেলেই কি, না গেলেই কি?"

"এবারে না হয় তোমার বুদ্ধি একটু ধার করে নিয়ে যাব।"

"তবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে না। সাধে কি বলি যে পুরুষে ভাল বাস্‌তে জানে না। আমি সঙ্গে না গেলে তুমি বাঁচ। তাই যাও।"

সূর্য্যকুমার সরমাকে আলিঙ্গন করিলেন। সরমা ভুজ-লতা-দ্বারা সূর্য্যকুমারের গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে সূর্য্যকুমার দৌবারিকাদি সঙ্গে লইয়া পাল্কী করিয়া রামনগর যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিপ্রহর কালে রৌদ্র চম্, চম্ করিতেছে। আশ্রয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া ক্লেশকর। হরিপাড়া গ্রাম যেন জনশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। জনপ্রাণী সকলেই ছায়াতলে শয়ন করিয়া শ্রান্তি লভিতেছে। গ্রামের এক পার্শ্বে আম্র, কাঁঠাল, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি বিস্তর বৃক্ষের ঝোপ। সেই উদ্যান বা

বন মধ্যে এক খানি সুপরিস্কৃত খড়ের ঘর। গৃহস্বামীর গুণে সেই বাগান বা বন সুপরিস্কৃত, নির্ম্মল ও ঝরঝরে। ঘর খানির অবস্থা আরও প্রশংসনীয়। ঘর খানি এমনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, এমনি সুরুচি-সম্পন্ন যে, অতি মনোরম সৌধ ত্যাগ করিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত সেই ঘরের দাবায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে সাধ যায়।

সেই ঘরের মধ্যে একটী সুপরিস্কৃত সামান্য শয্যায় একজন নিদ্রা দিতেছিল। শয্যার অনতিদূরে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। সেই সুন্দরী মনোরমা। মনোরমা ক্ষণেক পরে পুস্তক রাখিয়া দিলেন। নিদ্রিত ব্যক্তিরও নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। এই নিদ্রিত ব্যক্তি আমাদের চিরপরিচিত যোগেশ। যোগেশ এখানে? ঘটনাচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া যোগেশ এই অচিন্তিত পূর্ব্ব স্থানে সমাগত। এ ব্যাপারে কিছুই বিচিত্রতা নাই। পাঠক আপনি বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন না। যোগেশ রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। তিনি বসিলেন; দেখিলেন মনোরমা বসিয়া আছেন। সস্নেহে কহিলেন,—

"ভগ্নি! তুমি নিয়ত এই খানেই বসিয়া আছ?"

মনোরমা বলিলেন,—

"হাঁ"

যোগেশ কহিলেন,—

ভগ্নি! তোমার এই স্নেহ অতি অমূল্য সম্পত্তি। আমি তো মরিয়া গিয়াছিলাম। প্রান্তর মধ্যে আমার পাল্কি রাখিয়া বাহকেরা বিশ্রাম করিতে গেল, তৎপরে কে আমায় গুরুতর আঘাত করিল, আর আমি কিছু জানি না। পরে যখন আমার চেতনা হইল, আমি শুনিলাম হরিপাড়ায় রহিয়াছি। দেখিলাম তোমার ও নরেন্দ্রর স্নেহ আমার জীবনে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে। ভগ্নি! তুমি আমাকে এত যত্ন কেন করিতেছ? আহার নিদ্রার অন্যথায় তোমার পীড়া হইতে পারে। আমি তো সুস্থ হইয়াছি। ভগ্নি! আমার জন্য আর কোন চিন্তা নাই।"

যোগেশ দেখিলেন মনোরমার চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে।

সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"মনোরমা! কাঁদিতেছ কেন দিদি?"

মনোরমা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—

"এ জীবনে কেহ আমার সহিত এমন আদর করিয়া কথা কহে না।"

কথাটী যোগেশের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন,—

"ভগ্নি! একটী কথা তোমায় মনে করিয়া দি। আজ তাহার অন্যথা করি-

লে চলিবে না।”

মনোরমা বলিলেন,—

“বল।”

যোগেশ কহিলেন,—

“যখন প্রথমে আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিলাম আমার শয্যার এক পার্শ্বে তুমি, অপর পার্শ্বে নরেন্দ্র বসিয়া প্রাণপণে আমার শুশ্রুষা করিতেছ। তোমরা আমার জন্য যেরূপ যত্নশীল ও উদ্বিগ্ন দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম ভাই-ভগ্নী ততদূর হয় না। আমি অবাক হইলাম। সকলই স্বপ্ন বোধ হইতে লাগিল। কোথায় হইতে কোথায় আসিয়াছি, তাহা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক এ বিস্ময় অধিকক্ষণ থাকিল না। অতি অল্প কথায় নরেন্দ্র আমাকে সমস্তই বুঝাইয়া দিলেন। আমি সেই দিন হইতে তোমাকে সোদরাপেক্ষা স্নেহ ও আপন জ্ঞান করি। নরেন্দ্র সংক্ষেপে আমাকে আত্ম পরিচয় দিলেন। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তুমি কাঁদিতে লাগিলে। আমার বড় কৌতূহল হইল, বড় দুঃখ হইল। পাছে তোমার চক্ষু দিয়া আবার জল পড়ে এই ভয়ে আর ও কথা তুলিলাম না। এই ব্যাপারের পর আমার বড় জ্বর হয়। নরেন্দ্র কি কার্য্যে গিয়াছিলেন, তুমি আমাকে ঔষধ খাওয়াইতে আসিলে। আমি বলিলাম, ভগ্নি! আমাকে আত্ম বিবরণ না জানাইলে আমি কদাচ ঔষধ খাইব না। তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে যে, আমার জ্বর সারিলে তুমি সমস্ত কথা বলিবে। ভগ্নি! আমার তো জ্বর সারিয়াছে। বল আজ তোমার কথা বল। তুমি আমাকে আপন হইতে আপন বিবেচনা কর তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তবে ভগ্নি! আমাকে না বলিবে কেন?”

মনোরমা ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—

“বলিব,ভ্রাতঃ! তোমাকেই বলিব। আমার শোকাবহ কথা শুনিবার একমাত্র তুমিই উপযুক্ত পাত্র।”

যোগেশ আরও কৌতূহলী হইলেন।

মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—

“কিন্তু আমি বড় হতভাগিনী। ভয় হয় পাছে সমস্ত কথা শুনিয়া তুমিও আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা কর, আমার সহিত সাদরে কথা না কও, আমাকে দেখিলে মুখ ভার কর। আমার কপাল বড় মন্দ।”

যোগেশ বলিলেন,—

“মনোরমে! তোমার কাহিনীতে এমন কিছুই থাকিতে পারে না, যেজন্য তোমাকে ঘৃণা করা যায়। তোমার চরিত্রে দোষ থাকা অসম্ভব। আমি দেখিলেও তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে যদি তোমার কাহিনীতে সেরূপ কিছুই থাকে, নিশ্চয় জানিও আমি

তোমাকে সাহস দিতেছি যে, তজ্জন্য আমার স্নেহ, মমতা টলিবে না, ভাঙ্গিবে না। মনোরমা! কি বলিবে বল।"

মনোরমা উন্মাদিনীর ন্যায় অস্থিরতা সহকারে স্বীয় কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়দিগের সুবিধার জন্য আমারা তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

মনোরমা বাল্যকালেই পিতৃহীনা। জননী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ ছিল না। দরিদ্র তনয়া মনোরমা ও তাঁহার জননী কথঞ্চিৎ রূপে জীবিকাপাৎ করিতেন। অতি অল্প আয়ে পল্লিগ্রামে জীবিকা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। কায়ক্লেশ মনোরমার মাতা তাহা সংগ্রহ করিলেন। মনোরমার যখন আট বৎসর বয়স তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে পাত্রস্থা করিলেন। মনোরমার জন্য চিন্তা হইতে তিনি অবসর পাইলেন মনে করিতেন। কিন্তু সকলই বিপরীত হইল। এক বৎসরের মধ্যে মনোরমার স্বামী বিগতজীব হইলেন। মনোরমা বাল বিধবা। মোমের পুতুল মনোরমার সত্ব হইল না। লতিকা ভূমে লুটাইতে লাগিল। মনে সুখ নাই, কিন্তু স্বাভাবিক শোভা কোথা যাইবে? যৌবনোদয়ে মনোরমার অতুল্য সৌন্দর্য্য ভুবনমোহিনী হইয়া উঠিল।

বলরামপুর প্রভৃতি গ্রামে বরদাকান্ত রায়ের জমিদারী ও নীলকুঠী ছিল। সেই জন্য রুদ্রকান্ত রায় একবার বলরামপুর আইসেন। ভ্রমণ উদ্দেশে তিনি অশ্ব পৃষ্ঠে হরিপাড়ার মধ্য দিয়া গমন করেন। মনোরমার ভুবনমোহিনী রূপ সেই কাণ্ড জ্ঞান বিরহিত যুবকের নেত্র পথে পতিত হয়। মনোরমা সম্বন্ধে রুদ্রকান্তের নিরতিশয় কদর্য্য লালসা উদিত হয়। হিতাহিত বোধ বিহীন রুদ্রকান্ত পবিত্র হৃদয়া বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধন, সম্পত্তি, বল, প্রভুতার দ্বারা কোন্ কার্য্য না সম্পন্ন হইতে পারে? সহায় সম্পত্তি বিহীনা, অনাথিনী, বালিকার কাকুতি মিনতি, রোদন সমস্তই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল। বলপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। চিরদিনের নিমিত্ত সরল পবিত্র হৃদয়ে গরল ঢালিয়া দেওয়া হইল, ঘোর বিষাদ সমুদ্রে তাহার নিঃসহায় জীবন তরণীকে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, তাহার সমস্ত সুখের মূলে বিষম কুঠারঘাত করা হইল, বালিকার নিমিত্ত চিরজীবন রোদন, অন্তর্দাহ ও মর্ম্মবেদনা ব্যবস্থা করা হইল। হায়! ধন ও প্রভুতা গর্ব্বে গর্ব্বিত অবিবেকী পশুবৎ মানবগণ সংসারে কি অত্যাচারই না করিতেছে!

মনোরমার চৈতন্যের উদয় হইল। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার আয়োজন করিলেন। এ কলঙ্কিত দেহ রাখি-

বেন না স্থির করিলেন। মৃত্যু স্থির করিয়া নিভৃত গৃহে মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে গলদেশে ফাঁস দিলেন। লম্বিত হইবেন এমন সময় ঘরের রুদ্ধ দ্বার ঘোর শব্দ সহকারে উন্মুক্ত হইল। এক জন লোক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তিনি মনোরমাকে মরিতে দিলেন না। সেই একজন মনোরমার বাল সহচর, চিরপরিচিত পরম হিতৈষী নরেন্দ্র। নরেন্দ্র মনোরিমাকে মরিতে দিলেন না। নরেন্দ্রের কথা রহিল—মনোরমা মরিতে পাইলেন না। নরেন্দ্র সদা সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রর সহিত চিরকালের ভালবাসা। নরেন্দ্রর এতাদৃশ যত্নে, এতাদৃশ শুভানুধ্যানে সেই ভাল বাসা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যৌবনের ভাল বাসা বেশ গাঢ় হইল। নরেন্দ্র দুঃখিত হইবেন ভাবিয়া মনোরমা এককালে মরিবার বাসনা মন হইতে বিসর্জ্জণ দিলেন। শেষে নরেন্দ্রর সন্তোষ সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। উভয়ের হৃদয়ে প্রেম প্রবাহ সমভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। উভয়ে প্রণয় তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"জগতে মনোরমা ভিন্ন আর কাহাকেও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবেন না।" মনোরমাও বলিলেন,—"সংসারে নরেন্দ্রই তাঁহার সর্ব্বস্ব।" সংসারে যাহাই হউক নরেন্দ্র মনোরমা অভ্যন্তরে অভেদাত্মা। তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বথা নির্দ্দোষ, উচ্চ, উদার ও পবিত্র প্রণয় অধিষ্ঠিত।

যোগেশ সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন,—

"মনোরমে! ভগ্নি! তোমার কথা শুনিয়া আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছি। যেমন করিয়া হউক এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি স্বহস্তে রুদ্রকান্তের এ ঘোর দুষ্কৃতির প্রতিফল দিব। আর ভগ্নি! তুমি এ জন্য এতাদৃশ সঙ্কুচিতা কেন? ইহাতে তোমার অপরাধ কি? অত্যাচারী, জ্ঞানহীন পশুবৎ জঘন্য জীবের দুষ্কৃতির জন্য তুমি কখনই দায়ী নহ। তোমার অপরাধ কি? এ জন্য যে তোমার অপরাধ দেয় নিশ্চয় জানিও সে মূর্খ। সমাজের নিয়মে যদিও ইহাতে তোমাকে দোষী করে, জানিও সে নিয়ম নিরতিশয় ভ্রান্তি মূলক। এই কারণে আমি তোমাকে ভ্রমেও ঘৃণা বা অনাদর করিব না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। ভগ্নি! কেন তুমি কষ্টে নিজ অন্তর সন্তাপিত কর? ইহাতে তোমার দোষ কি? আমি বলিতেছি, ইহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই।"

মনোরমা অবনত মস্তকে বসিয়া

রহিলেন। তাঁহার লোচন দিয়া এক এক বিন্দু অশ্রু পড়িল। যোগেশ আবার বলিলেন,—

"মনোরমে! আবারও কাঁদিতেছ কেন? তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার বড় কষ্ট হয়। মনোরমা তুমি কাঁদিও না।"

মনোরমা ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"সংসারের সকল লোক যদি আমার উপর তোমার মত সদয় হইত!"

যোগেশ বড় দুঃখিত হইলেন। বলিলেন,—

"সংসারের লোকের কথায় তোমার কাজ কি মনোরমা? সংসারের সকল লোকের হৃদয় কি কখন একরূপ হয়? মনোরমা তুমি মানুষ চেন না। সংসারে বিচার নাই। তুমি সেই পাপ সংসারের জন্য চিন্তা করিও না। আমায় বল, আর চক্ষের জল ফেলিবে না?"

মনোরমা বলিলেন,—

"না।"

এই সময় নরেন্দ্র আসিয়া ব্যস্ততা সহকারে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, —

"কি হইতেছে?"

যোগেশ তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুজা খাঁ।—মীর্জা মহম্মদ।—হাজী আহম্মদ ও মীর্জা মহম্মদ আলি।—সুজার সুবাদারী। সরফরাজ খাঁ।—আলিবর্দ্দির সুবাদারী।—মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ।—আলিবর্দ্দির চরিত্র।—তাঁহার উত্তরাধিকারী।—সিরাজের চরিত্র।—তাঁহার সুবাদারী।

জাফরের কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তানাদি ছিল না। সুজা খাঁ নামক এক সদ্বংশীয় ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার বিবাহ হয়। সুজা খাঁ অলস ও দূষিতস্বভাব ছিলেন। তাঁহাকে কর্ম্মিষ্ঠ করিবার নিমিত্ত জাফর, বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী লাভের অনতিকাল পরে, সুজাকে উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন। *

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ২য় তনয় আজীমের, মীর্জা মহম্মদ নামে এক প্রিয় সঙ্গী ছিল। আজীম গতাসু হইলে ক্রমে মীর্জার নিরতিশয় দৈন্য দশা উপস্থিত হইল। সুজা খাঁর সহিত মীর্জা পত্নীর সম্বন্ধ ছিল। সুজার পদ

† Seir Mutaqherin, or Review of Modern Times. Vol. I, Orme's History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan. Vol. II.

প্রতিষ্ঠা শ্রবণে এই দীন পরিবার তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। সুজার অন্য দোষ থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ে দয়া ও উদারতা ছিল। তিনি এই শরণাগত পরিবারকে করুণা পূর্ব্বক সানুগ্রহে গ্রহণ করিলেন। মীর্জ্জা মহম্মদের দুই সন্তান। জ্যেষ্ঠের নাম হাজী আহম্মদ, কনিষ্ঠের নাম মীর্জ্জা মহম্মদ আলি। ক্রমে এই ভ্রাতৃদ্বয়ও উড়িষ্যায় আসিলেন ও রাজ প্রসাদ লাভ করিলেন। হাজী সুকৌশলী, ধীর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বিবেচক এবং কার্য্যকুশল ছিলেন; তাঁহার অনুজের এই সকল গুণ ব্যতীত অধিকন্তু সবিশেষ সমরনৈপুণ্য ছিল। সুতরাং ভ্রাতৃদ্বয় অল্প সময়েই যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠিলেন।*

১৭২৫ অব্দে জাফর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সুজা সুবাদার হইলেন। ১৭২৯ অব্দে সুজা আলিবর্দ্দীকে (মীর্জ্জা মহম্মদ আলির উপাধি) বেহারের শাসন ভার প্রদান করিলেন। আলি অতীব সুচারুরূপে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ১৭৩৯ অব্দে সুজার জীব লীলা শেষ হইল। তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ পিতৃপদের উত্তরাধিকারী হইলেন। †

সরফরাজ যৎপরোনাস্তি কলুষিত স্বভাবান্বিত ছিলেন। স্বভাবের দোষে অনেকের সহিত তাঁহার শত্রুতা জন্মে। ভারতবর্ষীয় প্রধান সম্পত্তিশালী জগৎ শেঠ ও আলমচাঁদ নামক দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার ঘোর বিরোধী হইয়া উঠেন। হাজী ও আলি ভ্রাতৃদ্বয় সেই বিরোধিতায় যোগ দিলেন। অর্থবলে ইতিপূর্ব্বে আলি স্বয়ং দিল্লী হইতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। অধুনা (১৭৪৫) প্রকাশ্যে সরফরাজের বিরোধে অসি ধারণ করিলেন। সমরে সরফরাজ পরাজিত হইলেন। আলিবর্দ্দি সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন বিজয়ী ভূপতি বিজিত নবাবের পরিবারাদিকে সততা সহকারে, নিরুপদ্রবে, ঢাকায় অবস্থান করিতে আদেশ দিলেন।

আলিবর্দ্দির শাসন সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা বারম্বার বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। আমরা এ স্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে একটী গূঢ় চিন্তা হঠাৎ মিলের মনে সমুদিত হইয়া লেখনী মুখে পরিব্যক্ত হইয়া গিয়াছে, কোন উপকার সম্ভাবনা না থাকিলেও সকল ভারতবাসীর সেই কথাটী নিভৃ-

* Mill's History of British India. Vol. III.

† Orme's History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan Vol. I., Mill's History of British India. Vol. III

তে বসিয়া ধ্যান করিয়া দেখা আবশ্যক।

"The dependence of the greatest events upon the slightest causes is often exemplified in Asiatic story. Had Sirffraz Khan remained Subahdar of Bengal, the Mahrattas might have added it, and all the adjoining provinces, to their extensive dominion. The English, and other European factories, might have been expelled. Nothing afterwards remained to check the Mahratta progress. The Mahomedans might have been exterminated; and the Government of Brahmens and Khatriyas might have extended once more from Caubal to Cape Comorin."

মহারাষ্ট্রীয়েরা বঙ্গদেশে বিবিধমতে উপদ্রব করিয়াছিল। তাহাদের ঘোর দৌরাত্ম্য অদ্যাপি "বর্গীর হাঙ্গামা" নামে আবালবৃদ্ধবনিতার রসনায় বিরাজ করিতেছে। ইংরেজেরা ও তাঁহাদের কলিকাতাস্থ প্রজাগণ এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ১৭৪২ অব্দে এক খাল খনন করেন। ঐ খাল মহারাষ্ট্রীয় খাত (Mahratta ditch) নামে খ্যাত। যাহা হউক আলিবর্দ্দির অমিত যত্ন, বুদ্ধি ও নিপুণতা বলে মহরাষ্ট্র দৌরাত্ম্য অবসিত হইল।*

আলিবর্দ্দির উন্নতির মূল যাহাই হউক তাঁহার চরিত্র অতি শান্ত ও সৎ। তাঁহার শাসনে জন সাধারণ সর্ব্বথা সন্তুষ্ট ছিল। বিদ্যার প্রতি ও গুণবান লোকের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ইংরাজ গণের সহিত তিনি কোন অসন্তোষ জনক ব্যবহার করেন নাই। *

আলিবর্দ্দির পুত্র সন্তান ছিল না। তিন কন্যা ছিল। † তাঁহার অগ্রজ হাজী আহম্মদের তিন পুত্র ছিল। ১ মনেওয়াজিশ (নেওয়াগিশ) মহম্মদ, ২ সায়দ আহিম্মদ, ৩, জীন উদ্দীন আহম্মদ। এই পুত্রত্রয়ের সহিত আলিবর্দ্দির তিন কন্যার বিবাহ হইল ‡। জামাতা ও ভ্রাতস্পুত্র গণের মধ্যে জীন উদ্দিন আহম্মদ সর্ব্বাপেক্ষা আলিবর্দ্দির প্রিয় ছিলেন। জীন উদ্দীন আহম্মদের ২ পুত্র।

* আলিবর্দ্দির মনোজ্ঞ জীবন চরিত ও মহারাষ্ট্র দৌরাত্ম্যের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে Seir Mutaqherin Vol. 1 এবং Orme's History of Indostan নামক পুস্তক অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

* মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং। শ্রীযুক্ত রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়েন রচিতং। Torren's Empire In Asia. Ormes Indostan Vol. II

† Orme ও রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় এক কন্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু Sier Mutaqharin প্রণেতা তিন কন্যার কথা বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শেষোক্ত গ্রন্থকর্ত্তার মত সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বোধ হওয়ায় আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। মহাত্মা মিলও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

‡ Orme বলেন নেওয়াগিশের সহিত আলিবর্দ্দির একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়।

মীর্জা মহম্মদ এবং মোরাদ উদ্দৌলা। জীন উদ্দীনের জ্যেষ্ঠ সায়দ আহম্মদেরও এক পুত্র ছিল। পুত্রহীন আলিবর্দ্দি জীন-উদ্-দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন ও নিজ পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করেন। জীন-উদ্-দীনের অপর তনয়কে নেওয়াগিশ মহম্মদ গ্রহণ করেন। আলিবর্দ্দি জীন উদ্দীন তনয় মীর্জা মহম্মদকে প্রাণাধিক প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। তিনিই স্নেহ সহকারে বালককে সিরাজ-উদ্-দ্দৌলা (চিরাগ-উৎ-দৌলা অর্থাৎ সম্পত্তির আলোক) এই নাম প্রদান করেন। আলিবর্দ্দির স্নেহের সীমা ছিল না। সিরাজের সন্তোষ সাধনার্থ তিনি সকলই কর্ত্তব্য ও সহজ মনে করিতেন। সিরাজ যখন নিতান্ত বালক নবাব আলিবর্দ্দি তখন তাঁহার সন্তোষ সাধনার্থ তাঁহাকে আজিমাবাদের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন।* ফলতঃ সিরাজ উদ্দৌলা সম্বন্ধে বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির হিতাহিত জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। সিরাজ তাঁহার জীবনের আনন্দ বর্ত্তিকা, প্রীতির প্রস্রবণ, সন্তোষের নিলয়, সুখের সোপান স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিবেক বিহীন বালককে এতদ্রূপে সমাদর করিলে, ও তাহার কৃত কার্য্য সমস্তের দোষ না দেখিলে, তাহার স্বভাব যে নিরতিশয় কলুষিত হইয়া উঠিবে তাহার সন্দেহ কি? ভাল হউক, মন্দ হউক, বাক্য বদন হইতে বিনির্গত হইবা মাত্র, ইচ্ছা স্ফূর্ত্তি মাত্র, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন হইতেছে। যে বালকের বাল্য জীবন এইরূপে পর্য্যবসিত হয়, তাহার নিকট আমরা কিরূপে সততা ও সাধুতা প্রার্থনা করিতে পারি? যে দেখিতেছে যে তাহার ইচ্ছাই জগতের সকল নিয়ম অপেক্ষা বলবান, যে দেখিতেছে, স্বয়ং বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার আলিবর্দ্দি খাঁ বাহাদুর তাহার ইচ্ছার দাস, যে দেখিতেছে, অপরের পক্ষে যাহা নিরতিশয় নীতি বিগর্হিত অসাধুকার্য্য তাহার পক্ষে তাহা সাধু ও শ্রেয়ঃ, যে দেখিতেছে, অপরে যে কার্য্য করিলে কলঙ্কিত হয় সে তৎসম্পাদনে সুখ্যাতিভাজন হয়, সেরূপ বালকের চরিত্র পরিণামে কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।* সিরাজ যে কার্য্যে আস্থা বা অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই, তাঁহাকে সে কার্য্য সম্পাদন জন্য কেহ অনুরোধ করে নাই। লেখা পড়া সম্বন্ধে সিরাজ

* Seir Mutaqherin or Review of modern Times vol. 1 P-585.

* He was unreasonable, because nobody ever dared to reason with him, and selfish, because he had never been made to feel himself dependant on the good will of others.

Macaulay.

অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। সিরাজ নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাঁহার প্রতি সমুচিত যত্ন হইলে তিনি বড় ভাল লোক হইতেন সন্দেহ নাই। যদি আলিবর্দ্দি অযথা স্নেহের দাস না হইতেন, যদি বার্দ্ধক্য বশতঃ তিনি এ সম্বন্ধে এতাদৃশ উদাসীন না হইতেন, সিরাজের দুষ্ক্রিয়ার কথা কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি যদি হাসিয়া না উড়াইতেন, লোকের গ্লানি ও জগতের কলঙ্ক হইতে সিরাজকে নির্ম্মুক্ত রাখিবার নিমিত্ত তিনি যদি সকল কার্য্যেই সুখ্যাতি না করিতেন, তাহা হইলে অদ্য হয়ত সিরাজউদ্দৌলার ইতিহাস লিখিতে বসিয়া সম্পূর্ণ নূতন কথা লিখিতে হইত, তাহা হইলে হয়ত লেখনী অদ্য পরমানন্দে বঙ্গের সেই বালক নবাবের অমলধবল যশরাশি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিত, তাহা হইলে অদ্য আমাদের লেখ্য বিষয় সমস্ত অন্যরূপ হইয়া যাইত, তাহা হইলে হয়ত এ বঙ্গদেশ ইংরাজগণের পদাবনত হইত না, তাহা হইলে হয়ত ইংরাজগণের বাণিজ্য মাত্র এদেশ মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে হয়ত অদ্য আমরা সামান্য ফিরিঙ্গীর এতাদৃশ প্রভুতা দেখিতে পাইতাম না এবং তাহা হইলে হয়ত বঙ্গদেশের এ অননুভূত পূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিত না। আলিবর্দ্দি বিধিমতে সিরাজের মাথা খাইয়াছিলেন। সিরাজের দোষের নিমিত্ত তিনি অবশ্যই কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। তিনি সিরাজকে অতীব যত্ন ও পিত্রাধিক স্নেহ সহকারে লালন পালন করিয়াছিলেন এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু পিতার প্রধান কার্য্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি সিরাজের হৃদয়ে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিবিষ্ট করিয়া দেন নাই। যাহা হউক সিরাজের স্বভাব যেরূপ কলুষিত হইয়াছিল, তাহা কদাচ অস্বাভাবিক নহে। সেরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই হইয়াছিল।*

এই দুর্বিনীত উচ্ছৃঙ্খল যুবককে নবাব আলিবর্দ্দি স্বীয় উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি ১৭৫৭ অব্দের ৯ই এপ্রেল, অশীতিবর্ষ বয়ক্রম কালে, পরলোকগত হইলেন। বৃদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরেই সিরাজ-উদ্দৌলা সিংহাসনে সমাসীন হইয়া স্বহস্তে রাজ কার্য্য গ্রহণ করিলেন এবং যথা সময়ে দিল্লী হইতে তৎসূচক সনন্দও প্রাপ্ত হইলেন।

* Seir Mutaqherin vol. I.
Mill's British India vol. III.
Orme's Indostan vol. II.

সিরাজের বাল্য জীবনের সমধিক বৃত্তান্ত জানিতে কৌতূহল জন্মিলে Seir Mutaqherin বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ।—বিবি গাহসিতির অবরোধ।—প্রধান মন্ত্রী মোহনলাল।—সকতজঙ্গের বিরোধে যাত্রা।—ড্রেক সাহেবের প্রতি আজ্ঞা।—ড্রেকের উত্তর।—সিরাজের ক্রোধ।—তাহার ন্যায়ান্যায় বিচার।—পথমধ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। তখন তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ মাত্র। যে বয়সে ক্রীড়া, ব্যসন, আমোদ ও বিলাস মনুষ্য জীবনের অতি প্রিয় কার্য্য, সেই বয়সে সিরাজউদ্দৌলার স্কন্ধে অতি গুরুতর রাজ্য শাসন ভার সমর্পিত হইল। তখন দেশের যে রূপ অবস্থা, বৈদেশিক বণিকগণের যে রূপ ভাব, তাহাতে তৎকালে একজন বিলক্ষণ নীতিকুশল, সুদূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিধেয় ছিল। তৎকালে বঙ্গের শাসন ভার আকবর বা সালিমাগ্নি, হায়দরআলি বা ক্রমওয়েল, সীজর বা বোনাপার্টির করে সমর্পিত হইলে যথাযথ হইত। তাহা হইলে অদ্য বঙ্গের যুগান্তর দেখিতে। সেই ঘোরতর কঠিন কার্য্য অপরিপক্কমতি, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, কাণ্ডজ্ঞান বিরহিত, সিরাজউদ্দৌলার মস্তকে পরিস্থাপিত হইল। নবীন সিরাজউদ্দৌলা দেখিলেন এই অগণ্য মানব-নিবাস-ভূমি বিস্তীর্ণ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা তাঁহারই পদানত,—এই প্রদেশত্রয় মধ্যে তাঁহার আজ্ঞা ঈশ্বরাজ্ঞা অপেক্ষাও বলবান,—এই ভুখণ্ডের যাবতীয় মানব তাঁহারই ইচ্ছা পূরণে ও সন্তোষ সাধনে নিরন্তর ব্যস্ত,—এইস্থান সমূহবাসী জন সাধারণের ধন, মান, প্রাণ সমস্তই তাঁহারই পদতলে পরিনিহিত,—আর দেখিলেন, রাজ কোষে অপরিমেয় সম্পত্তিরাশি তাঁহারই ব্যবহারার্থ সঞ্চিত! কাণ্ডজ্ঞানহীন বালক যদি আপনার অবস্থা এতাদৃশ মহোচ্চ দেখিতে পায় ও বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মস্তিস্কের অবস্থা কিরূপ হওয়া সম্ভাবিত? তাহার চিত্তের অবস্থা কি তৎকালে ন্যায়, ও নীতির শাসন অতিক্রম করে না? লজ্জা বা ধর্ম্ম-ভয় তখন কি তাহাকে পাপ হইতে অন্তরিত রাখিতে পারে? সমাজ যাহার পদতলে, বিদ্বানবৃন্দ যাহার সেবক, যশস্বীগণ যাহার তোষামোদী, সে জগতে কাহার মুখ চাহিবে? তাহার মন তখন অনন্ত ভাগে বিভক্ত হইয়া অনন্ত আমোদে লীন হইতে চাহে,—তাহার আত্মা তখন পৃথিবতলে কল্পিত নন্দন কানন দেখিতে চাহে,—তাহার প্রাণ তখন মধুমক্ষিকার ন্যায় সুখের চেষ্টায় পাপ হইতে পাপান্তরে ডুবিতে চাহে। তখন কর্ত্তব্য জ্ঞান তাহার হৃদয় হইতে এককালে বিদূরিত হইয়া যায়

কোন কার্য্যই ধীরতা সহকারে সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা যায় না। দারুণ হঠকারিতা, অধীরতা, অসহিষ্ণুতা ও অকারণ ক্রোধ তাহার সঙ্গী হয়। আমোদ ব্যতীত অন্য কার্য্যে মনঃ সংযোগ করিতে ইচ্ছা হয় না। বরং তাহাতে সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে বোধ হইতে থাকে; তজ্জন্য কেহ কোন কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তাহার উপর গুরুতর ক্রোধ জন্মে। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সিরাজের অবস্থাও ঐ রূপ হইল। অবিবেচনায় তাঁহার রাজ কার্য্য আরব্ধ হইল, অবিবেচনায় তাহা পর্য্যবসিত হইবে।*

সিংহাসন লাভের পর সিরাজের প্রথম কার্য্য স্বকীয় সংসার ও পরিবার সমন্ধীয়। মতি ঝিল নামে রাজধানীর ক্রোশেক দক্ষিণে এক উদ্যান ছিল, সেই উদ্যানে সিরাজের পিতৃব্য, ঢাকার নবাব নওয়াগিস্ মহম্মদের বিধবা পত্নী বাস করিতেন। এই রমণীর চরিত্রে কলঙ্ক ছিল। সিরাজের আজ্ঞায় নওয়াগিস্ পত্নী বিবি গাহসিতি অবরুদ্ধা হইলেন এবং তাঁহার সম্পত্তি সমস্ত রাজকোষে পরিরক্ষিত হইল। রাজবল্লভ নামক এক জন হিন্দু নওয়াগিসের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। নওয়াগিসের পত্নী বিবি গাহসিতির সহিত এই ব্যক্তির নিন্দনীয় আত্মীয়তা ছিল বলিয়া প্রচার। পিতৃব্যের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করা ও রাজবল্লভকে শাস্তি দেওয়া সিরাজের মনোগত ছিল। তদভিপ্রায়ে ঢাকায় অনুজ্ঞা প্রেরিত হইল। †

*পক্ষপাত বিবর্জ্জিত মহাত্মা Torrens তাঁহার Empire in Asia নামক পুস্তকে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন। সে কথা কয়েকটী অতি মহার্হ। সিরাজ ইংরাজগণের শত্রু সন্দেহ নাই। শত্রু শত্রুর কথা লিখিতে এবম্বিধ উদারতা প্রকাশ করে না। Torrens সাহেবের প্রকৃতি স্বর্গীয়, তাঁহার উদারতা দৃষ্টান্তস্থলীভূত। তাঁহার কথা কয়েকটী এই ;—

"The young prince though educated, it is said, with special care by his uncle, inherited few of his high qualities; and on his accession to the Nizamut in April 1756, he was thrown without experience into circumstances that might have tried a judgment more mature. He has been accused of innumerable vices, and it is probable he had his share. But it is somewhat remarkable that his enemies, who had an interest, if ever men had such, in establishing their eager accusations, failed to make out the enormities which their invectives lead us to anticipate. Whatever may have been the defects of his disposition or understanding, the sudden height of power to which he found himself raised, the hoarded wealth of which he became master, and the homage paid to him as sovereign of a great and populous domain, were little calculated to teach him patience, caution or forbearance in the exercise of authority; and he had abundant need of them."

† Comp. Seir Mutaqherin Vol. I Page 716. Orme's History of the Military Transac-

সিরাজ উদ্দৌলা অতঃপর আর একটী এরূপ অবিবেচনার কার্য্য করিলেন যে, তাঁহার কার্য্যে আর কাহারও সহানুভূতি থাকিবার সম্ভাবনা রহিল না। প্রাচীন, বিশ্বাসী ও অনুরাগী কয়েকজন প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন করিয়া তত্তৎস্থানে কয়েকজন নূতন ব্যক্তি বিনিয়োগ করিলেন। মীর জাফর খাঁ নামক একজন প্রধান পদস্থ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে মীরমদন নামে এক জন বিনিযুক্ত হইলেন। মোহন লাল * নামক এক ব্যক্তিকে মহারাজা উপাধি ও পঞ্চ সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষতা দিয়া প্রধান মন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত করা হইল। একে নবাবের প্রতি জনসমূহের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, তাহাতে আবার মোহন লালের কদর্য্য ব্যবহারে লোক যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া উঠিল। নবাব স্বয়ং মোহন লাল সম্বন্ধে অন্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মোহন লালের কার্য্যে ও চরিত্রে গুণ ভিন্ন দোষের সংস্পর্শও দেখিতে পাইতেন না। এই নূতন কর্ম্মচারীরা নবাবের সন্তোষ ও তৃপ্তি সাধনোপযোগী কার্য্য করিতেন ও তদনুযায়ী উপদেশ দিতেন। এ বম্বিধ অনুরাগ নিবন্ধন সিরাজের বিশেষ অনিষ্ট হইল। নগরের প্রধানপ্রধান ব্যক্তি ও সৈন্যের ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারীগণ অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া রহিল। *

সিংহাসন প্রাপ্তির অনতিকাল পরে সিরাজ উদ্দৌলার মনে, স্বীয় পিতৃব্য সায়দ আহম্মদের পুত্র সকত জঙ্গের হস্ত হইতে পুর্ণিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবার বাসনা নিরতিশয় বলবতী হয়। তদভিপ্রায় সাধনোদ্দেশে নবাব পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নওয়াগিশ মহম্মদের প্রধান কর্ম্মচারী রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ-

tions of the British nation in Indostan Vol. II Page 49-50. Mill's History of British India Vol. III Page 114.

* "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" লেখক শ্রীযুক্ত রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় নবাবের প্রধান পাত্রের নাম মহারাজা মহেন্দ্র বলিয়া বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন। মোহন লাল ও মহেন্দ্রকে এক ব্যক্তি বিবেচনা করা সঙ্গত হয় না। কারণ মোহন লাল নবাবের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। মহেন্দ্র নবাবের বিরোধী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মোহন লাল সম্বন্ধে একটী ঘৃণাজনক কথা লিখিত হইয়াছে। মোহনলাল স্বীয় পরমা সুন্দরী ভগ্নীকে সিরাজ উদ্দৌলার সন্তোষার্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

* Seir Mutaqherin or Review of Modern Times Vol. I, Page 717-718.

দাস * কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সিরাজ উদ্দৌলার দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ লালসায় কলিকাতায় ইংরাজগণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সিরাজ উদ্দৌলা পূর্ণিয়া গমনকালে কলিকাতার ইংরাজদিগের প্রেসিডেণ্ট ড্রেক সাহেবের নিকট দূতহস্তে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রে কৃষ্ণদাসকে তাহার সমস্ত সম্পত্তি সহ নবাবের নিকট হাজির করিয়া দিবার আজ্ঞা ছিল। কলিকাতার ইংরাজগণ অতি অবিবেচনা করিয়া নবাবের পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন না এবং অতি সামান্য কারণে দূতকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিলেন। নবাব নীরবে সমস্ত সহ্য করিলেন। †

পূর্ণিয়া গমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নবাব সংবাদ পাইলেন যে, ইংরাজগণ কলিকাতা নগরীর চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন ও প্রাকার রচনা করিতেছেন। সংবাদে নবাব নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন। প্রত্যুত ইহা বিরক্ত হইবারই কথা। কিন্তু কোন রূপ অসদ্ব্যবহার না করিয়া ভদ্রতাসহ ইংরাজগণের কলিকাতাস্থ প্রেসিডেণ্ট ড্রেক সাহেবকে "সম্প্রতি দুর্গে যে কোন নূতন কার্য্য হইয়াছে তাহা ধ্বংস করিতে ও অতঃপর নিবৃত্ত থাকিতে" আজ্ঞা দিলেন। পত্রের উত্তর অপেক্ষা না করিয়া নবাব পূর্ণিয়া অভিমুখে রাজমহল চলিয়া গেলেন। ড্রেক সাহেব পত্রের নিম্ন মত উত্তর প্রেরণ করিলেন ;—"কলিকাতার চারিদিকে প্রাচীর দেওয়া হইতেছে এ সংবাদ মিথ্যা, মহারাষ্ট্র আক্রমণ কালে আলিবর্দ্দি খাঁর অনুমোদন ও সম্মতি অনুসারে, অধিবাসীগণের অনুরোধ ক্রমে এক পরিখা খনিত হয়, তৎপরে আর কোন পরিখা হয় নাই, গত ইংরাজ ও ফরাসী যুদ্ধে ফরাসীগণ মান্দ্রাজ আক্রমণ ও অধিকার করেন ; সম্প্রতি ঐ দুই জাতির যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা। পাছে ফরাসীরা পূর্ব্ববৎ এবারেও ইংরেজাধিকারে দৌরাত্ম্য করেন, সেই ভয়ে নদী তীরের কামান শ্রেণী সংস্কৃত হইতেছে।" * পত্র রাজমহলে

* Seir Mutaqherin পুস্তকে ইনি কৃষ্ণ বল্লভ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। অন্য সমস্ত ইতিহাসেই কৃষ্ণদাস নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" পুস্তকে, কৃষ্ণদাস, কলিকাতার কোঠির বড় সাহেব ও নবাব ঘটিত অনেক পত্রাদি ও অন্যান্য অনেক কথা বিবরিত হইয়াছে, কিন্তু তৎসমস্তের কোন প্রমাণ দেখা যায় না।

† Orme's Indostan Vol. II, Mill's British India Vol III., Thornton's British India Vol. I.

* Orme's History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan Vol. II Page 55-56.

নবাব সমীপে পৌঁছিল। নবাব পত্রপাঠে যার পর নাই কুপিত হইলেন। তাঁহার এ ক্রোধ নিতান্ত অকারণ বলা যায় না। কারণ ইউরোপে ইংরেজ ও করাসী জাতির মধ্যে যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিবে, বঙ্গদেশে যদি তাহার শিখা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে কাহার দোষ? নিরীহ বঙ্গবাসীগণ যদি ফরাসী দৌরাত্ম্যে ব্যথিত হয়, তাহা হইলে সে জন্য কে দায়ী? নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব ও প্রশান্ত প্রদেশে যাবতীয় অমঙ্গলের নিদান ভূত রণভেরী নিনাদিত হইলে কে সে জন্য নিমিত্তের ভাগী? ইহার একই উত্তর। বঙ্গে ইংরাজ না থাকিলে এ বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। ফরাসী বিপ্লবে যদি বঙ্গদেশ কিয়ৎপরিমাণেও কষ্ট পায়, ইংরাজ বণিকগণ অবশ্যই সে জন্য দায়ী। এ বিবেচনায় ড্রেক সাহেবের পত্র পাঠে নবাবের ক্রোধ কদাচ অসঙ্গত নহে। নবাবের ক্রোধের আরও কারণ ছিল। বঙ্গদেশ নবাবের অধীন রাজ্য। তথায় শান্তি সংস্থাপন,বিদ্রোহ নিবারণ প্রভৃতি কার্য্য নবাবেরই কর্ত্তব্য। ইংরেজেরা ইজারাদার জমিদার মাত্র। তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করাও নবাবের ভার। তাঁহারা যদি আত্ম অধিকার সংরক্ষণার্থ আপনারা স্বাধীনরূপে সমুদ্যোগী হন, তাহা হইলে কি নবাবকে প্রকারান্তরে অপমান করা হয় না? নবাবের বিক্রম ও ক্ষমতাকে কি এতদ্বারা উপেক্ষা করা হয় না? নবাবের সাহায্যে বা তাঁহার দৃষ্টির অধীনে অবস্থান করা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে,—এ কার্য্যে কি এই ভাব ব্যক্ত হয় না? তবে কে বলিবে যে নবাব অন্যায় রাগ করিয়াছিলেন? সিরাজ উদ্ধত প্রকৃতির লোক। ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার যথেষ্ট দুর্ণাম ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই জন্য হতভাগ্য সিরাজ উদ্দৌলার সকল কার্য্যেই দোষ ভিন্ন গুণের সংস্পর্শও কেহ দেখিল না। তাঁহার কার্য্য হইলেই লোকে অমনি তাহার দোষ ঘোষণা করিয়া থাকে। ভাল মন্দ বিচারে প্রবৃত্ত হয় না। নিরতিশয় অন্ধ কুসংস্কার ইহার মূল।

ইংরাজ ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ নবাবের ভীরুতাকে এবম্বিধ ক্রোধের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ যুক্তি অতি সুন্দর! স্বকীয় দোষ গোপন করিতে পরকীয় স্কন্ধে গুরুতর দোষ আরোপ না করিলে চলিবে কেন? আপনারা যে সমস্ত নিয়মবহির্ভূত কার্য্য করিয়াছিলেন, যেরূপ অসাধু ভাবে নবাবের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে অবশ্যই নবাবের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সে কথা কি আর স্বীকার করিতে আছে? যাহা হইয়া গিয়াছে

তাহাতে আর গোল কি? সেই বিগত কালের অন্ধকার গহ্বরে কে আর প্রবেশ করিতে যাইবে? তবে আর এখন সে কথায় কাজ কি? সিদ্ধান্ত ভাল! নবাব ভীরু। ভয় প্রযুক্ত তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকিলে এরূপ সারবান সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব।

কয়েকজন—কয়েকজন কেন—অধিকাংশ * ইতিহাস শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত বলিতেছেন যে, অতি পূর্ব্ব হইতেই সিরাজ উদ্দৌলার ইংরাজগণের বিরোধে কুসংস্কার ছিল। তিনি তাহাদের অনিষ্ট করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন; আমরা এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। ১৭৫৭ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোম্পানীর বিলাতস্থ "কোর্ট অব্ ডিরেকটর" (Court of Directors) নামক সভায় যে এক বিবরণ লিপি (Despatch) প্রেরিত হয়, তাহা দ্বারা এরূপ সন্দেহ সমস্ত অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হইতেছে। কোন সময়ে করাশী, ওলন্দাজ ও ইংরাজ শাসনপতিত্রয় সিরাজ-উদ্দৌলার সহিত সাক্ষাতাভিপ্রায়ে হুগলীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজ শাসন কর্ত্তাকে সিরাজ অধিক সম্মান যত্ন ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যথানিয়ম উপহারাদি প্রদানের পর ইংরাজ গবর্ণর এবং তাঁহার সঙ্গীগণ পরমানন্দে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কোর্ট অব ডিরেকটর সমীপে সেই আনন্দ সমস্ত বর্ণনা করিয়া লিপি প্রেরণ করিলেন। † তবে নবাবের পূর্ব্ব হইতে বিদ্বেষ ভাব ছিল এ কথা কেমন করিয়া বলি? যাহা হউক নবাবের বিদ্বেষভাব ছিল, তিনি নিতান্ত ভীরু ইত্যাদি চাপ দিয়া ইংরাজেরা যদি আত্ম অন্যায় সমস্ত প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সে কিছু মন্দ নয়।

১৭ই মে তারিখে রাজমহলে ড্রেক সাহেবের পত্র নবাব সাহেবের সমক্ষে উপস্থিত হইল। তিনি তৎপাঠে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পূর্ণিয়া গমন করিয়া সকতজঙ্গের রাজ্য গ্রহণ বাসনা এককালে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। যেরূপে হউক ইংরাজদিগকে দণ্ডিত করিতেই হইবে এই বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। তদভিপ্রায়ে সৈন্য সমস্তকে অবলিম্বে মুরসিদাবাদ গমন করিয়া কাশিম বাজারের দুর্গ বা কুঠী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ১লা জুন তারিখে নবাব অবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত সমস্ত সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

* Orme, Thornton, Mill, Macaulay, Marshman, Murray ইত্যাদি।

† Empire in Asia, By W. M. Torrens M. P.

বনফুল কাব্য।

ষষ্ঠ সর্গ

১

"কমলা ভুলিবে সেই শিখর, কানন,
কমলা ভুলিবে সেই বিজন কুটীর,
আজ হতে নেত্র! বারি করোনা বর্ষণ,
আজহ'তে মন প্রাণ হওগো সুস্থির।

২

অতীত ও ভবিষ্যত হইব বিস্মৃত।
জুড়িয়াছে কমলার ভগন হৃদয়!
সুখের তরঙ্গ হৃদে হয়েছে উত্থিত,
সংসার আজিকে হোতে দেখি সুখময়।

৩

বিজয়েরে আর করিবনা তিরস্কার।
সংসার-কাননে মোরে আনিয়াছে বলি
খুলিয়া দিয়াছে সে যে হৃদয়ের দ্বার,
ফুটায়েছে হৃদয়ের অস্ফুটিত কলি!

৪

জমি জমি জলরাশি পর্ব্বত গুহায়,
এক দিন উথলিয়া উঠে রে উচ্ছ্বাসে।
এক দিন পূর্ণ বেগে প্রবাহিয়া যায়
গাহিয়া সুখের গান ধায় সিন্ধু পাশে।—

৫

আজি হোতে কমলার নূতন উচ্ছ্বাস,-
বহিতেছে কমলার নুতন জীবন।
কমলা ফেলিবে আহানূতন নিশ্বাস,
কমলা নূতন বায়ু করিবে সেবন।

৬

কাঁদিতে ছিলাম কাল বকুল তলায়,
নিশার আঁধারে অশ্রু করিয়া গোপন।
ভাবিতে ছিলাম বসি পিতায় মাতায়—
জানিনা নীরদ আহা এয়েছে কখন!

৭

সেও কি কাঁদিতে ছিল পিছনে আমার?
সেওকি কাঁদিতে ছিল আমারি কারণ?
পিছনে ফিরিয়া দেখি মুখ পানে তার,
মন যে কেমন হল জানে তাহা মন।

৮

নীরদ কহিল হৃদি ভরিয়া সুধায়—
"শোভনে! কিসের তরে করিছ রোদন?"
আহাহা! নীরদ যদি আবার শুধায়,
"কমলে! কিসের তরে করিছ রোদন?"

বিজয়েরে বলিয়াছি প্রাতঃকালে কাল,
একটি হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান!
নীরদেই ভাল বাসা দিব চিরকাল,
প্রণয়ের করিবনা কভু অপমান।

১০

ওই যে নীরজা আসে পরাণ স্বজনী,
এক মাত্র বন্ধু মোর পৃথিবী মাঝার!
হেন বন্ধু আছে কিরে, নির্দ্দয় ধরণী!
হেন বন্ধু কমলা কি পাইবেক আর?

১১

ওকি সখি কোথা যাও? তুলিবেনা
ফুল?
নীরজা, আজিকে সই গাঁথিবেনা মালা?
ওকি সখি আজ কেন বাঁধ নাই চুল?
শুকনো শুকনো মুখ কেন আজি বালা?

১২

মুখ ফিরাইয়া কেন মুছ আঁখি জল
কোথা যাও, কোথা সই যেওনা যেওনা!
কি হয়েছে? বল বিনে—বল সখি বল!
কি হয়েছে, কে দিয়েছে কিসের যাতনা?"

১৩

কি হয়েছে, কে দিয়েছে, বলি গো
সকল,
কি হয়েছে, কে দিয়েছে, কিসের যাতনা
ফেলিব যে চিরকাল নয়নের জল,
নিভায়ে ফেলিতে বালা মরম বেদনা!

১৪

কে দিয়েছে মনমাঝে জ্বালায়ে অনল?
বলি তবে তুই সখি তুই! আর নয়—
কে আমার হৃদয়েতে ঢেলেছে গরল?
কমলারে ভালবাসে আমার বিজয়!

১৫

কেন হলুম না বালা আমি তোর মত,
বনে হতে আসিতাম বিজয়ের সাথে
তোর মত কমলালো মুখ আঁখি যত
তাহলে বিজয় মন পাইতাম হাতে!

১৬

পরাণ হইতে অগ্নি নিভিবেনা আর
বনে ছিলি বনবালা সেত বেশ ছিলি
জ্বালালি!—জ্বলিলি বোন! খুলি
মর্ম্মদ্বার—
কাঁদিতে করিগে যত্ন যেথা নিরিবিলি।

১৭

কমলা চাহিয়া রয় নাহি বহে শ্বাস।
হৃদয়ের গূঢ় দেশে অশ্রু রাশি মিলি
ফাটিয়া বাহির হোতে করিল প্রয়াস
কমলা কহিল ধীরে "জ্বালালি জ্বলিলি!"
আবার কহিল ধীরে, আবার হেরিল নীরে
যমুনা তরঙ্গে খেলে পূর্ণ শশধর
তরঙ্গের ধারে ধারে, রঞ্জিয়া রজত ধারে
সুনীল সলিলে ভাসে রজতময় কর!
হেরিল আকাশ পানে, সুনীল জলদযানে
ঘুমায়ে চন্দ্রিমা ঢালে হাসি এ নিশীথে
কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে পাগল বনের মেয়ে
আকুল-কত কি মনে লাগিল ভাবিতে! ॥

"ওই খানে আছে পিতা, ওই খানে
আছে মাতা
ওই জ্যোৎস্নাময় চাঁদে করি বিচরণ।
দেখিছেন হোথা হোতে, দাঁড়ায়ে
সংসার পথে
কমলা নয়ন বারি করিছে মোচন।
একিরে পাপের অশ্রু ? নীরদ আমার—
নীরদ আমার যেথা আছে লুকায়িত,
সেই খান হোতে এই অশ্রু বারি ধার
পূর্ণ উৎস সম আজ হ'ল উৎসারিত
এ ত পাপ নয় বিধি ! পাপ কেন হবে ?
বিবাহ করেছি বলে, নীরদে আমার
ভাল বাসিব না ? হায় এহৃদয় তবে
বজ্রদিয়া দিক্ বিধি ক'রে চুরমার !
এ বক্ষে হৃদয় নাই, নাইক পরাণ,
এক খানি প্রতিমূর্ত্তি রেখেছি শরীরে,
রহিবে, যদিন প্রাণ হবে বহমান "
রহিবে, যদিন রক্ত রবে শীরে শীরে !
সেই মূর্ত্তি নীরদের। সে মূর্ত্তি মোহন
রাখিলে বুকের মধ্যে পাপ কেন হবে ?
তবুও সে পাপ, আহা নীরদ যখন
বলেছে, নিশ্চয় তারে পাপ বলি তবে !
তবু মুছিব না অশ্রু এ নয়ান হোতে,
কেন বা জানিতে চাব পাপ কারে বলি ?
দেখুক জনক মোর ওই চন্দ্র হোতে
দেখুন জননী মোর আঁখি দুই মেলি !
নীরজা গাইত 'চল চন্দ্র লোকে র'বি।
সুধাময় চন্দ্রলোক, নাই সেথা দুখ শোক
সকলি সেথায় নব ছবি।
ফুল বক্ষে কীট নাই,বিদ্যুতে অশনি নাই,
কাঁটা নাই গোলাপের পাশে।
হাসিতে উপেক্ষা নাই,অশ্রুতেবিষাদনাই,
নিরাশার বিষ নাই শ্বাসে।
নিশীথে আঁধার নাই,অলোকে তীব্রতা নাই,
কোলাহল নাইকদিবায় !
আশায় নাইক অন্ত, নূতনত্বে নাই অন্ত,
তৃপ্তি নাই মাধুর্য্য শোভায়।
লতিকা কুসুমময়, কুসুম সুরভিময়,
সুরভি মৃদুতাময় যেথা !
জীবন স্বপনময়, স্বপন প্রমোদময়,
প্রমোদ নূতনময় সেথা !
সঙ্গীত উচ্ছাসময়, উচ্ছাস মাধুর্য্যময়
মাধুর্য্য মত্ততাময় অতি।
প্রেমঅস্ফুটতামাখা,অস্ফুটতা স্বপ্নমাখা,
স্বপ্নে মাখা অস্ফুটিত জ্যোতি !
গভীর নিশীথে যেন, দূর হোতে স্বপ্ন হেন
অস্ফুট বাঁশীর মৃদু রব—
সুধীরে পশিয়া কাণে,শ্রবণ হৃদয় প্রাণে,
আকুল করিয়া দেয় সব।
এখানে সকলি যেন, অস্ফুট মধুর হেন,
উষার সুবর্ণ জ্যোতি প্রায়।
আলোকেআঁধারমিশে,মধুজ্যোছনায়দিশে
রাখিয়াছে ভরিয়া সুধায়।
দূর হোতে অপ্সরার,মধুর গানের ধার,
নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি।
নদীর অস্ফুট তান, মলয়ের মৃদু গান
একত্তরে মিশেছে এমনি !
সকলি অস্ফুট হেথা মধুর স্বপনে গাঁথা
চেতনা মিশা'ন যেন ঘুমে।
অশ্রু শোক দুঃখ ব্যথা,কিছুই নাইক হেথা

জ্যোতির্ম্ময় নন্দনের ভূমে !'
আমি যাব সেইখানে,পুলক প্রমত্ত প্রাণে
সেই দিনকারমত বেড়াব খেলিয়া,—
বেড়া'ব তটিনী তীরে,খেলাব তটিনী নীরে
বেড়াইব জ্যোছনায় কুসুম তুলিয়া !
শুনেছি মৃত্যুর পিছু, পৃথিবীর সব কিছু
ভুলিতে হয় নাকি গো যা আছে এখানে !
ওমা!সেকিকোরেহবে ? মরিতেচাইনাতবে
নীরদে ভুলিতেআমি চাবকোনপ্রাণে ?"
কমলা এতেক পরে হেরিল সহসা,
নীরদ কানন পথে যাইছে চলিয়া
মুখপানে চাহি রয় বালিকা বিবশা
হৃদয়ে শোণিত রাশি উঠে উথলিয়া।
নীরদের স্কন্ধে খেলে নিবিড় কুন্তল
দেহ আবরিয়া রহে গৈরিক বসন
গভীর ঔদাস্যে যেন পূর্ণ হৃদিতল
চলিছে যেদিকে যেন চলিছে চরণ।
যুবা কমলারে দেখি--ফিরাইয়া লয় আঁখি
চলিল ফিরায়ে মুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলি
যুবক চলিয়া যায়-বালিকা তবুও হায় !
চাহিরয় এক দৃষ্টে আঁখিদ্বয় মেলি।
ঘুম হোতে যেন জাগি,সহসাকিসেরলাগি,
ছুটিয়া পড়িল গিয়া নীরদের পায়।
যুবক চমকি প্রাণে,হেরি চারি দিক পানে
পুনঃ না করিয়া দৃষ্টি ধীরে চলি যায়।
"কোথা যাও-কোথাযাও-নীরদ! যেওনা !
একটি কহিব কথা শুন একবার
মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত রও—পূরাও কামনা !
কাতরে দুখিনী আজি কহে বার বার !
জিজ্ঞাসা করিবে নাকি আজি যুবাবর—
'কমলা কিসের তরে করিছ রোদন'
তা হলে কমলা আজি দিবেক উত্তর
কমলা খুলিবে আজি হৃদয় বেদন !
দাঁড়াও—দাঁড়াও যুবা ! দেখি একবার
যেথা ইচ্ছা হয় তুমি যেও তার পর !
কেন গো রোদন করি শুধাও আবার
কমলা আজিকে তারদিবেক উত্তর !
কমলা আজিকে তার দিবেক উত্তর
কমলা হৃদয় খুলি দেখাবে তোমায়
সেথায় রয়েছে লেখা দেখো তার পর
কমলা রোদন করে কিসের জ্বালায় !"
"কি কব কমলা আর কি কব তোমায়
জনমের মত আজি লইব বিদায় !
ভেঙ্গেছেপাষাণপ্রাণ,ভেঙ্গেছেসুখেরগান
এ জন্মে সুখের আশা রাখিনাক আর !
এ জন্মে মুছিবনাক নয়নের ধার !
কতদিন ভেবেছিনু যোগীবেশ ধরে।
ভ্রমিব যেথায় ইচ্ছা কানন প্রান্তরে
তবু বিজয়ের তরে, এতদিন ছিনু ঘরে
হৃদয়ের জ্বালা সব করিয়া গোপন—
হাসি টানি আনি মুখে,এতদিন দুখেদুখে
ছিলাম, হৃদয় করি অনলে অর্পণ !
কিআরকহিবতোরে,কালিকে বিজয়মোরে,
কহিল জন্মের মত ছাড়িতে আলয় !
জানেন জগৎস্বামী-বিজয়ের তরে আমি
প্রেম বিসর্জ্জিয়াছিনু তুষিতে প্রণয়"
এত বলি নীরবিল ক্ষুব্ধ যুবাবর ;
কাঁপিতে লাগিল কমলার কলেবর
নিবিড় কুন্তল যেন উঠিল ফুলিয়া
যুবারে সম্ভাষে বালা, এতেক বলিয়া।—

"কমলাতোমারে আহা ভালবাসে বোলে
তোমারে ক'রেছে দূর নিষ্ঠুর বিজয়।
প্রেমেরে ডুবা'ব আজি বিস্মৃতির জলে.
বিস্মৃতির জলে আজি ডুবাব হৃদয়!
তবুও বিজয় তুই পাবি কি এ মন?
নিষ্ঠুর আমারে আর পাবি কি কখন?
পদ তলে পড়ি মোর, দেহ কর ক্ষয়—
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয়?
তুমিও চলিলে যদি হইয়া উদাস—
কেন গো বহিব তবে এ হৃদি হতাশ?
আমিওগো আভরণ ভূষণ ফেলিয়া
যোগিনী তোমার সাথে যাইব চলিয়া
যোগিনী হইয়া আমি জন্মেছি যখন
যোগিনী হইয়া প্রাণ করিব বহন।
কাজ কি এ মণি মুক্তা রজত কাঞ্চন—
পরির বাকল বাস ফুলের ভূষণ।
নীরদ! তোমার পদে লইনু শরণ—
লয়ে যাও যেথা তুমি করিবে গমন!
নতুবা যমুনা জলে-এখনই অবহেলে—
ত্যজিব বিষাদ দগ্ধ নারীর জীবন!"
পড়িল ভূতলে কেন নীরদ সহসা?
শোনিতে মৃত্তিকা তল হইল রঞ্জিত!
কমলা চমকি দেখে সভয়ে বিবশা
দারুণ ছুরিকা পৃষ্ঠে হ'য়েছে নিহিত!
কমলা সভয়ে শোকে করিল চীৎকার।
রক্ত মাখা হাতে ওই চলিছে বিজয়!
নয়নে আঁচল চাপি কমলা আবার—
সভয়ে মুদিয়া আঁখি স্থির হ'য়ে রয়।
আবার মেলিয়া আঁখি মুদিল নয়নে
য়া চলিল বালা যমুনার জলে
আবার আইল ফিরি যুবার সদনে—
যমুনা শীতল জলে ভিজায়ে আঁচলে।
যুবকের ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া আঁচল
কমলা একেলা বসি রহিল তথায়
এক বিন্দু পড়িল না নয়নের জল
এক বারো বহিল না দীর্ঘ শ্বাস বায়।
তুলি নি'ল যুবকের মাথা কোল পরে—
এক দৃষ্টে মুখপানে রহিল চাহিয়া
নির্জ্জীব প্রতিমা প্রায় না নড়ে না চড়ে
কেবল নিশ্বাস মাত্র যেতেছে বহিয়া।
চেতন পাইয়া যুবা কহে কমলায়
"যে ছুরীতে ছিঁড়িয়াছে জীবন বন্ধন
অধিক সুতীক্ষ্ণ ছুরী তাহা অপেক্ষায়
আগে হোতে প্রেমরজ্জু করেছে ছেদন।
বন্ধুর ছুরিকা মাখা দ্বেষ হলাহলে,
করেছে হৃদয়ে দেহে আঘাত ভীষণ
নিভেছে দেহের জ্বালা হৃদয় অনলে
ইহার অধিক আর না'ইক মরণ!
বকুলের তলা হোক্ রক্তে রক্ত ময়!
মৃত্তিকা রঞ্জিত হোক্ লোহিত বরণে!
বসিবে যখন কাল হেথায় বিজয়—
আচ্ছন্ন বন্ধুতা পুনঃ উদিবে না মনে?
মৃত্তিকার রক্তরাগ হোয়ে যাবে ক্ষয়—
বিজয়ের হৃদয়ের শোণিতের দাগ
আর কি কখনো তার হবে অপচয়
অনুতাপ অশ্রু জলে মুছিবে সে রাগ?
বন্ধুতার ক্ষীণ জ্যোতি,প্রেমের কিরণে—
(রবিকরে হীন ভাতি নক্ষত্র যেমন)
বিলুপ্ত হয়েছে কিরে বিজয়ের মনে?
উদিত হইবে না কি আবার কখন?

এক দিন অশ্রুজল ফেলিবে বিজয়!
এক দিন অভিশাপ দিবে ছুরিকারে
এক দিন মুছিবারে, হইতে হৃদয়
চাহিবে সে রক্তধারা অশ্রুবারি ধারে!
কমলে! খুলিয়া ফেল আঁচল তোমার!
রক্ত ধারা যেথা ইচ্ছা হক প্রবাহিত,
বিজয় সুধেছে আজি বন্ধুতার ধার—
প্রেমেরে করায়ে পান বন্ধুর শোণিত!
চলিনু কমলা আজ ছাড়িয়া ধরায়
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িয়া বন্ধন
জলাঞ্জলি দিয়া পৃথিবীর মিত্রতায়
প্রেমের দাসত্ব রজ্জু করিয়া ছেদন!"
অবসন্ন হোয়ে প'ল যুবক তখনি
কমলার কোল হোতে পড়িল ধরায়!
উঠিয়া বিপিন বালা সবেগে অমনি
ঊর্দ্ধ্ব হস্তে কহে উচ্চ সুদৃঢ় ভাষায়!
"জ্বলন্ত জগৎ! ওগো চন্দ্র সূর্য্য তারা!
দেখিতেছ চিরকাল পৃথিবীর নরে!
পৃথিবীর পাপ পুণ্য, হিংসা, রক্ত ধারা
তোমরাই লিখে রাখো জ্বলদ অক্ষরে!
সাক্ষী হও তোমরা গো করিও বিচার!—
তোমরা হও গো সাক্ষী পৃথ্বী চরাচর!
ব'হে যাও!—ব'হে যাও যমুনার ধার,
নিষ্ঠুর কাহিনী কহি সবার গোচর!
এখনই অস্তাচলে যেওনা তপন!
ফিরে এসো-ফিরে এসো তুমি দিনকর
এই—এই রক্ত ধারা করিয়া শোষণ—
লয়ে যাও—লয়ে যাও স্বর্গের গোচর!
ধুসনে যমুনা জল! শোণিতের ধারে!
বকুল তোমার ছায়া লও গো সরিয়ে!
গোপন ক'রো না উহা নিশীথ! আঁধারে
জগৎ! দেখিয়া লও নয়ন ভরিয়ে!
অবাক্ হউক পৃথ্বী সভয়ে, বিস্ময়ে।
অবাক হইয়া যাক আঁধার নরক!
পিশাচেরা লোমাঞ্চিত হউক সভয়ে!
প্রকৃতি মুদুক্ ভয়ে নয়ন-পলক!
রক্তে লিপ্ত হয়ে যাক্ বিজয়ের মন
বিস্মৃতি! তোমার ছায়ে রেখো না বিজয়ে
শুকালেও হৃদি রক্ত এ রক্ত যেমন
চিরকাল লিপ্ত থাকে পাষাণ হৃদয়ে!
বিষাদ! বিলাসে তার মাখি হলাহল—
ধরিও সমুখে তার নরকের বিষ!
শান্তির কুটীরে তার জ্বালায়ো অনল!
বিষ বৃক্ষ বীজ তার হৃদয়ে রোপিস্!
দূর হ—দূর হ তোরা ভূষণ রতন!
আজিকে কমলা যেরে হোয়েছে বিধবা
আবার কবরি! তোরে করিনু মোচন!
আজিকে কমলা যেরে হোয়েছে বিধবা!
কি বলিস্ যমুনা লো! 'কমলা বিধবা'!
জাহ্নবীরে বল্ গিয়ে 'কমলা বিধবা'!
পাখী! কি করিস্ গান 'কমলা বিধবা'
দেশে দেশে বল্ গিয়ে 'কমলা বিধবা'!
আয়! শুক ফিরে যা লো বিজন শিখরে!
মৃগদের বল্ গিয়া উচু করি গলা—
কুটীরকে বল্ গিয়ে, তটিনী, নির্ঝরে—
'বিধবা হয়েছে সেই বালিকা কমলা'!
উহুহু! উহুহু—আর সহিব কেমনে?
হৃদয়ে জ্বলিছে কত অগ্নিরাশি মিলি
বেশ ছিনু বনবালা, বেশ ছিনু বনে!—
নীরজা বলিয়াগেছে "জ্বালালি! জ্বলিলি!

বুদ্ধদেবের দন্ত।

(শ্রীরামদাস সেন সঙ্কলিত)

বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ শাক্যসিংহকে দেববৎ মান্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নির্ব্বাণের পর হইতেই, তাঁহার মূর্ত্তি সম্মানের সহিত মন্দির মধ্যে রক্ষিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের সত্বা স্বীকার করিতেন না, কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেববৎ সম্মান করিতেন এবং তাঁহাকে এইরূপ স্তব করিতেন। যথা

"নৌমি শ্রীশাক্যসিংহং সকল হিতকরং ধর্ম্মরাজং মহেশং। সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানকায়ং ত্রিমল বিরহিতং সৌগতং বোধিরাজং॥"

এই স্তব ভক্তি প্রকাশক। হিন্দুশাস্ত্রেও গুরুদেবের চরণ পূজা প্রচলিত আছে। বৌদ্ধেরাও সেই মত তাহাদিগের প্রধান গুরু বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরেও তাঁহার মূর্ত্তির উপাসনা করিত। ইহা পৌত্তলিক উপাসনা নহে; কেবল ভক্তি প্রকাশক উপাসনা মাত্র। অদ্যাপিও সিংহল দ্বীপে বুদ্ধ মূর্ত্তির সমীপে বৌদ্ধগণ পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা পূজার প্রণালীতে প্রদত্ত হয় না।

খৃষ্ট জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখীয় পূর্ণিমা রজনীতে শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার চিতাস্থিত ভস্ম, সুবর্ণ পাত্রে বৌদ্ধস্থবিরগণ কর্তৃক নানা দেশে প্রেরিত হইয়া তাহার উপর চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল; এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নৃপতিগণ দ্বারা তাঁহার অস্থি খণ্ড সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। ধম্মাশোক এই সকল অস্থি খণ্ড এবং চিতাস্থিত ভস্ম পুনরায় বিভাগ করতঃ নানা স্থানে প্রেরণ করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যে বট বৃক্ষের মূলে ৬ বৎসর ধ্যান করিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই আদি বৃক্ষের শাখা হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ এ পর্য্যন্ত সিংহল দ্বীপে বর্ত্তমান আছে। মগধ হইতে এই বট বৃক্ষের শাখা ধম্মাশোক তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্য শাসন কালে অনুরাধাপুরে প্রেরণ করেন ও তথায় উহা মহামেঘান্যের প্রমোদ কাননে রোপিত হয়। যথা। (মহাবংশ)

"অথরসহি অসমাহি ধম্মাশোকেশ রাজিনো। মহামেঘ অনাবামে মহাবোধি পতিৎওহি॥"

সিংহলে মহারাজ তিষ্যের রাজ্য শাসন কালে খৃ পূঃ ২৮৮ বৎসরে ঐ

বট বৃক্ষ রোপিত হয়। এই বট বৃক্ষ এ পর্য্যন্ত সজীব আছে। ইহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ২১৬৪ বৎসর। বুদ্ধদেবকে স্মরণ রাখিবার জন্য বৌদ্ধগণ এই রূপ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের দন্ত একাল পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই দন্ত দেখিবার জন্য প্রিন্স-অব-ওয়েলস সিংহলের মন্দিরে অতি সমারোহের সহিত গমন করিয়াছিলেন। উহা কান্দির মালিগাওয়া মন্দিরে অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। ব্রহ্মদেশের রাজদূতগণ ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত হইয়া ভক্তির সহিত এই মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। এ কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ এই মন্দিরে বুদ্ধদন্ত দর্শনাভিলাষে গমন করিয়া থাকে। এই দন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অদ্য লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

বুদ্ধের এই দন্তের ইতিবৃত্ত বিবিধ পালি গ্রন্থে লিখিত আছে। তাহার মধ্যে "দালাদ বংশ" বা "দাত ধাতু বংশ" অতি প্রাচীন, এবং বিস্তীর্ণ, তাহা সিংহল দেশীয় প্রাচীন ইলু ভাষায় ৩১০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। ইহা পালিভাষায় ধর্ম্মকীর্ত্তিথের দ্বারা অনুবাদিত। দাত বংশই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত; দাত বংশের রচনা অতি মনোহর এবং পাঞ্জল। অনুরাধাপুরের পালুতী নগরের রাজ্ঞী লীলাবতীর রাজ্য শাসন সময়ে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মকীর্ত্তি বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি দাতবংশ ভিন্ন চন্দ্র গোমিকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাবংশে দাত বংশের ও বুদ্ধ দন্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

"নয়মিতস অসান্তি দাত ধাতুম মহামহেসিণো। ব্রাহ্মণি কচি অদ্যায় কলিঙ্গ মহ ইযান যই॥ দাত ধাতু সয়ন সম্মহি উত্তেন উবিন্নাসতন্। গহেত্ত বহুমন্নেন কটয়াসমনম্ মুত্তমন্॥ পক্ষি পিত্ত কারণত্তামিহি উসিঙ্গ কলিকুন্তয়ে। দেবানন্ পিয়তী স্সেন রাজ উত্তমহি করোতি॥ ধম্মচক্কেয় গিহে অঙ্গয়ত্তিম্ মহীপতি। ততোপট্টেয়তন গেহন্ দাথ ধাতু ঘরণ অহু॥"

অর্থাৎ তাঁহার (শ্রীমেঘ বাহনের) নবম বর্ষ রাজ্যকালে দাতবংশের বর্ণিত বিবরণানুসারে কোন ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী বুদ্ধের দন্ত কলিঙ্গ হইতে আনয়ন করেন। তাহা তিনি (রাজা) ভক্তিসহকারে "ফালিক" প্রস্তর নির্ম্মিত আধারে দেবপ্রিয়তিস্স নির্ম্মিত ধর্ম্মচক্র নামক গৃহে রাখিয়াছিলেন।

দাতবংশের দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৭ শ্লোকে লিখিত আছে। ক্ষেম নামক বুদ্ধশিষ্য শাক্য সিংহের দন্ত তাঁহার নির্ব্বাণের পর (৫৪৩ খৃ ঃ পূঃ) কুশীনগর হইতে আনয়ন করিলে কলিঙ্গ

প্রদেশের দন্তপুর * নগরাধিপ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ও তাহার পুত্র ও পৌত্র করী এবং সুনন্দের রাজ্যশাসন হইতে দন্তপুরে অপর রাজগণের শাসন পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত বৎসর এই দন্ত সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। দন্তপুরাধিপ গুহসিংহ বুদ্ধ দন্তের বিবরণ কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। একদা তিনি নগর মধ্যে মহাসমারোহ দৃষ্টে প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য কি নিমিত্ত এই উৎসব হইতেছে? তাহাতে এক জন বৌদ্ধ স্থবির ক্ষেমাচার্য্যের আনীত বুদ্ধদন্তের বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা তিনি বুদ্ধ চরিত্রের প্রকৃত মহিমা অবগত হইয়া তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল এবং তিনি স্বরাজ্য হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিপক্ষবাদীগণকে বহিষ্কৃত করিয়াদিলেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণ এই রূপে দন্তপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পাটলিপুত্রাধিপ পাণ্ডুরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ নৃপতি চৈতন্যকে গুহ সিংহের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পাটলিপুত্রে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। চৈতন্য অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দন্তপুরে প্রবেশ করিলে গুহ সিংহ তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। তথায় উভয়ের কথোপকথনানন্তর বিলক্ষণ সম্প্রাতি জন্মিল। গুহ সিংহ চৈতন্যকে বুদ্ধদন্ত দেখাইলে, তিনি তাহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করত দন্তের অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণ বিপক্ষ ভাব বিস্মৃত হইয়া সকলেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। গুহ সিংহ, চৈতন্যের সমভিব্যাহারে বৈরীভাব পরিত্যাগ করত মাণিক্য ময় পাত্রে বুদ্ধ দন্ত লইয়া, জম্বুদ্বীপাধিপতি পাণ্ডু নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডু চৈতন্য ও তাঁহার সৈন্যগণের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণের কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং যে দন্ত প্রভাবে তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দন্ত খণ্ড প্রজ্জ্বলিত হুতাশন মধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের অলৌকিক প্রভাবে দন্ত ভস্ম না হইয়া, রথ চক্রের ন্যায় বৃহৎ পদ্ম মধ্যে মণি মাণিক্য আধারে দন্ত কুন্দ পুষ্পের

* প্রাচীতত্ত্ববিৎ কনিংহেম সাহেব অনুমান করেন, ইহার আধুনিক নাম রাজমহেন্দ্রী।

শোভা ধারণ করিয়া রহিল। * পাণ্ডু এতদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দন্ত হস্তি পদ দ্বারা দলিত করিতে আদেশ করিলেন ; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। পরিশেষে তিনি উহা লৌহ মুদ্গর দ্বারা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের আশ্চর্য্য প্রভাবে উহা সেই লৌহ মুদ্গারে সংযোজিত হইয়া রহিল। কেহই তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। তৎপরে সুভদ্র নামক বৌদ্ধ পুরোহিতের আজ্ঞায় উহা স্থান ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত সুবর্ণ পাত্রে পতিত হইল। রাজা পাণ্ডু এ সকল দৃষ্টে এককালে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের "বত্নত্রিতয়" অবগত হইয়া সুগতের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন †। তিনি এই দন্তের নিমিত্ত মনোহর চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। একজন নৃপতি এই দন্ত প্রাপ্তির জন্য পাটলী পুত্রে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া পাণ্ডু দ্বারা সমরে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর গুহ সিংহ বুদ্ধ দন্ত খণ্ড পুনরায় স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু অধিক কাল তিনি উহা রাখিতে পারেন নাই। ক্ষের ধারের ভ্রাতষ্পুত্র অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার বিরুদ্ধে এই দণ্ড পাইবার আশয়ে যুদ্ধ যাত্রা করিলে গুহসিংহ আপনাকে হীনবল ভাবিয়া এই দন্ত গোপনে তাঁহার জামাতা অবন্তীরাজকুমার দন্তকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী হেমমালার সঙ্গে গোপনে দন্ত খণ্ড লইয়া তাম্রলিপি (তম্লুক) হইতে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। দন্তকুমারের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে ঐ দন্ত লইয়া "দেবানম্ পিয়" তিস্স-নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দিরে রাখিয়া ছিলেন। এই পর্য্যন্ত দাতবংশ পঞ্চমাধ্যায় মধ্যে বুদ্ধ দন্তের অনেক অলৌকিক বিবরণ বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই দন্ত সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ আমরা কতিপয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান একদা সিংহল দ্বীপে মহাসমারোহের সহিত বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক

---

* দাতবংশ তৃতীয় অধ্যায়। পদ্মমধ্যে মনির আধারে দন্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় "ওঁ মণি পদ্ম হোত্রীং" বৌদ্ধ মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

† পাণ্ডু বুদ্ধ দন্ত দন্তপুরাধিপের নিকট হইতে লইয়া যে ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করেন, তাহার উল্লেখ এইরূপ পালিভাষার লিপিতে দিল্লীর প্রস্তর স্তম্ভে খোদিত আছে।

"দেবানন পেয় পাণ্ড সোরাজা হিয়ন অহ" সত্যয়ি স্মৃতি যশ অভিশিতেন সেই যন ধম্ম লিপি লিখপিতহি। দন্তপুরতো দশনন উপাদায়িন ইত্যাদি।

উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

১২৬৮ খৃষ্টাব্দে এই দন্ত কান্দীর মালিগবা মন্দিরে রক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ভাষায় সুপণ্ডিত মৃত টরনার সাহেব কহেন ১৩০৩ হইতে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে প্রথম ভুবনেকবাহুর রাজ্যকালে পাণ্ডু দেশাধিপতি কুলশেখরের সেনাপতি "অরিচক্রবর্ত্তী" সিংহল জয় করিয়া এই দন্ত খণ্ড পাণ্ডু নগরে আনয়ন করেন। তৎপরে উহা পুনরায় তৃতীয় পরাক্রম নৃপতি পাণ্ডুনগরাধিপতিকে পরাজয় করত সিংহলের মন্দিরে পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করেন। রেবিরো নামক ইতিবৃত্ত লেখক কহেন যে উহা ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে পর্টুগিজ যুদ্ধের সময় কনষ্টেস্টাইন ডিব্রাগেঞ্জা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সিংহল বাসী বৌদ্ধগণ এই কথায় বিশ্বাস করে না। তাহারা বুদ্ধদন্ত ধ্বংস হইবার নহে, ইহা মনে২ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে। সিংহলীয় আধুনিক ইতিবৃত্তে লিখিত আছে যে, ঐ দন্ত পোর্টুগিজ যুদ্ধের সময় সফ্রাগামের মন্দিরে লুক্কায়িত ভাবে রাখা হইয়াছিল; এজন্য তাহা কনেস্টেনটাইন ডিব্রাগেঞ্জা বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ যাহাই বলুন না কেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এক্ষণে কান্দীর মন্দিরে যে বুদ্ধদন্ত আছে, তাহা কখনই মনুষ্যের দন্ত নহে, উহা কুম্ভীরের দন্ত এবং সিংহল বাসী সুপণ্ডিত মতুকুমার স্বামীও তাহাতে ঐক্যমত হইয়াছেন। বর্ষে২ মহাসমারোহের সহিত এই দন্ত সিংহলবাসীগণের সম্মুখে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই উৎসবের নাম "দালাদ পিক্কয়া"।

স্ত্রী স্বাধীনতা

দিন অবধি আমাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা লইয়া বিস্তর আন্দোলন হইয়া আসিতেছে। কেহ তৎপক্ষে এবং কেহ তদ্বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমরাও এতদ্বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

কেহ বলেন যে স্ত্রীদিগকে গৃহ পিঞ্জরুদ্ধা রাখিয়া তাঁহাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক উন্নতিরও ব্যাঘাত জন্মান হইতেছে, ইহা নিষ্ঠুরতারও কার্য্য বটে। আমরা এ সকলই অস্বীকার করি। আমাদিগের স্ত্রী লোকেরা আপন আপন গৃহে যে প্রকার পরিশ্রম করিয়া থাকেন তাহাতে

তাঁহাদিগের উত্তম রূপ শারীরিক চালনা হইয়া থাকে।) ইহাতে ইউরোপীয় এবং এদেশীয় স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যপক্ষে এত প্রভেদ যে পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শ্রেণীর স্বাস্থ্য অতি হীনাবস্থাপন্ন এবং পরোক্ত স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষাকৃত সমধিক সুস্থ। শারীরিক চালনার এত ফল যে, কৃষকেরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আর আর সমুদয় নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও কেবল এক মাত্র শরীর চালনা দ্বারা প্রায় অন্য সমুদয় শ্রেণীর লোকাপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্য সুখ ভোগ করিতেছে। উপরোস্থ ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে স্বাস্থ্যসুখ অল্প তাহা শারীর বিধান বিদ্যাবিৎ ডাক্তার হামিল্টন সাহেবের গ্রন্থ দেখিলেই জানিতে পারা যায়। আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকেরা যে সকল গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন তাহার কিছুই অপমান জনক নহে, যে হেতু তৎসমুদয়ই কেবল আপন আপন গৃহের নিমিত্ত সম্পাদিত করিতে হয়। ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের যে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তাহার হেতু নিষ্ঠুরতা হওয়া দূরে থাকুক প্রবল হিতৈষণী। যে হেতু আপন আপন স্ত্রী কন্যাদিগের প্রতি লোকে কেনই বা নিষ্ঠুরাচরণ করিবে। স্ত্রীদিগকে গৃহে আবদ্ধ করার হেতুও নিষ্ঠুরতা নহে এবং তাহার ফলও নিষ্ঠুরতা ব্যঞ্জক নহে। আমাদিগের দেশে সাধারণ ব্যক্তিদিগের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে বহির্ব্বিহারকারিণী স্ত্রীলোকদিগকে যে কতই অশ্লীল বাক্য শ্রবন করিয়া বিরক্ত হইতে হয় তাহা পথি মধ্যে ভ্রমণকারী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ আমাদিগের দেশে সুরাপায়ীদিগের যে প্রকার শোচনীয় প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে অসহায় অবস্থায় ভ্রমণকারিণী, ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের যে কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এ দেশে ইউরোপীয় কি আশিয়ান, এপ্রকার অশিক্ষিত বলবান বিদেশীয়ও অনেক দেখা যায়, যাহারা ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের প্রতি স্বভাবতই অভদ্র আচরণ করিবে এবং স্থল বিশেষে তাহারা বলপ্রয়োগ করিলেও এ দেশীয় ভদ্র লোকেরা তাহদিগকে দমন করিতে পারিবে না। যখন সুসভ্য ইংলণ্ডীয় সমাজেই কর্ণেল বেকারের মত লোকের অসদ্ভাব নাই তখন অসভ্যলোকাকুল ভারতবর্ষে বহিঃভ্রমণকারিণী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি আর কি প্রকারে উচিতমত সদাচরণ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ অতি অল্প লোক ব্যতীত সর্ব্বসাধারণে এখনও স্ত্রীলোকদিগকে যথোচিতরূপে সমাদর করিতে শিখে নাই এবং যে সমাজে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি

পুরুষদিগের অধিক পরিমাণে সমাদর জন্মে নাই সে সমাজের স্ত্রীলোকদিগের যথেষ্ট ভ্রমন করিতে দেওয়া অপরিনামদর্শিতার কার্য্য মাত্র। বিশেষতঃ শিক্ষিত স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য ভদ্র স্ত্রীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করার প্রস্তাবই যখন ভ্রমান্ধতার কার্য্য তখন যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা কেবল মাত্র আরব্ধ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না সে দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদান করা যে কত দূর অসঙ্গত তাহা প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিবেন। \

কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকাতে প্রায় দর্শনীয় কিছুই দেখিতে পান না। ইহা অত্যুক্তি পরিপূর্ণ। তাঁহারা অনেক দেখিতে পান। ভাল প্রকারের যাত্রাদি, বাজীকরের বাজী, সপুড়িয়ার সর্প প্রদর্শন, ভদ্র ভদ্র অনেক লোক সকলই তাঁহারা দেখিতে পান। বগী, কোচ, হস্তী, ঘোড়া প্রভৃতিও প্রকৃতির মনোহর দৃশ্যও এককালীন তাঁহাদিগের দৃষ্টির অগোচর থাকে না। তবে তাঁহারা বিচারলয়ে উপস্থিত হইয়া বিচারপতি প্রমুখ সমবেত অমাত্যবর্গ ও বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শিক্ষক প্রমুখ সমবেত ছাত্রবর্গ এবং পথিমধ্যে গমনকারী লোকদিগকে প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পান না সত্য বটে, কিন্তু শিক্ষিত লোকের স্ত্রীরা অনেক বিচারের যুক্তি, এবং সদুপদেশ পূর্ণ অনেক প্রকারের কথা, ধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই প্রসঙ্গ শুনিতে পান। ভদ্র স্ত্রীলোক মণ্ডলীর অনেকে সময়ে সময়ে সমবেত হইয়া সমাজিক সুখও উপভোগ করেন। তবে তাঁহারা পথিমধ্যে ভ্রমণকারী ইতর লোকদিগের কুৎসিক কথোপকথন, অনেক অভদ্র আচরণ বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের অসভ্যোচিত হাস্যপরিহাস, চপলতা এবং কুভাবব্যঞ্জক কটাক্ষাদি হইতে দূরে থাকেন এ কথা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু এই সকল হইতে দূরে থাকা কাহারও যে রুচিবিরুদ্ধও হইয়া থাকে ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

ক্রমশঃ।

সিরাজ উদ্দৌলা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাশিমবাজারের কুঠী আক্রমণ।—কলিকাতার কৌন্সিলের ভয়।—তাঁহাদের সাবধানতা।—উমিচাঁদের প্রতি অত্যাচার।—তাহার গর্হিততা।

২২ শে মে তারিখে নবাবের সৈন্যেরা কোম্পানির কাশিমবাজারের কুঠী বা দুর্গ অবরোধ করিল। অন্য অত্যাচার কিছুই করিল না। ১লা জুন তারিখে নবাব স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য সমেত উপস্থিত হইলেন। কাশিমবাজারের দুর্গে বিপক্ষ আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়, এরূপ সমরায়োজন কিছুই ছিল না। দুর্গ সহজেই নবাবের করকবলিত হইল।* মেঃ ওয়াট্‌স্, মেঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংশ্ ও কাশিমবাজারস্থ কোম্পানির অপরাপর কর্ম্মচারীবর্গ বন্দী হইলেন। নবাব এ ঘটনায় অকারণ শোণিতস্রোতে ধরণী কলঙ্কিত করেন নাই।† বিজাতীয় ঐতিহাসিকগণ তাঁহার চরিত্র চিত্র করিতে যেরূপ বর্ণের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে এই ব্যাপারে নবাব যদি আয়ত্তাগত প্রত্যেক ইংরাজের জীবন নাশ করিতেন, তাহা হইলে উপযোগী হইত। প্রাণ হানি করা দূরের কথা, নবাব কাহারও সহিত বিশেষ অভদ্র ব্যবহারও করেন নাই। তথাপি আমি বলিব, তোমার নবাব বড় মন্দ, বড় নিষ্ঠুর, বড় দুর্দ্দান্ত। তুমি আমার কি করিবে?

কাশিমবাজারের এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কলিকাতার কৌন্সিল নিতান্ত ভীত হইলেন।* তখন তাঁহারা নবাবের ক্রোধ শান্তির যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিপদে না পড়িলে ইংরেজেরা কখনই নরম হন না। তাঁহারা দেখিলেন যে, উপস্থিত বিপদ ভয়ানক ও তাহার হস্ত হইতে বল বিক্রম দেখাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব। নবাবের দয়া ভিন্ন নিস্তারের অন্য কোন উপায় নাই। তখন তাঁহারা অগত্যা নবাবের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিতে লাগিলেন। দুর্গে নূতন যে কিছু সংযুক্ত হইয়াছে তাহা ধ্বংস করিতে, দুর্গের বাহি-

* Orme's Indostan Vol. II. P. 56. &c
† Torren's Empire in Asia, P. 27.

* Thornton's History of the British Empire in India Vol. I. Torren's Empire in Asia &c &c.

রেও যদি এমন কোন বাটী থাকে, যাহা দেখিলে সহসা রক্ষণ কার্য্যের নিমিত্ত বিনির্ম্মিত বোধ হয়, তাহা নির্ম্মূল করিতে, অথবা নবাবের যেরূপ অভিরুচি হয়,তদনুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকার করিলেন। তথাপি নবাবের ক্রোধ শান্তি হইল না। সুপ্রসিদ্ধ ধনবান্ রত্নবণিক জগৎ শেঠের পুত্র মুতাব রায় শেঠ ও রূপচাঁদ শেঠের সহিত ইংরাজদিগের বাণিজ্য সূত্রে অনেক সম্বন্ধ ছিল। তাঁহারাও নবাবের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। হুগলীতে খোজা ওয়াজিদ্ নামে একজন প্রধান মুসলমান বণিক বাস করিতেন। ইংরেজরা এই ব্যক্তিকে তাঁহাদের হইয়া নবাবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। খোজাওয়াজিদের অনুরোধ শুনিয়া নবাব বলিলেন, মেঃ ড্রেক তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক অপমানিত করিয়াছেন, নবাব জাফরের সময়ে ইংরেজরা যেরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগকে তদন্যথায় অন্যরূপে এ দেশে থাকিতে দিব না। * নবাবের এ কথার উপর আর কথা অসম্ভব। প্রত্যুত ড্রেক নবাবকে অপমানিত করিয়াছিলেন। সিরাজ উদ্দৌলার হঠকারী ও অবিবেচক বলিয়া অখ্যাতি রাষ্ট্র আছে। কিন্তু তাঁহার কার্য্য সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে সিরাজের সে অখ্যাতি যেন অমূলক বলিয়া বোধ হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ড্রেক কৃত সেই ঘোর অপমানের পর (নবাবের দূতের প্রতি অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি) সমস্ত ইংরাজকে খণ্ড খণ্ড করিলে শোভা পাইত। সিরাজ সেই অপমানের পর বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র; অন্যায় করিয়া বা অবিবেচনা পূর্ব্বক কোন নীতিবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। স্থির, ধীর ও প্রশান্ত ব্যক্তি এ অবস্থায় যেরূপ করিয়া থাকে, সিরাজ তাহাই করিলেন। তিনি যদি অধীরতা সহকারে হিতাহিত বোধ শূন্য হইয়া ক্রোধদাসের ন্যায় কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে কি কাশিমবাজারস্থ ওয়াট্, হেষ্টিংস প্রভৃতি ইংরেজগণের জীবন পরিরক্ষিত হইত? না, তাঁহারা নবাব সকাশে সদ্ব্যবহার পাইতেন? ফলতঃ নবাব ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই এবং তাঁহাকে যতদূর ক্রোধান্ধ ও অবিবেকী বলিয়া কলঙ্কিত করা

* Orme's Indostan Vol. II.

যায়, তিনি তত দূর মন্দ ছিলেন না। যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ এবম্বিধ অবস্থায় ধীরতা সহকারে যেরূপ ভাবে কার্য্য-সাগরে প্রবেশ করে, বালক সিরাজ-উদ্দৌলা সেইরূপ ভাবে কার্য্যে প্র-বৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ। তাঁহার কার্য্যে মন্দা-ভিসন্ধি ভিন্ন অন্য কিছুই লোকে দেখিল না। তাঁহার নাম ঘৃণার্হ হইয়া রহিল! তাঁহার ব্যবহার মাত্রই নিন্দ-নীয় এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া রহিল। সে যাহা হউক সিরাজের ক্রোধ কিছুতেই উপশমিত হইল না। তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। ৯ই জুন তারিখে তাঁহার সৈন্য সমস্ত কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল।

কলিকাতার কৌন্সিল কাশিম-বাজারের পতন সংবাদ পাইয়া বুঝি-লেন যে, সাবধান হওয়া সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। এজন্য তাঁহারা মা-ন্দ্রাজ ও বম্বেতে সাহায্যার্থে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সে সকল সুদূর প্রদেশ হইতে সাহায্য সমুচিত সময়ে সমুপস্থিত হওয়া নিরতিশয় অসম্ভব। অনন্যোপায়ে ইংরাজগণ চন্দননগ-রস্থ ফরাসীগণ ও চুঁচুড়াস্থ ওল-ন্দাজগণ সমীপে সবিনয়ে সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। উভয় সম্প্র-দায়ই সাহায্যদানে অস্বীকৃত হই-লেন।* তখন যেরূপে হউক বিপদের সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত ইংরাজগণের অন্য উপায় রহিল না। আত্মবলের উপর তাঁহারা তখন অগত্যা সমস্ত ভরসা সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহা-দের কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে যে বল ছিল, তাহা যৎসামান্য। তাহার উপর নির্ভর করা বাতুলতা। কিন্তু "মজ্জমান জন ধরে তৃণ।" ইং-রাজগণ সেই অকুল বিপদ্‌সাগরে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত নিতান্ত নি-র্জীব ভেলকাশ্রয় করিলেন। ২৬৪ জন সৈন্য দুর্গে, ২৫০ জন রণতরিতে, একুনে ৫১৪ জন সৈন্য মাত্র ইংরাজ-গণের ভরসা। দুর্গের সৈন্যগণ নি-তান্ত অশিক্ষিত। তাহারা সমরকার্য্যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এমন কি "তা-হাদের মধ্যে দশজনও কাওয়াজ ভিন্ন অন্যকার্য্য দেখেও নাই" † এবং তাহাদের মধ্যে একজনও বন্দু-কের প্রকৃত ব্যবহার জানিত না।‡ ভরিতযুদ্ধে ভারতবাসী ইংরাজদি-গকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সা-হায্য প্রদান করিয়া আসিতেছে।

* Orme's Indostan Vol. II. 59. Thornton's British Empire in India. Vol. I P. 1?8-9.

† Orme's Indostan. Vol II P. 59.

‡ Holwell's India Tracts. P. 302.

ইহা ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবজনক কথা নহে। না হউক কিন্তু একথায় ইহা ব্যক্ত করিতেছে যে, ভারতবাসী ইংরাজগণের সহিত কদাচ অসদ্ব্যবহার করে নাই। স্বদেশবাসীর শোণিত পাত করিয়াও তাহারা ইংরাজগণের সন্তোষ সমুৎপাদন করিয়া আসিতেছে। ইংরাজরা বুঝিলেন যে, এই সামান্য সৈন্যবল লইয়া নবাবের সম্মুখীন হওয়া ও জ্বলন্ত অনলে জীবন সমর্পণ করা সমান কথা। অগত্যা তখন ভারতবাসীর শরণগ্রহণ শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইল। বক্সারী বন্দুকধারী সৈন্য সংখ্যা সম্বর্দ্ধিত করিয়া পনর শত করা হইল * সেই অত্যল্প সময় মধ্যে রক্ষণোপযোগী আয়োজন যথাসম্ভব বিহিত হইতে লাগিল। নগরের কতকগুলি পথ নিরুদ্ধ করা হইল এবং কতকগুলি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ভবনে দুর্গের ন্যায় আয়োজন করা হইল। এইরূপে নিষ্কৃতির অতি সামান্য উপায় সমস্ত প্রদর্শিত হইতে লাগিল। কিন্তু এসকল প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদর্শন মাত্র। কারণ ইহাতে উপকার সম্ভাবনা অতি বিরল, বস্তুতঃ নিষ্কৃতির নিমিত্ত এতদপেক্ষা অধিক আয়োজন বিহিত হইলেও তাহা যে সুফল সমুৎপাদন করিত তাহা কদাচ বিবেচনা করা যায় না।*

বিপদের সময় কিছুতেই কুল দেয় না। ইংরাজরা ভাবিলেন যে, নবাব আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে কলিকাতার অনতিদূরে নদীর সংকীর্ণ স্থলে কিছু সমরায়োজন রাখিলে উপকার সম্ভাবনা। এজন্য ১৩ই জুন তারিখের প্রাতে তত্রত্য দুর্গ অধিকারের প্রযত্ন হইল। মনোরথ আপাতত সি হইল বটে কিন্তু স্থায়ী হইল না। পরদিন তাঁহাদের অধিকার নষ্ট হইয়া গেল। হুগলী হইতে বিপক্ষপক্ষের সাহায্য আসিল। সেই সাহায্য বলে তাহারা ইংরাজদিগকে বিজিত করিল। †

ইংরাজরা এই সময়ে একজনের মস্তকে যেরূপ অত্যাচাররাশি বর্ষণ করিয়াছিলেন, অকারণে মনুষ্য মনুষ্যের উপর তাদৃশ দৌরাত্ম্য করিয়া উঠিতে পারে, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত সুসভ্য

* Orme's Indostan Vol. II. P,59.

* Seir Mutaqherin Vol I,P. 720 & Thornton's History of India Vol. I P. 189.

† Orme's Indostan. Vol II,P.59-60.

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজজাতি অপর বর্ণের সজাতির উপর যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যে হতভাগ্যকে ইংরেজরা জ্বালাতন করিয়াছিলেন তাহার নাম উমিচাঁদ। উমিচাঁদ এক জন প্রধান শ্রেণীর বণিক। তাঁহার কাজ কারবার বিস্তৃত ও লাভপ্রদ। তাঁহার সম্পত্তিরাশিও অপরিমিত। এ ব্যক্তির বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি প্রশংসনীয়। কলিকাতায় উমিচাঁদ স্বীয় কারবার স্থাপন করেন ও তথায় সপরিবারে বাস করেন। উমিচাঁদ কলিকাতায় নরপতির ন্যায় সমারোহে বাস করিতেন। তাঁহার লোকজন দাসদাসী বাহক যানাদি রাজ পদযোগ্য ছিল। সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াই হউক, বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়াই হউক, তৎপ্রদত্ত উপহার বলেই হউক, নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারে উমিচাঁদের আধিপত্য ছিল। তাঁহার এই সম্ভ্রমই সর্ব্বনাশের মূল হইল। ইংরাজগণের হিংসা প্রবৃত্তি উমিচাঁদের এবম্বিধ মান সম্ভ্রম ও উন্নতি সহ্য করিতে পারিল না। তাঁহারা যেরূপে হউক উমিচাঁদকে বিপন্ন, কাতর ও মানশূন্য করিতে কৃতসংকল্প হইলেন উমিচাঁদের অপরাধ কি? কেন. তাঁহার অপরাধ কি জিজ্ঞাসিতেছ? তাঁহার অপরাধ নাই কি? তাঁহার এত সম্ভ্রম কেন হইল? নবাবের নিকট তাঁহার এত আধিপত্য কেন হইল? বাণিজ্যে তাঁহার এত অর্থ কেন জমিল? সেই বাণিজ্য আমরাও করিতেছি। আমাদের অধীনস্থ বণিক উমিচাঁদ আমাদের অপেক্ষা অধিক ধনোপার্জ্জন করিতে লাগিল ইহা কি তাহার অপরাধ নয়? এ সকল অবশ্যই গুরুতর অপরাধ। আর বিশেষ অপরাধ সে তাহার সম্পত্তিরাশি আমাদের দেয় না কেন? তাহার তত সম্পত্তির প্রয়োজন কি? সে হিন্দু, গর্দ্দভ, মূর্খ, অসভ্য, বাঙ্গালী, নরাধম, কাপুরুষ ধনে তাহার কি প্রয়োজন? আমরা জগতের প্রধান সভ্য জাতি, মনুষ্যকুলের গৌরবস্থল, বিদ্যা ভদ্রতা প্রভৃতির নিকেতন ইংরাজজাতি, উত্তাল তরঙ্গমালা সংকুল সাগরবারি অতিক্রম করিয়া এই ঘোর অসভ্য, রোগ শোকপূর্ণ. অস্বাস্থ্যকর, বরাহ শৃগাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীর নিবাসোপযোগী ভারতভূমে কেবল ধনের চেষ্টায় আসিয়াছি। তোমাদের উচিত যে তোমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তোমাদের ছিন্ন কন্থা পর্য্যন্ত আমাদিগকে দান করিয়া বান-

প্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন কর। তাহা না করা দোষ—দোষ কেন পাপ—মহাপাপ। সিরাজউদ্দৌলা, উমিচাঁদ প্রভৃতি এই মহাপাপ করিয়াছিল। সুতরাং তাহারা বধ্য, তাহারা নারকী, তাহারা অসৎ, তাহারা শঠ, তাহারা নীচ হইতে নীচ। আর আমরা? আমরা সভ্যতার ধ্বজা, সততার দৃষ্টান্ত, জগতের প্রধান জাতি।

অনতিকাল মধ্যে নবাব কলিকাতা আক্রমণ ও তাহা লুণ্ঠন করিবেন জানিয়া দরবারস্থ একজন উমিচাঁদের আত্মীয় তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তি সমস্ত সাবধান করিতে পরামর্শ লিখিয়া পাঠান। ঐ লিপি ১৩ই জুন তারিখে উমিচাঁদের হস্তগত হয়। এই সামান্য কারণে উমিচাঁদকে ইংরাজেরা অবরুদ্ধ করিলেন এবং দুর্গমধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তাঁহার বাসবাটীতে কোম্পানী ২০ জন প্রহরী বসাইলেন। উমিচাঁদের এক কপর্দ্দক সম্পত্তিও যাহাতে স্থানান্তরিত না হয় তাহার আয়োজন করা হইল। হাজারীমল নামে উমিচাঁদের কার্য্যাধ্যক্ষ অন্তঃপুর মধ্যে লুকায়িত ছিল। প্রহরীগণ তাহাকে নিরুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করায় উমিচাঁদের ৩০০ ভৃত্য অস্ত্র হস্তে দণ্ডায়মান হইল। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বল ক্ষয় হইল। ইত্যবসরে উমিচাঁদের একজন প্রধান কর্ম্মচারী প্রভুর মান সম্ভ্রম রক্ষার অন্য প্রকৃষ্ট উপায় না দেখিয়া বাস বাটীতে অগ্নি সংযুক্ত করিয়া দিল। প্রকাণ্ড ভবন ধুধু শব্দে জ্বলিতে লাগিল, সেই ব্যক্তি তখন স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে একে একে উমিচাঁদের পরিবারভুক্ত ১৩ জন কুলকামিনীর জীবন সংহার করিল। অবশেষে স্বীয় বক্ষে ছুরিকা প্রোথিত করিল।*

পাঠক! এই লোমহর্ষণ ব্যাপার অনুধাবন করিয়া তোমার কি বোধ হয়? উমিচাঁদ স্বীয় সম্পত্তি আবশ্যক বা সুবিধা অনুসারে যেখানে সেখানে রাখিতে পারে। তাহার সম্পত্তি, সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। ইচ্ছা হইলে সে স্বীয় ধনরাশি ভাগীরথীর বিশাল গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে পারে বা ভূমধ্যে প্রোথিত করিতে পারে। তুমি ইংরাজ বণিক! তোমার তাহাতে ক্ষতি কি? সে তাহার নিজ সম্প-

* Orme's Indostan Vol. II.
Mill's British India Vol. III.

ত্তির যথাভিরুচি ব্যবহার করিবে, তুমি ইংরাজ তাহাতে ক্ষুণ্ণ হও কেন? তোমার এ অনধিকার চর্চ্চা কেন? স্বীকার কর বা না কর, উমিচাঁদের ধনাগার তোমার আয়ত্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, ইহা কখনই তোমার অভিপ্রায় ছিল না। সেই ধনরাশির জন্য দুর্দ্দমনীয় লোভে তোমার হৃদয় আপ্লুত ছিল। কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া পরকীয় বিত্ত সংরক্ষণার্থ ইংরাজ বণিক কি অনিষ্টই না করিলে? অনিষ্ট করিলে করিলে আবার দোষটী সমস্ত উমিচাঁদের স্কন্ধেই রাখিয়া দিলে। এ সকল সভ্যতা, বিদ্যা ও বুদ্ধি বাঙ্গালীর নাই। সুতরাং তাহারা তোমাদের অপার মহিমা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আর এক কথা। উমিচাঁদের কর্ম্মচারী যে উমিচাঁদের প্রকাণ্ড ভবন ভস্মীভূত করিল ও অন্তঃপুরবাসিনী, ১৩ জন নিষ্কলঙ্ক হিন্দু রমণীর জীবন সংহার করিল, তাহারই বা কারণ কি? কেবল ইংরাজপ্রহরীগণ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিবেন ভাবিয়া কি কর্ম্মচারী এই ঘোর দুষ্কর্ম্ম সম্পন্ন করিল? এ কথা কে বলিবে? এ অতীত কালের সাক্ষী কে দিবে? অদ্য কাহায় জিজ্ঞাসিব, কে বলিবে, ইংরাজ শত বর্ষ পূর্ব্বে উমিচাঁদের পরিবার সম্বন্ধে কি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? বীরপ্রসূ রাজবারায় কুলকামিনীর সতীত্ব রত্ন নিষ্কলঙ্ক রাখিবার নিমিত্ত এবম্বিধ রমণীহত্যা বারম্বার সংঘটিত হইয়াছিল। ভারত—সতীত্ব, মান, সম্ভ্রম ও নৈতিক উন্নতির সবিশেষ অনুরাগী। সতীত্ব বিধ্বংসিত হওয়া অপেক্ষা পুরস্ত্রীর জীবন বিনষ্ট হওয়া সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ, এ কথা ভারতবাসী যেমন বুঝে এমন আর কোন জাতি বুঝে কি না সন্দেহ। কিন্তু কেবল ভিন্ন জাতির পুরুষ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিবে, এই সামান্য ভয়ে ত্রয়োদশ নিরীহ রমণীর জীবন নাশ করা কখনই সম্ভাবিত নহে। ইহার অবশ্যই অন্য কারণ আছে। কিন্তু সে কারণ অদ্য আমাদের কে জানাইয়া দিবে। ঘটনাচক্রে ইতিহাস যেন, যথার্থ কথা লুকাইয়া রাখিয়াও রাখিতে পারিতেছে না। ইতিহাস যেন বলিতেছে যে, ইংরাজপ্রহরীগণের উমিচাঁদের পরিবার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি ছিল। তজ্জন্যই (তাদৃশ গুরুতর কারণ ভিন্ন অন্য কারণ সম্ভবে না।) প্রভুভক্ত, মানভীত কর্ম্মচারী নিরীহ পুরস্ত্রীর পবিত্র শোণিতে স্বীয় হস্ত কলঙ্কিত করে। জগতের সভ্যতার আদর্শ ইংরাজ

জাতির এবম্বিধ চরিত্রগত দোষ অনুসন্ধান করিতে মন উদাস, বিভোর ও অস্থির হইয়া উঠে। পাঠক! সিরাজ কোন্ কোন্ পাপে মনুষ্য সমাজে চিরকাল কলঙ্কিত ও নিন্দাভাজন হইয়া রহিয়াছেন তাহা একবার এই সময় স্মরণ করিয়া দেখিবেন। উমিচাঁদের প্রতি অত্যাচার নাটকের এক অঙ্ক মাত্র প্রদর্শিত হইল। যথাসময়ে অবশিষ্টাংশ প্রদর্শিত হইবে।

আমরা প্রাসঙ্গিক কথায় মূল কথা ছাড়িয়া দিয়া অনেক দূরে গিয়াছিলাম। একণে সিরাজ উদ্দৌলা উদ্দেশ্য সিদ্ধির কতদূর কি করিয়া উঠিলেন তাহা দর্শন করা বিধেয়।

(ক্রমশঃ)

জ্ঞাতব্য চিকিৎসা।

ডিসেনটরি বা আমাশায়

লক্ষণ

এই পীড়া কাহার কাহার সামান্যরূপে, কাহার কাহার বা প্রবলরূপে প্রথমে আক্রমণ করে। সামান্যরূপে আক্রমিত হইলে অগ্রে অল্প কম্প হইয়া ক্রমে গাত্র উষ্ণ হয়, ক্ষুধা মান্দ্য হয়, গা বমি বমি করে, যেন কে উদর চিবাইতেছে বোধ হয়, দাস্তের অল্প অল্প বেগ হইতে থাকে এবং ক্রমে অল্প অল্প মল নিঃসৃত হইতে থাকে। তাহার সহিত আম মিশ্রিত থাকে এবং কাহার কাহার বা অল্প অল্প রক্তাংশ নির্গত হইতে দেখা যায়। অল্প অল্প পিপাসা হয়. আহার করিতে ইচ্ছা থাকে না এবং জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও আর্দ্র হয়। এ অবস্থায় যদি রোগী সুনিয়মে থাকে অর্থাৎ সুপথ্যাদি সেবন করে, কোন অত্যাচার না করে, তবে ইহার চিকিৎসা করিতে হয় না। কিন্তু যদি ঐ অবস্থায় আহারাদির অনিয়ম এবং অতিরিক্ত অসহনীয় ঔষধ সেবন করে, তবে পীড়া ক্রমে প্রবল হইয়া পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয়। প্রবলরূপে আক্রমিত হইলে প্রথমে কম্প হইয়া পরে গাত্র উষ্ণ হয়, নাড়ী দ্রুতগামী হয় ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া সকল দুর্ব্বল হয়। উদরে বেদনা হয়, দাস্তের বেগ অত্যন্ত হয় অর্থাৎ মলনিঃসর-

ণের সময় অত্যন্ত বেগ দিতে ইচ্ছা করে অথচ মল নির্গত হয় না; প্রথমে অল্প অল্প মল নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহার সহিত আমসংযুক্ত থাকে এবং কখন কখন বা রক্ত ও আম উভয়ই সংযুক্ত থাকে; মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় ও অত্যন্ত কোঁতানি হয়। রোগী মল ত্যাগে বসিয়া উঠিতে চাহে না, কারণ বেগ দিতে আরাম বোধ হয়। সরলান্ত্রে প্রদাহ থাকিলে দাস্ত হইবার বেগ দিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব হয় এবং কখন কখন মূত্রাশয়ে উত্তেজন হইয়া প্রস্রাব করিতে কষ্ট হয় ও কাহার কাহার প্রস্রাব বন্ধ হয়। (এ অবস্থায় ক্যাথিটর বা শলা দ্বারা প্রস্রাব করান কর্ত্তব্য) অতিশয় বেগের সহিত বার বার মল নিঃসৃত হইতে থাকে, রোগী দুর্ব্বল হয়, সবল থাকিলেও উঠিতে ইচ্ছা করে না, কেবল শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। উদরে স্থানে স্থানে বেদনা হয় ও পেট ফুলে, শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও রোগীর স্বভাব রুক্ষ হয়। প্রথমে অল্প আমরক্ত সংযুক্ত দাস্ত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পায়। অবশেষে মাংস ধৌত জলের ন্যায় পাতলা মল নিঃসৃত হইতে থাকে, ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হইয়া মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে অর্থাৎ রক্তহীন বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে জ্বরভাব হয়, নাড়ী দ্রুতগামী ও সূক্ষ্ম হয়, উদর অতিশয় স্ফীত হয়, জিহ্বার মধ্য ভাগে ক্লেদযুক্ত অনুভব হয়, পার্শ্বদেশ শাদা, রাঙ্গা অথবা কটাবর্ণ হয়, কখন কখন বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ক্রমে অধিক পরিমাণে সিরম্ সংযুক্ত কটাবর্ণ জলবৎ দাস্ত হইয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং গাত্র হইতে পচা মাংসের ন্যায় দুর্গন্ধ বাহির হয়। তখন উদরের বেদনা নরম পড়িতে থাকে। রোগী তখন কিছু আরাম বোধ করে, কিন্তু হঠাৎ প্রলাপাদির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। এই অবস্থায় উত্তমরূপে চিকিৎসিত হইলে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু কখন কখন বা রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াও অনিয়ম পথ্য ও অত্যাচার দোষে পুনরায় রোগাক্রান্ত হয়। তখন রোগী দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং জলবৎ দুর্গন্ধ মল নিঃসৃত হইতে থাকে। তাহাতে কখন কখন অধিক পরিমাণে আম ও সিরম্ মিশ্রিত থাকে, কখন কখনও বা সহজ মলের ন্যায় কঠিন মল নিঃসৃত হয়। কখন কখনও অ-

তিশয় তরল কটাবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ কিংবা রক্তবর্ণ অথবা ফেনযুক্ত মল গুহ্যদ্বার দিয়া বেগে নির্গত হইতে থাকে। গুহ্য সংকোচক পেশির স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস হওয়ায় বিনা চেষ্টায় মল নির্গত হইতে থাকে, রোগী দাস্ত হইবে তাহা জানিতে পারে না। রোগীর আহার করিতে অনিচ্ছা হয় না, কখন কখনও কুপথ্য দ্রব্য খাইতে অভিলাষ হয়। আহার্য্য দ্রব্য উত্তমরূপ পরিপাক না হইয়া শীঘ্র শীঘ্র অন্ত্র হইতে বহির্গত হওয়াতে পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইয়া রোগী শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, জিহ্বার স্থানে স্থানে ফাটা ফাটা বোধ হয় এবং রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল হয়; মাথার চুল ২।১টী করিয়া পড়িতে থাকে, শরীরে মধ্যে মধ্যে স্ফোটক নির্গত হইতে দেখা যায়, রাত্রে অধিক ঘর্ম্ম হয়। যদি উক্ত পীড়ার সহিত যকৃৎ ও প্লীহার বৃদ্ধি হয়, বা মূত্রপিণ্ডের পীড়া হয় অথবা ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর থাকে, তবে উপরোক্ত লক্ষণ সকল নানারূপে পরিবর্ত্ত হয়। এই পীড়ার শেষাবস্থায় হিক্কাও প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে রোগীর আর বাঁচিবার আশা থাকে না। এই রোগে বৃহৎ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ হয় এবং বৃহৎ অন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ কোলন্ নামক অন্ত্রেও প্রদাহ হয়, এবং বৃহৎ অন্ত্রের অভ্যন্তরে পূর্ণ গর্ত্ত ও শূন্য গর্ত্ত যে দুই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি অবস্থিতি করে, তাহাতে রক্তাধিক্য ও প্রদাহ হয়। এই রোগের প্রাচীন অবস্থায় যকৃৎ-স্ফোটক হইয়াও থাকে এবং কখন কখন অন্ত্র ছিদ্রও ক্ষত হয়। এই পীড়ার শেষাবস্থায় নানারূপ রোগ আক্রমণ করিতে পারে।

কারণ।

অপরিমিত ভোজন ও নিদ্রা, পচামৎস্য মাংস আহার, দূষিত জলপান, দূষিত বায়ুসেবন, অপরিমিত পরিশ্রম ও অতিরিক্ত জাগরণে এই রোগের উৎপত্তি হয় এবং মন্দাগ্নি হইলে গুরুপাক দ্রব্য ভোজনেও এই রোগ জন্মে।

ভাবিফল।

প্রথম হইতে যদি উত্তমরূপ চিকিৎসা হইয়া রোগের লক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে, তবে প্রায়ই শুভ, নচেৎ যদি উত্তরোত্তর উপসর্গ বৃদ্ধি হইতে থাকে, তবে প্রায় অশুভ। উষ্ণপ্রধান দেশে এই পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে ইহা হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।

যদি প্রথমে পীড়া সামান্যরূপে আক্রমণ করে, অথচ উদরে সঞ্চিত মল আছে এরূপ অনুভব হয়, তবে কাষ্টরাইল্ বা এরণ্ডতৈল অর্দ্ধছটাক ও লডেনাম্ ৩০ ত্রিশ ফোটা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। (কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে উষ্ণজলে স্নান করান বিধি)। পরে ১০ দশ বা ২০ কুড়ি গ্রেন্ পরিমাণে ইপিকাকুয়ানা একবারে সেবন করিতে দিবে। যদি আবশ্যক হয় ৩।৪ ঘণ্টা পরে ঐ পরিমাণে পুনরায় সেবন করিতে দিবে। বমি না হয় এই জন্য রোগীকে শয়ন করাইয়া রাখিবে। (ইপিকাকুয়ানার পরিবর্ত্তে আকন্দ বৃক্ষের সিকড়ের ছাল চূর্ণ ব্যবহার হইতে পারে)। ইপিকাকুয়ানা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে উদরে মসিনা ও কিছু সর্ষপ একত্রে বাটিয়া পুল্টিস দিবে এবং ঔষধ সেবনের পর ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পানীয় দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না। কোন কোন মহাত্মা এই সময়ে সাবানের জলের সহিত অহিফেনের অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া মলদ্বারে পিচ্কারি দিতে ব্যবস্থা দেন। রোগ যদি ইহাতে উপশম না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বার বার আমরক্ত মিশ্রিত তরল মল নির্গত হয় এবং তলপেট ছেঁচানি ও মলদ্বার শুলনি বৃদ্ধি হয়, তবে নিম্নলিখিত ঔষধি প্রয়োগে অনেক সুফল হইতে পারে।

পল্ভ ইপিক্যাক্	১০ গ্রেন্
মর্ফিয়া	ট ,,
বিস্মথ্	৬ ,,
মৌহরির জল	১ ঔন্স

মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা সেবন করিতে দিবে। প্রয়োজন হইলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর আর ২।৩ বার দেওয়া যাইতে পারে। রোগীকে স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য যবের লেহি বা এরারুট সেবন করিতে দিবে। অথবা বেলস্থুট জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল সেবন করিতে দিবে। বিহিদানা ও ইষবগুল এ অবস্থায় বিশেষ উপকারী। উপরোক্ত ঔষধি ভিন্ন নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ ঐ অবস্থায় দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে উপকার হইয়া থাকে। আম্রুলের রসের সহিত সাচি চিনি ও জল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। অথবা দাড়িম্বের সিকড় ।/০ পাঁচ আনা, কুচটের ছাল ।/০ পাঁচ আনা ও মুথা ।/০ আনা ওজনে একত্র করিয়া /।।০ অর্দ্ধ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া /।০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর

সেবন করিতে দিলেও উপকার হইতে পারে। অথবা জায়ফল চূর্ণ ১০ রতি ও সৈন্ধা লবণ ৬ রতি মিশ্রিত করিয়া ৬ পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া ২।১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে উপকার হইতে পারে। কিংবা সিদ্ধি (বা ভাঙ্গ) চূর্ণ ২০বা৩০ রতি, শশার বীজের শাঁস চূর্ণ ২০ রতি, জায়ফল ১০রতি, মোহরির জল দিয়া মাড়িয়া ১০টি বটিকা করিয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর জল দিয়া সেবন করিতে দিলেও এ পীড়ার বিশেষ উপকার হয়। কিম্বা নিম্নলিখিত ঔষধ বিধেয়।

নাইট্রিক এসিড্ ডিল	২ ড্রাম্।
টিন্চার কাইনো	৪ ,,
মোহরির জল	৬ ঔন্স।

মিশ্রিত করিয়া ১ঔন্স পরিমাণে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। কিন্তু ইপিক্যাক্ প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ, এজন্য বিশেষ রূপে ইপিক্যাক্ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইপিক্যাক্ প্রয়োগে যদি অত্যন্ত বমন হয়, তবে উদরে সরিষার পটি দিবে ও আবশ্যক মত ক্লোরোফরম ডাইলিউট হাইড্রোসাইনিক এসিড্ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। আর যদি আমাশয়ের সহিত প্রবল জ্বর বিদ্যমান থাকে, তবে নিম্নলিখিত ঔষধ বিধেয়।

এসিড্ নাইট্রিক ডিল	২ ড্রাম্।
টিন্চার ক্যাটিকিউ	১ ড্রাম্।
টিন্চার কাইনো ..	২ ড্রাম্।
ডিকক্ট্ সিঙ্কোনা ...	৬ ঔন্স।

মিশ্রিত করিয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তরে সেবন করিতে দিবে অথবা

কুইনাইন্	১২ গ্রেন।
ডাইলিউট্ সালফিউরিক্ এসিড্	১ ড্রাম্।
টিন্চার কাইনো ...	২ ড্রাম
কলম্বার জল ...	৬ ঔন্স

মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

পেটের বেদনা নিবারণের জন্য টারপিন তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ জলের সেক দিবে। অথবা আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া জল দিয়া বাটিয়া পেটের উপর লাগাইয়া দিবে এবং রোগীকে অধিক পরিমাণে লেবুর রস দিয়া মিছরির সরবৎ খাইতে দিবে মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে উক্ত স্থানে বরফ কিম্বা শীতল জলের পটি দিবে। রোগী যদি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং উপরোক্ত ঔষধ সকলে যদি উপকার অল্প হয় তবে নিম্নলিখিত ঔষধ বেসি দিন সেবন করিতে দিবে।

এসিড_নাইট্রোমিউরেটিক ডিল_ ২ ড্রাম।
টিন্‌চার কার্ডেমাম্ কম্পাউণ্ড ৪ ড্রাম্।
পোর্ট ওয়াইন্ ... ১ ঔন্স্।
টিন্‌চার হাইও সাইমস্ ৪ ড্রাম্।
ডিককূট্ সিঙ্কোনা ... ১২ ঔন্স্।

মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে।

যদি ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি পাইয়া অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত হইয়া পচিতে আরম্ভ হয় এবং নানা রঙ্গ বিরঙ্গের মল নির্গত হইতে থাকে, শরীর কৃশ হয় এবং রোগী অত্যন্ত কাতর হয়, তবে তখন তাহার শারীরিক বল রক্ষার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইবে। একারণ পোর্ট বা সেরি ওয়াইন্ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে মাংসের ক্বাথ ও অল্প পরিমাণে এক বলকা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

বিস্‌মথ ... ... ৩০ গ্রেন্।
গ্যালিক্ এসিড্ ... ৪০ গ্রেন্।
আফিং ... ... ৩ গ্রেন্।
খদিরের গুড়া ... ৩০ গ্রেন্।
দারুচিনি ... ... ৩০ গ্রেন্।

মিশ্রিত করিয়া ৬ পুরিয়া করিবেক ও ২।৩ ঘণ্টা অন্তর বিবেচনা পূর্ব্বক এক এক পুরিয়া সেবন করিতে দিবে। অথবা

লডেনম্ ... ... ½ ড্রাম্।
টিন্‌চার কাইনো ... ১ ড্রাম্।
টিন্‌চার ক্যাটিকিউ ১ ড্রাম্।
ডিককূট্ লগ্‌উড্ ... ৬ ঔন্স্।

মিশ্রিত করিয়া ১ ঔন্স্ পরিমাণে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। কটজের ছালের ক্বাথ এরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। উপরোক্ত ঔষধের সহিত কিম্বা ভিন্নরূপে ইহা প্রয়োগ করিলে ফল লাভ হয়।

যদি অত্যন্ত পিপাসা থাকে, তবে চিনির সরবতের সহিত ডাইলিউট্ সলফিউরিক এসিড্ একত্রে সেবন করিতে দিবে। ক্রমে রোগী সুস্থতা প্রাপ্ত হইলে আগ্নেয় ও বলকারক ঔষধ অল্প পরিমাণে কিছুদিন সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে খুব সতর্কভাবে রাখিবে। অনিয়ম চলিলে ও কুপথ্য সেবন করিলে রোগ হঠাৎ পুনরায় এমন ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিবে যে, তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া দুরূহ হইবে। পথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে রোগী চলে সে ত্বরায় আরোগ্য লাভ করে। কুপথ্যপ্রিয় রোগীকে ভেষজ সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখিলেও

আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না। পথ্য, রোগের অর্দ্ধ ঔষধ ; একারণ রোগীর পথ্যের দিকে চিকিৎসকের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এ পী‧ড়ায় বেল পুড়াইয়া ঘোল এবং সৈন্ধব দিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে যে ঔষধের মাত্রা লেখা হইল, তাহা পূর্ণবয়স্কের প্রতি। বালক ও বৃদ্ধের প্রতি অর্দ্ধ মাত্রা। অতি শৈশবদিগের স্বতন্ত্র কথা।

পথ্য।

সাগু, আরারুট, যবের লেহি, সুজির পায়স, অন্নের মণ্ড, দুগ্ধ, মাংসের যূষ, ডিম্ব, মাছের ঝোল প্রভৃতি লঘু ও বলকর দ্রব্য সকল খাইতে দিবে। রোগীকে একবারে অধিক পরিমাণে খাইতে দিলে অসহ্য হইয়া অগ্নিমান্দ্য হয়। একারণ বারে বারে অল্প পরিমাণে খাইতে দিলে পরিপাক সুচারুরূপে হয়, ও শরীরে বলাধান হয় ও রোগ ক্রমে বিমুক্ত হইয়া আরোগ্যোন্মুখ হইতে থাকে।

রসসাগর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন "পর্ব্বতশিখরে মীন উচ্চ পুচ্ছে নাচে।" রসসাগরের পূরণ ;—

ইন্দ্রহাতে বজ্রাঘাতে,কার সাধ্য বাঁচে।
অগাধ সমুদ্রমধ্যে মৈনাক ডুবেছে॥
মহতের ক্ষুদ্র দশা দৈবাৎ ঘটেছে।
পর্ব্বতশিখরে মীন উচ্চ পুচ্ছে নাচে॥

প্রশ্ন " প্রাণেশ্বরে রে মন্মথ।" রসসাগর মহাশয় পূরণ করিলেন ;—

অশোকবনেতে সীতা
শোকেতে ব্যাকুল।
ভাবে কিসে শোকার্ণবে
পাব আমি কূল॥
ফেলরে রামের পাশে
শূন্যে আনি রথ।
প্রাণ জুড়ায় দেখে প্রাণে-
শ্বরে রে মন্মথ॥

প্রশ্ন "পিতামহের মাতামহ রথের সারথী।" রসসাগরের পূরণ ,—

তুমি আমি মামা আর কৃপ অশ্বথামা।
কর্ণ দুঃশাসন নহে অর্জ্জুন উপমা॥
কৌরবের গৌরব পিতামহ রথী।
পিতামহের মাতামহ রথের সারথী॥

কৌরবেশ্বর দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যে তুমি, আমি, কৃপ, অশ্ব-

খামা, কর্ণ, দুঃশাসন, ইহার মধ্যে কেহই অর্জ্জুনের সমতুল্য নহে। কৌরবদিগের এইমাত্র গৌরব যে, পিতামহ ভীষ্মদেব তাঁহাদের রথী, কিন্তু সেই ভীষ্মদেবের মাতামহ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনের সারথী। বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, সে সম্পর্কে কৃষ্ণ গঙ্গার পিতা এবং গঙ্গা ভীষ্মদেবের মাতা। রসসাগরের ক্ষমতার পরিমাণ করা যায় না।

একদা প্রশ্ন হইল "এক নড়িতে সাত সাপ মারে।" রসসাগরের পূরণ ;—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ-মত্ত গ্লানি।
সর্প প্রায় আরো তায় সংসার সাপিনী॥
কাশীবাসী করঙ্গ কৌপীন দণ্ড ধরে।
মায়া ছাড়িতে এক নড়িতে সাত সাপ মারে॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদমত্ত, গ্লানি এই ছয়টী সর্প, আর সংসার সর্পিণী। কাশীবাসী মায়া পরিত্যাগ করিতে করঙ্গ, কৌপীন আর দণ্ডধারণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদমত্ত গ্লানি এবং সংসার পরিত্যাগ করিতে হয়। ঐ সাতটী সর্পকে বিনাশ না করিলে সাধুপদবাচ্য হইতে পারে না। এই জন্য সন্ন্যাসী মায়া ছাড়িতে হইলে এক নড়ীতে সাত সাপ মারে। উপরি উক্ত সমস্যা পূরণটী অতি উচ্চ দরের কবিতার দৃষ্টান্ত স্থল।

প্রশ্ন ; "ইষ ইষ।" পূরণ,—

নিমকাষ্ঠে বসি কৃষ্ণ পদ বাড়াইয়ে।
না জানি হানিল বাণ ব্যাধপুত্র গিয়ে॥
অভাগে বাণের মুখ ছিল তুল্য বিষ।
পড়িল ত্রৈলোক্যনাথ করি ইষ ইষ॥

প্রশ্ন "ঝাল খেয়ে মরে পাড়া-প্রতিবাসী।" রসসাগরেরর পূরণ ;—

ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলা শশি।
জনক জননী কাশী নিবাসী॥
মায়ে না বিউল, বিউল মাসী।
ঝালখেয়ে মরে পাড়া প্রতিবাসী॥

ষড়াননের জন্মের পর ভগবতী তাহাকে শরবণে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান। চন্দ্রমহিষী (ভগবতীর ভগিনী) কৃত্তিকাদেবী সেই সদ্য-প্রসূত সন্তানকে নিজ সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। চন্দ্রদেব ধ্যান যোগে সমস্ত জানিতে পারিলেন। এত রসিকতা না থাকিলে রসসাগর নাম হইবে কেন ?

প্রশ্ন ; "যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দৈ।" রসসাগরের পূরণ ;—

আয়ান করিল বিয়া রাধিকাসুন্দরী।
তাঁরে লয়ে বিহারেন মুকুন্দমুরারী॥

এ দুঃখের কথা আমি কার কাছে কই।
যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দৈ॥

একদা কোন ভদ্র লোক রসসাগর মহাশয়কে কহিলেন, মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া আমার এই হিসাবটী নিকাশ করিয়া দেন। মুহুরী দিগের হিসাবে আমার আর তত বিশ্বাস নাই। তাহাদের ঠিক, ঠিক করা যায় না। তাহাতে আর একজন অমনি বলিয়া উঠেন "ঠিক ঠিক ঠিক।" রসসাগর তৎক্ষণাৎ একটী সমস্যা পূরণ করিলেন ;—

বিধিলিপি নিয়োজিত, ন ন্যূন অধিক।
শিববাক্য ত্রৈলোক্যে, ন গুরুর অধিক॥
গুরুভক্তিহীন জনে ধিক ধিক ধিক
এতিন অন্যথা নহে ঠিক ঠিক ঠিক॥

একদা প্রশ্ন হইল "এই আছিস, এই নাই বাপ্ রে বাপ্।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

এই কতক্ষণ রেঁখে এলেম
দুয়ারে দিয়ে ঝাঁপ।
বারে বারে কৃষ্ণ তুই
দিচ্চিস্ মনস্তাপ॥
ক্রোধ করে মহামুনি
পাছে দেন শাপ।
এই আছিস্ এই নাই
বাপ্ রে বাপ্॥

মহর্ষি দুর্ব্বাসা নন্দালয়ে অতিথি হইয়াছেন। নন্দ ও যশোদা যথাবিহিত অতিথিসৎকার জন্য দ্রব্যাদি আহরণ করিলেন। দুর্ব্বাসা পাকাদি সমাপন করিয়া ইষ্টদেব উদ্দেশে নিবেদন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন। মহামুনি এই ব্যাপার দেখিয়া যশোদাকে ডাকিলেন, যশোদা কৃষ্ণকে লইয়া ঘরের মধ্যে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া আসিলেন। মুনি পুনরায় ইষ্টদেবকে নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলেন ; আবার কৃষ্ণ আসিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মুনি পুনরায় যশোদাকে ডাকিলেন। যশোদা কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার সময় উপরি উক্ত কথা বলিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন "বাছা, বাছা, বাছা।" রসসাগরের পূরণ ;—

কপ্নি মেরে অদ্বৈত দেখালেন পাছা।
অবধৌত নিত্যানন্দ নাহি দিলেন
কাছা॥
গৌরাঙ্গ মুড়ালেন বাবরি চুলের গোছা।
তোরা তিনজনেই বৈরাগী হলি,
বাছা বাছা বাছা॥

একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে পঞ্চকোটের রাজসংসারস্থ কোন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে আ-

গমন করেন। তিনি তিন চরণে একটী প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, চতুর্থ চরণে তাহার উত্তর বিন্যস্ত হইবে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রশ্নের তিন চরণ এই ;—

"দ্বিভুজা রমণী তার দশভুজ পতি।
পঞ্চমুখ পতি কিন্তু নন পশুপতি॥
অপুত্রক পতি-পিতা অপূর্ব্ব কাহিনী।"

রসসাগর ইহার চতুর্থ চরণ পূরণ করিলেন. যথা;—

"এ রসসাগরে ভাসে দ্রুপদনন্দিনী॥"

"দ্বিভুজা রমনীর" দ্রৌপদীর "দশভুজ পতি" অর্থাৎ পঞ্চপতির দশ হাত। "পঞ্চমুখ পতি কিন্তু নন পশুপতি" অর্থাৎ শিব নহেন, অথচ পঞ্চমুখ পতি কি না পূর্ব্বের ন্যায় পঞ্চ পতি। "অপুত্রক পতি-পিতা" অর্থাৎ পাণ্ডু অপুত্রক, কেন না, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব পাণ্ডুর ঔরস পুত্র নহেন।

প্রশ্ন "মা যাঁর সধবা বিমাতা তাঁর রাঁড়ী।" রসসাগরের পূরণ;—

সাধে দিলেন বাপের বিয়ে দাস রাজার বাড়ী।
হেন পিতার পঞ্চত্ব পদ্মিনীরে ছাড়ি॥
অভিমানে ভীষ্ম ভূমে যান গড়াগড়ি।
মা যাঁর সধবা বিমাতা তাঁর রাঁড়ী॥

ভীষ্মের জননী গঙ্গাদেবী সধবা, এবং বিমাতা পদ্মিনী বিধবা।

প্রশ্ন "বলেন সধবা মাতা বিধবা বিমাতা।" রসসাগরের উত্তর ;—

অনিত্য মানব লীলা করি সম্বরণ।
করিল শান্তনুরাজা স্বর্গ আরোহণ॥
ভাবেন বিস্ময়ে ভীষ্ম মরিলেন পিতা।
বলেন সধবা মাতা বিধবা বিমাতা॥

প্রশ্ন "পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর।" রসসাগরের উত্তর ;—

অদিতিনন্দন সেই দেব পুরন্দর।
শিবাজ্ঞায় পঞ্চ ইন্দ্র দ্রৌপদীর বর॥
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রতি যে যে কন বৃকোদর।
পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর॥

অন্যপ্রকার।

তর্পণ কালেতে কুন্তী যুধিষ্ঠিরে কন।
তোমার অগ্রজ কর্ণ রাধার নন্দন॥
শুনিয়া ধর্ম্মের সুত করেন উত্তর।
পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর॥

উপরি উক্ত শ্লোকদ্বয়ের ভাব পূর্ব্বকার দুই একটী শ্লোকে প্রসঙ্গতঃ বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রশ্ন "দেশের হবে কি!" রসসাগরের পূরণ ;—

শূদ্রেতে বেদ পড়ে বামন হলো ভেকো।
ছত্রিশবর্ণ এক হলো তার সাক্ষী হুঁকো॥

শ্বশুরে পুত্রবধূ হরে বাপে হরে ঝি।
ইহা দেখে পাখী বলে দেশের হবে কি!

বোধ হয় ইহা কোন তাৎকালিক ব্যক্তি বিশেষকে উল্লেখ করিয়া রচিত হইয়া থাকিবেক।

অভিজ্ঞান শকুন্তল উপলক্ষে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্ব্বশীর উল্লেখ।

বিক্রমোর্ব্বশী মহাকবি কালিদাস প্রণীত;—ইহাতে অপ্সরা প্রধানা উর্ব্বশী একদিবস সখীসঙ্গে কুবের ভবন হইতে আগমন সময়ে কেশীনামক দুর্দ্দান্ত দানব কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়েন, অন্যান্য অপ্সরাগণ পথে সঙ্গিনীর এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনে ভয়বিস্ময়ে কাঁদিয়া উঠেন। ঐ সময় চন্দ্রবংশীয় আদি নৃপতি পুরূরবা সূর্য্যোপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন, পথে নারীকুলের আর্ত্ত নাদ শ্রবণে সত্বরভাবে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া অপ্সরাদিগকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহারা কাতরভাবে তাঁহার নিকট উর্ব্বশীর দুরবস্থায় বিষয় উল্লেখ করিলে তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া দানব পরাজয় পূর্ব্বক সখীসঙ্গে উর্ব্বশীকে আনিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হেমকূটশিখরে অপ্সরা দিগকে প্রদান করেন।

এ দিকে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ইন্দ্রাদেশে উর্ব্বশীকে দৈত্যহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং অপ্সরা মুখে পুরূরবা কর্ত্তৃক উর্ব্বশী উদ্ধারের বিষয় অবগত হইয়া প্রীতমনে তাঁহাকে অমরাবতী যাইবার জন্য অনুরোধ করেন; পুরূরবা লজ্জা বশত তৎকালে তথায় যাইতে সম্মত হইলেন না, শুদ্ধ তাঁহাদিগকেই স্বর্গভবনে যাইবার অনুরোধ করিলেন। পরে পরস্পর শিষ্টাচার প্রদর্শনের পর চিত্ররথ অপ্সরাসঙ্গে স্বর্গাভিমুখে এবং রাজা নগরাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু উদ্ধার সময়ে অচৈতন্য উর্ব্বশীর চৈতন্যাবেশে তাঁহাকে আপনার প্রতি নানা অনুরাগ চিহ্ন প্রকাশ করিতে দেখিয়া এবং চিত্ররথের সহিত গমন সময়েও তাঁহার সেই সেই ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা তৎসহবাস বাসনায় বিষম আকুল হইয়া উঠেন। উর্ব্বশী স্বর্গে গিয়াও রাজাকে ভুলিতে পারিলেন না।

বিষম যাতনায় আকুল হইয়া অবশেষে স্বয়ংই অভিসারিকা বেশে রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় দেবদূত ইন্দ্রসভায় লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকের পূর্ব্বোপদিষ্টা নায়িকা লক্ষ্মীর ভূমিকা পরিগ্রহের জন্য উর্ব্বশীকে আহ্বান করিলেন। আকাশবাণী অম্বরতল ভেদ করিয়া যেমন উর্ব্বশীর সেইরূপ রাজার হৃদয়েও আহত হইল। সেই দারুণ বেদনা সহ্য করিয়াও উর্ব্বশী ইন্দ্রভয়ে দেবসভায় গমন করিলেন; কিন্তু সেস্থলে লক্ষ্মীবেশ-পরিধারিণী উর্ব্বশী নারায়ণ নামের পরিবর্ত্তে পুরূরবার নাম উল্লেখ করাতে নাট্যাচার্য্য ভরতমুনি মর্ত্ত্যের প্রতি অনুরাগ নিবন্ধন মর্ত্তে বাসার্থ উহাঁকে শাপ প্রদান করেন। মর্ত্তে বাস অনুরক্তার শাপে বর হইল; উর্ব্বশী মর্ত্তে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে পুরূরবার সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয়ে উভয়ের প্রেমে এমনি আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন, যে নগরবাসেও মনের ক্ষণিক চাঞ্চল্য সম্ভব, বিবেচনা করিয়া উভয়ের অন্তরে বিজন বিহার বাসনা উদ্দীপ্ত হইল। নগর হইতে বহির্গত হইলেন, হিমালয় শিখর দিব্য বিজন স্থান ও ভোগসুখের একান্ত উপযুক্ত দেখিয়া সেই স্থলেই বাস করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ গন্ধমাদন প্রদেশই উহাঁদের বিহার কানন হইল। তথায় বহুদিন অবস্থানের পর কথঞ্চিৎ প্রেমপরিতৃপ্ত রাজার হৃদয়ে এক দিন উদয়বতী নামক এক বিদ্যাধর কন্যার রূপের আভা ক্ষণকালের জন্য পতিত হয়। প্রেমিকার প্রেমের শয্যা, তাহাতে অন্যের ছায়া পতিত দেখিয়া উর্ব্বশী মানভরে রাজার অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন। সম্মুখে কুমার বন-মানিনী মানে মগ্না-অজ্ঞানবশত যেমন প্রবেশ করিবেন, অমনি সেই মনোহর কান্তি লতারূপে পরিণত হয়, পশ্চাৎ অনুগমন করিলেও রাজা তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই; চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া যারপর নাই, আকুল হইয়া উঠিলেন; সঙ্গিনী সঙ্গ পরিত্যাগ করিল, মনের মানসী শক্তি বনে লুকাইল। রাজা উন্মনা, বাতুলের বেশ, বাতুলের ভাব, বনফুল মাথায় পরিলেন, বনপল্লব পৃষ্ঠে বান্ধিলেন; মেঘ চলিয়াছে, কোলে বিদ্যুৎ খেলিতেছে; কেশী দৈত্যের অস্পষ্ট ভাব হৃদয়ে উদিত হইল, প্রস্তরহস্তে প্রহারার্থ ধাবমান হইলেন; সম্মুখে সরোবর, হংস চরিতেছে, মনে আপনার

ভাব, হংসেই তাহা আরোপ, আপনার হৃদয়ে প্রিয়দুঃখ, আপনার নয়নে জলধারা; কিন্তু যেন তিনি হংসেই তাহা দেখিতেছেন। চকিতমাত্র মনে জ্ঞানের উদয়, দৈত্য মেঘ হইলে, দৈত্যধনু ইন্দ্রধনু হইল, বাণ বর্ষণ বৃষ্টি ও কনককান্তি উর্ব্বশীও বিদ্যুতে পরিণত হইল। হৃদয়ে বিষম দুঃখাবেগ, আর সহ্য হয় না, মূর্চ্ছা এবং অবশভাবে ভূমিতেই পতন। এইরূপ বাতুলভাবে রাজা পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে ভ্রমণ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সঙ্গমমণি প্রাপ্ত হইয়া লতারূপা উর্ব্বশীকে লতা ভাবেই আলিঙ্গন করিলেন। লতার সঙ্গমমণি লতাকে স্পর্শ করিল, রাজার সঙ্গমমণি রাজাকে স্পর্শ করিলেন। অজ্ঞান অচৈতন্য, আনন্দমাত্রই উপলব্ধি, জড়দেহ জড়বৎই অবস্থিত। ক্রমে জ্ঞানের আভাস, জ্ঞানের উদয়। জ্ঞানোদয়ে উর্ব্বশী রাজাকে শান্ত করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন এবং রাজাকে লইয়া মেঘপথে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বহুদিনের পর রাজা ও রাণীকে দেখিয়া নগর আনন্দময় হইয়া উঠিল। এদিকে যে মণিপ্রভাবে রাজার জীবনী-শক্তি আহৃত হইয়াছিল, রক্ষক হস্ত হইতে আমিষ আশঙ্কায় গৃধ্র কর্ত্তৃক তাহা অপহৃত হইল, রাজা নেপথ্যগৃহে, বহুদিনের পর আসিয়াছেন, অঙ্গসংস্কার ও বেশভূষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন; কিন্তু "মহারাজের সঙ্গম মণি আমিষ লোভী গৃধ্র আমিষ লোভে হরণ করিল।" শুনিবামাত্র রাজা ব্যস্তভাবে অনবসিত বেশেই বাহিরে আসিলেন, এবং গৃধ্রবধ রাজার অকর্ত্তব্য হইলেও ধনুর্ব্বাণ আনিতে আদেশ করিলেন। ধনু আহৃত হইল, কিন্তু গৃধ্র তখন লক্ষ্যের অতীত। রাজা বিষণ্নমনে কঞ্চুকীকে আদেশ করিলেন, "দেখ, রাত্রিকালে ঐ বিহগাধম অবশ্য আপন বাসবৃক্ষে গিয়া অবস্থান করিবে, কিরাতগণকে বল, যেন তাহারা সেই সময় প্রত্যেক বৃক্ষ অনুসন্ধান করে।" কঞ্চুকী গমন করিল, পরক্ষণেই হৃষ্টমনে মণি সমবেত বাণবিদ্ধ পক্ষিমুণ্ড আনিয়া রাজসমীপে উপস্থিত করিল। বাণে নাম লিখিত রহিয়াছে, রাজা পড়িলেন, "উর্ব্বশীগর্ভজাত পুরূরবা পুত্র কুমার আয়ুর শত্রু আয়ু নির্ব্বাণকারী বাণ" দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। পরক্ষণেই চ্যবনাশ্রম হইতে এক তাপসী আসিয়া রাজাকে তাঁহার পুত্র প্রদান করিয়া বলিল, "মহা-

রাজ! কি জন্য যে উর্ব্বশী জাত মাত্র ইহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, বলিতে পারিনা। এক্ষণে আপনার পুত্র আপনি গ্রহণ করুন, আশ্রমে প্রতিপালিত হইলেও ক্ষত্রিয় স্বভাব বশত আজ একটী গৃধ্র বধ করিয়া যার পর নাই আশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, অতএব এ বালক আর আশ্রম বাসের যোগ্য নহে, আপনার বালক আপনিই গ্রহণ করুন।"

রাজা পুত্রমুখ দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়া উর্ব্বশীকে সে স্থলে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। উর্ব্বশী সে স্থলে আসিয়া তাপসীকে এবং রাজার অঙ্কে আপন পুত্রকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অন্যান্য নানাবিধ প্রিয় সম্ভাষণের পর তাপসী আপন আশ্রমে গমন করিল, পতি—পত্নী পুত্র পাইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, কথা প্রসঙ্গে ইন্দ্রের নাম উচ্চরিত হইবামাত্র উর্ব্বশীর বদন বিষণ্ণ হইল, নয়নে বারিধারা পড়িতে লাগিল, দুঃখিত হৃদয়ে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহারাজ! এই দর্শনই অভাগীর শেষ দর্শন, এই মিলনই শেষ মিলন, বিদায় দেও জন্মের মত হতভাগিনী আপনার দর্শনে বঞ্চিত হইয়া বিদায় হয়।" রাজার মস্তকে বজ্র আহত হইল, বলিলেন, "প্রিয়ে! এই কথা শুনাইবার জন্যই কি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে? কি অপরাধ করিয়াছি যে, তোমার মুখ হইতেও আমাকে এমন নিদারুণ কথা শুনিতে হইল? বল, এ সুখের সময় অসঙ্গত প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবার কারণ কি?" উর্ব্বশী বলিলেন, "মহারাজ আপনার দোষ নাই, অভাগিনীর অদৃষ্টের দোষ। সুররাজ আপনার প্রিয় কামনায় আপনার নিকট আসিবার জন্য যখন আমাকে আদেশ করিলেন, তখন আমার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু অবশেষে যখন বলিলেন যে, প্রিয়সখা পুরূরবা যতদিন না তোমার গর্ভজাত পুত্রমুখ দর্শন করেন, ততদিনই তুমি তাঁহার নিকট থাকিবে। তখন আমার হৃদয় আহত হইল, কি করি প্রভুর আদেশ অবশ্য পালন করিতে হইবে, মনে করিয়া দুঃখিত মনে আমি এস্থলে আসিলাম, পরে এই পুত্র ভূমিষ্ট হইবামাত্র আপনার বিচ্ছেদ আশঙ্কায় আপনার অজ্ঞাতসারেই আমি ইহাকে সত্যবতী হস্তে প্রদান করি। হত

ভগিনীর দুরদৃষ্ট বশত সত্যবতী আজ আপনার নিকটই ইহাকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। অতএব মার্জ্জনা করুন, আজ এ অভাগিনীকে সুখের স্বর্গ ছাড়িয়া দুঃখময় স্বর্গে যাইতে হইবে। অনুমতি করুন, জন্মের মত দুঃখের জন্য দুঃখিনী বিদায় হয়।” রাজা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “ইন্দ্রের আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য্য, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর, অভাগা বন গমনের সমস্ত আয়োজন করিয়া অগ্রে বিদায় হউক, পরে স্বর্গের আলোক স্বর্গে উপনীত হইবে।” দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল, বলিলেন, “প্রিয়ে। তোমাকে ছাড়িয়া এই শূন্য নগরীতে কিরূপে বাস করিব? নগরের শোভা, রাজ্যের লক্ষ্মী, রাজা ছাঁড়িয়া চলিল, হতভাগ্য পুরূরবা কি সুখে আর এই অন্ধকারময় পুরীতে বাস করিবে? কঞ্চুকি! অমাত্যকে বল,—অবিলম্বে কুমারের অভিষেকের সমস্ত উপকরণ আহরণ করুন।”

সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই নীরব; সুখের পুরী দুঃখে ভাসিল। ক্রমে কুমারের অভিষেকের সমস্ত সামগ্রী আহৃত হইলে নভোমণ্ডলে সহসা একটী জ্যোতির্ম্মণ্ডল আবির্ভূত হইল, মধ্যে দেবর্ষি নারদ। ক্রমে দেবর্ষি সভাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সকলে অবনত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলে নারদ বলিলেন, “মহারাজ! ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ আদেশ করিয়াছেন, অবিলম্বে দেবদানবের একটী সংগ্রাম উপস্থিত হইবে অতএব এসময় আপনি অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বন গমন করিলে সুররাজ যার পর নাই সহায়হীন হইবেন, এই জন্য তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, যতদিন আপনি জীবিত থাকিবেন, উর্ব্বশী ততদিনই আপনার সহচারিণী থাকিবেন।” সভাতল আনন্দে প্রতিধ্বনিত হইল। এবং সেই সকল আহৃত দ্রব্যসামগ্রীতে নারদ স্বয়ংই কুমারকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া পুনরায় স্বর্গপুরীতে গমন করিলেন। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীও শেষ হইল।

কিন্তু পুরাণের(১) উপাখ্যান অন্যরূপ; তাহাকে ঠিক বিক্রমোর্ব্বশী বলা যাইতে পারে না। বিক্রমোর্ব্বশীতে পুরূরবা ও উর্ব্বশীর অনুরাগ সঞ্চার এক বিক্রম সম্পর্কেই সঙ্ঘটিত হয়। পুরূরবা বিক্রম দ্বারাই উর্ব্বশীকে

---

(১) মৎস্যপুরাণ ভিন্ন।

কেশী নামক দানবের হস্ত হইতে র করেন, বিক্রম দ্বারাই উর্ব্বশী হৃদয়ের প্রেমের কবাট উন্মুক্ত করেন। যে শয্যা অনুরাগে নির্ম্মিত, প্রীতিপুষ্পে সুবভিত, বিক্রমই উর্ব্বশীহৃদয়ের সেই শয্যার একমাত্র পথপ্রদর্শক; রাজা অতিথি, উর্ব্বশী পরিচারিকা; পরে অতিথির নানাগুণে আকৃষ্ট হইয়া পরিচারিকা প্রীতমনে সেই শয্যাতেই অতিথিসেবা করেন। আবার রাজার পুত্রমুখ দর্শনের পর যখন পরস্পর একান্ত বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, তখন সেই বিক্রমই মধ্যস্থ হইয়া পরস্পর চিরমিলন সম্পাদন করে।

কালিদাস যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই প্রেমপূর্ণ সুললিত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, মূলপুরাণে (১) তাহা অতি সামান্য ও কুৎসিতরসের পরিচায়ক।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে, উর্ব্বশী মিত্রাবরুণ শাপে মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক পুরূরবার অলোক সামান্য রূপগুণ দর্শনে মোহিত হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, পুরূরবাও উর্ব্বশীর হাবভাব লাবণ্যাদি দেখিয়া এক কালে মোহিত হইয়া উঠেন এবং এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতিই চাহিয়া থাকেন। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে রাজা বলিলেন, সুন্দরি! বলিতে পারি না, কিন্তু যদি অধীনের প্রতি অনুগ্রহ হয় তাহা হইলে বাসনা এই যে, পরস্পর পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া চিরদিন সুখে কাল যাপন করি। উর্ব্বশী লজ্জাবনত মস্তকে বলিলেন, রাজন্! শয্যাপার্শ্বে আমার পুত্রভূত দুইটী মেষ থাকিবে তাহা কেহ হরণ করিলে বা আপনাকে উলঙ্গদর্শন করিলে আমি আপনার নিকট থাকিব না এবং ঘৃত ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যও আহার করিব না, আপনি যদি এই নিয়মে বদ্ধ হন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি। রাজা অবিচারিতচিত্তে সেই নিয়মে বদ্ধ হইয়া উর্ব্বশীর সহিত কখনও অলকায় কখনো চৈত্ররথ প্রদেশে কখনও বা মানসাদি তীর্থে বিহার করত পরমানন্দে ষষ্টিসহস্র বৎসর যাপন করিলেন।

এদিকে উর্ব্বশী বিহনে সুরলোক দিন দিন যেন হতশ্রী হইতে লাগিল দেখিয়া বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বদিগের সহিত নিশীথসময় উর্ব্বশীর শয্যা-

---

(১) মৎস্যপুরাণ ভিন্ন।

পার্শ্ব হইতে একটী মেষ অপহরণ করিলেন। আকাশে মেষের কাতর ধ্বনি শ্রবণে উর্ব্বশী আকুলভাবে বলিতে লাগিলেন, হায়! অনাথা বলিয়া কে আমার পুত্র হরণ করিল, এক্ষণে কাহার নিকট যাই, কেবা আমার পুত্র আনিয়া দেয়, রাজা উলঙ্গ ছিলেন, পাছে তাঁহার উলঙ্গভাব দর্শনে উর্ব্বশী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় উঠিতে পারিলেন না। অন্য মেষও অপহৃত হইল। উর্ব্বশী তাহারও করুণধ্বনি শ্রবণে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমি অনাথা, স্বামীসত্ত্বেও স্বামীহীনা, কি করিব, নিতান্ত কাপুরুষের হস্তে পড়িয়াই আমার এই দুর্গতি হইল। রাজা আর থাকিতে পারিলেন না, উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে যেমন শয্যা পরিত্যাগ করিলেন, অমনি গন্ধর্ব্বমায়ায় বিদ্যুৎ সৃষ্ট হইল, উলঙ্গ রাজাও উর্ব্বশীচক্ষে পতিত হইলেন, এদিকে উর্ব্বশীও রাজাকে উলঙ্গ দেখিবামাত্র অন্তর্দ্ধান হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ কার্য্যসিদ্ধ হইল দেখিয়া মেষ পরিহার পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। রাজা মেষদ্বয় গ্রহণ করিয়া শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দেখেন. উর্ব্বশী নাই। তখন তাঁহার নিয়মবৃত্তান্ত স্মরণ হইল। রাজা দিগম্বর, সেই দিগম্বর বেশেই উন্মত্তের ন্যায় পুরী হইতে বহির্গত হইলেন, পরে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া একদিন কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীকে অন্যান্য অপ্সরা সঙ্গে পদ্মবনে বিহার করিতে দেখিয়া উন্মত্ত পাগলের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "জায়ে! যাইও না, কঠিন হৃদয়ে! দাঁড়াও. আমার সহিত কথা কও" উর্ব্বশী বলিলেন, মহারাজ কি অবিবেচকের ন্যায় কথা কহিতেছেন, আমি গর্ভিনী, ভাল এক বৎসর পরে পুনরায় এখানে আসিবেন, এক রাত্রি আপনার সহিত অবস্থান করিব এবং আপনার পুত্র আপনাকে প্রদান করিব। এই কথা বলিয়া উর্ব্বশী অন্যান্য অপ্সরাদিগকে বলিলেন, যখন আমি মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া বাস করি, তখন ইহাঁকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম। অপ্সরাগণ রাজাকে দেখিয়া বলিল, আহা কি মনোহর রূপই দেখিলাম, এ রূপ দেখিয়া আমাদেরও চিরকাল ইহাঁর সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা হয়। এদিকে রাজা উর্ব্বশীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় এক বৎসর পরে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, উর্ব্বশীও আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার পুত্র প্রদান পূর্ব্বক এক রাত্রি তাঁহার সহিত বাস করিয়া

পুনরায় গর্ব্ভিনী হইলেন, (পরে সেই গর্ব্ভে রাজার পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে।) উর্ব্বশী রাজার সহিত রাত্রি যাপন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণ আমার প্রতি প্রীত হইয়া আপনাকে বর দিতে চাহিতেছেন, রাজা বলিলেন, যদি গন্ধর্ব্বগণ আমাকে বরদান করেন, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন চিরদিন আমি তোমার সহিত একত্র বাস করিতে পাই। গন্ধর্ব্বগণ "তথাস্তু" বলিয়া রাজাকে এক অগ্নিস্থালী প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্! এই স্থালীতে যে অগ্নি আছে, বেদবিধি অনুসারে ইহাকে তিনভাগ করিয়া ইহাতে যজ্ঞ করিলে তুমি উর্ব্বশীর সালোক্য প্রাপ্ত হইবে।

রাজা অগ্নিস্থালী গ্রহণ করিয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সেই অগ্নিস্থালী দেখিয়া ভাবিলেন, কি আমি উর্ব্বশীর পরিবর্ত্তে একটা স্থালী লইয়া আসিলাম?—বনে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে আসিলেন। রাত্রি দুইপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে,—রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল, ভাবিলেন, কি উর্ব্বশীর সালোক্য পাইবার জন্য গন্ধর্ব্বগণ আমাকে যে অগ্নিস্থালী প্রদান করেন, তাহা আমি বনে ফেলিয়া আসিয়াছি? উঠিলেন এবং সেই রাত্রিতেই সেই বনে গমন করিয়া দেখিলেন, যেখানে অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেখানে তাহা নাই তৎপরিবর্ত্তে এক শমীগর্ভ অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। অনন্তর সেই অশ্বত্থ শাখা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া তাহাতে অরণী নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সেই অরণী ঘর্ষণে বহ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক অগ্নিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাতে যজ্ঞ করিলেন, পূর্ব্বে এক অগ্নি ছিল, সেই সময় হইতেই অগ্নি তিনভাগে বিভক্ত হয়। পুরূরবা এইরূপে যজ্ঞ করিয়া উর্ব্বশীর সলোকতা লাভ করেন। বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্রমশঃ

বনফুল কাব্য। সপ্তম সর্গ।

১

গভীর আঁধার রাত্রি শ্মশান ভীষণ!
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন!
সর সর মরমরে সুধীরে তটিনী বহে যায়।
প্রাণ আকুলিয়া বহে ধূমময় শ্মশানের বায়!

২

গাছ পালা নাই কোথা প্রান্তর গম্ভীর!
শাখা পত্র হীন বৃক্ষ, শুষ্ক, দগ্ধ, উঁচু করি শির
দাঁড়াইয়া দূরে—দূরে নিরখিয়া চারিদিক পান
পৃথিবীর ধ্বংসরাশি, রহিয়াছে হোয়ে ম্রিয়মান?

৩

শ্মশানের নাই প্রাণ যেন আপনার
শুষ্ক তৃণরাজি তার ঢাকিয়াছে বিশাল বিস্তার!
তৃণের শিশির চুমি বহেনাকো প্রভাতের বায়
কুসুমের পরিমল ছড়াইয়া হেথায় হোথায়।

৪

শ্মশানে আঁধার ঘোর ঢালিয়াছে বুক!
হেথা হোথা অস্থি রাশি ভস্মমাঝে লুকাইয়া মুখ!
পরশিয়া অস্থিমালা তটিনী আবার সরি যায়
ভস্মরাশি ধুয়ে ধুয়ে, নিভাইয়া অঙ্গার শিখায়!

৫

বিকটদশন মেলি মানব কপাল—
ধ্বংসের স্মরণ স্তূপ, ছড়াছড়ি দেখিতে ভয়াল!
গভীর আঁখি কোটর, আঁধারেরে দিয়াছে আবাস
মেলিয়া দশন পাঁতি পৃথিবীরে করে উপহাস!

৬

মানব কঙ্কাল শুয়ে ভস্মের শয্যায়
কানের কাছেতে গিয়া বায়ু কত কথা ফুসলায়!
তটিনী কহিছে কানে উঠ! উঠ! উঠ নিদ্রা হোতে
ঠেলিয়া শরীর তার ফিরে ফিরে তরঙ্গ আঘাতে!

৭

উঠগো কঙ্কাল! কত ঘুমাইবে আর।
পৃথিবীর বায়ু এই বহিতেছে উঠ আরবার,
উঠগো কঙ্কাল! দেখ স্রোতস্বিনী ডাকিছে তোমায়!
ঘুমাইবে কত আর বিসর্জ্জন দিয়া চেতনায়!

৮

বলনা-বলনা তুমি ঘুমাও কি বোলে?
কাল যে প্রেমের মালা পরাইয়া ছিল এই গলে
তরুণী ষোড়শী বালা! আজ তুমি ঘুমাও কি বোলে!

অনাথারে একাকিনী সঁপিয়া এ পৃথিবীর
কোলে!

৯

উঠগো—উঠগো—পুনঃ করিনু আহ্বান
শুন, রজনীর কানে ওই সে করিছে খেদ
গান!
সময় তোমার আজো ঘুমাবার হয় নাই
তরে!
কোল বাড়াইয়া আছে পৃথিবীর সুখ
তোমা তরে!

১০

তুমিগো ঘুমাও, আমি বলিনা তোমারে!
জীবনের রাত্রি তব ফুরায়েছে নেত্র ধারে
ধারে!
এক বিন্দু অশ্রুজল বরষিতে কেহ নাই
তোর
জীবনের নিশা আহা এতদিনে হইয়াছে
ভোর!

১১

ভয় দেখাইয়া আহা নিশার তামসে—
একটি জ্বলিছে চিতা, গাঢ় ঘোর ধুমরাশি
শ্বসে!
একটি অনল শিখা জ্বলিতেছে বিশাল
প্রান্তরে,
অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ কণা নিক্ষেপিয়া আকা-
শের পরে!

১২

কার চিতা জ্বলিতেছে কাহার কে জানে?
কমলা! কেন গো তুমি তাকাইয়া
চিতাগ্নির পানে?
একাকিনী অন্ধকারে ভীষণ এ শ্মশান
প্রদেশে!
ভূষণ-বিহীণ-দেহে, শুষ্ক মুখে, এলো
থেলো কেশে

১৩

কার চিতা জান কিগো কমলে জিজ্ঞাসি!
দেখিতেছি কার চিতা শ্মশানেতে একা-
কিনী আসি?
নীরদের চিতা? নীরদের দেহ অগ্নি
মাঝে জ্বলে?
নিভায়ে ফেলিবে অগ্নি কমলে! কি
নয়নের জলে?

১৪

নীরব, নিস্তব্ধ ভাবে কমলা দাঁড়ায়ে!
গভীর নিশ্বাস বায়ু উচ্ছ্বাসিয়া উঠে!
ধুমময় নিশীথের শ্মশানের বায়ে
এলো থেলো কেশ রাশি চারিদিকে ছুটে!

১৫

ভেদি অমা নিশীথের গাঢ় অন্ধকার
চিতার অনলোত্থিত অস্ফুট আলোক
পড়িয়াছে ঘোর ম্লান মুখে কমলার,
পরিস্ফুট করিতেছে সুগভীর শোক!

১৬

নিশীথে শ্মশানে আর নাই জনপ্রাণী
মেঘান্ধ অমান্ধকারে মগ্ন চরাচর
বিশাল শ্মশান ক্ষেত্রে শুধু একাকিনী
বিষাদ প্রতিমা বামা বিলীন অন্তর!

১৭

তটিনী চলিয়া যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
নিশীথ শ্মশান বায়ু স্বনিছে উচ্ছ্বাসে!

আলেয়া ছুটিছে হোথা আঁধার ভেদিয়া!
অস্থির বিকট শব্দ নিশার নিশ্বাসে!

১৮

শৃগাল চলিয়া গেল সমুচ্চে কাঁদিয়া!—
নীরব শ্মশান ময় তুলি প্রতিধ্বনি!
মাথার উপর দিয়া পাখা ঝাপটিয়া
বাদুড় চলিয়া গেল করি ঘোরধ্বনি!

১৯

এ হেন ভীষণ স্থানে দাঁড়ায়ে কমলা!
কাঁপে নাই কমলার একটিও কেশ!
শূন্য নেত্রে, শূন্য হৃদে চাহি আছে বালা
চিতার অনলে করি নয়ন নিবেশ!

২০

কমলা চিতায় নাকি করিবে প্রবেশ?
বালিকা কমলা নাকি পশিবে চিতায়?
অনলে সংসার লীলা করিবি কি শেষ?
অনলে পুড়াবি নাকি সুকুমার কায়?

২১

সেই যে বালিকা তোরে দেখিতাম হায়-
ছুটিতিস্ ফুল তুলে কাননে কাননে
ফুলে ফুল সাজাইয়া ফুল সম কায়—
দেখাতিস্ রাজ সজ্জা পিতার সদনে!

২২

দিতিস্ হরিণ-শৃঙ্গে মালা জড়াইয়া!
হরিণ শিশুরে আহা বুকে লয়ে তুলি—
সুদূর কানন ভাগে যেতিস্ ছুটিয়া
ভ্রমিতিস্ হেথা হোথা পথ গিয়া ভুলি!

২৩

সুধাময়ী বীণা খানি লোয়ে কোল পরে
সমুচ্চ হিমাদ্রি শিরে বসি শিলাসনে—
বীণার ঝঙ্কার দিয়া মধুময় স্বরে
গাহিতিস্ কত গান আপনার মনে!

২৪

হরিণেরা বন হোতে শুনিয়া সে স্বর—
শিখরে আসিত ছুটি তৃণাহার ভুলি
শুনিত, ঘিরিয়া বসি ঘাসের উপর—
বড় বড় আঁখি দুটি মুখ পানে তুলি!

২৫

সেই যে বালিকা তোরে দেখিতাম বনে
চিতার অনলে আজ হবে তোর শেষ?
সুখের যৌবন দীপ নিভাবি আগুনে?
সুকুমার দেহ হবে ভস্ম-অবশেষ!

২৬

না, না, না, সরলা বালা ফিরে যাই চল,
এসেছিলি যেথা হোতে সেই সে কুটীরে
আবার ফুলের গাছে ঢালিবিলো জল!
আবার ছুটিবি গিয়ে পর্ব্বতের শিরে!

২৭

পৃথিবীর যাহা কিছু ভুলে যালো সব
নিরাশ-যন্ত্রণাময় পৃথ্বীর প্রণয়!
নিদারুণ সংসারের ঘোর কলরব,
নিদারুণ সংসারের জ্বালা বিষময়।

২৮

তুই স্বরগের পাখী পৃথিবীতে কেন?
পৃথিবীর অগ্নি মাঝে পারিজাত ফুল।
নন্দনের বনে গিয়া, গাইবি খুলিয়া হিয়া
নন্দন মলয় বায়ু করিবি আকুল।

২৯

আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে,
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল,

তটিনী বহিছে যথা কল কল স্বরে,
সুবাস নিশ্বাস ফেলে বন ফুল দল!

৩০

বন ফুল ফুটেছিলি ছায়াময় বনে,
শুকাইলি মানবের নিশ্বাসের বায়ে,
দয়াময়ী বনদেবী শিশির সেচনে
আবার জীবন তোরে দিবেন ফিরায়ে!

৩১

এখনো কমলা ওই রয়েছে দাঁড়িয়ে!
জ্বলন্ত চিতার পরে মেলিয়ে নয়ন!
ওইরে সহসা ওই মূর্চ্ছিয়ে পড়িয়ে
ভস্মের শয্যার পরে করিল শয়ন!

৩২

এলায়ে পড়িল ভস্মে সুনিবীড় কেশ!
অঞ্চল বসন ভস্মে পড়িল এলায়ে!
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে আলু থালু বেশ—
কমলার বক্ষ হোতে শ্মশানের বায়ে!

৩৩

নিভে গেল ধীরে ধীরে চিতার অনল
এখনো কমলা বালা মূর্চ্ছায় মগন
শুকতারা উজলিল গগনের তল—
এখনো কমলা বালা স্তব্ধ অচেতন!

৩৪

ওইরে কুমারী ঊষা বিলোল চরণে
উঁকি মারি পূর্ব্বাশার স্বুবর্ণ তোরণে—
রক্তিম অধর খানি হাসিতে ছাইয়া
সিঁদুর প্রকৃতি ভালে দিল পরাইয়া।

৩৫

এখনো কমলা বালা ঘোর অচেতন
কমলা কপোল চুমে অরুণ কিরণ!
গণিছে কুন্তল গুলি প্রভাতের বায়
চরণে তটিনী বালা তরঙ্গ ঢুলায়!

৩৬

কপোলে, আঁখির পাতে পড়েছে শিশির
নিস্তেজ স্বুবর্ণ করে পিতেছে মিহির!
শিথিল অঞ্চল খানি লোয়ে উর্ম্মিমালা
কতকি-কতকি কোরে করিতেছে খেলা!

৩৭

ক্রমশঃ বালিকা ওই পাইছে চেতন!
ক্রমশঃ বালিকা ওই মেলিছে নয়ন!
বক্ষোদেশ আবরিয়া অঞ্চল বসনে
নেহারিল চারিদিক বিস্মিত নয়নে।

৩৮

ভস্ম রাশি সমাকুল শ্মশান প্রদেশ!
মলিনা কমলা ছাড়া যেদিকে নেহারি
বিশাল শ্মশানে নাই সৌন্দর্য্যের লেশ
জন প্রাণী নাই আর কমলারে ছাড়ি!

৩৯

সূর্য্যকর পড়িয়াছে শুষ্ক ম্লান প্রায়,
ভস্ম মাখা ছুটিতেছে প্রভাতের বায়,
কোথাও নাইরে যেন আঁখির বিশ্রাম,
তটিনী ঢালিছে কানে বিষাদের গান।

৪০

বালিকা কমলা ক্রমে করিল উত্থান
ফিরাইল চারিদিকে নিস্তেজ নয়ান।
শ্মশানের ভস্ম মাখা অঞ্চল তুলিয়া
যেদিকে চরণ চলে যাইল চলিয়া!

মানব তত্ত্ব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্তোত্র।

"নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তোপি বশগাঃ।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোহপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলপ্রদঃ
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিম মরগণৈঃ কিঞ্চবিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি নমেভ্যঃ প্রভবতি॥"

হে অনাদ্যা বিশ্বজননি প্রকৃতি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। যদিও তোমাতে আমাতে ভেদ নাই, তথাপি আমি তোমার মহিমা বর্ণন করিব। তুমি স্তবে তুষ্ট না হইলেও আমি তোমার স্তব করিব। হে দেবি বিশ্বশক্তি! তুমি একবার সরস্বতী রূপে আমার জিহ্বাগ্রে বাস কর; আমি তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিব। তুমি যেমন রমণীর শিরোমণি, সেইরূপ পুরুষের মধ্যেও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তোমার বিরাট মূর্ত্তি চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। হে বিশ্বদেব! প্রত্যেক পৃথিবী তোমার পদ, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নয়ন, আলোক তোমার বর্ণ, বায়ু তোমার শ্বাস, আকাশ তোমার ব্যাপ্তি, গ্রহ নক্ষত্র সকল তোমার রোমকূপ এবং শক্তি তোমার প্রাণ। তোমার বিশ্বদেহের তুলনা নাই। তুমি বিশ্বের স্রষ্টা, সুতরাং ব্রহ্মা; তুমি বিশ্বের পাতা, সুতরাং বিষ্ণু এবং তুমি বিশ্বের নাশক সুতরাং শিব। প্রণব তোমারই বাচক। তুমি সকল দেব হইতে উচ্চ, সুতরাং মহাদেব; তুমি দুর্গ হইতে রক্ষা কর, সুতরাং দুর্গা; এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে বিরাজ কর, সুতরাং করাল বদনা কালী। তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র; তুমি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ; তুমি বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, মেধা; তুমি লজ্জা, শান্তি, দয়া, শ্রদ্ধা; তুমি দিক্, দেশ, কাল; তুমি তড়িৎ, তাপ, আলোক; তুমি নদী, জল, প্রস্রবণ; তুমি যক্ষ, রক্ষ, দানব; তুমি সত্ব, রজঃ, তম; তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; তুমি লক্ষ্মী, সরস্বতী; তুমি স্থাবর, জঙ্গম; তুমি দিবা, রাত্রি; তুমি শরীর, তুমিই শরীরী; তুমি স্রষ্টা, তুমিই সৃষ্ট; তুমি দ্রষ্টা, তুমিই দৃশ্য; তুমি শ্রোতা, তুমিই শ্রাব্য; তুমি পিতা, তুমিই পুত্র; তুমিও তুমি, আমিও তুমি।

যাহা কিছু আছে, সকলই তুমি। তোমা ভিন্ন কিছুই নাই। তোমার তত্ত্ব কে বুঝিবে? তোমার মহত্ত্ব বুঝিতে না প্যারিয়া মানবগণ তোমার সৃষ্টি কর্ত্তার কল্পনা করিয়াছে। তোমার অপ্রমেয় শক্তির আশ্চর্য্য মহিমা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া এই ভ্রমাত্মক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা জানে না যে, তোমার আদি বা অন্ত নাই। যখন তুমি এই বিশ্বের সংহার কর, তখনও যে তুমি সমগ্র বর্ত্তমান থাক, তাহা তাহারা জানে না। নরকুলতিলক মনু লিখিয়াছেন "আসীদিদন্ত মোভূত ম প্রজ্ঞান মলক্ষণং। অপ্রতক্য মবিজ্ঞেয়ম্ প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" প্রলয় কালে এই বিশ্ব অন্ধকারময় অবিজ্ঞেয় লক্ষণশূন্য অবস্থায় থাকে। সৃষ্টিকালে আবার সকল পদার্থ স্ব স্ব পূর্ব্বশক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে থাকে। এ সকলই তোমার কার্য্য। কিন্তু হে বিশ্বময়! তুমি কি জন্য এরূপ সৃষ্টি ও নাশ কর, তাহা আমরা কিছুই জানি না। তুমি করিতেছ, পালন করিতেছ, আবার সংহার করিতেছ। সেই নষ্ট পদার্থের আবার পুনর্জ্জন্ম দিতেছ. আবার মারিতেছ। তুমি কখনও আমাদিগকে হাসাইতেছ ও কখনও কাঁদাইতেছ। কিন্তু তুমি কেন জন্ম দাও, কেন নষ্ট কর, কেন হাসাও, কেন কাঁদাও, তাহা আমরা জানি না। তুমি জান কি না তাহাও আমরা জানি না। তোমার কোন অভিপ্রায় আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তোমার ক্রীড়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা আছে কি না, তাহা আমরা কি প্রকারে বুঝিব। আমরা দেখিতেছি, তুমি অসংখ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ, কিন্তু বিশেষ প্রনিধান পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে দুই প্রকার মাত্র কার্য্য দেখিতে পাই। তুমি কেবল ভাঙ্গিতেছ ও গড়িতেছ। মহৎকে ক্ষুদ্র করিতেছ, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিতেছ। জল ভাঙ্গিয়া বাষ্প করিতেছ এবং বাষ্প গড়িয়া জল করিতেছ। তুমি সমভূমিকে পর্ব্বত করিতেছ, আবার পর্ব্বতকে সমভূমি করিতেছ। মরুভূমিকে উদ্যান এবং উদ্যানকে মরুভূমি করিতেছ। পশুকে মনুষ্য এবং মনুষ্যকে পশু করিতেছ। এই সকলই ভাঙ্গা গড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাঙ্গা গড়াই তোমার কাজ। কিন্তু তুমি কেন ভাঙ্গ, কেন গড়, উহার কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। হে শক্তিরূপিণি! তোমার অসংখ্য

মূর্ত্তি সতত বিরাজ করিতেছে। যদিও তুমি নিরাকার, তথাপি তোমার অসংখ্য সাকারমূর্ত্তি অহঃরহঃ দীপ্যমান রহিয়াছে। বিশ্বের সমস্ত পদার্থই তোমার মূর্ত্তি। কখনও তোমার প্রশান্ত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমরা আনন্দে পুলকিত হই, এবং কখনও তোমার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হই। কখন তোমাকে "অতসী পুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং। লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং। নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং। সুচারু দশনাং দেবীং পীনোন্নত পয়োধরাং। প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামপ্রদাং শুভাং।" বলিয়া ধ্যান করি, কখনও 'করালবদনাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং। সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃখড়্গ বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং। মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথৈচৈব দিগম্বরীং। কণ্ঠাবশক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাং। কর্ণাবতংস তানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাং। শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চং হসোন্মুখাম্। শৃক্কদ্বযগলদ্রক্ত ধারা বিস্ফুরিতাননং। ঘোর রাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।" বলিয়া ধ্যান করি। এই দেখিতেছি, তুমি শান্তভাবে বিরাজ করিতেছ, মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে, কোকিল মধুরস্বরে গান করিতেছে, গবাদি পশুসকল সুখে বিচরণ করিতেছে, যুবক দম্পতি প্রেমালাপ করিতেছে, নদী মৃদু কলরবে সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে, সুগন্ধ ও সুদর্শন পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া অতুল শোভা বিস্তার করিতেছে, ময়ূর ময়ূরী সুন্দর পক্ষ বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, নির্ম্মলাকাশে চন্দ্রিকা মোহিনী ক্রীড়া করিতেছে, যে দিকে তাকাই সর্ব্বত্রেই তোমার মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকি। মনে ভাবি তুমি আমাদের সুখের জন্য নিয়তই ব্যস্ত রহিয়াছ। কিন্তু দেখিতে দেখিতে আবার তোমায় কিরূপ দেখি; আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, নিবিড় অন্ধকারে আপনার শরীর পর্য্যন্ত দেখা যায় না, ভয়ঙ্কর বেগে কড়মড়াইতেছে, বৃক্ষ সকল মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিতেছে, গৃহসকল যেন রসাতলে নীত হইতেছে, মুষলধারে

পড়িতেছে, করকাঘাতে শরীর ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, বিদ্যুতালোকে চক্ষু ধাঁদিয়া যাইতেছে, অশনিপাতের শব্দে কর্ণ বাধির হইয়া যাইতেছে, চতুর্দ্দিকে মনুষ্য সকল হা হতোস্মি বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে.

প্রণয়ীর মৃত্যুজনিত ক্রন্দনধ্বনিতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে। যেদিকে দেখি সকলই ভয়ানক। তোমার এই সংহার মূর্ত্তি স্মরণ করিলেও ভয়ে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। তখন বোধ হয় যেন তুমি বিশ্বের সংহার সাধন করিতে আসিয়াছ। যেন ক্রোধে তোমার বিশ্বদেহ কম্পিত হইতেছে। কিন্তু জানি না কিসে তোমার ক্রোধ হয় এবং কিসে ক্রোধের শান্তি হয়। এই দেখিতেছি শ্যামল শস্যক্ষেত্রে স্থান বিশেষ শোভিত করিতেছে, আবার দেখি আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুৎপাতে বিদীর্ণ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী শত শত গ্রাম ও নগর উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। এই দেখিতেছি স্রোতস্বতী কলকল রবে মধুর গান করিতে করিতে গমন করিতেছে, আবার দেখি ভয়ঙ্কর বেগে জলপ্রবাহ উত্থিত হইয়া সমুদায় দেশ প্লাবিত করিতেছে। এই দেখিতেছি ভয়ঙ্কর শীতে শরীর অবসন্ন ও জড়সড় হইয়া অগ্নির নিকট বসিয়া রহিয়াছি, জলকে বিষবৎ স্পর্শ করিতে ভয় হইতেছে, আবার দেখি ভয়ানক রৌদ্রের তাপে শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে, প্রিয় অগ্নি বিষতুল্য হইয়াছে এবং বিদ্বিষ্ট জল সুখের সামগ্রী হইয়াছে। এই দেখিতেছি সুখাসীন মানব প্রিয় পরিজন, বয়স্য ও প্রণয়িণীর সহিত মধুর আলাপ করিতেছে, পরোপকার ও পরহিত চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে, শত শত আশাকে হৃদয়ে বর্দ্ধিত করিতেছে, সতত আপনাকে অজর অমর করিবার চেষ্টা করিতেছে, আবার দেখি তাহার সেই যত্নের দেহ চিতায় শায়িত রহিয়াছে, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভষ্মাবশেষ হইতেছে, চতুর্দ্দিকে পরিজনেরা আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে। এ সকলই তোমার রূপ বৈচিত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ সকলের গূঢ় অর্থ কে বুঝিবে? যদি আমরা তোমার তত্ত্ব বুঝিতে পারিতাম, তবে তোমাতে আমাতে কি প্রভেদ থাকিত? তুমি যাহাকে যাহা দিয়াছ, সে তাহা পাইয়াছে, যাহা দেও নাই সে তাহা পায় নাই। তুমি সিংহকে বল, অশ্বকে গতি, ময়ূরকে শ্রী, কোকিলকে স্বর, অগ্নিতে তাপ, তুষারে শৈত্য, তাড়িতে গতি, দীপকে উজ্জ্বলতা এবং মানবকে বুদ্ধি দিয়াছ! তুমি যাহাকে যাহা দেও নাই, সহস্র চেষ্টা করিলেও সে তাহা পাইবে না। দিগ্গজ সহস্র চেষ্টা করিলেও বুদ্ধিমান হইবে না। কালিদাস চেষ্টা না করিলেও কবি হইতেন। কাহার

সাধ্য তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে। যে তাহার চেষ্টা করিবে, সে তদ্দণ্ডেই তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইবে। হে জগদাম্বিকে! মানব তোমারই সন্তান সুতরাং তোমারই অঙ্গবিশেষ। মরিলে তোমাতেই লীন হইবে। সেই মানবের মোক্ষ। মোক্ষ ভিন্ন মানবের গত্যন্তর নাই। হে বিশ্বময়! যদিও জানিতেছি যে, তোমার স্তব করা বৃথা, কেন না তুমি খোষামোদে ভুলনা, তথাপি তোমার মহিমা গান করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয় ও সংসার জয় করা যায়, সুতরাং তোমার গুণগানে ফল আছে। তোমার পূজা করিতে কালাকাল ও স্থানাস্থান বিচার করিতে হয় না, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই ও যখন ইচ্ছা তখনই তোমার পূজা করা যায়। তাহাতে ফুল জল প্রভৃতির আবশ্যক করে না, চক্ষুও মুদ্রিত করিতে হয় না। স্থিরচিত্তে তোমার রূপ ও শক্তির বিষয় ভাবনা করিয়া তোমার নিয়মানুসারে কার্য্য করিলেই তোমার পূজা করা হয়। মানবগণ আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কার্য্যে, বিশ্রামে, সকল সময়েই তোমার পূজা করিতেছে। যাহারা কেবল তোমার পূজা করে, তাহাদের পৃথিবীর কাহারও সহিত ধর্ম্মদ্বন্দ্ব হয় না। কেন না তোমার সাক্ষাতে নিয়ম লঙ্ঘন ভিন্ন অন্য কিছুতেই তোমার ক্রোধ হয় না। সুতরাং পরস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন বা পুত্তলিকা পূজা করিলে তোমার নিকট কোন অপরাধ হয় না। হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান সকলেই তোমার নিকট সমান। তুমি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতির নামে নাম রাখিলে রাগ করনা এবং ব্রাহ্মণের জাতীয় চিহ্ন স্বরূপ উপবীত ধারণে ক্ষুণ্ণ হওনা। তোমার সেবকদিগকে সাক্ষাত দেবতা, পিতা, মাতা ও প্রণয়-পুত্তলি রমণী পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না, অথবা বিধর্ম্মী বলিয়া বন্ধুগণের বিশ্বস্ত ধর্ম্মকার্য্যে নিমন্ত্রণ গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতে হয় না। হে পরাৎপর! তোমার আশ্চর্য্য গুণ এই যে, তুমি স্তবে তুষ্ট বা নিন্দায় রুষ্ট হও না। সহস্র লোক একত্রিত হইয়া উচ্চরবে দিবা নিশি তোমার নাম উচ্চারণ করিলে অথবা মুদ্রিত নয়নে তোমাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আনিয়া সহস্র দিন চিন্তা করিলেও তুমি তুষ্ট হও না। নানা প্রকার গীত বাদ্য ও নানা প্রকার মূল্যবান্ উপহার সহ পূজা করিলেও তুমি সন্তুষ্ট

হও না। কেন না তুমি নির্ব্বিকার, ভোলানাথ বা আশুতোষ নও। তুমি সত্য স্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ ও ন্যায়পর। তুমি করুণাময় নও। যাহারা তোমাকে করুণাময় বলে, তাহারা তোমার মহাশক্তির দুর্নাম ঘোষণা করে। যাহারা তোমাকে স্তবে তুষ্ট করিবার প্রয়াস পায়, তাহারা তোমাকে বালকের ন্যায় চঞ্চল ও অবিমৃষ্যকারী বিবেচনা করে। তোমার নির্ব্বিকার নামে বিকার জন্মাইয়া দেয়। যদি একেশ্বর বাদীরা পৌত্তলিকদিগকে অধার্ম্মিক বলিতে পারেন তাহা হইলে, যাঁ-হারা তোমার করুণা প্রভৃতির ক-ল্পনা করেন, তাঁহাদিগকেও অধা-র্ম্মিক বলা যায়। কিন্তু তোমার নি-র্ব্বিকারত্বগুণে তুমি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হও না। হে জ্ঞানময়! তুমি দয়াময় নও বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরও নও। কেন না আমরা পদে পদে তোমার ক্ষমার পরিচয় পাইতেছি। যদি তোমার ক্ষমা না থাকিত তাহা হইলে একবার রোগ হইলে আর সারিত না, শোক হইলেও আর সুস্থ হইত না। হে সনাতনি শক্তি! যা-হারা তোমাকে জড় প্রকৃতি বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তুমি অচিন্ত্য শক্তি, অপার মহিম; অপ্রেমেয় জ্ঞানশালী, চৈতন্যস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, নির্ব্বিকার ওঁ তৎসৎ বাচ্য ও এক মেবাদ্বিতী-য়ম্। তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহারা তোমা ভিন্ন অপর পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারা তো-মার অদ্বিতীয় নাম অর্থশূন্য করে অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে। তাহাদিগকে দ্বৈতবাদী ব-লিতে হয়। তোমার উপাসকেরা প্রকৃত অদ্বৈতবাদী। যাঁহারা তো-মার উপাসক, অর্থাৎ যাঁহারা অদ্বৈ-তবাদী বিশ্বদেব উপাসকদিগকে নাস্তিক বলেন, তাঁহারাই নাস্তিক অথবা তাঁহারই পৌত্তলিক। হে বাঙ্মনসোহগোচর! তোমার মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব? তুমি মান-বের এমন শক্তি দাও নাই যে,তদ্দ্বারা তোমাকে অবগত হয়। যে বিজ্ঞান শাস্ত্র বলে তোমার তত্ত্ব জানিবার আশা করা যায়, তাহা মানবের কৃত, সুতরাং অপূর্ণ। মানব সম্যক্রূপে অপূর্ণ। অপূর্ণ শক্তি দ্বারা তোমার পূর্ণশক্তির পরিচয় কিরূপে লইব? তোমার নিকট প্রার্থনা এই যে, আ-মাতে এমত মহাভূত সকল প্রদান কর, যাহার বলে তোমার তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। ইহাই মান-বের একমাত্র অভাব। অপূর্ণতা

দূর হইলেই মানব চরিতার্থ হয়। কিন্তু তুমি তাহা করিবে কি না বলিতে পারি না। যিনি প্রতিদিন অবহিতচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবেন, তিনি সংসারজয়ী হইতে পারিবেন। মর্ম্মার্থ বুঝিয়া এই স্তব পাঠ করিলে মৃত্যুভয় থাকে না। কোন কষ্টই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, রোগ শোক কিছুতেই তিনি ব্যথিত হন না। অতএব সকলেরই উচিত পূর্ব্ব ও পর সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মনোহর কালে অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিশ্বদেবের উপাসনা করেন।

ক্রমশঃ

ভারতের আশা।

অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন, তার্কিক তর্কক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের নূতন শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিতেছেন, ঐতিহাসিক ইতিহাসক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গভীর গবেষণা অসাধারণ অতীত জ্ঞান জগতের সমক্ষে প্রকাশিত করিতেছেন; এইরূপ যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই অনন্ত বিষয়ের অনন্ত উন্নতি নয়নগোচর হইবে। পৃথিবী প্রতিপাদবিক্ষেপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, মনুষ্য প্রতিপাদবিক্ষেপে আপনাকে উন্নত বলিয়া অভিমান করিতেছে।

কিন্তু ভারতের অবস্থা কি উন্নত? ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, সভ্যতা সদাচার সম্পন্ন জগতের সমক্ষে এরূপ প্রশ্ন করিলে হয়ত অনেক সভ্যতাভিমানী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি আমাদিগকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিবেন। কিন্তু আমরা এরূপ উপহাসে দৃক্‌পাত না করিয়া পুনর্ব্বার জলদ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিতেছি, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অবস্থা কি উন্নত? "কভু উন্নতি কভু অবনতি জগতের নিয়তি।" জগতের নিয়তি অনুসারে ভারত এই ঊনবিংশ

শতাব্দীতে কি অবনতি হইতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে সরলপ্রকৃতি উদাসীন হয়ত মুদ্রিত নয়নে বলিবেন, সময়ের ধর্ম্মানুসারে ভারতের অবস্থা এক্ষণে অবশ্য উন্নত। সরল প্রকৃতি তার্কিক হয়ত তর্কজাল বিস্তার করিয়া বলিবেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নত বিজ্ঞানের প্রসাদে পূতি দ্রব্য ইঙ্গিত মাত্রে ভারতের হৃদয় আলোকমালায় সুশোভিত করিতেছে, গগনবিহারিণী বিদ্যুৎদামীত্বে নিয়োজিত হইয়া নিমেষ মধ্যে ভারতের সুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে সংবাদ আনিয়া দিতেছে, শূন্যপথাশ্রয়ী বাষ্প, শকটবাহক হইয়া ভারতের স্থানসমূহকে পরস্পরের ক্রোড়স্থ করিয়া তুলিতেছে। কেবল ইহাই নয়, ওই দেখ ভারতবাসী করে হংসপুচ্ছরূপ দুর্ব্বার অস্ত্র ধারণ করিয়া বীরদর্পে কত রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, কত রাজাকে রসাতলে দিতেছে, কত ব্যক্তিকে জীবনের তরে নির্ব্বাসিত করিতেছে, জনতাপূর্ণ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া জলদ গম্ভীর মধুর স্বরে কত তেজস্বিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গকে যুগপৎ হর্ষ, ক্ষোভ, আতঙ্ক, উৎসাহে নাচাইয়া তুলিতেছে, দুকম্মের রাজনৈতিক বিচারে কত তর্কজাল বিস্তার করিয়া সকলকে চমকিত করিতেছে ইহা দেখিয়াও কি বলিবে, ভারত উন্নত হয় নাই? ইহা দেখিয়াও কি নির্দ্দেশ করিবে, দিন দিন ভারতের অধোগতি হইতেছে?

যাঁহারা এইরূপ যুক্তি এইরূপ তর্কের বলবত্তা দেখাইয়া স্বমত বজায় রাখিতে প্রয়াসবান হয়েন, আমরা তাঁহাদিগকে শত হস্ত দূর হইতে নমস্কার করি। তাঁহারা সরল-প্রকৃতি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে তাঁহাদিগের সারল্য লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহাদিগের বাহ্য দৃশ্যে সরলতা, অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে সরলতা, আদ্যোপান্ত সমস্ত সরলতাময়। এরূপ সরলতা কখন কাহারও নিগূঢ় তত্ত্বের শিক্ষয়িত্রী হইতে পারে না, এরূপ সারল্য হইতেও কখন কেহ অভ্যন্তরীণ স্বভাব জানিতে পারে না। যদি কেহ অন্তঃপ্রকৃতির গূঢ় তত্ত্বের উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েন, যদি কেহ অতীত কার্য্য কারণ আলোচনা করিয়া তাহার সহিত ভাবী পরিণামের সম্বন্ধ বিনির্ণয় করিতে পারেন, যদি কেহ প্রকৃত সহৃদয়তার ক্রোড়ে লালিত হইয়া ঘটনা সমূহের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে তিনি অম্লান বদনে অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিবেন,

ভারতের অবস্থা উন্নত হয় নাই। সত্য, ভারতের বক্ষোদেশে বায়ু-গতি লৌহ তুরঙ্গম লৌহ বর্ত্মে প্রধাবিত হইতেছে, সত্য, জলদ প্রণয়িণী সৌদামিনী ভূতলে আসিয়া সংবাদ বাহিকার কার্য্যে নিয়োজিতা হইয়াছে, সত্য অত্যুজ্জ্বল আলোক মালা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তামসী নিশীথেও প্রচণ্ড নৈদাঘ দিবা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইতেছে। কিন্তু ভারত "যে তিমিরে সে তিমিরে।" ভারতের সমস্তই যুগান্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু ভারত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। ভারতবাসীর অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় নূতনত্ব প্রবেশিত হইয়াছে তথাপি তাহারা আজও সর্ব্বাংশে উন্নত বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য হয় নাই। ভারত যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়াছে, ভারতবাসী যে দুর্ব্বলতায় সেই দুর্ব্বলতায়ই পড়িয়া আছে। জগতের নিয়তি অনুসারে ভারত উন্নতি হইতে অবনতিতে পতিত হইয়াছে, জগতের নিয়তি অনুসারে ভারতবাসী এক সময়ে উন্নত থাকিয়া আজ অবনত হইয়াছে।

যে দিন প্রাচীন আর্য্যগণ হল স্কন্ধে করিয়া গোধন সঙ্গে ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন, সে দিন ভারতের কি শুভদিন। সেই দিনেই ভারতের গৌরব, ভারতের সম্ভ্রমের সূত্রপাত। যে বেদের পবিত্র স্বর্গীয় ভাবে ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ বিমোহিত হইতেছেন, সেই দিন হইতেই তাহা ভারতে উপনীত হইতে আরম্ভ হয়। "যে উজ্জয়িনী জনিতা কবিতা বল্লীর মধুময় কুসুমের" সৌরভ বিধুনিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী আমোদিত করিয়াছে, সেই দিনেই ভারতে তাহার বীজ রোপিত হয়। যে আয়ুর্ব্বেদের মহিমায় ভারতীয় জনগণের শোক সন্তাপের প্রতীকার হইয়া আসিতেছে, সেই দিনেই তাহার মুল ভারত হৃদয়ে স্থান পরিগ্রহ করে। যে জ্বলন্ত বহ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ হলদি ঘাটে অতুল পরাক্রম রাজপুতদিগের হৃদয় চুল্লী হইতে উদ্গত হইয়া অত্যদ্ভুত অনল ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং অধিক দিন অতীত হয় নাই, যাহা চিলিয়ান ওয়ালায় বিকশিত হইয়া প্রসিদ্ধ ওয়াটারলু জয়ী ব্রিটীষ তেজকেও বিধ্বস্ত করিয়াছে, যাহার নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসের আদরের ধন হলদি ঘাট ও চিলিয়ানওয়ালা গ্রীসের থর্ম্মাপলী ও ম্যারাথন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, সেই দিনেই

তাহা ভারত হৃদয়ে অনুপ্রবেশিত হয়। আর্য্যগণ এই পবিত্র দিনে পবিত্র সময়ে ভারতে পদার্পণ করিয়া অলৌকিক বুদ্ধিবলে অলৌকিক পাণ্ডিত্য বলে সভ্যতা প্রসারিত করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভারত অচিরাৎ সুসভ্য হয় এবং তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভারতীয় মহিমা অতীত সাক্ষী ইতিহাসের পূজনীয় হইয়া উঠে।

এক্ষণে ভারতের সে মহত্ত্ব বিগত হইয়াছে, সে জ্ঞান, সে ধর্ম্ম, সে নীতি, সে সদাচার, সে সভ্যতা, সে উদারতা অনন্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়াছে। যে পঞ্চনদ বাহিনী সিন্ধু সরস্বতীর তীরে বসিয়া আর্য্য মহর্ষিগণ জলদ গম্ভীর মধুর স্বরে সামগান করিতেন, সে সিন্ধু সরস্বতী আজও পঞ্চনদ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; যে অভ্রংলিহ হিমাদ্রির নির্জ্জন গহ্বরে সমাসীন হইয়া যোগরত আর্য্যতাপসগণ সৃষ্টির প্রাণ রূপিণী অনন্ত শক্তির ধ্যানে সংযতচিত্ত থাকিতেন, সে গিরি শ্রেষ্ঠ সে গিরি গহ্বর আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে ; যে হলদি ঘাটে প্রচণ্ড আর্য্য তেজ আর্য্য সাহস বিকশিত হইয়া শত্রুর মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিল, সে হলদি ঘাট আজও ভারত মানচিত্রে শোভা পাইতেছে। যে পশ্চিম শৈলের শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া অদীন-পরাক্রম শিবজী বিজয় ভেরী বিজয় দুন্দুভির গভীর নির্ঘোষে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন, সে পশ্চিম শৈল আজও বিস্তৃত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের সে জ্ঞানধর্ম্ম নাই, সে জীবনীশক্তি নাই, সে একতা নাই, সে আত্মত্যাগ নাই। প্রাচীন ভারতের সভ্যতার স্রষ্টা আর্য্য মহর্ষিগণের বিলাসভূমি গিরি কন্দর অধিকৃত রহিয়াছে, পুণ্য সলিলা, সিন্ধু সরস্বতী যথা প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু অদ্য ভারত শ্মশান। সমীরণ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে বিলাপিয়া বিলাপিয়া বহিয়া যাইতেছে, তরঙ্গিণী বিষাদ তরঙ্গে অধীর হইয়া একবার উন্নত আবার অবনত হইতেছে, অদ্য ভারত শ্মশান। ভারতের গতি নাই, চেতনা নাই, বেদনা বোধ নাই, অদ্য ভারত শ্মশান। বিংশতি কোটী জীব এই মহা শ্মশানে মহা নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে।

যে ইউরোপের ইয়তা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, যে ইউরোপ এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে আপনাকে সুসভ্য, সুপণ্ডিত, সু যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সেই ইউরোপের শ্রীবৃদ্ধির

কারণ কি? কাহার জন্য সেই ইউরোপ পাণ্ডিত্য, সভ্যতা ও যোদ্ধৃত্বাভিমানে স্ফীত হইতেছে। ধীর চেতা, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন ভারতকে নির্দ্দেশ করিবেন। প্রাচীন ভারতের পাণ্ডিত্য, প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, প্রাচীন ভারতের তেজ লইয়াই ইদানীন্তন ইউরোপীয় সমাজ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। দিবাকর যেমন পূর্ব্বে সমুদিত হইয়া ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকের ক্রোড়শায়ী হয়, জ্ঞানদিবাকরও সেইরূপ প্রাচ্য ভারতে উদিত হইয়া প্রতীচ্য ইউরোপের অঙ্কগত হইয়াছে। ইউরোপের শিক্ষাদাত্রী গ্রীস যখন বাল্যলীলা তরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিল, সভ্যতা জননী রোম যখন অনাগত কালগর্ভে নিহিত ছিল, সেই অতি প্রাচীন সময়ের বিদ্যা ও সভ্যতা জ্যোতিঃ ভারতহৃদয়ে শতধা বিকীর্ণ হইয়া উঠে। ভারতের সভ্যতা, ভারতের ধর্ম্মনীতি, ভারতের সমাজ নীতি, ভারতের পাণ্ডিত্য অতি প্রাচীন সময়ে লব্ধ প্রসর হয়। ব্রিটীষ দ্বীপের অধিবাসিগণ যখন মৃগয়ালব্ধ আমমাংসে জঠরানল নির্ব্বাপিত করিত, যখন বন্যবৃক্ষের ত্বকে আপনাদিগের লজ্জা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিত, যখন বিবিধ বন্য বর্ণে আপনাদিগের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিলসিত বদন রঞ্জিত করিয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে যথেচ্ছ বিচরণ করিত, সংক্ষেপতঃ যখন তাহারা বন্যভাব বন্য আচার বন্য প্রকৃতিতে অটল ছিল, সে সময় ভারত উন্নতির শিখরে সমারূঢ়। সে সময়ে ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্প চাতুরী প্রভাবে সভ্যতাস্রোতঃ শতধা প্রসৃত হইতেছিল, সে সময়ে ভারতে স্বর্ণময় আভরণ, যুদ্ধোপযোগী বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়া ক্রমোন্নতির পরিচয় দিতে ছিল, সে সময়ে ভারতে প্রভাববতী চিকিৎসা বিদ্যা অনুশীলিত হইয়া শোক সন্তাপের প্রতীকার বিধানে নিয়োজিত ছিল, এবং সে সময়ে ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থা, বাণিজ্য যাত্রা, উত্তরাধিকার নিয়ম প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার ভারতীয় সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু অদ্যতন ভারতের সহিত ব্রিটীষ দ্বীপের তুলনা কর, বিস্ময়ে অভিভূত হইবে। অদ্যতন ভারত মুষ্টি ভিক্ষার নিমিত্ত অদ্যতন ব্রিটীষ দ্বীপের দ্বারে লালায়িত। অদ্যতন ভারতের অশন বসন শয়ন উপবেশন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যই অদ্যতন ব্রিটীষ দ্বীপের সাহায্য-

সাপেক্ষ। ভারতবাসী এক্ষণে সামান্য ছুঁচ সুতা হইতে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ব্রিটেনের নিকট ভিক্ষা করিতেছে। দেশীয় শিল্পীরা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, সংযতচিত্ত মহাযোগীর ন্যায় ব্রিটনের পাদ পূজায় নিয়ত আছে। দীপ্তিমান চন্দ্র সূর্য্যের বংশে এক্ষণে কতকগুল ক্ষীণজ্যোতিঃ নক্ষত্র স্তিমিতভাবে ঝিকমিক্ করিতেছে, দেবভাবাপন্ন আর্য্যগণের বংশে এক্ষণে কতকগুলি ক্ষীণমতি, ক্ষীণসাহস, ক্ষীণবীর্য্য, জড়ভাবাপন্ন অনার্য্য লীলা করিতেছে। ইহা দেখিয়াও কি বলিবে ভারত উন্নত হইয়াছে? ইহা দেখিয়াও কি নির্দ্দেশ করিবে ভারতবাসী দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে?

ভারতের বেদ, ভারতের দর্শন, ভারতের স্মৃতি, ভারতের পুরাণ, ভারতের সাহিত্য দেবভাষা সংস্কৃতের অতি আদরের ধন। আর্য্য মনীষীগণ এই সমস্ত অগাধ পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সমস্ত পৃথিবীর উপকার করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে পুস্তকাদি প্রকাশের কোনও সুবিধা হইত না; তথাপি তাঁহারা অসাধারণ পরিশ্রম, অসাধারণ অধ্যবসায়, অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে বংশময়ী লেখনীর সাহায্যে তাল অথবা ভূর্জ্জপত্রে যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সমস্ত পৃথিবী অদ্যাপি বিস্ময়মিশ্র ভক্তিসহকারে তাঁহার গুণ গান করিতেছে। গৌতম কণাদ প্রভৃতি যে দেশের দার্শনিক, বৃহস্পতি, অত্রি প্রভৃতি যে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে দেশের ধর্ম্ম প্রচারক, কবিতা নিকুঞ্জবিহারী কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি যে দেশের কবি, সেই দেশের আজ কাল সকলেই গ্রন্থকার হইয়া উঠিয়াছে। লেখা পড়া শিখুক আর নাই শিখুক, সাধারণ্যে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলেই লোকে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। মুদ্রাযন্ত্র প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি দিনে যে কত পূতিদ্রব্য উদ্গারণ করিয়া ভারতভূমি কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। ঐ যে তাল অথবা ভূর্জ্জপত্রে যাহা লিখিত রহিয়াছে, তাহার সহিত এই সমস্ত কি তুলনীয়? পূর্ব্বতন আর্য্যমনীষীগণের বংশময়ী লেখনীর ব্যায়াম ক্রিয়ায় যাহা সমুদ্ভূত হইত, তাহা সমস্ত পৃথিবীর উপর আধিপত্য

করিতেছে, আর ইদানীন্তন অনার্য্য দিগের মুদ্রা যন্ত্র যাহা উদ্গীরণ করিতেছে, তাহা অবজ্ঞাসহকারে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে ইহা দেখিয়াও কি বলিবে ভারত উন্নত হইয়াছে? ইহা দেখিয়াও কি নির্দ্দেশ করিবে ভারতবাসী দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে?

বান্ধবের জাতীয় জীবন শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে, ভারতের গতি নাই. বেদনা বোধ নাই, এক প্রাণতা নাই। ভারতে একজনকে আঘাত করিলে অন্যজন হাসিতে থাকে, একজনকে ক্রন্দন করিতে দেখিলে অন্যজন তালে তালে নাচিতে থাকে। একের প্রহার বেদনা অপরের হৃদয়ে লাগিতে পারে, ভারতের এরূপ সহানুভূতি নাই, একের ক্রন্দনে অপরে ক্রন্দন করিতে পারে, ভারতের এরূপ এক প্রাণতা নাই। পরস্পরের হৃদয় একত্র হইলে কতদূর কার্য্যকর হয়, তাহা ভারত শিখিতে সমর্থ হয় নাই। পরস্পর একত্র ক্রন্দন করিলে কতদূর যাইয়া পৌঁছে, তাহা ভারত জানিতে পারে নাই। ফ্রান্স জর্ম্মেণী তুরস্ক গ্রীসের দৃষ্টান্ত দূরে থাকুক, ম্যাট্‌সিনি, মীরাবোর জীবন্ত উৎসাহ জীবন্ত অধ্যবসায় অন্তরিত হউক, এক পূর্ব্বতন ভারতের দৃষ্টান্ত লইয়াই ইহার সমর্থন হইতে পারে। যখন মহামতি নানক, বেদ কোরাণ প্রভৃতি মন্থন করিয়া অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন, যখন লোকে দলে দলে এই অভিনব ধর্ম্মের মন্ত্রশিষ্য হয়, তখন নানক ও তৎশিষ্যগণ নিরীহ ভাবে আত্মসংযত যোগীর ন্যায় স্বপদ্ধতির অনুমোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন, কালক্রমে মুসলমান সম্রাট্‌গণের অত্যাচারে এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হৃদয় বিদগ্ধ হইতে লাগিল, ইহারা পশুগণের ন্যায় রজ্জুবদ্ধ হইয়া বধ্যভূমিতে নীত হইতে লাগিলেন, অসামান্য অত্যাচার, অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণায় সকলের প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। এই নিদারুণ সময়ে শিখসমিতিতে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন, তিনি স্বশ্রেণীর স্বজাতির এইরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া জীবন্ত অধ্যবসায়, জীবন্ত উৎসাহ সহকারে উহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার সাহস, তাঁহার মহাপ্রাণতা শিখদলে অনুপ্রবেশিত হইয়া তাহাদিগের এক নূতন জীবনীশক্তির উৎপত্তি করিল। এই অবধি এক প্রাণতা, বেদনাবোধ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমু-

দর লক্ষণ শিখহৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এই অবধি গুরুগোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিখগণ মহাপ্রাণ মহাসত্ব হইয়া উঠিল। এই মহামন্ত্র, এই মহাপ্রাণতার ফল, ১৮৪৯ অব্দের চিলিয়ানওয়ালা। এক্ষণে ভারতে এরূপ জাতীয় বন্ধন নাই, এরূপ সহানুভূতি, এরূপ এক প্রাণতা, এরূপ বেদনাবোধ নাই। এক সময়ে ভারতীয় আর্য্যগণ ধৈর্য্যে অটল ছিলেন, বীরত্বে অজেয় ছিলেন; জাতীয়জীবনের জীবনে অনমনীয় ছিলেন। তাঁহারা কেবল কোমল প্রকৃতির কোমল সৌন্দর্য্যের সম্ভোগেই ব্যাসক্ত ছিলেন না, ভ্রমরচুম্বিত প্রভাতকমলের অঙ্গবিলাস, অথবা দিবস-পরিণাম-সম্ভূত সায়ন্তন শ্রীর কমনীয় শোভা প্রভৃতিতেই কেবল অনিমিষলোচন হইয়া আসিতেন না। হাবভাবপরায়ণা চটুলনেত্রা বিলাসিনীগণ প্রেমপঙ্কজ সমাকীর্ণ হৃদয়-সরোবরে অবগাহন করিয়া তাঁহাদিগকে অসার ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিত না। মলয় সমীরণ প্রসূন লতিকা দোলাইয়া দোলাইয়া স্পর্শে স্পর্শে দেহ যষ্টি আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে জাড্যদোষে সমাচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হইত না। জয়দেবের "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল মলয় সমীরে। মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে" প্রভৃতি রসময়ী কোমল-কান্ত-পদাবলি অথবা বিদ্যাপতির "আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত। ধাওল অলিকুল মাধবিপন্থ। নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকসিত ফুল। নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল," প্রভৃতি কন্দর্পের আবেশময়ী ললিত কবিতা নিরবচ্ছিন্ন তাঁহাদিগের চিত্ত বিনোদনের সামগ্রী ছিল না। তাঁহারা লোকারণ্যের জীব সংঘের বিরাট মিশ্রণ জনিত ভীম কান্ত সৌন্দর্য্যে সমাকৃষ্ট হইতেন, তাঁহারা গগনস্পর্শী হিমগিরির কটিতে প্রলয় পয়োদ মালার ছুটাছুটি দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন, তাঁহারা ভীম মারুত সংক্ষোভিত বিশাল অপার সিন্ধুর বিশ্বত্রাস গর্জ্জনে উৎফুল্ল হইতেন। তাঁহারা "পরিস্ফুরন্মোল শিখাগ্র জিহ্বং, জগজ্জিঘৎসন্ত মিবান্ত বহ্নিম্" প্রভৃতির ন্যায় পর্ব্বত বিদারী বাক্যাবলিতে নাচিয়া উঠিতেন। তাঁহাদিগের হৃদয় সাগর অটলতা, নির্ভীকতায় পূর্ণ ছিল, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য বুদ্ধি, সুখে

দুঃখে, সুসময়ে দুঃসময়ে অভ্রংলিহ গিরিবরের ন্যায় সদা উন্নত শীর্ষ থাকিত। পূর্ব্বতন ভারত এক সময়ে এইরূপ মহাসত্ত্ব আর্য্য শ্রেষ্ঠদিগের লীলা ভুমি ছিল। এক সময়ে এই আর্য্য মহাপুরুষগণ জন্মভূমির হিতের তরে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিতেও ক্রুটী করিতেন না, এক সময়ে আর্য্য সীমন্তিনীগণ জন্ম ভূমি রক্ষার্থ স্বীয় কমনীয় অঙ্গযষ্টি হইতে মহামূল্য অলঙ্কার রাশি উন্মোচন করিতেও কাতর হইতেন না। কিন্তু হায়! "তেহিনো দিবসা গতাঃ" আমাদিগের সে এক দিন গিয়াছে। ভারতের সে গৌরব সূর্য্য এক্ষণে অনন্ত জলধিতলে নিমগ্ন হইয়াছে। সে সাহস, সে বীর্য্যবত্তা, সে রণোন্মাদ, সে একতা, সে আত্মত্যাগ এক্ষণে আভিধানিক শব্দে পরিণত হইয়াছে। ইদানীন্তন ভারতবাসিগণ ক্ষুধা হইলে ক্রন্দন করে, ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে নিদ্রাভিভূত হয়। ছিন্ন বস্ত্র হইলে ইংলণ্ডের পানে তাকাইয়া থাকে, বস্ত্র পাইলে লজ্জা নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার মুদ্রিতনেত্র হয়। কি করিলে আহারীয় দ্রব্যের সংস্থান হয়, কি করিলে পরিধেয় বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, তাহা ভারতবাসি জানিতে চায় না। ভারতবর্ষ এক্ষণে এইরূপ জড়পদার্থের বিলাসক্ষেত্র, ভারতবাসী এক্ষণে এইরূপ নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ হইয়া জড়তায় সমাচ্ছন্ন।

দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ অনেক বিদেশীয় জাতির উপদ্রব সহ্য করিয়াছে। সেকন্দর সাহ হইতে সুলতান মহম্মদ পর্য্যন্ত অনেক দিগ্‌বিজয় মত্ত দস্যুগণ ভারতের মর্ম্মে আঘাত দিয়াছে। ভারতবর্ষকে এত উপদ্রব এত অত্যাচারে পতিত করিয়াও নিদারুণ বিধাতার হৃদয় প্রসন্ন হয় নাই। ক্রমে নিয়তি নির্দ্দিষ্ট দশা বিপর্য্যয়ে পতিত হইয়া ভারত মুসলমানদিগের অধীনতা শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া উঠে। অভাগীর এমনই বিড়ম্বনা। মাথার উপর বিরাটমূর্ত্তি হিমগিরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পায়ে আবার দুর্ব্বহ নিগড় দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। এই শৃঙ্খল আর বিমুক্ত হইল না, মুসলমান রাজত্ব অধঃপাতে গেল, তথাপি অভাগীর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে আর এক বাণিজ্যবেশধারী বৈদেশিক জাতি আসিয়া ধীরে ধীরে সম্মোহন বাক্যে অভাগিনীকে আবার শৃঙ্খল পরাইয়া দিল। প্রবল পরাক্রান্ত অন্য আগন্তুককে রাজ্যাধিকারী হইতে

দেখিয়া মুসলমান জাতি সাহায্য প্রাপ্তির আশায় ভারতবাসীর গলা জড়াইয়া ধরিল। ভারতবাসী নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য ও নিমগ্ন প্রায়, সুতরাং তাহাকে ধরিয়া মুসলমানের মঙ্গল হইল না, নিমগ্ন প্রায়ের গলা ধরিয়া উভয়েই রসাতলে গেল। এক্ষণে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই জড়াজড়ি করিয়া এক মহা শ্মশানে পড়িয়া রহিয়াছে।

উল্লিখিত বিষয়ের অধিকাংশই জাতীয় জীবন প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। তথাপি আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবটী স্ফুটতর করিবার জন্য উহার পুনরুল্লেখ করিলাম। এক্ষণে ভারতবর্ষ ব্রিটীষ অধিকারভুক্ত হইয়া ব্রিটীষ ইণ্ডিয়া নামে আখ্যাত। ভারতবাসী এক্ষণে ব্রিটীষ শাসিত হইয়া ব্রিটীষ ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত। অনেকে বলিয়া থাকেন, ব্রিটীষ শাসনবলে ব্রিটীষ ইণ্ডিয়ার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইতেছে। ব্রিটীষ উদারতার মহিমায় ব্রিটীষ ইণ্ডিয়ানগণ মানুষ হইতে শিখিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের হৃদয় এ কথায় সায় দিতে চাহে না। সত্য, ভারতবাসিগণ প্রকাশ্য সভায় দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরোন্নত স্বরে দশদিক পরিপূর্ণ করিতে শিখিয়াছে। সত্য ভারতবাসিগণ হংসপুচ্ছরূপ দুর্ব্বার অস্ত্রের সাহায্যে অসঙ্কুচিতভাবে মহা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু এগুলি প্রকৃত সজীবতার লক্ষণ নয়। জড় পদার্থে তাড়িত বেগ প্রয়োগ করিলে তাহা যেমন কিয়ৎক্ষণের জন্য স্ফুরিত হইয়া নির্ব্বল হয়, ভারতবাসীর সজীবত্বও সেইরূপ মুহূর্ত্তমাত্র বিকশিত হইয়া পুনর্ব্বার নিভিয়া যাইতেছে। ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বিস্ফুরণ, সর্ব্বত্র এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর সজীবতা।

ব্রিটীষ শাসনের সুনিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবাসিগণ আশানুরূপ সুশিক্ষিত হইতেছে না। যে শিক্ষায় চিত্তের উদারতা জন্মে, যে শিক্ষায় আত্মনির্ভরের ভাব অঙ্কুরিত হয়; সংক্ষেপতঃ যে শিক্ষায় সমাজ উন্নত ও অনবদ্য হইয়া থাকে, সে শিক্ষায় ভারতবাসিগণ চির বঞ্চিত। অধুনাতন বিশ্ব বিদ্যালয়ের যুবকগণ তোতা পাখীর ন্যায় রাশি রাশি পুস্তকের বুলি কণ্ঠস্থ করিতেছেন মাত্র; পুস্তকের উপর পুস্তকের বোঝায় তাহাদিগের নবীন দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। উৎকট চিন্তায় উৎকট শ্রমে ভারতের আশা ভরসার অদ্বিতীয় অবলম্বন যুবক বৃন্দ

কঙ্কাল মাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহাতেও নিস্তার নাই. কর্ত্তৃপক্ষের সুবিচারে অনেক অসার গ্রন্থ প্রতিদিন ইহাদিগের সম্মুখীন হইতেছে। শিক্ষা বিভাগের মহামতিগণ এই নীরস কাষ্ঠরাশি লক্ষ্য করিয়া আবার তারস্বরে বলিতেছেন, "সরসতরুরিহ বিলসতি পুরতঃ" কিন্তু ছাত্রগণ তাহার প্রতি একবার নয়নাবর্ত্তন করিয়াই নাসা সঙ্কুচিত করিয়া বিকৃতমুখে বিকৃতস্বরে বলিতেছে, "শুষ্ক কাষ্ঠস্তিষ্ঠত্যগ্রে।" ভারত উদ্যানের ঈষদুদ্ভিন্ন নবীন প্রসূনচয় এইরূপ অসহনীয় জ্বালায় দিন দিন শুষ্ক লাবণ্যশূন্য ও শিথিল বৃন্ত হইয়া পড়িতেছে।

অদ্যতন ভারত এইরূপ দুরবস্থায় পতিত, অদ্যতন ভারতের আশা ভরসা এইরূপ সংশয় দোলায় সমারূঢ়। এই দুরবস্থা কি ঘুচিবেনা? এই আশা ভরসা কি সংশয় চ্যুত হইবে না? উদয় অস্ত সূর্য্যের চিরন্তন নিয়ম। সূর্য্য উদয় হইয়া অস্ত যায়, অস্ত হইবার পর আবার উদয় হয়। ভারতের সুখ সূর্য্য উদিত হইয়া অস্তমিত হইয়াছে, তাহা কি পুনরুদিত হইবে না? নীচৈর্গচ্ছত্যুপরিচ দশা চক্রনেমি ক্রমেণ" মহা কবির এই উক্তি কি নিষ্ফল হইবে?

আশা মায়াবিনী। আশা সকল বিষয়েই মায়াজাল বিস্তার করিয়া আশ্বাস দিয়া থাকে। পথিক পথশ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের কিরণজাল তাহার বিশীর্ণ দেহ বিদগ্ধ করিতেছে, তৃষ্ণায় শুষ্ক কণ্ঠ, অনাহারে কঙ্কালময় হইয়া পথিক ভূতলশায়ী হইয়াছে। আশা ভ্রমরগুঞ্জনবৎ মধুর স্বরে তাহার কর্ণে বলিতেছে, "পান্থ! অগ্রসর হও, আশ্রয় স্থান পাইবে।" নবপ্রণয়ী রোগশয্যাশায়ী হইয়াছে। তাহার কমনীয় মুখ বিবর্ণ, কমনীয় দেহ বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রণয়িণী সংসারার্ণবের সোণামুখী তরীখানিকে ডোব ডোব দেখিয়া নীরবে রোদন করিতেছে; অমনি আশা তাহার কর্ণে বীণাধ্বনি করিয়া বলিতেছে "বালে! এ দিন যাবে, রবে না।" অদ্য অনশনে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, ভারতও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আশার এই মোহিনী কথা শুনিতেছে, "এ দিন যাবে রবেনা।"

আশার এই আশ্বাসবাক্য ভারতের সুখ শান্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন। এই আশ্বাসবাক্যে ভারত অদ্যাপি বুক বান্ধিয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি একটী মহাকার্য্যের সূত্রপাতে ভারতের এই আশার সুসার হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে, বর্ত্তমান বর্ষের ১২ই শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা মহানগরীর বক্ষে ভারত সভা নামে একটী মহা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন এই সভার একমাত্র ব্রত। এক্ষণে অনেক স্থানে অনেক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অনেক স্থানে অনেক সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ভারতসভার ন্যায়

কোন সভাই উদারভাবে আপনার কর্ত্তব্য-মার্গ প্রসারিত করে নাই খ্রিটীষ্ ইণ্ডিয়ান সভা সম্প্রদায় বিশেষের পৃষ্ঠ পূরক, ভারত সমবায় (ইণ্ডিয়ান লীগ) সত্য হউক মিথ্যা হউক, এক্ষণে সাধারণ মতানুসারে সঙ্কুচিত বিষয়ে সঙ্কুচিত ভাবে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতসভা সর্ব্ব প্রকার উদার কর্ত্তব্যের প্রসূতি। ইহা লাভ গণনা নিপুণ জমীদার বর্গের উদ্ভাবিত নহে, অসার বক্তৃতাপরায়ণ ছাত্রবৃন্দের কল্পিত নহে. ইহা দেশের ভরসা স্থানীয় সুশিক্ষিত, সুদক্ষ, সুব্যবস্থিত লোকের পরিচালিত। ইহাতে ভারত সভার নিকট ভারত আশা না করিবে কেন ?

অপূর্ব্ব সময়ে অপূর্ব্বক্ষণে ইহার জন্ম। এক দিকে পুত্রশোক পাগলিনী নয়ন তারার নয়ন জল, মাজিষ্ট্রেটের কুক্কুরঘাতী রাজচন্দ্রের কারাবাস, অপরদিকে ভারতসভার সমুত্থান। এক দিকে ভারতের পুত্রহারা বিধবা, দিশাহারা বালক মাজিষ্ট্রেটের কোপে পড়িয়া ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়াছে, অপর দিকে ভারতসভা জলদ্ গম্ভীর স্বরে মাভৈঃমাভৈঃ বলিতেছে! কি সুন্দর দৃশ্য! কি আশাপ্রদ ভাব!! ভারত অত্যাচার, অবিচার জলধিতলে মগ্ন হইতেছে, ভারত সভা তাহাকে উদ্ধার করিতে বিংশতিকোটি হস্তপ্রসারণ করিতেছে। ইহাতে ভারতসভার নিকট ভারত আশা না করিবে কেন ?

ইহাতে জাতির নিয়ম নাই, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিয়ম নাই। ইহা ভারতবাসী সকল জাতির, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি। ইহা ভারতবাসী বালক বৃদ্ধ পণ্ডিত মুর্খ, ভদ্র ইতর সকলেরই মঙ্গলবিধাত্রী। ইহা ভারতের নিরক্ষর নিঃসহায় মূক প্রজাগণের পক্ষ সমর্থন করিবে, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। ভারতের আশাস্থানীয় তরুণযুবকদিগের শিক্ষার পথ সুগম ও সরল করিতে যত্নপর হইবে, তাহাদিগকে ভারতের স্বত্ব রক্ষণোপযোগী রাজনৈতিক শিক্ষায় সংযত করিবে। সংক্ষেপে যাহাতে সমস্ত ভারত এক হাড় এক প্রাণ হইয়া বিরাট মিশ্রণে এক মহা সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আপনার জীবন উৎসর্গ করিবে, ইহাতে ভারতসভার নিকট ভারত আশা না করিবে কেন।

একতা, ত্যাগ স্বীকার ইহার বীজমন্ত্র। ইহা সজীবতায় পরিপুষ্ট, সজীবতায় পরিবর্দ্ধিত ও সজীবতায় অনুপ্রাণিত। ইহা সাধনায় অটল; সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও ইহা ভারতকে মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস, বিপদে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও দারিদ্র্যে ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা দিবে। ইহা ভারতকে, সজীব, সতেজ, মহাপ্রাণ ও মহাসত্ত্ব করিতে যত্নপর হইবে। ইহাতে ভারতসভার নিকট ভারত আশা না করিবে কেন। ভারতসভার উপর ভারতের সম্পূর্ণ ভরসা, ভারত সভার উপর

ভারতের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

ভারতে কে এমন আছে যে এই মহাব্রতধারী মহাসভার প্রতি সহানুভূতি না দেখাইবে? কে এমন আছে যে, এই আশালীলা তরঙ্গায়িত সুখবল্লীকে পদদলিত করিবে! ভারতে এরূপ প্রকৃতি যদি কেহ থাকে, যদি কেহ এরূপ অকৃতজ্ঞ ও দিশাহারা হয়, যদি কেহ এরূপ অসারত্ব ও মানুষত্বের পরিচয় দেয়, যদি কেহ এরূপ বিদ্বেষভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে অদ্যই মহাপ্রলয় উপস্থিত হউক, অদ্যই ভীষণ অশনিপাতে হিমাদ্রির অভ্রংলিহ শৃঙ্গ বিচূর্ণ হউক, অদ্যই ভারত মহাসাগর করালগ্রাস প্রসারিত করিয়া ভারতভূমি উদরস্থ করুক, অদ্যই ভারতবর্ষ পৃথিবীর মানচিত্র হইতে অন্তর্হিত হউক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই, কিছুমাত্র দুঃখ নাই। কিন্তু ভারতসভা জাতীয় জীবনে অনুপ্রাণিত। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তিতে অটল গিরিবরের ন্যায় অটলতায় পূর্ণ থাকিবে। ইহা ভারতহৃদয়ে নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার করিবে। ইহা বিংশতিকোটি জীবের বিংশতিকোটি স্বর একত্র হইলে কতদূর যাইয়া পৌঁছে, বিংশতিকোটি জীবের বিংশতিকোটি হস্ত একত্র হইলে কতদূর কার্য্যকর হয়, তাহা ভারতকে শিক্ষা দিবে। এরূপ পরহিতব্রত বিরাটমূর্ত্তির অমঙ্গল কেন হইবে? "সাধুকার্য্য যাহার ব্রত, ঈশ্বর তাহার সহায়" মহাজনের এই বাক্য কখনও নিষ্ফল হইবে না। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ইহার প্রতিষ্ঠাদিবসে অলৌকিক মহাসত্ত্ব, অলৌকিক মহাপ্রাণের পরিচয় দিয়াছেন। স্নেহের শৈশব দোলা, প্রীতির বিলাসভূমি একমাত্র পুত্র সন্তানকে কাল-কবলিত দেখিয়াও তাঁহার ধৈর্য্য বিচলিত হয় নাই। হৃদয়-সরবরের লাবণ্য লীলাময় কমলকোরককে দুরন্ত কৃতান্ত কীটের অত্যাচারে বৃন্তচ্যুত হইতে দেখিয়াও তাঁহার জীবন্ত উৎসাহ, জীবন্ত অধ্যবসায়ের ব্যত্যয় হয় নাই। যাহার মূল এরূপ উৎসাহ, এরূপ অধ্যবসায়ের উপর সংস্থাপিত তাহার অমঙ্গল কেন হইবে? ভারতসভার প্রতিষ্ঠাতার এরূপ মহাপুরুষত্ব জগতের ইতিহাসে দুর্লভ; জন্মভূমির হিতের তরে এরূপ অটল বিকারশূন্যতা জগতের সমাজে বিরল, ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে ভারতসভার প্রতিষ্ঠাতার এই অটল সাহস, অটল ধৈর্য্য, অটল অধ্যবসায় গীত হউক, সমুদ্রতটে, সমুদ্রনির্ঘোষের সহিত মিশিয়া এই সঙ্গীত মন্ত্রীভূত হউক, হিমালয়ের গগনস্পর্শী শৃঙ্গের গগন ব্যাপ্ত করিয়া এই সঙ্গীত বিঘোষিত হউক, বিংশতিকোটি জীবের হৃদয়-তন্ত্রী এই সঙ্গীত তানে বাজিতে থাকুক।

৪র্থ খণ্ড,। ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১২৮৩।

ও

প্রতিবিম্ব।

(মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।)

কলিকাতা।

৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিং লাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৩

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

১। জ্ঞানাঙ্কুরের মূল্য বিষয়ক নিয়ম ;—

বার্ষিক অগ্রিম	......	......	... ..	......	৩৲
ষাণ্মাষিক ,,	......	......	......	...	১৸৹
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	......	... ..	......	.. ...	।৵৹

এতদ্ব্যতীত মফঃসলে গ্রাহকদিগের বার্ষিক ।৵৹ ছয় আনা করিয়া ডাক মাশুল লাগিবে।

২। যাঁহারা জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের মূল্য স্বরূপে ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা কেবল অৰ্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন ; এবং প্রত্যেক টাকাতে ⁄৹ এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইবেন, কেননা বিক্রয় করণ কালে আমাদিগকে টাকাতে ⁄৹ আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

৩। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের কার্য্য সম্বন্ধে পত্র এবং সমালোচনের জন্য গ্রন্থাদি আমরা গ্রহণ করিব। রচনা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমাদের ঠিকানায় "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব সম্পাদক" শিরোনামা দিয়া লিখিতে হইবে।

৪। ব্যারিং ও ইন্সফিসেণ্ট পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।
জ্ঞানাঙ্কুর কার্য্যাধ্যক্ষ।

রণ-চণ্ডী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

জ্ঞানাঙ্কুর হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রাহা প্রণীত নূতন উপন্যাস। মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাসুল ৵৹ আনা। ঢাকা ন্যাশনাল ডিপজিটরীতে এবং ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীব্রজমাধব বসু।

ও

প্রতিবিম্ব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

চতুর্থ খণ্ড।

(১২৮২ অব্দের অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮৩ অব্দের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত।)

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক।

প্রকাশিত।

৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট। ক্যানিং লাইব্রেরী।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৭৬

মূল্য খোলা ৩৲ টাকা। বাঁধা ৩।০ টাকা।

সূচীপত্র।

রসসাগর।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

প্রশ্ন ; "ধিন্তা ধিনা পাকা নোনা।" রসসাগরের পূরণ,—

চৈত্রে শিবের আরাধনা।
জিহ্বা ফোঁড়েন ঢেঁকির মোনা॥
ছোলা কলা গুড় পানা।
ধিন্তা ধিনা পাকা নোনা॥

প্রশ্ন ; "রাম রাম রাম।" পূরণ,—.

সম্পূর্ণ যুবতী নারী বাটীতে রাখিয়ে।
চলিল তাহার পতি বাণিজ্য লাগিয়ে॥
মধুমাস মন্দ মন্দ বহে সমীরণ।
নিশিতে বিদেশী জন দেখিল স্বপন॥
স্বপন দেখিয়া পতি উঠিয়া বসিল।
বাটীতে যাইব বলি মনেতে ভাবিল॥
তিন দিবসের পথ এক দিনে যাব।
নারী সঙ্গ রস রঙ্গ আজিকে করিব॥
এত ভাবি তাড়া তাড়ি যেতে নিজ ধাম।
উছট খাইয়া বলে রাম রাম রাম॥

প্রশ্ন ; "হরগিজ" পূরণ,—

সর্ব্বস্ব কালের ঘরে রেখেছি মরগিজ।
আশিলক্ষবারেওআমারঘুচলনাখিরকিজ॥
মনমত্ত অভাগার সব নষ্টের বীজ।
ওরে এখন কালী পদ ধর্‌লিনে হর্‌গিজ॥

এই শ্লোকটী সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী কথা বক্তব্য আছে। হরগিজ শব্দের অর্থ "কোন মতেই ;" ইহা বাঙ্গালা শব্দ নহে,পারসীক মূল হইতে ইহার উৎপত্তি। রসসাগর মহাশয় যে ভাষায় প্রশ্ন সেই ভাষায় তাহার পাদ পূরণ প্রায়ই করিতেন। এটী যে তিনি হিন্দি ভাষায় রচনা না করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় করিয়াছেন, তাহাতে কিছু চমৎকৃত হইতে হয়। যাঁহাদের মুখে এই শ্লোকটী শুনা গিয়াছে, তাঁহারা রসসাগরকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায় মহাশয়ও ইহাকে রসসাগরের রচিত বলিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এটী রসসাগরের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। উপরে যে কারণ প্রদর্শিত হইল, তাহাই যে আমাদের এক মাত্র অস্বীকারের কারণ এমত নহে। আরও আমরা একটী বিশেষ কারণ দেখাইতেছি। মারগিজ শব্দ ইংরাজি মর্টগেজ শব্দের অপভ্রংশ ; উহার অর্থ বন্ধক দেওয়া। এই মারগিজ শব্দটী কলিকাতায় যে প্রকার প্রচলিত, পল্লীগ্রামে তেমন নহে ; এমন কি কৃষ্ণনগর অঞ্চলে সচরাচর সকলে বুঝিতে পারে কি না সন্দেহ। ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারে না। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ শব্দ যে এত প্রচলিত থাকিবে, এমন কি শ্লোকের মধ্যে

প্রক্ষিপ্ত হইবে, ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। এই জন্যই আমরা রসসাগর মহাশয়কে ইহার রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ ন্যায় অন্যায় বিচার করিবেন।

একদা প্রশ্ন হইল "আর সয় না।" সে সময় রসসাগর নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্লোকটী রচনা করিলেন,—

চাতক পাতকী বড় করেছে প্রতিজ্ঞা দড়,
শরৎ পর্য্যন্ত ভিন্ন অন্য জল খায় না।
শরৎ অবধি আশ, অতি কষ্টে অষ্ট মাস,
আশ্বাসে রয়েছে শ্বাস, অন্য পানে চায়না
বিস্তারিয়ে ওষ্ঠাধর, নাহি তাহে ধারাধর
ধরণী তার মূলাধার সেও তা যো পায়না।
তাহে বিশিষ্ট পাপিষ্ঠ, কুস্ষ্টতো কুঁজাপৃষ্ঠ
নবঘনে অধিষ্ঠিত, তিষ্ঠিবারে দেয় না॥
ঝটিত ঝাটিত ঝড়, ঝন ঝন চড় চড়,
গগণেতে গড় গড় ধড়ে প্রাণ রয় না।
ত্রিদশ মুদ্রার কাত, তিন মাস তনুপাত,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি নাথ, বজ্রাঘাত আর
সয় না॥

এ শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই;— চাতক যেমন শরৎ পর্য্যন্ত ভিন্ন অন্য জল খায় না, তিনিও তেমন রাজ প্রসাদ ভিন্ন অন্যের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী নহেন। রাজ বাটিতে ত্রিশ টকা তাঁহার পাওনা হইয়াছে, তিন মাস হাঁটাহাঁটী করিয়া আদায় করিতে পারিতেছেন না। যে মুদীর দোকানে ধার করিয়া খাইয়াছেন, সে তাগাদায় তাঁহাকে সুস্থির হইতে দিতেছে না। সে মুদী কুপৃস্ট, কুজাপৃষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ।

একদা প্রশ্ন হইল "নিষ্কন্ধ চুম্বন করে রমণীর মুখ।" প্রশ্ন শুনিয়া অনেকেই অবাক হইতে পারেন, কিন্তু রসসাগর সে প্রকার ধাতুর মনুষ্য ছিলেন না। তাঁহার এত সংগ্রহ ছিল এবং এত ভাব মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়া ছিলেন যে, যেমন কেন উৎকট প্রশ্ন হউক না, অনায়াসে তাহার সদুত্তর প্রদান পূর্ব্বক প্রশ্ন কর্ত্তাকে চমৎকার-সংবলিত সন্তোষ রসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেন। তিনি উপরি উক্ত প্রশ্নের এই উত্তর দান করিলেন;—

একাকিনী রজকিনী সদা মনে দুখ।
দিবারাতি খেটে মরে নাহি পায় সুখ॥
কাজ নহে ভাঁজ মাত্র প্রহারিয়ে বুক।
নিষ্কন্ধ চুম্বন করে রমণীর মুখ॥

এই শ্লোকের ভাব এই; রজকরমণী একাকিনী জামা ভাঁজ করিতেছে।

কখন কখন এরূপ ঘটিত যে, কোন কারণ বশতঃ মহারাজ রসসাগরের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার বেতনাদি বন্ধ করিয়া দিতেন; আবার রসসাগরের রসিকতায় মোহিত হইয়া আহ্বান করিতেন। এক সময়ে এই রূপ ঘটিলে রসসাগরের সংসার চলা নিতান্ত ক-

ঠিন হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া রসসাগর মহাশয় নিজ স্ত্রীর উক্তিতে মহারাজের নিকট এই শ্লোকটী প্রেরণ করিয়াছিলেন,—

নিবেদন করে দাসের দাসী,
রস সাগরের রসিকা।
করুণা ছেড়েছে নাথের নাথ,
মন্দির ছেড়েছে মূষিকা॥
আভরণ চয় করেছি বিক্রয়,
কাঞ্চন রহিত নাশিকা।
পাইব আশায় তথাপি নাশায়,
ধারণ করেছি ইসিকা॥

স্ত্রীলোকেরা সচরাচর কর্ণ ও নাশিকায় অলঙ্কার ধারণের ছিদ্র পাছে বুজিয়া যায় বলিয়া ইসিকা অর্থাৎ খড় দিয়া রাখে।

কোন সম্পন্ন জমিদার বৃহৎ একটী ক্রিয়া করেন, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হন। রসসাগর সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। কৃতী অকাতরে স্বর্ণ রৌপ্য দান করিতেছেন। সভাস্থ কোন ব্যক্তি রসসাগরকে প্রশ্ন করিলেন "কারো স্বস্তি, কারো নাস্তি, কারো মহোল্লাস।" কিন্তু কহিয়া দিলেন, কবিতা তিন চরণে সমাপ্ত হইবে। রসসাগর তৎক্ষণাৎ তিন চরণে এক শ্লোক রচনা করিয়া সভাস্থ সকলকে চমৎকৃত করিলেন।—

দেখিয়া দানের ঘটা সুমেরুর ত্রাস।
নাচয়ে অরুণবাজি পদ্মিনীর হাস॥
কারো স্বস্তি, কারো নাস্তি কারো মহোল্লাস।

প্রশ্নটীর অর্থ এই; কাহারো স্বস্তি অর্থাৎ আরাম, আর কাহারো নাস্তি অর্থাৎ স্বস্তি নহে, সুতরাং ক্লেশ, আর কাহারো অত্যন্ত আনন্দ। রসসাগর যে শ্লোক রচনা করিলেন তাহার ভাব অতি পরিপাটী। কৃতী যে প্রকার দান করিতেছেন, সেই দানের ঘটা দেখিয়া সুমেরুর ভয় হইয়াছে, সূর্য্যের ঘোড়া নাচিতেছে, আর পদ্মিনী হাস্য করিতেছে। দানের ঘটা দেখিয়া ইহাদের এপ্রকার ভাবের কারণ কি? যথেষ্ট কারণ আছে;— দানের ঘটা দেখিয়া সুমেরু এই জন্য ভয় পাইতেছে যে পাছে কৃতী তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া দান করিয়া ফেলেন। অরুণ বাজি এই জন্য নৃত্য করিতেছে যে, যদি কৃতীর দানের প্রবলতায় সুমেরুর ধ্বংস হয়, তবে সূর্য্যকে টানিয়া লইয়া যাইবার পথ সোজা হইল। আর সুমেরুকে উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে না। পদ্মিনী এই জন্য আহ্লাদে গদ গদ হইয়াছেন, যে সুমেরু যাইলে সূর্য্য আর অস্তে যাইবেন না। এই সকল বিষয় পাঠ করিয়া কে না রসসাগরকে শত শত ধন্যবাদ করিবেন!

একবার প্রশ্ন হইল, "জননীর গর্ভ হতে প্রসবে জননী" সকলে দেখিবেন প্রশ্নটী কতদূর উৎকট। আমাদের

কবি মহাশয় আবার উৎকট প্রশ্নের সময়ে যথেষ্ট ক্ষমতাও প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার কবিতাটী এই ;

ধান্যরূপা লক্ষ্মী তিনি জগৎ জননী।
ধরাতলে গোলারূপা তাঁহার জননী॥
তৃণহীন সছিদ্র গোলার চাল দ্বারা।
বর্ষাকালে তার মধ্যে পড়ে বারি ধারা॥
আপ নারায়ণ সহ সংসর্গের পরে।
গর্ভবতী হয় মাতা গোলার ভিতরে॥
যথাকালে অঙ্কুরাদি তনয় অমনি।
জননীর গর্ভহতে প্রসবে জননী॥

ক্রমশঃ

প্রলাপ সাগর।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

ভৌগোলিক তরঙ্গ।

এই তরঙ্গে বিবিধ ভূয়োগোল উঠিবার সম্ভাবনা। পৃথিবী গোল ইহাই ভূগোল শাস্ত্রের প্রথম সূত্র। যাহার সূত্র পাতেই গোল, তাহাকে সোজা করা যার পর নাই কঠিন, এ কথা কে না স্বীকার করিবেন? গোলকে সোজা করিতে হইলে যে সকল প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাহাকেই ভূয়োগোল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমরা অনেক সময়ে বৃথা কাজে অনেক সময় নষ্ট করিয়া থাকি, সে গুলি আমাদের ভূয়োগোলেই যায়; যাহা যায় তাহার আর উদ্ধারও হয় না। সুতরাং সেটী আমাদের সমূহ ক্ষতি। সেই জন্যই বলি কেহ যেন ভূয়োগোলে সময় নষ্ট না করেন।

ভূগোল শাস্ত্র পাঠ সহজ সাধ্য নহে। চিত্র ভিন্ন তাহার পাঠ হইতে পারে না। যে পুস্তকে দেশাদির চিত্র থাকে, তাহার নাম "এটলাস্"। পাঠকবর্গ! একবার এই "এটলাস্" শব্দের ব্যুৎপত্তি পাঠ করুন। ইংরাজী ভাষায় 'লস্' শব্দের অর্থ লোকসান। "ইট-লস" শব্দের অপভ্রংশে এটলাস হইয়াছে ; তাহার অর্থ এই যে ইহা এককালে লোক্সান মাত্র। যাহার গোড়ায় সম্পূর্ণ গোল, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অদৃষ্টে অনেক লোক্সান হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবী গোল এই কথা সাব্যস্ত করিবার জন্য ভূগোলবেত্তারা অনেক রকমওয়ারী প্রমাণ দিয়াছেন। ছেলেপিলেদের বুঝাইবার জন্য সে সকল প্রমাণ কোন কার্য্যকর নহে ; তাহারা ঐ সকল উৎকট প্রমাণ মনেই ধারণ করিতে পারে না। তাহাদের কাণ ধরিয়া এই কথা বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হয় যে, পৃথিবী গোল। পৃথিবীর আ-

কার অন্য প্রকার, এ কথা কেহ বলিলে চড় খাইতে হইবে। তাহা হইলেই ছেলেরা ঐ রূপ শিখিয়া গেল। কস্মিন্ কালেও ভুলিবে না, ভুলিলে তাহাদের বাপ নির্ব্বংশ!

আমরা ঐতিহাসিক তরঙ্গে বলিয়াছি আমাদের সমুদায়ই অনুবাদ। আমাদের দেশের কোন বিষয় জানিতে হইলে, হয় ইংরাজী ভাষায় পাইবে, অথবা যদি কোন অর্থ লোলুপ মহাশয় তাহার অনুবাদ করিয়া থাকেন, তবে তাহা দেখিলে কথঞ্চিৎ হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন হইতে পারে। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, "কথঞ্চিৎ তৃপ্তিসাধন" বলিবার উদ্দেশ্য কি? আমরা অনুবাদ এবং অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া আমাদের প্রকৃত উচ্চারণ গুলি ভুলিয়া যাইলাম। আর আমরা এখন পেঁড়ো বলি না, টিকিট লইবার সময় 'পাণ্ডুয়া' বলিয়া থাকি। কৃষ্ণগঞ্জ না বলিয়া 'কিশেন গন্জ' বলি। কলিকাতা নাম আর মনে আইসে না, 'ক্যালক্যাটা' বলা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। হাবড়া চুলোয় গিয়াছে, এখন তাহার পরিবর্ত্তে হাওড়া না বলিলে অনেকে বিরক্ত হয়েন। এই স্থলে একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে না বলিয়া থাকিতে পারা গেলনা। "নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক" একথাই বা বলি কেন? "হাবড়া" এই শব্দের যিনি রুট—থুড়ি—মূল জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার পক্ষে ইহা নিতান্ত উপাদেয় হইবে। এই জন্যই ইহাকে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াও শেষে গিলিয়া ফেলিতে হইল।

এক জন সাহেব ও তাঁহার বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত নৌকা যোগে হাবড়ার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। তথাকার সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইবার পর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "পণ্ডিত! জায়গার নাম হাবড়া, টার মানে কি আছে?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন, 'এক বুড়ি কতক গুলি তালের বড়া লইয়া এই ঘাটের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সে সময়ে জোয়ার আসিয়া তাহার বড়া ভাসিয়া যায়, সে তখন "হা—বড়া" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, এই জন্যই এই স্থানের নাম "হাবড়া" হইয়াছে।' যেমন কালিদাস, তেমনি মল্লিনাথ। কলিকাতা সম্বন্ধেও এই প্রকার একটী প্রবাদ আছে।

ভূগোলকে সাধে ভূয়োগোল বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি না। পবিত্র সলিলা গঙ্গা দেবী ছাপ ঘাটীর মোহানায় আসিয়া নাম হারাইলেন; তথা হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম হইল ভাগীরথী; আবার তথা হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত হুগলী নামে

জাহির হইলেন। পদ্মার নামোল্লেখও অনেক ভূগোল গ্রন্থে দেখিতে পাই না। পদ্মা ও মেঘনা প্রভৃতি গঙ্গা নামেই অভিহিত। ভূগোল পাঠ করিলে এরূপ গাঁজা, খুরী দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ মধ্যে মথুরা যে একটী বিখ্যাত পবিত্র স্থান, তাহা আমাদের বালকেরা ইংরাজী ভূগোল পাঠ করিতে গিয়া জানিতে পারে না। তাহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মুট্‌রা নামে একটী নগর আছে তাহাই শিখিয়া রাখে। এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। পাঠক মহাশয়রা একটু বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবেন। এই জন্যই বলি ভূয়োগোলে সময় নষ্ট করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

বিমলা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? তুমি মনুষ্য, প্রভুতা, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধরণীকে তৃণবৎ মনে করিতেছ, কিন্তু তুমি জান কি এখনই তোমার এ গর্ব্বের কি পরিণাম ঘটিতে পারে? মনুষ্য এ সংসারে, অন্ধকার গৃহ মধ্যে বিহঙ্গমের ন্যায়, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জানে না কোন দিকে পথ বা কোন দিকে প্রতিবন্ধক। মনুষ্য যাহা মনে ভাবিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, হয়ত তাহা হইতেছে না। নয়ত বা ঘটিয়া যাইতেছে। কিন্তু স্থির কি? তুমি যাহা স্থির ভাবিতেছ, তাহা তো স্থির নয়; সকলই অস্থির। এ সংসারে প্রতি কাণ্ডই অস্থির। ব্যবসায়ী! অর্থাগমের উপায় অন্বেষণার্থে তুমি কতই ফাঁদ পাতিতেছ, যশার্থী! স্বকীয় নাম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি মানববদনে অহর্নিশ সমুচ্চারিত শুনিতে কতই চেষ্টা করিতেছ, প্রেমিক! প্রণয়ের পূত ভাণ্ডার আয়ত্ত করিয়া প্রণয়িনীর পীযুষ পূরিত মুখারবিন্দ অতৃপ্তনয়নে অনন্তকালের নিমিত্ত সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত সংসারের সমস্ত বিপদ তুমি বিদলিত ও উপেক্ষা করিতেছে, বিদ্বান্! বিদ্যার নির্ম্মল সলিল রাশির উপরে নিরন্তর অকাতরে একসীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সন্তরণ দিবার নিমিত্ত তোমার চিত্ত নিয়ত ব্যাকুল রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জান কি, তোমাদের এ সকল চেষ্টার কি পরিণাম হইবে? এত সাধে

কি বাদ জুঠিবে, তাহা কে জানে? কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? আশা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা সকলই বলিতেছে বাসনার ষোল কলা পূর্ণ হইবে। কিন্তু কই, তা হয় কই? কই, মনের আশা মিটে কই? মনের সাধ মনেই রহিয়া যায়, তাহা সফল হয় কই? এ জগতে কাহার আশা মিটিয়াছে? কে বলিয়াছে আকাঙ্ক্ষার সীমা দেখিয়াছি? আলেকজণ্ডর বলিলেন,—"জগতে আর এমন রাজ্য নাই যে, আমি অধিকার করি।" নিউটন বলিলেন,—"বিদ্যা সমুদ্র যেমন তেমনি আছে, আমি কেবল তাহার তীরস্থ লোষ্ট্র সঞ্চয় করিয়াছি।" আর্কিমিডিজ বলিলেন,—"কোথাও এমন স্থান নাই যে আমি তথায় স্ক্রু যন্ত্র স্থাপন করিয়া পৃথিবীটাকে সরাইয়া দি।" আর কাহার কথা বলিব? কাহার সাধ মিটিয়াছে, কাহার আশা সফল হইয়াছে? কে বলিবে যে, আমি জগতে মনের বাসনা মিটাইয়া চলিলাম। ভ্রান্ত আশার প্রতিপদে বিঘ্ন। বাসনায় বিস্তর বাধা। তুমি যাহা স্বপ্নেও ভাব নাই, ভ্রমেও মনে স্থান দেও নাই, এমন অননুভূত পূর্ব্ব অভ্যাগত বিপদ সমুপস্থিত হইয়া তোমার সমস্ত আশা স্রোতের জলে ভাসাইয়া দিতে পারে, তোমার সমস্ত সাধে বিষাদ ঘটাইয়া দিতে পারে, তোমার সমস্ত বাসনার মূলে গরল ঢালিয়া দিতে পারে, তোমাকে জীবন্মৃত করিয়া দিতে পারে। কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? ব্যবসায়ী! হয়ত তোমার কার্য্যের অভ্যন্তর অসাবধানতা কীটে এমন জর্জ্জর করিতেছে যে, সহসা তোমার সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়া গিয়া একদিনে তুমি পথের ফকির হইতে পার, যশার্থী। তোমার অজ্ঞাতসারে তোমারই নিকটে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ এরূপ এক ব্যক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে যে, একদিনেই তাহার নাম তোমার সমস্ত আশা ভরসা অতল জলে নিলীন করিতে পারে। প্রেমিক! তোমার জীবন সর্ব্বস্বের কপট অনুরাগ ও উপেক্ষা হয়ত তোমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাকে চিরকালের নিমিত্ত অসার ও নীরস করিয়া দিতে পারে, বিদ্বান্! বিদ্বেষের তীব্র আক্রমণে তোমার অন্তরকে হয়ত চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য করিয়া দিতে পারে; সর্ব্বোপরি মৃত্যু আসিয়া সকল সময়েই আমাদের সকল বাসনার শেষ করিয়া দিতে পারে। তবে, কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? কালিকার কথা আজি কেহ বলিতে পারে না বলিয়াই তো সংসারে এত গোল ও এত অসুবিধা। কালিকার কথা আজ কেহ বলিতে পারে না বলিয়াই তো আজ্ অবন্তীপুরের যোগেশ হরিপাড়ার নরেন্দ্রের

পার্শ্বে উপবিষ্ট। কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? যোগেশ কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইতেছিলেন, কিরূপ বিপদে ও কিরূপ ঘটনায় এই অচিন্তিত পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া উপস্থিত! কোথায় প্রাণাধিকা বিমলার সন্ধানার্থ যোগেশ মাথায় সাপ বাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, না কোথায় অজ্ঞাত ব্যক্তির বিষম আঘাতে মৃতপ্রায়! যোগেশ সে আঘাতে মরিলেন না। কিন্তু তখন তাঁহার অবস্থা মৃতবৎ হইল। নির্ব্বোধ বাহকেরা ক্ষণঃ পরে তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া ভাবিল যে এ হত্যার জন্য হয়ত তাহাদিগকে দায়ী হইতে হইবে। তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে পলায়ন করিল। হত্যাকারী একজন হইলেও তাহাদের সম্প্রদায় ছিল। তাহারা ভাবিল মৃতদেহ দূরে রাখিয়া আসিলে সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে। হরিপাড়ার নীচে অন্ধকার রাত্রে তাহারা দেহ গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিল। দেহ নীরে পড়িলনা। ঘটনাক্রমে তাহা নরেন্দ্র মনোরমার চক্ষে পড়িল। তাঁহাদের দয়াতে মৃত দেহে জীবনের আবির্ভাব হইল। তাই বলি, এ সংসারে কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে?

বলা বাহুল্য, নরেন্দ্র মনোরমার সহিত যোগেশের যৎপরোনাস্তি আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। যোগেশ এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। যোগেশ নরেন্দ্রকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে মনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। নরেন্দ্র যোগেশকে ভদ্রতার উচ্চ আদর্শ জানিয়া স্বীয় মনের মধ্যে প্রবেশ অধিকার দিয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে, পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাতে মনোরমাও ঐ উপযুক্ত বন্ধুকে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা জানাইয়াছেন। মনের বেদনা মনে পুষিয়া রাখা বড় বালাই। এ সংসারে উপযুক্ত পাত্রে বেদনা ঢালিয়া দেওয়াই ভাল। একের ভারের অন্যে যদি অংশ লয়, তাহায় হানি কি? মনোরমা মনের কথা যোগেশকে বলিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহার উপকারই হইয়াছে। যোগেশ তাঁহাকে পরম সমাদর করিয়াছেন, ঘৃণা করেন নাই ও অত্যাচারীকে দণ্ড দিয়া প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন বলিয়াছেন। মনোরমার আনন্দের সীমা নাই।

সায়ংকালে নরেন্দ্র ও যোগেশ বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। যোগেশ বলিতেছেন,—

"তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব? তবে আমার বিশ্বাস যে রুদ্রকান্তের নিয়োজিত ব্যক্তি আমাকে মারিয়াছিল।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—

"আমারও তাহাই বোধ হয়।" যোগেশ কহিলেন,—

"কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! পাপে পাপে রুদ্রকান্তের হৃদয় এমনি অষাঢ় হইয়া গিয়াছে যে, কোনরূপ দুষ্কর্ম্মই তাহার পক্ষে এক্ষণে আর অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।"

"আর অধিকদিন তাহাকে ওরূপ করিতে হইবে না। তাহার সর্ব্বনাশ নিকট। এখনকার সংবাদ অবগত আছ?"

যোগেশ ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন,—

"না।"

"আমি বিমলার সন্ধান পাইয়াছি।" যোগেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সমধর্ম্মী যন্ত্রের ন্যায় নরেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। যোগেশ নরেন্দ্রের বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিলেন,—

"নরেন্! তোমার ভ্রান্তি হইয়াছে!"

এতক্ষণে যোগেশের চক্ষু দিয়া এক ফোটা, দুই ফোটা, তিন ফোটা, বহু ফোটা জল পড়িল। নরেন্দ্র যোগেশের হস্ত হইতে স্বীয় হস্ত নির্ম্মুক্ত করিয়া কহিলেন,—

"না যোগেশ! ভ্রান্তি নহে। তুমি আজি আমায় নিরুৎসাহ করিও না। আমার উদ্যম তুমি নষ্ট করিও না। রুদ্রকান্ত আমার হৃদয়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে, আমার শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। আমি দরিদ্র, অক্ষম, দীন, ভিক্ষুক; আমি সেই সমস্ত জ্বালা নীরবে সহ্য করিতেছি। কিন্তু যোগেশ! আর না। এত দৌরাত্ম্য আর সহা যায় না। পাপিষ্ঠ কামিনী-কুসুম বিমলাকে আনিয়া বলরামপুরের কুঠীতে রাখিয়াছে, একথায় কোন সন্দেহ নাই। এই মর্ম্ম-ঘাতী কথা আজি আমার কর্ণ-গোচর হইল। যোগেশ! এক জন মানুষের এত অত্যাচার অসহনীয়। আমি দরিদ্র হই, আর যাহাই হই, আমি এত দৌরাত্ম্য আর সহিব না।"

নরেন্দ্রর চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত হইল, বদন রক্তবর্ণ হইল। শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া উপবেশন করিলেন। যোগেশ ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া কহিলেন,—

"ভাই! উপায়?"

নরেন্দ্রর চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। কহিলেন,—

"যোগেশ! উপায় কি নাই? ধনবানের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভের কি উপায় নাই? দরিদ্র নীরবে অত্যাচার সহ্য করিবে, ইহাই কি ব্যবস্থা? অবশ্য উপায় আছে। আমি ইহার উপায় করিব।"

যোগেশ কহিলেন,—

"সূর্য্যকুমারের নিকট কখন লোক পাঠাইয়াছ ?"

"অদ্য প্রাতে।"

"সে লোক কতক্ষণে রামনগরে পঁহুছিয়াছে ?"

"দ্বিপ্রহরের মধ্যে।"

"সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র যদি সূর্য্যকুমার যাত্রা করেন, তাহা হইলে কতক্ষণে এখানে আসিয়া পঁহুছিবার সম্ভাবনা।"

"সন্ধ্যার মধ্যে।"

"সন্ধ্যা তো হইয়া গেল। সূর্য্যকুমার তো আসিলেন না।"

"বোধ হয়, অদ্য আসিবেন না।"

বলিতে বলিতে বাহিরে বাহকগণের-কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ শ্রবণ করা গেল। নরেন্দ্র ও যোগেশ ব্যস্ততা সহকারে বাহিরে গমন করিলেন।

সিরাজ-উদ্দৌলা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অত্যাচারের দণ্ড দিবার নিমিত্ত সিরাজের মন এত ব্যগ্র হইয়াছিল যে, কলিকাতা আক্রমণ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করাও তাঁহার পক্ষে অবৈধ ও অসহ্য বিবেচিত হইল। সিরাজের প্রকৃতি বিচক্ষণতা সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, নিরতিশয় হঠকারিতা তাঁহার স্বভাবের অনপনেয় অঙ্গ বলিয়া উপলব্ধ হইবে। ধীরতা ও স্থিরতা সহকারে কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যে কার্য্য তিনি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিতেন, তৎসম্পাদনার্থ বিপুল আয়াস, প্রযত্ন, ব্যয় সকলই তিনি তুচ্ছ করিতেন। দুরন্ত ইংরাজগণকে পরাভূত করিয়া, তাহাদিগের দুর্গোপরি স্বীয় বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে, তাঁহার বেগবতী বাসনা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, তজ্জন্য তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে কলিকাতার দ্বার-সমীপে উপস্থিত হইয়া রণ-ভেরী নিনাদিত করিয়া ইংরাজ-হৃদয়ে ভীতি সমুৎপাদন করিবার নিমিত্ত সিরাজ-উদ্দৌলা স্বীয় সৈন্য সামন্তকে অসাধারণ বেগে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি ক্লিষ্ট হইল। নিদারুণ ক্লান্তিহেতু বিস্তর সেনা মানবলীলা সম্বরণ করিল। * নিতান্ত উদ্ধত স্বভাব ও হঠকারী সিরাজ-উদ্দৌলা সে

* History of British India, by Hugh Murray, F. R. S. E., and History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan, by Robert Orme, F. A. S.

সমস্ত অনিষ্টই অকাতরে উপেক্ষা করিলেন। ১৫ ই জুন তারিখে (৭ দিন পরে) নবাবের সৈন্য হুগলীতে উপস্থিত. হইল। চুঁচুড়া ও চন্দননগরস্থ ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগকে সিরাজ পূর্ব্বেই পত্র লিখিয়াছিলেন যে, কলিকাতা আক্রমণ-ব্যাপারে তাঁহাদের নবাবকে সৈন্যাদি দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। অধুনা নিকটস্থ হইয়া সিরাজ সেই সাহায্য প্রদানের আজ্ঞা করিলেন; কিন্তু উক্ত উভয় জাতিই ইউরোপে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি-বন্ধনে বদ্ধ আছেন বলিয়া সাহায্য-দানে বিমুখ হইলেন। সিরাজ এ ঘটনায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে বিশেষ বুদ্ধি সহকারে সে রাগ অব্যক্ত রাখিলেন। *

১৬ই জুন তারিখের ঊষা-কালে শত্রুর আগমনবার্ত্তা কলিকাতাস্থ ইংরাজগণের কর্ণ-গোচর হইল। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সমরের সম্ভব মত ব্যবস্থা বিহিত হইল এবং নগরস্থ ইংরাজ রমণীগণ স্ব স্ব ভবন পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেশীয় অনেকেই পূর্ব্বেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিল; যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও এই সমাগত-প্রায় দুর্নিবার বিপদ-বাত্যার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি-লাভ-লালসায় পলায়ন পরায়ণ হইল। কে কোথায় যাইতে লাগিল, তাহার স্থিরতা বা লক্ষ্য থাকিল না। শিশু সন্তানাদি লইয়া তাহাদের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা রহিল না। দুর্গে স্থানাধিক ছিল না। আহারের আয়োজন আরও হীন। গোলে মিশিয়া প্রায় দুই সহস্র নগরবাসী পর্ত্তুগীজ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। * অপরাহ্নে নবাবের সৈন্য-প্রমুখ ইংরাজগণের নেত্র-গোচর হইল।

সিরাজ প্রথমেই নগরাক্রমণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্র খাতে তাঁহার আক্রমণের ব্যাঘাত জন্মাইল। সে রাত্রে নবাবের প্রযত্ন সমস্ত বিফল হইল। পরদিন প্রত্যূষে কার্য্য আরম্ভ হইল।

১৮ ই জুন প্রাতে নবাব নগরাক্রমণ আরম্ভ করিলেন। যেরূপে যুদ্ধ কার্য্য চলিতে লাগিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। † ইংরাজগণ আত্মরক্ষার নিমিত্ত যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে চেষ্টায় কোন ফল দর্শিল না। সামান্য সৈন্য-বল সহায়ে বিপুল বল বিক্রম বিশিষ্ট নবাবের সম্মুখীন হওয়া এবং স্বেচ্ছায়

* Ibid.

* Orme's Indostan Vol. II.

† Orme এই যুদ্ধের বিশেষ ও বিস্তারিত বিবরণ প্রকটিত করিয়াছেন।

জ্বলন্ত চিতায় লম্ফ দেওয়া একই কথা। নিস্তারের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, তাঁহারা সকলে এক মত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। স্থির হইল যে, মহিলাবৃন্দ ও দ্রব্য সামগ্রী সমস্ত তরণীযোগে স্থানান্তরিত করা বিধেয়। তদনুসারে সেই রাত্রেই দুই জন তত্ত্বাবধায়কের অধীনতায় সিমন্তিনীগণকে নৌকায় অধিষ্ঠিত করা হইল। তত্ত্বাবধায়কদ্বয় ভাবিলেন যে, পুনর্ব্বার দুর্গে প্রত্যাগমন করা মরিবার কারণ। তাঁহারা সেই বিবেচনায় সিমন্তিনীদলে মিশিয়া পলায়ন করিলেন! *

রাত্রি দুইটার সময় দুর্গের গবর্ণর দ্রেক ও সেনানায়ক মিন্‌চিন প্রভৃতি সমবেত হইয়া এক সভা করিলেন। কিন্তু যখন মস্তকোপরি ঊর্ণাসূত্রে অসি বিলম্বিত রহিয়াছে, তখন প্রকৃতিকে স্থির করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। পলায়ন করা অবধারিতই হইয়াছিল, কিন্তু কোন সময় পলায়ন করা বিধেয় তাহাই নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত সভা সমবেত হইয়াছিল। সভ্যেরা দুই ঘণ্টা কাল মস্তক বিঘূর্ণিত করিলেন কিন্তু কিছুই মীমাংসা হইল না। *

প্রাতে অবশিষ্ট নৌকা সহায়ে পর্ত্তুগিজ নারি-মণ্ডলি ও শিশুগণকে বিপন্মুক্ত করা বিধেয় বিবেচিত হইল। দুর্গস্থ তাহাতেই জ্ঞাত ছিল যে, পলায়ন করাই অবধারিত হইয়াছে। সভা যে সময় স্থির করেন নাই এ সংবাদ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। ভ্রান্তি হেতু সভ্যেরা এ বিষয়ে কোন অবধারিত আজ্ঞাও প্রচার করেন নাই। প্রাতে রমণীগণকে নৌকাস্থ করিবার সময় ভয়ানক কলরব, কোলাহল, বিশৃঙ্খলা ও বিপদ উপস্থিত হইল। প্রাণ সকলের পক্ষেই অমূল্য সম্পত্তি। সকলেই স্ব স্ব জীবনকে বিপন্মুক্ত করিবার চেষ্টায় সজোরে নৌকায় উঠিতে লাগিল। কে কাহাকে নিষেধ করে, কে বা কাহার আদেশ পালন করে? এইরূপে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত হওয়ায় অনেক গুলি নৌকা ভগ্ন, চূর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া আরোহী সমেত ডুবিয়া গেল। আরোহীগণ অনেকে নদী-নীরে জীবনত্যাগ করিল; অনেকে স্রোতোবেগে পরিচালিত হইয়া তীর দেশে নীত হইল ও মুসলমানগণের কর-কবলিত হইল। নবাবের লোকেরা তীর হইতে নৌকা সমস্ত

* "Two civil servants, named Manningham and Frankland volunteered to superintend the embarkation of the females and having on this pretence quitted the scene of danger, refused to return."
Thornton's History of British India Vol. I. Page 190.

* Orme's Indotsan. Vol. II P, 669.

ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আরোহীগণ সেই ঘোর বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার উদ্দেশে গবর্ণর সাহেবের অনুমতি ব্যতীত আপনাদের নৌকা ছাড়িয়া গোবিন্দপুরের নীচে নোঙর করিল। এই স্থানে পূর্ব্বাগত নৌকা সমস্ত নোঙর করিয়াছিল।

ইংরাজ দুর্গে বিপদ, বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার একশেষ বিরাজ করিতে লাগিল। প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দ্দিকে ঘোর গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। দুর্গ রক্ষার কথা ভুলিয়া সকলেই আত্মরক্ষনে নিযুক্ত হইল। সেই ভয়ানক রঙ্গভূমির একজন অভিনেতা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "যে সময় হইতে আমরা দুর্গ রক্ষণে, ব্যাপৃত হইলাম, সে সময় হইতে অব্যবস্থা, কোলাহল ও গোল ভিন্ন কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। প্রত্যেকেই উপদেশ প্রদানে অগ্রসর, কিন্তু কেহই সে কার্য্যের যথার্থ উপযোগী নহেন।" * গবর্ণর সাহেবের রণ নৈপুণ্য ছিল না। কিউপায় করিলে এই অনির্ব্বচনীয় বিপদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যাইবে, তাহার কোন সদ্যুক্তি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার যখন এতাদৃশ অবস্থা, সেই সময় এক জন লোক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, দুর্গে এখন যে বারুদ মজুত আছে তাহা ভিজা, সুতরাং অনাবশ্যক ও অকর্ম্মণ্য। ড্রেক সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! যে সামান্য বারুদ আছে তাহাও কার্য্যের উপযোগী নহে! কি ভয়ানক! যাহা হউক ড্রেক এ কথা আর প্রচার করিতে দিলেন না। বুঝিলেন যে, আর নিস্তার-আশা দুরাশা। অনর্থক সিরাজের হস্তগত হইয়া জীবনপাত করা অপেক্ষা পলায়ন করা বুদ্ধির কার্য্য বিবেচনায়, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, জাতীর মমতা ত্যাগ করিয়া, স্বীয় নামে অনপনেয় কলঙ্ক ঢালিয়া, দুর্গকে ঘোর অব্যবস্থিত রাখিয়া, ভীত ড্রেক অবশিষ্ট দুই খানি নৌকার এক খানিতে উঠিয়া পড়িলেন। স্বয়ং গবর্ণর এরূপ করিলে আর সকলে আরও ভীত হইতে পারে। ড্রেকের দৃষ্টান্তের অনুসরণক্রমে আরও কয়েক জন কর্ম্মচারী নৌকারোহণে পলায়ন করিলেন। *

* Cook's Evidence in first Report of Select Committee of House of Commons.

কুক এই ভয়ানক ব্যাপার মধ্যে এক জন প্রধান অভিনেতা। তিনি তৎকালে কলিকাতার গবর্ণর কৌন্সিলের সেক্রেটরি ছিলেন।

* Among those who left the factory in this unaccountable manner, were, the Governor Mr. Drake, Mr. Macket, Captain Commandant Minchin,

ড্রেকের এবম্বিধ বিসদৃশ ব্যবহারে দুর্গের ভাবতেই অযথা ক্ষুণ্ণ হইল এবং পলাতকগণকে মর্ম্মান্তিক গালি দিতে লাগিল। কৌন্সিল সভার প্রধান সভ্য পিয়ার্কস্ সাহেব, হলওয়েল সাহেবকে দুর্গের সাশন ভার সমর্পণ করিলেন। রণতরির ও দুর্গের সৈন্য সংখ্যা অধুনা ১৯০ জন মাত্র ছিল। অবশিষ্টেরা অতঃপর পলাইতে না পারে, এই জন্য নুতন গবর্ণর হলওয়েল দুর্গের পশ্চিম-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বিপক্ষেরা ঘোরতর রূপে দুর্গ আক্রমণ করিল। তাহারা দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ গৃহ সমূহে অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। হলওয়েল দেখিলেন, সৈন্য সংখ্যা সম্বর্দ্ধিত না হইলে, এ ঘোর বিপদ-সাগর হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা অসম্ভব। এজন্য গোবিন্দপুরের নিম্নস্থ পলাতক নৌকা সমূহকে বার বার বিবিধ উপায়ে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক খানি নৌকাও সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল না। হলওয়েল সেই অকুল বিপদ-বারিধি মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন। *

and Captain Grant.'' *Cook's Evidence in first Report of Select Committee of House of Commons.*
পলায়ন সময়ে মীরজা আমীর বেগ নামক জনৈক মুসলমান বিশেষ উদারতা সহ কতকগুলি ইংরাজ মহিলার ধন, মান ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। Seir mutaqherin প্রণেতা তাহার, বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। Seir mutaqherin Vol I P. 721.

* Thornton এই উপলক্ষে উক্ত কাপুরুষ ইংরাজগণের চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন। পলাতকেরা পুনরায় দুর্গস্থ জাতীয়বৃন্দের সাহায্য না আসায় তিনি বিশেষ দোষ দিয়াছেন। আমরা তাঁহার বাক্য উদ্ধার করিলাম।
"Ignobly as they had abandoned their proper duties, it could not be believed that, when the consciousness of personal safety had calmed their agitation and time had afforded opportunity for reflection, they would coolly surrender a large body of their country men to the mercy of a despot, whose naturally cruel disposition was inflamed by the most savage hatred of the English.'' *The History of the British Empire in India*, by, Edward Thornton. Vol. I Page 191.

Cookও পলাতকগণের উক্তবিধ বিসদৃশ ব্যবহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাত্মা Orme পলাতকগণের এবম্বিধ ব্যবহার হেতু বিশেষ আক্ষেপ সহকারে তাহাদিগের এই জ্বলন্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।
"Never perhaps was, such an opportunity of performing an heroic action so ignominiously neglected; for a single sloop with fifteen brave men

ইংরেজেরা সতত জাতীয় চরিত্রের সবিশেষ গৌরব করিয়া থাকেন। স্বজাতি স্নেহ, দয়া, মমতা, সাহস, বীর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের আদর্শ-স্থল বলিয়া তাঁহারা অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিকাতার এই ব্যাপার সম্যক্‌ আলোচনা করিলে, তাঁহাদিগকে পশু, পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জীব বলিয়া অনুমান হয়। বহুসংখ্যক স্বজাতি মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হইয়া জীবন-মুক্তির জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন, আর আমরা আত্ম-জীবন নিরাপদ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া আমোদ দেখিতেছি, এ প্রবৃত্তি নিতান্ত অসৎ, নীচ ও ঘৃণার্হ। যে ব্যক্তির হস্তে সকলের জীবন, মান, সম্ভ্রম ও সম্পত্তি ন্যস্ত রহিয়াছে, সে ব্যক্তি সেই সমস্তকে অদৃষ্টের উপর রাখিয়া ভীরু, কাপুরুষের ন্যায় স্বীয় জীবন লইয়া পলায়ন করিল, তাহারই বা এ কি ব্যবহার! কলিকাতার এই ব্যাপার ইংরাজ চরিত্রের নীচতা ও অসারতা পরিষ্কার রূপে ঘোষণা করিতেছে। *

পরদিন প্রত্যূষে বিপক্ষেরা নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিল। হলওয়েল সাহেব সাধ্যমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এ সকলই বৃথা প্রযত্ন হইতেছে। দুর্গের অনেকে তাঁহাকে সন্ধি সংস্থাপনার্থ অনুরোধ করিতে লাগিল। তিনিও অগত্যা তাহাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, উমিচাঁদকে ইংরাজগণ দুর্গ মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই উমিচাঁদ এই সময়ে বড় কাজে লাগিল। উমিচাঁদ ইংরাজগণের অনুরোধক্রমে মানিকচাঁদ নামে নবাবের জনেক সৈনাধ্যক্ষকে পত্র লিখিলেন। সেই

on board, might, in spite of all efforts of the enemy, have come up, and anchoring under the fort, have carried away all who suffered in the dungeon. *Ormes Indostan* Vol. II. Page 78.

* Lord Macaulay এই ব্যাপারে কোনই দোষ দেখিতে পান নাই। স্বজাতি সম্বন্ধে তিনি সতত অন্ধ, বিজাতীয় ব্যাপারে তিনি সহস্রলোচন। তিনি অতি সোজা কথায় এই লোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

"The Governor who had heard much of Surajah Dowlah's cruelty, was frightened out of his wits, jumped into a boat, and took refuge into the nearest ship." *Macaulay's Essay on Lord Clive.*

পত্রে লিখিত ছিল যে, ইংরাজগণ নবাবের তাবৎ আজ্ঞা পালন করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল সম্ভ্রম ও জীবন রক্ষার জন্য তাঁহারা দুর্গ রক্ষা করিতেছেন, অতএব নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিবে। * ঐ পত্র দুর্গের প্রাচীরের উপর দিয়া নীচে ফেলিয়া দেওয়া হইল। বেলা ৪ টার সময় সন্ধি বিজ্ঞাপক পতাকা হস্তে এক ব্যক্তিকে শত্রু মধ্য হইতে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। হলওয়েল সাধারণের অনুরোধানুসারে দুর্গ হইতে এক পতাকা দেখাইয়া তাহার উত্তর জ্ঞাপন করিলেন। মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য নিবৃত্ত হইয়া গেল।

বেলা পাঁচটার সময় বিজয়ী সিরাজ-উদ্দৌলা, সেনা নায়ক মীর-জাফর এবং অপরাপর প্রধান কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ উমিচাঁদ ও কৃষ্ণদাস তাঁহার সমক্ষে সমানীত হইলেন। নবাব তাঁহাদিগকে ভদ্র ব্যবহারে আপ্যায়িত করিলেন। কোম্পানীর ভাণ্ডার আত্মসাৎ করিয়া নবাব এক সুপ্রশস্ত গৃহে উপবেশন করিলেন এবং বিজয় হেতু উল্লাসে রত হইলেন। নবাবের আজ্ঞাক্রমে হস্ত-বদ্ধ হলওয়েল সাহেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নবাব ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের যে প্রকার বিস্তৃত বাণিজ্য, তাহাতে তাহাদের সম্পত্তি অপরিমিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দেখিলেন, ভাণ্ডারে ৫০,০০০ সহস্রের অধিক টাকা নাই। তিনি ভাবিলেন অবশ্যই আরও অর্থ লুকায়িত আছে। হলওয়েল উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাদের প্রগল্‌ভতা হেতু ভৎসনা করিলেন এবং সম্পত্তির হীনতা হেতু অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। যাহাই হউক নবাব হলওয়েল সাহেবের বন্ধন মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বীয় বীরতার উল্লেখ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কেহ তাঁহার বা তাঁহার সঙ্গীর কেশও স্পর্শ করিবে না। এই রূপে বার বার আশ্বাস দিয়া নবাব হলওয়েলকে বিদায় দিলেন। সে দিন আরও দুইবার হলওয়েলের সহিত নবাব বাহাদুরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নবাব একবারও ভ্রমেও অসদ্ব্যবহার করেন নাই বরং প্রতিবারেই তাঁহাদের শান্তি সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছেন। *

* Orme's Indostan Vol. II Page 72.

* Mills History of British India Vol. III-Page 117.
Orme's Indostan Vol. II Page. 73

নবাবের প্রকৃতি পরীক্ষার এই এক উপযুক্ত অবসর। নবাব যে স্বীয় নিষ্ঠুরতা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কলিকাতা আক্রমণ করেন নাই, এই ঘটনা তাহার সম্যক সাক্ষী দিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ও ঘটনাস্থলে বিবৃত করিয়াছি যে, প্রত্যুত ইংরাজগণ অন্যায় ব্যবহারে নবাবের ক্রোধ উদ্দীপন করিয়াছিলেন। সুদূর পরাহত, স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, ব্যবসায় ও জাতিভুক্ত অজ্ঞাত পূর্ব্ব, অপরিচিত জাতি আসিয়া নবাবের রাজ্য মধ্যে তাঁহার ক্ষমতা, প্রভুতা ও বিক্রমের অপহ্নব করিয়া যথেচ্ছাচার ব্যবহার করিবে, ইহা কদাচই অনুমোদনীয় নহে। বোধ হয় লার্ড মেকলেও ইহার সদ্যুক্তি নিরাকরণ করিতে সক্ষম হইবেন না। নবাব সেরূপ অন্যায় ব্যবহারের সম্যক প্রতিফল দিবেন, কে তাঁহার নিন্দা করিবে? নবাবের কলিকাতা আক্রমণ ও তাহা অধিকার করা উচিত কার্য্য হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অধিকারেরপর সিরাজ বন্দী ইংরাজগণের সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা আশাতিরিক্ত। কখন কোন বিজেতা বিজিতগণের সহিত তাদৃশ সৌজন্য করে কি না সন্দেহ। সমগ্র ইংলণ্ড ইতিহাস গবেষণা করিয়া এরূপ অসামান্য উদারতার একটী উদাহরণও নিরাকরণ করা সুকঠিন। সিরাজ-উদ্দৌলার চরিত্রচিত্র যেরূপ কদর্য্য বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে এবং তাহাতে যেরূপ মনোমদ রূপে তুলিকা বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে এরূপ সৌজন্য কখনই আশা করা যায় না। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ সিরাজের চরিত্র চিত্রিত করিতে যে স্বেচ্ছাচার প্রকাশ করিয়াছেন, নবাবের এই ব্যবহার তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। কে তাহার সমর্থন করিবে?

এইরূপে কলিকাতা বিজয় ব্যাপার সমাপ্ত হইল। এব্যাপার সামান্যই হউক বা মহৎই হউক, নবাব ইহাতে শ্লাঘা করিতেন। তিনি ইংরাজদিগকে বড় দুষ্ট শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদের দমন করায় তাঁহার অন্তর নিতান্ত আনন্দিত হইল।

এই দিবস রাত্রে এক ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হয়। তাহার বিবরণ পর পরিচ্ছেদে বক্তব্য।

"With a humanity that ill-accords with the ferocity imputed to him he ordered their bonds to be removed, and pleged his word as a soldeir for their personal safety." *Empire in Asia By M. Torrens.*

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকূপ-হত্যা।

এই ঘোর ভয়াবহ ও শোচনীয় ঘটনা নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার নাম ইংরাজ সমাজে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। অন্ধকূপ-হত্যা নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এ সম্বন্ধে ঔচিত্যাচিত্ত ও ইহার দোষাদোষ আমরা পরে বিচার করিব। অধুনা ইংলণ্ডীয় ঐতিহাসিকগণ এই ভয়ানক ঘটনার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহাই অবিকল সংগ্রহ করিতেছি।

সিরাজ-উদ্দৌলা হলওয়েল সাহেবকে বিদায় দিয়া বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলেন। *। হলওয়েল স্বীয় হতভাগ্য সঙ্গীগণ সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। বন্দী ইংরাজগণ যে স্থানে অপেক্ষা করিতে ছিলেন সে স্থান তৎকালে ধূম সমাচ্ছন্ন ছিল। বন্দীগণ ভাবিলেন 'হয়ত এই ধূম দ্বারা আমাদিগকে রুদ্ধশ্বাস করিয়া বিনষ্ট করা হইবে। †। তাঁহাদিগকে তদবস্থায় রাখিয়া প্রহরীগণ সে রাত্রি বন্দীগণকে নিরুদ্ধ রাখিবার উপযুক্ত স্থানান্বেষণ করিতেছিল। রাত্রি ৮ আটটার সময় প্রহরীগণ সংবাদ দিল যে, উপযুক্ত স্থান দৃষ্ট হইল না। তখন প্রধান রক্ষক বন্দীগণকে পশ্চাতস্থ কোন গৃহে নিরুদ্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিল। *। যে গৃহে তাঁহাদিগকে রাখা স্থির হইল, তাহাই ইংরাজ দুর্গের কারাগৃহ। সেই ভয়ানক গৃহের নাম অন্ধকূপ (Black Hole) †। বন্দীগণের অনেকেই এই গৃহের বিবরণ জ্ঞাত ছিল; তাহারা শ্রবণ মাত্র মহা উদ্বিগ্ন হইল ও আপত্তি করিতে লাগিল। প্রধান রক্ষক আজ্ঞা দিল,' যে ব্যক্তি গৃহ প্রবেশে অনিচ্ছু হইবে তাহাকে বধ কর। ‡। বন্দীগণ অগত্যা সেই ভয়ানক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রকোষ্ঠটির আয়তন বিংশতি বর্গ ফিট মাত্র। প্রকোষ্ঠের তিন দিকে বায়ু বা আলোক নির্গমনের কোনই পথ ছিল না। এক দিকে লৌহ দণ্ডাচ্ছন্ন দুইটী গবাক্ষ ছিল। § কিন্তু সে গবাক্ষদ্বয়ও বারাণ্ডায় অবরুদ্ধ।

* Macaulay's Esssay on Lord clive Vol II P99.

† Orme's Indostan Vol II, P. 73, Murray's History of British India Page 317.

* Orme's Indostan Vol. II, P. 74.

† Mill's History of British India Vol. III, P. 11 7. Taylor's Manual of Indian History P. 423.; Murray's British India P. 317.; Orme's Indostan Vol. II, P. 74

‡ Orme's Indostan Vol. II, P.74.

§ Thornton's British India Vol. I. P. 193

এই সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ মধ্যে একশত ছচল্লিশ জন শ্বেতকায় বন্দী অবরুদ্ধ হইলেন।

দুরন্ত গ্রীষ্ম কালে, তুহিন-বর্ষী দেশ-নিবাসী বহু সংখ্যক ব্যক্তি সামান্য, সংকীর্ণ ও বায়ুবিহীন স্থানে অবরুদ্ধ হইলেন। প্রবেশ মাত্র বন্দীগণ বুঝিলেন যে, এই ভয়ানক প্রকোষ্ঠে, রজনী পাত করা দূরের কথা, ক্ষণেক অবস্থান করাও অসম্ভব। তাঁহারা দ্বার ভগ্ন করিয়া বাহিরে আসিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। *। হলওয়েল সাহেব একটি গবাক্ষ সন্নিধানে স্থান পাইয়াছিলেন। তিনি সকলকে যথোচিত প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন নিদারুণ যাতনায় দেহ অবসন্ন ও জীবন বিগত-প্রায় হইতেছে, তখন উপদেশে কি ফল? হলওয়েল এক জন প্রাচীন জমাদারকে কহিলেন যে, যদ্যপি সে বন্দীগণকে দুই প্রকোষ্ঠে ভাগ করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যুষে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। বৃদ্ধ চেষ্টা করিতে গেল কিন্তু হায়! ক্ষণ পরে আসিয়া বলিল "অসম্ভব।" হলওয়েল তাহাকে তদধিক অর্থ দিতে স্বীকৃত হইলেন। সে ব্যক্তি পুনরায় প্রস্থান করিল কিন্তু বন্দীগণের দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকতর দুরাশা বহন করিয়া প্রত্যাগমন করিল নবাব নিদ্রিত, কাহার সাধ্য তাঁহাকে জাগরিত করে? সুতরাং সমস্ত আশা দুরাশা। *

প্রতি মুহূর্ত্তেই বন্দীগণের যাতনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঘর্ম্মে তাঁহাদিগের দেহ আপ্লাবিত হইতে লাগিল, পরস্পর শরীর ঘর্ষণে চর্ম্ম উদ্ভ্রান্ত হইতে লাগিল, বায়ু অভাবে শ্বাসাবরোধ হইতে লাগিল। কেহ কেহ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ভূপতিত, পদ-বিদলিত হইয়া শমন সদনে প্রস্থান করিতে লাগিল। পুনরায় দ্বার ভঙ্গ করিবার প্রযত্ন হইল, কিন্তু সে চেষ্টা পূর্ব্বের ন্যায় নিষ্ফল হইল। বন্দীগণ তখন উন্মত্তের ন্যায় অস্থিরতাসহকারে "জল" "জল" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। করুণ হৃদয় জমাদার কয়েক ভিস্তি জল আনাইয়া দিল। কিন্তু তাহার এতাদৃশ অনুগ্রহে উপকার না হইয়া অনুপকার জন্মিল। দারুণ তৃষ্ণায় বন্দীগণ সকলেই নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। বারি দর্শন মাত্র, সকলেই তাহা পানার্থ এতাদৃশ ব্যগ্র হইয়া উঠিল যে, অগ্রে বাতায়ন সন্নিধানে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ঘোর কলহ ও যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনেকের বিগতপ্রায় জীবন এই ব্যাপারে অন্ত-

* Orme's Indostan Vol. II. P.74.

* Orme's Indostan Vol. H. 75.

মিত হইয়া গেল।*। নিষ্ঠুর ও নৃশংস প্রহরীগণ এই ঘোর শোকাবহ ব্যাপার মধ্যে স্ব স্ব জঘন্য প্রকৃতির সন্তোষ সমুৎপাদক আমোদ সন্দর্শন করিয়া উল্লসিত হইতে লাগিল।†। তৃষ্ণা নিবারণার্থ যুদ্ধে অনেকে বিগতজীব হইল। পুরোভাগস্থ ব্যক্তিগণ টুপিতে করিয়া পশ্চাতস্থ জনগণকে জল দিল। কিন্তু তাহাতে পিপাসার শান্তি না হইয়া অধিকতর সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। প্রকোষ্ঠের বায়ু অনবরত নিশ্বাস নিঃসৃত, স্বেদবারি নির্গত ও মৃতদেহ হইতে সমুৎপাদিত বিষে যৎপরোনাস্তি অসহনীয় ও ক্লেশপ্রদ হইয়া উঠিল। বন্দীগণ ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য ও প্রলাপাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। জীবনের আশা সকলের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মৃত্যুই তৎকালে একমাত্র প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। রক্ষকদিগের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইলে হয়ত এ ভারভূত জীবন বিনষ্ট হইলেও হইতে পারে ভাবিয়া বন্দীগণ তাহাদিগকে উল্লেখ করিয়া বহুবিধ দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। কেহ বা বিধাতাকে নিন্দা করিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ নির্জ্জীব হইয়া ভূপতিত মৃত বা মৃতপ্রায় দেহের উপর নিপতিত হইয়া একে একে সমন সদনে প্রস্থান করিতে লাগিল। বারি পানে তৃপ্তি হইল না, বায়ু সেবনে তৃপ্তি সম্ভাবিত ভাবিয়া জীবিতেরা বাতায়ন সম্মুখে সমুপস্থিত হইবার নিমিত্ত প্রাণপণ করিতে লাগিল। দয়া বা স্নেহ তৎকালে সকলের হৃদয় হইতে নির্ম্মূল হইয়া গেল। বন্দীগণের প্রত্যেকেই অপরকে বঞ্চিত করিয়া ঈপ্সিত স্থানাধিকারের চেষ্টা পাইতে লাগিল। এবম্বিধ কলহেও অনেকে মানবলীলা সম্বরণ করিল।* ফলতঃ অন্ধকূপের দশা ভয়ানকের ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় কিন্তু প্রকাশ করা অসম্ভব।† এক জন ভুক্তভোগী বলিয়াছেন, "বন্দী সম্প্রদায়ের অনেকেই নিরুদ্ধ হওয়ার অল্পকাল পরে মানবলীলা সম্বরণ করিল; অন্যে উম্মত্ত হইয়া উঠিল এবং জ্ঞানহীন হইয়া অবসাদাপন্ন জীবন ত্যাগ করিল।"‡। রাত্রি যখন ২টা তখন ৫০ জনের অধিক জীবিত ছিল না।$। কিন্তু তৎকালে

* Ibid.

† Orme, Mill, Murray Macaulay &c. &c. &c.

* Orme's Indostan Vol. II P. 76.

† Mill's British India Vol. III, P. 117.

‡ John Cooke.

$Orme's Indostan.

সে প্রকোষ্ঠের অবস্থায় ৫০ জন ব্যক্তিও তন্মধ্যে জীবিত থাকা কদাচ সম্ভাবিত নহে। সুতরাং তখনও তাহারা শান্তি পাইল না। অবশেষে ঊষার মোহিনী আলোক আশা রাশি সঙ্গে লইয়া বন্দীগণকে অভয় দিতে আসিতে লাগিল। জীবিতেরা তখনও রক্ষক-দিগের নিকট মুক্তি কামনা করিতে লাগিল। এই সময়ে কুকের মনে হইল, যে, যদি হলওয়েল জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা মুক্তির অনেক উপায় হইতে পারিবে। তাঁহার প্ররোচনায় ২ জন সেই শবরাশি মধ্য হইতে হলওয়েলের অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে, তখনও তাঁহাতে জীবনের চিহ্ন আছে। কাপ্তেন মিলস্ অতীব উদারতা সহকারে স্বকীয় বাতায়ন সন্নিহিত স্থান হলওয়েলের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে হলওয়েলের চৈতন্যোদয় হইতে লাগিল। অনতি-বিলম্বে নবাবের এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া অন্ধকূপের দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। গৃহ শব রাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। জীবিত বন্দীগণও মৃতবৎ দুর্ব্বল হইয়াছিলেন সুতরাং সেই দেহ সমস্ত অতিক্রম করিয়া নিষ্ক্রমণ করা তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মধ্যে দেহ সমস্ত দ্বার মুখ হইতে অপসারিত করিয়া নিষ্ক্রমণ উপযোগী পন্থা করা হইল। তখন ১৪৬ জন বন্দীর মধ্য হইতে ২৩ জন মাত্র মৃতবৎ, বীভৎস-মূর্ত্তি, অদৃষ্টপূর্ব্ব স্বতন্ত্র জীব সদৃশ ব্যক্তি সেই সংহারকারী গুহামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নবাবের সৈন্যেরা বন্দীগণের এতাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে বিস্ময় মাত্রও প্রকাশ করিল না। মৃতদেহ সমস্ত তৎক্ষণাৎ অপসারিত করিয়া এক প্রকাণ্ড গর্ত্ত মধ্যে সমা-হিত করা হইল। *

এই ভয়ানক ঘটনা অন্ধকূপ হত্যা নামে ইতিহাসে প্রথিত। এই নিদা-রুণ ব্যাপার সিরাজ-উদ্দৌলার চির-কলঙ্কিত নামে অধিকতর অনপনেয় কলঙ্করাশি ঢালিয়া দিয়াছে। এই অবক্তব্য অত্যাচার হেতু নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার নাম, ইংরাজ সমাজে সয়তান অপেক্ষাও ঘৃণার্হ হইয়া রহি-য়াছে। অন্ধকূপ হত্যা নিষ্ঠুরতার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ, এ সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। শতাধিক বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও সেই লোমহর্ষণ অন্ধকূপ হত্যার কথা মনে হইলে শরীর কণ্টকিত ও মন অবসন্ন হইয়া উঠে। সুস্থ সবলকায় বহুসংখ্যক মানব জীবন রক্ষণোপযোগী বায়ু অভাবে শ্বাসাবরোধ হেতু মানবলীলা সম্বরণ করিল, ইহা মনে করাও ভয়ানক ক্লেশকর। তাহাদের সেই যম যন্ত্রণা

* Ibid.

অধুনা বিরলে বসিয়া কল্পনা করিতেও নেত্র অশ্রুবর্ষণ করে। সে যাতনা, সে ক্লেশ, সে অধীরতা, সে অবসাদ, সে উন্মত্ততা, কবির লেখনী বর্ণন করিতে অসক্ত, চিত্রকরের তুলিকা চিত্রিত করিতে অপারগ। তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় কিন্তু প্রকাশ করা যায় না। এ পাপ ভারত-ভূমি বহুকাল যাবৎ পর-সেবায় রত। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ম্লেচ্ছজাতি সমূহ ভারতবর্ষে সমাসীন হইয়া নানা সময়ে নানাবিধ নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনাদের নাম চির-কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্ধকূপ হত্যা তৎসমস্ত নিষ্ঠুরতার অগ্রগণ্য। এ নিদারুণ ঘটনা, এ ভয়ানক ব্যাপার ভারত ইতিহাস মধ্যে চিরকাল তামসী অক্ষরে লিখিত থাকিবে। নৃশংসতার উদাহরণের প্রয়োজন হইলেই এই লোম-হর্ষণ ঘটনা উল্লিখিত হইবে এবং পরম্পরাগত বংশ পরম্পরা ভীত ভাবে এই ঘটনার আলোচনা করিবে।

কিন্তু, এ ভয়ানক হত্যা কাণ্ডের মূল কে? কাহার স্কন্ধে এ ঘোর পাপ প্রযুজ্য? কে এ নিদারুণ অনিষ্ট ঘটনার নিমিত্ত দায়ী? একবার এ কথার আলোচনা করা ভাল নয়কি? এ "বাঙ্‌মনসগোচর" নৃশংসতার মূল, কর্ত্তা ও নিয়ন্তা কে তাহা অনুসন্ধান করা অবশ্যই বিধেয়। নচেৎ পবিত্র ইতিহাসের অবমাননা হয়, সত্যের অপহ্নব করা হয়, বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার গুরুত্ব সমর্থিত হয়, এবং ঘোর অবিচার প্রকাশিত হয়।

কয়েক জন ইংরাজ ঐতিহাসিক পণ্ডিত এই মহাপাপের জন্য সিরাজকেই দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে সিরাজকে এ নিমিত্ত দায়ী করা কদাচ সঙ্গত হইবে না। নবাব বন্দীগণকে সে রজনীর নিমিত্ত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং বিশ্রামার্থ প্রয়াণ করিলেন। নবাব যদি কারাগৃহ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট আজ্ঞা প্রদান করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে এই ঘোর দুষ্কর্ম্ম মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে লিপ্ত বলা যাইতে পারিত। ক্লেশ নিপীড়িত হলওয়েল সাহেবেরই বিশ্বাস ছিল যে, নবাব স্থান সম্বন্ধে কোন বিশেষ আদেশ দেন নাই। তিনি প্রহরীগণকেই এই নৃশংসতার মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *। অপর ভুক্তভোগী কুক বলিয়াছেন যে নবাবের আজ্ঞা মধ্যে স্থান সম্বন্ধেও বিশেষ নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু স্থানের পরিমাণ না জানিয়াই সে আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। কুক সিরাজের স্কন্ধে যে দোষ চাপাইতেছেন, তিনি স্বয়ংই তাহা খণ্ডন করিতেছেন। সুতরাং সে কথার

* Holwel's India Tracts.

আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। হলওয়েল যাহা বলিতেছেন তাহাও নবাবকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ করিতেছে। হলওয়েল "কুকের কথা এসম্বন্ধে সমীচীন তাহার সংশয় নাই। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা জগদ্বিখ্যাত নিষ্ঠুর সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন দুষ্কার্য্যই অসম্ভব, নয়। কিন্তু এ বিষয়ে নবাব যে লিপ্ত ছিলেন না তাহা সহজ বুদ্ধিতেও ধারণা করা যায়

যদি বন্দীগণকে ক্লেশ নিপীড়িত করিয়া বিনষ্ট করা নবাবের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তৎসমাধানার্থ তাঁহার এত প্রযত্ন কেন? সে কার্য্য তিনি তো সহজেই সম্পন্ন করিতে পারিতেন। জগতে এমন ব্যক্তি কেহ ছিল না, যাহার ভয়ে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা. কাতর হইতেন, ভু-মণ্ডলে এমন কোন লোক ছিল না যাহাকে লুকাইয়া নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা কোন কার্য্য করিতেন, তাঁহার জীবনে এমন কোন পাপ ছিল না, যাহা সাধনে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন। ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দীকে অবক্তব্য ক্লেশ দিয়া বধ করা যদি অবিবেকী সিরাজের আবশ্যক হইত, তিনি তাহা হইলে কদাচই সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি মনের বাসনা চাপিয়া রাখিবার লোক ছিলেন না। সে মনের বাসনা তিনি তখনই মিটাইতেন। আর নবাব প্রথম সাক্ষাতে হলওয়েলকে নিরাপদ সম্বন্ধে তত আশ্বাস দিলেন কেন? কেন তিনি তাঁহার বন্ধন মোচন করিতে আজ্ঞা দিলেন? কেন তিনি তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন? যাহাকে ক্ষণপরে যার পর নাই কষ্ট দিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে স্থির আছে, তাহার সহিত এবম্বিধ সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন? এরূপ ব্যবহার কি সঙ্গত? ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ত্রয়োবিংশ জন ব্যতীত অবশিষ্টেরা ঘোর ক্লেশ ভোগ করিয়া শমন সদনে প্রস্থান করিল। যদি বধ কার্য্যই নবাবের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে নবাব এই ত্রয়োবিংশ ব্যক্তির জীবন কেন রক্ষা করিলেন? তিনি কি জানিতেন না যে, এই ত্রয়োবিংশ ব্যক্তি বিনষ্ট হইলে তাঁহার দুর্ণামের মূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে? তবে এত লোকের মধ্যে ২৩ জনের জীবন রক্ষা করায় তাঁহার কি স্বার্থ ছিল? ফলতঃ স্থির চিত্তে ভাবিয়া, দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, নবাব সিরাজ অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারের মধ্যে এক তিলও লিপ্ত ছিলেন না। *

* এ সম্বন্ধে An Address on the study of Indian History, Dlivered Extempore, at the annivesary meeting of the Youngmen's Union on saturday June, 24th 1876 নামক পুস্তক দেখ। এপুস্তকে বাগ্মীর নাম নাই। কিন্তু তাঁহার স্বদেশানুরাগ ও ঐতিহাসিক জ্ঞান সমূহ প্রশংসনীয়।

যদি নবাব এই অতুলনীয় নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন না তাহা হইলে দেখা আবশ্যক এ মহাপাপ কাহার কার্য্য? কে এই জগদ্বিখ্যাত কলঙ্কের মূল? প্রহরীগণই দ্বিতীয় লক্ষ্য স্থল। তাহারা অন্ধকূপ সদৃশ ভয়ানক স্থান মধ্যে বন্দীগণকে না রাখিলে এ ভয়ানক ব্যাপার কদাচ সংঘটিত হইত না। এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, প্রহরীগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই ভয়ানক প্রকোষ্ঠ মধ্যে বন্দীগণকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল কি না? মহাত্মা Orme * এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম;—

"About eight o'clock, those who had been sent to examine the rooms reported that they had found none fit for the purpose. On which the principal officer commanded the prisoners to go into one of the rooms which stood behind them along the Varanda. It was the common dungeon of the garrison, who used to call it *the black hole.*" †

পূর্ব্বোল্লিখিত কথায় অর্ম্ম সাক্ষী দিতেছেন যে, প্রহরীগণ উপযুক্ত স্থানান্বেষণ করিয়াছিল কিন্তু না পাওয়ায় অগত্যা ঐ গৃহে বন্দীগণকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। এই ঐতিহাসিক পণ্ডিতের কথায় দ্বিমত করিবার কোনই কারণ নাই। স্বয়ং দুষ্টবুদ্ধি মেকলে প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্ম্মের ইতিহাসে অন্য দোষ থাকিলেও ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। * আমরা এক মাত্র অর্ম্মের কথায় নির্ভর করিয়া প্রহরীগণকে নিষ্কৃতি দিতেছে না মহামনস্বী মিল এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি;—

"When evening, however, came, it was question with the guards to whom they were intrusted, how they might be secured for the night. Some search was made for convenient apartment; but none was found; upon which information was obtained of a place which

*অবশ্যক বোধে আমরা এই স্থানে ব্যক্ত করিতেছি যে, অর্ম্ম এই সময়ে মন্দ্রাজ কৌন্সিলের এক জন মেম্বর ছিলেন। ইতি পূর্ব্বে তিনি নয় বৎসর কলিকাতা কৌন্সিলের মেম্বর ছিলেন। সুতরাং এ সকল ব্যাপারে তাঁহার মত সর্ব্বাপেক্ষা গ্রাহ্য তাহার সন্দেহ কি?

† Orme's Indostan Vol. II P.74

* "Orme inferior to no one English historian in style and power of painting, is minute even to tediousness. In one volume he allots, on an avrego a closely printed quarto page to the event of every forty eight hours. The consequence is, that his narrative, though one of the most authentic and one of the most finely written in our sauguge, has never been very popular, and is now scarcely ever read." *Macaulay's Essay, On Lord Clive.*

the English themselves had employed as a prison. Into this, without further inquiry, they, were impelled." *

— মিলের ন্যায় মাননীয় ও বিবেচক পণ্ডিতও এ দুর্ঘটনা বিষয়ে প্রহরীগণকে দোষী করিতেছেন না। আমরা উপরোক্ত মনীষীদ্বয়ের কথা প্রমাণে রক্ষকবৃন্দকে অনায়াসে নির্দ্দোষী করিতে পারি। এ নিদারুণ ঘটনায় সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজগণের আত্মদোষই সমধিক প্রবল বোধ হয়। অন্ধকূপ নামধেয় কারাগৃহ সিরাজ উদ্দৌলা বা তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের সৃজিত নহে। ইংরাজগণ হতভাগ্য বঙ্গবাসীগণকে পীড়িত করিবার নিমিত্ত উক্ত বন্দীশালা স্থাপন করেন। প্রহরীগণ উপযুক্ত স্থানান্বেষণ সময়ে জ্ঞাত হইল যে, বারান্দার পশ্চাতে ইংরাজগণের কারাগৃহ আছে। তাহারা তৎশ্রবণে সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বন্দীগণকে সেই ভয়ানক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ করিল। যদি ইংরাজগণ সেই ভয়ানক গৃহের সংস্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অদৃষ্টে এবম্বিধ অনর্থপাত হইত না। "পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়িতে হয়," এই চলিত কথা এই ঘটনায় উত্তমরূপে সমর্থিত হইতেছে। ইংরাজগণ উক্তবিধ অন্ধকূপ কারায় বঙ্গীয় বন্দীমণ্ডলীকে যে অযথা যাতনা দিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

অন্ধকূপে ঘোর যাতনা ভোগ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করা ইংরাজগণের "আত্মাপরাধ বৃক্ষস্য ফল" ইহার সংশয় নাই। প্রবীণ বিচারক্ষম ইতিহাস শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত মণ্ডলী সহজে বা প্রকারান্তরে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। আমারা এ স্থলে মিলের অন্ধকূপ সম্বন্ধীয় সমস্ত টীকাটী উদ্ধৃত করিলাম।

"The atrocities of English imprisonment at home, not then exposed to detestation by the labours of Howard, too naturally reconciled Englishmen abroad to the use of dungeons: of *Black Holes*. What had they to do with a *Blck Hole*? Had no *Black Hole* existed (as none ought to exist any where least of all in the sultry and unwholesome climate of Bengal), those who perished in the Black Hole of Calcutta would have experienced a different fate. Even so late as 17 82, the common gaol of Calcutta is described by the Select Committee, as "a miserable and pestilential place." That Committee examined two witnesses on the state of the common gaols of Calcutta. One said, "The gaol is an old ruin of a house; there were very few win-

* Mill's History of British India Vol. III P. 117.

dows to admit air, and those very small He asked the gaoler how many souls were then confined in the prison ? who answered, upwards of 170, blacks, and whites included—that there was no gaol allowance, that many persons died for want of the necessareis of life. The nauseous smells, arising from such a crowded place, were beyond expression. Besides the prisoners, the number of women and attendants, to carry in provisions and dress victuals, was so great, that it was astonihsing that any person could long survive such a situation. It was the most horrible place he ever saw, take it altogether." The other witness said, "It was divided into small apartments, and those very bad ; the stunch dreadful, and more offensive than he ever experienced in this country—that there is no thorough draft of air—the windows are neither large nor numerous—the rooms low—that it would be impossible for any European to exist any length of time in the prison—that debtors and criminals were not seperated—nor Hindoos, Mahommedans and Europeans." *First Report, Appendix, no. XI.* *

এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন এ ভয়ানক ঘটনার নিমিত্ত কে দায়ী ? কাহার দোষে এই নিদারুণ ব্যাপারের জন্ম হইল ? প্রকৃত বিবেচনায় অন্ধকূপ নামধেয় সেই দুরন্ত কারাগৃহের সংস্থাপনই কি এই দুর্ঘটনার মূলীভূত নহে ? আজ্ শতাধিক বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গেল ইংরাজগণ ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে এ দেশের অধিবাসীগণের সহিত নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? অন্ধকূপ কারায় বহুসংখ্যক অপরাধী নিবদ্ধ রাখিয়া উৎপীড়িত করার মূল কে ? কে সংজ্ঞা শূন্য, মমতা শূন্য, দয়া শূন্য হইয়া এই দুরন্ত দণ্ডের আবিষ্কার করে ? মনুষ্যকে এতাবত এতাদৃশ যাতনা দিতে কে জানিত ? ইংরাজগণ এই মহানর্থের মূল। আজি লেখনী হস্তে লইয়া সমস্ত পাপ হতভাগ্য সিরাজের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলে চলিবে কেন ? আমরা সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্পাপ, শান্ত, দেব প্রকৃতি বলিতেছি না। আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে, সিরাজ যদি কিছুতেই লিপ্ত না থাকিয়া, দোষ সংস্পর্শ-শূন্য থাকিয়াও চিরকাল ঘোর কলঙ্কিত হয়েন, তাহা হইলে ইংরাজগণকে কি বলা সঙ্গত ? তাঁহারা তাহা হইলে অবশ্যই পাপীর পাপী ; নারকীর নারকী, তাঁহারা অবশ্যই ঘোর নৃশংস।

সাক্ষী ইতিহাসের নির্ম্মল পৃষ্ঠ হইতেই অমরা এই সত্য আহ-

* Mill's History of British India Vol. III.P-117.

রণ করিতেছি। ইতিহাস ক্ষেত্রে সতর্কতা সহকারে অবতরণ করিলে পরিদৃষ্ট হয় যে, ইংরারাজগণ সবিশেষ যত্ন, অধ্যবসায় ও উদ্যম সহকারে আপনাদের কলঙ্কের চিহ্ন সমস্তও অপসারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; তাঁহারা তৎসাধনে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তবে হয়ত ব্যস্ততা হেতু, বা সতন্ত্র কারণ বশত দুই-একটী ক্ষুদ্র সূত্র খণ্ড স্থানান্তরিত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই ক্ষুদ্র সূত্র খণ্ডের অনুসরণে ক্রমশ, দুই একটী নিগূঢ় বৃত্তান্তের চিহ্ন আজি ছায়ার ন্যায় নেত্র সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক সেই সূত্র সমস্ত স্থানান্তরিত হয় নাই বলিয়া অন্তরে বিশেষ যাতনা পাইয়াছেন এবং অধুনা তাহা অপসারিত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ঠ প্রয়াস পাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এস্থলে মিলের টীকাকার উইল্‌সন্ (Horace Hayman Wilson, M. A, F. R. S. &c. &c.) সাহেবের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মেঃ উইল্‌সন্ একজন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁহার কথায় সকলেই সম্যক্ আস্থা ও যত্ন করে। এরূপ ব্যক্তির স্বদেশ ও স্বজাতি মমতা সম্যক প্রবল হওয়া নিতান্ত উচিত। না হইলে নিন্দার কথা হইত। দুঃখ সহকারে ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি যে, মেঃ উইলসন্ যেন একটু জোর করিয়া প্রকৃত কথার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। মিলের কথা উইলসন্ ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার যুক্তির কিয়দংশ পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

"In 1808 a chamber was shown in the old fort of Calcutta then standing, said to be the Black Hole of 1756. Its situation did not exactly corres pond with Mr. Holwell's description of its but if not the same, it was a room of same description and size, such as is very common amongst the offices of both public and private buildings in Calcutta, and no doubt accurately represented the kind of place which was the scene of this occurence. It bore by no means the character of a prison. It was much more light, airy, and spacious, than most of the rooms used formerly by the London watch or at present by the police, for purposes of temporary durance. Had a dozen or twenty people been immured within such limits for a night, there would have been no hardship whatever in their imprisonment, and in all probablity no such number of dersons ever was confined in it * * * The state of the Calcutta gaol, in 1782, like that of the common

gaols in England or in Europe, was, no doubt, bad enough; but it is not said that its inmates had ever died of want of air, or that one hundred and twenty perished in a single night, * * * * *Wilson's note of Mill's India.*

ঘটনার অর্দ্ধ শতাধিক বর্ষ-পরে "ব্লাকহোল" বলিয়া যে গৃহ প্রদর্শিত হয়, তাহাই যে প্রকৃত সেই গৃহ তাহার স্থির কি? প্রদর্শিত গৃহের সহিত হলওয়েলের বর্ণনার সামঞ্জস্য নাই। ভুক্তভোগী হলওয়েলের কথা অপেক্ষা আনুমানিক প্রদর্শন যে সমধিক সত্য একথা কে বিশ্বাস করিবে? এরূপ কথায় আস্থা স্থাপন করা পণ্ডিতবর উইল্‌সনের উচিত নহে। যদিই বা প্রদর্শিত গৃহ সেই দুর্ঘটনার স্থান হয়, তাহা হইলেও ইংরাজ চরিত্রের দোষ যাইতেছে কৈ? সে গৃহ মধ্যে দ্বাদশ বা বিংশতি ব্যক্তি নিরুদ্ধ হইলে কোনই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইত না। তথায় অল্প সংখ্যক ব্যক্তি থাকিলে মরিত না, সুতরাং সে গৃহ ভাল এ কথা স্বীকার করা যায় না। উইল্‌সন্ বিশ্বাস করেন যে, "সম্ভবতঃ" তথায় বহুসংখ্যক ব্যক্তি কদাচ অবরুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু একথায় অমরা প্রতিবাদ করিব না। তিনি যাহা সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই, তাহা লইয়া বাদনুবাদ করা অন্যায় ও অনাবশ্যক। ঘটনার অনতিকাল বিলম্বে "সিলেকট কমিটীর" সম্মুখে এক জন স্বাক্ষী ব্যক্ত করিতেছেন যে, তথায় ১৭০ জনাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি অবরুদ্ধ হইত। একথা উপেক্ষা করিয়া উইল্‌সনের "সম্ভাবনায়" বিশ্বাস করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? ফলতঃ বিদ্বৎ-কুলতিল্ক উইল্‌সন্ নিতান্ত হাস্যজনক যুক্তিসমস্ত অবলম্বন করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। উইল্‌সন্ স্বীকার করেন যে, তৎকালে ইংলণ্ডের ন্যায় কলিকাতার অবরোধ গৃহের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। একথা লিখিবার সময় তাঁহার মনে হওয়া উচিত ছিল যে, বঙ্গদেশ নিরতিশয় উষ্ণ। গ্রীষ্মকালে এখানকার অবরোধ গৃহে বিংশত্যাধিক ব্যক্তি নিরুদ্ধ হইলে অবশ্যই মরিবে। যাহাই হউক একথা লইয়া আমরা আর অধিক বাদনুবাদ করিয়া প্রস্তাবকে পল্লবিত করিতে চাহি না। উইল্‌সনের যুক্তি যে নিতান্ত অসার তাহা বুঝাইতে প্রযত্নাতিশয় নিষ্প্রয়োজন।

সুসভ্য ইংরাজ জাতি যে দীন, দরিদ্র অক্ষম ব্যক্তির উপর চিরকাল উৎপীড়ন করিয়া থাকেন, তাহা প্রমাণ করিতে কষ্ঠ পাইতে হয় না। অত্যুজ্জ্বল নীল দৌরাত্ম্য এখনও

কোন সহৃদয় বঙ্গবাসীর হৃদয় হইতে অস্তমিত হয় নাই। তদ্ধেতু ইংরাজগণ যে, অবক্তব্য অত্যাচারে বাঙ্গবাসীগণকে উৎপীড়িত করিয়াছেন, তাহা কেনা জানে? আমেরিকা ও আফেরিকার ঘোর ঘৃণাহ দাস ব্যবসায় ইংরাজ চরিত্রের অনপনেয় কলঙ্ক। স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে, তাঁহারা কোন কার্য্যেই বিমুখ নহেন, ইহা সর্ব্বজন বিদিত কথা। যতক্ষণ সাধ্য থাকে ততক্ষণ তাঁহারা অত্যাচার দ্বারা স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। অসাধ্য হইয়া উঠিলে অমনি তাঁহারা ভদ্র লোক হইয়া "ভিজে বিড়ালের" ন্যায় সরিয়া বসেন। এববিধ চরিত্র সম্পন্ন ইংরাজগণ যখন ব্যবসায়ী রূপে বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন তখন যে, তত্রত্য অধিবাসীগণেরপ্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচারকরিতেন তাহার সন্দেহ কি? অন্ধকূপ প্রভৃতি দুরন্ত দণ্ড সমস্ত যে, তাঁহাদেরই কল্পনা তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

Seir mutaqherin প্রণেতা* ও অপর একজন বাগ্মী † অন্ধকূপ হত্যা প্রসঙ্গে ইংরাজ চরিত্রের নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়া সিরাজের চরিত্র সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। সিরাজ যখন অন্ধকূপ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইতেছে, তখন তাঁহার চরিত্র সমর্থনের নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

আমরা অন্ধকূপ হত্যা প্রসঙ্গে অনেক স্থান ব্যয় করিয়াছি। এক্ষণে ইহার বিষয় সমস্ত পাঠকবৃন্দের গোচর করিয়া ও ইহার ন্যায়ান্যায় বিচারের ভার তাঁহাদের উপর সমর্পণ করিয়া পরকীয় ঘটনা বর্ণনে অগ্রসর হইতেছি *

---

* See Seir Mutaqherin Vol I. Page 721.

† An address on the study of Indian History. Deliverd extempore at the Anniversary meeting of the young men's union. Calcutta.

* প্রসঙ্গত আমরা এস্থলে আর একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। দেশীয় ইতিহাসে এই সর্ব্বজন বিদিত অন্ধকূপ হত্যার নাম মাত্রও উল্লিখিত হয় নাই। Seir Mutaqherin" এবং "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" পুস্তকদ্বয়ে এই ঘটনার উল্লেখ মাত্রও নাই। অথচ এই পুস্তকদ্বয় কোনস্থলেই সিরাজের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন নাই। বরং তাঁহারা সিরাজের সম্বন্ধে বিজাতীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে এই ব্যাপার গোপন করিবেন, ইহা কদাচ সঙ্গত বোধ হয় না। Marshman এজন্য তাঁহাদের উপর একটু উপহাস করিয়াছেন। (See Marshman's History of India Vol. I. 274.) আমরা ঐ ইতিহাসদ্বয় প্রমাণে এমন কথা বলিতেছি না যে, অন্ধকূপ হত্যা সর্ব্বৈব মিথ্যা ও কল্পনা মাত্র। এই ভয়ানক ঘটনা সিরাজের স্কন্ধে সমর্পিত হইতেছে বলিয়া ইহার ভয়ানকত্ব এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যদি বিবেচনা করা যায় যে এব্যাপার সামান্য অসাবধানতা

হেতু সংঘটিত ও ইংরাজগণের কর্ম্মোচিত ফল তাহা হইলে ইহার আর কোনই ভয়ানকত্ব থাকে না। আমরা যথাসাধ্য প্রমাণ করিয়াছি যে, ইহা সমান্য প্রহরী-বৃন্দের অসাবধানতা হেতু উদ্ভূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং এব্যাপার সমধিক আলোচ্য বা আন্দোলনীয় নহে সম্ভবতঃ এই হেতুবশতঃ এ ব্যাপার দেশীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্থান লাভ করে নাই।

কানন-কুসুম। *

পুস্তক খানি নিম্ন-লিখিত উপন্যাস অবলম্বন করিয়া লিখিত :—

পশ্চিমাঞ্চলে পঞ্চতী নামক রাজ্যের রাজপুত্র কৌমার অবস্থায় কোন কারণ বশতঃ পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হন। বৃদ্ধ রাজা মৃত্যুকালে পুত্রের পুনরাগমন আশা না করিয়া মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করত মানবলীলা সংবরণ করেন। তদীয় রাজ্যের কেহই উত্তরাধিকারী না থাকাতে নরপতি মন্ত্রীর একমাত্র কন্যা বিলাসবতীর নামে দান-পত্র লিখিয়া যান।

নিরুদ্দেশ রাজকুমারের একটি শৈশব-সখা ছিল। তাহার নাম অভিরাম। অভিরাম কোন গুরুতর অপরাধে চিরজীবনের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত ও আণ্ডামান দ্বীপে প্রেরিত হন। কৌশলক্রমে অভিরাম আণ্ডামান হইতে পলায়ন করিয়া কতকগুলি গঙ্গাসাগর যাত্রীর সাহায্যে ভারতবর্ষের উপকূল ভাগে আনীত হন এবং এই স্থানে পঞ্চতী-রাজপুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তথা হইতে নৌকারোহণে বাটী যাইতে অভিলাষী হইয়া উভয়েই কোন একটি নিঃশঙ্ক পথের অনুসরণ করেন। দৈব-দোষে তাঁহারা প্রবল বাত্যায় আক্রান্ত হইলেন। এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া অভিরাম বন্ধু-রাজ্য-লাভ-লোভে বীরেন্দ্রকে সাংঘাতিক রূপে আহত করিয়া নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করেন। নদীর স্রোতে বীরেন্দ্র উপকূলবর্ত্তী একটি কর্দ্দমময় স্থানে নীত হন। তথায় বনচর সাংখ্য নামক দস্যু সম্প্রদায়ের আশ্রিত জনৈক যুবা তাঁহাকে দেখিতে পায়। এই ব্যক্তির নাম রজমন। রজমন সাংখ্য সম্প্রদায়ের জনৈক মহিলার পরম প্রিয়পাত্র। ঐ মহিলা রজমনের নির্দ্দেশ

* কানন-কুসুম (নবন্যাস) শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার অধিকারী বি, এ, বিরচিত। সুচারু যন্ত্রে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে মুদ্রিত। মূল্য ১৷০ মাত্র।

ক্রমে মৃতপ্রায় বীরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন এবং তদীয় শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে, আপনাদের তৎকালীক বাসস্থানে লইয়া যান। এই স্থানে রাখিয়া প্রাণপণে শুশ্রূষা করত তাঁহার জীবন দান করেন, বীরেন্দ্রের জীবন-দাত্রী কামিনীর নাম কানন-কুসুম জয়মনিয়া। পুনর্জীবন লাভ করিলে অপরাপর দস্যুবর্গের তাহার প্রতি লক্ষ্য পড়িল। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা তাহাদের প্রথম বাসনা; অনন্তর তদীয় জীবন-নাশে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইবার ভয় অপনোদন হইবে। এবম্বিধ দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতেবীরেন্দ্র কেবল কণ্টক-বৃন্ত কানন-কুসুমের উপর নির্ভর করিয়া জীবন লাভ করিলেন। অনন্তর বীরেন্দ্র জয়মনিয়ার উপদেশক্রমে বিবিধ বিঘ্ন-সঙ্কুল দস্যুদল হইতে পলায়ন করেন। পথে কোন বিজন প্রদেশে কাননাভ্যন্তরস্থ শিব-মন্দির-বাসী অভিরামের পিতার আবাস স্থল আশ্রয় করিয়া শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে আশঙ্কার অপনোদন করেন। মন্দির-বাসী বৃদ্ধের সম্বল একমাত্র কন্যা প্রভাবতী। প্রভাবতী অতিথির রীতিমত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অতিথি এখন আর অতিথি নহেন। বৃদ্ধ ও প্রভাবতীর অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া তাঁহাকে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিতি করিতে হইল। ক্রমে উভয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বীরেন্দ্র নূতন চিন্তায় চঞ্চল হইলেন। শিব-মন্দির তাহার শান্তিপ্রদ হইলেও আর আবাস স্থান হইতে পারিল না। ইচ্ছা করিলে অবশিষ্ট জীবন তথায় অতিবাহিত করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা ঘটিল না। কোমল-হৃদয়া প্রভাবতী কমল, প্রবল অনিলে চঞ্চল করিয়া বীরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন। অগ্রসর হইতে যান, কে যেন তাহার পশ্চাৎ হইতে গতির প্রতিবন্ধকতা সম্পাদন করে। এপর্য্যন্ত প্রভাবতীর প্রতি তাঁহার যে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে, তাহা অতি অস্ফুট ও উদ্বুদ্ধ মাত্র সুতরাং প্রতিজ্ঞারূঢ় মন আকর্ষণী শক্তির শক্তি অতিক্রম করিয়া বীরেন্দ্রকে সে স্থান হইতে লইয়া চলিল। বীরেন্দ্র পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া প্রান্তর মধ্যস্থ একটি বটতলায় শয়ন করিয়া আছেন, এমত সময়ে আশঙ্কা ও অভিলাষের বশীভূতা, বীরেন্দ্রের উদ্দেশে বহির্গতা, সানুচর জয়মনিয়াকে পুলিস ও তাঁহার ভ্রাতার হস্তে, বন্ধন দশাগ্রস্ত দর্শন করিলেন। ভূতভাবী বিবেচনা না করিয়া প্রবল পরাক্রমে উভয়কে বন্ধন-মুক্ত করিলেন। কিন্তু নিজে জয়মনিয়ার ভ্রাতার বিষম কুঠারাঘাত অতিক্রম করিতে পারিলেন না। মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়িত রহিলেন। জয়মনিয়া

একটি বিজন কাননে অবরোধ দশা-গ্রস্ত ; রজমন পুলিষদের সেবক। সাংখ্য-পুত্র ভগিনীকে আশ্রিতের অনুসরণে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় পাপ-বাসনা পরিপূরণ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইল। সে তাহার পাণিগ্রহণ-লোভে লোলুপ। পয়োধর তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে পয়োধারা বর্ষণে সন্তুষ্ট না করিয়া বিষময় অশনি প্রহারে তাহার আশা-লতা সমূলে ধ্বংস করিল। সাংখ-পুত্র জিম্মা ভগিনীকে স্ববশে আনিতে নিরাশ হইয়া তাহার সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। অর্থ-বলে পুলিষের সহায়তায় জয়মনিয়ার বিরুদ্ধে বীরেন্দ্র-ঘাতিনী অপরাধ দিয়া অভিযোগ উপস্থিত করাইল। জয়-মনিয়া বিচারালয়ে উইলমট সাহেবের নিকট নীতা হইলেন। সাহেব সন্দেহ-ক্রমে মকর্দ্দমা মাসেকের নিমিত্ত স্থগিত রাখিয়া জয়মনিয়াকে হাজতে রাখি-বার আদেশ দিলেন।

কুঠারাঘাতে বীরেন্দ্র মৃতপ্রায় হইয়া পথ-প্রান্তে পতিত ছিলেন। এক জন ডাক্তার সস্ত্রীক যাইতে যাইতে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। ডাক্তার বাবুটি বিধাতা অথবা গ্রন্থকার প্রেরিত শ্রীশচন্দ্র। ইনিও বীরেন্দ্রের শৈশব-সখা। করুণা অথবা বন্ধুতার বশ-বর্ত্তী হইয়া শ্রীশ বীরেন্দ্রকে নিকটবর্ত্তী পল্লীতে লইয়া কিয়ৎকাল চিকিৎসা করেন। বন্ধু সুস্থপ্রায় হইলে শ্রীশচন্দ্র গন্তব্য পথের অনুসরণ করেন। পথটি পূর্ব্বোক্ত শিবমন্দিরের সম্মুখ দিয়া গিয়াছে। শ্রীশ বাবু সস্ত্রীক শিব-মন্দিরে উপস্থিত হইলে, পিতৃহীন প্রভাবতীকে নিতান্ত প্রভাহীন অবস্থায় অবলোকন করিলেন। স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করে কাহার সাধ্য ? শ্রীশবাবু, কাশী যাইয়া দুরবস্থার করালগ্রাসে নিপতিতা প্রভাবতীর দুঃখ দূর করিতে স্থির নি-শ্চয় হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন।

স্বভাব-সুন্দরী কৃত্রিম শোভার অপেক্ষা করে না। প্রভাবতী যে অব-স্থায় থাকুন, তাঁহার রূপরাশি অলৌকিক, শ্রীশের পত্নী সেরূপ নন। তিনি ঈর্যাপরবশ হইয়া প্রভাবতীকে বড় যন্ত্রণা দিতেন। প্রভাবতী যখন দুর-বস্থায় পতিত হইয়াছেন তখন আর তাঁহার সৌভাগ্য আশা কোথায় ? এই দুঃখের অবস্থায় দলিত হইয়া এক দিন তিনি দ্বার-দেশে দাঁড়াইয়া আছেন এমত সময়ে একজন যুবাপুরুষ তাঁহার নেত্র পথে পতিত হইল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। "দাদা দাদা" বলিয়া তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দাদা আগুনে গলিবার ধাতু নহেন। প্রভাবতীকে ভূতল-শায়িনী করিয়া দাদা অন্তর্হিত হইলেন। ধূল্যবলুণ্ঠিতা প্রভাবতী বহুদিনের নিরুদ্দেশ মাতুলের সাহায্যে পুনর্জীবন

লাভ করিলেন। এবং স্নেহাধার মাতুলের বাটিতে বাস করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী যাঁহাকে দাদা বলিয়াছিলেন তিনি অভিরাম। কাল-চক্র অভিরামের অভিনব পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিয়াছে।

বীরেন্দ্রকে নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া অভিরাম পঞ্চতী অভিমুখে প্রস্থান করেন। সেখানে উপনীত হইয়া মন্ত্রী-বিরহিত অরাজক দেশের রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন। এই সৌভাগ্য-লাভ করিতে, অসদুপায় লব্ধ বীরেন্দ্রের কতকগুলি চিটিপত্র ও জীবন-বৃত্তান্ত অভিরামের প্রধান সোপান। মন্ত্রী-তনয়া বিলাসবতীর পাণি-গ্রহণ করিতে পারিলেই রাজ্যাধিকার নিষ্কণ্টক হইবে জানিয়া অভিরাম প্রভাবতীর লাভ-লালসায় ব্যাকুল হইলেন। অনেক আয়াসে বাসনা ফলে পরিণত করিলেন। কিন্তু সংখ্যাতীত অনুতাপ তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য সুস্থচিত্তে ভোগ করিতে দিল না। অনুতাপ অভিরামকে আক্রমণ করিয়া দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থির থাকিতে একান্ত অসমর্থ। রাজ-দর্প অনুতাপকে বশীভূত করিতে পারিল না। বিবাহের পর হইতে নব-ভূপতি কখন কখন মূর্চ্ছিত হইতে আরম্ভ করিলেন। অনুসন্ধিৎসু বিলাসবতীর চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বলিলেন, আমি রোগাক্রান্ত; কাশীতে না যাইলে পীড়ার উপশমের কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মঙ্গলের উপর অনেকের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে; একারণ কাল-বিলম্ব ব্যতিরেকে সস্ত্রীক অভিরাম কাশী-যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কুঠার-ক্ষত, একণে সুস্থপ্রায়, বীরেন্দ্রকে দর্শন করিলেন। অমনি মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিল। কিন্তু কাশী-যাত্রা বন্ধ হইল না। সুস্থ হইয়া বীরেন্দ্র স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এক্ষণে পঞ্চতীতে উপনীত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান রাজ-মন্ত্রী বীরেন্দ্রের প্রতিকূল নহেন। তিনি বীরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন এবং সাদরে তাঁহার সৎকার করিতে লাগিলেন। ক্রমে অতিথি মন্ত্রী মহাশয়ের অনুগ্রহে স্বরাজ্যও প্রাপ্ত হইলেন।

অতিথিভাবে অবস্থিতি কালে বীরেন্দ্র একদিন নগরের প্রান্তভাগে সন্নিবেশিত ইংরাজ-শিবির সন্নিকটে শিলাতলে শয়ন করিয়া আছেন, এমত সময় তাঁহাদের জমিদারীর পূর্ব্ব-ম্যানেজার উইলমট সাহেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর তাঁহারা উভয়েই যে উভয়ের পরিচিত তাহা বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিলেন। উইলমট সাহেব জয়মনিয়ার মোকদ্দমায় শুনিয়াছেন বীরেন্দ্র নিহত হইয়াছেন;

কেবল সন্দেহ প্রযুক্ত সে দিবস মোকদ্দমা স্থগিত রাখেন। এক্ষণে সেই সন্দেহ সম্পূর্ণ রূপে অপনীত হইল। তিনি, জয়মনিয়া নামে চঞ্চল-চিত্ত বীরেন্দ্রকে জয়মনিয়ার নিকট লইয়া গেলেন।

উভয়ের বহুদিনের আশা সফল হইল। পর দিন মোকদ্দমার দিন হওয়াতে বিচারালয় জনাকীর্ণ। নিশঙ্ক জয়মনিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত পুলিষ ও জিম্মা এবং তৎপক্ষণ পরেই সাহেবের অনুগ্রহে বীরেন্দ্র বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষগণ অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিল। মৃত মনুষ্য জীবন লাভ করিয়াছে। বীরেন্দ্র বিচারালয়ে উপস্থিত!

এক্ষণে সুবিচার দর্শন দূরে থাকুক, আপন আপন প্রাণ লইয়া বিপক্ষগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সাহেবের আজ্ঞায় বাটীতে যাওয়া হইল না; শ্রীঘরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন।

বিচারে ধর্ম্মেরই জয় হইল। রাহুগ্রস্ত সুধাকর রাহুর কবল-মুক্ত হইলেন। জয়মনিয়া বহুদিনের বিরহিত বীরেন্দ্রের দর্শনে নয়নের ও মনের পিপাসা মিটাইয়া লইলেন। বীরেন্দ্র বিপিনের বিহঙ্গিনীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে চাহিলেন। দুরাশা সফল হইল না। বিহঙ্গিনী উড়িয়া গেল।

রাজ-মন্ত্রী মুকুন্দরাম কাশীস্থ কপটরাজের পত্নীকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন যে, তোমার পতি চাতুরিতে আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাজ্য-লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃত বীরেন্দ্র এক্ষণে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিলাসবতী এত দিন কেবল সন্দীহান মাত্র ছিলেন। এক্ষণে এক প্রকার বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কি করেন; স্বামী যেই হউক না কেন, রাজ-মহিষী হইতে হইবে। সুতরাং অভিরামকে এতদ্বিষয়ক অণুমাত্র আভাস দিয়া উভয়ে পঞ্চুতী যাত্রা স্থির করিলেন।

তাঁহার অভিলাষ সামান্য অভিলাষ। স্বামীর সাধ্য নাই যে তাহার বিরুদ্ধে কথামাত্র কহেন। তাঁহারা পঞ্চুতী আসিলেন। রাজ-তোরণে শিবিকা আসিল—দ্বার রুদ্ধ। অনেক কষ্টে মুক্ত হইল। অভিরাম যাহার চিন্তায় এত দিন কখন আত্মবিস্মৃত, কখন বিকলচিত্ত, কখন মূর্চ্ছিত হইতে ছিলেন সেই বীরেন্দ্র এক্ষণে পঞ্চুতীর রাজা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অভিরাম মুখ তুলিতে পারেন না, তা কথা কহিবেন কি? বিলাসবতী মন্ত্রী এবং বীরেন্দ্রের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সপতি আপন বাটীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অভিরামের সকল কৌশল প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিবেন? বিলাসবতী

বিপদে অভিভূতা হইবার পাত্রী নহেন; তিনি তুলা-রাশির নিম্নস্থ অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আজ্ঞাকারী অভিরামকে আজ্ঞা করিলেন, যে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বীরেন্দ্রকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখ যে, তিনি যেন কল্য প্রত্যূষে নদী-তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তুমি গোপনে তাঁহার সহিত সমস্ত বিবাদ ভঞ্জন করিবে। পূর্ব্ব সৌহার্দ্য দূরীভূত করাই তোমার প্রধান উদ্দেশ্য। বীরেন্দ্র সরল হৃদয়—তোমার পত্রের অর্থ বুঝিতে পারিবে না। নদীকূলে নিশ্চয়ই আসিবে। সেই সময়ে আপন অভিলাষ পূর্ণ করিও। এই সুযোগ ব্যর্থ হইলে জানিবে যে, তোমার ভাগ্যে অমঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই নাই। অভিরাম বাতাসের আগে উড়েন। সিংহাসন প্রাপ্তির নিমিত্ত যত না হউক, প্রণয়িনীকে সন্তুষ্ট করিতেই ব্যতিব্যস্ত। পত্র প্রেরিত হইল। বীরেন্দ্র নিয়মিত সময়ে একাকী নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অদ্বিতীয় সুহৃদও আত্ম বিরোধের মূলোচ্ছেদ করিতে ছুরিকা হস্তে সম্মুখে উপনীত। অভিরামের সহোদরা বীরেন্দ্রের চিন্তামণি। তিনি প্রভাবতী লাভ-লালসায় আকুল। প্রভাবতীর আত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আশা সফল হইবে। সুহৃদের প্রতি যদিও কিছু সন্দেহ হইত, বীরেন্দ্র তাহার তিলমাত্র মনে স্থান দিলেন না। প্রভাবতী তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্থান অবরোধ করিয়াছেন। মেঘাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে রাহু ও শশী একত্র হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর অভিরাম বীরেন্দ্রকে নদী-তীরে লইয়া চলিলেন। উভয়েই আপন আপন অভীষ্ট বিষয় লইয়া তৎ সিদ্ধির উপায় চিন্তায় নিমগ্ন।

এমত সময় বীরেন্দ্রের গ্রীবাদেশে কাহার কঠোর কর আসিয়া শ্বাস রোধ করিল; আবার মুক্তও হইল। বীরেন্দ্র দেখিলেন,—অভিরাম— কালান্তক। উভয়ে সাধ্যানুরূপ স্ব স্ব অভিলাষ সিদ্ধির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; অভিরামের অভিলাষ বিফল হইবে কেন? তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া কর-স্থিত অশনি সঞ্চালন করিলেন। সংখ্যাতীত বিপদে যিনি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কি এক্ষণে তাঁহাকে রক্ষা করিতে বিমুখ হইবেন? কখনই নহে। জয়মনিয়া বীরেন্দ্রের নিকট হইতে উড়িয়া গিয়া এই অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই ঘোর বিপদ হইতে বীরেন্দ্রকে রক্ষা করিতে আসিলেন। অশনি বীরেন্দ্রকে লক্ষ্য না করিয়া জয়মনিয়ার

শিরে পতিত হইল। কিন্তু অণুমাত্রও কাতর করিতে সমর্থ হইল না।

অভিরাম পলায়ন করিল। বীরেন্দ্র ও রজমন জয়মনিয়াকে লইয়া রাজবাটীতে উপনীত হইলেন। বীরেন্দ্র বাটীতে যাইবামাত্র চতুর্দ্দিকে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। বীরেন্দ্র ও মুকুন্দরাম বৈদ্যের হস্তে জয়মনিয়ার ভার অর্পণ করিয়া অভিরামের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর দূরবর্ত্তী গিরিডি নামক রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। এই সময়ে এক খানি গাড়ি গিরিডিতে আসিল। সমাতুল প্রভাবতী সেই গাড়ি হইতে নামিয়া দাদার গলা জড়াইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না; দাদার তখন প্রাণ লইয়া টানাটানি। শ্যেনের ভয়ে পতঙ্গ আকুল। গাড়ি চড়িয়া দূর দেশে যাওয়া দূরে গেল; লম্ফ প্রদান করিয়া রেল পার হইবেন, এমত সময় শকট তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া পঞ্চতী রাজ্য নিষ্কণ্টক ও ধরিত্রীর পাপভার হরণ করিল। প্রভাবতীর সুখ-শশী ভ্রাতৃশোক রাহুতেগ্রাস করিল। নয় দণ্ড পরে গ্রহণ ছাড়িল। সমাতুলপ্রভাবতী বীরেন্দ্রের সহিত রাজবাটিতে উপস্থিত হইলেন। রাজবাটিতে কানন-কুসুম শেষ শয্যায় শয়িতা। সকলেই তাহার মুখের দিকে নেত্র স্থির করিয়া অন্তিম মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছেন।

জয়মনিয়া অনেক কথা কহিলেন। রজমন কাঁদিলেন। বীরেন্দ্রের ইচ্ছা কানন-কুসুম জয়মনিয়া তাঁহার হৃদয়ানন্দ-দায়িনী হন। কিন্তু জয়মনিয়া তাঁহার পত্নী হইবার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। অলক্ষ্য প্রদেশে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে। তিনি গমনোদ্যত। বীরেন্দ্র জয়মনিয়া হইতে প্রাপ্ত উপকারের প্রতিশোধ দিতে উদ্যত। কিন্তু কে গ্রহণ করিবে? জয়মনিয়া উপকারের প্রত্যাশায় উপকার করেন নাই। অবশেষে, পুরস্কার গ্রহণ না করিলে বীরেন্দ্র নিতান্ত বিষণ্ন হন; অন্তিম সময়ে তাঁহার বিষণ্ন বদন দর্শন করিয়া এ জীবনের মত নয়ন মুদ্রিত করিতে হয় এই ভাবিয়া, যখন বীরেন্দ্র প্রভাবতীকে নিকটে আনিয়া তাঁহার পরিচয় দিয়া দেন, তখন বীরেন্দ্রের হস্তে তাহার হস্ত অর্পণ করিয়া অন্তিমকালীন অস্পৃষ্টস্বরে বলিলেন;— "বীরেন্দ্র! তুমি আমার কার্য্যের জন্য সন্তুষ্ট হইয়া অনেক দিন হইতে আমাকে পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইতেছিলে। আমি এত কাল পুরস্কার গ্রহণ করি নাই। এই আমার অন্তিম-কাল উপস্থিত। আমি এই তোমার পুরস্কার গ্রহণ করিতেছি। আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে একটী মণি প্রদান করিয়াছিলাম। এখন এই গৌরাঙ্গীকে

তোমাকে সম্প্রদান করিলাম। তুমি প্রভাবতীকে গ্রহণ করিলে, স্বকর্ণে এই কথা শুনিলে অন্তরে যে বিমল সুখ-ভোগ করিব সেই আমার এখনকার প্রশস্ত পুরস্কার। আমি এখন পৃথিবী হইতে চলিলাম। পার্থিব কোন বিষয়েই আমার প্রয়োজন নাই।”

এই বলিয়া জয়মনিয়া নীরব হইলেন। প্রাণ-বায়ু কলেবর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। কানন-কুসুম বৃন্ত-চ্যুত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। রজমন জয়মনিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া ধরাতলে থাকিবেন? তিনিও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অতঃপর বীরেন্দ্র ও প্রভাবতীর পরিণয় সমাপ্ত হইলে, চতুরা বিলাসবতী আপনার জীবনের উপর চ প্রকাশ করিল। এই তাহার শেষ চাতুরী। ছুরিকাঘাতে আত্মঘাতিনী হইল।

কেহ বলেন ইতিবৃত্তের জটিলতা, প্রত্যেক ঘটনার—প্রধান ঘটনার উপযোগিতা ও কৌতূহলোদ্দীপকতা নবন্যাসের প্রাণস্বরূপ। কেহ বলেন মানব চরিত্রের প্রকৃতি ও ক্রিয়াগত প্রভেদ প্রদর্শন ও সুচারু-রূপে প্রকৃতির যথাযথ বর্ণনই তাহার জীবন্ত ভাব। একণে যত প্রকার নভেল প্রকাশিত হইতেছে তৎসমুদয়ই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একটী বঙ্কিম বাবুর পন্থানুসরণ করিয়া কৌশলময়ী লেখনীতে বিবিধ চিত্রে চিত্রিত। অপরটী কালধর্ম্মানুযায়িক মানবগণের চরিত্রচিত্রে পরিপূর্ণ। কানন-কুসুম শেষোক্তের অন্তর্গত।

গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্যের দুর্গম জনহীন নিভৃত প্রদেশ-জাত কণ্টকীবৃক্ষে প্রস্ফুটিত কুসুম, আজন্ম মনুষ্য-যত্নে পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত কুসুমের ন্যায় সদ্গন্ধশালী হয় কি না, তাহাই দেখান। কানন-কুসুমে গ্রন্থকারের সেই বাসনা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইয়াছে। কানন-কুসুম পাঠে পাঠক মাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, স্বভাবতঃ স্বাভাবিক প্রকৃতি নিচয় কতদূর প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে। করুণা, মমতা প্রভৃতি স্বাভাবিক সদ্‌গুণের সহিত শিক্ষার কোন সম্বন্ধ আছে কি না। কানন-কুসুম পাঠ করিলে, যাঁহারা ভাবেন অসদ্বংশ অসন্তানের, মরুভূমি তপন-কিরণে তপ্ত কালান্তক কালোপম বালুকা ও কুহকিনী মরীচিকার এবং দুস্তর পারাবার মকর কুম্ভীর প্রভৃতি নরঘ্ন জীব ও অত্যুন্নত শৈলমালার আকর স্থান, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, সেই চির-কালিমাবৃত নীচকুলে নারী-কুলের শিরোভূষণ-স্বরূপা জয়মনিয়া মহান রত্ন, সেই অকূল অর্ণবে শত শত ভূপতি-দুর্ল্লভ মহারত্ন

এবং সেই জীবিত শ্মশানে পান্থপাদপ জন্ম গ্রহণ করে কি না। কোন্ রমণী রাজ-মহিষী হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের একেশ্বরী ও অগণিত মণিমাণিক্যাদি বিভূষিতা হইয়া বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে অভিলাষ না করে? জগত-দুর্লভ ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিতে কোন্ রমণীর হৃদয় অণুমাত্র বিচলিত না হয়? পাঠক! দেখুন বীরেন্দ্র আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য অঞ্জলি করিয়া জয়মনিয়ার করে অর্পণ করিতে যাইতেছেন, তিনি একবার তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কেন করিলেন না? সাধারণতঃ স্ত্রী-স্বভাব জয়মনিয়াকে বশীভূত করিতে পারে নাই। "সৎস্য কন্যা আত্মরক্ষা করিতে পারে।" ফলতঃ কানন-কুসুম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার বৃন্ত হইতে সপত্র কেশর পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্ব স্থানেই সুকুসুমোচিত প্রায় সর্ব্ব পদার্থই বিদ্যমান আছে।

বিলাসবতী, বিলাসবতী নামের উপযুক্তা পাত্রী। আমাদের ইচ্ছা তিনি স্বগুণোচিত একটী বিশেষণ প্রাপ্ত হন। সেটী "চতুরিকা"। চতুরিকা বিলাসবতী, অভিরাম কেন, একটী কাঠের পুতুল পাইলেও তাহাকে পঞ্চতীর রাজসিংহাসনের অধিকারী করিয়া রাজ্য-পালন করিতে পারিতেন। বীরেন্দ্র পৃথিবী সুদ্ধলোকের সাহায্যে তাহার কিছুই করিতে পারিতেন না। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ; অভিরাম কাষ্ঠ-পুত্তলিকা অপেক্ষাও অধম। পাঠোপক্রমে আমরা ভাবিয়াছিলাম তিনি বীরেন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হইবেন। কিন্তু পূর্ব্ব ভাব হইতে তাঁহার যেরূপ ভাবান্তর হইয়াছিল তাহা চিত্র করিতে গ্রন্থকার বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন; সফলও হইয়াছেন।

প্রভাবতীর পরিচয় আমরা অধিক প্রাপ্ত হই নাই। তবে যতদূর তিনি আমাদের পরিচিত তাহাতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি স্বকুলের একটী প্রধান রত্ন। খনি মধ্যে বিবিধ আবর্জ্জনায় আবৃত ছিলেন তাঁহার জ্যোতিঃ কেহ ভাল দেখিতে পায় নাই। এক্ষণে কাঞ্চনে মণ্ডিত হইয়া যথাস্থানে স্থাপিত হইলেন—স্বীয় সুবিমল প্রভায় ধাতা ও দর্শকগণের মনোহরণ করিবেন।

বীরেন্দ্র পঞ্চতীর রাজা; কিঞ্চিত প্রচ্ছন্ন-বেশী। কারণ সর্ব্বত্র আমরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া চিনিতে পারি নাই। অভিরাম কার্য্যদক্ষ, বুদ্ধিহীন। পাপকার্য্য করিয়া যে প্রকার অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছে তাহা অতীব উপযুক্ত। কিন্তু পাপ কর্ম্মে শঙ্কিত হইবার মূলোচ্ছেদের কুঠার তাঁহার হস্তে ছিল। কেবল ইচ্ছায় আপনি অনুতপ্ত হইলেন। রঙ্গমন জয়মনিয়ার

একটী 'পাগলা ছেলে'। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিঞ্চিত পরে আমরা ভাবিয়াছিলাম সূর্য্য বাবু দয়া করিয়া তাহাকে সংসারী করিবার নিমিত্ত একটী রমণী-রত্ন ও সে কে আমাদিগকে পরিচয় দিয়া দিবেন। দুঃখের বিষয় তাহার ফুলও ফুটিলনা। আমাদেরও আশা বিফল হইল। রজমনের বিবাহ হইলনা। তিনি তারা গুণিতে ও নদীর কথা শুনিতে আসিয়াছিলেন। জয়মনিয়া প্রস্থান করিলেন; অমনি দেখি তিনিও অন্তর্দ্ধান!! স্বকার্য্য কতদূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিতে পারি না। সূর্য্য বাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতে না হইলে বোধ হয় জিন্যাকে কারাগারের ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। তাহার কষ্ট তাঁহার দোষে। সে ইচ্ছা করিলে গোপনে স্বকার্য্য সাধন করিতে পারিত। যাহাহউক পাপাত্মারা কর্ম্মোচিত ফল-ভোগ করে ইহাই প্রার্থনীয়। কানন-কুসুম প্রণেতা বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ লেখকদিগের মত বিজাতি বিদ্বেষী নহেন। তাঁহার উইলমট সহেব স্বর্গীয় দূত। তাঁহাকে দেখিলেই তজ্জাতির উপর কেমন একটী ভক্তির উদ্রেক হয়। ফলতঃ প্রত্যেক বিচারালয়ে যদি এক এক জন উইলমট সাহেব থাকিতেন তাহা হইলে এতদিন অনেক জয়মনিয়ার মুক্তি ও জিন্যার কারাবাস হইত। পুস্তক সমালোচন করিতে হইলে তৎ পুস্তকের একটী অংশ উদ্ধৃত করিতে হয়। কিন্তু কানন-কুসুমের এমন একটী স্থল আছে যে, তাহা হইতে পত্রোচিত অংশ উদ্ধৃত করিলে আপনাকে পক্ষপাতিতা দোষ হইতে মুক্ত করিবার উপায় থাকে না। একারণ পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা কানন কুসুম অষ্টম স্তবক আমূল শীর্ষ পাঠ করিয়া দেখুন, কত রত্ন একস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। কালসহকারে পুস্তক খানি যদি অগ্নিদ্বারা আক্রান্ত হয় তাহা হইলে সমস্ত অংশ পুড়িয়া গেলেও অষ্টম স্তবকটী যেমন তেমনই থাকিবে। অগ্নির সাধ্য নাই তাহাকে স্পর্শ করে। চিন্তাশীল মনকে বশীভূত করিতে তাহার প্রত্যেক পংক্তি সজ্জিত। গ্রন্থ খানির ভাষা সুন্দর রূপে মার্জ্জিত। এমন কি স্থান বিশেষ বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত হইতে পারে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা বই পড়িয়া হাসিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে।

অনন্তর দোষ গুণ বিচার করিয়া বিবেচনা করিতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গ সহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিতে সূর্য্য বাবু লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তিনি যে স্বকার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন তাহা তাঁহার কানন-কুসুম বলিয়া দিতেছে। শ্রী:—*

* এই সমালোচনের সহিত জ্ঞানাঙ্কুরের মতের ঐক্য নাই। (জ্ঞাঃ সং)

পাটলীপুত্র।

ভুবন-বিখ্যাত মগধ-রাজদিগের প্রিয়তম রাজধানী পাটলীপুত্র নগরের নাম অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। কোন্ মহাত্মা কর্তৃক এই মহা সমৃদ্ধিশালী নগরী সংস্থাপিত হয়, কোন্ সময়ে এবং কি কারণেই বা ইহার কুসুমপুর নাম হয়, এবং কিরূপে এক্ষণে ইহা 'পাটনা নামে বিখ্যাত হইয়াছে, ইহা জানিতে অনেকেরই কৌতূহল শিখা উদ্দীপ্ত হইতে পারে; কিন্তু আমরা সে কৌতূহল সম্যক নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইব কি না বলিতে পারিনা, তথাপি আমরা উহার যত দূর পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গ সমীপে উপহার প্রদান করিতেছি। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ মহাশয়রা, এই বিবরণ পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা কখনই প্রত্যাশা করা যায় না।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ নামক অতীত সাময়িক পত্রের দ্বিতীয় পর্ব্বের বিংশ খণ্ডে, পাটনা নগর বিবরণে, লিখিত হইয়াছে "পাটনা অতিপ্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। পরন্তু যে স্থানে ইহার স্থিতি তাহা ঐ নগর অপেক্ষাও প্রসিদ্ধ। ভুবন-বিখ্যাত পাটলীপুত্র নগর, যাহার অতুল বিভব ও অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্য হইতে 'কুসুমপুর' আখ্যার উৎপত্তি হয়,—যাহা রামায়ণ, মহাভারত, মুদ্রারাক্ষসাদি এতদ্দেশীয় সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—যাহাতে অবস্থান করিয়া নন্দ, চন্দ্র গুপ্তাদি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত ভূপাল সকল ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন,—পূর্ব্বকালে সেই মহানগর ঐ স্থানে ছিল। ঐ নগর কলিকাতা হইতে প্রায় ৪০০ জ্যোতিষি ক্রোশ অন্তর। গঙ্গার বাম তটে এক উচ্চ প্রস্তরময় স্থানে তাহার স্থিতি; এবং অধুনা বাহার অঞ্চলের প্রধান নগর রূপে গণ্য। তাহার ঐশ্বর্য্যের আধিক্যতা জ্ঞাপনার্থে ঐ মহানগর 'পট্টন' ও তদপভ্রংশে 'পাটনা' শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে।"

ঐ প্রস্তাবের অপর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, "পাটনা তীর্থস্থানের মধ্যে গণ্য নহে; সুতরাং তাহাতে ধর্ম্মোন্মুখ যাত্রীর সমাগম নাই, এবং কোন দেব মন্দিরও বিশেষ বিখ্যাত নাই। পাটনাদেবী বা পাটনেশ্বরী দেবীর দুই মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; কিন্তু তাহা নব্য এবং যৎসামান্য।"

বিবিধার্থ সংগ্রহে পাটনা নগরীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ঐ পর্য্যন্তই লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ কহেন প্রাচীন পাটলীপুত্র ও এক্ষণকার পাটনা নগর

এক নহে। তাঁহারা কহেন পাটলী-পুত্র স্থানে এখন বগলী পুর নগর সংস্থাপিত আছে। তাঁহারা ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ দিতে পারেন না। পাটলী পুত্র এবং বগলী পুর এই উভয় নামে লী ও পুর এই অক্ষর দ্বয়ে মাত্র সাদৃশ্য আছে; ইহাতেই যদি তাঁহাদের এই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, বলিতে পারি না। অপভ্রংশে আদ্যাক্ষরের অতি অল্পই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। পাটলীপুত্র হইতে পাটলী, তৎপরে পাটন এবং শেষে পাটনা হওয়া যত সহজ বোধ হয়, পাটলীপুত্র হইতে বগলীপুর হওয়া তত সহজ ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শব্দ সহজ করিবার জন্যই অপভ্রংশের আবির্ভাব। সুতরাং পাটলীপুত্র হইতে পাটনা হওয়া অনেকাংশে সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

পাটনা নগরী সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর গল্প আছে, তাহা এস্থলে প্রকাশ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে বিবেচনায় নিম্নে তাহার সবিস্তার বিবরণ লিখিত হইল।

সত্য যুগে কৌশাম্বী নগরে ভুমিদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; কুশ ও বিকুশ নামে তাঁহার দুই পুত্র সন্তান ছিলেন। কালক্রমে ঐ দুই পুত্রের সহিত সর্ব্বসিদ্ধি নামক এক ঋষির প্রমতি ও সুমতি নাম্নী কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয়। একদা ভ্রাতৃদ্বয় অত্যন্ত দীন হীন দশাপন্ন হইয়া স্ব স্ব সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। কতিপয় দিবস অবিশ্রান্ত ভ্রমণের পর, তাঁহারা এক নির্জ্জন বন প্রদেশে উপস্থিত হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত স্বভাব সম্পাদিত সুকোমল শষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রে ভ্রাতৃদ্বয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তাঁহারা দেখিলেন, রমণীদ্বয় গত কতিপয় দিবসের পথ-শ্রান্তি জন্য নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। উভয়ে পরামর্শ করিলেন যে, আমাদিগকে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া দ্বারে২ ভ্রমণ করিতে হইবে। এরূপ স্থলে স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই বিবেচনা করিয়া রমণীদ্বয়কে তদবস্থায় রাখিয়া তাঁহারা পলায়ন করিলেন। হর-পার্ব্বতী সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন নিঃসহায়া দুই রমণী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। পার্ব্বতী মনে মনে তাহাদের অবস্থা অবগত হইয়া মহাদেবকে কহিলেন, "দেব! এই দুইটি অবলার যাহাতে দুঃখ দূর হয় তাহা করুন।" সদয়হৃদয় দেবাদিদেব মহাদেব বর দিলেন "কনিষ্ঠা রমণী সুমতি পূর্ণ সসত্বা আছে, তাহার গর্ভে এই রাত্রেই এক পুত্র সন্তান জন্মিবে। তাহার নাম হইবে পুত্র। সেই পুত্র

নিদ্রোত্থিত হইবামাত্র তাহার মস্তক হইতে সহস্র সুবর্ণ বর্ষণ হইবে।” অনুল্লঙ্ঘনীয় শিব-বাক্য সর্ব্বাংশে ফলিত হইল। সেই রাত্রে সুমতির পুত্রসন্তান জন্মিল, এবং সেই সন্তান নিদ্রোত্থিত হইবামাত্র তাহার মস্তক হইতে সহস্র সুবর্ণখণ্ড ভূমিতে পতিত হইল। রমণীদ্বয় এই বিপন্ন সময়ে সন্তান পাইয়া কথঞ্চিৎ হর্ষিত হইল বটে, কিন্তু সহস্র সুবর্ণ খণ্ড দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, হয়তো তাহাদিগকে চোর বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এই ভয়ে তাহারা প্রাতঃকালে তথা হইতে পলায়ন করিল। কিন্তু যেখানেই যায় শিব-বাক্য কোন স্থানেই নিষ্ফল হইবার নহে। সকল স্থানেই পুত্রের মস্তক হইতে সহস্র সুবর্ণ-খণ্ড পাত হইতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা স্বপ্নাবেশে শিব-মহিমা অবগত হইল। এইরূপে রমণী-যুগল নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে বারাণসী ধামে যাইয়া অবস্থিতি করিল। পুত্রের নাম পুত্র থাকিল। পুত্র ক্রমে ক্রমে ধনবান্ হইতে লাগিলেন। অকাতরে দরিদ্রদিগকে ধন দান করায় চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। অতি দূরদেশ হইতে প্রার্থীগণ আসিয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইবা মাত্র তিনি তাহাদিগকে ধন দানে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এসময়ে কুশ ও বিকুশ কর্ণাট দেশে ভিক্ষুকবেশে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহারা লোক পরম্পরায় শুনিলেন, বারাণসী-ধামে পুত্র নামে এক বালক অকাতরে দরিদ্রদিগকে ধনদান করিতেছেন। ভ্রাতৃদ্বয় এতদ্বাক্য শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া দান প্রাপ্তির আশয়ে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন পুত্রের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, তখন পুত্র-জননী সুমতি প্রাসাদোপরি বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর-মধ্যে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহারা সমুদায় জ্ঞাত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পুত্রের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাঁহার পিতার অন্তরে এক অস্বাভাবিক হিংসার আবির্ভাব হইল। তিনি গোপনে পুত্রের নিধন চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ নৃশংস ব্যাপার সম্পাদনের কোন উপায় না দেখিয়া পরিশেষে কতিপয় চণ্ডালকে উক্ত দুষ্কৃতি সাধনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। চণ্ডালগণ পুত্রসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল,“আমরা বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পাণ্ডা। যখন তুমি মাতৃ-গর্ভে ছিলে, তখন এরূপ প্রত্যাদেশ হয় যে, তুমি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্বয়ং দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পূজা

দিবে। আমরা এখন তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে আসিয়াছি। “পুত্র পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে নৃশংস পিতা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দান করিলেন। চণ্ডালেরা পুত্রকে এক নির্জ্জন অরণ্যে লইয়া গিয়া প্রথমে তাঁহাকে সমুদায় বিষয় বলিয়া তাঁহার শিরে খড়্গাঘাত করিল। পুত্র দৈববলে বলীয়ান্, কাহার সাধ্য সহজে তাঁহার জীবন সংহার করে! খড়্গ মৃত্তিকায় পতিত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। অতঃপর চণ্ডালেরা পুত্র সমীপে কিঞ্চিৎ পুরস্কার লইয়া তাঁহাকে সেই নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহারা কাশীশ্বের বিকুশ সমীপে গমন করিয়া নির্দ্দেশিত কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া পুরস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। এইরূপে পুত্র সেই নির্ব্বান্ধব বনপ্রদেশে আকুল হৃদয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রজনী সমাগতা হইলে এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। মধ্যরাত্রে শঙ্কট ও বিকট নামে দুই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। আতঙ্কে পুত্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। রাক্ষসেরা বৃক্ষোপরি পুত্রকে দেখিয়া কহিল, “তোমার কোন ভয় নাই। তুমি বৃক্ষ হইতে নামিয়া আমাদের একটী বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেও।” পুত্র কি করেন, অগত্যা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। তাহারা কহিতে লাগিল, “আমরা করিবক নামা রাক্ষসের পুত্র। পিতা বহুকাল মহাদেবের তপস্যা করেন; মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া পিতাকে তিনটী দ্রব্য দেন। প্রথম এক জোড়া বিনামা, উহা চরণে ধারণ করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করা যায়। দ্বিতীয় একটী ক্ষুদ্র পেটিকা, যখন তাহার মধ্যে হস্ত প্রদান করিবে, তখনই বহুমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইবে। তৃতীয় এক গাছি যষ্টি, উহা হস্তে লইয়া ঘুরাইলে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই স্থানে সুপ্রশস্ত সমৃদ্ধিশালী নগর সংস্থাপিত হইবে। এক্ষণে আমাদের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, এই দ্রব্য গুলি আমাদের মধ্যে কে পাইবে?” পুত্র কহিলেন, “তোমরা উভয়ে ঐ দূরস্থিত বৃক্ষতলে যাও, দ্রব্যগুলি এখানে থাকুক, তোমরা যে আসিয়া অগ্রে উহাদিগকে স্পর্শ করিবে, দ্রব্যগুলি তাহারই হইবে।” রাক্ষসেরা নির্দ্দেশিত বৃক্ষতলে যাইল, এমন সময়ে দৈববাণী হইল “বালক! আর বিলম্ব কেন? চরণে পাদুকা ধারণ করত পেটিকা ও যষ্টি লইয়া সিংহল দ্বীপে গমন কর।” পুত্র উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিবামাত্র সিংহল দ্বীপের এক মনোহর সরোবরতীরে উপনীত হইলেন। পুত্র তথায় লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিলেন, তথাকার রাজা পটলেশ্বরের পাটলী নাম্নী এক যুবতী কন্যা আছে। এরূপ দৈববাণী

আছে যে, পুত্র নামে কোন বৈদেশিক যুবক আসিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিবে। পুত্র দৈববাণীর ভাবগ্রহ করিয়া রজনীযোগে গোপনে পাটলীর প্রকোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। যুবতী তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে সম্মত হইলেন। পুত্র চরণে বিনামা ধারণ করত পাটলীকে পৃষ্ঠে লইয়া গঙ্গার দক্ষিণ তীর, গয়ার উত্তর, সোনভদ্রের পূর্ব্ব এবং পুনপুনা নদীর পশ্চিম এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে উপনীত হইলেন। তথায় দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নারদ তথায় দ্বারা এক নগর সংস্থাপনের পরামর্শ দিলেন। পুত্র তথায় এক অপূর্ব্ব নগরী সংস্থাপন পুরঃসর আপনার ও স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নাম একত্র সংযোগ করিয়া ঐ মহানগরীর 'পাটলীপুত্র' নাম রাখিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি নানা দেশ জয় করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হইলেন।

পুত্রের কুসুম নামে এক পুত্র কিয়ৎকাল বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য কিছুদিন এই মহানগরী কুসুমপুর নামে অভিহিত হইয়াছিল। কুসুমের পটন নামে এক পুত্র ও পাটনা নাম্নী এক কন্যা ছিল। পটনের নামানুসারে নগরী পটন নাম ধারণ করে। পাটনা বিবাহ করেন নাই, চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা দেব-সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কালে তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিই উক্ত নগরীর অধিষ্ঠাত্রী পাটনাদেবী বা পাটনেশ্বরী; এবং তাঁহারই নামানুসারে নগরীর পাটনা নাম হইয়াছে। পুত্র বৃদ্ধ হইয়া সস্ত্রীক কৈলাস-ধামে গমন পূর্ব্বক শঙ্কট বিকট রাক্ষসের নিকট প্রাপ্ত দ্রব্যত্রয় মহাদেবকে অর্পণ করিলেন।

ইহাই পাটলীপুত্র অধুনা পাটনা নগরের ইতিবৃত্ত। উপরে যে উপাখ্যানটী লিখিত হইল, উহা পরম্পরাগত কিংবদন্তী নহে, বৃহৎ কথায় উহার মুল আছে। প্রাচীন দেশ মাত্রেই তত্তদ্দেশের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদক এরূপ উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। দেবতা, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি প্রায়ই সেই সেই উপাখ্যানে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে.সেই জন্য সে সকলনব্য সম্প্রদায়ীর নিকট তাদৃশ বিশ্বসনীয় বলিয়া বোধ হয় না। ঐ উপাখ্যানগুলির পল্লবিত অংশ পরিত্যাগ করিলে অনেকাংশে উহার অলীকত্ব দুর হয়। ইহা কখনই অসম্ভাবিত নহে যে, পুত্র নামা কোন দরিদ্র সন্তান ক্রমে বিপুল ধনশালী হইয়া উঠেন। কালক্রমে সিংহল-রাজ-দুহিতা পাটলীর সহিত তাঁহার বিবাহ

হয় এবং তিনি পাটলীপুত্র নামে নগর স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র কুসুম হইতে কুসুমপুরএবং তাঁহার পুত্র পটন ও কন্যা পাটনা হইতে নগরী পট্টন ও পাটনা নাম ধারণ করে। এই কয়েকটী কথা যত পল্লবিত করিবে ততই উপাখ্যান বিস্তারিত হইবে।

বিবিধার্থ সংগ্রহের পাটনা প্রস্তাব লেখক লিখিয়াছেন, "যাহা রামায়ণ মহাভারত, মুদ্রারাক্ষসাদি এতদ্দেশীয়সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে।" আমরা এ কথায় সম্যক অনুমোদন করিতে পারি না। রামায়ণে পাটলীপুত্রের নাম কোথা হইতে আসিবে ? মহাভারতে মগধ রাজ্যের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তখন পাটলীপুত্র নগর রাজধানী রূপে পরিগণিত হয় নাই। আর লেখক যে পাটনাদেবী বা পাটনেশ্বরীর মন্দির অতি নব্য বলিয়াছেন, ইহাতে পাঠকবর্গ যার পর নাই চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। ইহা যতই নব্য হউক না কেন, পাটনা নামের সহিত উহার সম্পূর্ণ সংস্রব আছে এ কথা কে না স্বীকার করিবেন ? সুতরাং উহাও যে প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না।

কোথা পাব সুখ ?

কোথা পাব সুখ ? কে কবে আমারে ?
রাজার প্রাসাদে, গৃহীর আগারে,
দীনের কুটীরে, দেবের মন্দিরে,
কোথায় না আমি, সুখ পাইবারে,
খুঁজিলাম এই ভবের বাজারে ?

সরলতাময় শৈশব সময়,
হিতাহিত বোধে অক্ষম হৃদয়,
শিশুগণসঙ্গে, ধূলা মাখি অঙ্গে
হইত আনন্দ পুতুল খেলায় ;
এখন কি তাহে মন সুখ পায় ?

শৈশব অবধি সুখের সন্ধানে
ফিরিলাম আমি কত শত স্থানে,—
ভীম হিমাচলে, সাগরের তলে,
সমতল ভূমে, মরুময় দেশে,
কোথা না গেলাম সুখের উদ্দেশে ?

পরে বিদ্যালয়ে, একপাঠী সনে
বিজ্ঞান রহস্যে, গণিত দর্শনে,
ভূগোল, জ্যোতিষে, কাব্য, ইতিহাসে,
পাইত আমোদ নবীন হৃদয়,
এখন সে সবে নাহি সুখোদয়।

৫

তার পর সেই যৌবন সময়
নবীনা নারীর কোমল প্রণয় .
ভাবে গদগদ, প্রেমে বশম্বদ,
কতই আগ্রহ দেখিতে সে মুখ,
নয়নে নয়নে কি অসীম সুখ !

৬

মধুর সন্ধ্যায় প্রমোদ কাননে,
কুসুম রূপিনী প্রিয়ার মিলনে,
তুলি ফুলভার, পরিতাম হার
দুজনে, বিরলে আনন্দ অপার ;
এবে সুখ তাহে নাহি কিছু আর ।

৭

প্রভাত-কুসুম সদৃশ নন্দনে
স্নেহের প্রতিমা তনয়া রতনে
ক্রোড়েতে লইতে, হৃদয়ে ধরিতে
জুড়াত জীবন, ভুলে যেত মন ;
এখন কি হেতু নহেরে তেমন ?

৮

কুবের দেবের আরাধনা তরে,
অগাধ তরঙ্গে, অকূল সাগরে
মুকুতা তুলিতে, প্রবাল লভিতে
ডুবি বার বার, ভীম রত্নাকরে
খাছিয়া লয়েছি তন্ন তন্ন করে ।

৯

আবার বসুধা হৃদয় খুলিয়া,
আঁধার গভীর আকর খুঁজিয়া,
কাঞ্চন রজত, আদি ধাতু কত
হীরা পান্না চুনি আর মণি যত
করেছি সকলি নিজ হস্ত গত ।

১০

সোণার প্রাঙ্গনে, হীরার মন্দিরে,
যশের পতাকা উড়ায়ে সমীরে,
কমল আসনে, কোমল ভূষণে,
পূজেছি কমলা যুগল চরণে,
এবে সুখ নাই ধন উপার্জ্জনে ।

১১

আবার কখন বিলাস ভবনে,
উজল আলোকে, সুবাস পবনে,
বেণু সপ্তস্বরা, মৃদঙ্গ সেতারা,
কামিনী চরণ নূপুরের সনে
মিলি একতানে বাজে মধুস্বনে ;

১২

কুটিল কটাক্ষে চৌদিক মোহিয়া
আনিতম্ববেনী পিছে দোলাইয়া,
নৃত্য গীত লয়ে, হাব ভাব চয়ে,
অঙ্গের বিক্ষেপে রূপের তরঙ্গে,
তুলি মৃদু মৃদু জাগায়ে অনঙ্গে,

১৩

নাচিত নর্ত্তকী মাতায়ে দর্শকে ,
সুধাপূর্ণ পাত্র ফিরিত চৌদিকে ;
সুমধুর তান, সুললিত গান
তখন সে সবে জুড়াত পরাণ ;
এবে তাহে হয় বিষ অনুমান ।

১৪

কখন কুটুম্ব সমাজে বসিয়া
হাসায়ে সকলে আপনি হাসিয়া
তাস পাশা ধরে, খোস গপ্প করে;
কভু তোষামোদে, কভু প্রশংসায়
তুষেছি সকলে যে যেমন চায় ।

১৫

হায় ! এইরূপে আশার ছলনে,
কতই যতনে সুখের কারণে,
কতই দেখেছি, কতই ঠেকেছি,
কতই শিখেছি একে একে করে
সুখ অন্বেষণে ধরণী ভিতরে।

১৬

নব নব ভোগে জনমে আহ্লাদ
পুরাণ হলেই অমনি বিষাদ,
বুঝিলাম সার খুঁজিবনা আর
ধরণীতে কিছু নিত্য সুখ নাই—
এভূলোক সুধু অসুখের ঠাঁই।

১৭

একদা দাঁড়ায়ে যমুনা-পুলিনে,
প্রদোষ সময়ে, ব্রজের বিপিনে,
হৃদয়ের কথা, মরমের ব্যথা
এই খেদ গান, একাকী বিজনে
গাহিতেছিলাম আপনার মনে।

১৮

গীত শেষ হোলো, অমনি তখনি
স্বর্গীয় সৌরভে ভরিল মেদিনী,
অপ্সরা বীণার মধুর ঝঙ্কার
সহ, সুললিত মেদুর পবনে
এই কথাগুলি আনিল শ্রবণে।—

১৯

"ধর বৎস ধর মম উপদেশ,
যদি চাও নিত্য সুখের উদ্দেশ,
দুঃখ দূর হবে, চির সুখে রবে,
মনের মালিন্য হৃদয় বিকার
ঘুচিবে, মানব-জ্ঞানের আঁধার

২০

"কৃত্রিম আমোদ মান অহংকার,
বিষয়-লালসা, কর পরিহার
ধনের গৌরব, বিদ্যার সৌরভ,
অলস বিলাস, ইন্দ্রিয়ের আশা,
ত্যাগ কর যত পার্থিব পিপাসা।

২১

"দুষ্ট রিপুচয়ে কর হে দমন,
নিন্দা তোষামোদে দিওনাকো মন,
সুখের সন্ধানে ফিরি স্থানে স্থানে,
যতই বেড়াবে তুমি ঘুরে ঘুরে,
ততই তোমার সুখ যাবে দূরে।

২২

"মানবের জ্ঞান ভ্রান্তি জাল ভরা
মানবের গ্রন্থ কপটতা পোরা;
হেন জ্ঞান তরে, হেন গ্রন্থ পড়ে
করিও না বৃথা সময় ক্ষেপণ,
প্রকৃতির পুথি কর অধ্যয়ন।

২৩

"তাহলেই পাবে সুখ অবিনাশী
যার তরে তুমি এত অভিলাষী,
প্রকৃতির পত্র, স্বভাবের ছত্র
আনন্দের উৎস, সুখের আকর,
বিরাজে সন্তোষ যাহে নিরন্তর।

২৪

"চাঁদের আলোকে, রবির কিরণে,
ভীম প্রভঞ্জন, মৃদু সমীরণে,
ভ্রমর ঝঙ্কারে, কেশরী হুঙ্কারে
সলিল-প্রপাতে, তটিনী-হিল্লোলে
উষ্ণ প্রস্রবণে, সাগর-কল্লোলে,

২৫

"কুসুম সৌরভে, কোকিল কূজনে,
শৈবালের দলে, কমল কাননে,
পত্রের মর্ম্মরে, বিমল নির্ঝরে
তরুতে, মরুতে, মাটিতে, গগনে,
জন কোলাহলে, অথবা বিজনে,

২৬

"প্রকৃতির রাজ্যে যেখানে যাইবে,
অবিচল সুখ সেখানে পাইবে।
সৃষ্টির মাঝারে দেখিতে স্রষ্টারে
সদা সাবধানে করিবে সাধনা,
নিসর্গ সন্দর্ভ যাঁহার রচনা।

২৭

'সুখের দুঃখের মনই জনক,
মনেই স্বরগ, মনেই নরক,
শান্তি বিনোদিনী, সুখের জননী ;
সন্তোষ অমৃত কর বাছা পান,
অমর আনন্দে পুরিবে পরাণ।"

২৮

এই কথা বলে বাণীশেষ হোলো,
গগনের বাণী গগনে মিশালো,
শবদ সঙ্গিনী প্রতিধ্বনি ধনী
অমনি তখনি গভীরে ভাষিল ;
"সন্তোষ অমৃত কর বাছা পান,
অমর আনন্দে জুড়াবে পরাণ।"

পুলিন—

রসসাগর।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

রসসাগর সম্বন্ধে আমাদের সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কার্ত্তিক মাসে জ্ঞানাঙ্কুরের বর্ষ শেষ, আমরা সেই বর্ষ শেষ সঙ্গে ইহারও শেষ করিব মনস্থ করিতেছি। যদি ইহাকে কখনও গ্রন্থাকারে পরিণত করিতে সক্ষম হই, তবে আরও কতকগুলি নূতন পাদপূরণ প্রকাশ করিতে ত্রুটী করিব না। অনেকদিন হইতে আমরা রসসাগরের সমস্যাগুলি সংগ্রহ করিতেছি। এমন কি শ্যামাধব বাবুর গ্রন্থ প্রচারের পূর্ব্বেও আমাদের ঐ সকল হস্তগত ছিল, কিন্তু উহাদিগের অর্থ ও ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে এত সময় লাগিয়াছে। উক্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থের সহিত মিলাইলে অনেকে ইহাতে স্থানে স্থানে পাঠ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। যে পাঠে অর্থ সঙ্গতির ব্যাঘাত না হয়, তাহাই গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সময় আমরা ইহাকে আরও সুমার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করিব। এখন অধিক বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই।

কোন সময়ে রাজসংসারে উপযুক্ত কর্ম্মচারী না থাকায় বিষয় বিভবাদি অত্যন্ত অব্যবস্থিত হইয়াছিল। অনেকেই অবগত আছেন, নবদ্বীপের রাজবংশীয়েরা অদ্যাপি হরধাম, আনন্দধাম, শিবনিবাস প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। হরধামে সেসময় রাজা গঙ্গেশচন্দ্র জীবিত ছিলেন, তিনি সম্পর্কে গিরীশচন্দ্রের পিতৃব্য। তিনি তাঁহার নামের সহিত বাজপেয়ী উপাধি ধারণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন, সেই জন্য রাজা তাঁহাকে বাজপেয়ী খুড়া বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহাদের অবস্থা অতি মন্দ ছিল। তিনিই ঐ সময়ে নবদ্বীপাধিপতির সংসারে কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন। তাঁহার মনের ভাব যে এসময়ে রাজসংসারে প্রবেশ করিয়া যে সকল ওমরাও দ্রব্যাদি আছে লইয়া প্রস্থান করেন। বাস্তবিক কিছুদিনের মধ্যে তাহাই করিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রসসাগর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী রচনা করেন। যথা ;—

কি আর বলিব বিধাতার ভবিতব্য।
ছাদ ফুঁড়ে লয়ে যায় ওমরাও দ্রব্য॥
পাতসাই জিনিস যত ছিল উপজীব্য।
অধনেন ধনং প্রাপ্ত হায়রে পিতৃব্য॥
নবদ্বীপের অধিপতি নৃপতির চূড়া।
কত ইন্দ্র চন্দ্র এই দরজায়
　　খেয়ে গিয়াছেন হুড়া॥
সকল নিলে লুটে পুটে
　　রাখ্‌লে না এক গুঁড়া।
না বিইয়ে কানাইয়ের মা
　　বাজপেয়ী খুড়া॥

বাজপেয়ী যজ্ঞ না করিয়া বাজপেয়ী উপাধি ধারণ করাতেই "না বিইয়ে কানাইয়ের মা" বলিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, যে রসরাজ একসময়ে রাজীবলোচন সরকার নামক রাজ সংসারের ইজারদারের হাতে পড়িয়া ছিলেন। মুন্সী গোলাম মোস্তফাও এক জন ইজারাদার ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সুন্দর স্বভাবের লোক ছিলেন। ইহাঁর নিবাস বগুলা, ষ্টেসন হইতে গ্রাম-মধ্যে যে পুরাতন দ্বিতল গৃহটী দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই তাঁহার বাটী। ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া রসসাগর নিচের লিখিত শ্লোকটী রচনা করেন।

সকল বাণিজ্য হতে ইজারদারী তোফা।
দয়া ধর্ম্ম চক্ষু লজ্জা ইস্তফা তিন দফা॥
এ রসসাগরে জানেন অনেক চৌগোফা।
মনুষ্যত্ব দেখি মুন্সী গোলাম মোস্তফা॥

নিম্নে আমরা রসসাগরের গুটি কতক শ্লোক দিতেছি তাহার অর্থ বা ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নাই। ব্যক্তি বিশেষ যে এই শ্লোক গুলির লক্ষ্য তাহার সন্দেহ নাই।

"আস্তে আজ্ঞে হোক।"

পেটে খেলে পিটে সয় গোবর্দ্ধন কি লোক
গোবৎস লয়ে গোপ নিরুদ্বেগে রোক॥
কাছের মানুষ চিন্তে নার সর্ব্বাঙ্গে চোক
মতিভ্রম পরিশ্রম আস্‌তে আজ্ঞে হোক॥

"রহ রহ রহ।"

আর কেন বাক্য বাণে দহ দহ দহ
শ্যাম কলঙ্কিনী রাণী কহ কহ কহ।
মনোরম্য বোধ গম্য নহ নহ নহ।
রমণে রমণ করে—রহ রহ রহ॥

"স্বামীর পরম ইচ্ছা স্ত্রীর গর্ভে যায়।"
পুত্রের পরম ইচ্ছা পিতা হয় অতি।
শাশুড়ির সাধ মনে জামাতারে পতি॥
পুত্র বধূর পরম ইচ্ছা স্ত্রীর গর্ভে যায়॥
স্বামীর পরম ইচ্ছা স্ত্রীর গর্ভে যায়।

"হায় হায় হায়"

পুত্রের বাসনা মনে পিতা হউক অতি।
শাশুড়ীর বাসনা মনে জামাই হউক পতি॥
বধূর বাসনা মনে শ্বশুর লাগুক গায়।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা হায় হায় হায়॥

"ওরে সর্ব্বনেশে।"

কাম ক্রোধ লোভ মোহ সাঙ্গ করে এসে
কামার ডিঙ্গির খালের
ধারে কাল রয়েছে বসে॥
মন্‌তো ভুল্লি গুপ্ত পল্লি
তুচ্ছ কল্লি হেঁসে।
তোরে যা বলেছে তাই করেছিস
ওরে সর্ব্বনেশে॥

আমরা পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, যে রসসাগর প্রবন্ধের শেষ ভাগে তাঁহার রচিত কতিপয় হিন্দী শ্লোক দিব। কৃষ্ণনগরের প্রাচীন লোক মুখে শুনিতে পাই রসসাগর অনেক হিন্দী শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালক্রমে সে গুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা যে কয়টী পাইয়াছি তাহাই এস্থানে প্রকাশ করিলাম।

মহারাজ গিরিশ চন্দ্রের পৌত্র সতীশ

চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলে মহারাজ অত্যন্ত পুলকিত হইয়া রসসাগরকে কহিলেন "মহী দূর কর হাম নৃত্য করি।" রসসাগর পূরণ কহিলেন,—

রাজধানী নৃপ নন্দন নন্দন,
চন্দ্রবংশ অবতার হরি।
চৌদ্দ ভুবন জন নাচত গায়ত
চৌথট যোগিনী তান ধরি॥
অপ্সর কিন্নর দশ দিগধীশ্বর,
তর তর শ্রীল গিরিশ পূরী।
এতনক বোলে অহিরাজ কহে
মহী দূর কর হাম নৃত্য করি॥

এই শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে রাজধানীতে নৃপ নন্দনের নন্দন ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, চৌদ্দ ভুবন নাচিতেছে গাইতেছে। চৌষট্টী যোগিনী তান ধরিয়াছে, এত আনন্দে অহিরাজ বাসকী পুলকিত হইয়া কহিতেছে যে আমার মস্তক হইতে পৃথিবীর ভার দূর কর, আমি একবার নৃত্য করি।

একদা প্রশ্ন হইল "কিষণ্ কহো, কিষণ্ কহো, রাধে মৎ কহো রে।" রসসাগরের পূরণ ;—

ধরম্ সরম্ কুল ক্রিয়া,
মুরলী সব লুট লিয়া,
জগ্ মে কলঙ্ক দিয়া,
সোঁহি নাম পাওরে।
সাঁওনসুন্দর কান,
মার গেঁয়ে বিরহ বাণ,
ছোড়ত রাধিকা প্রাণ,
কণ্ঠাগত ভঁওরে॥

বাকে কি রাজ পাট,
কুবুজে কি লাগি ঠাট,
মথুরা মে তাঁক পাছ,
আনন্দ মে রহো রে।
কোহেলা তোর পড়ি পাঁও,
ছোড়ি দে গোপ গাঁও,
কিষণ্ কহো কিষণ্ কহো,
রাধে মৎ কহো রে॥

শিব চতুর্দ্দশীর রাত্রে মহারাজ শিব পূজা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে শিব মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শিব শিরস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রের উপর যে পঞ্চামৃত দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে পিপীলিকা লাগিয়াছে। তদ্দৃষ্টে রসসাগরকে কহিলেন। "অমাবস্যার চন্দ্র পিপীলিকায় খায়।" এই শ্লোকটী মহারাজ হিন্দী ভাষায় পূরিতে আদেশ করেন।

শিবরাত্র ঘটাওয়ে, তিন লোক জাগাওয়ে,
পঞ্চামৃত শশীচূড়ে চড়াওয়ে।
ভোরে বি অরুণা মেরে হাঁকাওয়ে
আঁচকো চাঁদ্ পিপীলা ন খাওয়ে॥

গয়ায় পিণ্ডদান সময়ে অত্যন্ত জনতা হয়। রসসাগর সেই জনতা ঠেলিয়া একবারে পিণ্ডদান স্থলে উপস্থিত হওয়ায় একজন গয়ালী কহিল "বাহ্বা বাহ্বা বাহ্বা জী।" রসসাগর অমনি পূরণ করিলেন ;—

এক চরণ তব্ গয়াসুর মুণ্ডে
পিণ্ড দেনে উধারণ জী।
দুস্রা চরণ কা ধূলি মে
অহল্যা পাযাণ মানবী জী॥

তিস্‌রা চরণ ঘামছে
জগত্তারণ উধারণ গঙ্গাজী।
তেরা পাঁও মে গোড়োয়া লাগে
বাহ্বা বাহ্বা বাহ্বা জী॥

আমরা এই স্থলেই রসসাগর প্রবন্ধের শেষ করিলাম ইতি।

অনন্ত ভাবাভাব।

পৃথিবী একটী রত্ন হারাইয়াছে। খনিতেই সে মণির বিনাশ হইয়াছে; মণিকারে তাহার পরিচয় পায় নাই; বিলাসী সে নিরুপম শোভার জন্য স্বীয় সর্ব্বস্বান্ত করিতে পায় নাই; এবং তাহা করিতে পায় নাই বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ ভাবিতে পায় নাই; দরিদ্রে সে মহারত্নের নাম মাত্রও অবগত হইতে পায় নাই; পায় নাই, সেই জন্য ঈর্ষ্যার চরম সীমা,মর্ম্মযাতনা বুঝিতে পায় নাই। —কিন্তু যাহার কথা,সে আপনি আপনার পরিচয় দিউক, আমাকে তাহার জন্য ভূমিকা লিখিতে হইবে না। সংক্ষেপে বলি, নিধিরাম উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে; নিধি অমূল্য নিধি, তাহার তুলনা তাহারই সহিত হইতে পারিত "রাম রাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব"। এ কি সামান্য দুঃখ! এ দুঃখ কি সহা যায়!

কিন্তু শরীর যেমন ব্যাধি মন্দির, সংসার তেমনি দুঃখ মন্দির। সাতাইশ বৎসর, এক মাস, সাতদিন, আঠার দণ্ড, পঁয়ত্রিশ পল গতে মঙ্গলবারে, অনুরাধা নক্ষত্রে,ব্যতিপাত যোগে,তৈতিল করণে— ফলতঃ নূতন পঞ্জিকাতে নিধিরামের পূর্ব্বভাবান্ত হইল, সংসারের সুখান্ত হইল। কপালে যাহা ছিল, তাহা হইল। কাঁদিলে কি হইবে? সেই জন্য কাঁদিব না, নিধিরামের গুণ গাইব, নিধির কথা বলিব।—না, আমি বলিব না, নিধি আপনার কথা আপনি বলুক। কিন্তু হায়! নিধি যে নূতন কথা আর বলিতে পারিবে না; তাহার হইয়া এখন মাঝে মাঝে তাহারই কথা যে আমাকে বলিতে হইবে! আহা হা! নিধির জ্ঞান গেল, কেন প্রাণ গেল না?

কি ভাল? মরা ভাল, না ক্ষেপা ভাল? মরিলে "৺" হয়—দেবতা হয়; ক্ষেপিলে কি হয়? "শ্রী" ভ্রষ্ট! অপরে "শ্রীযুক্ত" করে,"শ্রীমান্"করে কিন্তু শুদ্ধ, নির্ভাঁজ, সুপরিষ্কৃত, আবর্জ্জনাবর্জ্জিত "শ্রী" আপনার আপনি ব্যতীত হইবার যো নাই। অপরকে অপরে বিশুদ্ধ "শ্রী" দিলে কেমন কেমন দেখায়, যেন একটু ঘৃণা, যেন একটু তাচ্ছীল্য, যেন একটু অবজ্ঞা সে"শ্রী"র সর্ব্বাঙ্গে দেদীপ্যমান। তবে নিধিরামের কি হইবে? শ্রীভ্রষ্ট

হইবে, অথচ দেবতা হইবে না, নিধি এখন কি করে? আমিই বা কি করি? নিধির মরাই উচিত ছিল। আমার অন্তরে যে বেদনা হইয়াছে, নিধিকে মরিতে বলা ভিন্ন আর কি বলি?

নিধিরামকে ঢাকায় লইয়া গিয়াছে। সেখানে সে কোথায় থাকিবে? কেমন করিয়া থাকিবে? আমাকে পত্র লিখিতে চাহিলে কাগজ, কালী, কলম, পাইবে ত? নিধিরাম যে উন্মাদগ্রস্ত; সে কি এখন পত্র লিখিতে পারিবে? তাহা যদি পারে, তবে কতক শান্তি; তাহা হইলে মরা অপেক্ষা ক্ষেপা ভাল। নিধির কি পত্র লেখা মনে আছে?

ঢাকা কেমন স্থান? জন্মে দেখি নাই, সুতরাং আমার অপরাধ নাই, কিন্তু শুনিতে পাই যে সেখানে মাটী নাই। সেখানে নৌকায় যাওয়া আসা, নৌকায় শোয়া বসা, নৌকায় খাওয়া পরা, নৌকায় বাজার করা। তবেত বড় বিষম স্থান! নিধিরাম জল দেখিলে ভয় পায়। সেই জন্য বাল্যকালে নিধি জলের পরিবর্ত্তে ডাব খাইত, বয়স হইলে নির্জ্জল মদ খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিত। নিধিরাম একবার বিলাত যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল, জাহাজ ভাড়া পর্য্যন্ত করিয়াছিল। পরিশেষে, যাইবার দিনে সকাল বেলায় ভূগোল খুলিয়া নিধিরাম দেখিল যে মধ্যে সমুদ্র;— পার না হইলে বিলাত যাওয়া যায় না। কেবল সমুদ্র আছে বলিয়া নিধির বিলাত যাওয়া ঘটে নাই। ঢাকার যদি নৌকাগত প্রকৃতি হয়, নিধির দশায় কি হইবে?

নিধি যে লেখক, পাঠক, ভাবুক, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং নিধি বিলাত গেলে সাতকাণ্ডের চূড়াস্বরূপ এক কাণ্ড নিশ্চিত করিত; ফিরিয়া আসিলে দশজনকে কাণ্ডজ্ঞান শিক্ষা দিত। কিন্তু পোড়া সমুদ্রেই সব নষ্ট করিল। ফলতঃ আর উপায় নাই, ভাবিলে, পুরাণ কথা মনে করিয়া ছল ছল চিত্তকে উদ্বেল করিলে, আর কি হইবে।

নিধিরাম আমার চির সখা। এখন নিধিও একা, আমিও একা। দুইজনে একত্র জন্মিয়াছি, একত্র শয়নোপবেশন করিয়াছি, একত্র ব্যায়াম বিশ্রাম করিয়াছি; একত্র বিদ্যানুশীলন করিয়াছি। উদরের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বলিয়া সাধারণ লোকে যাহাকে প্রণয় বলে, তাহা উদরগত। এই উদরেরই দার্শনিক নাম "স্বার্থ"। কিন্তু আমাদের প্রণয় উদরগত ছিল না; ভালবাসার নিমিত্তই দুই জনে ভালবাসা ছিল; পাপপুণ্য, সুখ দুঃখ, ইহলোক পরলোক, স্বর্গ নরক এ সকল ভাবনা সে প্রণয়ে স্থান পাইত না। ধরাতলে সে প্রণয়ের উপমা নাই, কারণ ধরাতলে সকলই সীমা নিরুদ্ধ; পর্ব্বত তেমন উচ্চ নয়, অরণ্য তেমন নিবিড় নয়, জনপদ তেমন পূর্ণ নয়,

উদ্যান তেমন রম্য নয়,অগ্নি তেমন উত্তপ্ত নয়, মধ্যাহ্নে সে আলোক নাই,নিশীথে সে নিস্তব্ধতা নাই, ঊষাতে সে মাধুর্য্য নাই, আর, চন্দ্রের কলঙ্ক আছে,আকাশে মেঘ আছে, মেঘে অশনি আছে; বিদ্যায় বিড়ম্বনা আছে, জ্ঞানে মোহ আছে, দর্শনে ভ্রম আছে, বিজ্ঞানে উন্নতির ক্রম আছে। কিন্তু আমাদের সে প্রণয় অতুল্য, অমূল্য। এখন আমরা দুই জনে একা। বিধি! এমন নিধিও কাড়িয়া লইতে হয়?

নিধিরামের কথা ফুরাইবার নহে; অনন্ত কথা, বাড়াইলেই বাড়ে। অতএব এখন নিধিরামের পরিচয় নিধিরামের কথাতেই দিব; আমি আর কিছু বলিব না। একবারেই বলিব না, তাহা নহে; যাহা না বলিলে নহে তাহা অবশ্যই বলিব। আজি যাহা বলিব,তাহা এই;

নিধিরাম বড় অনুশীলনশীল ছিল; নিধি পড়িত বিস্তর, লিখিত আরও বস্তর। যাহা লিখিত, তাহা আমাকে পড়িয়া শুনাইত,শুনান শেষ হইলে আমি তাহার লেখা গুলি, ভাল বাসিতাম বলিয়া, তুলিয়া রাখিতাম। কে জানিত যে সেই যত্ন রক্ষিত লেখা ধরিয়া এখন আমাকে কাঁদিতে হইবে!

নিধি সকল প্রকারের লেখাই লিখিত; কাব্য, ইতিহাস, প্রবন্ধ কল্পনা, অলীক জল্পনা; এসমুদয় যেমন সহজে তাহার লেখনী মুখ হইতে বহির্গত হইত, দর্শন,বিজ্ঞান, জীবন চরিত; প্রত্নতত্ত্বও সেই রূপ অবলীলায় আসিত। দুঃখের বিষয় তাহার কোনও লেখাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া উপায় নাই। নিধিরামের এই সমুদয় অতীত কীর্ত্তি আমি সময়ে সময়ে মুদ্রাক্ষরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন ও সঙ্গে সঙ্গে যশোভাজন হইব; এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। অদ্যকার মত সেই জন্য এই ভূমিকার "ইতি" সাধন করা গেল।

(নিধিরামের রহস্য প্রবন্ধ।)

একটী ঘর ছিল, এখন তাহা নাই সুতরাং কোথায় ছিল, বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার ভুল হইয়াছে, ঘর ত ছিলই, একটা বাড়ী ছিল, তাহাতে অনেক গুলি ঘর ছিল। এখন সে সব কিছুই নাই।

বাড়ীটী উত্তম বাড়ী, রাজার বাড়ীর মত বাড়ী। কে কখন্ সে বাড়ী প্রস্তুত করে, তাহা ভগবান জানেন। বাড়ীর দুই দিকে অলংঘ্য প্রাচীর, আর দুই দিকে অলংঘ্য পরিখা। কাহার বাড়ী, বলিতে পারি না, অথবা যে বলে আমার তাহারই।

ফলতঃ বাড়ীটা ছিল; সুন্দর বাড়ী, বাড়ীর মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উদ্যান, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, কত বলিব; সকল প্রকার জলাশয়,সকল প্রকার ফলাশয়। বর্ণনায় বাহুল্য হয় মাত্র। লাভ কিছুই

নাই। বাড়ীটাকে কল্পতরু,নন্দন কানন, কামধেনু, স্পর্শমনি, যাহা বলিবে,তাহাই বলা যায়। সে এমনই বাড়ী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাড়ীটাতে অনেক ঘর, সে সব ঘরের শোভাই কত, সজ্জাই বা কত! কিন্তু একটি ঘরেও মানুষ ছিল না। তথায়, নাম বলিতে পারি না, এক প্রকার জন্তু বাস করিত। সেই জন্তু চতুষ্পদ, কিন্তু মানুষের মত পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া বেড়াইয়া বেড়াইত। তাহারা সুখে ছিল, কি দুঃখে ছিল, জানি না। তাহারা খাইত, শুইত, থাকিত এই মাত্র জানি।

দিন যায়। দিন কোনও রাজার রাজ্যে বাস করে না, নহিলে দিন যাইত না, দিনের দুর্গতির এক শেষ হইত। ঠিক্ আমারই মত দশা হইত। দিন যায়, যাইতে যাইতে ঐ যে বাড়ীর কথা বলিতে ছিলাম, তাহার উপর মানুষের দৃষ্টি পড়িল। হন হন্ করিয়া তাহারা বাড়ীর উপর আসিয়া পড়িল। তখন, যে জন্তুগুলি সেই বাড়ীতে থাকিত, তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, কতর্কগুলি মানুষের কাজে লাগিল, অবশিষ্ট গুলি গিয়া বাড়ীতে যে প্রাচীর ছিল সেই প্রাচীরের উপরে বসিয়া রহিল। তাহারা সেই খানেই থাকুক, আমি অন্য কথা বলি।

ঐ যে মানুষ আসিল তাহারা বাড়ীর শ্রী-শৃঙ্খলা করিতে লাগিল; দেশ বিদেশ হইতে লোকে বাড়ী দেখিতে আসিতে লাগিল। ক্রমে বাড়ীর একটা নাম পড়িয়া গেল, আর তাহার শোভা দেখিয়া জগতের লাল পড়িতে লাগিল। কেবল বাড়ীর নাম নয়, বাড়ীর মানুষ গুলাও এমনি হইয়া উঠিল, যে তাহাদের গৌরবে পৃথিবী রৈ রৈ থৈ থৈ করিতে লাগিল। কিন্তু সুখ কাহারও হাত ধরা নয়, সেই মানুষ গুলার কপাল ভাঙ্গিল

যখন কপাল ভাঙ্গিল, তখন আবার অন্য প্রকারের মানুষ ঐবাড়ীতে আসিতে লাগিল। পঙ্গপালের মত তাহারা পালে পালে আসিল, আবার ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। এমন কত বার কত জন আসিল, আবার কত জন চলিয়া গেল, তাহার হিসাব আছে, রীতিমত জমাখরচ আছে। সে জমা খরচের নাম ইতিহাস; রীতিমত জমা খরচে যাহা হয়, ইহাতেও সেই রূপ—মিথ্যা কথা বোঝাই করা আছে; কত গুলি কথা আছে; তাহার পনর আনা উনিশ গণ্ডা, তিন কড়া দুই ক্রান্তি মিথ্যা; সুতরাং আমি তাহাতে বিশ্বাস করি না। আসল হিসাব দেবতাদের খাতায় লেখা আছে; মহা প্রলয়ের পর দিবস সে হিসাবের খতিয়ান, বাকীয়ান হইবে। যাহা পাওনা দাড়াইবে,দেবতারা তাহা বুঝিয়া লইতে, আদায় করিতে জানিবেন, লইবেন ও করিবেন। আগন্তুকদের নিকট, যদি কিছু দেনা হয়, তাহারা——পাইবে বৈ কি।

ক্রমে ঐ আগন্তুকদের একদল যে আসিল, আর ফিরিয়া গেল না, ঐ বাড়ীতেই রহিল। ইহারা রহিল, অনেক কীর্ত্তি করিল, বাড়ীর লোকের সঙ্গে সদ্ভাব করিল ; তাহারা যে পর, লোকে তাহা ক্রমে ভুলিয়া গেল। ফলতঃ তাহাদের সুখ সমৃদ্ধির একশেষ হইল, ক্রমে বৃদ্ধির অন্ত্যদশা হইল। যতই কেন হউক না, এই আগন্তুকেরা কলমের গাছ বা পোষ্যপুত্রের সহিত তুলনীয় ; প্রথমতঃ তেজোবিশিষ্ট রস গরিষ্ঠ, আবার অচিরাৎ জীর্ণ, বিশীর্ণ, উচ্ছিন্ন। পরের বিষয়ে বাবুগিরি করিলেই ইহা অবশ্য ঘটিবে।

আগন্তুকদের যখন এই দশা, তখন ঐ বাড়ীতে অথিতি সমাগম হইতে লাগিল ; কেহ একটী বটিকা দিয়া অদ্য নিষ্কর ভূমিলাভ করিল, কেহ প্রথমতঃ আতিথ্য স্বীকার করিয়া পরে ঐ বাড়ীতে বসিয়াই চিরুনি, ঘুনশী, কাঠের কৌটা, টিনের আরশী লইয়া দোকান সাজাইয়া আপন উদরান্নের সংস্থানের ভাণে বাড়ীটা, বাড়ীর লোক জন, সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে ও চিনিতে লাগিল।

ক্রমে ছুঁতোনাতা করিয়া অতিথিরা বিবাদ আরম্ভ করিল ; অতিথিতে অতিথিতে বিবাদ, অতিথিতে আগন্তুকে বিবাদ। তখন দেখা গেল অতিথিদের দোকানে ছুরী কাঁচীও বিক্রীত হয়। লোকের চক্ষু ফুটিল, তখন লেই কি, আর না ফুটিলেই কি?

অথিথিরা লোক ভাল, দোষের মধ্যে অতিশয় লুব্ধ, অতিশয় অধার্ম্মিক। ইহাদের মুখ মিষ্ট, ব্যবহার শিষ্ট, কিন্তু কড়ির বড় টান। ঘরে খাবার থাকিলে পরের বাড়ী আতিথ্য স্বীকার করিবে বা কেন? কড়ির টান, আর দোকানে ছুরী কাঁচী, কাজে কাজেই অতিথি শেষে গৃহস্থের গলায় দিল। অতিথি আগন্তুকের বীজ রাখিল না, পরের বাড়ী ক্রমে আপন করিয়া লইল। আর যাহা করিল, তাহা তুমিও জান, আমিও জানি।

আর সেই বাড়ীর লোক—তাহারা কি করিল? কেন, আমি যাহা করিতেছি, তাহারা তাহাই করিল। যুগে যুগে নিজ ভবনে ভিক্ষা, আর তিল গঙ্গাজলে পিতৃ পুরুষের তর্পণ। দেবতা এই তিল গুলি তুলিয়া রাখিতেছেন, হিসাবের দিনে তিলের গণনা হইবে। একবার দেনা পাওনাটা মিটিয়া গেলে ভাল হয় না?

গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম! হরিবোল!! হরিবোল!!

বিমলা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অদ্য বলরামপুরের কাছারি বাটীতে আনন্দের সীমা নাই। তথায় অদ্য রজনীযোগে এক সমারোহের বিবাহ হইবে। বিবাহের পাত্র রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। পাত্রী বিমলা। বরকর্ত্তা স্বয়ং রুদ্রকান্ত রায়। সকলেই আনন্দ সাগরে মগ্ন। রামকৃষ্ণ অদৃষ্টে এমনও ছিল ভাবিয়া খুসী—রুদ্রকান্ত অত্যাচারের চূড়ান্ত হইবে ভাবিয়া খুসী লোক জন যা হবার নয় তাই হইল ভাবিয়া খুসী। মামা ঠাকুরের বিবাহ—স্বপ্নের অগোচর কথা। রূপের হোঁদল কুতকুতে মামা ঠাকুরের বিবাহ হইবে—যেমন তেমন বিবাহ নয়, সাক্ষাৎ স্বর্গের অপ্সরার সঙ্গে, সুতরাং অনুজনবর্গ মহা খুসী। ফল কাছারি বাটী আনন্দে তোলপাড়। এত আমোদ, এত আনন্দ মধ্যে কেবল এক জন বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছে। সে এক জন বিমলা। বিমলা কাঁদিতেছেন। কিন্তু তিনি কাঁদিতেছেন, তা আমার কি? সংসারে কত লোক কত সময় কাঁদিয়া থাকে। সকলের কান্না দেখিতে গেলে চলে না। যার ইচ্ছা হয় সে কাঁদুক। তা বলিয়া আমরা আপন কাজ ছাড়িব কেন? যে কোন রূপে আত্ম কার্য্য উদ্ধার করা চাই। এখন বিমলার রোদন দেখে কে? বিমলার ইচ্ছা আছে কি না আছে, তাহাই বা জানিবার দরকার কি? সংসারে কোন কার্য্যই সর্ব্ববাদী সম্মত হয় না। বিশেষতঃ পাত্রীর মত লইয়া বিবাহ কোথায় হয়? আর পাত্রীর মত না থাকিলেই কি বয়ে গেল? সুতরাং বিমলা কি করিতেছেন সে জন্য কেহ চিন্তিত বা কাতর নহে। সে দিকে কাহার লক্ষ্যও নাই।

কাছারি ঘরের পার্শ্বস্থ বৈঠকখানা ঘরে রুদ্রকান্ত ও চারিজন বয়স্য বসিয়া আমোদ প্রমোদ ও মন্দ চর্চ্চায় রত রহিয়াছেন। এমন সময় সম্মুখের দ্বার-সংলগ্ন সবুজ রঙ্গের পরদা একটু খানি সরিয়া গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া একটী কৃষ্ণ বর্ণের কুপা বা জালা প্রবেশ করিতেছে বোধ হইল। বিশেষ অনুধাবনে বুঝা গেল, সেটী কুপা বা জালা নহে। তাহা কথঞ্চিৎ মনুষ্যের উদর সদৃশ। একে একে হস্ত পদাদি সমস্তই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাবতের সম্মিলনে যে অদ্ভুত জীবের উদ্ভব হইল তাহার নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। রামকৃষ্ণের হরিদ্রা বর্ণের দন্ত আজ আর ঢাকিতেছে না। আজ তাঁহার অধরোষ্ঠ (হাঁ তাই বটে) ভেদ করিয়া হাস্যের তরঙ্গ বাহির হইতেছে। যেন গোমুখী হইতে গঙ্গার উদ্ভব হইতেছে।

রামকৃষ্ণকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন, এক জন বয়স্য বলিলেন,—

"মামা! তোমার আজ পাথরে পাঁচ কিল বাবা!"

রামকৃষ্ণের দন্ত আরও বাহির হইল। হাসি আকর্ণ বিশ্রান্ত হইল। হাঁসি আকর্ণ বিশ্রান্ত? হাঁ—তাই ত। হাসি আকর্ণ বিশ্রান্ত হইল। রামকৃষ্ণ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। বুঝি কথাটায় একটু লজ্জা হইল। কহিলেন,—

"অ্যাঁ—হাঃ, হাঃ; অ্যাঃ—"

রামকৃষ্ণ উপবেশন করিলেন। এক জন বয়স্য রুদ্রকান্তকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"লগ্ন কত রাত্রে?" রুদ্রকান্ত কহিলেন,—

"রাত্রি ৭ টার পর যখন ইচ্ছা।"

অনেক রাত্রে বিবাহ দেওয়াই ভাল।"

রামকৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—

"কেন—কেন—অ্যাঁ?"

"এদিকে একটু আমোদ প্রমোদ করে শেষাশেষি বিবাহ হওয়াই ভাল।" রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"তা কেন? আমার শরীর খারাপ তা বিবেচনা কর তোমার যে উল্টা কথা।"

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—

"বিলক্ষণ মামা! তুমি কার কথা শুনছ? সন্ধ্যা হতেই শুভ কর্ম্ম শেষ কত্তে হবে।"

রামকৃষ্ণের শ্রীবদনারবিন্দে আবার পূর্ব্বের ন্যায় দেড় কাঠা হাঁসি বাহির হইল। কহিলেন,—

"তা তো বটেই।"

একজন বয়স্য জিজ্ঞাসিলেন,—

"আচ্ছা মামা সবই তো স্থির। আর কয়েক ঘণ্টা বাদে তোমার বিবাহ হবেই হবে। কিছুতেই এ আর রদ হয় না। তুমি সত্য করে বল দেখি এখন তোমার মনের অবস্থা কি রকম?"

এবার রামকৃষ্ণের মধুর হাসি এত বাড়িয়া গেল ও শ্রীমুখ এত ফাঁক হইল যে কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল। অন্য কোন উত্তর না দিয়া তিনি কেবল বারদ্বয় বিকট গর্দ্দভবৎ "অ্যাঁ—অ্যাঁ!" শব্দ করিয়া উঠিলেন।

বয়স্য পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন,—

"বল্লে না মামা। ছি বাবা, আমাদের কাছে লুকোচুরী।"

রামকৃষ্ণ দেখিলেন কথাটার জবাব দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং চেষ্টা করিয়া মুখ বন্ধ করিলেন। ক্ষণেক ভাবিয়া আবার পূর্ব্ববৎ হাঁসিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব হাঁসির সহিত মিশাইয়া অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠে রামকৃষ্ণ কহিলেন,—

"আমার প্রাণটা যেন আজ ভো কাটা ঘুড়ির মত লোট খেতে খেতে পড়ে যাচ্চে। যেন লুটে নিলেই হয়।"

সকলে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উ-

ঠিল। একজন বলিল,—

"মামার রস দেখেছ?"

রামকৃষ্ণ আবার বলিতে লাগিলেন,—

"সত্তি বাবা। আমার শরীরটে যেন আজ্ গলে জল হয়ে গিয়েছে। আমি যেন কোথায় রইছি।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"মামার যে মনোরথ আজ্ সিদ্ধ হলো এ আমাব বড় আনন্দ। মামা আজ্ মন খুলে ফূর্ত্তি কর।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"ফূর্ত্তিতে আমি যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছি। আমার ইচ্ছে হচ্চে তোমায় কোলে করে নাচি।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। একজন বয়স্য রুদ্রকান্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"আমাদের আনন্দ কম নয়। বিশেষ আহারটা পরিপাটী রকম হবে।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"জায়গাটা বড় খারাপ। আহারের আয়োজনটা বড় সুবিধা মত হয় নাই।"

আর একজন কহিলেন,—

"সে কি কথা? ওটার তদ্বির বড় আবশ্যক।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—

"সে যা হয়েছে তা হয়েছে, তার জন্য আট্‌কাবে না।"

বয়স্য বলিলেন,—

"বিলক্ষণ। তোমার এই কথা বটে?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"তা বই কি? আহার যৎকিঞ্চিৎ হলেই হল। শুভ কর্ম্মটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়া নিয়ে কথা।" সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—

"সন্ধ্যা হয়ে এলো। বাবাজি তুমি কিছু জল টল খাওগে। এর পর সময় পাবে না।"

রুদ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—

"সে কি মামা, এখনও দুই বাজে নাই। এই তো আহার করা গেল।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"আরে নাহে না। তোমার ভুল হয়ে থাকবে।"

রুদ্রকান্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখাইলেন।

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—

"ঘড়িটা ঠিক চল্‌ছে তো?"

রুদ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—

"বিলক্ষণ।"

রামকৃষ্ণ একটু দুঃখিত হইয়া নীরব হইলেন।

কুঠীর একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী আসিয়া নিবেদন করিল,—

"বিবাহ স্থানের যে ব্যবস্থা করা গেল, একবার আসিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

রুদ্রকান্ত গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও চলিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায়। বিবাহ অদ্য রাত্রেই হইবে স্থির হইয়াছে। সুতরাং আর বিলম্ব নাই। লোক জন সকলেই ব্যস্ত। রামকৃষ্ণ আহ্লাদে কুটি কাঁকুড়। রুদ্রকান্ত অস্থির। কাছারি বাটী লোকের কণ্ঠ-স্বরে প্রতিধ্বনিত।

বৈঠকখানার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে রোসন চৌকি লক্ষ্ণৌ ঠুংরি বাজাইতেছে। কয়েকজন ব্যক্তি বসিয়া তাহা শুনিতেছে। রুদ্রকান্ত বাবু নানা কাজে ব্যস্ত, সুতরাং নিয়মিত রূপে শুনিতে পাইতেছেন না। শুনিতে পাইতেছেন না, তাহা নহে। তিনি যখন যে স্থানে রহিয়াছেন তথা হইতে তাহা বেশ শুনা যাইতেছে; তথাপি তিনি শুনিতে পাইতেছেন না। তাঁহার শুনার মানে অন্যবিধ। তিনি কিছুই বুঝেন না, তাঁহার কোনই জ্ঞান নাই। তথাপি তাঁহার হাত নাড়া চাই, অসময়ে করতালি দেওয়া চাই এবং পার্শ্বস্থ ব্যক্তির, বিশেষতঃ রোসনচৌকি ওয়ালার সেলাম করিয়া বলা চাই যে, বাবুর বোধ শক্তি বড়ই ভাল। তিনি এই সকল শুনিতে পাইতেছেন না। যাহা হউক কোন রূপ প্রকারে একটু সাবকাশ করিয়া বাবু বাদ্য স্থলে "আহা হায়" শব্দে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলার চীৎকারে বাদ্যের বিঘ্ন জন্মিল। বাদকেরা থামিয়া বাবুকে সেলাম করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল,—

"আঃ বাবু আসিয়াছেন, আমরা বাজাইয়া বাঁচি।"

বাবু হাসিতে লাগিলেন। বাদকেরা পুনরায় অন্যবিধ বাদ্য আরম্ভ করিল। এমন সময় রামকৃষ্ণ ব্যস্ততা সহ সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং রুদ্রকান্তকে কহিলেন,—

"সেকি বাবাজি তুমি বাজ্না শুন্তে বসিলে তো চলিবে না। শেষটা কি কাজটা পণ্ড হবে নাকি? রাত্রি প্রায় বারটা বাজে, লগ্ন ভ্রষ্ট করে ফেল্লে দেখ্‌চি।"

রুদ্রকান্ত মাতুলের পৃষ্ঠে থাবা দিয়া কহিলেন,—

"আমি থাক্‌তে তোমার কোন চিন্তা নাই বাবা। তুমি বস, বাজ্না শুন। এখনও ৬টা বাজে নাই। ভয় কি?"

এই বলিয়া সজোরে রামকৃষ্ণকে পার্শ্বস্থ মোড়ায় বসাইলেন। রামকৃষ্ণ কলের সঙ্গের ন্যায় বসিলেন। সকলে ইত্যাদি রূপ আমোদ কৌতুকে প্রমত্ত রহিলেন।

পাঠক! নিরন্তর আমোদ চর্চ্চায় থাকাও তো ভাল নহে। সময়ে সময়ে শোকে বিমিশ্রিত হওয়াও ভাল। সতত এক কার্য্য ভালও লাগে না। নিয়ত আমোদে থাকিলে, আমোদও কালে বিষবৎ প্রতীত হইতে থাকে। নিয়ত

কোন কাজ ভাল নয়। কার্য্যের তাল ফেরা আবশ্যক। আহারে চাট্‌নী থাকা ভাল। শোকের পরে সুখ বড় মিষ্ট।

এই অতুল আনন্দ সাগর মধ্যে ঘোরতর বিষাদ রহিয়াছে। এই সুখ রাশি মধ্যে একজনের হৃদয় দুঃখের মুর্ম্মুর দহনে দগ্ধ হইতেছে। এই আমোদ শ্রোত মধ্যে এক জনের নেত্র অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। এই সমারোহ মধ্যে একজন জগৎ শূন্যময় দেখিতেছে। এই উৎসাহ মধ্যে একজনের হৃদয় হতাশে পরিপ্লাবিত হইতেছে।' দুই তিনটী প্রকোষ্ঠ পার্শ্বস্থ একটী সুপ্রসস্থ প্রকোষ্ঠে বসিয়া বিমলা রোদন করিতেছেন। নিকটে আর কেহ নাই। সমস্ত দিন তাঁহার নিকটে একজন দাসী ছিল। অধুনা বিমলা কৌশল ক্রমে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। বিমলা একাকিনী। তাঁহার দেহে সে রূপ নাই, সে নিরূপম লাবণ্য নাই, সে ভুবনমোহিনী মাধুর্য্য নাই। বিমলার পূর্ব্বশ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। অদ্য এক সপ্তাহ কাল সরলা বিমলা রুদ্রকান্তের চাতুরীতে পিঞ্জরবদ্ধা হইয়াছেন। এই সপ্তাহ মধ্যে তাঁহার পরিবর্ত্তনের সীমা নাই। যদিও রুদ্রকান্ত তাঁহার যত্নের ত্রুটী করেন নাই এবং অন্য কোন অত্যাচারে উৎপীড়িত করেন নাই, তথাপি বিমলার চিন্তার যথেষ্ট কারণই রহিয়াছে। যে সরলা বালিকা সংসারের কিছুই জানেন না, যাহার হৃদয়ে পবিত্রতা ভিন্ন অন্য কিছুরই স্থান নাই, তাহার এই ঘোর দুর্দ্দশা। কোথায় অবন্তীপুর, কোথায় জননী, কোথায় যোগেশ আর কোথায় বিমলা? অদ্য বিমলার বিবাহ! কি সর্ব্বনাশ! জোর করিয়া, ছলনা করিয়া, অদ্য—অদ্যই কেবল আর দুই ঘণ্টা পরে বিমলার বিবাহ দিবে! তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে, তাঁহার রুচির বিরোধে, তাঁহার কাকুতি মিনতি রোদন উপেক্ষা করিয়া, নিকৃষ্ট রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে! রামকৃষ্ণ নিকৃষ্ট বা ঘৃণিত জীব না হইয়া যদি স্বর্গের দেবতা হয়, যদি তাহার রূপরাশি ভুবনমোহন হয়, তাহার বিদ্যা অতুল হয়, তাহার গুণ অসামান্য হয়, তাহা হইলেও বিমলার হৃদয়ে রামকৃষ্ণের নাম একটী অক্ষও পাত করিতে পারিবে না। যে হৃদয় যোগেশের তাহা যোগেশেরই। বিমলার হৃদয় তো তাঁহার নয়—তাহা যোগেশের। তবে এ অসম্ভব চেষ্টা কেন? এ কথা বুঝে কে?

একাকিনী বিমলা বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার নিবিড় কুন্তল রাশি অবেনী সম্বদ্ধ হইয়া, বদনের কিয়দংশ আবৃত করিয়া, ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। গৃহ মধ্যে একখানি শয্যাচ্ছাদিত পর্য্যঙ্ক রহিয়াছে। বিমলা তাহা ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকায় বসিয়া আছেন।

লোচন যুগল রক্তবর্ণ, বর্ণ মলিন, কেশ রাশি বিশৃঙ্খল, পরিধেয় মলিন, দেহ নিরাভরণ। বিমলা যেন সে বিমলা নহেন। বহুক্ষণ এক মনে বসিয়া, আত্ম অবস্থা চিন্তা করিয়া বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—

"এ জীবনে কাজ কি? যে জীবনে সুখ নাই সে জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? জীবন রাখিব? না—কাহার জীবন রাখিব? যাহার সম্পত্তি তাহাকে বঞ্চিত করিয়া এ সম্পত্তি রাখিবার প্রয়োজন? না,এ জীবন রাখিব না।"

বিমলা আত্মহত্যা স্থির করিয়া সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করত সন্নিহিত স্থানে একখানি পিঁড়ি ছিল তথায় গিয়া উপবেশন করিলেন। বিমলা স্থির করিয়াছিলেন যে, সেই পিঁড়ির আঘাতে মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিবেন। পিঁড়িখানি উঠাইলেন। প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিক একবার স্থিরনেত্রে দেখিয়া লইলেন। ভাবিলেন সংসারে আজ আমার এই শেষ দেখা। লোচন দিয়া এক ফোটা দুই ফোটা করিয়া বহু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"যোগেশ! প্রিয়তম! প্রাণনাথ! হৃদয়বল্লভ! এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইল না। তোমার নিরূপম বদন আর দেখিতে পাইব না। না পাই—আমার আশা আছে। আমি এ পৃথিবীতে থাকিতে পাইলাম না। আমার কি হইল তাহা তুমি জানিতে পারিলে না। কিন্তু আমার বড় আনন্দ যে আমি তোমারই থাকিয়া মরিলাম। হৃদয়েশ! অভাগিনীর সর্ব্বস্ব ধন যোগেশ! আমার চরমকাল আগত।"

এই বলিয়া বিমলা সেই পিঁড়ি উত্তোলন করিয়া সজোরে স্বীয় মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তাঁহার আ-ঘাত কার্য্য শেষ হইতে না হইতে প্র-কোষ্ঠের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং ব্যস্ততা সহকারে যোগেশ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন! যোগেশ দে-খিলেন বিমলার দেহ রুধিরাপ্লাবিত, চৈতন্য শূন্য, ভূপতিত। তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল। উচ্চৈস্বরে কহিলেন,—

"বিমলে! বিমলে!"

উত্তর পাইলেন না।

"আমার বিমলার এ অবস্থা কে করিল" বলিয়া যোগেশ সংজ্ঞা রহিত হইয়া বিমলার শোণিতাক্ত দেহ পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। ক্রমশঃ

ভুবন মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখ সঙ্গিনী।

মনুষ্য হৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর শত্রু হস্ত বা কোন অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা সূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহা কাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবনজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্ব্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈল ক্ষেত্রের শিলা রাশিও উর্ব্বরা করিতে পারে। কিম্বা যখন অগ্নি শৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নি রাশি উদ্গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প নহে। ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে, এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই গীতিকাব্যই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উন্মত্ত করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভার লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের সুখে আহুতি প্রদান করে, দেবপূজার সময় সাধকের ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই গীতিকাব্যই ফরাসী বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে, এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এবং এই গীতিকাব্যই বাঙ্গালির নির্জ্জীব হৃদয়ে আজ কাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতিকাব্যের উপকরণ সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড় সামান্য ক্ষমতা নহে।

সেক্সপীয়র পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয় চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতি-কাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন্ নিজ হৃদয় চিত্রে অসাধারণ; কিন্তু পরের হৃদয় চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয় কাননের পুষ্প, আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জ্জিল প্রভৃতির প্রাচীন কালের করিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লে-খিতে পারিব না; কেননা সেই প্রাচীন কালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন। গীতিকাব্য যেমন প্রাচীনকালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেন না সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে। নিজের হৃদয় চিত্র করিতে গীতি কাব্যের উৎপত্তি বটে কিন্তু কেবল মাত্র নিজের হৃদয় চিত্র করা গীতি কাব্যের কার্য্য নহে; এখন নিজের ও পরের উভয়ের মনোচিত্রের নিমিত্ত গীতি কাব্য ব্যাপৃত আছে, নহিলে গীতি কাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিত না। ইংরাজিতে যাহাকে Lyric Poetry কহে, আমরা তাহাকে খণ্ডকাব্য কহি। মেঘদূত খণ্ডকাব্য, ঋতুসংহারও খণ্ডকাব্য এবং Lalla Rookh ও Lyric Poetry, I rish Melodies ও Lyric Poetry, কিন্তু আ-মরা গীতিকাব্য অর্থে মেঘদূতকে মনে করিনাই, ঋতুসংহারকে গীতিকাব্য কহি-তেছি। আমাদের মতে Lalla Rookh গীতিকাব্য নয়, I rish Melodies গীতিকাব্য। ইংরাজিতে যাহাদিগকে Odes, Sonnets প্রভৃতি কহে তাহা-দিগের সমষ্টিকেই আমরা গীতিকাব্য বলিতেছি। বাঙ্গলা দেশে মহাকাব্য অতি অল্প কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয় দিগের অধীনে থাকিয়া নির্জ্জীব হইয়া আছে, আবার বাঙ্গলার জল বায়ুর গুণে বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃ নির্জ্জীব, স্বপ্নময়, নি-স্তেজ, শান্ত; মহাকাব্যের নায়ক দিগের হৃদয় চিত্র করিবার আদর্শ হৃদয় পাইবে কোথা? অনেক দিন হইতে বঙ্গ দেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বাধীনতার ভাব বাঙ্গালীর হৃদয়ে নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ অষ্ঠে পৃষ্ঠে মূল বিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডী-দাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করি-

য়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেম-প্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আজ কাল ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা, অধীনতা, তেজস্বীতা, স্বদেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি অনেকগুলি কথার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজ কাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি করিয়া মহাকাব্য বাহির করেন কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি, জয়দেবের সময় তাঁহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা থাকিত তবে তাঁহারা হয়ত উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধ হৃদয় লোকদের হৃদয়ে উকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন এই নিমিত্ত মেঘনাদ বধে, বৃত্র সংহারে ঐ সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙ্গালিদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙ্গালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাব্যে ঢালিয়া দিতেছে। "মিলে সবে ভারত সন্তান" ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙ্গালির প্রথম অশ্রুজল! সেই অবধি আরম্ভ হইয়া আজি কালি বাঙ্গালা গীতিকাব্যের যে অংশে নেত্রপাত করি সেই খানেই ভারত! কোথাও বা দেশের নির্জ্জীব রোদন, কোথাও বা উৎসাহের জ্বলন্ত অনল! "মিলে সবে ভারত সন্তানের" কবি যে ভারতের জয় গান করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আজ কালি বালক পর্য্যন্ত, স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত সেই জয় গান করিতেছে, বরং এখন এমন অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা সমূহ হাস্য জনক! সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্য জনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি। ভারত মাতা, যবন, উঠ, জাগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয় এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে ও সকল কথা আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ ভারত ভারত চীৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইবে! এই নিমিত্ত যাঁহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আর্য্যসঙ্গীত লেখেন, তাঁহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই; তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহাদের প্র-

য়াস দেহিতে কবিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে কিন্তু তাঁহাদের সোপান হাস্য জনক। তাঁহারা বুঝেন না ঘুমন্ত মনুষ্যের কর্ণে ক্রমাগত একইরূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ক্রমে তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাতে আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহারা বুঝেন না যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হইয়া যায় তেমনি সকল বিষয়েই। এই নিমিত্তই সেক্সপীয়র কহিয়াছেন "Words to the heat of deed too cold breath give." তোমার হৃদয় যখন উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিবে তখন তুমি তাহা দমন করিবে নহিলে প্রকাশ করিলেই নিভিয়া যাইবে এবং যত দমন করিবে ততই জ্বলিয়া জ্বলিয়া

ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী এই তিনখানি গীতিকাব্য আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে ভুবনমোহিনী প্রতিভা ও অবসর সরোজিনীর মধ্যে অনেকগুলি আর্য্যসঙ্গীত আছে, কেননা ইহাঁদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক। ইহা প্রায় প্রত্যক্ষ যে দুর্ব্বলদিগের যেমন শারীরিক বল অল্প তেমনি মানসিক তেজ অধিক; ঈশ্বর একটীর অভাব অন্যটির দ্বারা পূর্ণ করেন। ভুবনমোহিনী প্রতিভা ও অবসর সরোজিনী পড়িলে দেখিবে, ইহাঁদিগের মধ্যে একজনের প্রয়াস আছে, অধ্যবসায় আছে, শ্রম শীলতা আছে। একজন আপনার হৃদয়ের খনির মধ্যে যে রত্ন যে ধাতু পাইয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, সে রত্নে ধূলি কর্দ্দম মিশ্রিত আছে কি না, তাহা সুমার্জ্জিত মসৃণ করিতে হইবে কি না তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আর একজন আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে যাহা কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জ্জিত করিয়া বা কোন কোন স্থলে তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন। একজন নিজের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর একজন পাঠকদিগের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন। ভুবনমোহিনী নিজের মন তৃপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর রাজকৃষ্ণ বাবু যশ প্রাপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, নহিলে তিনি বিদেশীয় কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়া নিজের বলিয়া দিতেন না। ভুবনমোহিনী পৃথিবীর লোক, তাঁহার কবিতার নিন্দা করিলেও গ্রাহ্য করিবেন না, কেননা তিনি পৃথিবীর লোকের নিমিত্ত কবিতা লেখেন নাই। আর রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহার কবিতার নিন্দা শুনিলে মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইবেন কেননা যশেচ্ছাই তাঁহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। একজন অশিক্ষিতা রমণীর প্রতিভায় ও একজন শিক্ষিত যুব-

কের প্রয়াসে এই প্রভেদ। কবিরা যেখানেই প্রায় পরের অনুকরণ করিতে যান সেই খানেই নষ্ট করেন ও যেখানে নিজের ভাব লেখেন সেই খানেই ভাল হয়, কেননা তাঁহাদের নিজের ভাব স্রোতের মধ্যে পরের ভাব ভাল করিয়া মিশে না। আর কুকবিরা প্রায় যেখানে পরের অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেই খানেই ভাল হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন, কেননা হয় পরের মনোভাব স্রোতের মধ্যে তাঁহাদের নিজের ভাব মিশে না কিম্বা তাঁহার আশ্রয় উচ্চতর কবির কবিত্বের নিকট তাঁহার নিজের ভাব "হংস মধ্যে বকো যথা" হইয়া পড়ে! এই নিমিত্ত অবসর সরোজিনীর "মধু মক্ষিকা দংশন" ও "প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনী" ইত্যাদি কবিতাগুলি মন্দ নাও লাগিতে পারে!

"THE WOUNDED CUPID"

Cupid, as he lay among
Roses, by a bee was stung.
Whereupon, in anger flying
To his mother said thus, crying,
Help, O help, your boy's a dying!
And why my pretty lad? said she.
Then, blubbering, replied he,
A winged snake has beaten me,
Which country people call a bee.
At which she smiled; then with her hairs
And kisses drying up his tears
Alas, said she my wag! if this
Such a perniceous torment is;
Come, tell me then, how great's the smart
Of those thou woundest with thy dart?

"HERRICK"

মধুমক্ষিকা দংশন।

একদা মদন করিয়ে যতন,
বাছি বাছি তুলি কুসুম রতন
রচিল শয়ন মনের মতন,

*   *   *

ঘুমের ঘোরেতে হয়ে অচেতন,
মুদিয়ে নয়ন রহিল মদন

*   *   *

ঘুমঘোরে কাম নড়িল যেমন,
মধুমাছি দেহে বাজিল চরণ;
রাগভরে মাছি সবলে তখন
ফুটাইল কাম চরণে হুল।
অধীর হইয়া বিষের জ্বালায়
উঠি রতিপতি ছুটিয়ে পালায়
প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যথায়
গাঁথিতে ছিলেন মালতী ফুল।
"অয়ি প্রিয়তমে!" কহিল রতিরে
রতিনাথ "প্রাণ যায় যে অচিরে

*   *   *

কেন শুইলাম বিছাইয়া ফুল
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল
কি হবে কি করি প্রাণ যে যায়!"

*   *   *

কহে কামে রতি নিকটে আসিয়ে
"ছোট মধুমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে

*   *   *

তাই তুমি, নাথ! হইলে কাতর
ভাল, বল দেখি দাসীর গোচর

কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
পঞ্চশর তুমি বিঁধিবে যার ?"

"Flow on thou shining river,
But ere thou reach the sea,
Seek Ella's bower and give her
The wreath I fling o'er thee." &c.
Moore

প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনি !
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিবে নয়নে ;—
তব তটে বসি মম সুচারু হাসিনী
নব বিবাহিতা বালা আনত আননে !
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়া
কমল-কুসুম মালা, দিয়ে করে তার।"
ইত্যাদি।

এই ইংরাজি কবিতা ও বাঙ্গালা কবিতাগুলিতে অতি অল্প প্রভেদ আছে।

"বাঙ্গালী ভায়ারা করি নিবেদন
যোড় করে বন্দি ও রাঙ্গা চরণ !
যা কিছু বলিনু ভালরি কারণ
ভাবি দেখ মনে করো না রাগ।
রাগ ত কর না দাসত্ব করিতে
রাগ ত কর না নিগার হইতে
পাদুকা বহিতে অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্ক দাগ !
এসব করিতে রাগ যদি নাই
আমার কথায় রেগো না দোহাই
বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা হ'লে !

অবসর সরোজিনীর কবি ভাবিতেছেন তিনি হাসিতে হাসিতে, উপহাস করিতে করিতে খুব বুঝি অর্থস্পর্শ করিতেছেন কিন্তু "বাঙ্গালী ভায়ারা" ইত্যাদিতে কবিতার উপর অভক্তি ভিন্ন আর কোন ভাব মনে আসে না। তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে কিন্তু ভাব নাই। তাঁহার প্রেমের কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে কিন্তু অনুরাগের জ্বলন্ত তেজ নাই। তিনি "কেন ভালবাসি ?"র ন্যায় একটি কবিতা লিখিতে পারেন না এবং ভুবনমোহিনীরও তাঁহার "প্রিয়তমা হাসিল"র ন্যায় কবিতা মনে আসিতে পারে না। সরোজিনীর মধ্যে রূপক তুলনার কৌশল বাক্যের আড়ম্বর আছে কিন্তু সেগুলি হৃদয় স্পর্শ করে না। ভুবন মোহিনীর কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসম্বন্ধ রচনা অনেক আছে তথাপি সেগুলি সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।

যদিও ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াস জাত কবিতা নাই, সব গুলিই প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভুবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা ইহার যাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে। গুণ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি সেই গুণ দ্বিগুণিত হইয়া মনে উঠে। দোষ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে অমনি তাহার চক্ষু-

র্থাংশ কমিয়া যায়। যখন আমরা

"রুধির মেখেছে, রুধির পিতেছে,
রুধির প্রবাহে দিতেছে সাঁতার
ছিন্ন শীর্ষ শব, ভেসে যায় সব
পিশাচী প্রেতিনী কাতারে কাতার!
সঘনে নিঘনে মলয় পবন,
আহরি সুরভি নন্দন রতন
মন্দার সৌরভ অমৃত রাশি
মর্ম্মরিছে তরু অটল ভূধর,
দমিছে দাপেতে কাঁপিছে শিখর—

প্রভৃতি পড়িয়া কিছুই অর্থ করিতে পারি না তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে এবং ইহার অর্থ বুঝিতেও চাই না! যখন উন্মাদিনী পড়িয়া আমাদের হাসি আসে তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে অমনি হাসি চাপিয়া ফেলি! যখন প্রতিভার "পিশাচী" "প্রেতিনী" ময়ী কবিতার মধ্যে কোন কর্কশ কথা পাই তখনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে ও আমরা যথাসাধ্য কোমল করিয়া পাঠ করি! একজনকে আমি "উন্মাদিনী" কবিতার অর্থ বুঝাইতে বলি, তিনি কহিলেন আমি ইহার অর্থ বুঝাইতে পারি না, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটী মাধুর্য্য আছে। কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বন্ধ প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য্য কল্পনা করে এবং দর্শনের মধ্যে যে অংশ টুকু দুর্বোধ্য ও কঠোর তাহাই পাঠকেরা গভীরদর্শন বলিয়া মনে করেন। অনেক গীতিকাব্যের দোষ এই যে তাহার শৃঙ্খলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্ততাময়; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির উচ্ছসিত হৃদয় হইতে যে কবিতা প্রসূত হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না। প্রতিভা এই দোষে কলঙ্কিত। ইহার অনেক দোষ পরিহার করিয়া কতকগুলি কবিতা পাই যাহা উচ্চ শ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

"সরোজিনী" ও "প্রতিভা" পড়িতে পড়িতে আমরা "দুঃখসঙ্গিনীকে" ভুলিয়া গিয়াছিলাম। "দুঃখসঙ্গিনীতে" আর্য্য সঙ্গীত নাই, আর্য্য রক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। হৃদয়ের বৃত্তি নিচয়ের মধ্যে প্রেমে যেমন বৈচিত্র্য আছে, এমন আর কিছুতেই নাই। প্রেমের মধ্যে দুঃখ আছে, সুখ আছে, নৈরাশ্য আছে, দ্বেষ আছে, এবং প্রেমের সহিত অনেকগুলি মনোবৃত্তি জড়িত! এখন কতকগুলি সমালোচক ধুয়া ধরিয়াছেন যে প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। একথার অর্থ খুব অস্পষ্ট আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তিনি মানব প্রকৃতি বুঝেন না। যে মনুষ্যের হৃদয়ে প্রেম নাই তেজস্বিতা আছে,

তাহার হৃদয় নরক! কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম আছে, তাহার তেজস্বিতা আছেই। তুমি কবি! নৈরাশ্য বিষাদ জনিত অশ্রুজল যদি তোমার হৃদয়ে জমিয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেল! তাহা দমন করিয়া তুমি বলপূর্ব্বক যেন "ভারত" "একতা" "যবন" প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার করিও. না। কবিতা হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে উত্থিত হয়, সমালোচকদের তিরস্কার হইতে উত্থিত হয় না। দুঃখসঙ্গিনীর বিষয় আমরা এই বলিতে পারি তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট। তিনি যেখানে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন সেই খানকার ভাষাই মিষ্ট হইয়াছে। তবে একটী কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার ভাবের মাধুর্য্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে! এই পুস্তকের মধ্যে হইতে আমরা অনেক সুন্দর পংক্তি তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম কিন্তু বাহুল্য ভয়ে পারিলাম না।

সিরাজ উদ্দৌলা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নবাবের সৈন্যগণ বিজয় কার্য্য সমাধা করিয়া কলিকাতা লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। (১) কলিকাতা হইতে সিরাজ আশানুযায়ী সম্পত্তি লাভ করিতে পারিলেন না। কলিকাতাবাসীগণ পূর্ব্ব হইতেই স্ব স্ব সম্পত্তি স্থানান্তরিত করিয়াছিল। কেবল উমিচাঁদের ভাণ্ডার হইতে নবাব ৪০০,০০০ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লাভ করিয়াছিলেন। সন্তোষানুযায়ী অর্থ লাভ না করায় সিরাজ হলওয়েল প্রভৃতির উপর মর্ম্মান্তিক কুপিত হইলেন। তজ্জন্য অন্যান্য সমস্তকে মুক্তি দিয়া হলওয়েল ও তাঁহার দুইজন সঙ্গীকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। (২)

সিরাজ বিজয় মদে প্রমত্ত হইয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার কলিকাতা জয় ব্যাপার অসাধারণ কাণ্ড। এ ঘটনায় ইংরাজগণ এতই ভীত হইবে যে, এ দেশে আর কদাচ অস্ত্র ধারণ করিতেও সাহস করিবে না। এই অসার ও অদূরদৃষ্ট আমোদে গর্ব্বিত হইয়া সিরাজ পলাতকদিগকে অনুসরণ করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। দিল্লীতে বাদশাহ সমীপে স্বীয় বিজয় বার্ত্তা গৌরব সহকারে প্রেরণ করিলেন। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তিনি কলিকা-

১। Seir Mutaqherin Vol I,P. 721

২। Orme's Indostan Vol II,P. 81

তার নাম আলিনগর অর্থাৎ 'ঈশ্বরের নগর' রাখিলেন। (১) অতঃপর কলিকাতা সংরক্ষণার্থ মানিকচাঁদ নামক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে আট বা নয় সহস্র পদাতিক এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য রাখিয়া স্বয়ং মুরসিদাবাদ প্রস্থান করিলেন। (২) প্রস্থানের পূর্ব্বে নবাব যে সকল ব্যক্তি অন্ধকূপ হত্যা হইতে প্রাণ লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে পুনরায় নগরে আসিয়া বাস করিতে আজ্ঞা দিলেন। উমিচাঁদ তাহাদিগকে আবশ্যকীয় সমস্ত প্রদান করিল এবং তাহারই প্রযত্নে নবাবের তাদৃশ অনুগ্রহ সূচক আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। (৩)

১। Orme's Indostan P.82.

২। Seir Mutaqherin Vol P. 723-724

মানিকচাঁদ পূর্ব্বে বর্দ্ধমান রাজের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার গুণপনা ছিল না বরং প্রকৃতি সর্ব্বথা নিন্দনীয় ছিল। তাঁহাকে এতাদৃশ উন্নত পদ প্রদান করায় মীরজাফর খাঁ, রহিম খাঁ, ওমর খাঁ, তদীয় পুত্র সেলাবট খাঁ ও দিলীর খাঁ এবং রাজা দুর্ল্লভরাম প্রভতি বিজ্ঞ, প্রবীণ ও ক্ষমতাশালী সেনাপতিগণ অপমানিত ও দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের এতাদৃশ মনোমালিন্য সিরাজের অবনতির হেতু ভূত। সিরাজ যাহা বুঝিতেন, তাহা কে নিরারণ করে? Seir Mutaqherin দেখ।

৩। যে উমিচাঁদ ইংরাজ হস্তে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছে, সেই তাঁহাদের এই বিপদ সময়ে সাহায্যার্থ দ্রব্য সামগ্রী হস্তে অগ্রসর এবং নবাবের করুণা লাভার্থ ব্যগ্র। এখনও ইংরাজ! তোমায় জিজ্ঞাসি—কাহার হৃদয় প্রশস্ত, কে সুমধিক উদার, উচ্চমনা ও প্রশংসনীয়? ক্ষণবিলম্বে, বিপদ উত্তীর্ণ হইলেই তুমি বলিবে, উমিচাঁদ অতি অসৎ, অতি নীচ ও অতি অপবিত্র।

স্থির থাকিয়া স্বকীয় কার্য্য সিদ্ধ করা ইংরাজগণের স্বভাববিরুদ্ধ। কলিকাতা প্রবেশের অনতিকাল পরে এক জন ইংরাজ সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া একজন যবনকে বিনষ্ট করে। এই কারণে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্যস্থ তাবত ইংরাজের বিরুদ্ধে কঠোর রাজাজ্ঞ প্রচার করিলেন। ইংরাজগণ পলাতক হইয়া ফরাসী, ওলন্দাজ এবং প্রুসিয়া দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং ক্রমশঃ ফলতায় পূর্ব্ব পলাতক দলে মিশিতে লাগিলেন। (১)

ফলতাস্থ পলাতক ইংরাজগণ মানিংহাম সাহেবকে এই বিপদের সংবাদ দিতে মান্দ্রাজ পাঠাইলেন। ১৫ই জুলাই তারিখে কাসিমবাজারের পতন সংবাদ পৌঁছে। এই সংবাদ পাইয়া দেলওয়ারি নামক পোতে ২৩০ জন সৈন্য সহ মেজর কিলপাট্রিককে, ২০ শে জুলাই তারিখে কলিকাতা প্রেরণ করা হইল। ৫ই আগষ্ট তারিখে পুনরায় কলিকাতার পতন বার্ত্তা মান্দ্রাজে

১। Orme's Indostan Vol. II P 80

পঁহুছিল। (১) তাঁহারা কর্ত্তব্যাবধারণে ব্যাপৃত হইলেন।

সিরাজ নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহেন। পূর্ণিয়ার নবাব সকতজঙ্গের সহিত তাঁহার মনোবাদ ছিল। সময় ও সুবিধা হয় নাই বলিয়া সিরাজ এতদিন স্থির ছিলেন। অধুনা তাঁহাকে পরাভূত করিবার বাসনা বলবতী হইল। সকত-জঙ্গ সিরাজের ন্যায় অবিবেকী, উদ্ধত ও চপলপ্রকৃতি ছিলেন। সুতরাং এই ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয়ে সম্ভাব থাকা অসম্ভব। রাজা দুর্ল্লভরামের অনুজ রামবিহারীকে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা পূর্ণিয়ার অন্তর্গত বীরনগর ও গন্ধবারার ফৌজদারী পদ প্রদান করিলেন এবং তদধিকারের নি-মিত্ত রাজাজ্ঞা ও সকতজঙ্গের সমীপে এক পত্র প্রদান করিলেন। সেই পত্রের উত্তরে সকতজঙ্গ সিরাজকে গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তদ্ধেতু সি-রাজের সেনাপতিগণ সকতজঙ্গকে শিক্ষা দিতে প্রস্থান করিল। ১৭৫৬ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে সকতজঙ্গ পরাভূত ও বিনষ্ট হই-লেন। সকতের সম্পত্তি আদি মুরসি-দাবাদে প্রেরিত হইল। (২)

নবাব সিরাজ উদ্দৌলার অদৃষ্ট তরু প্রসূনমালায় পরিশোভিত হইল। তিনি সৌভাগ্যের উচ্চতম আসনে অপ্রতিহত প্রভাবে সমাসীন হইলেন। আনন্দ উৎসাহ ও গর্ব্বে তাঁহার হৃদয় কন্দর পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। কিন্তু এ জগতে সকল কার্য্যেরই সীমা ও শেষ আছে। আনন্দের বিঘ্ন জন্মে, উৎসা-হের জ্বলন্ত শিখা নিবিয়া যায়, গর্ব্বের শেষ হয়। "অত্যুচ্চেঃ পতনায়" এ কথা বালক প্রলাপ নহে। সিরাজ নিরতি-শয় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত-নের সময় উপস্থিত হইল।

কলিকাতার পতন সংবাদ মান্দ্রাজে পৌঁছিলে, তথাকার গবর্ণর কৌন্সিল দুই মাস কাল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণে নষ্ট করিলেন। এ সংবাদে তাঁহাদের বিরক্তি বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।১ অবশেষে স্থির হইল যে, আডমিরাল ওয়াটসন্

১। Orme's Indostan P. 84

২। Scir Mutaqherin Vol. I, P. 724-752

এই গ্রন্থের প্রণেতা সকতজঙ্গের মন্ত্রীত্ব পদে অভিষিক্ত ছিলেন। এই যুদ্ধ বিগ্রহ মধ্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ দেখিলে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বিদিত হওয়া যাইবে।

১। মহাত্মা মেকলের সকলই বাড়া-বাড়ি। স্বজাতীয় গৌরব সংস্থাপনে তিনি নিতান্ত ব্যগ্র। তজ্জন্য তিনি অমূলক বা অযৌক্তিক কথা বলিতেও কাতর নহেন। তিনি লিখিতেছেন,

In August the news of the fall of Calcutta reached Madras, and exited the fiercest and bitterest resentment. The cry of the whole

স্বকীয় রণতরি সমেত কলিকাতার উদ্ধার সাধনার্থ গমন করিবেন। কিন্তু কেবল জলসৈন্যে কি হইবে পদাতিক সৈন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তাহার কর্ত্তৃত্ব ভার কে লইবেন? তাঁহার ক্ষমতা কতদূর হইবে? কলিকাতার গবর্ণর কৌন্সিলের সহিত তাঁহার ক্ষমতারই বা কি তারতম্য থাকিবে? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা কঠিন হইয়া উঠিল। অনেকে ভূসৈন্যের

tlement was for vengeance. Within forty-eight hours after the arrival of the intelligence it was determined that an expedition should be sent to the Hooghly, and that Clive should be at the head of the land forces." *Macaulay's Essay On Clive.*

অর্ম্ম এই সময়ে মান্দ্রাজের গবর্ণর কৌন্সিলের একজন প্রধান মেম্বর ছিলেন এবং এই ব্যাপারের তিনিই প্রধান উদ্যোগী। তিনি লিখিতেছেন;—

——"On the 5th of August arrived letters from the fugitives at Fulta, with details of the capture of Calcutta, which scarcely created more horror and resentment than consternation of perplexity."

অন্যত্র যথা;—

"Two months passed in debates before these final resolutions were taken, and then the embarkation began."

ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর পিগট্, কর্ণেল আল্ডারক্রন্, কর্ণেল লরেন্স, কেহই উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে হইল না। অর্ম্ম কর্ণেল ক্লাইবের কথা প্রস্তাব করিলেন; সকলে তাহাতে সাদরে অনুমোদন করিলেন। রাজকীয় এবং বাণিজ্য বিষয়ক যাবতীয় ক্ষমতা কলিকাতার গবর্ণর এবং কৌন্সিলের হস্তে ন্যস্ত হইল; সমর সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারে ক্লাইব সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেন। পলাতক মানিংহাম এ সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন, কিন্তু সে ভীরু ও কাপুরুষের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

১৬ ই অক্টোবর তারিখে ৯০০ ইউরোপীয় ও ১৫০০ সিপাহী এবং ৫ খানি রণতরি মান্দ্রাজ ত্যাগ করিল। ২০শে তারিখে তৎসমস্ত ফল্তায় পৌঁছিল। ইতিপূর্ব্বে মেজর কিলপেট্রি-

এ সম্বন্ধে অর্ম্মের কথা উপেক্ষা করিয়া মেকলের কথায় আস্থা করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? মেকলে এতাদৃশ সত্য সমস্ত কোথায় পান বলিতে পারি না। ঐতিহাসিক ব্যাপারে তাঁহার মতের স্বাধীনতা এবম্বিধ ঘটনায় বিশেষ সাক্ষী দিতেছে।

কের অধীনে যে সৈন্য আসিয়াছিল তাহারাও ফল্‌তায় ছিল। সেই অস্বাস্থ্যকর স্থানে অধিক দিন অবস্থান হেতু প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। জীবিতের মধ্যে ত্রিংশৎ জন মাত্র প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মক্ষম ছিল। ১

ক্লাইব পঁহুছিবার পূর্ব্বে "কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরস্‌" বিলাত হইতে মেঃ ড্রেক ও কলিকাতার কৌন্সিলের ভূতপূর্ব্ব কয়েকজন মেম্বরকে রাজকীয় ও সামরীক ক্ষমতা দিয়া এক 'সিলেক্ট কমিটী' নিযুক্ত করেন। ঐ কমিটী মেজর কিল্‌পাট্রিককে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লন। পরে ওয়াট্‌সন্‌ এবং ক্লাইবও কমিটীতে স্থান পান। ক্লাইব মান্দ্রাজ হইতে নবাবকে দিবার জন্য পত্র লইয়া আনিয়াছিলেন। অধুনা স্বয়ং একখানি ও ওয়াট্‌সন্‌ আর একখানি লিখিয়া নবাবের কলিকাতাস্থ সেনানায়ক মাণিকচাঁদের সমীপে প্রেরণ করিলেন। সেই সমস্ত পত্র দ্বারা নবাবকে ভৎসনা ও ভীতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। মাণিকচাঁদ সেই কঠোর লিপি সমস্ত নবাব সন্নিধানে প্রেরণ করিতে সাহসী হইলেন না।

নবাব বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজগণের বাণিজ্য দেশ হইতে নিরুদ্ধ হইলে, তাঁহার আয় কমিয়া যাইবে। এজন্য তিনি পুনরায় ইংরাজদের সহিত জাফরের বন্দোবস্তে সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এমন সময় ফল্‌তায় বহুসংখ্যক ইংরাজের সমরাভিপ্রায়ে আগমন বার্ত্তা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তৎ শ্রবণে স্বীয় সৈন্য সমস্তকে মুরসিদাবাদে সমবেত হইতে আজ্ঞা দিলেন।

ফল্‌তা হইতে ইংরাজ সৈন্য সমস্ত মায়াপুরের নীচে আসিল। স্থির হইল যে কল্য বজবজিয়ার দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে। বজবজিয়া মায়াপুর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। আক্রমণ প্রকাশ্যে না হইয়া লুক্কায়িত ভাবে করাই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইল। আবশ্যক মত সৈন্যাদি বজবজিয়া সন্নিধানে প্রেরিত হইল। সৈন্যগণ পথশ্রম জন্য নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহারা স্ব স্ব অস্ত্রাদি রাখিয়া যে যেখানে সুবিধা হইল নিদ্রা দিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে তাহারই পূর্ব্ব দিন মানিকচাঁদ ১৫০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সমভিব্যাহারে বজবজিয়ার দুর্গে আগমন করিয়াছিলেন। ইংরাজরা

১। এতদ্বিষয়ক সমধিক বৃত্তান্ত জানিতে হইলে Orme's Indostan vol II P 84-P89 ও 119-120 এবং Thornton's British India vol I P 198-200 দেখ।

নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া আত্ম সাবধানে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অর্ম্ম লিখিয়াছেন,—

——"From a security which no superiority or appearances in war could justify, the common precaution of stationing sentinels was neglected."

এই কার্য্যটী ক্লাইবের ন্যায় রণ-চতুর ব্যক্তির উপযোগী হয় নাই। ইহাতে সম্ভবতঃ ইংরাজগণের বঙ্গের আশা ভরসা বিলীন হইতে পারিত। অর্ম্ম আশঙ্কা করিয়াছেন যে, যদি বিপক্ষের অশ্বারোহীগণ আসিয়া সহসা আক্রমণ করিত তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারিত। (১)

যাহাই হউক সুশিক্ষিত ও সাহসী ইংরাজ সৈন্যের নিকট সকলকেই পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ অসাবধান অবস্থায় বিপক্ষেরা আক্রমণ আরম্ভ করিল ; কিন্তু কোনই কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিলনা। বহু কাল যুদ্ধের পর মানিকচাঁদ সৈন্যগণকে রণে ভঙ্গ দিতে আজ্ঞা দিলেন এবং স্বীয় হস্তী ফিরাইলেন। ইংরাজ সৈন্যগণ সন্নিহিত গ্রামে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময়ে অন্ধকারে লুকায়িত হইয়া দুর্গস্থ সৈন্য সমস্ত দুর্গ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল, একথা ইংরাজরা জানিতে পারিলেন না। রাত্রি ৮ টার সময় একজন উন্মত্ত সেনানী দুর্গের পরিখা পার হইয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল এবং দেখিল যে একটী প্রহরীও নাই। সে তথা হইতে চীৎকার আরম্ভ করিল। তাহার চীৎকারে ইংরাজ সন্নিহিত গ্রাম ত্যাগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সকলে দুর্গে প্রবেশ করিল। কতকগুলি নাবিক সুরাপানে বিকলিত চিত্ত হইয়াছিল। কএকজন সিপাহী সৈন্যকে শত্রুসৈন্য বিবেচনায় উক্ত

১।————"the thick jungle which concealed the approach of the infantry, was impervious to cavelry, who had no means of advancing, except through openings where they must have been seen, and the possilitity of surprise defeated." *The life of Robert Clive. By Major General Sir john Malcolm, K. C. B. Vol. 1P. 152.*

চরিতাখ্যায়ক মালকলম সতত উজ্জল বর্ণে ক্লাইবের গুণ গরিমা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ক্লাইবের উপস্থিত কলঙ্ক ভঞ্জনের নিমিত্ত বলিতেছেন যে, তথায় অশ্বারোহী সৈন্যের আসিবার সম্ভাবনা ছিল না, ভাল, স্বীকার করিলাম যে, অশ্বারোহী তথায় উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অলক্ষিতভাবে পদাতিক সৈন্য উপস্থিত হইয়া কি সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারিত না ?

নাবিকগণ গুলি করিল। সেই গুলির আঘাতে কাপ্তেন কাম্বেল নামে একজন ইংরাজ যোদ্ধা হত হইলেন। ১

মানিকচাঁদ এই বিপদের সংবাদ লইয়া স্বয়ং মুরসিদাবাদে নবাব সন্নিধানে গমন করিলেন। কলিকাতার দুর্গ রক্ষণার্থ ৫০০ সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সঙ্গে লইয়া গেলেন।

বজবজিয়ার দুর্গ হইতে ৩০সে ডিসেম্বর ইংরাজ সৈন্য কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করিল। ক্লাইব পরদিন অধিকাংশ ইউরোপীয় সিপাহী সৈন্য সঙ্গে স্থলপথে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ২রা জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ করা হইল ও অতি সহজেই দুর্গ, ও নগর অধিকৃত হইল। তৎক্ষণাৎ পুনরায় দুর্গোপরি ইংরাজ পাতাকা উড্ডীন হইল।

ইংরাজগণের আনন্দের সীমা রহিল না। বিগত অধিকার পুনঃলাভ হওয়ায় তাঁহারা সকলেই যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের বাণিজ্য দ্রব্য সমস্ত অপসারিত হয় নাই। প্রায় ৫০০০০ অধিবাসী পুনরায় কলিকাতা আসিয়া স্বস্ব আবাসে বাস করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজগণের বাসবাটী প্রভৃতি বিধ্বংসিত ও সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল।

ড্রেক গোপনে সংবাদ পাইলেন যে, মুরসিদাবাদ হইতে নবাবের সৈন্য উপস্থিত হইবার বিলম্ব আছে। ইত্যবসরে হুগলী আক্রমণ করিতে পারিলে সুবিধা হয়। তথায় সকলেই দারুণ ভীত হইয়া রহিয়াছে। তজ্জন্য কিয়দংশ সৈন্য হুগলি প্রেরিত হইল। ১০দিনের পর সৈন্য সমস্ত হুগলী পহুছিল। ইংরাজ সৈন্য দর্শনমাত্র হুগলীস্থ সৈন্য সমস্ত নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। হুগলি এবং সন্নিহিত স্থান সমস্ত সহজেই অধিকৃত হইল। ১৯ সে জানুয়ারি তারিখে সফল প্রযত্ন হইয়া কতক সৈন্য কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল।

এই সময় সংবাদ আসিল যে, ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিয়াছে। বঙ্গভূমে চন্দননগর ফরাসিদিগের অধিকার। তথায় তাঁহাদের ৩০০ ইউরোপীয় সৈন্য ও কামানাদি ছিল। ক্লাইব দেখিলেন, নবাবের সহিত যোগ দিলে সহজে ফরাসিদিগকে পরাভূত করা যাইতে পারে। তদনুসারে তিনি মুরসিদাবাদের শেঠ দিগকে এই বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন; কিন্তু এই সময়ে হুগলির সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তিনি ক্রুদ্ধ

১। Orme's Indostan Vol II P-124-5

হইয়া ইংরাজগণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, সুতরাং কেহ কিছু বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। উমিচাঁদ কলিকাতার দুর্গ জয়ের পর স্বীয় বিনষ্ট সম্পতি পুনরুদ্ধার সাধনার্থ নবাবের সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি পুনঃ প্রদান করিলেন, উমিচাঁদের কলিকাতায় অনেক বাটী ও ভূমি সম্পত্তি ছিল। তদ্ধেতু ইংরাজগণের সহিত সন্ধি তাঁহারও সর্ব্বথা অভিপ্রেত। তিনিও নবাবের সৈন্য সঙ্গে যাত্রা করিলেন।

ইতিমধ্যে ইংরাজেরা কলিকাতায় শান্তি সংস্থাপনার্থ যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নগরের চতুর্দ্দিকে এক পরিখা খনিত করিলেন এবং ১ মাইল উত্তরে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। নবাব আসিতেছেন শুনিয়া জনগণ ভীত হইয়া ইংরাজ সৈণ্যগণকে খাদ্য সরবরাহ করিতে বা অন্য সাহায্য করিতে অপারক হইল, ক্লাইব সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সিরাজ প্রকাশ করিলেন যে, তিনি সন্ধি করিতে সম্মত আছেন। কিন্তু তিনি অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। ৩ রা ফেব্রুয়ারি নবাবের সৈন্যাগ্র পরিদৃষ্ট হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দূরে প্রজ্বলিত নগরের অগ্নিশিখা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ক্লাইব এই সময়ে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলে সুবিধা হইতে পারিত তিনি তাহা করিলেন না। কেন করিলেন না তাহা তিনি বলিতে পারেন। পরদিন প্রাতে সুবাদার সৈন্যের পুরোভাগ অগ্রসর হইল। নবাব পত্র দ্বারা সন্ধি সম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা স্থির করিবার জন্য কর্ম্মচারি প্রেরণ করিতে বলিলেন। তদনুসারে ওয়ান্‌স এবং স্ক্রুফ্‌টন নামক দুই জন সিবিলিয়ান নবাব সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রধান মন্ত্রি রায় দুল্লভের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি দেখিলেন তাঁহাদের কোন দুরভিসন্ধি আছে কি না। কর্ম্মচারীদ্বয় নবাব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আপনাদের লিখিত প্রস্তাব প্রদান করিলেন। নবাব তাহা পাঠ করিয়া দেওয়ানের সহিত তৎসম্বন্ধীয় কথা কহিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা তদভিপ্রায়ে উঠিলেন। এমন সময় উমিচাঁদ তাঁহাদিগকে, সতর্ক থাকিবার নিমিত্ত সাবধান করিয়া দিলেন। কর্ম্মচারীদ্বয় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। ক্লাইব সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া পরদিন প্রত্যূষে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। আক্রমণ করিলেন বটে কিন্তু কার্য্য কিছুই হইল না। দারুণ কুজ্ঝটিকায় সমস্ত প্রান্তর আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ঘোর যুদ্ধেও আশানুরূপ ফল ফলিল না। পুনরায় নবাবের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব

হইল। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সন্ধি স্থির হইল। সন্ধির মর্ম্ম এই ;—"নবাব কোম্পানীর কুঠী সকল ও যে সকল লুণ্ঠিত সামগ্রী তাঁহার রাজকীয় হিসাবে জমা হইয়াছে, তৎসমুদয় পুনঃ প্রদানে সম্মত হইলেন। তিনি কোম্পানিকে কলিকাতার দুর্গ সংস্করণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিলেন ; তাহাদিগকে নিজ টাকশালে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন ; কোম্পানির দস্তখ লইয়া যত বাণিজ্য দ্রব্য যাইবে, তাহার কর, শুল্‌ক প্রভৃতি রহিত করিয়াদিলেন ; বাদশাহ ফরক্‌শিয়রের নিকট হইতে ১৭১৭ খৃঃঅব্দে তাঁহারা যে ৩২ খানি গ্রামের স্বত্ব পাইয়াছিলেন, তাহা অধিকার করিতে আজ্ঞা দিলেন ; সংক্ষেপতঃ পূর্ব্ব বাদশাহগণ তাঁহাদিগকে এ পর্য্যন্ত যে কিছু ক্ষমতা দিয়াছিলেন তাহা সমস্তই পূর্ব্ববৎ হইল।" ১

সিরাজ-উদ্দৌলা এবম্বিধ গ্লানিজনক সন্ধি বন্ধনে বদ্ধ হইয়া দুরন্ত শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিলেন। তাঁহার এই কার্য্য ত্বদীয় বীরতার একান্ত বিরোধী। কিন্তু সময় ও ঘটনার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাঁহার এতৎকার্য্য সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইবে। যে বল বিক্রম সম্পান্ন শত্রু বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমশঃ অস্ত্র ধারণ করত দেশাধিপের বিরোধে দণ্ডায়মান হয়, তাহাদের বিশ্বাস কি ? যে কোন উপায়ে তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা বিধেয়। বালক সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

সিরাজ কর্ণেল ক্লাইব ও আডমিরাল ওয়াটসনকে যথারীতি খেলাৎ আদি দিয়া কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলেন। স্থির হইল মেঃ ওয়াট্‌স নবাবের মুরসিদাবাদস্থ দরবারে বৃটিশ রেসিডেণ্ট স্বরূপ থাকিবেন। তিনিও নবাবের সঙ্গে চলিলেন।

সিরাজ স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যে গৌরব-রবি তাঁহার জীবনকে উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহা অস্তমিত হইতে আরম্ভ হইল। সিরাজ বুঝিলেন—যে অদূরে সর্ব্বনাশ তাঁহার নিমিত্ত বদন ব্যাদন করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন যে, ভবিষ্যতের তামসী দ্বার তাঁহার নিমিত্ত উন্মুক্ত হইয়াছে। ভূত দুষ্কৃতি সকলের ছবি অধুনা তাঁহার নেত্র সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই সকল কার্য্যের নিমিত্ত অধুনা তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। ইংরাজগণ তাঁহার দুর্দ্দমনীয় শত্রু। তাহারা তাঁহার রাজ্য মধ্যে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাকে ক্রীড়া পুত্তলীবৎ

১। এই ব্যাপারের অধিকাংশ বৃত্তান্ত Orme হইতে সংগৃহীত।

করিয়া তুলিল। যে সিরাজ কখন কাহারও নিকট সংকুচিত হন নাই, যাঁহার প্রতাপে সমগ্র বঙ্গভূমি বিকম্পিত হইয়াছিল, যাঁহার বাসনা বিধাতৃ বিহিত নিয়ম নিচয়ের ন্যায় সিদ্ধ হইত, যাঁহার অমিত তেজ, অতুল বিক্রম, অসাধারণ গর্ব্ব, কখন কোনই কারণে সংক্ষুব্ধ হয় নাই—সেই সিরাজ অদ্য দূরদেশীয় বিধর্ম্মী বণিক ইংরাজ জাতির ক্রীড়ার সামগ্রী, তাহাদের ইচ্ছার দাস এবং তাহাদের সুখ সন্তোষ সাধনে নিরত হইলেন। মানব অদৃষ্ট নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। সিরাজের আধুনিক পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। এবম্বিধ কঠিন সময়ে তাঁহার অনুজনবর্গ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। দস্ত মহম্মদ খাঁ নামক একজন প্রধান যোদ্ধা গত যুদ্ধ জনিত অঙ্গের ক্ষত সকল আরাম করিবার ছলনায় প্রস্থান করিলেন। মীর জাফর খাঁ এবং রাজা দুর্ল্লভরাম, মোহনলালের উন্নতি হেতু মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও অধুনা রাজকার্য্য স্থগিত করিলেন। জগৎশেঠ নামক মুরসিদাবাদস্থ একজন প্রধান ধনী নবাবের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। এই সকল বিদ্বেষ ভাব উপশম করিতে যেরূপ ধীর বুদ্ধি ও সাহসের প্রয়োজন সিরাজ তাহা হারাইয়াছেন। ইংরাজগণের নিকট পরাভূত হওয়ায় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য বিচ্যুত হইয়াছে। তিনি, জগৎ শূন্য ও সংসার অরণ্যবৎ দেখিতে লাগিলেন। ১

সিরাজ গত ইংরাজ যুদ্ধে চন্দননগরস্থ ফরাশীগণের নিকট হইতে সাহায্য কামনা করেন। ফরাশীগণ উত্তর দেন যে, ইউরোপে ফরাশী ও ইংরাজ জাতির মধ্যে বিরোধ থাকিলেও তাঁহারা সন্ধিবদ্ধ হইয়া বঙ্গভূমে শত্রুতা হইতে নিরত থাকিবেন। ২ ফরাশীগণ তৎকালে তাদৃশ ব্যবহার না করিয়া নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিলে ইংরাজগণের সর্ব্বনাশ হইত। যৎকালে ক্লাইব নবাবের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট হইতে ফরাশীগণকে আক্রমণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নবাব এ প্রস্তাবে সর্ব্বথা অসম্মতি প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এ দিকে ফরাশীগণ আগত প্রায় বিপদের সংবাদ পাইয়া নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। নবাব ইংরাজদিগকে এবম্বিধ উদ্যম হইতে এককালে নিরস্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। ওয়াটস্ ও উমিচাঁদ নবাবের পশ্চাতে চলিলেন। অগ্রদ্বীপে তাঁহারা নবাবের সহিত সম্মিলিত হইলেন। নবাব উমিচাঁদকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান

১। Seir Mutaqherin Vol 1P 758-9.
২ Mill's British India Vol IIIP.124

করিয়া ইংরাজগণের চন্দননগর আক্রমণ চেষ্টার জন্য বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং ইংরাজরা সন্ধি রাখিতে চাহেন কি ভাঙ্গিতে চাহেন, তৎসম্বন্ধে নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। উমিচাঁদ ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, ইংরাজরা জগতে সত্যানুরাগী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা কদাচ সন্ধির অন্যথা করিবে না। নবাব অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্ট হইয়া ফরাশী সাহায্যে যে সৈন্য প্রেরণ করিতেছিলেন তাহাদের নিরস্ত হইতে আজ্ঞা করিলেন। ক্লাইব নবাবকে পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার সম্মতি ব্যতীত তাঁহারা ফরাশীগণের সহিত শত্রুতা করিবেন না। নবাব শান্ত হইয়া মুরসিদাবাদে প্রস্থান করিলেন। ১

ওয়াটস্ ও উমিচাঁদ হতাশ হইলেন না। তাঁহারা নবাবের সম্মতি প্রাপ্তির বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবাব দরবারে ফরাশীগণের পক্ষীয় অনেক লোক ছিল। নবাব প্রায় প্রতিদিন ক্লাইবকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্রতি পত্রেই তিনি চন্দননগর আক্রমণ সম্বন্ধে অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই কারণে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজগণের বাসনা সিদ্ধির কোনই উপায় হইল না। এমন সময় নবাব সংবাদ পাইলেন যে, পাঠানেরা (আবদালী) দিল্লী অধিকার করিয়াছে এবং পূর্ব্ব রাজ্য সমস্ত অধিকার করিবে. মনস্থ করিয়াছে। নবাব ভীত হইয়া ইংরাজগণের সহায় প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদের সৈন্য পোষণের ব্যয় স্বরূপ মাসিক লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইলেন। ১

ইংরাজগণ অন্য উপায় না দেখিয়া অগত্যা ফরাশীদিগের সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। সন্ধির সমস্ত স্থির হইয়া গেল। চন্দননগরস্থ ফরাশীগণ পণ্ডিচেরীর অধীন। সুতরাং তাঁহারা যে সন্ধি করিবেন, তাহার সহিত পণ্ডিচেরীর বাধকতা থাকিতেছে না। অপর পক্ষে ইংরাজরা যে সন্ধি করিতেছেন তাহা পরমুখাপেক্ষী নহে। এই বিভিন্নতা হেতু আডমিরাল ওয়াট্‌সন্ সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ক্লাইব দেখিলেন হয় সন্ধি নচেৎ যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু যুদ্ধ নবাবের সম্মতি ব্যতীত ঘটিতে পারে না। অগত্যা সন্ধি সংস্থাপনার্থ তিনি ব্যগ্র হইলেন। ২ তিনি এই জন্য

১। Orme's Indostan Vol II P. 137-8.

১। Orme's Indostan Vol II P. 138.

২। Mill's British India Vol III P. 125.

"সিলেক্ট কমিটীতে" যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

" The immediate attack of Chandernagore becomes in my opinion absolutely necessary, if the nutrality be refused. Do but reflect, Gentlemen, what will be the opinion of the world of these our late proceedings. Did we not in consequence of a letter received from the Governor and Council of Chandernagore, making offers of a neutrality within the' Ganges, in a manner accede to it, by desiring they would send deputies, and that we would gladly come into such neutrality with them ? and have we not since their arrival, drawn out articles that were satisfactory to both parties ; and agreed that such articles should be reciprocally signed, sealed and sowrn to ? what should the Nabob think, after the promise made him on our side, after his consenting to guarantee this neutality ? He, and all the world will certainly think that we are men without principles, or that we are men of a trifling insignificant disposition. ১

ক্লাইবের এই পত্র খানি তাঁহার সদ্‌বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে; কিন্তু ক্লাইব ও সিরাজ উদ্দৌলায় প্রভেদ অতি সামান্য। যাঁহারা মনোযোগ সহকারে ক্লাইবের জীবনী অধ্যয়ণ করিবেন তাঁহারা বুঝিবেন যে, তিনি অযথা অস্থির, উদ্ধত ও চপল প্রকৃতি ছিলেন। স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ক্লাইব পাপ পুণ্যের বিচার করিতেন না, উদ্দেশ্য লাভের জন্য ন্যায়ান্যায় বিচারে তাঁহার মতি ছিল না। লাভের সম্ভাবনা থাকিলে তিনি না করিতে পারিতেন এমন কাজই নাই। বিশেষ বিবেচনা করিলে ক্লাইবকে সিরাজের অপেক্ষাও জঘন্য স্বভাবান্বিত বলিয়া বোধ হয়। রাজনীতি শাস্ত্রে তাঁহার বিন্দু মাত্রও দৃষ্টি ছিল না। তিনি যৎপরোনাস্তি গোঁয়ার ছিলেন। গোঁয়ারতুমি করিয়া ক্লাইব ইংরাজদের কার্য্য শেষ করিয়া গিয়াছেন। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, যে কার্য্য উদ্ধার করিতে সক্ষম, সেই বড় লোক। ইংরাজদের এই যুক্তি। এই জন্যই অদ্য ক্লাইবেবের এত জয়জয়কার। এই জন্যই অদ্য ক্লাইব ইংরাজ সমাজে পরম পুজনীয়। আমরা ক্লাইবের চারিত্রগত সমস্ত ব্যাপার ক্রমশ বিশদ করিয়া পাঠক মহাশয়দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১। Unpublished Records of the Indian Government, by the Rev. J Long. Vol I. P. 88.

যখন কমিটীতে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের নিমিত্ত বাগবিতণ্ডা চলিতেছে, তখন সংবাদ আসিল যে, বম্বে ও মান্দ্রাজ হইতে সৈন্য সমেত রণতরি আসিয়া পৌছিয়াছে। আর ক্লাইবের ধৈর্য্য থাকিল না। তিনি দেখিলেন এসৈন্য সহায়ে অনায়াসে চন্দননগর জয় করা যাইবে। তবে আর কেন? চন্দননগর আক্রমণ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন, আর সন্ধির কথা মনে রহিল না। আর সে জন্য অনুরোধ করিবার প্রয়োজন থাকিল না। পাঠক দেখিবেন ক্লাইবের প্রকৃতি কিরূপ অস্থির। ফরাশী দূত সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করাইবার নিমিত্ত ক্লাইবের নিকট আসিয়াছিল! ক্লাইব তৎক্ষণাৎ দূতগণকে বিদায় করিয়া দিলেন। সন্ধি পত্র লিখিত হইয়াছিল, সংক্ষেপতঃ সন্ধি বন্ধন একরূপ শেষ হইয়াছিল। বীর, অমিততেজা, সত্যানুরাগী, ন্যায়পরায়ণ ক্লাইব সে সকল কিছু মনে না করিয়া ফরাশীদূতগণকে বিদায় করিয়া দিলেন। ১ তৎক্ষণাৎ তিনি নবাবকে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে, পাঠানদিগের আক্রমণ যথার্থ হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের সাহায্য করিবেন, অধুনা তিনি চন্দননগর আক্রমণে চলিলেন। নবাব পঠান দিগের আক্রমণ ভয়ে, স্বজন বিদ্রোহে, এবং ইংরাজ অত্যাচারে হৃদয় হীন হইয়াছিলেন। তিনি আশু ক্লাইবকে কিছুই জানাইলেন না। ক্লাইব সেই মৌন সম্মতিসূচক ভাবিয়া লইয়া যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। ওয়াট্সন্ নবাবের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ যাত্রায় অস্বীকৃত হইলেন। তিনি সম্মতি প্রাপ্তির নিমিত্ত নবাবকে নানাবিধ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র সমস্তে ইংরাজ চরিত্রের রীতি নীতির স্বাক্ষী দিতেছে। এক খানি পত্র এই—

" * * * But have we not sowrn reciprocally that the friends and enemies of the one should be regarded as such by the other? and will not God, the avenger of perjury punish us if we do not fulfil our oaths?" ১

ওয়াট্সনের এ পত্র মোয়া দিয়া বালককে ভুলাইবার চেষ্টা। তিনি যে

১। Colnel Clive therefore immediately dismissed the French deputies, who were then with him, waiting to sign the treaty, which was even written out fair, and which they supposed had been entirely concluded: *Orme's History of the Military transactions of the British Nation in Indostan.* Vol. II P. 139

১। Memoirs of Clive, Vol. I. Chap. IV.

কারণ দেখাইয়া সিরাজের সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সিরাজও অবিকল সেই কারণে তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতে পারিতেন। কৌশলে কার্য্য হইল না দেখিয়া ওয়াট্‌সন্‌ ভয়প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সেই নিরতিশয় নীতিবিগর্হিত লিপি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"I now acquaint you that the remainder of the troops, which should have been here long ago, and which I hear the Colnel expeted, will be at calcutta in a few days; that in a few days more I shall despatch a vessel for more ships and more troops; and that I will kindle such a flame in your country as all the waters in the Ganges shall not be able to extinguish. Remember that he who promises you this never yet broke his word with you or with any man whatsoever." ১

নবাব সিরাজ উদ্দৌলা ওয়াট্‌সনের এবম্বিধ রূঢ় পত্রের যে উত্তর প্রদান করেন তাহা তাঁহার তদানীন্তন অবস্থার সম্যক পরিচায়ক। তাহা নীতিজ্ঞান, ধীরতা, সহৃদয়তা ও বুদ্ধিমত্তায় পূর্ণ।

"If it be true that one Frenchman does not approve and abide by a treaty enterred into by another, no confidence is to be placed in them. The reason of my forbidding war in my country is, that I look on the French as my own subjects, because they have in this affair implored my protection; for which reason I wrote to you to make peace with them, or else I had neither pleaded for them nor protected them. But you are generous and wise men, and will know if any enemy comes to you with a clean heart to implore your mercy, his life should be granted him, that is if you think him pure of heart; but if you mistrust his sincerity, act according to the time and ocassion. ১

ইংরাজগণ এই পত্র সম্মতিসূচক মনে করিয়া লইলেন। আর অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। আক্রমণ সময়েও নবাব

১। Umpublished Rrecords of India Government by Rev. J. Long. Vol. I O. P 1--III.

১। Thornton's History of the British Empire in Sindia Vol I. P. 219-220.

বারম্বার পত্র ও লোক দ্বারা তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তখন আর সে কথা কে শুনে? চন্দননগর আক্রান্ত, বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বংসিত হইল। ১

অধুনা এই ব্যাপারের ন্যায়ান্যায় বিচারের সময়। এই ঘটনার মূল হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই দোষাবহ। ইংরাজগণ যে এব্যাপারে নিতান্ত যথেচ্ছাচার ও ন্যায়হীনতা প্রকাশ করিয়াছেন, কে তাহা অস্বীকার করিবে? আমরা একে একে সেই সমস্ত প্রকাশ করিতেছি।

১ম। ইংরাজগণ নবাবের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর মিত্রতা ভিন্ন শক্রতা থাকা উচিত নহে। সন্ধির উদ্দেশ্য তাহাই বটে। ফরাশীগণ নবাবের প্রজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রজার জীবন, সম্পত্তি প্রভৃতি সংরক্ষণ ভার নবাবের। নবাবের শেষ পত্রে সে কথা বিশদরূপে লিখিত আছে। অপরতঃ ফরাশীগণ নবাবের শরণাগত। তাহাদের বিরোধে অস্ত্র ধারণ করিলে নবাবকে যার পর নাই অপমানিত করা হয়, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? আর এরূপ কার্য্য দ্বারা সন্ধির অন্যথা সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতা সাধিত হয় তাহাই বা কে না বলিবে? মহাত্মা তরেন্স এ ঘটনাকে পরিস্ফুটরূপে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২য়। ফরাশীদিগের অপরাধ কি? তাহারা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিল—তবে তোমরা তাহাদের বিরোধে লাগ কেন? এ সম্বন্ধে ক্লাইবের ব্যবহার হাস্যজনক। তিনি পূর্ব্বাবধি সন্ধির নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু যেমন সৈন্য সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হইল, আর ক্লাইব সে ক্লাইব নহেন। আর তাঁহার সে মত থাকিল না। কমিটীর আর কোন মেম্বরই অমত করিলেন না। এতদিন ন্যায়ান্যায় বিচার হইতেছিল। এখন সকলে সে বিচার ভুলিয়া গেলেন। ক্লাইব "সিলেক্ট কমিটীতে" যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা যথা স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। সে পত্রখানি কৌতুকাবহ। ওয়াট্‌সন্‌কে সন্ধি করিতে অনুরোধ করুন। তাহাতে অমত হইলে যুদ্ধ করিতে বলুন। ক্লাইবের পত্রের সার এই। একথা যে কত অযৌক্তিক তাহা বলা যায় না।

"as the Admiral would not consent to an armed neutrality with our French neighbours in the East, the next best thing to

১। Orme's Indostan Vol II P. 140-5.

do was to fall upon them suddenly and smite them hip and thigh." ১ ক্লাইবের যুক্তি এববিধ অন্যায়।

৩য়। নবাবের সম্মতি লইবার জন্য অভদ্রতার একশেষ। সম্মতি লইয়া কার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা জগতকে জানাইতেছেন যে, আমরা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলাম। ফলতঃ তাহাতে তাঁহাদের অভদ্রতা ভিন্ন কিছুই প্রকাশ হয় নাই। ঘোর অমানিশায় নির্জ্জন পথে লগুড় হস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিঃসহায় পান্থকে ভীতি প্রদর্শন করাইয়া তাহার সম্পত্তি যাচ্ঞা করিলে সে অবশ্যই প্রাণ-ভয়ে সম্পত্তির মায়া বিসর্জ্জন দেয়। তাই বলিয়া তাহাকে দান বলা যায় না। ইংরাজদের ব্যবহার তদ্রূপ। বিপদাপন্ন, স্বজনচ্যুত, বিদ্রোহভীত, উৎপীড়িত বালক সিরাজকে তাঁহারা যার পর নাই ভয় দেখাইতে লাগিলেন। সিরাজের তখন অধঃপতনের সময় উপস্থিত। তিনি তখন শান্তির ভিখারী। তাঁহার হৃদয় তখন ভয়ে আপ্লুত। তাঁহার অবস্থা শোচনীয়। তিনি সভয়ে, সবিনয়ে, কাতরতা সহকারে ইংরাজদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। হায়! সেই সিরাজ যাহার উন্নত চিত্ত কদাচ কাহার অধীনতা স্বীকার করে নাই—সেই মহা তেজস্বী নবাব সিরাজউদ্দৌলা—অদ্য ইংরাজ বণিকগণের ভয়ে অবসন্ন, তাঁহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত, তাঁহাদের অস্থিরতায় কাতর, তাঁহাদের মনোস্তোষণে বিব্রত। ইংরাজরা তাহাকেই সিরাজের সম্মতি মনে করিলেন। তাঁহাদের বুদ্ধি প্রশংসনীয়।

এইরূপে ইংরাজগণ নবাবকে অপমানিত করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিলেন। ক্লাইবের জীবনের ভারতীয় অংশ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ধূর্ত্ততা, শঠতা, ও চাতুর্য্যে পূর্ণ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কার্য্য সিদ্ধ করিতে ক্লাইব কদাচ ন্যায়ান্যায় লক্ষ্য করিতেন না। সন্ধি থাকিলে কি হয়, চন্দন নগর অধিকার করা আবশ্যক। নবাব সম্মতি না দেন উলঙ্গ অসি হস্তে তাঁহার শয্যা পার্শ্বে দণ্ডায়মান হও। তিনি অবশ্য সম্মতি দিবেন। ক্লাইবের চরিতাখ্যায়ক, ১ কুত্রাপি তাঁহার দোষ দেখিতে পান নাই। মেকলে তাঁহার দোষ দেখিয়াছেন বটে কিন্তু সে সমস্ত দোষকেই তিনি যুক্তি যুক্ত মনে করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন—

"The Nabob behaved with all

১। Torrens Empire in Asia P. 32.

১। Major General Sir J. Malcolm K. C. B.

the faithlessness of an Indian statesman." ১•

ধন্য লর্ড মেকলের স্বদেশানুরাগ! আমরা উপস্থিত ব্যাপার বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, পাঠকগণ দেখিবেন কে বিশ্বাসঘাতী।

নবাব এবম্বিধ ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি উত্যক্ত হইলেন। কিন্তু তখনই সংবাদ পাইলেন যে, পাঠানগণ বেহার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং তখন আর সে রাগ প্রকাশ না করিয়া ক্লাইবও ওয়াট সন্‌কে সন্তোষজনক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ২ ফরাসীগণ স্থানভ্রষ্ট ও আশ্রয়হীন হইয়া নবাবের শরণাপন্ন হইল। নবাব শরণাগত পালন কর্ত্তব্য বোধে বিজিত ফরাশীগণকে কাশিমবাজারে আশ্রয় দিলেন। ইংরাজগণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া নবাবকে ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। নবাব অগত্যা তাহাদের সাহার্য্যার্থ অর্থ অস্ত্র ও সুরঞ্জাম দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ৩ চন্দননগর সম্বন্ধে ফরাসীগণের সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল ইংরাজদিগের সহিত তদ্রূপ করিয়া দিলেন।

নবাবকে ফরাসীদিগকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করায় নবাব যে আপত্তি করেন, কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক সে আপত্তি কিছুই কাজের কথা নহে মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে নবাবের আপত্তি সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া উপলব্ধ হইবে।

চন্দননগরস্থ ফরাসীদিগের নায়ক মুসেঁ। লা যে কয়দিন নবাবের আশ্রয়ে ছিলেন, সেই সময়ে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্বজনবিদ্রোহে নবাবের অধঃপতন হইবে। তিনি নবাবকে গমন কালে সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিলেন। প্রস্থান সময়ে নবাব যখন তাঁহাকে বলেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিবেন। মুসেঁ। লা তদুত্তরে বলেন,—

"Send for me again?" answered Lass (Law) "Rest assured, my Lord Nabab," added he, "that this is the last time we shall see each other: remember my words: we shall never meet again: it is nearly impossible." ১

১•। Macaulay's Essay On Lord Clive.

২। Orme's Indostan Vol II P. 144.

৩। Mill's British India Vol III P. 128.

১। Seir Mutaqherin Vol I P. 769

এই বৈদেশিক রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত নবাবের রাজকীয় অবস্থা সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নবাবের অসন্তুষ্ট কর্ম্মচারীবর্গ ইংরাজদিগের সহিত যোগ দিয়াছে বা দিবে, মুসেঁা লার এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিবর্ণ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। আমরা অতঃপর তৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ক্রমশঃ।

অষ্টম স্বর্গ।

বন-ফুল কাব্য।

আজিও পড়িছে ওই সেই সে নির্ঝর!
হিমাদ্রির বুকে বুকে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটে সুখে,
সরসীর বুকে পড়ে ঝর ঝর ঝর।
আজিও সে শৈলবালা, বিস্তারিয়া ঊর্ম্মি-
মালা,
চলিছে কত কি কহি আপনার মনে!
তুষার শীতলবায়, পুষ্প চুমি চুমি যায়,
খেলা করে মনো সুখে তটিনীর সনে।
কুটীর তটিনী তীরে, লতারে ধরিয়া শিরে
সুখ ছায়া দেখিতেছে সলিল দর্পণে!
হরিণেরা তরু ছায়ে, খেলিতেছে গায়ে
গায়ে,
চমকি হেরিছে দিক পাদপ কম্পনে।
বনের পাদপ পত্র, আজিও মানব নেত্র,
হিংসার অনলময় করেনি লোকন!
কুসুম লইয়া লতা, প্রণত করিয়া মাথা,
মানবেরে উপহার দেয়নি কখন!
বনের হরিণগণে, মানবের শরাসনে
ছুটে ছুটে ভ্রমে নাই তরাসে তরাসে!
কানন ঘুমায় সুখে, নীরব শান্তির বুকে
কলঙ্কিত নাহি হোয়ে মানব নিশ্বাসে।
কমলা বসিয়া আছে উদাসিনী বেশে!
শৈলতটিনীর তীরে এলো থেলো কেশে!
অধরে সঁপিয়া কর, অশ্রু বিন্দু ঝর ঝর
ঝরিছে কপোলদেশে মুছিছে আঁচলে।
সম্বোধিয়া তটিনীরে ধীরে ধীরে বলে
"তটিনী বহিয়া যাও আপনার মনে!
কিন্তু সেই ছেলে বেলা, যেমন করিতে
খেলা
তেমনি করিয়ে খেলো নির্ঝরের সনে!
তখন যেমন স্বরে, কল কল গান করে
মৃদু বেগে তীরে আসি পড়িতে লো ঝাঁপি।
বালিকা ক্রীড়ার ছলে, পাথর ফেলিয়া
জলে,
মারিতাম, জলরাশি উঠিত লো কাঁপি!
তেমনি খেলিয়ে চল, তুই লো তটিনী জল!
তেমনি বিতরি সুখ নয়নে আমার।
নির্ঝর তেমনি কোরে, ঝাঁপিয়া সরসী পরে
পড়্ লো উগরি শুভ্র রাশি ফেন ভার!
মুছিতে লো অশ্রু বারি এয়েছি হেথায়।
তাই বলি পাপীয়ারে! গান কর্ সুধাধারে
নিভাইয়া হৃদয়ের অনল শিখায়!
ছেলে বেলাকার মত, বায়ু তুই অবিরত
লতার কুসুম রাশি কর্ লো কম্পিত!

নদী চল ছুলে ছুলে! পুষ্প দে হৃদয়
খুলে!
নির্ঝর সরসী বক্ষ কর্ বিচলিত!
সে দিন আসিবে আর, হৃদি মাঝে যাতনার
রেখা নাই, প্রমোদেই পূরিত অন্তর।
ছুটা ছুটি করি বনে, বেড়াইব যুল্লমনে,
প্রভাতে অরুণোদয়ে উঠিব শিখর!
মালা গাথি ফুলে ফুলে, জড়াইব এলোচুলে
জড়ায়ে ধরিব গিয়ে হরিণের গলে!
বড় বড় দুটি আঁখি, মোর মুখ পানে রাখি
এক দৃষ্টে চেয়ে রবে হরিণ বিহ্বল!
সেদিন গিয়েছে হারে--বেড়াই নদীর ধারে
ছায়া কুঞ্জে শুনি গিয়ে শুকেদের গান!
না-থাক, হেথায় বসি, কি হবে কাননে
পশি,
শুক আর গাবে না কো জুড়ায়ে পরাণ!
সেও যেন ধরিয়াছে বিষাদের তান!
জুড়ায়ে হৃদয় ব্যথা, দুলিবে না পুষ্পলতা
তেমন জীবন্ত ভাবে বহিবে না বায়!
প্রাণ হীণ যেন সবি--যেন রে নীরব ছবি
প্রাণ হারাইয়া যেন নদী বহে যায়!
তবুও যাহাতে হোক্, নিভাতে হইবে শোক
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল!
তবুও ত আপনারে, ভুলিতে হইবে হারে!
তবুও নিভাতে হবে হৃদয় অনল!
যাই তবে বনে বনে, ভ্রমিগে আপন মনে,
যাই তবে গাছে গাছে ঢালি দিই জল!
শুক পাখীদের গান, শুনিয়া জুড়াই প্রাণ
সরসী হইতে তবে তুলি গে কমল!
হৃদয় নাচে না ত গো তেমন উল্লাসে!
ভ্রমিত ভ্রমিই বনে, ম্রিয়মান শূন্য মনে,
দেখিতে দেখিই বোসে সলিল উচ্ছ্বাসে!

তেমন জীবন্ত ভাব নাই ত অন্তরে--
দেখিয়া লতার কোলে, ফুটন্ত কুসুম দোলে,
কুঁড়ি লুকাইয়া আছে পাতার ভিতরে—
নির্ঝরের ঝরঝরে--হৃদয়ে তেমন কোরে
উল্লাসে শোণিত রাশি উঠে না নাচিয়া!
কি জানি কি করিতেছি, কি জানি কি
ভাবিতেছি,
কি জানি কেমন ধারা শূন্য প্রায় হিয়া!
তবুও যাহাতে হোক্, নিভাতে হইবে
শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল।
তবুও ত আপনারে, তুলিতে হইবে হারে,
তবুও নিভাতে হবে হৃদয় অনল!
কাননে পশিগে তবে, শুক যেথা সুধা রবে
গান করে জাগাইয়া নীরব কানন।
উঁচু করি করি মাথা, হরিণেরা বৃক্ষ পাতা
সুধীরে নিঃশঙ্ক মনে করিছে চর্ব্বণ!
সুন্দরী এতেক বলি, পশিল কানন স্থলী
পাদপ রৌদ্রের তাপ করিছে বারণ।
বৃক্ষ ছায়ে তলে তলে, ধীরে ধীরে নদী
চলে,
সলিলে বৃক্ষের মূল করি প্রক্ষালন।
হরিণ নিঃশঙ্ক মনে, শুয়ে ছিল ছায়া বনে
পদ শব্দ পেয়ে তারা চমকিয়া উঠে।
বিস্তারি নয়ন দ্বয়, মুখ পানে চাহি রয়
সহসা সভয় প্রাণে বনান্তরে ছুটে।
ছুটিছে হরিণ চয়, কমলা অবাক রয়
নেত্র হতে ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রু জল।
ওই যায়--ওই যায়--হরিণ হরিণী হয়—
ওই যায় ছুটে ছুটে মিলি দলে দল।
কমলা বিষাদ ভরে কহিল সমুচ্চস্বরে—
প্রতিধ্বনি বন হোতে ছুটে বনান্তরে।

"যাস্‌নে—যাস্‌নে তোরা আয় ফিরে আয়
কমলা--কমলা সেই ডাকিতেছে তোকে!
সেই যে কমলা সেই থাকিত কুটীরে
সেই যে কমলা সেই বেড়াইত বনে!
সেই যে কমলা পাতা ছিঁড়ি ধীরে ধীরে
হরষে তুলিয়া দিত তোদের আননে!
কোথা যাস্—কোথা যাস্—আয় ফিরে
আয়!
ডাকিছে তোদের আজি সেই সে কমলা!
কারে ভয় করি তোরা যাস্‌রে কোথায়?
আয় হেথা দীর্ঘশৃঙ্গ! আয় লো চপলা!
এলিনে--এলিনে তোরা এখনো এলিনে—
কমলা ডাকিছে যেরে তবুও এলিনে!
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি কমলারে?
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি বালিকারে?
খুলিয়া ফেলিনু এই কবরী বন্ধন,
এখনও ফিরিবি না হরিণের দল?
এই দেখ্—এই দেখ্—ফেলিয়া বসন
পরিনু সে পুরাতন গাছের বাকল!
যাক্ তবে, যাক্ চ'লে—যে যার যেথানে—
শুক পাখী উড়ে যাক্ সুদূর বিমানে!
আয়—আয়—আয় তুই আয় রে মরণ!
বিনাশ শক্তিতে তোর নিভা এ যন্ত্রণা
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িব বন্ধন!
বহিতে অনল হৃদে আর ত পারি না!
নীরদ স্বরগে আছে, আছেন জনক
স্নেহময়ী মাতা মোর কোলে রাখি পাতি—
সেথায় মিলিব গিয়া, সেথায় যাইব—
ভোর করি জীবনের বিষাদের রাতি!
নীরদে আমাতে চড়ি প্রদোষ তারায়
অস্তগামী তপনেরে করিব বীক্ষণ;
মন্দাকিনী তীরে বসি দেখিব ধরায়
এত কাল যার কোলে কাটিল জীবন।
শুকতারা প্রকাশিবে উঁহার কপোলে
তখন রাখিয়া মাথা নীরদের কোলে—
অশ্রু জল সিক্ত হয়ে কব সেই কথা
পৃথিবী ছাড়িয়া এনু পেয়ে কোন্ ব্যথা!
নীরদের আঁখি হোতে ব'বে অশ্রু জল!
মুছিব হরষে আমি তুলিয়া আঁচল!
আয়—আয়—আয় তুই, আয় রে মরণ!
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িব বন্ধন!"
এত বলি ধীরে ধীরে উঠিল শিখর!
দেখে বালা নেত্র তুলে—
চারিদিক গেছে খুলে
উপত্যকা, বনভূমি, বিপিন, ভূধর!
তটিনীর শুভ্র রেখা—
নেত্র পথে দিল দেখা—
বৃক্ষ ছায়া দুলাইয়া ব'হে ব'হে যায়!
ছোট ছোট গাছপালা—
সঙ্কীর্ণ নির্ঝর মালা
সবিংযেন দেখা যায় রেখা রেখা প্রায়।
গেছে খুলে দিগ্বিদিক—
নাহি পাওয়া যায় ঠিক—
কোথা কুঞ্জ—কোথা বন—কোথায় কুটীর!
শ্যামল মেঘের মত—
হেথা হোথা কত শত
দেখায় ঝোপের প্রায় কানন গভীর!
তুষার রাশির মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী!
মাথায় জলদ ঠেকে,
চরণে চাহিয়া দেখে
গাছপালা ঝোপে ঝাপে ভূধর আবরি!
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা রেখা
হেথা হোথা যায় দেখা
কে কোথা পড়িয়া আছে কে দেখে কোথায়!

বন, গিরি, লতা, পাতা আঁধারে মিশায়!
অসংখ্য শিখর মালা ব্যাপি চারি ধার
মধ্যের শিখর পরে—
(মাথায় আকাশ ধরে)
কমলা দাঁড়ায়ে আছে চৌদিকে তুষার!
চৌদিকে শিখর মালা—
মাঝেতে কমলা বালা—
একেলা দাঁড়ায়ে মেলি নয়ন যুগল!
এলোথেলো কেশপাশ—
এলোথেলো বেশ বাস
তুষারে লুটায়ে পড়ে বসন আঁচল!
যেন কোন্ সুর-বালা—
দেখিতে মর্ত্ত্যের খেলা
স্বর্গ হোতে নামি আসি হিমাদ্রি শিখরে
চড়িয়া নীরদ রথে—
সমুচ্চ শিখর হোতে
দেখিলেন পৃথ্বীতল বিস্মিত অন্তরে!
তুষার রাশির মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী!
হিমময় বায়ু ছুটে,
অন্তরে অন্তরে ফুটে
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধপ্রায় করি!
শীতল তুষার দল—
কোমল চরণতল
দিয়াছে অসাড় ক'রে পাষাণের মত!
কমলা দাঁড়ায়ে আছে যেন জ্ঞান হত!
কোথা স্বর্গ—কোথা মর্ত্ত্য—আকাশ পাতাল।
কমলা কি দেখিতেছে!
কমলা কি ভাবিতেছে!
কমলার হৃদয়েতে ঘোর গোলমাল!
চন্দ্র সূর্য্য নাই কিছু—
শূণ্যময় আগু পিছু!
নাই রে কিছুই যেন ভূধর কানন!

নাই'ক শরীর দেহ—
জগতে নাই'ক কেহ—
একেলা রয়েছে যেন কমলার মন!
কে আছে—কে আছে—আজি কর গো
স্মরণ!
বালিকা ত্যজিতে প্রাণ করেছে মনন!
বারণ কর গো তুমি গিরি হিমালয়!
শুনেছ কি বনদেবী—করণা আলয়—
বালিকা তোমার কোলে করিত ক্রন্দন—
সে নাকি মরিতে আজ করেছে মনন?
বনের কুসুম কলি—
তপন তাপনে জ্বলি
শুকায়ে মরিবে নাকি ক'রেছে মনন!
শীতল শিশির ধারে—
জীয়াও জীয়াও তারে
বিশুষ্ক হৃদয় মাঝে বিতরি জীবন!
উদিল প্রদোষ তারা সাঁঝের আঁচলে—
এখনি মুদিবে আঁখি?
বারণ করিবে না কি?
এখনি নীরদ কোলে মিশাবে কি বোলে?
অনন্ত তুষার মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী!
মোহ স্বপ্ন গেছে ছুটে—
হেরিল চমকি উঠে—
চৌদিকে তুষার রাশি শিখর আবরি!
উচ্চ হোতে উচ্চ গিরি—
জলদে মস্তক ঘিরি
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন!
বন-বালা থাকি থাকি—
সহসা মুদিল আঁখি—
কাঁপিয়া উঠিল দেহ! কাঁপি উঠে মন!
অনন্ত আকাশ মাঝে একেলা কমলা!
অনন্ত তুষার মাঝে একেলা কমলা!

সমুচ্চ শিখর পরে একেলা কমলা!
আকাশে শিখর উঠে—
চরণে পৃথিবী লুঠে—
একেলা শিখরপরে বালিকা কমলা!
ওই—ওই—ধর্—ধর্—পড়িল বালিকা
ধবল তুষারচ্যুতা পড়িল বিহ্বল!—
খসিল পাদপ হোতে কুসুম কলিকা!
খসিল আকাশ হোতে তারকা উজ্জ্বল!
প্রশান্ত তটিনী চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
ধরিল বুকের পরে কমলা বালায়!
উচ্ছ্বাসে সফেন জল উঠিল নাচিয়া!
কমলার দেহ ওই ভেসে ভেসে যায়!
কমলার দেহ বহে সলিল উচ্ছ্বাস!
কমলার জীবনের হোলো অবসান!
ফুরাইল কমলার দুখের নিঃশ্বাস
জুড়াইল কমলার তাপিত পরাণ!
কল্পনা! বিষাদে দুখে গাইনু সে গান!
কমলার জীবনের হোলো অবসান!
দীপালোক নিভাইল প্রচণ্ড পবন!
কমলার—প্রতিমার হ'ল বিসর্জ্জন!

অভিজ্ঞান শকুন্তল উপলক্ষে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্ব্বশীর উল্লেখ।

বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবত প্রভৃতিতে পুরূরবার উপাখ্যান প্রায় পরস্পর সমরূপ; যাহা কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহা অতি সামান্য। কালিদাস প্রত্যেক পুরাণগত পুরূরবার উপাখ্যানের সামঞ্জস্য রাখিয়া, পুরাণগত দোষভাগ পরিহারপূর্ব্বক বিক্রমোর্ব্বশীকে যার পর নাই মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণাদির উপাখ্যানে যে সময় মিত্রাবরুণের শাপে উর্ব্বশীকে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া বাস করিতে হয়, (১) সে সময় দেবসহবাস দুর্ল্লভ জানিয়া উর্ব্বশী মনোমত পুরুষ কামনায় ধরাধামের অতুল্য অধীশ্বর পুরূরবার গুণশ্রবণে তাঁহাকেই তত্তৎবৃত্তি চরিতার্থের একমাত্র অবলম্বন স্থির করিয়া দেখিবার নিমিত্ত পুরূরবার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং পুরূরবাকে দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতিই আসক্তচিত্তা হন। রাজাও উর্ব্বশী দর্শনে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে

(১) একদিন উর্ব্বশীকে পথে যাইতে দেখিয়া প্রথমে মিত্র পরে বরুণ তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে, উর্ব্বশী উভয়কে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যান। মিত্র ও বরুণ উর্ব্বশীর এইরূপ গর্ব্বভাব দর্শনে তাঁহাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক বলেন, পাপীয়সি! যেমন তুই আমাদিগকে অবমাননা করিলি, তেমনি তোকে মর্ত্ত্যলোকে গিয়া বাস করিতে হইবে। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ২২ অ।

কামনা করেন। উর্ব্বশী স্বীকৃতা হইলেন, কিন্তু স্বর্গ গমনের সুবিধার জন্য (২) রাজাকে দুইটী নিয়মে বদ্ধ করিলেন।

ঐ নিয়মদ্বয়ে রাজাকে বদ্ধ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, রাজা যেরূপ ক্ষমবান, তাহাতে দেব গন্ধর্ব্ব ভিন্ন কোন মানবই তাঁহার অন্তঃপুর হইতে ঐ মেষদ্বয় লইয়া যাইতে পারিবে না। অতএব যখন দেবতা কি গন্ধর্ব্বগণ আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমার শাপ মোচনের চেষ্টা করিবেন, তখন তাঁহারই প্রভাব দ্বারা আমার নিয়ম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা অপহরণের চেষ্টা করিবেন। তাহাতেও অন্য একটী অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভব; কারণ রাজা দৈত্যযুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়, কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা যদি ঐ মেষ অপহৃত হয়, তাহা হইলে রাজার সহিত দেবতাদিগের বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে তাহা না ঘটে, এই জন্য "আপনাকে উলঙ্গ দর্শন করিলে থাকিব না।" এই দ্বিতীয় নিয়ম করিলেন। কারণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মটী অন্যের আয়ত্ত, দ্বিতীয়টী রাজারই আয়ত্ত। ঘৃত তৈজস পদার্থ, তদ্ভক্ষণে পার্থিবভাব সঞ্জাত হইতে পারিবে না; এই জন্যই কেবলমাত্র ঘৃতাহারেই অভিরুচি। দেবতারা ইঙ্গিত করিলেই ত উর্ব্বশী যাইতে পারিতেন, তবে নিয়ম সংস্থাপনের কারণ কি? আর কিছুই নহে, উর্ব্বশী জাতীয় ভাবে (বেশ্যার ভাব) বিশেষ পরিপক্ক থাকিয়াও পুরূরবার রূপদর্শনে এত দূর বিমোহিত হইয়াছিলেন, যে পাছে রাজার প্রেমে সাতিশয় আসক্ত হইয়া পরে স্বর্গবাসের বাসনা অবধি উন্মূলিত হয়, এই আশঙ্কাতেই স্বর্গপ্রণয়িনী স্বর্গকামিনী ঐ নিয়মে রাজাকে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত ভোগ সুখে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু স্বভাবের মাহাত্ম্য সহজে যাইবার নহে। কিছু দিন পরে উর্ব্বশীর সে সুখের চরিতার্থতা জন্মিল, এ দিকে মেষও অপহৃত হইল। মেষ অপহৃত হইলে যাহাতে রাজার ক্রোধ উদ্রিক্ত হয়, এই ভাবে উর্ব্বশী নানা প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। (৩) রাজা উলঙ্গ ছিলেন উঠিলেন। গন্ধর্ব্ব-

(২) হরিবংশে এইরূপ আভাসই লিখিত হইয়াছে।

(৩) ভাগবতে রাজার সহবাস পরিহার পূর্ব্বক প্রস্থান করিবার অভিলাষে বলিতে লাগিলেন।

"হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা। যদ্বিশ্রম্ভাদহং নষ্টা হৃতা চ পত্যা

মায়ায় বিদ্যুত দৃষ্ট হইল; উলঙ্গ রাজা উর্ব্বশী চক্ষে পড়িবামাত্র প্রেমেরও বন্ধন ছিন্ন হইল; উর্ব্বশী পলায়ন করিলেন। রাজা উন্মত্ত হইলেন, অথচ প্রণয়িনীর প্রণয়ের এমনি মাহাত্ম্য যে উর্ব্বশী একবার রাজার সহিত সাক্ষাতও করিলেন না। বাতুলবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি বা রাজা তাঁহাকে কুরুক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন "জায়ে যাইও না, কঠিন হৃদয়ে! দাঁড়াও, আআমার সহিত কথা কও।" তথাপি সে হৃদয় সঙ্কুচিত হইল না, কঠিনা কঠিন হৃদয়ে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! অবিবেচকের ন্যায় ঈদৃশ চেষ্টা করিবেন না (৪) আমি গর্ব্ভিণী, একবৎসর পরে এখানে আসিবেন, বরং আমি একরাত্রি আপনার সহিত

দস্যুভিঃ॥ যঃ শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্॥

ভাগবত নবমস্কন্দ ১৪ অ০

এই নপুংসক অকর্ম্মণ্য স্বামীর হস্তে পড়িয়া আমি মরিলাম, ইঁনি আপনাকেই আপনি বীর মনে করেন, ঐ দেখ নারীর ন্যায় ভয়ে আকুল হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, দস্যুরা আমার পুত্র হরণ করিল, তথাপি উঠিলেন না, ইনিই দিবসে পুরুষের বেশ পরিধান করিবেন। হায়! ইহাঁতে বিশ্বাস করিয়াই অভাগিনী প্রাণে মরিল। এইরূপ বর্ণিত আছে।

(৪) ভাগবতে রাজা উর্ব্বশীকে পাইয়া যখন বলিলেন, প্রিয়ে! তোমা বিহনে আমার জীবনে কাজ নাই, এই বৃকগণ আমাকে ভক্ষণ করুক। তখন উর্ব্বশী বলিলেন, মহারাজ!

মা মৃথাঃ পুরুষোসি ত্বং মাস্ম ত্বাদ্যুর্ কাইমে। ক্কাপিসখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং যথা॥ স্ত্রিয়োহ্যকরুণাঃ ক্রূরা দুর্ম্মর্ষা প্রিয়সাহসাঃ। ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিশ্রব্ধং পত্নিং ভ্রাতরমপ্যুত॥ ২৬॥

বিধায়ালীকবিশ্রম্ভমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহৃদাঃ। নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চলস্বৈরবৃত্তয়ঃ॥২৭॥

ভাগবত নবমস্কন্ধ ১৪ অ০

আপনি মরিবেন না, আপনি পুরুষ, কেন বৃকগণ আপনাকে ভক্ষণ করিবে। আপনি স্ত্রী জাতির প্রণয়ের কথা কোথায় শুনিয়াছেন? এই বৃকের হৃদয় যেমন নিষ্ঠুর, স্ত্রীজাতিও সেইরূপ; তাহাদের দয়ার লেশ নাই, ক্রূরতারও শেষ নাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে বলিতেছেন, কিন্তু ক্ষমা যাহাকে বলে, স্ত্রীজাতি তাহা জানে না। সাহসপ্রিয় কামিনীগণ তুচ্ছ কারণে প্রণয়ের পতি স্নেহের ভ্রাতাকেও বিনাশ করিতে পারে। উহাদিগের প্রণয় কোথায়? মূর্খেরাই কামিনীকে প্রণয়িনী মনে করিয়া তাহাদিগের মিথ্যা মায়ায় মুগ্ধ হয়। কিন্তু ঐ স্বেচ্ছাচারিণীগণ নূতন পাইলেই মিথ্যা প্রণয় দেখাইয়া তাহার

যাপন করিব।" প্রিয়ার ঐ উক্তি শ্রবণে রাজা গৃহে আসিলেন, প্রণয়িণীর প্রণয়ও সাঙ্গ হইল।

পুরাতন মুনি নারায়ণ তপোবনে এরূপ শত সহস্র উর্ব্বশীকে সৃজন করিতে পারেন, কিন্তু,—

অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূ-
চ্চন্দ্রোনু কান্তিপ্রদঃ
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো
মাসো নু পুষ্পাকরঃ।
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু
বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং
রূপং পুরাণো মুনিঃ॥

চন্দ্রিকা-নায়ক চন্দ্রমা নিজের কান্তি দ্বারা যে অঙ্গ গঠন করিয়াছেন, কামজীবন কন্দর্পের সমগ্র শক্তি যে অঙ্গের জীবন, এবং ফুলময় বসন্তের সমগ্র সম্পত্তি যে অঙ্গের বিলাস, তাহা কি একজন বেদাভ্যাসে জড়বুদ্ধি ভোগসুখ বিহীন জরাজীর্ণ ঋষির নির্ম্মিত হইবে? কখনই না।

ঋষির উর্ব্বশী সুন্দরী হইতে পারেন, কিন্তু যে সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য রহিল না, সে সৌন্দর্য্য শুষ্ক নয়নেরই প্রীতিপদ, ভাবস্নিগ্ধ প্রেমিক-নয়নে তাহা সৌন্দর্য্য বলিয়াই অনুমিত হইবে না। প্রেমের কান্তিই মানব জীবনের পরম শান্তি, প্রেমের কান্তিই দৈহিক সৌন্দর্য্যের লাবণ্য জ্যোতি; যে হৃদয়ে সে কান্তি বিকাশ পাইল না, সে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি কোথায়? বা সে অঙ্গ দর্শনে এক জন প্রেমিকের মানসী তৃপ্তির সম্ভাবনা কি? কান্তিসর্ব্বস্ব চন্দ্রমার কান্তি যে অঙ্গে বিলাস পাইতেছে, সে হৃদয় প্রেমে পূর্ণ, ভোগেও যে কামের পরিতৃপ্তি হইল না, প্রেমই সেই কামের জীবন, যে ফুলের সৌরভে জগৎ মাতিল, সে ফুল কি মধুহীন হইতে পারে? সেই বিলাসিতাই প্রেমে পূর্ণ, সেই বিলাসই প্রেমের প্রস্রবণ, যাহার আভাসেও প্রেমিকের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। শুষ্ক ঋষির শুষ্ক উর্ব্বশীতে তাহা কোথায়? উর্ব্বশী সুন্দরী, কিন্তু সে হৃদয়ে প্রেমের কান্তি নাই, সে অঙ্গে প্রেমের জ্যোতিও নাই, আহার্য্য শোভাই সে অঙ্গের শোভা, অভ্যস্ত বিলাসই সে হৃদয়ের বিলাসিতা। সে মনের তৃপ্তি কিছুতেই নাই, আকাঙ্ক্ষারও শান্তি নাই। উর্ব্বশী ইন্দ্রসভার নর্ত্তকী, তিনি অন্যের ভাবে নাচিতেছেন, অন্যের ভাবে হাসিতে-

প্রণয়িণী হয়, পুরাতন হইলেই পরিত্যাগ করে। ভাগবতে উর্ব্বশী আপনারই হৃদয়ের চিত্রপট খুলিয়া দেখাইতেছেন। তিনি বেশ্যা, এই জন্য আপনার হৃদয় দেখিয়া তিনি জগতের সৌভাগ্যকে ঐ পাপপদে বিদলিত করিতেছেন।

ছেন এবং অন্যের ভাবেই কটাক্ষ-পাত করিতেছেন, নিজের ভাব কোথায়? স্বভাবে বঞ্চিতা উর্ব্বশী প্রেমের প্রেমিকা নহেন, তিনি ইন্দ্রাদেশেরই প্রেমিকা।

কালিদাস যখন তাঁহাকে স্বভাবের ভাবিকা করিয়াছেন, তখন তিনি সখীদিগকে দেখিতেছেন মনে করিয়া রাজাকেই দেখিতেছেন, রাজার অঙ্গস্পর্শে লজ্জায় অঙ্গ জড়সড় হইয়াছে, একাবলী মোচনচ্ছলে রাজাকেই দেখিতেছেন, সখীকে না বলিয়াই রাজার উদ্দেশে চলিয়াছেন, যখন একান্তই বলিতে হইল, তখন সখীর নিকটও সঙ্কুচিতা হইয়াছেন, সামান্য রাজপুরীকেও তাঁহার স্বর্গবোধ হইয়াছে, প্রথম দর্শন হইতেও দ্বিতীয় দর্শনদিবসে তিনি রাজাকে সবিশেষ প্রিয়দর্শন দেখিয়াছেন, তিরস্করণীতে প্রচ্ছন্না হইলেও রাজার উদ্বোধে শূন্যা; রাজা কোনো কামিনীকে কামনা করিতেছেন দেখিয়া পাছে আমি না হই, এই আশঙ্কায় প্রভাব দ্বারা জানিতেও ভয় পাইয়াছেন; সেই রাত্রিতে তিনি দেবসভায় অভিনয়ের নায়িকা থাকিয়াও তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন, পরে দেবদূতের আকাশবাণী তাঁহার বজ্র তুল্য জ্ঞান হইয়াছে; তিনি ইন্দ্রসভার নর্ত্তকী হইলেও নারায়ণ নামের পরিবর্ত্তে পুরূরবার নাম করিয়াছেন, রাজার মহিষী বলিয়াই দেবীকে রাজার চক্ষেই দেখিতেছেন, মিলনের পর যখন উভয়ের এক আত্মা এক দেহ হইয়াছে, তখন রাজা বিদ্যাধর বালাকে ক্ষণমাত্রও দেখিয়াছেন বলিয়া মানে মগ্না হইয়াছেন এবং উদ্বোধশূন্য হইয়াই কন্যাজনের নিষিদ্ধ-প্রবেশ কুমার বনে প্রবেশ করিয়াছেন। বিচ্ছেদাশঙ্কায় গর্ভজাত পুত্রকেও অন্যহস্তে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, পরে পুত্রসমন্বিত রাজাকে দেখিয়াই ইন্দ্রাদেশ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন এবং প্রসঙ্গত ইন্দ্রনাম শ্রবণে আদেশ স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে, তখন চিরবিচ্ছেদ ঘটিল ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন।

বিক্রমোর্ব্বশীতে তিনি শয্যা-পার্শ্বে মেষশাবক রাখেন নাই, উলঙ্গ দেখিলে থাকিব না এ নিয়মও করেন নাই, তাঁহার বিচ্ছেদেই উন্মত্ত জানিতে পারিয়াও রাজাকে কুরুক্ষেত্রে ওরূপ কর্কশ বাক্যে প্রত্যাখ্যান করেন নাই এবং গন্ধর্ব্ব দ্বারা অগ্নিস্থালী দিয়াও তাঁহাকে ভুলান নাই, কালিদাস পুরাণের ঐ উপাখ্যানই গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ উহাকে কাব্যের উপযোগী করিয়া যারপর নাই সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। পুরাণে মিত্রাবরুণ উর্ব্বশীকে বরণ করিতে চাহেন,

উর্ব্বশী, তাহার ব্যত্যয় করাতেই উহাঁদিগের শাপেই উর্ব্বশী মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা হন। বিক্রমোর্ব্বশীতেও ভরত-মুনি উর্ব্বশীকে অভিনয়ে নারায়ণকে বরণ করিতে আদেশ করেন, তাহার ব্যত্যয় ঘটাতেই মুনির শাপে উর্ব্ব-শীকে আসিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইতে হয়। কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীর মণি-হরণের সহিত মেষহরণের সৌসাদৃশ্য রাখিয়াছেন এবং অনবসিত নেপথ্যের সহিত রাজার উলঙ্গাবস্থারও সারূপ্য বিধান করিয়াছেন। পুরাণের উপা-খ্যানে গন্ধর্ব্বসৃষ্ট বিদ্যুতালোকে রা-জার উলঙ্গতার দর্শনেই উর্ব্বশী বিচ্ছিন্না হয়েন, বিক্রমোর্ব্বশীতেও বিদ্যাধর কন্যার রূপালোকে রাজার হৃদয়ের উলঙ্গভাব দর্শনে উর্ব্বশী বিচ্ছিন্না হন। বিচ্ছেদে রাজার উন্মত্ততা উভ-য়েই তুল্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণে বিচ্ছেদকালে সজীব উর্ব্বশীর নির্জ্জীব-বৎ ব্যবহার; বিক্রমোর্ব্বশীতে লতা-রূপা উর্ব্বশীর সজীবতা সত্ত্বেও অক্ষ-মতাবশতই নির্জীববৎ ব্যবহার। পু-রাণে উর্ব্বশীর সহিত চিরমিলন জন্য রাজার অগ্নিস্থালী প্রাপ্তি, ইহাতে অগ্নিবর্ণ মণিপ্রাপ্তি, পুরাণে অগ্নি-স্থালী পরিত্যাগ, বিক্রমোর্ব্বশীতেও মণি পরিত্যাগ। পরে সেই অগ্নিস্থা-নীয় শমীগর্ভ অশ্বত্থ গ্রহণ, ইহাতেও পুনরায় সেই সূত্র গর্ভমণি গ্রহণ। কালিদাস পুরাণের সেই কুৎসিত নিয়মের পরিবর্ত্তে বিক্রমোর্ব্বশীতে ইন্দ্রাদেশকেই মিলনের নিয়ম করিয়া-ছেন। পুরাণে সেই নিয়মের অপ-ভ্রংশে উর্ব্বশীর রাজাকে পরিত্যাগ, ইহাতেও রাজার পুত্রমুখদর্শনরূপ নিয়ম-ভ্রংশেই রাজাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া উর্ব্বশীর কাতরতা প্র-কাশ; পুরাণে সেই শমীগর্ভ অশ্বত্থের অরণীসংযোগে বহ্নি উৎপাদন, ইহা-তেও উহাঁদের দুঃখরূপ অরণী সম্পর্কে নভোমণ্ডলে তেজঃপ্রকাশ। পুরাণে বহ্নিতে যজ্ঞ ও যজ্ঞপ্রভাবে চির-মিলন, এখানে সে তেজে দেবর্ষি নার-দের অবস্থান ও দেবর্ষি প্রমুখাৎ ইন্দ্রা-দেশ ও পরস্পর চিরমিলন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। কালিদাস পৌরাণিক উ-পাখ্যানের কোন অংশই পরিত্যাগ করেন নাই, অথচ উহা অন্যরূপে প্রণ-য়ণ করিয়া বিক্রমোর্ব্বশীকে যারপর নাই সুমধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

(৫) মৎস্যপুরাণের সহিত কালিদাসের উপাখ্যানের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও পাঠকালে মৎস্যপুরাণ ও বিক্রমোর্ব্বশী রচনা গুণে নিশ্চয়ই দুটী স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া অনুমিত হইবে।